পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্প

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্প

অনিরুদ্ধ চৌধুরী সম্পাদিত

অনুবাদক

মণীন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ বসু
সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, অনিরুদ্ধ চৌধুবী
প্রীতি পালচৌধুরী, অনিন্দ্য চৌধুরী
তীর্থপতি দত্ত

ঃ ১, কলেজ রো, কলকাতা—৯

আশ্বিন ১৩৬৮

ISBN 81-87917-16-4

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ।। তুলি-কলম ।। ১, কলেজ রো, কলকাতা - ৯

লেজার কম্পোজ : এস টি লেজার ইউনিট, কলকাতা— ৭৩

মুদ্রক : ফ্রেন্ডস গ্রাফিক ।। ১১বি, বিডন রো, কলকাতা - ৬

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিৎ ।। অলংকরণ রাজা দত্ত

প্রাপ্তিস্থান : সাহিত্য তীর্থ ।। ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—৭৩

সূচীপত্র

ভূমিকা

'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্প' পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হল। বিদেশের সেকাল ও একালের ভূতের গল্প লেখকদের মূল গল্পগুলি সংগ্রহ, সেগুলির সুষ্ঠু ও সাবলীল অনুবাদের ব্যবস্থা ও মুদ্রণ এবং ছয়শতাধিক পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থখানির মুদ্রণ পারিপাট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা সত্যি এক দুরূহ দায়। পাঠক-সাধারণের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদকে স্মরণ করে সাধ্যমতো সে দায় বহন করতে চেষ্টা করেছি।

প্রথমেই মনে একটা প্রশ্ন জাগে : ভূত কি? ভূত কাকে বলা হয়? এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত হলেও বলা যায় : কোনও মৃত ব্যক্তির আত্মা যখন অশরীরী হয়ে জীবিতদের মাঝে ফিরে আসে তখনই সে আসে ভূত হয়ে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভূত বলতে মানুষ এই বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে আছে। ফরাসী ভাষায় ভূতকে বলা হয় revenant —যে মৃত্যু-পুরী থেকে ফিরে এসেছে।

ভূত নানা রকমের হতে পারে। লোকে সাধারণভাবে বিশ্বাস করে : যে মানুষ কোনও অশুভ পরিবেশে রহস্যজনকভাবে অথবা দুর্ঘটনায় মারা যায় সেই ভূত হয়ে ফিরে আসে তার পূর্ব বাসস্থানে শান্তির প্রত্যাশায়। অনেক সময়ই কোনও ভূতুড়ে বাড়িকে ভেঙে ফেলতে বা সংস্কার করতে গিয়ে তার মধ্যে কোনও গুপ্ত কক্ষে বা সুড়ঙ্গের মধ্যে নর-কংকাল পাওয়া যায়। সেই কংকালকে কবর দিয়ে সৎকার করার পরে অনেক সময় ভূতের উপদ্রব চলেও যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে শুভকামী ও কল্যাণার্থী ভূতের গল্পও শোনা যায়. পাকা চুল, মিষ্টি চেহারার বুড়ি ভূতরা অনেক সময়ই অসহায় আশ্রয়হীন শিশুদের আদর করে, যত্ন করে, রাতের বেলা এসে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। এককথায়, মন্দ হোক আর ভাল হোক, চঞ্চল হোক আর শান্ত হোক ভূতরা মৃত্যুপুরী থেকে ফিরে আসে— আমাদের সামনেই চলাফেরা করে, এমন কি কথাও বলে -যেভাবেই হোক তাদের অস্তিত্বকে আমরা অনুভব করতে পারি অতএব ভূত আছে। অনেকেই তাদের দেখতেও পায়।

কিন্তু বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ। কাজেই ভূত সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসে রূপান্তর ঘটছে— ঘটতে বাধ্য। আজকের মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস : ভূত আছে, কিন্তু তারা দেহধারী জীব না হয়ে একধরনের অস্তিত্বমাত্র---বলা যেতে পারে, তারা টিভি র পর্দায় দেখা ছবির মতো। তুলনাটা খুবই উপযোগী। কয়েকশো বছর আগে কোনও

মানুষ যদি বৈঠকখানার একটা বাক্সের মধ্যে চাঁদের বুকে মানুষের কাণ্ডকারখানার ছবি দেখাতে চেষ্টা করত তাহলে তো তাকে নির্ঘাৎ ডাইনী ভেবে পুড়িয়ে মারা হত। অথচ আজকের জীবনে এটা একটা সবজনগ্রাহ্য সত্য। আজ এ সবই আমাদের জানা, অন্তত জানা বলেই আমাদের ধারণা। কালক্রমে মানুষের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও কত কিছুই তো আমরা জানতে পারব, বুঝতে পারব। অথচ এটাও তো ঠিক যে আমাদের জ্ঞান রাজ্যের দিগন্ত রেখার ওপারে আজও এমন অনেক কিছুই আছে একশো বছর পরে যা হয়তো আমাদের জ্ঞানের আলোয় ধরা পড়বে। আজ যেমন বেতার, দূরদর্শন, টেপ-রেকর্ডিং বা ফটোগ্রাফকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি ও বোঝাতে পারি অদূর ভবিষ্যতে হয়তো ভূত ও ভৌতিক অস্তিত্বকেও আমরা তেমনই সহজে বুঝতে পারব, বোঝাতেও পারব। একটা ফটোগ্রাফের জন্য দরকার একটা ক্যামেরা, একটা অনুভূতিশীল ফিল্ম, একজন ফটোগ্রাফার ও এমন একটা কিছু যার ফটো তোলা হবে। তেমনই ভূতও এমন একটি ছায়াময় অস্তিত্ব যা কোনও অনুভূতিশীল বস্তুর স্থানের উপর তার ছাপ রেখে দেয়, আর সুবিধাজনক পরিবেশে সেই ছাপ যখন আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন হয়তো কোনও নতুন দর্শকের ক্যামেরার চক্ষু অনুভূতিশীল ফিল্মে তার ছবি ধরা পড়তে পারে। একটা ক্যামেরার যেমন একজন ক্যামেরাম্যান দরকার তেমনই এই সব ভৌতিক ছবিও কিছু কাল বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ অনুভূতিশীল মানুষের কাছেই ধরা পড়বে। এই হল ভূত ও ভৌতিক অস্তিত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক মত ও বিশ্বাস।

আর এখানেই ভূত ও ভূতের গল্প সম্পর্কে আমাদের ও বিদেশের ভাবনা ও বিশ্বাসের পার্থক্য। একটা চরিত্রগত পার্থক্য একান্তভাবে লক্ষণীয়। এ দেশে আমরা সাধারণত যে ধরনের ভূতের গল্প পড়তে ও শুনতে অভ্যস্ত তাতে একটা ভৌতিক ব্যাপার উদ্ভট চমকপ্রদ প্রকৃতি। আমাদের ভূতের গল্পের ভূতেরা সশরীরে উপস্থিত হয়, মাছ খায়, নাকি সুরে কথা বলে, নানা আজগুবি কাণ্ডকারখানা ঘটায়। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের ভূতের গল্প বিশেষ করে উনিশ শতকের লেখকদের ভূতের গল্পে সাধারণ ভয়াবহতার পরিবর্তে ভৌতিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডল তাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। একটা গা ছমছম করা ঝিমঝিম আবহাওয়া। সেখানে পাঠককে অভিভূত করে, শিহরিত উন্মাদ করে তোলে। কিন্তু কোনও অলৌকিক অট্টহাস অথবা আনুনাসিক কণ্ঠস্বর তাদের রোমাঞ্চকে অতি কণ্টকিত করে তোলে না। এ দেশ ও ও দেশের ভূতের গল্পের এই চরিত্রগত ও আচরণগত পার্থক্যটিকু স্মরণে রাখতে আমরা এই গ্রন্থের আগ্রহী পাঠকদের সবিনয়ে অনুরোধ জানাই। ভূত ও ভূতের গল্পের প্রাচীন ও আধুনিক কোন ব্যাখ্যাটি সঠিক সেটা পাঠক নিজেই স্থির করবেন। আমরা শুধু বলি ঃ পৃথিবী অনেক বড়। আমাদের জ্ঞান সবটা তার নাগাল পায় না। মানুষের জ্ঞান দূরবিস্তার। অথচ বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকুই বা আমরা জানি।

—সম্পাদক

প্রায়শ্চিত্ত

Confession of Charles Linkworth —ই. এফ. বেন্সন্

ফাঁসির অপেক্ষায় দিন গুণছে কারাগারে বন্দী এক হত্যাকারী। এই দণ্ডের বিরুদ্ধে তার সমস্ত আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হয়েছে। কারাগারের ডাক্তার টীসডেল নিয়মমতো সপ্তাহে একবার কি দু'বার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এই আসামীকে দেখতে আসেন। যতই তার ফাঁসির দিন এগিয়ে আসতে থাকে, ডাক্তার লক্ষ্য করেন বাঁচার প্রতি আসামীর একটা জান্তব কামনা যেন ততই তাকে পেয়ে বসছে। ডাক্তার তার অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনা কখনও প্রত্যক্ষ করেননি। আসামীর আবেদন নাকচ হওয়ার কথা জানালে, উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত হয়ে উদাসীনভাবে সে অবশ্যম্ভাবী পরিণামের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তবু ডাক্তারের মনে হল এ খবর তাকে সমস্ত বুদ্ধি-বিবেচনা রহিত করলেও যেন বাস্তব জীবনের ওপর তার একটা প্রবল আকর্ষণ তাকে উতলা করে তুলছে। কথাটা শুনে তার মূর্চ্ছা ঘটলেও সেটা সাময়িক। পরমুহূর্তে যা ঘটে গেছে সেবিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে।

খুনটা একটু অদ্ভুত, আতঙ্কজনক। খুনীর ওপর জনসাধারণের কোন সমবেদনা ছিল না। খুনীর নাম চার্লস লিংকওয়র্থ। শেফিল্ডের একটা ছোট স্টেশনারী দোকানের মালিক ছিল। তার স্ত্রী ও মায়ের সঙ্গে সে বাস করত। মা তার নৃশংসতার বলি হয়। মায়ের পাঁচশো পাউন্ড আত্মসাৎ করাই ছিল এই জঘন্য কাজের মূল উদ্দেশ্য। আদালতের বিচারে প্রকাশ পায়, চার্লস এই সময় একশো পাউন্ড দেনার দায়ে পড়ে। গত কয়েক বছর ধরে তার সঙ্গে মায়ের নানা অসন্তোষ ও ঝগড়ার মধ্যে দিন কাটছিল। তিনি বেশ কয়েকবার শাসিয়ে বলেন যে তাদের সংসারে তিনি আর থাকবেন না, এমনকি প্রতি সপ্তাহে যে আট শিলিং করে খরচ দেন তাও বন্ধ করে দেবেন। তার নিজের যে টাকা আছে তা থেকে নিজের বন্দোবস্ত করবেন।

একদিন চার্লসের স্ত্রী কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি যায়। সেইদিনই তার মা ব্যাঙ্ক থেকে সব টাকা তুলে নিয়ে আসেন। তার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধে। অশান্তি সহ্য করতে না পেরে তিনি জানান পরের দিন লন্ডনে চলে যাবেন, সেখানে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে থাকবেন। কিন্তু সেই রাতে চার্লস তার মাকে গলা টিপে হত্যা করে। রাতের অন্ধকারে সেই মৃতদেহ বাড়ির পেছনে বাগানে কবর দেয়।

তার স্ত্রী ফিরে আসার আগে সে যেকাজ করেছিল তা যুক্তিসঙ্গত ও বিবেচনাগ্রাহ্য। পরের দিন সকালে সে তার মায়ের জিনিসপত্র দুটো বাক্সে পুরে ট্রেনের মালগাড়িতে তুলে দেয়। সন্ধ্যাবেলা তার বন্ধুদের ভোজে নিমন্ত্রণ করে। সেই সময় সে তার মায়ের অন্তর্ধানের কথা বলে। এজন্যে কোন দুঃখ প্রকাশের ভানও সে করে না। কারণ তার বন্ধুরা জানত তাদের দু'জনের মধ্যে ভাল সম্বন্ধ ছিল না। তিনি চলে যাওয়াতে ঘরের শান্তি আরো বাড়বে। তার স্ত্রী ফিরে এলে একই কথা তাকে জানাল। সেই সঙ্গে আরো বলল, ঝগড়াটা এমন চরমে ওঠে যে যাবার সময় তাঁর ঠিকানাটা পর্যন্ত দিয়ে যাননি। এটাও একটা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যাতে তার স্ত্রী কোন চিঠি লিখতে না পারে। মনে হল তার স্ত্রী কাহিনীটা পুরোপুরি বিশ্বাস করল। বাস্তবিক, এ ব্যাপারে সন্দেহ করার মতো বা আশ্চর্য হওয়ার কিছু ছিল না।

সাধারণত এসব ক্ষেত্রে অপরাধীদের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিরীহ হাবভাব ও চাতুরীতে কোন ছেদ পড়ে না। কিছুদিন পরে তারা সহজেই ধরা পড়ে। চার্লসের ব্যাপারেও তাই ঘটল। যেমন তড়িঘড়ি সে ঋণ শোধ করল না, তার মায়ের খালি ঘরে এক তরুণ ভাড়াটে বসাল, তার দোকান থেকে লোক ছাড়িয়ে দিল এবং নিজেই সব কাজকর্ম করতে লাগল। এতে তার মিতব্যয়িতার পরিচয় পাওয়া গেল। আবার একই সঙ্গে তার ব্যবসার উন্নতির কথা বলে বেড়াতে লাগল। একমাস পর্যন্ত তার মায়ের ড্রয়ার থেকে ব্যাঙ্ক নোট ভাঙাল না। তারপর হঠাৎ দুটো পঞ্চাশ পাউন্ডের নোট ভাঙিয়ে পাওনাদারদের কিছু দেনা শোধ করল।

এই সময় থেকে সে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। স্থানীয় ব্যাঙ্কে একটা নতুন একাউন্ট খুলল। তার সেভিংস ব্যাঙ্কে ক্রমশ টাকা বাড়িয়ে চলল। বাগানে যা কবর দিয়েছে সে ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তাই নিজেকে আরো নিরাপদ রাখবার জন্যে ভাড়াটের সাহায্য নিয়ে সেই জায়গাটার ওপর মাটিতে পাথর দিয়ে একটা উঁচু ঢিবি তৈরি করল।

তারপর এল সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা তার এই বিপজ্জনক খেলায় সমাপ্তি ঘটাল। হঠাৎ কিংস ক্রস স্টেশনের বেওয়ারিস মালের ঘরে আগুন লাগে। তার মায়ের জিনিস আগেই সেখান থেকে নেওয়া উচিত ছিল। দুটো বাক্সের মধ্যে একটা আংশিক পুড়ে যায়। রেল কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। সেই পোড়া বাক্সটার ভেতরে মায়ের নামাঙ্কিত একটা কাপড় ও শেফিল্ডের ঠিকানা লেখা একটা খাম পাওয়া গেল। রেল কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দেবার জন্যে মিসেস লিংকওয়ার্থের নামে একটা চিঠি পাঠাল। সেই চিঠি চার্লসের স্ত্রীর হাতে গিয়ে পড়ল। সে ভাড়াটিয়ার সামনে সেটা খুলে বিষয়বস্তু জানতে পারে।

এটা একটা নির্দোষ চিঠি মনে হলেও আসলে কিন্তু চার্লসের মৃত্যুপরোয়ানা। এবিষয়ে চার্লসকে জিজ্ঞেস করা হল। সে তার মায়ের কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলা ছাড়া বাক্সগুলোর ব্যাপারে আর কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারল না। তাদের

করল। যদি প্রমাণিত হয় সত্যি তার মায়ের মৃত্যু ঘটেছে তবে জিনিসপত্রের সঙ্গে ব্যাঙ্কের টাকাটাও সে দাবি করবে। তাই তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করল না।

এরপর থেকে পুলিশ তার ওপর নজর রাখতে আরম্ভ করে। ব্যাঙ্কে খোঁজ-খবর নিতে থাকে, ব্যবসার উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করে। পাশের বাড়ির ছাদ থেকে তার বাড়ি ও বাগানের ওপর দৃষ্টি রাখে। কিছুদিন পরেই তাকে গ্রেপ্তার করে তার বিচার শুরু হয়। বিচারপর্ব বেশিদিন চলেনি। বিচার চলাকালীন কোর্টে অনেক লোকের সমাগম হত। তাদের মধ্যে বয়স্ক ভদ্রমহিলাও ছিল। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড তাদের মাতৃত্বকে দারুণ আঘাত দেয়। বিচারে তার ফাঁসি হয়।

কারাগারে যাজক অনেক চেষ্টা করেও তার স্বীকারোক্তি আদায় করতে সক্ষম হয়নি। সেপ্টেম্বর মাসের এক উজ্জ্বল প্রভাতে আসামীর ফাঁসি হয়ে গেল। ডাক্তার ফাঁসিমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। আসামীকে ফাঁসিকাঠ থেকে গর্তের মধ্যে পড়ে যেতে দেখেছিলেন। দড়ির ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তাঁর কানে পৌঁছেছিল। গর্তের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেহের তীব্র ছটফটানি লক্ষ্য করেছিলেন, যদিও সেটা কযেক সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী ছিল না। ফাঁসি সুষ্ঠুভাবেই হয়েছে। মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চিত।

একঘণ্টা পরে ডাক্তার পোস্টমোর্টম করে দেখতে পান যে ঘাড়ের কাছে মেরুদণ্ডের কশেরুকা বিচ্ছিন্ন হয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটেছে। পোস্টমোর্টমের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ মৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তার নিঃসন্দেহ তবু নিয়ম রক্ষা করতে তাঁকে একাজ করতে হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে এক বিচিত্র অনুভূতি ডাক্তারের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তিনি অনুভব করতে লাগলেন মৃতের প্রেতাত্মা যেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহের মধ্যে যেন প্রাণের অস্তিত্ব বিদ্যমান। অথচ একঘণ্টা আগে তার মৃত্যু হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। একজন ওয়ার্ডার সেই সময় এসে জানতে চাইল যে দড়িটা দিয়ে লোকটার ফাঁসি হয়েছে এবং যেটা জল্লাদের প্রাপ্য, সেটা ভুল করে মৃতদেহের সঙ্গে মর্গে এসেছে কি না। আশ্চর্যের কথা, সেটা কোথাও পাওয়া গেল না। এটা তুচ্ছ ব্যাপার কিন্তু তবু যেন কিসের ইঙ্গিত করছে।

ডাক্তার অবিবাহিত। বেডফোর্ড স্কোয়ারের বাসিন্দা। এক রাঁধুনী তাঁর রান্নার কাজ করে, তার স্বামী ডাক্তারের অন্য কাজকর্ম দেখাশুনা করে। কারাগারের ডাক্তারী করা ছাড়া রোজগারের আর দরকার ছিল না। যে টাকা তিনি পেতেন তাতে তাঁর ভালভাবেই চলে যেত। অপরাধীদের মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের জন্যই তিনি এই কাজ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন বেশির ভাগ পাপকাজ মস্তিষ্ক বিকৃতিজনিত অথবা, কোন কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে ঘটে। যেমন, চুরি করার অপরাধ কোন একটা নির্দিষ্ট কারণে ধরা যায় না। তবে এটা সত্যি যে প্রায়শ অভাবের দরুন একাজ করা হয় কিন্তু ঘন ঘন এমন হলে বুঝতে হবে সেটা মাথার কোন অজানা রোগের লক্ষণ। সাধারণত একে চৌর্যোন্মাদ হিসেবে ধরা হয়। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল

সঙ্গে হিংসাত্মক ঘটনা জড়িত। এই হত্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য টাকাপয়সা নয়। যে জঘন্যতা ও অস্বাভাবিকতা দেখা যায় তাতে হত্যাকারীকে সাধারণ অপরাধী বলে মনে হয় না, সে একজন উম্মাদগ্রস্ত।

যতদূর জানা যায় চার্লস ছিল শান্ত স্বভাববিশিষ্ট, উপযুক্ত স্বামী এবং মিশুকে প্রতিবেশী। সে এই অপরাধ করে এবং একমাত্র একটিই যা তাকে সমস্ত ভাবনা-চিন্তার বাইরে রেখেছিল। এই ভয়ঙ্কর কাজ, প্রকৃতিস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ যেই করুক না কেন, মোটেই বরদাস্ত করা যায় না। এই পৃথিবীতে তার কোন স্থান নেই। যাই হোক, যদি আসামী তার অপরাধ স্বীকার করত, ডাক্তারের বোধ হল, সে ন্যায়-বিচারের স্বপক্ষেই মত দিত; নীতিগতভাবে সে দোষী। যখন কোন আশার আলো দেখা গেল না তখন নিজেই বিচারের রায় মেনে নিয়েছিল।

সেদিন রাতে ডাক্তার খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে বসে আছেন। বই পড়ার কোন ইচ্ছা নেই। আনমনা হয়ে ফায়ারপ্লেসের দিকে মুখ করে চেয়ারে বসে আছেন। ভাবছেন তাঁর সকালের অদ্ভুত অনুভূতির কথা, মর্গে চার্লসের প্রেতাত্মার উপলব্ধি, যদিও তার একঘণ্টা আগেই জীবনদীপ নিভে গেছে। এটাই প্রথম নয়, আকস্মিক মৃত্যুতে এধরনের প্রত্যয় তাঁর আগেও হয়েছে। তবে আজ যা ঘটল তা ভোলা যায় না। তাঁর মনের এই ভাব হয়ত জন্মগত ও আত্মগত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে বলা যেতে পারে ডাক্তার আত্মায় বিশ্বাসী, মৃত্যুর পরেই যে সব শেষ হয়ে যায় তা নয়। শক্তিহীন অথবা অনিচ্ছুক আত্মা ওই পৃথিবীর খুব কাছে ঘুরে বেড়ায়। ডাক্তার অবসর সময় ভূতপ্রেত নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন। পণ্ডিত ও দক্ষ ডাক্তারের মতো তিনিও দেহ ও আত্মার মধ্যে ব্যবধান যে কত সূক্ষ্ম তা স্বীকার করেন, জাগতিক বস্তুর প্রতি তার ভীষণ প্রভাব যে কত অননুভবনীয় এবং একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হল না. যে বাস্তব ও সীমাবদ্ধ মানুষের সঙ্গে বিদেহী আত্মার সোজাসুজি যোগাযোগ সম্ভব।

এইরকম নানা চিন্তার মধ্যে তিনি যখন মগ্ন, টেবিলের ওপরে টেলিফোনটা তখন হঠাৎ বেজে উঠল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার টেলিফোনের স্বাভাবিক ক্রিং ক্রিং আওয়াজটা খুব ক্ষীণ স্বরে বাজল, মনে হল বিদ্যুৎ সরবরাহ কম অথবা যন্ত্রে কোন গোলমাল হয়েছে। যাই হোক, সত্যিই ফোনটা বাজছে কিনা সন্দেহ দূর করবার জন্যে ডাক্তার উঠে গিয়ে ফোনটা তুলে কানে দিলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি বলছি। কে আপনি?

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে দুর্বোধ্য ও শ্রবণাতীত ফিসফিসানি কানে এল।

আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না।

আবার সেই ফিস ফিস শব্দ, তারপর নিস্তব্ধতা। টেলিফোনটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন; আবার টেলিফোনটা তুলে নিয়ে এক্সচেঞ্জে ফোন করে জিজ্ঞেস করলেন, বলতে পারেন কোন্ নম্বর থেকে আমায় এইমাত্র ফোন করা হয়েছিল?

কিছুক্ষণ পর তাঁকে জানাল যে জেলখানার যিনি ডাক্তার সেখান থেকে ফোন করা হয়েছিল।

আমাকে সেখানে লাইনটা দিন।

লাইন সংযোগ করা হল।

এইমাত্র তুমি আমায় টেলিফোন করেছিলে ? হ্যাঁ, আমি ডাক্তার টীসডেল বলছি। ব্যাপার কি ? তুমি কি বললে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

ও প্রান্ত থেকে পরিষ্কার ও বোধগম্য গলার স্বর শোনা গেল।

কিছু ভুল হয়েছে স্যার। আমরা আপনাকে ফোন করিনি।

কিন্তু তিন মিনিট আগে আমায় এক্সচেঞ্জ জানাল তোমাদের ওখান থেকেই ফোন করা হয়েছিল।

এক্সচেঞ্জ ভুল করেছে স্যার।

অদ্ভুত ব্যাপার! আচ্ছা ঠিক আছে। গুড নাইট, ওয়ার্ডার ড্রেকট কথা বলছ না ?

হ্যাঁ স্যার। গুড নাইট স্যার।

ডাক্তার তাঁর চেয়ারে ফিরে গেলেন। বই-এর মধ্যে তিনি মনোনিবেশ করতে পারলেন না। ফোনের ব্যাপারটা ঘুরে ফিরে তাঁর চিন্তাকে ঘোরালো করে তুলছে। মাঝে মাঝে ভুলক্রমে তাঁর টেলিফোনটা বেজে ওঠে বটে, আবার কখনও এক্সচেঞ্জ ভুল নম্বর দিয়ে বসে। কিন্তু এই যে মৃদুস্বরে ফোনের আওয়াজ, অপর প্রান্ত থেকে দুর্বোধ্য ফিসফিসানি ডাক্তারের মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। চেয়ার ছেড়ে উঠে তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকেন আর নানা চিন্তার জট মনের মধ্যে পাকাতে থাকে।

একসময় স্বগতোক্তি করে বললেন, কিন্তু এ অসম্ভব।

পরদিন সকালে যথারীতি তিনি জেলখানায় গেলেন। অদৃশ্য কিছুর উপস্থিতি আবার তাঁর বোধশক্তিকে অদ্ভুতভাবে ঘিরে রইল। এর আগেও তাঁর আধিদৈবিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি জানতেন যে তিনি অনুভবনশীল অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যিনি নিয়ম বহির্ভূত অনুভূতি লাভ করতে পারেন এবং আমাদের চারদিকে অবস্থিত অদৃশ্য জগতের আভাস পেতে পারেন। তাই আজ সকালে যে লোকটির গতকাল ফাঁসি হয়েছে তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন। এটা স্থানিক এবং এই ছোট জেলখানার চত্বরে ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীকে রাখার কারাকক্ষের সামনে দিয়ে যাবার সময় তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করলেন। এটা এমনই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে তাঁর সামনে যদি সেই মানুষটিকে সশরীরে দেখা যেত তবুও তিনি আশ্চর্য হতেন না। এমনকি সেই গলিপথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তাকে প্রকৃতই দেখবার জন্যে পেছন ফিরে তাকান। সব সময়েই তিনি মনে একটা গভীর আতংক সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং এই অদৃশ্য কিছুর উপস্থিতি তাঁকে বিরক্ত করে তুলল। তাঁর মনে হল এই হতভাগ্য প্রেতাত্মা তার হয়ে কিছু করতে চায়। এই আবেগ যে বৈষয়িক তাঁর মনে একবারও সে সন্দেহ জাগেনি। তাঁর মনের চিন্তাধারা এমনই বাস্তবানুগ যে একে

অলীক কল্পনার সৃষ্টি বলে ধরা যেতে পারে না। চার্লসের বিদেহী আত্মা সেখানে উপস্থিত ছিল।

তিনি হাসপাতালে ঢুকে কিছুক্ষণ কাজের মধ্যে ব্যস্ত রইলেন। কিন্তু সর্বক্ষণ তাঁর কাছাকাছি সেই আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে লাগলেন। তবে সেই মানুষটি যেসব স্থানে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল সেখানে যত বেশি অনুভূত হয়েছিল, এখানে সে তুলনায় অনেক কম। শেষে তাঁর ধারণা পরীক্ষা করবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে ফাঁসিমঞ্চের ছাউনির দিকে তাকালেন। পরমুহূর্তে তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি দেখতে পেলেন মঞ্চে ওঠার শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট ও আবছা এক মূর্তি—হাত দুটো পেছনে বাঁধা, মাথা ও মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা! তিনি যে সেটা দেখতে পেলেন সে বিষয়ে কোন ভুল নেই।

ডাক্তার টীসডেল সাহসী লোক। এই আকস্মিক বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন না বরঞ্চ ক্ষণিক উদ্বিগ্নে লজ্জাবোধ করলেন। ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠেনি সেটা প্রধানত আকস্মিক বিস্ময় হয়েছিল। ভৌতিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তিনি কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন তবু সেখানে ফিরে যাবার মতো মনকে শক্ত করে তুলতে পারেননি। যদি এই হতভাগ্য পৃথিবীমুখী প্রেতাত্মার তাঁকে কিছু জানাবার থাকে তবে সেটা দূর থেকে হওয়াই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন। যতদূর তিনি জানেন এরা অবাধে চতুর্দিক বিচরণশীল গার্ডখানা, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর কারাকক্ষ হাসপাতাল—সর্বত্রই এর গতিবিধি অনুভূত হয়েছে। আরো একটা ব্যাপার মনে উদয় হওয়াতে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে ওয়ার্ডার ড্রেকটকে ডেকে পাঠালেন। এই ড্রেকটই গত রাতে টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল।

তুমি স্থির নিশ্চিত, গত রাতে আমি ফোন করার আগে কেউ আমাকে ফোন করেনি ?

ওয়ার্ডারের ইতস্ততভাব ডাক্তারের নজর এড়িয়ে গেল না।

আমি বুঝতে পারছি না স্যার, কি করে এটা সম্ভব হতে পারে ? আধঘন্টা এমনকি তারও বেশি সময় আমি টেলিফোনের কাছেই বসেছিলাম। যদি কেউ ফোনের কাছে থাকত, আমি অবশ্যই তাকে দেখতে পেতাম।

তাহলে তুমি কাউকে দেখনি ? ডাক্তার একটু জোর গলায় বললেন।

লোকটি আরো বেশি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

না স্যার, কাউকে দেখিনি, সে জোরের সঙ্গে উত্তর দিল।

ডাক্তার অন্যদিকে দৃষ্টি রেখে তাচ্ছিল্যভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু তোমার হয়ত মনে হয়েছিল সেখানে কেউ ছিল ?

স্পষ্টই বোঝা গেল ড্রেকটের মনে কিছু ছিল কিন্তু তা প্রকাশ করতে সে কুণ্ঠাবোধ করছিল।

আপনি যদি ওভাবে বলেন স্যার তা বলতে পারেন, আমি ঝিমুচ্ছিলাম অথবা আমার রাতের খাওয়া বদহজম হয়েছিল।

ডাক্তার এবার একটু সতর্ক হয়ে উঠলেন।

সেরকম আমি কিছু করব না যাতে তুমি বলতে পার আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে টেলিফোনের আওয়াজ শুনেছিলাম। মনে রেখ ড্রেকট, ফোনটা আমার খুব কাছে থাকা সত্ত্বেও তার স্বাভাবিক আওয়াজ না হয়ে ক্ষীণ শব্দে বেজেছিল। আর যখন ফোনটা তুলে নিয়ে কানে দিই কেবলমাত্র তখনই ফিসফিস শব্দ শুনেছিলাম। কিন্তু তুমি যখন কথা বললে তখন তা স্পষ্টই শুনতে পেয়েছিলাম। এখন আমার বিশ্বাস ফোনের এ প্রান্তে কিছু বা কেউ নিশ্চয়ই ছিল। তুমি এখানে ছিলে, কাউকে দেখতে না পেলেও তুমি মনে করেছিলে কেউ এখানে ছিল।

লোকটি মাথা নেড়ে সায় দিল।

আমি ভীতু নই স্যার, আর কল্পনাতেও ডুবে থাকি না। কিন্তু কেউ একজন ছিল। যন্ত্রটার ওপর চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেটা বাতাস নয় কারণ ঘরের অন্য কিছু নড়ছিল না, রাতটাও বেশ গরম ছিল। আমি নিশ্চিত হবার জন্য জানালা বন্ধ করে দিই। কিন্তু স্যার, একঘণ্টারও বেশি সেটা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। টেলিফোন বইয়ের পাতা ওলটানোর খসখস শব্দ হচ্ছিল। যতই আমার কাছে আসছিল, আমার চুলগুলো ততই এলোমেলো হয়ে উঠছিল। আর কি দারুণ ঠাণ্ডা, স্যার!

ডাক্তার একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, গতকাল সকালে কি করা হয়েছিল সে ব্যাপারে তোমায় কিছু মনে করিয়ে দিয়েছিল কি?

আবার লোকটি ইতস্তত করে শেষে বলল, হ্যাঁ স্যার, চার্লস লিংকওয়ার্থকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা।

নিশ্চিতভাবে ডাক্তার মাথা নাড়লেন। বললেন, ঠিক আছে। আজ রাতে কি তুমি ডিউটিতে আছ?

হ্যাঁ স্যার, তবে না থাকতেই আমি ইচ্ছুক।

আমি জানি তোমার কি অবস্থা, আমারও ঠিক এইরকম হয়েছিল। যাই হোক না কেন, মনে হয় আমাকে সে কিছু জানাতে চায়। আচ্ছা, কাল রাতে এখানে কোন গোলমাল হয়েছিল কি?

হ্যাঁ স্যার আধ ডজন লোক বিরাট চিৎকার ও আর্তনাদ করে ওঠে। এরা সাধারণত শান্ত প্রকৃতির লোক। মাঝে মাঝে কোন ফাঁসি হবার পর রাতে এরকম হয়। আমি এটা আগেই জানতাম তবে গত রাতে যেমন হয়েছে এমন আর কখনও হয়নি।

হুঁ। আচ্ছা দেখ, যদি এই—এই বস্তুটা যাকে তুমি দেখতে পাও না, আজ রাতে আবার যদি টেলিফোনের কাছে যায়, তুমি তাকে সব সুযোগ দেবে। হয়ত ঠিক একই সময়ে সে আসবে। আমি তোমাকে বলতে পারব না কেন, তবে সাধারণত তাই ঘটে। যদি নেহাতই তোমাকে ঘরে থাকতে হয়, ঠিক সাড়ে নটা থেকে সাড়ে

দশটা—এই একঘণ্টা তুমি টেলিফোনের কাছে থাকবে না। যদি আমাকে কেউ ফোন করে, কথা শেষ হলে পর আমি তোমাকে ফোন করে জানাব।

ভয়ের কিছু নেই তো স্যার?

সকালে ডাক্তারের নিজের আতঙ্কের কথা মনে পড়ল কিন্তু তিনি বেশ আন্তরিকভাবেই বললেন, আমি নিশ্চিত, ভয়ের কিছু নেই।

সেদিন রাতে ডাক্তার এক ভোজের নিমন্ত্রণে না গিয়ে ঠিক সাড়ে নটার কিছু আগে নিজের পড়ার ঘরে গিয়ে বসলেন। যে বিধি অনুযায়ী প্রেতাত্মাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত সে সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতাবশত ডাক্তার ওয়ার্ডারকে বলতে পারেননি কেন মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট সময়ে তাদের আবির্ভাব ঘটে, বিশেষ করে সেই প্রেতাত্মার যখন কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, যেমন এখানে হতে পারে; তিনি দেখেছেন দিনে অথবা রাতে ঠিক একই সময়ে আগমন হয়। নিয়ম অনুযায়ী, এদের দেহ ধারণ করার বা উদ্দেশ্য জানাবার বা অনুভব করানোর ক্ষমতা মৃত্যুর পরেই অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে অতি তীব্র থাকে। পরে যত তারা পৃথিবীর অভিমুখ থেকে দূরে সরে যায় তাদের ক্ষমতা তত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে একেবারে নিবৃত্ত হয়। আজ রাতে তিনি আরো ক্ষীণ অনুভূতি উপলব্ধি করবার জন্যে তৈরি হয়ে আছেন। শুঁয়োপোকা থেকে যেমন নতুন মথের জন্ম হয় তেমনি গোড়াব দিকে আত্মা দেহ থেকে পৃথক হলে দুর্বল হয়।

ঠিক সেই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আগের রাতের মতো ক্ষীণ নয় কিন্তু তা স্বাভাবিকভাবেও নয়। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে ফোনটা কানে দিলেন। তিনি শুনতে পেলেন হৃদয়বিদারক ফোঁপানি, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড আক্ষেপ, মনে হল যেন শোককারীকে খণ্ড-বিখণ্ড করে তুলছে।

তিনি কথা বলার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন, অজানা ভয়ে সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা বোধ হল তবু যদি তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় সাহায্য করার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। অবশেষে তিনি বললেন। আমি ডাক্তার টীসডেল। আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি? আর তুমিই বা কে? যদিও ভাবলেন এটা অনাবশ্যক প্রশ্ন।

আস্তে আস্তে ফোঁপানি থেমে গেল। ফিসফিস শব্দ হতে লাগল। তখনও কান্নার বেগ থামেনি। আমি বলতে চাই স্যার- -আমি বলতে চাই—আমি অবশ্যই বলব—

হ্যাঁ, কি বলবে বল?

না, তোমাকে নয়—অন্য আর একজনকে। যে আমাকে দেখতে আসত। আমি তোমাকে যা বলব তাকে কি বলবে? তাকে আমার কথা শোনাতে অথবা আমাকে দেখাতে আমি পারব না।

তুমি কে? তার কথা শেষ হবার আগেই ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

চার্লস লিংকওয়ার্থ। আমার মনে হয় তুমি জান। আমি ভীষণ দুঃখী। আমি জেলখানা ছাড়তে পারছি না—ভীষণ ঠাণ্ডা! তুমি কি ঐ ভদ্রলোককে ডেকে পাঠাবে?

তুমি যাজকের কথা বলছ?

হ্যাঁ, যাজক? গতকাল আমি যখন উঠোনের চত্বর পার হচ্ছিলাম, সে ধর্মোপাসনা করছিল। আমাকে বলা হয়েছিল আমি এত দুঃখী হব না।

ডাক্তার একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন। এই অদ্ভুত গল্প কারাগারের যাজক মিঃ ডবিন্সকে বলতে হবে যে যাকে গতকাল ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তার আত্মা টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেছে। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসী এই অসুখী আত্মা দুঃখী এবং সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। সে কি বলতে চায় তা জিজ্ঞেস করার আর দরকার নেই।

অবশেষে ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ, আমি তাকে এখানে আসতে বলব।

ধন্যবাদ স্যার, হাজার বার ধন্যবাদ। তুমি তাকে আনবে, তাই না?

তার গলার স্বর ক্রমশ ক্ষীণ হতে লাগল।

অবশ্যই কাল রাতে। আমি আর বেশিক্ষণ কথা বলতে পারছি না। আমাকে যেতে হবে দেখতে—হা ঈশ্বর।

আবার ফোঁপানি শুরু হল, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর।

প্রবল উত্তেজনার বশে ডাক্তার চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখতে? তুমি কি করছ আমাকে বল? তোমার কি হয়েছে?

আমি বলতে পারব না, আমি বলতে পারব না। ওটা...ক্ষীণ শব্দ থেমে গেল।

ডাক্তার ফোনটা কানে রেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন! কিন্তু কর্কশ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। ফোনটা নামিয়ে রেখে কপালে হাত দিয়ে বুঝতে পারলেন ভয়ে তাঁর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠছে। তাঁর কান ভোঁ ভোঁ করছে, হৃদয়ে দ্রুত ও ক্ষীণ স্পন্দন হচ্ছে। নিজেকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্যে চেয়ারে বসে পড়লেন। দু'-একবার তাঁর মনে হল কেউ কি তাঁর সঙ্গে ভীষণ ঠাট্টা করছে? কিন্তু তা হতে পারে না তিনি জানতেন। তিনি স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারলেন যে ভয়ানক ও অপ্রীতিকর পাপকাজের দরুন দারুণ মর্মপীড়ায় পীড়িত এক আত্মার সঙ্গে কথা বলছিলেন। এটা তাঁর মনের ভ্রান্তি নয়। কি আশ্চর্য! এই লন্ডনের বেডফোর্ড স্কোয়ারের এক মনোরম ঘরে আরামদায়ক পরিবেশের মধ্যে বসে তিনি মৃত চার্লস লিংকওয়ার্থের আত্মার সঙ্গে কথা বললেন!

কিন্তু এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে থাকবার সময় তাঁর নেই। প্রথমেই তিনি কারাগারে ফোন করলেন।

ওয়ার্ডার ড্রেকট।

অপর প্রান্তে লোকটির ভয়ে কম্পিত গলার স্বর স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়।

হ্যাঁ স্যার। আপনি কি ডাক্তার টীসডেল?

হ্যাঁ। তোমার ওখানে কিছু হয়েছে?

দু'বার মনে হল লোকটি কিছু বলার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। তৃতীয়বারের চেষ্টায় গলার শব্দ পাওয়া গেল।

হ্যাঁ স্যার। সে এখানে ছিল। আমি তাকে টেলিফোনের ঘরে ঢুকতে দেখেছিলাম।

ওঃ ! তার সঙ্গে তুমি কথা বলেছিলে ?

না স্যার ; আমার সর্বাঙ্গে ঘাম ঝরছিল, আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম। আর আধ ডজন লোক তাদের ঘুমের মধ্যেই আর্তনাদ করছিল ! কিন্তু এখন সব শান্ত। আমার মনে হয় সে ফাঁসিমঞ্চের দিকে গেছে।

আচ্ছা। আমার মনে হয় আর কোন গোলমাল হবে না। হ্যাঁ ভাল কথা, আমাকে মিঃ ডকিন্সের বাড়ির ঠিকানাটা দাও তো।

*   *   *   *

ডাক্তার যাজককে পরদিন রাতে তাঁর বাড়িতে ভোজের নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার টেলিফোনটা খুব কাছেই থাকাতে টেবিলের ওপর তিনি লিখতে পারলেন না। ওপরতলায় গিয়ে ড্রইংরুমে বসে তিনি লেখার কাজ শেষ করলেন। সেই চিঠিতে জানালেন এক অদ্ভুত ইতিহাস তাঁর কাছে ব্যক্ত করবেন এবং তাঁর সাহায্য নেবেন। এমনকি কোন কাজ থাকলেও তা যেন তিনি বাতিল করেন। আরো লিখলেন, তিনি নিজেও আজ রাতে তাই করেছিলেন। তা যদি না করতেন তবে তার জন্য তাকে দুঃখপ্রকাশ করতে হত।

পরদিন রাতে যথারীতি খাওয়া-দাওয়া সেরে দু'জনে বসে সিগারেট ও কফি খাচ্ছেন। তখন ডাক্তার বললেন, ডকিন্স, আমার কথা শুনে আপনি আমাকে পাগল ভাববেন না !

মিঃ ডকিন্স হাসলেন। বললেন, আমি কথা দিচ্ছি তা হবে না।

খুব ভাল। গত রাতে এবং তার আগের রাতে, এ সময় থেকে আর একটু পরে, দু'দিন আগে আমরা যাকে ফাঁসি হতে দেখেছি সেই চার্লস লিংকওয়ার্থের প্রেতাত্মার সঙ্গে আমি টেলিফোনে কথা বলেছি।

যাজক হাসলেন। চেয়ারটা একটু পেছনে ঠেলে বসলেন। মুখে বিরক্তির ভাব।

টীসডেল, আমাকে এই কথা বলতে, অবিশ্যি আমি দুর্বিনীত হতে চাই না, এই ভুতুড়ে গল্প শোনাবার জন্য আজ রাতে আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছেন ?

হ্যাঁ। আপনি এখনও সব শোনেননি। আপনাকে এখানে আনবার জন্যে কাল রাতে সে আমাকে বলেছে। সে আপনাকে কিছু বলতে চায়। আমার মনে হয় সেটা কি আমরা তা ধারণা করতে পারি।

ডকিন্স উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, দয়া করে আমাকে আর শোনাবেন না। মৃত ফিরে আসে না। কি অবস্থায় এবং কি পরিস্থিতিতে তারা বিদ্যমান তা এখনও আমাদের কাছে পরিস্ফুট নয়। জাগতিক সমস্ত সম্পর্ক তাদের শেষ হয়েছে।

কিন্তু আমি আপনাকে আরো কিছু বলব। দু'রাত আগে আমাকে ফোন করেছিল, খুব ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বর শুনেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি খবর নিই কোথা থেকে আমাকে ফোন করা হয়েছিল এবং আমাকে জানান হয় জেলখানা থেকে ফোন এসেছিল। আমি জেলখানায় ফোন করি। ওয়ার্ডার ড্রেকট জানায় কেউ আমাকে ফোন করেনি। সেও কিছুর উপস্থিতি অনুভব করেছিল।

আমার মনে হয় লোকটা মদ খেয়েছিল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডকিন্স বললেন।

ডাক্তার একমুহূর্ত থামলেন।

ওধরনের কথা বলা আপনার উচিত নয়। তার মতো ধীর স্থির লোক আমাদের আর একজনও নেই। সে যদি মাতাল হয়ে থাকত তবে আমিও তাই হয়েছিলাম ?

যাজক আবার চেয়ারে বসে পড়লেন।

আমাকে ক্ষমা করবেন, তবে আমি আর এগোতে চাই না। এ ব্যাপারে মাথা ঘামানো বিপজ্জনক ব্যাপার। তাছাড়া, এটা যে একটা তামাশা নয় তা কি করে আপনি জানলেন ?

কে তামাশা করছে ? চুপ ! শুনুন ! হঠাৎ ডাক্তার বললেন।

টেলিফোন বেজে উঠলো। ডাক্তার স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

আপনি শোনেননি ?

কি শুনব ?

টেলিফোনের বেল বাজার আওয়াজ ?

আমি কোন আওয়াজ শুনিনি, যাজক বেশ রাগতভাবে বললেন। কোন বেল বাজেনি।

ডাক্তার কোন কথা না বলে তাঁর স্টাডিরুমে উঠে গেলেন এবং আলো নিভিয়ে দিলেন। তারপর রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে দিলেন।

হ্যাঁ ? কে কথা বলছে ? ডাক্তারের গলা কাঁপছে। হ্যাঁ, মিঃ ডকিন্স এখানে আছেন। তাঁকে তোমাব সঙ্গে কথা বলাতে চেষ্টা করব।

তিনি অন্য ঘরে ফিরে গেলেন।

ডকিন্স, নিদারুণ যন্ত্রণায় এক আত্মা অপেক্ষা করছে। তার কথা শুনতে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি। ঈশ্বরের দোহাই আসুন এবং শুনুন।

যাজক একমুহূর্ত ইতস্তত করলেন। তারপর বললেন, বেশ আপনি যা বলবেন।

তিনি রিসিভারটা টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিয়ে কানে দিলেন।

আমি মিঃ ডকিন্স বলছি।

তিনি অপেক্ষা করলেন।

আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ কিছু যেন—একটা ক্ষীণ ফিসফিস শব্দ ? শুনতে চেষ্টা করুন, শুনতে চেষ্টা করুন। ডাক্তার বললেন।

আবার যাজক মন দিয়ে শুনতে চেষ্টা করলেন। হঠাৎ তিনি রিসিভারটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ভুরু কুঞ্চিত করলেন।

কিছু—কেউ যেন বলল, আমিই তাকে মেরেছি, আমি স্বীকার করছি ! আমাকে ক্ষমা করা হোক। ডাক্তার টীসডেল, এটা একটা তামাশা। প্রেতাত্মাবাদে আপনার ঝোঁক আছে জেনে কেউ এই ভীষণ ঠাট্টা করছে। আমি এ বিশ্বাস করতে পারি না।

ডাক্তার রিসিভারটা কানে তুলে নিলেন।

আমি ডাক্তার টীসডেল বলছি। কিছু সঙ্কেত মিঃ ডকিন্সকে দিতে পার যাতে বোঝা যাবে তুমিই চার্লস লিংকওয়ার্থ ?

তারপর রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন।

সে বলল পারবে। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ডাক্তার বললেন।

রাতটা বেশ গুমোট হয়ে আছে। ঘরের খোলা জানালা দিয়ে বাড়ির পেছন দিকের পাথর বাঁধান চত্বর দেখা যাচ্ছে। মিনিট পাঁচেক কি তারও বেশি দু'জনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। আশ্চর্য হবার মতো কিছুই ঘটল না।

তখন যাজক বললেন, আমি যা বলেছি আমার মনে হয় ওটাই যথার্থ সিদ্ধান্ত।

তাঁর কথা বলতে বলতেই হঠাৎ একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের মধ্যে ঢুকল। টেবিলের ওপরে কাগজগুলো খসখস করে আওয়াজ তুলল। ডাক্তার জানালাটা বন্ধ করে দিলেন।

আপনি অনুভব করলেন ?

হ্যাঁ, একঝলক বাতাস, বেশ ঠাণ্ডা।

আবার বন্ধ ঘরের মধ্যে বাতাস ঘুরতে লাগল।

এবং এবার ওটা অনুভব করলেন ?

যাজক মাথা নেড়ে সায় দিলেন। হঠাৎ তাঁর বুক ধড়ফড় করে উঠল। গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। বিস্ময়ে চিৎকার করে ঈশ্বরের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, আসন্ন রাত্রির সমস্ত বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

কিছু যেন আসছে ! ডাক্তার বললেন।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে হাজির। তাঁদের থেকে তিন গজও দূরে নয়, ঘরের ঠিক মাঝখানে মানুষের এক আকৃতি, মাথাটা কাঁধের ওপর ঝুলে পড়েছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। সে দুই হাত দিয়ে তার মাথাটা তুলে ধরল যেন মনে হল একটা ভারী কিছু ওঠাল—তাদের দিকে তাকাল। তার চোখ দুটো ও জিভটা ঠেলে সামনের দিকে বেরিয়ে আসছে, গোলাকার দাগটা গলায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পরমুহূর্তে কাঠের মেঝের ওপর ঘরঘর শব্দ হল—মূর্তি অদৃশ্য ! মেঝেয় পড়ে আছে একটা নতুন দড়ি।

অনেকক্ষণ তাদের দু'জনের কেউ কথা বলল না। ডাক্তারের মুখ দিয়ে ঘাম ঝরছে। ফ্যাকাসে ঠোঁট দুটো দিয়ে যাজক বিড়বিড় করে ঈশ্বরকে ডেকে চলেছে। অনেক কষ্টে নিজের সম্বিৎ ফিরিয়ে এনে ডাক্তার দড়িটা দেখাল।

ফাঁসি হবার পর থেকে এটা পাওয়া যাচ্ছিল না। ডাক্তার বললেন।

আবার টেলিফোন বেজে উঠল। এবার যাজককে আর বলে দিতে হল না। তিনি একলাফে ফোনের কাছে গেলেন কিন্তু বেল বাজা থেমে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে তিনি [illegible] শুনলেন।

অবশেষে তিনি বললেন, চার্লস লিংকওয়ার্থ, তুমি ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আছ ; তোমার পাপকর্মের জন্যে তুমি সত্যিই দুঃখিত ?

শ্রবণাতীত কিছু উত্তর ডাক্তারের কানে এল এবং যাজক দু' চোখ বুজলেন। পাপমুক্তির

বাণী উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার টীসডেল হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

আর বেশি কিছু আমি শুনতে পাইনি। রিসিভারটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে যাজক বললেন।

সেই সময় ডাক্তারের চাকর একটা ট্রেতে স্পিরিট ও নলযুক্ত বোতল নিয়ে ঘরে ঢুকল। প্রেতাত্মা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেদিকে না তাকিয়ে চাকরকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বললেন, পার্কার, ওখানে দড়িটা পড়ে আছে, ওটা নিয়ে পুড়িয়ে ফেল।

একমুহূর্ত নীরবতা।

কোন দড়ি নেই স্যার। পার্কারের বিস্ময়কর উত্তর।

অনুবাদ : রবীন্দ্রনাথ বসু

ভুতুড়ে কোট

The Coat—এ. ই. ডি. স্মিথ

আমি বেশ ভাল করেই জানি অফিসেব অন্য লোকেরা আমাকে মনে করে এক অদ্ভুত জীব—এক বিচিত্র পক্ষীবিশেষ। যদিও, একজন লোক যে অধ্যয়নশীল স্বভাববিশিষ্ট, যে গোলমাল পছন্দ করে না এবং যে নির্বোধের সঙ্গই বেছে নেয়, আরো বিশেষ করে যে দৃষ্টির অভাবহেতু মোটা কাঁচের চশমা পরে, সে সব সময় নীচমনা লোকদের কাছে ভুল বুঝে থাকবে। সাধারণভাবে, আমার বন্ধুদের মতামতের জন্যে যে অবজ্ঞা পাওয়া উচিত তাই দিয়ে থাকে। কিন্তু এই বিশেষ মুহূর্তে আমি ভাবতে শুরু করেছি যে তাদের অভিমতের পেছনে হয়ত কিছু থাকতে পারে। যদিও আমি ঐ বিচিত্র পক্ষীবিশেষ ব্যাপারটা মেনে নিতে পারি না, তবে নিঃসন্দেহে আমি একটা গাধা—একটা প্রথম শ্রেণীর বোকা লোক। তা না হলে আমি দিব্যি আরামে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে ছুটিটা উপভোগ করতে পারতাম। ভাঁড়ের গান শুনে অথবা সমুদ্রের ধারে বিশ্রাম নিয়ে দিন কাটাতাম। তার পরিবর্তে ফ্রান্সের এক নাম না জানা জায়গায় বোকার মতো সাইকেলে ঘুরে বেড়াবার মতলব করেছি। বৃষ্টিতে পুরাদস্তুর ভিজে, ক্ষুধার্ত ও দিশেহারা হয়ে এক অচেনা দেশে অপরিচিতের মতো, হতোদ্যমে মাল বোঝাই সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে ঘুরে বেড়াচ্ছি—গর্দভের মতো বাছাই করার এই বর্তমান ফল।

ঝড়ের বেগে আমি নির্দিষ্ট পথ থেকে অনেক মাইল দূরে সরে গেছি, ভোসজেসের এক জনশূন্য রাস্তা দিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে প্রবল বৃষ্টি মাথায় করে অনেক কষ্টে চলেছি, কোথাও জীবন্ত মানুষ অথবা মানুষের বাসস্থান চোখে পড়েনি।

অনেকক্ষণ পর অবশেষে একটা মোড় ঘুরতেই সামনে একটা বাড়ির ছাদের অংশ এবং চিমনি চোখে পড়ল। রাস্তা ছেড়ে একটু ভেতরে একটা গাছের ঝাড়ের আড়ালে নির্জন জনশূন্য পরিবেশে বাড়িটা অবস্থিত। এমনকি সেখানে আকর্ষণ করার মতো কিছু নেই। তবু ওই বন্য পরিবেশের মধ্যেও বাড়িটা স্বাগতম জানাবার পক্ষে যথেষ্ট। সাময়িক আশ্রয় পাবার আশায় এবং কিছু খাবার প্রয়োজনেও আমি সেইদিকে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম। দুশো গজ যাবার পর তবে বাড়ির গেটের সামনে এসে হাজির হয়ে এক শোচনীয় হতাশ্যার সম্মুখীন হলাম। ছাদহীন দরোয়ানের ঘর, পুরনো ক্ষয়প্রাপ্ত লোহার গেট দুটো কব্জার ওপর ভর করে ঝুলছে, সামনের পায়ে চলার পথটা ঝোপঝাড়ে ভর্তি—এ সবকিছুই ইঙ্গিত দিচ্ছে এখানে কেউ থাকে না।

মন থেকে সব ভাবনা-চিন্তা ঝেড়ে ফেলে এই বলে চাঙ্গা করে তুলতে লাগলাম যে এমন দুর্যোগময় অবস্থার মধ্যে এই পরিত্যক্ত বাড়িটা অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। কোন ঢাকা জায়গায় দাঁড়াতে পারলে আমার ভিজে পোশাক নিঙ্ড়োতে পারব আর ভাঙা সাইকেলটাও মেরামত করে নিতে পারব। তাই আর সময় নষ্ট না করে সাইকেল নিয়ে বারান্দার নিচে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেটা একটা পুরনো জমিদার বাড়ি বলে মনে হল। লতাগুল্ম বাড়িটার দেওয়াল ঢেকে ফেলেছে। দরজার পাশে দু'ধারে খোদাই করা পাথরে বংশমর্যাদার নিদর্শন। বোঝা যাচ্ছে এখানে একসময় উঁচু দরের লোক বাস করত। জানালাগুলো প্রায় সব বন্ধ, ঝুলে ভর্তি। মনে হচ্ছে বহুদিন এখানে কেউ বাস করেনি।

দরজাটা খোলবার চেষ্টা করলাম। কি আশ্চর্য দরজা খোলা। কাঁধের একটু ধাক্কা লাগতেই পাল্লাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে ফাঁক হয়ে গেল। সামনে বড় হলঘর, অস্পষ্ট আলোয় ভেতরে ঢুকলাম। একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বোলালাম। একটা পুরনো খালি বাড়িতে ঢুকলে যেমন গা ছম ছম করে, আমারও তেমনি একটু ভয় ভয় করছিল। আমার সামনে একটা চওড়া সিঁড়ি তার ঠিক ওপরে লম্বা মতো জানালা—কাঁচগুলো মাকড়সার জালে আর ময়লায় ভর্তি, একটুও আলো দেখা যাচ্ছে না। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই যে ঘরটা দেখা গেল তার দরজাটা ঠেলে খুলে ফেললাম। ঘরটা বেশ বড় আর সাজানো-গোছানো! এটাই প্রধান ঘর বলে মনে হল যদিও বহুদিন অযত্ন ও অব্যবহারে শোচনীয় অবস্থা। কারুকার্য করা কার্নিশ ভেঙে ভেঙে গেছে, ঘরের ছাদের এক কোণের চুনবালি একেবারে খসে গেছে। আঠার শতাব্দীর আসবাবপত্রগুলোয় সবুজ ছাতা ধরেছে। ছেঁড়া পর্দাঝালরগুলো ঝুলছে। দরজার গোড়া থেকে ফায়ারপ্লেস অবধি সুন্দর পার্শিয়ান কার্পেটের প্রায় অর্ধেকটায় কমলা রঙের ছাতা গজিয়ে উঠেছে।

ফায়ারপ্লেসটা দেখে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। জ্বালানি কিছু পেলে আগুন

জ্বালিয়ে গরম চা করতে পারি আর ভিজে পোশাক শুকিয়ে নিতে পারি। বাইরে একটু খুঁজতেই শুকনো ডালপালা পাওয়া গেল। কিছু ডালপালা নিয়ে আবার বাড়িতে ঢুকে চটপট সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। কিন্তু কেন জানি না, ঘরটার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ থমকে গেলাম। পা দুটো যেন তাদের ইচ্ছায় আমাকে আর টেনে নিয়ে যেতে চাইল না—কিছু যেন আমাকে ঘরের বাইরে যাবার জন্যে প্ররোচিত করছে। ডালপালা আবার পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে কিছুটা অনিশ্চিতভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম। সেই পরিবেশের মধ্যে আমি অজানা বিপদের গন্ধ উপলব্ধি করতে লাগলাম। এ জায়গা ছেড়ে যাবার সময় সব যেমন ছিল তেমনই আছে তবু আমার বোধ হচ্ছে আমার স্বল্পকালের অনুপস্থিতিতে অশুভ কিছু এই ঘরে ঢুকেছিল, আবার বেরিয়ে গেছে!

আমি ভীতু অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোক নই অথচ কিছুক্ষণ পরে আমি অতি বিনয়ী হয়ে ডালপালা তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে ফিরে গেলাম। আসলে কিন্তু কোন ভয় পেয়ে আমি একাজ করিনি। আমার মনে হল সদর দরজার কাছাকাছি থাকলে এবং নিচে কোন ঘরে আগুন জ্বালালে হয়ত আমি বেশি স্বস্তি পাব। যদিও এটা একটা ডাহা মূর্খের কল্পনা তা আমি জানি, কিন্তু—আচ্ছা, যদি কিছু—অদ্ভুতই ঘটল। ঐ পথ দিয়ে হঠাৎ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম।

সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে পা দিয়ে যেই খোলা সদর দরজার আলোর দিকে তাকিয়েছি হঠাৎ একটা জিনিস নজরে পড়তেই চমকে উঠলাম। মনে হল কেউ যেন এইমাত্র ধুলোর উপর দিয়ে থলে কিংবা ঐ ধরনের কিছু সিঁড়ির মাঝখান দিয়ে ওপরে টেনে তুলেছে।

আরো লক্ষ্য করলাম, সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে সেই ঘষড়ানো দাগটা হলঘর পেরিয়ে উল্টোদিকে দেওয়ালের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে দেওয়ালে আটকান আলনায় ঝুলছে একটা পুরনো, পোকায় কাটা কোট। দেখলাম অনেকগুলো দাগ ঘরের বিভিন্ন দিকে গেছে—কোনটা দু'দিকে দরজার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে, কোন কোনটা সিঁড়ির পাশ দিয়ে বাড়ির পেছন দিকে গেছে—কিন্তু সবগুলো একটা জায়গা থেকেই উদ্ভূত—কোট ঝোলানো আলনা থেকে। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, আমার পায়ের দাগ ছাড়া আর কোন পায়ের চিহ্ন নেই।

অস্থিরতা আবার আমাকে ঘিরে ধরল। মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ বাস করে না অথচ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কেউ বা কিছু সম্প্রতি এখানে ছিল। কে অথবা কি অশান্ত, অনুসন্ধানী প্রাণী যে ঐ কোট থেকে অদ্ভুত দাগগুলো করেছে? কোন বোকা ভবঘুরে—হয়ত মেয়ে—যার পেছনে ঝুলে পড়া চাদরের ঘষড়ানিতে তার নিজের পায়ের দাগ মুছে গেছে?

সেই পুরনো কোটটার কাছে গিয়ে ভাল করে দেখলাম। এটা একটা পুরনো ধাঁচের মিলিটারী ওভারকোট, তখনও দু'-একটা ময়লাধরা রুপোর বোতাম লাগান রয়েছে। বহুদিন ব্যবহারের স্বাক্ষর বহন করছে। যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে আস্তে আস্তে আলনাটাকে

ঘোরালাম। দেখলাম বাঁ কাঁধের ঠিক নিচে পেনীর মতো গোলাকার একটা গর্ত—তার চারধারের কাপড় পোড়া ও বিবর্ণ, মনে হয় যেন খুব কাছ থেকে পিস্তলের গুলি লেগে এমন হয়েছে। যদি পিস্তলের গুলিতে এই গর্ত হয় তবে নিশ্চয়ই কোন মৃতের গায়ে এই কোট ছিল।

একটা বিরক্তিতে মনটা ভরে উঠল কিন্তু বেশিক্ষণ স্থান দিলাম না। এটা একটা কল্পনাও হতে পারে না। তবে মনে হল বিশ্রী কাপড়ের গন্ধ ছাড়াও যেন একটা পচা মাংস ও হাড়ের গন্ধও বেরোচ্ছে...।

কোন জন্তুর পচা গন্ধ—মৃদু অথচ সন্দেহাতীত—বাতাসে তা আমি ঘ্রাণ করতে পারছি। সেই সঙ্গে কিছু অবর্ণনীয় কিন্তু সত্য—ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত অতীতের কোন কলঙ্কিত ও লজ্জাজনক পাপকার্যে সমস্ত পরিবেশটা ঘিরে রয়েছে।

নিজেকে শক্ত করে তুললাম। কি এমন আছে যা ভয় করতে হবে? কোন মনুষ্য লুণ্ঠনকারীদের ভয় পাই না কারণ সব সময় আমার কাছে পিস্তল থাকে। আর ভূত? যদি সত্যিই কোন অস্তিত্ব থাকে তবে দিনের বেলায় তারা ঘুরে বেড়ায় না। গা ছমছমে জায়গা এটা ঠিক, আমি তো আর এখানে রাত কাটাচ্ছি না। আমার অতি প্রয়োজনীয় গরম চা ও সাইকেল মেরামত না করে বৃথা অলীক কল্পনায় ভীত হয়ে আবার আমি বৃষ্টির তাণ্ডবের মধ্যে বাইরে বেরোচ্ছি না।

সুতরাং আমার কাছেই যে দরজাটা ছিল সেটা খুলে একটা ছোট ঘরে ঢুকলাম। একসময় এটা পড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হত বলে মনে হল। দরজার উল্টোদিকে ফায়ারপ্লেস—ঝাঁঝরিতে তখনও শেষ কাঠের ছাই পড়ে রয়েছে। খোঁচানি দিয়ে ছাই পরিষ্কার করে শুকনো ডাল সাজিয়ে নিলাম। কিন্তু কাঠগুলো এমন স্যাঁতসেঁতে ছিল যে আমার অর্ধেক দেশলাই শেষ হয়ে গেল তবু আগুন ধরল না, শুধু ধোঁয়া বেরোতে লাগল। চিমনি দিয়ে এক দমকা বাতাস এসে ঘরের মধ্যে ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে গেল। মেঝেয় হাঁটু ও হাত রেখে কাঠগুলোর কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মরিয়া হয়ে ফুঁ দিয়ে আগুন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এই বিরক্তিকর কাজের মধ্যে হঠাৎ হলঘর থেকে একটা আওয়াজ শুনে চমকে উঠলাম—মনে হল কে যেন মেঝেয় ধপ করে জামা ফেলল।

পলকের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে কিছু শোনবার চেষ্টা করলাম। কোন সাড়াশব্দ নেই, অটোমেটিক পিস্তলটা হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগোতে লাগলাম। হলঘরে কোথাও কিছু নেই, কিছু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, কেবল বাইরে বৃষ্টির শব্দ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই পুরনো কোটটার ঠিক নিচে মেঝের ধুলো উড়ছে।

দূর! একটা ইঁদুর! স্বগতোক্তি করে নিজের কাজে ফিরে গেলাম।

পোড়া কাঠে আরো জোরে ফুঁ দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে, আরো দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করতে লাগলাম—এর মধ্যেও আবার সেই অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলাম—খুব জোরে নয়, অথচ পরিষ্কার ও নির্ভুল।

আর একবার হলঘরে গেলাম। ঠিক একই জায়গায় একইভাবে ধুলো উড়তে দেখলাম। চোখে পড়ার মতো আর কিছু নেই। কিন্তু সেই ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের আসন্ন বিপদের ইঙ্গিত আরো বেশি করে অনুভূত হল। এবার আমি বুঝতে পারলাম—এই পুরনো, খালি বাড়িতে আমি একা নই—কোন অপবিত্র, অদৃশ্য কিছুর গুপ্তভাবে চলাফেরা স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারলাম।

এসব চিন্তার আমার আর দরকার নেই। আমি বোকা ভীতু হতে পারি কিন্তু এসব সহ্য করতে পারছি না। আমার জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাই তারপর যা ঘটে ঘটুক। এই বলে নিজেকে শক্ত করে তুললাম।

ঘরের মধ্যে ফিরে গিয়ে তাড়াহুড়ো করে হ্যাভারস্যাকের ভেতরে জিনিসপত্র পুরতে পুরতে এক একবার ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে তাকাতে লাগলাম। থলির মুখ বন্ধ করে দড়ির শেষ পাক দিয়েছি এমন সময় হলঘর থেকে খুব আস্তে চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেলাম, তারপরই মৃদু পায়ের শব্দ। ক্ষিপ্রগতিতে পিস্তলটা বার করে দরজার দিকে ফিরে ঘরের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম একটা ছায়ার মতো কি যেন চলে গেল। তারপরেই দরজায় একটু ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ, আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেল—ভেতরে ঢুকলো সেই কোট।

দরজার গোড়ায় সেটা সোজা হয়ে দাঁড়াল, তাবপর একটু এদিক-ওদিক দুলতে লাগল, অদৃশ্য লোক যেন কলারটা তুলে রেখেছে—এটা সেই কোট যেটা হলঘরে ঝুলতে দেখেছি।

অনন্ত শূন্যের মধ্যে পাথরের মূর্তির মতো আমি দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি আমার দোরগোড়ায় বস্তুটিব প্রতি নিবদ্ধ। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে রইলাম, সম্মোহিতের মতো সমস্ত দেহ অবশ হয়ে গেল, অসাড় আঙুল থেকে পিস্তলটা মাটিতে পড়ে গেল। তবু আমার মাথা ঠিক রইল। আমি জানতাম চরম অমঙ্গলের সান্নিধ্যে রয়েছি—দোরগোড়ায় নরকপ্রসূত বস্তুটির যে অলৌকিক আভা বিচ্ছুরিত তা সংক্রামক—এর সামান্য স্পর্শ শুধুমাত্র যে আমার দেহের ধ্বংস তা নয়, আমার আত্মার অনন্ত নরকভোগ!

এখন সেটা ঘরের মধ্যে ঢুকছে—এক অবর্ণনীয় চলার গতি—অদ্ভুতভাবে খালি হাত দুটো দুলছে, কোটের প্রান্ত মেঝেয় একবার করে পড়ছে, ঘষডানির দাগ হচ্ছে আর সেই সঙ্গে ধুলো উড়ছে, ধীরে ধীরে আমার দিকে এগোচ্ছে। আমার বিস্ফারিত চোখ দুটো বস্তুটার উপর স্থিরভাবে নিবদ্ধ রেখে পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগলাম। আড়ষ্ট, অচেতন যন্ত্রের মতো চলতে চলতে একেবারে অগ্নিকুণ্ডের দেওয়ালে পিঠ স্পর্শ করল, তার পিছনে যাবার জায়গা নেই। মারাত্মক অশুভ উদ্দেশ্যে তখনও সেটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। শূন্য হাত দুটো কাঁপতে কাঁপতে উপরে উঠে আমার গলা ছোঁবার চেষ্টা করছে। মনে হল পরমুহূর্তে সেগুলো আমাকে ধরে ফেলল। ভীতি ও আতঙ্কে বুঝতে পারলাম আমার সমস্ত বিচারবুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। সেই মুহূর্তে

একটা চিন্তা আমার মাথায় এল—অনেকদিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলাম কি শুনেছিলাম—পবিত্র চিহ্নের—ক্ষমতা—অশুভশক্তির—বিরুদ্ধে—। প্রচণ্ড প্রয়াসে ইচ্ছাশক্তিকে জাগরিত করে অসাড় আঙুল তুলে ক্রস চিহ্ন তৈরি করলাম...এবং সেই মুহূর্তে পেছনে আমার অন্য হাতটা কিছু পাবার জন্যে উত্তেজিত হয়ে হাতড়াচ্ছে, একটা ঠাণ্ডা শক্ত, গোল কিছুর সংস্পর্শে এল। সেটা পুরনো, ভারী উনুন খোঁচানোর হাতল।

সেই ঠাণ্ডা লোহার স্পর্শ আমার সমস্ত বোধশক্তিকে জাগিয়ে দিল। বিদ্যুতের গতিতে সেই ভারী খোঁচানিটা তুলে নিয়ে আমার সামনে অদ্ভুতজনক বস্তুটিকে আঘাত করলাম। দেখ! মুহূর্তে বস্তুটি পড়ে গেল এবং কোট ছাড়া আর কিছুই নয়, আমার পায়ের কাছে জড়ো হয়ে রয়েছে। অথচ, আমি দিব্যি করে বলছি, একলাফে সেটা পার হয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। আড়চোখে ফিরে দেখলাম, বস্তুটি আমার পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে তাড়া করেছে।

সেই অভিশপ্ত বাড়ির বাইরে এসে যে দৌড় লাগালাম, জীবনে সেরকম কখনও দৌড়ইনি। একটা সরাইখানার দরজায় অর্ধচৈতন্যহীন অবস্থায় পড়ে যাবার আগে পর্যন্ত আমার আর কিছুই মনে নেই। টলতে টলতে ভেতরে ঢুকে বলি, ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে মদ দিন। আমি যখন মুখে মদ ঢালছি তখন একটা ছোট জনতা বিস্ময়ে আমাকে দেখছে।

আমি ভাঙা ফরাসী ভাষায় আমার কাহিনী বলতে চেষ্টা করলাম। বিহ্বল দৃষ্টিতে তারা আমার দিকে তাকিয়ে আছে; অবশেষে সরাইখানার মালিকের মুখে সহানুভূতির ভাব ফুটে উঠল।

এও কি সম্ভব, মশাই ওই বাড়িতে ছিলেন! জুলিয়েট তাড়াতাড়ি। মশাইয়ের আর এক বোতল মদ লাগবে!

পরে ঐ মালিকের কাছ থেকে আমি একটা গল্প শুনি, যদিও সে বলার জন্য খুব আগ্রহী ছিল। নেপোলিয়নের সৈন্যদলের একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার ঐ পরিত্যক্ত বাড়িতে থাকত।—আফ্রিকান বংশজ ঐ লোকটি আধা পাগল ছিল। গল্প শুনে মনে হয় লোকটি অতি বদ ছিল। নিশ্চয়ই মশাই খুব খারাপ লোক—ঐ লোকটি। সে তার স্ত্রীকে মেরে ফেলে, সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর উপর, এমনকি, লোকে বলে, তার নিজের মেয়েদের উপর নিদারুণ অত্যাচার করত। পুরনো জমিদার বাড়িটার খুব খারাপ নাম আছে। আপনি যদি এক মিলিয়ন ফ্রাঁ ও দেন তবু এদেশের কোন লোকই ঐ বাড়িটার কাছে যাবে না।

গোড়ায় যা বলেছি, আমি জানি অফিসের লোকেরা আমায় একটা মানুষ মনে করে, তাই তাদের কাছে আমি এ গল্প করিনি। তবু এটা ডাহা সত্যি। আমার নতুন সাইকেল ও জিনিসপত্র ঐ ভূত-প্রেত অধ্যুষিত জমিদার বাড়িব হলঘবে হয়ত এখনও পড়ে আছে। কেউ যদি ওগুলো সংগ্রহ করতে সাহসী হয় তবে রেখে দিতে পারে।

অনুবাদ: রবীন্দ্রনাথ বসু

প্রতিজ্ঞা-পালন

Keeping His Promise—এলগারনন ব্ল্যাকউড

তখন রাত এগারটা। এডিনবরা শহরের রাস্তাগুলো এ সময়ে বেশ নির্জন থাকে। পথে বিশেষ লোক চলাচল করে না। এমন এক শান্ত ও নিস্তব্ধ রাস্তায় এক হোস্টেল বাড়ির চারতলায় থাকে ম্যারিয়ট। সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেখানে তার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় না বললেই চলে। এই হোস্টেলে তার মতো কিছু ছাত্র এবং সাধারণ খেটে খাওয়া লোকও থাকে।

দরজায় খিল দিয়ে একমনে সে পড়া মুখস্থ করে চলেছে। বেশ কয়েকবার পরীক্ষায় ফেল করায় তার বাবা-মা বলেছেন এটাই তার শেষ সুযোগ। তাদের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। আর তাঁরা টাকা-পয়সা খরচ করতে পারবেন না। সেইজন্যে সে এবার আদা-জল খেয়ে লেগেছে—তাকে পাশ করতে হবে নয় মরতে হবে।

তার কিছু বন্ধু ও পরিচিত লোক ছিল। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল রাতে তার পড়ার কোন ব্যাঘাত ঘটাবে না। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে সে ভীষণ পড়ছে। যে সময় এবং টাকা নষ্ট হয়েছে সেটা সে উসুল করতে চায় যদিও এ দুটোর গুরুত্ব সে কোনটাই বোঝে না।

এত রাতে হঠাৎ দরজায় বেল বাজার আওয়াজ শুনে সে একটু বিস্মিত হল। ভাবল কোন লোক এসেছে। কখনও কখনও কোন বাসিন্দা বেলটা চাপা দিয়ে নিঃশব্দে নিজের কাজে চলে যায়। কিন্তু ম্যারিয়ট সে ধরনের ছিল না। লোকটি কে এবং কি চায় সে যদি না জানতে পারে তাহলে সারারাত মনটা তার খুঁতখুঁত করবে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার আসার উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে তাকে বিদায় করতে হবে।

বাড়িওয়ালিও রোজ ঠিক রাত দশটার সময় খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে যায়। এরপর দরজায় কোন বেল বাজলে সে না শোনার ভান করে। অগত্যা ম্যারিয়ট দরজা খুলে দেবার জন্যে পড়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি। প্রত্যেক তলায় একটা করে গ্যাসের আলো জ্বলছে। তার মৃদু আলো জায়গাটাকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবার বেল বাজল। মনে রাগ ও বিরক্তি নিয়ে নিচে এসে দরজা খুলে বলল, সবাই জানে আমি এখন পরীক্ষার পড়া তৈরি করছি। এই অসময়ে এসে কেন তারা আমাকে বিরক্ত করে?

হাতে বই নিয়ে দরজা খুলে ম্যারিয়ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভাবছে যেকোন মুহূর্তে আগন্তুকের আবির্ভাব হবে। জুতোর শব্দটা এত কাছে এবং এত জোরে যে মনে হচ্ছে পা দুটো যেন আগে আগে আসছে। যেই হোক না কেন এই অসময়ে তার কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর উপযুক্ত আপ্যায়নের জন্যে সে তৈরি হয়ে আছে কিন্তু লোকটির দেখা নেই! পায়ের শব্দটা তার নাকের ডগায় অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না!

হঠাৎ ভয়ে তার শরীর শিরশিরিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়টা আবার কেটেও গেল। ভাবল, চিৎকার করে অদৃশ্য আগন্তুককে ডাকবে না দরজা বন্ধ করে তার পড়ায় ফিরে যাবে। সেই সময়ে একটা খসখস শব্দ হল, আগন্তুককে দেখা গেল।

লোকটি বয়সে তরুণ, বেঁটেখাটো মোটা চেহারা। মুখটা খড়ির মতো সাদা, উজ্জ্বল চোখ দুটোর তলায় কালো দাগ। যদিও তার একমুখ দাড়ি এবং চুলগুলো আলুথালু তবু তার পোশাকের পারিপাট্য দেখে ভদ্রলোক বলে মনে হয়। সবথেকে আশ্চর্যের ব্যাপার তার মাথায় কোন টুপি নেই এমনকি হাতেও নেই। সন্ধ্যে থেকে সমানে বৃষ্টি হয়ে চলেছে, তার গায়ে ওভারকোটও নেই, হাতে ছাতাও নেই।

তাকে দেখে ম্যারিয়টের মনে নানা প্রশ্ন উঁকি মারতে লাগল। তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, কে আপনি? কি প্রয়োজনেই বা আপনার আগমন? কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরোবার আগেই লোকটি মাথাটা একটু ঘোরালো। গ্যাসের আলো তার মুখে পড়তেই ম্যারিয়ট মুহূর্তে তাকে চিনতে পারল।

ফিল্ড! তুমি বেঁচে আছ? ভয়ে ম্যারিয়টের শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হল।

ম্যারিয়ট এই ফিল্ডের সঙ্গে একই স্কুলে পড়েছিল। সে যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল অবশেষে সেই দুঃখময় পরিণতি ঘটেছে। তার বাবা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে পরে একবারই মাত্র দেখা হয়েছিল। তার বাড়ির কাছেই ফিল্ড থাকত তাই তার বোনেদের মারফত সব খবরই ম্যারিয়ট পেত। ফিল্ড অসংযত জীবন যাপন করত—মদ্যপান, আফিম ইত্যাদির নেশায় সে একেবারে গোল্লায় গিয়েছিল।

ভেতরে এস। ম্যারিয়টের সব রাগ দূর হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। ভেতরে এস। আমাকে সব বল, হয়ত আমি কোন সাহায্য—। আর কি বলবে সে ভেবে পেল না, তোতলাতে লাগল। জীবনের যে অন্ধকার দিক আছে, তার যে ভয়াবহতা আছে, সেটা এমন এক জগৎ যা ম্যারিয়টের জানা ক্ষুদ্র বইয়ের গণ্ডি ও স্বপ্নের অনেক দূরে। কিন্তু তার হৃদয় আছে।

সদর দরজা বন্ধ করে তাকে নিয়ে ম্যারিয়ট হলের দিকে এগোতে লাগল। সে লক্ষ্য করল ফিল্ড অনেকটা সংযমী কিন্তু সে যে পরিশ্রান্ত, তার টলায়মান পা দুটো তার স্বাক্ষর দিচ্ছে। ম্যারিয়ট হয়ত পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না কিন্তু তার মুখে তীব্র ক্ষুধার জ্বালা সে অনুভব করতে পারছে।

উৎফুল্ল হয়ে এবং সমবেদনার সুরে ম্যারিয়ট বলল, আমার সঙ্গে এস। তোমাকে

দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। এইমাত্র আমি কিছু খেতে যাচ্ছিলাম, তুমি ঠিক সময়ে এসেছ।

অন্যজনের কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। সে এতই দুর্বলভাবে হাঁটছে যে ম্যারিয়ট তার হাতটা ধরে নিয়ে চলল। এই প্রথম সে লক্ষ্য করল জামাকাপড় তার গায়ে খুব ঢিলেঢালা। তার বিরাট চেহারাটা কঙ্কালসার। তাকে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যারিয়টের মূর্চ্ছা প্রবণতা ও ভীতির উত্তেজনা উদ্রেক করল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই সে নিজেকে সান্ত্বনা দিল, তার বন্ধু ফিল্ডের দুঃখজনক অবস্থা তাকে আঘাত করেছিল বলেই তার মনের এমন অবস্থা ঘটেছিল।

তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়াই ভাল। খুব অন্ধকার—এই হলঘরটা। আমি বারবার নালিশ করি। কিন্তু বুড়িটা কথা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করে না। তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসাল। ম্যারিয়ট আশ্চর্য হচ্ছে এই ভেবে যে কোথা থেকে ফিল্ড আসছে আর কি করেই বা সে তার ঠিকানা জানল। অন্তত সাত বছর আগে তারা সেই স্কুলে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের মধ্যে দিয়ে দিন কাটিয়েছিল।

এক মিনিটের জন্যে আমাকে মাফ কর, আমি খাবার ঠিক করি। সেইসঙ্গে তুমি কথা বলতে বিরক্ত হয়ো না। সোফায় বিশ্রাম নাও, তুমি বড্ড ক্লান্ত। পরে আমাকে সব বলো, আমরা দু'জন পরিকল্পনা করব।

ফিল্ড সোফার ধারে বসে কোন কথা না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ম্যারিয়ট আলমারি থেকে বাদামী রঙের পাঁউরুটি, কেক এবং একটা বড় পাত্রে কমলালেবুর আচার বার করে আনল। এডিনবরার ছাত্রেরা সবসময় এগুলো মজুত রাখে। আলমারির দরজার কাছ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তার চোখ দুটো ভীষণ চকচক করছে। ম্যারিয়ট ভাবল এটা কোন ওষুধের জের। ওর অবস্থা খুবই খারাপ অতএব তার কাছ থেকে শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল। তাছাড়া কথা বলার পক্ষে সে এখন বড়ই ক্লান্ত। সুতরাং ভদ্রতার দিক দিয়ে—এবং আরো একটা দিকে—সেটা যে ঠিক কি তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারল না—তাকে বিশ্রাম দেওয়াই উচিত। কোকো তৈরি করবার জন্যে সে স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বালাল। জল যখন ফুটছে তখন খাবার টেবিলটা সোফার কাছে টেনে নিয়ে এল যাতে ফিল্ডের চেয়ারে উঠে গিয়ে বসতে কষ্ট না হয়।

এস, এখন ভুরি-ভোজন করা যাক, তারপর পাইপ টানতে টানতে গল্প করা যাবে। পরীক্ষার জন্যে আমি তৈরি হচ্ছি, বুঝলে। এই সময় আমি কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকি। একজন বন্ধুকে কাছে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে।

চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল তার অতিথি তারই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। ম্যারিয়টের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা শিহরন খেলে গেল। বসে থাকা লোকটির মুখ মৃতের মতো সাদা এবং ব্যথা ও মানসিক কষ্টের এক ভীতিভাব তার মুখে ফুটে উঠছে।

হা ভগবান! ম্যারিয়ট লাফিয়ে উঠল। আমি একেবারে ভুলে গেছি! কোথায় যেন মদ রেখেছি! আমি কি গাধা! এমন কাজের মধ্যেও আমি ছুঁইনি।

আলমারি থেকে মদের বোতল ও গেলাস বার করে আনল। গেলাসে মদ ঢেলে ফিল্ডকে দিল। সে জল না মিশিয়ে সেটা এক ঢোকে শেষ করে ফেলল। ম্যারিয়ট দেখল তার কোটটা ধুলোয ভর্তি, কাঁধে মাকড়সার জাল আটকে রয়েছে। একেবারে শুকনো খটখটে। বৃষ্টিঝরা রাতে ফিল্ড এসেছে—টুপি, ছাতা, ওভারকোট কিছুই নেই—অথচ শুকনো, এমনকি ধুলোভর্তি! তাহলে সে ঢাকা অবস্থায় ছিল। এসবের কি মানে? সে কি এই বাড়িতেই লুকিয়েছিল?

এটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার! তবু সে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। সে ঠিক করেছে তার খাওয়া ও ঘুম না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবে না। খাদ্য এবং ঘুম—এ দুটোই এখন এর প্রয়োজন। ঠিক লক্ষণ ধরতে পেরে সে সন্তুষ্ট। সে একটু সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত কোন চাপ দেওয়া ভাল হবে না।

তারা দু'জনে খেতে লাগল। ম্যারিয়ট একাই কথা বলে যাচ্ছে। তার নিজের সম্বন্ধে, তার পরীক্ষার ব্যাপারে, বুড়ি বাড়িওয়ালির কথা। একনাগাড়ে বলে চলেছে যাতে তার অতিথিকে কিছু বলতে না হয়। ম্যারিয়টের খাবার কোন ইচ্ছে নেই, হাতে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। অথচ লোকটি গোগ্রাসে গিলছে। এক ক্ষুধার্ত লোকের এইভাবে ঠাণ্ডা, বাসি খাবার খাওযার আগ্রহ দেখে অনভিজ্ঞ ছাত্র ম্যারিযটের সামনে না খেতে পাওয়ার এক বিস্ময়কর রহস্য উধ্ঘাটিত হল। আশ্চর্য হযে দেখছে আর ভাবছে লোকটার গলায খাবার আটকে যাচ্ছে না তো!

কিন্তু ফিল্ড যেমন ক্ষুধার্ত তেমনি নিদ্রালু। মাঝে মাঝে তার মাথা সামনের দিকে ঝুলে পড়ছে, মুখেব খাবার চিবোন বন্ধ হযে যাচ্ছে। ম্যারিযট বারবার তাকে ঝাঁকানি দিয়ে জাগিয়ে তুলছে। একটা জোবালো আবেগ দুর্বলতাকে বশে আনতে পারে কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা মেটানো এবং নিদ্রা দূর করার এই যে সংগ্রাম এটা তাব কাছে অদ্ভুত লাগল। বিস্ময়মিশ্রিত ভযে সে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিযে রযেছে। সে শুনেছে ক্ষুধার্তকে সামনে বসিযে খাওয়ানোর মধ্যে আনন্দ আছে কিন্তু তার নিজের সে অভিজ্ঞতা কখনও হযনি। ফিল্ড পশুর মতো গরগব করে খাবার মুখে পুরে সরু গলনালি দিযে গিলে ফেলল। ম্যারিযট পড়াব কথা ভুলে গেল। তার নিজেবই গলায় যেন কিছু আটকে আছে বোধ হল।

তার শেষ কেকটা গলাধঃকরণ করার পর হঠাৎ বোকার মতো ম্যারিযট বলল, তোমাকে দেবার মতো আমাব আর কিছু নেই।

তখনও ফিল্ড কোন কথা বলল না। তার নিজের জাযগায প্রায় ঘুমিযে পড়ার মতো অবস্থা। ক্লান্ত ও কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সে একবার চোখ তুলে দেখল।

এখন একটু ঘুমের দরকার নচেৎ তোমার শরীর একেবারে ভেঙে পড়বে। আমাকে সারারাত জেগে পরীক্ষার পড়া করতে হবে। আমার বিছানায় তুমি স্বচ্ছন্দে ঘুমোতে পার। কাল একটু বেলাতে ব্রেকফাস্ট সারব, আব-- আর দেখি কি করা যায়—পরিকল্পনা করব—তুমি জান আমি এ ব্যাপারে ওস্তাদ। ঘরের পরিবেশ হাল্কা করার জন্যে ম্যারিয়ট কথাগুলি বলল।

ফিল্ড মৃত্যুর নীরবতা পালন করে চলেছে। তার মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ভেবে ম্যারিয়ট তাকে তার ছোট শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ফিল্ড জমিদারের ছেলে, তাদের বাড়ি প্রাসাদতুল্য। তার কাছে এই ছোট সামান্য ঘরটা নেহাতই পুতুল-ঘর।

ক্লান্ত অতিথি কোন ধন্যবাদ বা ভদ্রতার ভান না করে তার বন্ধুর হাতে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে ঘরে গেল। গায়ের পোশাক সুদ্ধ তাকে বিছানার উপর শুইয়ে দিল।

দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ম্যারিয়ট তাকে দেখল। তারপর তাকে যেন এমন দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্যে পড়তে না হয় তার জন্যে ভগবানের কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানাল। পরমুহূর্তে তার চিন্তা হল এই অনাহুত অতিথিকে নিয়ে কাল সে কি করবে। কিন্তু বেশিক্ষণ এ ভাবনা তাকে উতলা করে তুলতে পারল না কারণ তার পরীক্ষার ব্যাপারটা তার মন কেড়ে নিল।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে বই নিয়ে বসল। মেটিরিয়া মেডিকার যেখান থেকে নোট করতে করতে বেল শুনে উঠে গেছল সেখানে আবার মনোনিবেশ করল। কিন্তু বেশ খানিকক্ষণ সে মনোযোগ দিতে পারল না। তার চিন্তা কেবল সেই মূর্তিটায় ঘুরপাক খাচ্ছে—সাদা-ফ্যাকাসে মুখ, অদ্ভুত জ্বলন্ত চোখ, ক্ষুধার্ত ও মলিন বেশ, পোশাক ও জুতো পরে বিছানায় শুয়ে রয়েছে।

তার মনে পড়ল সেই ফেলে আসা স্কুল জীবনের কথা। তাদের দু'জনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হবার আগে তারা চিরন্তন বন্ধুত্বের শপথ নিয়েছিল। আরো কত কি! আর এখন! কি ভয়াবহ দুর্দশা! কেমন করে তার উপর একজন মানুষের ভালবাসা জন্মাতে পারে?

কিন্তু তাদের দু'জনের একটা শপথ ম্যারিয়ট একেবারে ভুলে গেছে। ঠিক এই মুহূর্তে সেই স্মৃতি তার মনের অনেক দূরে।

ম্যারিয়ট আধখোলা দরজা দিয়ে শোবার ঘর থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষের গভীর নিদ্রা তাকেও প্রায় বিছানায় আকর্ষণ করছিল।

ম্যারিয়ট ভাবল, এটা তার দরকার, আর ঠিক সময়েই হয়ত এই ঘুম তার এসেছে।

তখন বাইরে সোঁ সোঁ শব্দে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে; জানালার সার্সিতে ও রাস্তায় অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। ম্যারিয়ট আবার পড়ায় মনোনিবেশ করল কিন্তু বইয়ের মধ্যে সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে পাশের ঘরের লোকটির ভারী ও গভীর নিঃশ্বাস।

ঘণ্টা দুয়েক পর একটা হাই তুলে সে বই বদল করল। তখনও তার নিঃশ্বাস কানে আসছে। সন্তর্পণে দরজার কাছে গিয়ে সে একবার ঘরের চারদিক দেখল।

প্রথমে, হয় ঘরের অন্ধকারে সে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না নয়ত আলোয় এতক্ষণ বসে থেকে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেছল। কিছুই সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না—আসবাবপত্রগুলো কালো ঢেলার মতো, দেওয়ালে ড্রয়ারের আলমারিটা একটা কালো বস্তু, ঘরের মাঝখানে সাদা বাথটবটা যেন একটা সাদা প্রলেপ।

তারপর ধীরে ধীরে তার বিছানাটা দৃষ্টিপথে এল। সে দেখল তার উপর একটা

ঘুমন্ত দেহের রেখা ক্রমে ক্রমে আকার নিল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুতভাবে সে বাড়তে লাগল। একটা পরিষ্কার আকৃতি পরিগ্রহণ করল—সাদা সুজনির উপর একটা লম্বা কালো মূর্তি!

সে না হেসে পারল না। ফিল্ড একটুও নড়েনি। কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখে ম্যারিয়ট আবার তার বইয়ের কাছে ফিরে এল।

একঘেয়ে বৃষ্টি আর বাতাস বয়ে চলেছে। গাড়ির কোন শব্দ নেই, পাথরের উপর দিয়ে দু'চাকার গাড়ি চলার ঠনঠন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, দুধের গাড়ি চলারও সময় এখন নয়। ম্যারিয়ট স্থিরভাবে ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে পড়া করতে লাগল। মাঝে মাঝে ঘুম তাড়াবার জন্যে একটা কাপে চুমুক দিচ্ছে। তারই ফাঁকে ফিল্ডের গভীর নিঃশ্বাস তার কানে আসছে।

বাইরে বেগে ঝড় বইছে কিন্তু বাড়ির মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। টেবিলল্যাম্পের আলো সমস্ত টেবিলে ছড়িয়ে পড়েছে অথচ ঘরের সবটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। শোবার ঘরটা সে যেখানে বসে আছে ঠিক তার উল্টো দিকে, তার কাজে ব্যাঘাত ঘটাবার মতো কিছুই নেই, তবে মাঝে মাঝে ঝড়ের ঝাপটা জানালার ওপর পড়ছে আর তার হাতে সামান্য একটু ব্যথা অনুভব করছে।

এই ব্যথাটা যে কি করে হল সে বুঝতে পারছে না, কখনও টনটন করে উঠছে। এটা তাকে বিরক্ত করে তুলছে। সে মনে করবার চেষ্টা করছে কেমন করে, কখন এবং কোথায় তার হাতে ধাক্কা লেগেছিল, কিন্তু কিছুই ভেবে পাচ্ছে না।

অবশেষে তার চোখের সামনে বইয়ের পাতার রঙ হলদে থেকে ধূসর বর্ণে বদলে গেল এবং নিচে রাস্তায় চাকার শব্দ কানে এল। তখন ভোর চারটে। ম্যারিয়ট চেয়ারে হেলান দিয়ে বিরাট হাঁ করে হাই তুলল। জানালার পর্দাগুলো সে সরিয়ে দিল। তখন ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। বাইরের সবকিছুই কুয়াশায় ঢাকা। আর একবার হাই তুলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। ব্রেকফাস্টের আগে সোফায় শুয়ে বাকি চার ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেবার জন্যে প্রস্তুত হল। কিন্তু তখনও পাশের ঘরে গভীর নিশ্বাস ফেলছে। পায়ে ভর দিয়ে নিঃশব্দে আর একবার তাকে দেখে নিল।

সন্তর্পণে আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ভোরের মৃদু আলোয় বিছানাটা পরিষ্কার দেখতে পেল। একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে। একবার চোখটা রগড়ে নিয়ে দেখল। আবার সে চোখ রগড়াল—তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। অবাক বিস্ময়ে তার মুখটা হাঁ হয়ে গেল। বিছানা শূন্য, ঘর শূন্য।

ফিল্ডের প্রথম আবির্ভাবে যে ভয় ম্যারিয়টের মনে জেগে উঠেছিল সেই ভয় হঠাৎ যেন সে আবার অনুভব করতে লাগল। এবার যেন আরো বেশি। সেই সঙ্গে সে সচেতন হয়ে উঠল, তার বাঁ হাতটা দপদপ করছে, আরো বেশি ব্যথা বোধ করছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর চিন্তা করার চেষ্টা করছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে।

সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মনে বল এনে সাহসের সঙ্গে সে বিছানার দিকে এগিয়ে

গেল। দেখল, বিছানার উপর যেখানে ফিল্ড শুয়ে ঘুমিয়েছিল সেখানে দেহের চাপ পড়ে একটা ছাপ রয়েছে। বালিশে মাথা রাখার দাগ, নিচের দিকে সুজনির উপর যেখানে বুটজুতো পরা পা রেখেছিল সেখানটা গর্ত হয়ে গেছে। আর সে বিছানার এত কাছে ছিল যে পরিষ্কারভাবে নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

সমস্ত শক্তি সংহত করে সে চিৎকার করে তাব বন্ধুর নাম ধরে ডাকতে লাগল—ফিল্ড! তুমি আছ! কোথায় তুমি!

কোন সাড়া নেই। বিছানা থেকে নিশ্বাসের শব্দ অব্যাহত রয়েছে! তার নিজের স্বর তার কানে অদ্ভুত লাগছে। আর সে ডাকল না। হাঁটু গেড়ে বসে বিছানার উপরে-নিচে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। শেষে সুজনি তুলে ফেলল, একটার পর একটা চাদর, তোষক তুলে দেখতে লাগল। যদিও দৃশ্যত ফিল্ডকে দেখা যাচ্ছে না তবু সে তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে। দেওয়ালের কাছ থেকে খাটটা টেনে নিয়ে এল তবু শব্দটা সেখানেই রয়ে গেল, বিছানার সঙ্গে সেটা স্থানান্তরিত হল না।

এই ক্লান্তিকর অবস্থায় ম্যারিয়ট খুব সহজে আত্মসংযমী হয়ে উঠতে পারছিল না। সে তন্ন তন্ন করে সমস্ত ঘর খুঁজে দেখল। কোথাও কারও চিহ্ন নেই। ঘরের উপর দিকে ছোট জানালাটা বন্ধ। অবশ্যি সেটা খোলা থাকলেও একটা বেড়াল যাবার মতোও চওড়া নয়। বসার ঘরের দরজাটা ভেতর দিক থেকে বন্ধ। সে পথ দিয়ে সে বেরিয়ে যেতে পারে না। অদ্ভুত সব চিন্তা ম্যারিয়টের মনকে অস্থির করে তুলল, সেই সঙ্গে অবাঞ্ছিত অনুভূতি তার মনে জেগে উঠল। সে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। আবার সে বিছানা উল্টেপাল্টে দেখল। দুটো ঘর খুঁজল—এটা যে নিষ্ফল তা সে গোড়া থেকেই জ'নত,—তবু আবার সে দেখল। তার সারা দেহে ঠাণ্ডা ঘাম ঝরছে। ঘরের কোণে ফিল্ড যেখানে শুয়েছিল সেখান থেকে নিঃশ্বাসের শব্দ আসা কিন্তু বন্ধ হল না।

তখন সে অন্য কিছু করার চেষ্টা করল। খাটটা যেখানে ছিল সেখানে সরিয়ে রেখে সেই বিছানার উপর সে শুয়ে পড়ল। শোবার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। নিঃশ্বাসটা একেবারে তার গালের উপর পড়ছে—দেওয়াল এবং তাব মাঝে! সেই ফাঁক দিয়ে একটা বাচ্চা গলে যাওয়ারও জায়গা নেই।

সে তার বসার ঘরে ফিরে গিয়ে সব জানালা খুলে দিল। ঘরে আলো-হাওয়া খেলতে লাগল। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ধীরে সুস্থে চিন্তা করার চেষ্টা করল। সে জানত যারা খুব বেশি পড়াশুনা করে অথচ কম ঘুমোয় তাদের মনে নানা অলীক অবাস্তব চিন্তা জেগে উঠে যন্ত্রণা দেয়। আবার সে শান্তচিত্তে রাতের সব ঘটনাগুলো ভাবতে লাগল—তার মনের অনুভূতি, প্রাণবন্ত ঘটনা, তার মনকে আলোড়িত করা ভাবাবেগ, ভয়ঙ্কর ভোজনপর্ব—এত সব একসঙ্গে মিলে, এত সময় ধরে কোন ভৌতিক কাণ্ড ঘটতে পারে না। বারবার তার মূর্চ্ছা প্রবণতা, একবার কি দু'বার

তার মনে অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার, তারপর তার হাতের ভীষণ যন্ত্রণা—এ সব কিছুই চিন্তা করে কোন কূল পেল না, কোন কারণও খুঁজে পেল না।

এসব খতিয়ে দেখে পরীক্ষা করতে করতে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হঠাৎ তার মনে উদয় হল। সারাক্ষণ ধরে ফিল্ড মুখ দিয়ে একটাও তো শব্দ বার করেনি! তার ভাবনা-চিন্তাকে ঠাট্টা করবার জন্যেও তখনও ভেতরের ঘর থেকে দীর্ঘ গভীর ও স্বাভাবিক নিশ্বাসের শব্দ আসছে! একটা অবিশ্বাস্য, অযৌক্তিক ব্যাপার!

ভুতুড়ে চিন্তার জালে জড়িয়ে পাগলের মতো মাথায় টুপি ও গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে পড়ল। সকালের বিশুদ্ধ বাতাস, অকূল সমুদ্রের দৃশ্য, ছোট ছোট গাছ-গাছালির বুনো গন্ধ তার মাথার সমস্ত জঁট ছাড়িয়ে দেবে। বেশ কিছুক্ষণ ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটির উপর ঘুরে বেড়িয়ে যখন বুঝতে পারল তার মন থেকে ভয় দূর হয়েছে, খিদেও চনচনে হয়েছে, তখন সে বাড়ি ফিরে এল।

ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল একজন লোক জানালায় ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিল কিন্তু পরে চিনতে পারল। সে হচ্ছে গ্রীন, তার বন্ধু—তার সঙ্গে পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

সারারাত খুব পড়েছ, ম্যারিয়ট। সে বলল। ভাবলাম তোমার সঙ্গে নোটগুলো মিলিয়ে নিই আর ব্রেকফাস্টটাও শেষ করি। তাই তোমার কাছে এলাম। তুমি এত সকালে বাইরে গেছলে?

ম্যারিয়ট জানাল তার মাথাটা ধরেছিল বলে সে একটু বেড়াতে বেরিয়েছিল।

ও! গ্রীনের কণ্ঠে বিস্ময় জেগে উঠল। এই সময় একজন পরিচারিকা ঘরে ঢুকে গরম পরিজ টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল। তারপর বেশ জোরের সঙ্গে গ্রীন বলল, ম্যারিয়ট, তোমার কোন মদ্যপানাসক্ত বন্ধু আছে বলে জানতাম না তো?

এটা স্পষ্টতই সাময়িক তাই নীরসভাবে জানাল সে নিজেও তা জানে না।

মনে হচ্ছে বিছানায় কেউ আরামে ঘুমিয়ে গেছে, না? মাথা নেড়ে শোবার ঘরটা দেখিয়ে কৌতূহলী হয়ে ম্যারিয়টের দিকে তাকিয়ে রইল।

দু'জনে কয়েক সেকেন্ড পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর সাগ্রহে ম্যারিয়ট বলল, তাহলে তুমিও শুনেছ? ভগবানকে ধন্যবাদ।

নিশ্চয়ই আমি শুনেছি। দরজা খোলা রয়েছে। আমি যদি তাই বোঝাতে চাই তার জন্যে দুঃখিত।

না, না, আমি কিছু মনে করিনি। ম্যারিয়ট নিচু স্বরে বলল। আমি একেবারে আতঙ্কমুক্ত। আমাকে ব্যাপারটা বলতে দাও। অবশ্যি যদি তুমি শুনে থাক তবে ঠিক আছে। কিন্তু আমি যা বলতে পারি তার থেকে বেশি আমাকে ভীত করে তুলেছিল। আমি ভেবেছিলাম আমার মাথার কোন গোলমাল হয়েছে। তুমি জান এই পরীক্ষার উপর আমার অনেক কিছু নির্ভর করছে। এটা সব সময় শুরু হয় কোন শব্দ, দৃশ্য অথবা অলৌকিক চিন্তার মধ্যে দিয়ে এবং আমি——।

বাজে যত সব! তার কথার মাঝে হঠাৎ গ্রীন বলল। তুমি কিসের কথা বলছ?

আমার কথা শোন গ্রীন, যতটা সম্ভব শান্তভাবে ম্যারিয়ট বলল। তখনও সেই নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি যা বলতে চাই তোমাকে বলব কিন্তু কোন বাধা দিও না। তারপর রাতে যা ঘটেছিল সব বলল, এমনকি হাতের ব্যথার কথাও বলতে ভুলল না। বলা শেষ হলে টেবিল থেকে উঠে সে ঘরের ওপাশে গেল। বলল, এখন তুমি পরিষ্কারভাবে নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছ, তাই না? গ্রীন সম্মতি জানাল। বেশ, এস আমার সঙ্গে, আমরা দু'জনে ঘরটা ভাল করে খুঁজে দেখব। অন্যজন কিন্তু তার চেয়ার থেকে নড়ল না।

আমি আগেই ওখানে গেছি, নিষ্ক্রিয়ভাবে উত্তর দিল গ্রীন। আমি শব্দ শুনে ভেবেছিলাম যে তুমি। দরজা হাট করে খোলা ছিল তাই ভেতরে ঢুকেছিলাম।

ম্যারিয়ট কোন মন্তব্য না করে দরজাটা ঠেলে একেবারে খুলে দিল। দরজাটা খুলতেই নিশ্বাসের শব্দটা আরো জোর এবং পরিষ্কারভাবে হতে লাগল। কেউ নিশ্চয়ই ওখানে আছে। চাপা স্বরে গ্রীন বলল।

কেউ ওখানে আছে, কিন্তু কোথায়? ম্যারিয়ট বিস্মিত হয়ে বলল। আবার তার বন্ধুকে তার সঙ্গে ঘরে ঢোকবার জন্যে জেদ করতে লাগল। কিন্তু গ্রীন সোজাসুজি তা প্রত্যাখ্যান করল। বলল, সে একবার ঢুকে চারদিক খুঁজেছে, কোথাও কিছু দেখতে পায়নি। সে আর ভেতরে যাবে না।

তারা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসার ঘরে ফিরে এল। নানাদিক দিয়ে তারা এ ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগল। গ্রীন তার বন্ধুর খুব কাছে বসে প্রশ্ন করে যেতে লাগল। কিন্তু কোন আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেল না। কারণ সত্য ঘটনা কখনও প্রশ্নে বদলানো যায় না।

একমাত্র ব্যাপার যার সঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হয় তা হচ্ছে আমার হাতের ব্যথাটা। এই বলে ম্যারিয়ট তার আহত হাতটা বুলোতে বুলোতে মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। এটা সর্বক্ষণ আমায় নারকীয় যন্ত্রণা ও ব্যথা দিয়ে চলেছে। কখন যে ধাক্কা লেগেছিল কিছুই মনে করতে পারছি না।

দেখি, তোমার হাতটা একটু পরীক্ষা করতে দাও তো। হাড়ের উপর আমার জ্ঞান বেশ আছে, যদিও আমার পরীক্ষকগণ তা মানতে চান না। একটু মসকরা করলে মনের বোঝা হাল্কা হয়ে যায়—তাই ম্যারিয়ট কোটটা খুলে জামার হাতাটা গুটিয়ে ফেলল।

হা ভগবান! রক্ত বেরোচ্ছে! সে চিৎকার করে উঠল। দেখ, দেখ! এটা কি?

হাতের কব্জির কাছাকাছি একটা সরু লাল দাগ। এর উপরে টাটকা রক্তের ফোঁটা। গ্রীন কাছে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে বেশ খানিকক্ষণ সেটা দেখল। তারপর চেয়ারে বসে পড়ে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে বন্ধুর মুখ দেখতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, তোমার অজান্তে তুমি নখের আঁচড় কেটেছ!

কোন চিহ্ন নেই তো। এ নিশ্চয়ই অন্য কিছু যা আমার হাত বেদনাময় করে তুলেছে।

ম্যারিয়ট নিশ্চল হয়ে বসে একদৃষ্টে হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন সবকিছু রহস্যের সমাধান প্রকৃতই হাতের চামড়ার উপর লেখা আছে।

কি ব্যাপার? একটা আঁচড়ে অদ্ভুত কিছু আমি দেখছি না। প্রত্যয়হীন স্বরে গ্রীন বলল। এটা হয়ত তোমার জামার আস্তিনের বোতামের দাগ। গতরাতে তোমার উত্তেজনাবশত—

কিন্তু ম্যারিয়টের ঠোঁট দুটো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে কথা বলার চেষ্টা করল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। অবশেষে সে তার বন্ধুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল।

মৃদু কম্পিত অনুচ্চ কণ্ঠে সে বলল, দেখ। ঐ লাল দাগটা দেখছ? আমি বলতে চাইছি নিচের দিকে যাকে তুমি আঁচড় বলছ?

গ্রীন স্বীকার করল কিছু যেন দেখেছে। ম্যারিয়ট রুমাল দিয়ে সেটা মুছে ফেলে আবার তাকে ভাল করে লক্ষ্য করতে বলল।

হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে একটা পুরোনো ঘায়ের দাগ। একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করে সে বলল।

এটা একটা পুরোনো ঘা। ফিসফিস করে ম্যারিয়ট বলল। ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে। এখন সব কিছু মনে পড়ছে।

সব কিছু কি? চেয়ারে বসে অস্থির হয়ে গ্রীন জিজ্ঞেস করল।

চুপ! আস্তে! আমি তোমাকে বলব। এই ক্ষত ফিল্ডেরই কীর্তি!

বিস্মিত হয়ে তারা দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল। কারোর মুখে কোন শব্দ নেই।

ঐ ক্ষত ফিল্ড করেছিল! অবশেষে ম্যারিয়ট একটু উঁচু গলায় পুনরাবৃত্তি করল।

ফিল্ড! তুমি বলছ—কাল রাতে?

না, কাল রাতে নয়—অনেক বছর আগে—একটা ছুরি দিয়ে স্কুলে। এবং আমিও তার হাতে ক্ষত করেছিলাম। ম্যারিযট এখন তাড়াতাড়ি কথা বলছে। আমরা পরস্পরের ক্ষত দিয়ে রক্ত বদল করেছিলাম। সে একফোঁটা আমার হাতে ফেলেছিল, আমিও একফোঁটা তার—-।

হায় ভগবান, কিসের জন্যে?

এটা একটা নিবিড় বন্ধুত্বের বন্ধন। আমরা একটা পবিত্র অঙ্গীকার করেছিলাম, একটা চুক্তি। আমার এখন সব নিখুঁতভাবে মনে পড়ছে। আমরা ভুতুড়ে বই পড়তাম এবং শপথ নিয়েছিলাম যে আগে মরবে সে অন্যকে দেখা দেবে। এবং এই নিবিড় বন্ধুত্ব আমরা রক্ত দিয়ে অঙ্গিকারবদ্ধ হযেছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে —আজ থেকে সাত বছর আগে, এক ভীষণ গরমের দুপুরবেলায় খেলার মাঠে—-এবং একজন শিক্ষক আমাদের ধরে ফেলেন আর ছুরি দুটো কেড়ে নেন—এবং আজ পর্যন্ত আমার আগে এ ব্যাপারটা মনে আসেনি—।

তাহলে তুমি বলতে চাও—। গ্রীন তোতলাতে লাগল।

কিন্তু ম্যারিয়ট কোন উত্তর দিল না। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে সোফার উপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। মুখটা দু'হাতে ঢেকে রইল।

গ্রীন নিজেও একটু হতবাক হয়ে পড়ল। সে একা একা সমস্ত ব্যাপারটা আবার চিন্তা করতে লাগল। একটা ধারণা তার মাথায় এল। সে ম্যারিয়টের কাছে গিয়ে তাকে সোফা থেকে তুলল। যাহোক, কোন বিষয়ের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা থাক বা না থাক, তার মুখোমুখি হওয়া ভাল। নীরবে মেনে নেওয়া মানে বোকার মতো প্রস্থান করা।

আমি বলি কি ম্যারিয়ট, এ ব্যাপারে এত ঘাবড়ে যাওয়া ভাল নয়। তার মানে এটা যদি অলীক কিছু হয়, আমরা জানি কি করতে হয়। আর এটা যদি না হয়, তবে আমরা কি ভাবব তা জানি, তাই না?

ফ্যাকাসে মুখে তার দিকে তাকিয়ে ম্যারিয়ট বলল, আমার মনে হয় তাই। কিন্তু অন্য কারণে এ আমাকে ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। এবং ঐ বেচারা আত্মা—

সে যাহোক, যদি সব থেকে মন্দটাই সত্যি হয় আর—আর ঐ লোকটা তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে—ব্যস্, সে তার কথা রেখেছে, ব্যাপার মিটে গেল, তাই না?

ম্যারিয়েট মাথা নেড়ে সায় দিল।

একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, গ্রীন বলতে লাগল, আর তা হচ্ছে, তুমি কি নিশ্চিত যে সত্যিই সে ওভাবে খেয়েছিল— তার মানে প্রকৃতই সে কিছু খেয়েছিল?

ম্যারিয়ট কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকে দেখে জানাল যে সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই। সে শান্তভাবে কথা বলছিল। বড় আঘাত পাবার পর ছোটখাট কোন আশ্চর্য ব্যাপার মনকে প্রভাবিত করতে পারে না।

সে জানাল, আমাদের খাওয়া শেষ হলে আমি নিজের হাতে সেগুলো সরিয়ে রেখেছি। ঐ আলমারির তৃতীয় তাকে পাত্রগুলো আছে। ওগুলো সেই থেকে কেউ ছোঁয়নি।

চেয়ারে বসেই ম্যারিয়ট দেখাল। গ্রীন উঠে গিয়ে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখল।

ঠিক যা ভেবেছি তাই। যেকোন অবস্থাতেই হোক না কেন, এটা কিছুটা মনের কল্পনা। খাবারগুলো একেবারে ছোঁয়া হয়নি। এদিকে এস, নিজের চোখে দেখ।

তারা দু'জনে তাকটা পরীক্ষা করে দেখল। বাদামী রঙের পাঁউরুটি পড়ে আছে, থালায় বাসি কেক, পাত্রে কমলালেবুর আচার—যেমন রাখা হয়েছিল তেমনি আছে, একদম হাত দেয়নি। এমন কি ম্যারিয়টের ঢালা গেলাস ভর্তি মদও এতটুকু কমেনি।

তুমি কাউকে খাওয়াওনি, গ্রীন বলল। ফিল্ড কোন খাদ্যও খায়নি, কিছু পানও করেনি। সে সেখানে মোটেই ছিল না।

কিন্তু নিশ্বাস? চাপা গলায় সে জানতে চাইল। হতবুদ্ধির ভাব তার সারা মুখে।

গ্রীন কোন উত্তর দিল না। সে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ম্যারিয়টের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করল। সে দরজা খুলে কান পেতে কিছু শুনল। কথা বলার

দরকার হল না। গভীর নিরবচ্ছিন্ন নিশ্বাসের শব্দ বাতাসে ভেসে আসতে লাগল। সেটা কোন অলীক কল্পনা নয়। অন্য ঘরে ম্যারিয়ট যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানেও সে শুনতে পাচ্ছে।

গ্রীন দরজা বন্ধ করে ফিরে এল। সে এই বলে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করল, একটা কাজই করবার আছে। বাড়িতে চিঠি লিখে তার সম্বন্ধে জান। ইত্যবসরে আমার ঘরে থেকে তোমার পড়া শেষ কর। আমার আলাদা বিছানা আছে, তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

বেশ, রাজী আছি; ঐ পরীক্ষার ব্যাপারে কোন অবাস্তবতা নেই; যা কিছু ঘটুক আমাকে পাশ করতেই হবে।

এর এক সপ্তাহ পরে ম্যারিয়ট তার বোনের কাছ থেকে চিঠির উত্তর পেয়েছিল। চিঠির কিছু অংশ সে গ্রীনকে পড়িয়ে শুনিয়েছিল, তার বোন লিখেছিল:

এটা অদ্ভুত লাগছে তুমি ফিল্ডের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ। সে এক ভীষণ ব্যাপার। কিছুদিন আগে স্যার জনের সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছল। তিনি তাকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। তুমি কি ভাবছ? সে আত্মহত্যা করে। অন্তত তাকে দেখে মনে হয়। সে বাড়ি থেকে না গিয়ে ভূগর্ভস্থ ঘরে আশ্রয় নিল। ধীরে ধীরে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।...তারা এটা চাপা দেবার চেষ্টা করছে। আমাদের বাড়ির পরিচারিকার কাছে একথা শুনেছি, সে আবার তাদের চাপরাসীর মুখ থেকে শুনেছে। তারা ১৪ তারিখে মৃতদেহ দেখতে পায়। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলেছে বার ঘণ্টা আগে তার মৃত্যু ঘটেছে।...তাকে ভয়ঙ্কর রোগা দেখাচ্ছিল...।

তাহলে সে ১৩ তারিখে মরেছে, গ্রীন বলল।

ম্যারিয়ট মাথা নাড়ল।

ঠিক ঐ রাতে সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

ম্যারিয়ট আবার মাথা নেড়ে সায় দিল।

অনুবাদ: রবীন্দ্রনাথ বসু

প্রেত-লাভ

The Inexperienced Ghost—এইচ. জি. ওয়েলস্

যে পরিবেশের মধ্যে ক্লেটন গল্পটা বলেছিল আমার মনে সেটা জীবন্ত হয়ে ফিরে আসছে। আগুনের পাশে হেলানওয়ালা লম্বা বেঞ্চের উপর অনেকক্ষণ ধরে বসে ধূমপান করছে। সেখানে আছে ইভানস, একজন কুশলী নায়ক আর আছে উইশ, অতি বিনয়ী লোক। আমরা সকলে সেই শনিবারের সকালে মারমেড ক্লাবে এসে হাজির হয়েছি কেবল ক্লেটন ছাড়া। সে আগের দিন রাতে ওখানেই ঘুমিয়েছিল—সেটাই তাঁকে. গল্প বলার মুখ ধরিয়ে দিয়েছিল। আমরা অনেকক্ষণ ধরে গলফ খেললাম, খাবার খেলাম, তারপর গল্প শোনার যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবার মতো আমাদের মনের স্বাভাবিক অবস্থা ছিল। যখন ক্লেটন একটা গল্প বলতে শুরু করল, আমরা ধরে নিলাম সে মিথ্যা বলছে। হয়ত সে মিথ্যা বলে থাকতে পারে, সেটা আমার মতো পাঠকেরাও খুব তাড়াতাড়ি বিচার করতে সক্ষম হবেন। এটা সত্যি, সে খুব সাদাসিধেভাবে গল্পটা আরম্ভ করেছিল। কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম সেটা ওর চালাকি করে তৈরি করা।

আমি বলছি! তোমরা জান কাল রাতে আমি এখানে একা ছিলাম।

বাড়ির চাকর ছাড়া, উইলস বলল।

যারা বাড়ির শেষপ্রান্তে শোয়, ক্লেটন জবাব দিল। যা হোক—, বলতে গিয়ে থেমে গেল সে। কিছুক্ষণ সিগারে টান দিল। তখনও নিজের উপর বিশ্বাসে তার সন্দেহ ছিল ; তারপর বলল, বেশ শান্তভাবেই বলল, আমি একটা ভূত ধরেছিলাম।

ভূত ধরেছিলে, তুমি ? কোথায় সে ? স্যান্ডারসন জানতে চাইল।

উইশ ক্লেটনের খুব প্রশংসা করে এবং চার সপ্তাহ আমেরিকায় ছিল, সেও চিৎকার করে উঠল, তুমি ভূত ধরেছিলে, ক্লেটন ? আমি শুনে সুখী হলাম। এখুনি আমাদের ও সম্বন্ধে সব বল।

ক্লেটন জানাল সে এক মিনিটের মধ্যে সব জানাবে এবং তাকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলল।

সমর্থন পাবার উদ্দেশ্যে সে আমার দিকে তাকাল। বলল, যদিও কেউ আড়ি পেতে নেই, তবু এখানে ভূতের গুজব শুনে আমাদের সুন্দর পরিবেশনে বাধা দিতে চাই না। এ নিয়ে মজা করার মতো অনেক ছায়া ও ওক কাঠের দেওয়াল

নক্সা করা আছে। আর জান, এটা নিয়মিত ভূত নয়। আমার মনে হয় না আবার কখনও আসবে।

তুমি বলতে চাও তুমি ওটা রাখনি? স্যান্ডারসন বলল।

আমার সে অবস্থা ছিল না।

স্যান্ডারসন জানাল সে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে।

আমরা হেসে উঠলাম এবং ক্লেটনকে দুঃখিত মনে হল।

একটুকরো হাসিমুখে সে বলল, আমি জানি, আসল কথা এটা সত্যিই একটা ভূত। আমি যেমন তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি সেরকমই আমি নিশ্চিত। আমি ঠাট্টা করছি না। আমি যা বলছি ঠিক তাই।

স্যান্ডারসন একটা লাল চোখ তার উপর রেখে খুব জোরে পাইপে টান দিল তারপর আস্তে আস্তে এমনভাবে ধোঁয়া ছাড়ল যেন তাতে অনেক কথা বোঝাল।

ক্লেটন মন্তব্যটা গ্রাহ্য করল না। বলল, এমন অদ্ভুত ঘটনা আমার জীবনে কখনও ঘটেনি। তোমরা জান আগে কখনও ভূত বা সেই ধরনের কিছুর উপর আমার বিশ্বাস ছিল না। তারপর বুঝলে, আমার যে অভিজ্ঞতা হল তাতে আমার সব ওলট-পালট হয়ে গেল।

আর একটা সিগার বার করে অনেকক্ষণ ধরে সে চিন্তা করতে লাগল।

তুমি কথা বলেছিলে? উইশ জানতে চাইল।

একঘণ্টার মতো সুযোগ হয়েছিল।

গল্পসল্প? নাস্তিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমি বললাম।

বেচারা আত্মা কষ্টে পড়েছে।

ফুঁপিয়ে কাঁদছিল? কে যেন বলল।

ক্লেটন বাস্তব স্মৃতি চিন্তা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হা ভগবান! হ্যাঁ। বেচারা।

কোথায় তুমি আঘাত করেছিলে? আমেরিকান ঢঙে উইশ জিজ্ঞেস করল।

তাকে অগ্রাহ্য করে ক্লেটন বলল, আমি বুঝতে পারিনি, একজন ভূত দুর্ভাগা হতে পারে। আবার সে আমাদের কিছুক্ষণ উত্তেজিত করে তুলল। নিজে পকেট থেকে দেশলাই বার করে সিগার ধরিয়ে দেহ গরম করতে লাগল।

আমি একটা সুযোগ নিয়েছিলাম, গভীরভাবে বিবেচনা করে অবশেষে বলল।

আমাদের মধ্যে কারোরই তাড়া ছিল না।

সে বলল, একটা চরিত্র দেহত্যাগ করলেও ঠিক একই চরিত্র থাকে। সে ব্যাপারটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। লোকেদের কোন নির্দিষ্ট ক্ষমতা অথবা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকলে ভূত হয়েও তাদের সেই অবস্থায় দেখা যায়। তোমরা জান, প্রায় সব ভূতেরাই এক উদ্দেশ্যে উন্মত্ততাগ্রস্ত এবং অশ্বতরের মতো একগুঁয়ে হয়ে বারবার আবির্ভূত হয়। এই বেচারা প্রাণীর কিন্তু তা কিছুই ছিল না। হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে সে উপর দিকে এবং ঘরের চারদিকে চোখ বোলাল। পরোপকারিতার দিক দিয়ে বলছি, ব্যাপারটা নির্ভেজাল সত্যি। প্রথম দর্শনেই তাকে দুর্বল বলে মনে হয়েছিল।

তার সিগারের সাহায্যে জোর দিয়ে সে কথাগুলো বলছিল।

লম্বা প্যাসেজে আমি তার সামনে পড়ি। তার পেছন দিকটা আমার সামনে ছিল। আমিই তাকে প্রথম দেখি। সঙ্গে সঙ্গেই তাকে আমি ভূত মনে করি। সে স্বচ্ছ এবং সাদাটে রঙের; তার বুকের ভেতর দিয়ে আমি শেষ প্রান্তের জানালার আলো দেখতে পাই। কেবল তার দেহ নয়, তার হাবভাবেও তাকে দুর্বল মনে হয়। সে দেখছিল, বুঝলে, সে কি করতে চায় তার কিছুই সে জানে না মনে হল। একটা হাত তার জানালার গরাদে আর একটা হাত তার মুখে কাঁপছে। ঠিক এইরকম।

কেমন চেহারা ? স্যান্ডারসন বলল।

রোগা। জান, সেই যুবকের ঘাড় থেকে দুটো বড় বাঁশির মতো হাড় নিচের দিকে নেমে গেছে —ঠিক এখানে আর এখানে! ছোট ক্ষুদে মাথায় বুরুশ করা চুল, কান দুটো বিশ্রী, কাঁধ দুটোও বেমানান, কোমরের থেকে সরু; জামার কলার নামান, রেডিমেড ছোট জ্যাকেট, ট্রাউজার থলের মতো ঢলঢলে, তলার দিকটা ছেঁড়া। আমি খুব সন্তর্পণে সিঁড়িতে উঠলাম। আমি আলো নিইনি। বাতিগুলো নিচের টেবিলের উপর, সেখানেই লম্ফটা রয়েছে—এবং আমি পাড় লাগান চটি পরেছিলাম। আমি উঠতে উঠতে তাকে দেখলাম। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি মরার মতো দাঁড়িয়েই রইলাম। আমি একটুও ভীত হইনি। আমি ভাবলাম এসব ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় কারও ভয় পাওয়া বা উত্তেজিত হওয়া কখনও ঠিক নয় যা একজন সচরাচর মনে করে কেউ হয়ে থাকে। আমি একই সঙ্গে বিস্মিত ও উৎসুক হয়ে উঠলাম। আমার চিন্তা হল--ওঃ ভগবান, শেষকালে এখানে একটা ভূত! আর গত পঁচিশ বছর ধরে একমুহূর্তের জন্যে ভূতের উপর বিশ্বাস করিনি।

হুম ---। উইশ শুধু মুখে আওয়াজ করল।

আমাকে সে দেখার আগে আমি ভাবিনি যে আমি সিঁড়ির অবতরণস্থলে নেই। তখন আমি দেখলাম একজন অপরিণত যুবকের মুখ, নিস্তেজ নাক, ছোট গোঁফ আর তোবড়ান গাল। কিছুক্ষণের জন্যে আমরা দাড়িয়ে রইলাম— সে কাধের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে আমাকে দেখছে-- দু'জনেই দু'জনকে নিরীক্ষণ করছি। তারপরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সে সোজাসুজি আমার মুখের দিকে চেয়ে দু' হাত তুলে ভূতের মতো হাত ছড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। গাল দুটো তার তুবড়ে গেল, মুখ দিয়ে অদ্ভুত বু উ-উ শব্দ বেরিয়ে এল। না, এটা একটুও ভীতজনক নয়। আমি পেট ভরে খেয়েছি, শ্যাম্পেনও গিলেছি, বেশ শক্ত হয়ে রয়েছি, কিছুতেই ভয় নেই। বু-উ, বাজে যত সব। তুমি এখানকার লোক নও। এখানে কি করছ? আমি তাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বললাম।

আমি তাকে বেদনায় কুঁচকে যেতে দেখলাম।

বু-উ উ। সে শুধু মুখে আওয়াজ করল।

চুলোয় যাক বু-উ-উ। তুমি কি এখানকার সভ্য? তাকে যেন আমি গ্রাহ্যই করিনি

এইরকম ভাব দেখিয়ে তার একপাশে গিয়ে বাতিটা জ্বালালাম। তুমি কি সভ্য? মুখ ফিরিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম।

আমার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। তাকে একটু মনমরা লাগল। না, আমি সভ্য নই। আমি প্রেতাত্মা।

তবে কি এখানে কারো সঙ্গে দেখা করতে এসেছ বা ঐ ধরনের কিছু? যাতে সে আমার মদের নেশা বুঝতে না পারে সেজন্য যতটা সম্ভব অবিচলিতভাবে বাতিটা জ্বালালাম। তারপর আলোটা তার দিকে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, তবে এখানে কি করছ?

হাত দুটো নামিয়ে নিয়ে মুখের শব্দ বন্ধ করল। এক দুর্বল, বোকা, উদ্দেশ্যহীন যুবকের প্রেতাত্মা সপ্রতিভ ও হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আস্তে আস্তে সে বলল, আমি আতঙ্কগ্রস্ত।

তোমায় কোন প্রয়োজন নেই। শান্ত কণ্ঠে আমি বললাম।

আমি একজন ভূত! যেন নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্যেই সে উত্তর দিল।

তা হতে পারে, কিন্তু তোমার এখানে আসার কোন দরকার নেই।

এটা একটা সম্মানজনক ব্যক্তিগত ক্লাব। লোকেরা প্রায়ই তাদের ছেলেমেয়ে ও তাদের নার্সদের নিয়ে এখানে আসে এবং তোমার মতো এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। একরত্তি ছেলেমেয়েরা তোমার সামনে পড়ে ভয় পেতে পারে। আমার মনে হল তুমি সেটা চিন্তা করনি?

না, স্যার। তা আমি করিনি।

তোমার করা উচিত ছিল। এই জায়গায় তোমার কোন অধিকার নেই, আছে কি?

কিছু না স্যার। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এটা একটা পুরনো ও ওক কাঠের প্যানেল করা—।

ওটা কোন ওজর নয়, দৃঢ়কণ্ঠে বললাম। তোমার এখানে আসাটাই ভুল। পকেটে দেশলাই আছে কিনা দেখার ভান করে পরক্ষণেই তার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললাম, তোমার জায়গায় যদি আমি হতাম তবে ভোর হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতাম না। এইমুহূর্তে উধাও হয়ে যেতাম।

সে হতচকিত হয়ে গেল। ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার—।

সে বলতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু তাকে থামিয়ে বললাম, আমি উধাও হতাম।

ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার, যে—কিছুর জন্যে—আমি পারছি না।

তুমি পারছ না?

না, স্যার। কিছু একটা আমি ভুলে গেছি। গত মাঝরাত থেকেই আমি এখানে ঘুরঘুর করছি, খালি ঘরের আলমারির পেছন লুকিয়ে, এদিক-ওদিক গিয়ে এইভাবে। আমি বিক্ষুব্ধ। আমি আগে কখনও এখানে আসিনি, আমাকে অসুবিধেয় ফেলেছে।

ঠিক তাই স্যার। এটা আমি বারবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হইনি। একটা ছোট জিনিস আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে, সেটা আর ফেরত নিতে পারছি না।

তোমরা জান সেটা আমাকে পর্যুদস্ত করেছে। সে আমার দিকে এমন নিতান্ত হীনভাবে তাকাল যে তর্জন-গর্জন করে আমার কর্তৃত্ব জাহির করার আর অবস্থা রইল না।

অদ্ভুত ব্যাপার! আমার মনে হল নিচে যেন কারোর চলাফেরা করার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। তাকে বললাম, আমার ঘরে এস, এ সম্বন্ধে আমাকে আরও বল।

আমি অবশ্য এ ব্যাপারে কিছুই বুঝিনি এবং তাকে হাত ধরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করলাম। তোমরা সেটা মনে করতে পার একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ধরার চেষ্টা করার মতো। আমার ঘরের নম্বরটা ভুলে গেছি মনে হল। যাই হোক, আমি কতকগুলো ঘর পেরিয়ে গেছি মনে হল। ভাগ্যবশত সেইদিকে আমিই একমাত্র জীবন্ত প্রাণী। শেষে আমার নিজস্ব লটবহর দেখতে পেলাম। এই যে এসে গেছি, এই বলে আমি চেয়ারে বসলাম। এখানে বস, আমাকে সব বল।

সে বসল না। ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে চলাফেরা করাই পছন্দ করল যদিও আমার কাছে সেটা এই রকম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্যে ডুবে গেলাম। সেই সময় আমার মুখ দিয়ে মদ ও সোডার ঢেকুর উঠছে। কি উগ্র রাম আর ভুতুড়ে ঝামেলায় পড়েছি তখন থেকেই বুঝতে শুরু করলাম। ঐ আধা স্বচ্ছ মায়াময় এক মূর্তি, ভুতুড়ে গলার স্বর ছাড়া আর কোন হৈ-চৈ নেই। সুন্দর, পরিষ্কার ছিটকাপড় ঝোলানো পুরনো শোবার ঘরে সে এদিক-ওদিক পায়চারি করছে। সহজেই তার শরীরের ভেতর দিয়ে আমার বাতিদানে আলোর ঔজ্জ্বল্য, পেতলের ছাই চাপা দেবার ঢাকনার উপরে পড়া আলো, এবং দেওয়ালের কোণে কারুকার্যকরা ছবির ফ্রেম চোখে পড়ছে। তারা সবেমাত্র চরম দুর্দশাগ্রস্ত পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার গল্প বলছে। তার মুখে সততার কোন ছাপ নেই কারণ দেহটা স্বচ্ছ কিন্তু সত্য সে এড়িয়ে যেতে পারল না।

এ্যাঁ? হঠাৎ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে উইশ জিজ্ঞেস করল।

কি?

স্বচ্ছ—তবু সত্য এড়িয়ে যেতে পারল না—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমিও কিছু বুঝিনি, তবু তোমাকে নিশ্চিত বলতে পারি, এটা সত্যি। আমি বিশ্বাস করি না সে বাইবেলের সত্য থেকে একচুল নড়েছে। সে আমাকে বলল কিভাবে সে মরেছে—সে লন্ডনের একটা বাড়ির নিচে বাতি নিয়ে গ্যাসের লিক দেখতে গেছল। নিজেকে লন্ডনের একজন প্রাইভেট স্কুলের সিনিয়র ইংলিশ টীচার হিসেবে পরিচয় দেয়।

বেচারা হতভাগ্য! আমি বললাম।

ঠিক তাই আমি ভেবেছিলাম এবং যতই সে বলতে লাগল ততই আমার চিন্তা বাড়তে লাগল। এই সে দাঁড়িয়ে আছে—যে জীবনে এবং জীবনের পরেও লক্ষ্যহীন।

সে তার বাবার, মায়ের স্কুলমাস্টারের এবং অতি সামান্যভাবও যে তার জীবনের সঙ্গে জড়িত ছিল—তাদের সবার কথা বলল। সে খুব মর্মস্পর্শী ও ভীষণ ভীতু ছিল, কেউ তাকে ঠিকমতো বিচার করতে অথবা বুঝতে পারেনি। আমার মনে হয় পার্থিব জীবনে তার কোন প্রকৃত বন্ধু ছিল না। আর জীবনে কোন সফলতা আসেনি। সে খেলাধুলো এড়িয়ে চলত এবং পরীক্ষাতেও কৃতকার্য হত না।

সে বললে, মোটামুটি প্রায় অন্য লোকের মতো। পরীক্ষার ঘরে অথবা অন্য কোথাও গেলে মনে হত সবই বিফল।

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছিল, সেই সময় গ্যাসে তার সব শেষ হয়ে যায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন কোথায় তুমি ?

সে ব্যাপারে খুব পরিষ্কার নয়। যে ধারণা সে দিল তা হচ্ছে অস্পষ্ট, মধ্যবর্তী অবস্থা, পাপ অথবা পুণ্যের ফলে অস্তিত্বহীন আত্মার বিশেষ সংরক্ষিত জায়গা। আমি তা জানি না। মৃত্যুর পরপারের জায়গা, দেশ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা আমাকে দিতে সে অনিচ্ছুক। যেখানেই সে থাকুক না কেন, মনে হয় সে এক দয়ালু আত্মায় পরিণত হয়েছে। খাস লন্ডন শহরের এক দুর্বল ভূত। তার আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া সম্বন্ধে অনেক কিছু বলার আছে। হ্যাঁ—আতঙ্কগ্রস্ত! সেগুলো যেন ভুতুড়ে, ভয়ঙ্কর অ্যাডভেঞ্চার—সবসময় ভয়ে পিছিয়ে যেতে হয়। এইভাবে তৈরি হয়ে সে এসেছে।

কিন্তু সত্যি! উইশ আগুনের দিকে মুখ করে বলল। ক্লেটন নম্রভাবে বলল, এইরকম একটা ধারণা সে আমাকে দিয়েছিল। আমার হয়ত তখন কোন বাছ-বিচার করার মতো অবস্থা না থাকতে পারত তবে নিজের পূর্ব অবস্থা সম্বন্ধে এই ধরনের বিবৃতি দিয়েছিল। সরু গলার স্বরে কথা বলতে বলতে ঘরের মধ্যে সে পায়চারি করছিল—তার হতভাগ্য জীবনে—কিন্তু গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পরিষ্কার ও সোজাসুজি কখনও নয়। সে বেঁচে থাকলে যেমন হত তার থেকেও বেশি রোগা, মূর্খ ও অপ্রাসঙ্গিক। জীবন্ত অবস্থায় সেভাবে সে আমার ঘরে থাকত না। আমি তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতাম।

নিশ্চয়ই, এমন হতভাগ্য মানুষও আছে, ইভানস বলল।

হ্যাঁ, আমাদের মতো তাদেরও ভূত দেখার সুযোগ আছে। আমি স্বীকার করলাম। তার যে এইভাবে আসা, জানলে, সেটাও মনে হয় বাঁধাধরা সীমার মধ্যে মূর্খের মতো এই ভূত হয়ে আসায় তাকে ভীষণভাবে হতাশ করেছে। তাকে বলা হয়েছিল এটা একটা মজা করা। আর একটা মজা করার আশায় সে এসেছিল কিন্তু এটাও তার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। নিজেকেই সে ডাহা মিথ্যে বলে ঘোষণা করছে। সে বলল এবং আমি সত্যিই বিশ্বাস করতে পারি যে সে জীবনে কখনও এমন কাজ করেনি যাতে সে তালগোল পাকিয়ে ফেলতে পারে আর পৃথিবী রসাতলে গেলেও সে করবে না। যদি সে কিছু সমবেদনা পেত, হয়ত—। কথা শেষ না করে আমার দিকে দেখতে লাগল। সে মন্তব্য করল, আমার কাছে হয়ত অদ্ভুত লাগতে পারে, আমি যেমন সমবেদনা দেখাচ্ছি) তেমন কেউ এমনকি একজনও আমার প্রতি সমবেদনা

দেখায়নি। সে কি করতে চায় বুঝতে পেরে আমি সেই মুহূর্তে তাকে ছেড়ে চলে যাবার মনস্থ করলাম। আমি বোকা হতে পারি জানলে কিন্তু একমাত্র প্রকৃত বন্ধুর আখ্যা লাভ করে, সে ভূত বা দেহধারী হোক না কেন, আমার শারীরিক সন্ধ্যের বাইরে। চটপট উঠে দাঁড়িয়ে বললাম এ ব্যাপারে বেশি চিন্তা করো না। যেটা তোমার করা দরকার তা হচ্ছে এখুনি এখান থেকে চলে যাও, এই মুহূর্তে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা কর।

আমি পারব না, সে বলল।

চেষ্টা কর। আবার বললাম। এবং সে চেষ্টা করল।

চেষ্টা করল! কি করে? অবাক হয়ে স্যান্ডারসন জিজ্ঞেস করল।

মিলিয়ে গেল, ক্লেটন বলল।

মিলিয়ে গেল?

নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে হাত তুলে মিলিয়ে গেল। যেভাবে সে এসেছিল সেইভাবেই সে আবার অদৃশ্য হল। ও ভগবান! কি ঝামেলায় না পড়েছি!

কিন্তু কোন ধারাবাহিক অদৃশ্যতা কি করে সম্ভব হতে পারে—আমি বলতে আরম্ভ করলাম।

ওহে আমার প্রিয়, আমার দিকে ফিরে কতকগুলো কথার ওপর বেশ জোর দিয়ে বলল, সব কিছু পরিষ্কার তুমি চাও। সেটা কি করে আমি জানি না। এটুকু জানি তুমি যেমন কর, সেও তাই কবল। ভীতিপূর্ণ সময় কাটিয়ে হঠাৎ সে অদৃশ্য হল।

তুমি কি সেই যাওয়া লক্ষ্য করেছিলে? স্যান্ডারসন আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, বলে ক্লেটন কিছু ভাবতে লাগল। তারপর বলল, সেটা ভীষণ অদ্ভুত ব্যাপার। এই ছোট্ট নিস্তব্ধ শহবের শুক্রবারের রাতে এই নিস্তব্ধ শূন্য ক্লাবে ঐ নিস্তব্ধ ঘরে ঐখানে আমরা, আমি ও সেই রোগা অস্পষ্ট ভূত। আমাদের গলার স্বর ও তার দেহ সঞ্চালনের সময হাঁপানোর মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ কোথাও নেই। মাত্র দুটো বাতি জ্বলছে—একটা ঘরে আর একটা ড্রেসিং টেবিলে। মাঝে মাঝে হাওয়ার অভাবে লম্বা, সরু এবং আশ্চর্যভাবে বাতির শিখাগুলি জ্বলছে। আরো অদ্ভুত ব্যাপাব ঘটল।

আমি পারব না। আমি কখনও—। কথা শেষ না করে বিছানার শেষদিকে ছোট চেয়ারটার উপর ধপাস করে বসে ফুঁপিযে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ভগবান! সে কি যন্ত্রণাদায়ক শব্দ!

তোমার সমস্ত শক্তি সংহত কর। এই বলে আমি তার পিঠ চাপড়াবার চেষ্টা করলাম, এবং...আমার ডান হাতটা সোজা তার দেহের ভেতর দিয়ে চলে গেল! সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে আমি যেমন সংহত ছিলাম জানলে এখন তেমন থাকতে পারতাম না। এর সম্পূর্ণ বিচিত্রতা আমি উপলব্ধি করলাম। আমার মনে পড়ছে, হাতটা চট করে বার করে এনে একটু রোমাঞ্চিত হয়ে ড্রেসিং টেবিলের দিকে এগোলাম।

তুমি নিজেকে শক্ত করে তোল আর চেষ্টা কর, আমি তাকে বললাম। তাকে উৎসাহিত ও সাহায্য করতে আমিও চেষ্টা করতে লাগলাম।

কি? অদৃশ্য হওয়া! আশ্চর্য হয়ে স্যান্ডারসন জিজ্ঞেস করল।

হ্যাঁ, অদৃশ্য হওয়া।

কিন্তু—, একটা ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু স্যান্ডার তার মাঝেই বলল, এটা একটা কৌতূহলের ব্যাপার। তুমি বলতে চাও তোমার এই ভূতটা ছেড়ে দিল—।

বিভ্রান্ত বাধা দূর করবার জন্যে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করল? হ্যাঁ।

সে করেনি, করতে পারে না, নয়ত তোমারও ঐ অবস্থা হত। উইশ বলল।

ঠিক তাই। আমার চিন্তাধারাটা তার কথার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেল।

ঠিক তাই। চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে আগুনের দিকে তাকিয়ে ক্লেটন বলল।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ।

অবশেষে সে তাই করল? স্যান্ডারসনের জিজ্ঞাসা।

হ্যাঁ, অবশেষে সে তাই করল। আমি তাকে উত্তেজিত করে তুলতে লাগলাম, সে তাই করল হঠাৎই। সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল—আমরা একটা নাটকের দৃশ্য করেছিলাম। তারপর সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে আমাকে আবার সে মহড়া দিতে বলল যাতে সে দেখতে পারে।

সে বলল, আমার বিশ্বাস, আমি যদি দেখি আমার ভুলটা সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়বে।

আমি করলাম।

আমি জানি, সে বলল।

তুমি কি জান?

আমি জানি, সে আবার বলল। তারপর খিটখিটে মেজাজে বলল, আমি করতে পারব না। আমার দিকে দেখ—আমি সত্যি পারব না। কিছুটা এরকম সবসময় ছিল। আমি ভীতু বলে তুমি আমাকে অসুবিধেয় ফেলছ।

যাহোক, আমাদের মধ্যে একটু তর্কাতর্কি হল। স্বভাবতই আমি দেখতে চাইলাম, কিন্তু সে গোঁয়ার-গোবিন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আমি ভীষণ ক্লান্ত বোধ করলাম। ঠিক আছে, আমি তোমার দিকে দেখব না, এই বলে আমি বিছানার পাশে আয়নার দিকে ফিরলাম।

সে খুব তাড়াতাড়ি শুরু করল। আয়নার মধ্যে দিয়ে তাকে দেখার চেষ্টা করলাম। হাত দুটো ছড়িয়ে সে ঘুরছে, বোঁ বোঁ করে ঘুরছে, হঠাৎ সে সর্বশেষ ভঙ্গি করল। আমি চিৎকার করে বললাম, ঠিক হয়ে তুমি দাঁড়াও। সে দাঁড়াল। কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখি—সে নেই, কোথাও নেই! আমি বোঁ করে তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। সেখানে কিছুই নেই। আমি একা—অনাবৃত বাতির অগ্নিশিখা আর বিহ্বল মন। কি হল? কিছু কি ঘটল? আমি কি স্বপ্ন দেখছিলাম? সেই সময় সিঁড়ির মাথায় ঘড়িটায় একটা

বাজল। আমার শ্যাম্পেন ও মদ কোথায় তলিয়ে গেছে। আমি হতভম্ব অবস্থায় থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিচিত্র অনুভূতি বোধ হল, গা শিউরে উঠল। ওঃ ভগবান!

এই অবধি বলে ক্লেটন সিগারেটের ছাই ফেলল। বলল, যা ঘটেছিল। তা এই।

আর তারপর তুমি বিছানায় গেলে? ইভানস জিজ্ঞেস করল।

তাছাড়া আর কি করার থাকতে পারে?

আমি উইশের দিকে তাকালাম। আমরা তাকে ঠাট্টা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তার গলার স্বর ও হাবভাবে আমাদের সেই ইচ্ছায় বাধ সাধল।

তার অঙ্গভঙ্গিগুলো? স্যান্ডারসন জিজ্ঞেস করল।

আমার বিশ্বাস সেগুলো এখন করতে পারব।

ওঃ! তাহলে সেগুলো করছ না কেন?

তাই আমি করতে যাচ্ছি।

ওগুলো কাজ করবে না। ইভানস বলল।

যদি সেগুলো করে—। আমার কথা শেষ হল না।

উইশ পা দুটো সোজা করে ছড়িয়ে বলল, আমার ধারণা তুমি করনি।

কেন? ইভানস জিজ্ঞেস করল।

বাস্তবিকই সে করেনি, উইশ জবাব দিল।

হয়ত সে ঠিকমতো বুঝতে পারেনি, পাইপে টোব্যাকো গুঁজতে গুঁজতে স্যান্ডারসন বলল।

সে যাই হোক, সে করেনি, উইশ বলল।

আমরা উইশের সঙ্গে তর্ক করতে লাগলাম। সে বলল, ক্লেটনের ঐসব অঙ্গভঙ্গি করা মানে একটা গূঢ়তত্ত্বের তামাশা করা।

কিন্তু তোমরা কি বিশ্বাস কর না—?

উইশ আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে ক্লেটনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি বিশ্বাস করি, আধা-আধি করি।

আমি বললাম, ক্লেটন, তুমি একটা আস্ত মিথ্যাবাদী। প্রায় অনেকখানি ঠিক; তবে ঐ অদৃশ্য ব্যাপারটা ঠিক যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এটা একটা গাঁজাখুরি গল্প।

আমার কথায় কান না দিয়ে ক্লেটন ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল। এক মুহূর্ত নিজের পায়ের দিকে চেয়ে রইল তারপরেই গভীর মনে দেওয়ালের দিকে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে হাত দুটো চোখ বরাবর তুলে আরম্ভ করল...।

মধ্যযুগীয় ইউরোপের ফোর কিংস নামে এক গুপ্ত ভ্রাতৃসঙ্ঘের সভ্য ছিল স্যান্ডারসন। সে এই সঙ্ঘের অতীত ও বর্তমান গুপ্ত বিষয়সমূহের গভীর অধ্যয়ন এবং সেগুলো বিস্তারিত আলোচনাও করত। সে রক্তচক্ষু নিয়ে গভীর উৎসাহের সঙ্গে ক্লেটনের অঙ্গভঙ্গি দেখছিল। শেষ হলে সে বলল, এটা নেহাৎ মন্দ নয়। জান ক্লেটন, সত্যি তুমি অতি অদ্ভুতভাবে সংবদ্ধ করার ক্ষমতা রাখ। কিন্তু একটা ছোট ব্যাপার তুমি ছেড়ে গেছ।

আমি জানি, আমার বিশ্বাস আমি বলতে পারি কোন্‌টা।

আচ্ছা ?

এইটা—এই বলে ক্লেটন অদ্ভুতভাবে শরীরটা মোচড় দিয়ে, কুঁচকে হাত দুটো সজোরে ঠেলে দিল।

হ্যাঁ। ঠিক।

ওটাও সে ঠিকমতো করে উঠতে পারেনি। কিন্তু তুমি কেমন করে—?

এ ব্যাপারের সবটাই, বিশেষ করে তুমি কি করে আবিষ্কার করলে তার কিছু আমি বুঝছি না। তবে ঐ একটা ক্রিয়া আমি করি। সে কিছু যেন চিন্তা করতে লাগল। বলল, এগুলো হচ্ছে একটা ধারাবাহিক অঙ্গসঞ্চালন পদ্ধতি, কোন আভ্যন্তরিণ রহস্যময় গুপ্তবিদ্যার সঙ্গে জড়িত। হয়ত তুমি জান, নতুবা—কি করে এমন হল ? সে আবার কিছুক্ষণ ভেবে বলল, ঠিকমতো সঙ্কোচনের ব্যাপারটা তোমায় বলতে আমি কোন ক্ষতি দেখি না। যাই হোক, যদি তুমি জান ভাল। না জান তো না।

আমি কিছুই জানি না, কেবল গতরাতে বেচারা শয়তানটা যা দেখিয়েছিল।

বেশ তা যা হোক, এই বলে স্যান্ডারসন তাকে ফায়ারপ্লেসের উপরে সমান জায়গায় দাঁড় করাল। তারপর খুব দ্রুত তার হাত দুটো বিভিন্নভাবে ঘোরাল।

এইরকম ? ক্লেটন সেগুলো করে দেখাতে লাগল।

হ্যাঁ, এইরকম। স্যান্ডারসন আবার পাইপটা মুখে নিল।

ওঃ, আমি এখন সব ঠিক করতে পারব।

সে নিবন্ত আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। কিন্তু আমার মনে হল সেই হাসির মধ্যে যেন কিসের ইঙ্গিত রয়েছে। সে বলল, যদি আমি আরম্ভ করি—।

আমি করব না, উইশ বলল।

ঠিক আছে। ইভানস বলল, উপাদান ধ্বংসাতীত। তোমরা ভেব না এধরনের ভোজবাজি ক্লেটনকে অশরীরীর জগতে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। এটা তো নয়ই! তুমি চেষ্টা করে যাও ক্লেটন, যতক্ষণ না কব্জি থেকে তোমার হাত খসে যায়।

আমি ওতে বিশ্বাস করি না। উইশ উঠে দাঁড়িয়ে ক্লেটনের কাঁধে হাত দিয়ে বলল। তোমার গল্পে আমার আধা-বিশ্বাস জন্মেছে এবং তোমার ওকাজ আমি দেখতে চাই না।

হা ভগবান! উইশ ভয় পেয়ে গেছে! আমি বললাম।

সত্যি অথবা প্রশংসার ভান করেই হোক উইশ বলল, হ্যাঁ, আমি পেয়েছি। আমি বিশ্বাস করি ক্লেটন ঐসব অঙ্গভঙ্গি করলে সে চলে যাবে।

ক্লেটন সে ধরনের কিছু করবে না, আমি চিৎকার করে উঠলাম। এই মনুষ্যলোক ছেড়ে যাবার একটাই মাত্র পথ আর ক্লেটনের বয়স তো মাত্র তিরিশ। এছাড়া...ঐ ধরনের ভূত! তোমরা কি মনে কর...?

উইশ আমার কথায় বাধা দিয়ে ছেড়ে উঠে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে বলল, ক্লেটন, তুমি একটা বোকা।

ক্লেটন কৌতুকের দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। বলল, উইশ ঠিকই বলেছে, তোমরা সকলে ভুল করছ। আমি চলে যাব। আমার এই চর্চা শেষ হলে এবং শেষ শিসের আওয়াজ বাতাসে মিশে গেলে—লাগ ভেলকি চট্‌পট্ লাগ—দেখবে এ জায়গা খালি, ঘরের মধ্যে আশ্চর্যের খেলা, ভদ্রবেশ পরিহিত পনের স্টোন ওজনের এক ভদ্রলোক চুপ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমি নিশ্চিত, তোমারও তাই হবে। এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে চাই না। ব্যাপারটা চেষ্টা করে দেখা যাক।

না—, উইশ চিৎকার করে এক পা এগিয়ে এসে থেমে গেল। ক্লেটন হাত তুলে আর একবার আত্মার চলে যাওয়ার মহড়া দিল। সেই সময়, বুঝলে কিনা, আমরা একটা চাপা উত্তেজনার মধ্যে ছিলাম। বিশেষ করে উইশের ব্যবহারে। আমরা সকলেই ক্লেটনের দিকে চোখ রেখে বসে আছি—অন্তত আমি আকস্মিক অবস্থা সঙ্কটে লোহার মতো কাঠ হয়ে রয়েছি। এক প্রশান্ত শান্তির গাম্ভীর্যে ক্লেটন আমাদের সামনে এক একবার মাথা নিচু করে তার হাত দুটো ঘোরাচ্ছে, দোলাচ্ছে। যতই সে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে আসছে আমরা ততই আতঙ্কে জমে যাচ্ছি, আমাদের দাঁতকপাটি লাগছে। শেষ ভঙ্গি হচ্ছে, মুখটা উপরে তুলে হাত দুটো ছড়িয়ে বোঁ বোঁ করে ঘোরা। তার সেই অবস্থা দেখে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। এটা অসম্ভব ব্যাপার কিন্তু তোমরা জান সেই ভূতের গল্পের অনুভূতি—রাতের খাবারের পর, এক বিচিত্র পুরনো, ছায়া-ছায়া ঘেরা বাড়ির মধ্যে...। সে কি তাহলে... ?

ঘরের ঝোলানো বাতির মৃদু আলোয়, আত্মবিশ্বাসী ও উচ্ছল উঁচুকরা মুখে হাত দুটো ছড়িয়ে এক বিস্ময়কর মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে রইল। সেই ক্ষণিক মুহূর্ত আমাদের কাছে যুগ মনে হল। তারপর আমাদের কিছুটা অশেষ মুক্তির দীর্ঘশ্বাস, কিছুটা নিশ্চিতভাবে 'না' শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে এল। দৃশ্যত—সে যাচ্ছে না এসব কাজে। সে আমাদের একটা তুচ্ছ গল্প বলেছে এবং প্রায় আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়েছে, এই যা! ঠিক সেই মুহূর্তে ক্লেটনের মুখের ভাব পালটে গেল।

পালটে যাচ্ছে, যেমন একটা আলোকোজ্জ্বল বাড়ি হঠাৎ অন্ধকার হয়ে যায়। তার চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল, মুখের হাসি ঠোঁটেই জমে রইল এবং সে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খুব আস্তে আস্তে দুলতে লাগল।

সেই মুহূর্তটাও যেন এক অনন্ত সময়। মনে হল চেয়ারগুলো অনাবশ্যকভাবে ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে, সমস্ত জিনিসপত্তর ধুপধাপ করে পড়ছে, আমরা যেন গতিশীল। হাঁটুর উপর ভর করে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সামনে ঝুঁকে পড়ে যাচ্ছে এমন সময় ইভানস উঠে গিয়ে তার হাত ধরে ফেলল...।

এটা আমাদের সকলকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছে। এক মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। আমাদের বিশ্বাস হল, তবু যেন বিশ্বাস্য নয়...। জড়বুদ্ধির মতো বিহ্বল

হয়ে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম। তার জামা গেঞ্জী ছিঁড়ে ফেলে স্যান্ডারসন তার বুকের উপর হাত রাখল...।

সোজা ব্যাপারটা আমাদের বুঝতে একটু অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমাদের বোঝার কোন তাড়া ছিল না। ওখানেই সে ঘন্টাখানেক পড়ে রইল। এখনও পর্যন্ত আমার মনে সেই ঘটনা জ্বলজ্বল করছে। ক্লেটন চলে গেল সেই রাজ্যে—যা আমাদের এত কাছে অথচ কতদূরে, সেই পথ দিয়ে—যে-পথে সাধারণ মানুষ যায়। কিন্তু সে বাস্তবিক সেই ভূতের জাদুমন্ত্রে চলে গেল অথবা বাজে গল্প বলার মাঝে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবন শেষ হল—অবশ্যি করোনারের মতে তাই—সেটা আমার বিচারের বিষয় না। এটা এমন এক প্রহেলিকাময় ব্যাপার যা বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। সমস্ত বিষয়ের শেষ সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এটা অজানিত থাকবে। এই মুহূর্তে আমি নিশ্চয় করে যা জানি তা হল—তার সেই অঙ্গভঙ্গি করা শেষ হলে, তার মুখের পরিবর্তন হচ্ছিল, ঘুরছিল এবং আমাদের সামনে পড়ে গেল—তার মৃত্যু হল।

অনুবাদ: রবীন্দ্রনাথ বসু

রাতের সঙ্গী

The man of the night—এডগার ওয়ালেস

টিক-টক-টক—ইন্সপেক্টরের ডেস্কের পাশে টেবিলের উপরে রাখা ছোট যন্ত্রটার শব্দ হচ্ছে। একটু পরেই থেমে গেল, মনে হল যেন প্রেরিত বার্তার কথা বলার জন্যে ভাবছে। চার্জরুম বেশ শান্ত, এত নির্জন যে ফায়ারপ্লেসের মাথার উপরের ঘড়িটার টক-টক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সেইটা এবং ডেস্কের উপর ইন্সপেক্টরের সামনে হলদে কাগজে কলমের খস খস শব্দ ছাড়া ঘরে আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে,' রাস্তা জনশূন্য। পুব থেকে পশ্চিমে লাইন দিয়ে আলোগুলো আরো নির্জনতা ফুটিয়ে তুলছে।

টিক-টক, টিক-টক, টিক-টক যন্ত্রটা আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল।

ইন্সপেক্টর সোজা হয়ে বসে শুনতেই চেয়ারটায় ক্যাঁ-চ করে শব্দ হল।

দরজায় একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে, সেও শব্দটা শুনতে পেল।

কি ব্যাপার, গিল ? ইন্সপেক্টর জানতে চাইল।

টিকোটি-টিকোটি-টিক-টক—যন্ত্রটা বাজছে আর কনস্টেবল বার্তা লিখে নিচ্ছে:

সমস্ত স্টেশন শর্তাধীনে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী জর্জ টমাসকে গ্রেপ্তার করে আটকে রাখ। বয়স ৩৫ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, রঙ ও চুল কাল, চোখ বাদামী, ভদ্রলোকের মতো চেহারা। গুদাম ডাকাতিতে সন্দেহ করা হচ্ছে। ওয়ালথামস্টো ও ক্যানিং টাউনে এটা বিশেষ করে নোট করে জানাও।

এস. ওয়াই.

এই মাঝরাতে! হতাশায় চিৎকার করে উঠল ইন্সপেক্টর। আমি যা বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে বলেছি এখন তা আমায় ডেকে বলছে। কি রীতি!

আশাহীনভাবে সে মাথা নাড়ল।

বাইরে পাতলা বৃষ্টির মধ্যে একজন লোক রাস্তা দিয়ে আসছে—হাত দুটো পকেটে ঢোকাল, কোটের কলারটা উপর দিকে তোলা, মাথাটা বুক ঝোলানো। পা টেনে টেনে চলেছে, বৃষ্টির জলে তার বুটজুতোর প্যাঁচ-প্যাঁচ শব্দ হচ্ছে, স্টেশনের কাছে আসতেই তার গতি কমে গেল। পুলিশকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে আশা করেছিল কিন্তু অনুপস্থিত।

সিঁড়ির ধাপের সামনে লোকটা একটু অস্বস্তিতে দাঁড়াল, দাঁত ঠিক করে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল।

চার্জরুমের খোলা দরজার সামনে প্যাসেজে আবার সে থামল...।

টমাস সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আমি ভেবেছিলাম সে সৎ জীবন চালাবার চেষ্টা করছে, ইন্সপেক্টরের গলার স্বর ভেসে এল।

এটা তার স্ত্রীর জন্যে, স্যার, কনস্টেবল বলল। তারপর একটানা নীরবতা, কেবল ঘড়ির টক-টক আওয়াজ সে নীরবতা ভঙ্গ করছে।

তাহলে কেন তার স্ত্রী তাকে তালাক দিল?

সে করেছে, স্যার?

কনস্টেবলের স্বরে বিস্মিতভাব কিন্তু প্যাসেজে অপেক্ষমান লোকটি তা শুনতে পায়নি। রং করা দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে, একটা হাত তার গলায়, তার রোগা, দাড়ি না-কামানো সাদা মুখটা ময়লায় ভর্তি, ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে।

সে তাকে তালাক দিয়েছে। তুমি তাকে জান?

একটু স্যার।

সুন্দরী মহিলা। টমাসের থেকে আরো ভাল লোককে বিয়ে করতে পারত।

আমার মনে হয় সে করেছে, নীরস কণ্ঠে কনস্টেবল বলল। তারা দু'জনেই হেসে উঠল।

ওটাই কারণ তাই না? টমাসকে প্যাঁচ কষতে চায়, এ ধরনের কেস শুনেছি।

প্যাসেজে অপেক্ষমান লোকটি গুটি গুটি পায়ে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। তার সমস্ত দেহ কাঁপছে। শেষ ধাপে এসে সে প্রায় পড়ে গেছল, রেলিংটা ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বৃষ্টি পড়ে চলেছে কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আঘাত পেয়েছে, তার চলচ্ছক্তি লোপ পেয়েছে। সে ওয়ার হাউসে ডাকাতি করেছে কারণ তার উন্নতিসাধনের চেষ্টাকে সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। সে ভাল হয়ে চলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই তাকে এই বাঁকা পথ ধরিয়েছে।...এবং যখন সব কাজ শেষ হয়েছে, পুরনো দক্ষতায় সে কোন সাক্ষ্য রেখে আসেনি, তখন সে সোজা পুলিশে গিয়ে খবর দেয় এবং তাকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সেটা কিছু না। স্ত্রীলোকেরা এরকম কাজ আগেও করেছে—হিংসাবশত অথবা কোন সামান্য, সত্যি বা কল্পনায় ভর করে পাগলের মতো রাগবশত—কিন্তু এটা সে করেছে ইচ্ছে করে, বদমাইশি করে কারণ সে আমার থেকে অন্য কোন লোককে বেশি ভালবাসত।

এখন সে আগ্রহহীন, সব ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখছে, মাথা উঁচু করে তাড়াতাড়ি সে পা চালাল যেমন সে চলত যখন সে এক দালালের অফিসে জুনিয়রের কাজ করত আর তার স্ত্রী ছিল বালহামের এক নভেল-পড়ুয়া মেয়ে।

তার মুখের উপর দিয়ে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ছে, সরু জ্যাকেটের কাফটা জলে ভিজে কব্জির সঙ্গে লেগে আছে, উরু থেকে পায়ের গোছা পর্যন্ত তার ট্রাউজারটা ভিজে গেছে। কমার্শিয়াল রোডে সে একটা দোকান জানে যেখানে চীজ, মাখন ও কাঠ বিক্রি হয়। সে এক পেনী দিয়ে একটুকরো পাঁউরুটি ও চীজ কিনেছিল। তার মনে পড়েছে কাউন্টারের পেছনে মহিলাটি একটা ভারী, নতুন শান দেওয়া ছুরি দিয়ে চীজ কেটেছিল—দোকানের দিকে ঘুরে সে ব্যাপারটা ভেবে নিয়েছিল। ঐ ধরনের ছুরি সাধারণত ড্রয়ারের ভেতর থাকে, টাকা-পয়সা রাখার জন্যে দোকানের কাউন্টার সংলগ্ন দেরাজে, শুকনো শুয়োরের মাংস কাটার ছোট করাত, মিল্ক-টেস্টার ও রবার স্ট্যাম্পের সঙ্গে থাকে। সে জানত দোকানের শাটার ফেলা থাকবে, দরজায় তালা দেওয়া থাকবে এবং দরজা ভেঙে ঢোকবার মতো কোন যন্ত্রও তার নেই। তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্তর পুলিশের হাতে, ভগবান জানেন কি করে ডিটেকটিভরা সেগুলো পেল—কিন্তু এখন সে জানতে পেরেছে।

সে নিঃশব্দে ফোঁপাতে লাগল।

তবু একটা পথ নিশ্চয়ই আছে। ছুরিটা দরকার। তার শেষ সশ্রম কারাদণ্ডের সময় থেকে এখনও সে দুর্বল, তার হাত দিয়ে তাকে মারতে পারবে না, সে এত শক্তিশালী ও সুন্দর--ওঃ কি সুন্দর!

এলোমেলো চিন্তা করতে করতে সে দোকানের কাছে এল!

একটা ছোট রাস্তার ধারে দোকানটা। একটামাত্র আলো সমস্ত রাস্তাটাকে আলো দিচ্ছে। টিপ টিপ বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই, কাউকে দেখাও যাচ্ছে না—। শাটার ফেলা দরজার উপরে আলো যাবার একটা ছোট জানালা। সেটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে সে জানল এটাই একমাত্র পথ। কখনও কখনও এগুলো আটকানো থাকে না। পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে জানালার তলার দিকে কাঁচের ফ্রেমের উপর ভর দিয়ে উঠল। জানালার তাকের কিছুর সঙ্গে তার আঙুল

ঠেকল—সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা লাফিয়ে উঠল। একটা চাবি—। সে ভেবেছিল এটা বুঝি একটা তালাবন্ধ দোকান। সে বেশ ভালভাবেই জানত এই সব ছোট দোকানের মালিকেরা এমনই অসতর্ক যে সহজেই যে-কেউ দোকানে ঢুকতে পারে সে ব্যাপারে কোন নিরাপত্তা নেয় না। সে চাবিটা নিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকে আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরের ভেতরটা গরম ও গুমোট, নানা খাবারের তীব্র গন্ধ—চীজ, হ্যাস এবং জ্বালানী কাঠের গন্ধ। তার পকেটে একটা দেশলাই ছিল বটে কিন্তু সেটা স্যাঁতসেঁতে হওয়ার দরুন জ্বলছে না। তাক হাতড়ে একটা দেশলাই পেল। একটা কাঠি জ্বেলে হাতচাপা দিয়ে আগুনটা নিভতে দিল না। দোকানটা ঝাঁট দিয়ে রাতের মতো পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। দাঁড়িপাল্লার পাশে বাটখারাগুলো সুন্দরভাবে সাজান রয়েছে। খোলা মাখনের উপর একটা মসলিন কাপড় চাপা দেওয়া। কাউন্টারের উপর চট করে নজরে পড়ে এমন একটা লেখা নোট রয়েছে। এতে ফ্রেডকে কিছু নির্দেশ দেওয়া রয়েছে—কাঁচা হাতে পেনসিলে বড় বড় করে লেখা। সে আগুন জ্বালাবে, তার উপর কেটলি বসিয়ে দুধ নিয়ে মিসেস স্মিথকে পরিবেশন করবে।

ফ্রেড নামে ছেলেটা খুব সকালে আসে, তার জন্যেই চাবিটা রাখা হয়েছে। এটা লক্ষণীয় যে তার নিজের জন্যে সেই নির্দেশগুলো কাজে লাগাল। কাঠির পর কাঠি জ্বালাতে লাগল, নতুন শান দেওয়া ছুঁচোল ভারী ছুরিটা খুঁজতে লাগল। এবং এমনকি এত সহজে সে দোকানে ঢুকতে পেরে মনে মনে উৎফুল্ল হল এবং শিস দিয়ে গুন গুন করে গাইবার ইচ্ছাও হল।

সে ছুরিটা খুঁজে পেল। কাউন্টারের তলায় এটা ছিল। খবরের কাগজে ভাল করে জুড়ে নিল। তারপর তার খেয়াল হল সে ভীষণ ক্ষুধার্ত! খানিকটা চীজ নিল, কোন রুটি পেল না কিন্তু একটা খোলা বিস্কুটের টিন দেখতে পেল।

হাতে খাবার নিয়ে, পকেটে ছুরি পুরে সে ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। দোকানের পেছনদিকে একটা ছোট বৈঠকখানা ঘর, দরজা খোলা। সে ভেতরে ঢুকল। একটার পর একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাচ্ছে। একমুহূর্ত কি ভেবে গ্যাস জ্বালাল! এটা একটা ছোট্ট ঘর, সস্তা আসবাবপত্তরে সুন্দরভাবে সাজান। ম্যান্টেল-শেলফে কিছু চায়না জিনিস, দেওয়ালে টাঙানো কিছু লিথোগ্রাফ এবং একটা বড় দেওয়াল ঘড়ি। পুলিশ স্টেশনে একটা ঘড়ি আছে...মুখ বিকৃত করল, মনে হল যেন সে যন্ত্রণায় কাতর, হাত দিয়ে ছুরিটা অনুভব করে মৃদু হাসল।

ঘরের মাঝখানে একটা ছোট টেবিলে বসে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আনমনাভাবে খেয়ে গেল।

তার জন্যেই সে সব কিছু করেছে...তার প্রথম অপরাধ...ক্যাশ-বাক্স থেকে কয়েকটা মুদ্রা বার করে নেওয়া। সে-ই তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তার সমস্ত পদক্ষেপের নিচে ছিল তার ছোটখাট বোকামি, সীমালঙ্ঘন ও অহঙ্কার।- --দেওয়ালের দিকে চেয়ে তার এই অধঃপতনের পথ খুঁজে বার করেছিল। [illegible]

কাগজ দেওয়ালে সাঁটা রয়েছে। এতক্ষণ ধরে সেটার দিকে সে চেয়েছিল, কালো এবং সোনালী, সবুজ এবং গাঢ় লাল রঙে ছাপান কাগজটার তলায় বাঁদিকে স্পষ্ট লেখা যে এটা স্যাক্সনীতে ছাপা।

তার চিন্তাধারা ছিল বিস্তৃত কিন্তু অবান্তর সরু পথ দিয়ে চলতেই তার মন চাইল। উদাস দৃষ্টিতে সেদিকে সে চেয়ে রইল, অর্ধচেতন অবস্থায় তার চিন্তাধারাকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করল। তার চিন্তাধারার অর্ধেক অতীতের গতিপথ অনুসরণ করছিল, বাকি অর্ধেক দেওয়ালের কথাগুলোর অর্থ নিরূপণের চেষ্টা করছিল। যে কথাগুলো শুধু বড় হরফে লেখা সেগুলো সে পড়ছিল :

তাকাও—ভেড়া—ভগবান—নিয়ে নয়—পাপসমূহ—পৃথিবী।

ডাকাতির জন্যে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, দু'বার ছ'মাস করে ভাঙার ও ঢোকার জন্যে—। সে তার হাতের কাছে—কয়েক বছর আগে সে গীর্জার সভ্য ছিল, একসঙ্গে গান করত, ধর্মীয় ব্যাপার তার কাছে অর্থবহ ছিল। এটা অদ্ভুত লাগে কি করে একজন বয়স্ক লোকের কাছ থেকে সেগুলো অদৃশ্য হয়। কি করে বিশ্বাসের মধুর দীপ্তি মুছে যায়। মেরিহিবোনের এক রেজিস্ট্রি অফিসে সে তাকে বিয়ে করেছিল। তারপর তাকে নিয়ে ব্রাইটনে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে গেছল। সে খুব ভাল করেই জানত যেভাবে তারা জীবন চালাচ্ছে সেভাবে চালাতে পারবে না। সে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি যে মনিবের টাকা চুরির ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে; যখন ঠাণ্ডা মাথায় এবং কিছুটা কৌতুকের সঙ্গে সে তাকে জানাল তখন চমকে উঠল, থ বনে গেল।

তাকাও—ভেড়া—

ধর্ম কি তাকে আশা দিতে পারত যদি সে শিক্ষাগুলোকে মেনে চলত? আস্তে আস্তে চীজ ও বিস্কুট চিবোতে চিবোতে বাইবেলের অংশের দিকে চেয়ে সে ভাবতে লাগল।

কিছু দুধ দেখতে পেয়ে পান করে উঠে পড়ল। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে কান খাড়া করে ধীরে ধীরে দরজার কাছে গেল। একটু দরজাটা ফাঁক করে উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে নিল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাইরে বেরিয়ে দরজাটা তালা দিয়ে দিল। যেখান থেকে সে চাবিটা পেয়েছিল সেখানে রেখে দিল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বড় রাস্তার দিকে চলল। তার প্রতি পদক্ষেপে নতুন শান দেওয়া ছুঁচোল ভারী ছুরিটা তার উরুতে ধাক্কা লাগছে।

সে একটু অস্বস্তি বোধ করল এবং শুরু থেকে ব্যাপারটা চিন্তা করার চেষ্টা করল। সে ঠিক করল এটা সেই বাইবেলের অংশবিশেষ। আপন মনেই মৃদু হাসল। কিন্তু হঠাৎ তার হাসি স্তব্ধ হয়ে গেল—সে একা নয়।

অন্ধকারের মধ্যে একজন লোক দ্রুত, নিঃশব্দ চরণে তার পাশে পাশে চলেছে।

সে থেমে পড়ল, হাতটা তার পকেটে ছুরির উপর চলে গেল।

কি চাও তুমি? রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

কোন উত্তর নেই। তার মুখটা ছায়ার আড়ালে। কি কাপড় সে পরেছে, কি ধরনের লোক সে, টমাস বলতে পারে না। শুধু এটুকু জানে যে দাঁড়িয়ে আছে সে বেশ লম্বা, চমৎকার দেহের গঠন, স্বচ্ছ গতি। তারা দু'জনে চুপচাপ, তারপর:

এস—রাতের আগন্তুকের মুখ থেকে শব্দটা বেরিয়ে এল। ছিঁচকে চোরটাও কোন প্রশ্ন না করে তাকে অনুসরণ করল।

দু'জনে নিঃশব্দে চলেছে। টমাস লক্ষ্য করল যে পথ সে ধরবে বলে মনে করেছিল সে পথেই সে এগোতে লাগল।

পরে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব, অদ্ভুত স্বরে তাড়াতাড়ি কথাগুলো সে বলল। আমি এর সব শেষ করব—শেষ—শেষ—।

এটা টমাসের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হল না, এ যেন তারই মনের অভিব্যক্তি। তার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল, আগন্তুক সবকিছু জানে।

ও আমাকে ক্রমশ নিচের দিকে নামিয়েছে, তার পাশে চলতে চলতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে টমাস বলল। একটা সরু রাস্তা ধরে তারা এগোতে লাগল, রাস্তাটা নদীর দিকে গেছে। প্রথম প্রথম এটা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলত কিন্তু সে আমার বিবেকের টুঁটি টিপে ধরেছিল, আমার ভয়ে সে হেসেছিল। আমি তোমায় বলছি—সে একটা শয়তান।

লোকেরা বলে, মেয়েটা আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল। আগন্তুক মৃদুস্বরে বলল। তবু মানুষের একটা চিন্তা ও নিজের ইচ্ছা আছে।

টমাস মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিল।

সে কি অবস্থায় আছে, তা আমার জানার ইচ্ছা নেই। তাকে মারলে আমি আবার মানুষ হব। পকেটটা টিপে দেখল যে ছুরিটা তখনও আছে। আমাদের যদি ছেলেমেয়ে থাকত তবে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াত। সে সন্তান ঘৃণা করে।

তার হাত থেকে যদি নিজেকে মুক্ত কর তবে আবার মানুষ হতে পারবে। আগন্তুক বলল। তার গলার স্বর মধুর গম্ভীর ও মর্মঘাতী।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এটাই আমি বলতে চেয়েছি। সে আমার পথের বাধাস্বরূপ। তাকে মারলে আমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারব, কি পারব না? আমি সমস্ত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারব—আমার অসৎভাবকে হত্যা করেছি, আমায় আর একটা সুযোগ দাও—দেখ! সে পকেট থেকে ছুরিটা বার করল। কাগজের মোড়কের উপর বৃষ্টি পড়ার টুপটাপ আওয়াজ হচ্ছে। ছুঁচলো, রুপোর মতো চকচকে ছুরিটা দেখবার ইচ্ছায় উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে।

আমি হাত দিয়ে তাকে মারতে পারব না, তাই ছুরিটা এনেছি। আমাকে একাজ করতেই হবে যদিও কোন কিছু মারাকে আমি ঘৃণা করি। যখন ছোট ছিলাম আমি একটা খরগোশ মেরেছিলাম। তার আতঙ্কে আমার বেশ কয়েকদিন কেটেছে।

নিজেকে তার হাত হতে মুক্ত করলে, আবার মানুষ হতে পারবে, আগন্তুক আবার একই কথা বলল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তাই বলছি—আমি ফিরে যেতে পারব—আমার জানা লোকদের মধ্যে। তারা জানে না আমি কত নিচে নেমেছি। টমাসের গলার স্বর ধরে এল।

তারা চলতে লাগল—একদিক থেকে আর একদিকে, বড় রাস্তা পার হয়ে, সরু গলির মধ্যে যেখানে ফলওয়ালাদের গাড়িগুলো জড় করা, চাকায় চাকায় যেন বাঁধা, পোড়োজমির কাদার উপর দিয়ে।

একটা সরু গলি দিয়ে যাবার সময় একধারা নদীর জল দেখা গেল। দেখল পাশাপাশি তিনটে বজরা নদীর ঢেউ-এর তালে তালে ওঠানামা করছে। মাঝনদীতে একটা স্টীমার দাঁড়িয়ে, তার তিনটে আলো মৃদুভাবে জ্বলছে।

আমি পেছনদিক দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকব, টমাস বলল। এক বুড়ি ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই—অন্তত থাকা উচিত নয়। সামনের ঘরে আমার স্ত্রী ঘুমোয়।

তার হাত থেকে মুক্ত হলে তুমি আবার মানুষ হতে পারবে, আগন্তুক বলল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। অপরাধী অধৈর্য হয়ে উঠল। আমি তা জানি—আমি মুক্ত হলে—আনন্দে হাসতে লাগল।

সে তোমাকে অনেক নিচে টেনে নিয়ে গেছে, রাতের মানুষটি মৃদুস্বরে বলল। ভালর জন্যে যা কিছু করতে গেছ, সে তোমায় পদে পদে বাধা দিয়েছে—।

ঠিক কথা—সেটাই সত্যি।

তুমি কখনও তার কাছ থেকে পালাতে পারবে না, তুমি কর্তব্যনিষ্ঠ, বিশ্বাসী এবং দয়ালু।

ভগবান জানেন তা সত্য, টমাস কাঁদতে লাগল।

ভাল অথবা মন্দের জন্যে, প্রচুর অথবা সামান্যের জন্যে—টমাসের মনে হল আগন্তুক একই সঙ্গে কথাগুলো বলে গেল।

অবশেষে তারা সেই রাস্তায় এসে পৌঁছল, অন্য রাস্তার থেকে আরো অন্ধকার, আরো জঘন্য।

একটা সরু রাস্তার সামনে এসে লোকটি দাঁড়াল, সেটা বাড়ির পিছন দিকে গেছে।

আমি এখন ভেতরে যাচ্ছি। তুমি আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা কর। আমি ফিরে এলে আবার নতুন করে জীবন শুরু করব। খুব তাড়াতাড়ি তাকে মেরে আসছি।

রাতের লোকটি কোন উত্তর দিল না। টমাস সেই সরু রাস্তা ধরে চলে গেল। কাঠের বেড়ার মধ্যে দিয়ে আরো সরু একটা পথ দিয়ে ডানদিকে বেঁকে ভাঙাচোরা পেছনের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

গেটটা খুলে সে ভেতরে ঢুকল। বাড়ির ফেলা ময়লায় ভর্তি একটা উঠানে এসে দাঁড়াল। একটা মুরগী কিছু উলটে ফেলে দৌড়ে পালাল। একটা মোরগ জোরে ডেকে উঠল।

সে জানে পেছনের ঘরটা খালি। জানালাটা ঠেলে উপর দিকে তুলল। একটু ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল। মোরগের আবার ডাকের জন্যে অপেক্ষা করল যাতে এই

শব্দ ঢাকা পড়ে যায়। তারপর সে লাফিয়ে জানালা গলে ঘরের মধ্যে নামল। ছুরির ছুঁচলো মাথায় লেগে পাতলা কাপড়টা ছিঁড়ে গেল এবং সে পায়ে ব্যথা অনুভব করল।

পকেট থেকে ছুরিটা বার করে ধার পরীক্ষা করল। সেই সময় হঠাৎ সে সচেতন হয়ে উঠল, ঘরের মধ্যে কেউ রয়েছে।

ছুরিটা চেপে ধরে অন্ধকারের মধ্যে বাড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বলল, কে ওখানে?

আমি। সে গলা চিনতে পারল, এ হচ্ছে সেই রাতের লোকটির গলার স্বর।

কি করে—কি করে তুমি ভেতরে ঢুকলে? সে বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে গেল।

আমি তোমার সঙ্গে এসেছি। এস, এই মেয়েটার হাত থেকে আমাদের মুক্ত করি—সে তোমাকে নিচে টেনে নামিয়েছে, সে আগাছার মতো তোমার অন্তরের মহত্ত্ব প্রকাশ্যে ব্যাহত করছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ। টমাস ফিসফিস করে হাত বাড়িয়ে আগন্তুকের হাত ধরল।

হাত ধরাধরি করে তারা দু'জনে মেয়েটার ঘরে এল।

ঘরে একটা সস্তা দামের নাইট-লাইট জ্বলছে। সে বিছানায় শুয়ে আছে, একটা হাত ছড়িয়ে বিছানার বাইরে চলে গেছে, বুকটা নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে (সে কিছু দেখেছিল যা একঘেয়েমীভাবে উঠছে আর নামছে; সেটা কি? হ্যাঁ, নদীর উপর বজরাগুলো)।

সাধারণভাবে বলতে গেলে সে সুন্দরী, ঘুমন্ত অবস্থাতেও তার মুখে মৃদু হাসি লেগে আছে। লোকটার নড়াচড়া তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাল—সে একটু নড়ে উঠে বিড়বিড় করে একটা নাম উচ্চারণ করল—এ নাম কিন্তু মাথার দিকে দাঁড়ান লোকটার নাম নয়, যার কম্পিত হাতে ধরা একটা ছুরি।

তুমি ওকে ভালবাস? আগন্তুকেব গলার স্বর অনুচ্চ।

লোকটি মাথা নাড়ল। একসময়—আমি তাই ভাবতাম—কিন্তু এখন—। আবার সে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

তুমি কি ওকে ঘৃণা কর?

চোরটা সাগ্রহে ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে তাকাল।

আমি তাকে ঘৃণা করি না, সাদাসিধেভাবে বলল। আমার কর্তব্য মনে করে তার পরিচর্যা করেছি।

এস—। আগন্তুক বলল। তারা দু'জনে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

টমাস দরজা খুলে দিল, তারা আবার বিষণ্ন রাতের পথে এসে নামল।

আমি তাকে ভালবাসি না, আমি তাকে ঘৃণা করি না। অস্ফুট স্বরে টমাস বলল। আমি তার কাছে গেছলাম কারণ এটা আমার কর্তব্য। আমি কাজ করেছি ও চুরি করেছি—সে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর আমি ভেবেছিলাম তাকে আমি মেরে ফেলব।

ছুরিটা তখনও তার হাতে।

নিঃশব্দে যে পথ দিয়ে তারা এসেছিল সে পথেই তারা চলল যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই সরু পথটায় এল যেটা নদীতে গিয়ে পড়েছে।

সেদিকে তারা ঘুরল।

রাস্তার শেষে কয়েকটা পাথরের সিঁড়ি, তার উপরে জলের ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ তারা শুনতে পেল।

টমাস হাত তুলে ছুরিটা নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সিঁড়ির ধাপ থেকে তাকে কে যেন সম্বোধন করল।

কে তুমি, কোল ?

তার হৃৎস্পন্দন প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। গলার স্বর কঠিন ও খনখনে। ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো পিটপিট করে দেখতে লাগল।

তুমি কি কোল—কে ওখানে ?

টমাস সিঁড়ির কাছে একটা নৌকো দেখতে পেল, তাতে চারজন লোক। নদীর পাড়ে লোহার কড়ায় একজন নৌকোর দড়ি বাঁধতে ব্যস্ত।

আমি, চোরটা বলল।

এ কোল নয়, একজন বিরক্তির স্বরে বলল। কোল এসে পৌঁছবে না—সে মাতাল হয়ে গিয়েছে।

নৌকোয় ফিসফিস কথার শব্দ এল, তারপর একজন কর্তৃত্বের সুরে বলল, চাকরি চাও, ছোকরা ?

টমাস দুটো সিঁড়ি নেমে ঝুঁকে দেখল।

হ্যাঁ, আমি চাকরি চাই।

জোয়ার হাতছাড়া হয়ে যাবার জন্যে একজন কিছু বলল।

তুমি রান্না করতে পার ?

হ্যাঁ, পারি।

বন্দীদশায় সে এই কাজ করেছিল।

লাফিয়ে ওঠ, কাল লেখাপড়া হবে। আমরা ভালপারাইসো যাচ্ছি—তোমার মানানসই হবে তো ?

টমাস নির্বাক।

আমি ফিরে আসতে চাই না—এখানে। সে বলল।

ফিরতি সময়ে আমরা ভাল লোক পাব—লাফিয়ে ওঠ।

সে টলতে টলতে নৌকোয় উঠল। পেছনের চাকার উপর দাঁড়িয়ে অফিসার আদেশ দিল।

নৌকো ছেড়ে দিল এবং তখন চোরটার রাতের লোকটার কথা মনে পড়ল।

সে তাকে আগের থেকে আরো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। জলের ধারে ডাঙায় অন্ধকারের একটা দীপ্তিময় মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

টমাস তার মুখ দেখল সুন্দর ও সদাশয়; মৃদু আলোর আভা যেন তার চারপাশে ঘিরে রয়েছে।

তাকাও—, নৌকোর লোকটা বিড়বিড় করে বলল। এটা অদ্ভুত, কি করে বাইবেলের ঐ অংশটা—বিদায়, বিদায়, মহাশয়—।

বন্ধু, কার সঙ্গে তুমি কথা বলছ? যে নাবিকটা দাঁড় টানছিল সে বলল।

লোক—যে লোকটা আমার সঙ্গে ছিল। টমাস বলল।

তোমার সঙ্গে কোন লোক ছিল না, তুমি একাই ছিলে। নাবিকটা অবজ্ঞার সঙ্গে বলল।

অনুবাদ: রবীন্দ্রনাথ বসু

কবরের প্রেতাত্মা

The other sense—জে. এস. ফ্লেচার

২১শে অক্টোবর—আজ ওরা আমাকে অনিচ্ছাভরে ও স্নেহভরা কণ্ঠে বলল যে আমাকে কাল কোন এক ডাক্তার স্ক্রাইবারের বাড়ি যেতে হবে এবং তার তত্ত্বাবধানে যতদিন না সুস্থ হয়ে উঠি ততদিন আমাকে থাকতে হবে। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার! হায় ভগবান! উনিশ বছরের এক স্বাস্থ্যবান ছেলের সঙ্গে আমার কোন তফাৎ নেই। আমার যতদূর স্মরণ হয় সাত বছর বয়সে একবার হাম হয়েছিল আর কয়েক বছর আগে সামান্য লাল ফুসকুড়িযুক্ত সংক্রামক জ্বর ছাড়া আর কোন রোগই হয়নি। হায়! স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার! না, এটা তাদের একটা পরোপকারিতা দেখানোর পরাকাষ্ঠা! যা তারা আসলে বলতে চেয়েছে: আমাকে যেতে হবে এবং এই ডাক্তার স্ক্রাইবারের সঙ্গে থাকতে হবে। সে যেই হোক না কেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে, তারা এবং অন্য ডাক্তারেরা হালে যাদের তারা প্রায়ই আমাকে দেখাতে নিয়ে আসে, মনে করে যে আমি প্রকৃতিস্থ হয়েছি।

সেটাই প্রকৃত সত্য। মাঝে মাঝে আমি ভাবি—ক্রমে ক্রমে এই যে আমি নিঃসঙ্গ শৈশবাবস্থা থেকে বড় হয়ে উঠেছি, এটা ভাবতে অদ্ভুত লাগে বাচ্চার কাছে সত্য বলা যত সোজা, বড়োর কাছে তত কঠিন—সেটাই আমি এখন বুঝতে আরম্ভ করেছি। এ সত্ত্বেও, যদি আমার অভিভাবক এবং তার স্ত্রী আমাকে বলত—অ্যাঙ্গাস, আমরা ভীষণ দুঃখিত, ডাক্তারেরা ও আমরা তোমার বোধশক্তি যা হওয়া উচিত তা নয়,

এবং ডাক্তার স্ক্রাইবার একজন বিশিষ্ট মানসিক চিকিৎসক; এবং—, সেটা হয়ত আমার বেশি ভাল লাগত।

সত্যিই যদি তারা আমাকে পাগল মনে করত, তখন কিন্তু আমাকে সেকথা বলতে পারেনি। তারা তাই করেছিল। আমি জানি—আমি একবার নয় হাজারবার দেখেছি, দু'বছর আগে আল্‌ট্‌-না-শীয়েল থেকে এখানে লন্ডনে আসার পর থেকে (হায়! কখন আবার দেখব কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়!) মেলায় রঙ্গ দেখার মতো এখানকার লোকেরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের মুখ দেখেই তাদের বিহ্বল করা দৃষ্টি ধরা পড়ে, তাদের ভুরু কুঁচকে ওঠে, তাদের ঠোঁটগুলো আস্তে আস্তে চুপসে যায় অথবা মানিব্যাগের মুখের মতো সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। যদি তারা ভাবে আমি তাদের দেখছি না—তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা নাড়ে ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আমাকে পাগল মনে করার পেছনে তাদের তিনটে ব্যাপার আমার নজরে পড়ে। এক, আমি খুব নির্জনতা পছন্দ করি, সর্বসময়ে একা একা থাকতে ভালবাসি। আর একটা, আমি খুব চিন্তা করি, যেমন খুব পড়াশোনা করি, কখনও চিন্তায় আমার ভুরু কুঁচকে ওঠে, কখনও আপন মনে হাসি, তাদের দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠি। যখন রাতের খাওয়া-দাওযার পর মেজর কেনেডি টাইমস ম্যাগাজিন পড়ে, মিসেস কেনেডি বোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তখন আমার এরকম ব্যবহার তাদের কাছে অদ্ভুত লাগে—এটাও কারণ হতে পারে। কোন কিছু ভেবে হযত আমি মজা পেয়েছি, তখনই আমি জোরে খুব হাসতে থাকি—কেনই বা হাসব না, যখন কোন মজার ব্যাপার দেখে বা ভাবে তখন কি কেউ হাসে না? আর ঠিক সেই সময কেনেডি হঠাৎ বই ফেলে চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে—সত্যি সত্যিই লাফিয়ে ওঠা যাকে বলে। লন্ডনে আমার এমন অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হযেছে যাবা একটু হাসির ইঙ্গিত পেলেই হাসতে থাকে।

এই হচ্ছে দুটো কারণ। আর তৃতীয় কারণটা হচ্ছে—আমার মনে হয দু' একবার তাদের বলেছি যেমন ডাক্তারদেরও বলেছি—আমি মাঝে মাঝে কিছু দেখি যা সাধারণ মানুযেরা দেখে না বা দেখতে পায না। যেমন প্রথমবার আমি বলেছিলাম, আল্‌ট্‌-না শীযেল-এ আমি বার কুড়ি অশরীরী প্রেতাত্মা দেখেছি। তাবা আমাব দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকত যেন আমি মিথ্যে কথা বলছি, তারা অদ্ভুত অস্বস্তিতে আমার দিকে দেখত। আমার বুড়ি নার্স মার্গারেট ল্যাঙ এবং বাবার বুড়ো চাকর ডুনাল্ড গ্রায়ামকে এসব বললে তাদের কোন পরিবর্তন দেখতাম না। মনে হত আমার এসব কথা বলার অর্থ বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে।

আমি আজ ভাবছি তোমার অভিভাবক এবং তার স্ত্রীর কথা শোনার পর থেকে—বেচারা, তাঁর সেই মিলিটারী ধরনের কথা ও স্ত্রীর কান্নার মধ্যে দিয়ে। আমার ফেলে আসা জীবনের কথা প্রথমে শিশু অবস্থায় তারপর বালক বযসে। স্ট্রার্থান পর্বতমালার মধ্যে আল্‌ট্‌-না-শীয়েল একটা নির্জন সঙ্কীর্ণ উপত্যকা, রেলপথের দিক দিয়ে এটা একটা বড় পথ। সেখানে আমার বাবা অ্যাঙ্গাস ম্যাকইন্টায়ার, ঠিক

আমার মতো—বিয়ে করার পর মাকে নিয়ে সেখানে বাস করতে গিয়েছিলেন। আমার জন্মাবার ঠিক পরেই আমার মা মারা যান। আমার বাবা খুব পড়ুয়া ছিলেন এবং মা মারা যাবার পর থেকে দিনরাত বই মুখে পড়ে থাকতেন। ডুগাল গ্রায়ামের সাহায্যে মার্গারেট ল্যাঙ আমায় মানুষ করে তুলেছিলেন। কিন্তু আমার হাঁটতে শেখার পর থেকে মুক্ত প্রকৃতিই আমার সত্যিকারের নার্স ও মা হয়েছিল। উন্মুক্ত পরিবেশে আমি যেখানে সেখানে সারাদিন ধরে বসে থাকতাম—অসীম আকাশ পানে তাকিয়ে,' প্রকৃতির নানা বিচিত্র শব্দ শুনে, ঝোপ-ঝাড়, লতা-গুল্মের বন্য গন্ধ শুঁকে আমি সন্তুষ্ট থাকতাম। সেই পেছনের পানে তাকিয়ে আমি মনে করতে পারছি না কখন আমি সেই সব জিনিস দেখতাম যা অপরে দেখে না। যা দেখেছি তাতে কখনই আমি ভয় পাইনি।

সেই থেকে এখনও পর্যন্ত আমি দেখি তবে বেশ সময় অন্তর। আমার সতের বছর বয়সে বাবা মারা গেলেন। একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় মেজর কেনেডি আমার অভিভাবক হলেন। একুশ বছর বয়স পর্যন্ত আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকতে হয়েছিল। তাই আজ আমি বেজওয়াটারে মেজর কেনেডির বাড়িতে আমার ঘরে বসে ডায়েরীতে এই কথা লিখছি এবং কেন আমাকে কাল উইমব্লেডন কমন-এ ডাক্তার স্ক্রাইবারের সঙ্গে আমাকে থাকতে হবে। খুব সম্ভব এটা আমি লিখছি তার কারণ, যতদূর আমি জানি, আমার পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আজই শেষ দিন। এইসব প্রাইভেট পাগলা-গারদের কি নিযম তা আমি জানি না—অবশ্যি আমি যেখানে যাচ্ছি যদি সেটা তাই হয়।

২

২৩শে অক্টোবর—গতকাল দুপুরে ডাক্তার উইকিনসনের সঙ্গে ডাক্তার স্ক্রাইবারের বাড়ি এসেছি। শেষ ক'দিন এই ডাক্তাব আমাকে প্রায়ই দেখতে আসতেন। কেনেডি পরিবারের সঙ্গে আমার এই বিচ্ছেদ ঠিক যেন ছেলেদের স্কুল বোর্ডিং-এ যাওয়ার মতো। মেজর কেনেডি অন্তত ছ'বার আমাব সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছেন আর মিসেস কেনেডি কেঁদেছেন। বেজওয়াটার থেকে উইমব্লেডন আস'র পথে আমি ও ডাক্তার উইকিনসন ফুটবল খেলার কথা নিয়েই সময় কাটিযেছি, আমি জানতে পেরেছি তিনি অক্সফোর্ডের ব্লু, বছরটা আমি ভুলে গেছি।

ঠিক উইমব্লেডন কমন-এ নামবার আগে আমি ঠিক করেছিলাম ডাক্তার উইকিনসনের সঙ্গে আমার সোজাসুজি কিছু কথা হওয়া উচিত।

দেখুন স্যার, আমি বললাম। আপনি, ডাক্তার গর্ডন এবং মেজর ও মিসেস কেনেডির সঙ্গে একমত হয়ে ভাবেন যে আমি পাগল?

আমার মনে হয় ডাক্তার স্ক্রাইবারের কাছে কয়েকমাস থাকলেই তুমি নিখুঁত স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।

আচ্ছা, এককথায় যখন সত্যিটা বলা এত সহজ তখন কেন লোকেরা সেটা এড়িয়ে যায়?

ওঃ, কেন তারা বলে না? আমি নিজেও সেটা মাঝে মাঝে ভাবি।

অথবা আবার দেখুন, যদি একজনের নিজের ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও কোন গুণ বা ক্ষমতা না থাকে, যা অন্য লোকেরা, প্রায় সব লোকেরাই, অধিকারী হয় না—তারা সেই গুণ বা ক্ষমতাকে অদ্ভুত বলে ভাবে কেন।

তিনি ব্যাপারটা না জানার মতো মাথা নাড়লেন। আমি গভীর ও চিন্তাশীল ভাবনায় ডুব দিলাম। অবশেষে তিনি জানতে চাইলেন আমি কিসের চিন্তা করছি।

আমি ভাবছি স্যার, সেই মধ্যযুগীয় চিকিৎসকদের মতো আপনি কিভাবে প্রশংসনীয় দক্ষতা দেখাতেন, যদি কোন শক্তিশালী রাজা বা রাজনীতিবিদ চাইতেন তাদের কোন শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে এবং তারা যদি তাদের পাগল বলে ঘোষণা করে অন্ধকার ঘরে বা গুপ্তকক্ষে রেখে দেবার জন্যে বলত—।

শোন বাছা, তুমি ডাক্তার স্ক্রাইবারের বাড়িতে কোন অন্ধকার ঘর দেখতে পাবে না। হাসতে হাসতে সে বলল। এই যে এসে গেছি, তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে চারিদিক দেখতে লাগলাম। একটা পুরনো ধরনের লাল ইঁটের বাড়ি। চারিদিকে লতানে গাছ দিয়ে পাঁচিল ঢাকা। সবুজ লনের মাঝে বাড়িটা, নানা ফুলের গাছে ঘেরা, শরতের ফোটা ফুলে গাছ ভর্তি। গারদের মতো কিছু আছে বলে সন্দেহ হয় না, তার বদলে মুক্তি ও স্বাধীনতার রূপ ফুটে উঠেছে। আবার প্রথম দর্শনেই বেজওয়াটারের সঙ্গে এর তুলনা করতে বাধ্য করল।

ডাক্তার স্ক্রাইবার বেরিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি কমবয়সী লোক, বোধহয় পঁয়ত্রিশ কি চল্লিশ বছর বয়স—লম্বা, স্বাস্থ্যবান, চওড়া কাঁধ, তামাটে রং এবং হাসি-খুশি ভাব। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতো সাজ-পোশাকে ফুলবাবু—কিন্তু তিনি যে প্রাইভেট পাগলা গারদের মালিক সেটা বিশ্বাসই হচ্ছিল না। তিনি বেশ বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আমাকে স্বাগত জানালেন। তারপর ডাক্তার উইকিনসন আমাকে বাড়ি ও বাগানটা ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। কেবল বাড়ির কয়েকজন চাকর ও মালীকে লনের শুকনো পাতা ঝাট দিতে ছাড়া আর কাউকে না দেখতে পেয়ে আমি কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলাম।

কোথায় স্যার, আর বাকিরা? আমি জানতে চাইলাম।

বাকি কারা? তিনি আশ্চর্য হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

আপনাদের বাকি পাগল লোকেরা? আমাকে এখানে পাঠান হয়েছে কারণ তারা মনে করে আমি পাগল।

তিনি খুব জোরে হেসে উঠে আমাব পিঠে একটা চাপড় মারলেন।

আরে বুড়ো ছেলে, ছেড়ে দাও ওসব কথা। এখানে কেউ নেই শুধু তুমি, আমি, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট পোলার্ড, যে একজন সত্যি ভাল এবং চাকরবাকরেরা। তুমি এখানে বাতাসের মতো মুক্ত এবং যদি সম্পূর্ণ সময় তোমায় দিতে না পারি তবে সেটা আমার দোষ।

এরপর আমরা গলফ খেলার কথায় চলে গেলাম। আজ তাঁর রুগী দেখার পর, তাঁর বেশ ভালই পশার আছে মনে হল, আমরা সন্ধ্যে নামার আগে পর্যন্ত পুরো চক্কর খেলার সময় পেলাম। তিনি আমাকে দুই একে হারালেন।

৩

২৭শে অক্টোবর—এখনও পর্যন্ত আমি এখানে বেশ সুখেই আছি। এই বাড়িতে এবং ডাক্তার স্ক্রাইবারের সঙ্গে জীবন বেশ আনন্দেই কাটছে। আমার মনে হয় যত লোকের সঙ্গে আমি মিশেছি ইনি তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। আমি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে তাঁর গরীব রুগীদের দেখতে যাই। তাদের সমস্ত নালিশ তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। আমি একথা বলছি না যে তিনি তাদের ঠাট্টা করেন, সংক্রামক ব্যধির মতো তাঁর প্রফুল্লতা তাদের সব দুঃখ-কষ্ট দূর করে। সত্যিই তিনি এক মহৎ লোক!

গতরাতে খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি এবং আমি বিলিয়ার্ড খেলছিলাম। কিন্তু কিভাবে জানি না, লোকেরা আমার মোহাবেশ ব্যাপারে কি বলে সেই কথায় আমরা এসে পৌঁছলাম। আমরা বসে পড়লাম। এই প্রথম আমি তাঁকে এ ব্যাপারে কথা বললাম। তাঁকে বললাম আমি কিছু দেখেছি—বিশেষ করে আর্ডনা সোনাকের গীর্জায় করণিকের প্রেতাত্মা (যদি প্রেতাত্মা হয়)। যেন তিনি তাঁর কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না এভাবে না দেখে (যেমন মেজর কেনেডি দেখতেন) অথবা তাচ্ছিল্যভরে মাথা না নেড়ে (যেমন ডাক্তার উইকিনসন করতেন), তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনে একগাদা প্রশ্ন করলেন আমাকে। আমার সম্বন্ধে বা আমি ঘৃণা করি এরকম প্রশ্ন নয়, বেশ বিচক্ষণের প্রশ্ন।

জানেন, সেগুলো কোন প্রবঞ্চনা নয়। আমি সেসব দেখেছি—তাদের দেখেছি!

আপনি আমায় বিশ্বাস করেন?

হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি। দেখ, এখানে থাকাকালে তুমি যদি কিছু দেখ, ঠিক সেই রকম আমার কাছে এসে জানাবে। এস, শুতে যাবার আগে আর একশো খেলা যাক।

৪

৪ঠা নভেম্বর—আমি এই পুরনো বাড়িটার ভেতর ও বাইরে একটু উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখছি। দিন দুই আগে ডাক্তার স্ক্রাইবার বলেছিলেন এটা একসময় (এক শতক বা তারও আগে) এক বিখ্যাত কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তির বাসা-বাড়ি ছিল। আমার মনে হল এটা জর্জ সম্রাটগণের রাজত্বের গোড়ার দিকে তৈরি সুন্দর বড় বড় ঘর, অনেকগুলোর দেওয়ালে উঁচু পর্যন্ত ওক কাঠের প্যানেল করা। একটা ঘর, আগে যেটা লাইব্রেরী ছিল এখন ডাইনিংরুম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, অন্য ঘরের থেকে সেটাই আমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। এঘরে বাগানের দিকে মুখ করে চারটে সরু মতো উঁচু জানালা আছে। অদ্ভুত অথচ মনোরম পুরনো ওক কাঠের

ফার্নিচার (যেগুলো ডাক্তার স্ক্রাইবার টারেলনামীর তাঁরই পেশার একজন পূর্ববর্তী লোকের কাছ থেকে নিয়েছিলেন, যিনি ডাক্তারের কথা অনুযায়ী একজন চতুর লোক ছিলেন) এ ঘরের রূপ ও বৈশিষ্ট্য বাড়িয়েছে। ঐ যে ফায়ারপ্লেসের কাছে লম্বা ওক কাঠের বেঞ্চিটা রয়েছে, শীতকালের ঠাণ্ডায় ওতে বসে আগুন পোহাতে বেশ ভাল লাগবে।

৫

১৭ই নভেম্বর—কিছু ঘটল।

সেই গতানুগতিক ও নীরস ব্যাপার কিন্তু ব্যাখ্যা সমেত তিনটে শব্দ বেশি অর্থবহ। সত্যি বলতে কি আমার অদ্ভুত অনুভূতির (আলাদা বোধশক্তি মনে হয়) আবার প্রকাশ ঘটল। পাঁচ বছর আগে এমন হয়েছিল যখন ডালনারোসি গীর্জার কাছে আমি পরীদের দেখেছিলাম।

গতকাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি একা ডাইনিংরুমে লম্বা বেঞ্চিটার এককোণে বসে আছি। সেসময় ডাক্তার স্ক্রাইবার লন্ডনে গেছেন এবং মিঃ পোলার্ড রুগী দেখতে গেছেন। ফায়ারপ্লেসের আগুন ছাড়া ঘরে আর কোন আলো ছিল না। আগের দিন ডাক্তারের স্টাডিরুম থেকে একটা পুরনো অদ্ভুত ধরনের বই পেয়েছিলাম। লাঞ্চ খাওয়ার পর থেকে বেশির ভাগ সময় এই বইটা পড়ে কাটাচ্ছি। চোখ বন্ধ করে গদীতে হেলান দিয়ে বসে আছি, ভাবছি আমি কি পড়লাম আর উপভোগ করছি অপ্রচুর আলোয় ভরা ও ছায়াঘেরা ঘরের শান্ত পরিবেশে। হঠাৎ আমার বোধ হল আমি একা নই। বোধশক্তিটা এতই প্রবল ও গভীর যে পুরো এক মিনিট আমি নিথর হয়ে গেলাম। অবশেষে চোখ খুললাম এবং নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলাম আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি।

আমি যা দেখলাম তা এই :

আমার থেকে কয়েক ফুটের মধ্যে বড় কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে এক যুবক আমারই বয়সী কি কিছু বেশি। লম্বা, সামনের দিকে ঝুঁকে এক অশরীরী প্রেতাত্মা। তার পোশাক-পরিচ্ছদ আধুনিক—কালো কোট, ওয়েস্ট কোট এবং স্ট্রাইপ দেওয়া ট্রাউজার—হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ইটন ছেলেদের মতো ঢঙে—কিছুটা জবুথবু ভাব। মাথাটা তার সামনে ঝোলা। প্রথমে তার মুখটা আমি দেখতে পাইনি কিন্তু একটু ঘুরতেই আগুনের আভা তার মুখে পড়ল, তখনই বুঝতে পারলাম আমি ভূত দেখছি!

তার মুখই প্রমাণ করে সে বছর উনিশ বয়সের এক তরুণ ছিল। এক দুঃখময়, অশান্ত মুখ—মুখের উপর উদ্বিগ্ন, কষ্ট, হতাশার ছাপ পরিস্ফুট এবং অদ্ভুত বুড়োটে ধরনের। এটা খুব একটা জোরালো মুখ নয়—চিবুক ছোট ও কৃশ, ঠোঁট দুটো মনোরম কিন্তু দুর্বল, চোখ দুটো বড় ও নীল, ঠিক ছোটদের মতো—একটা ভীতির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

আমি নিস্পন্দ হয়ে বসে দেখছি। মূর্তিটা কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে কার্পেটের উপর

চলাফেরা করল——তারপর আস্তে আস্তে জানালার কাছে হেঁটে গিয়ে খানিকক্ষণ বাইরে বাগানের দিকে দেখল, তারপর আবার কার্পেটের উপর ফিরে এল। সেখানে মিনিটখানেক সময় কাটিয়ে শেষে ঘর পেরিয়ে দরজা খুলে দিল। সেই মুহূর্তে আমি তাকে অনুসরণ করলাম, চাকরেরা হলঘরের আলো তখন জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং হলঘরটা সম্পূর্ণরূপে আলোকিত। কিন্তু হলঘর খালি, সেখানে কোন মূর্তি নেই।

গতরাতে বিলিয়ার্ড খেলা শেষ হবার পর আমি ডাক্তারকে সব কথা বলেছিলাম, তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে সবকিছু শুনে শুধু মন্তব্য করলেন :

অ্যাঙ্গাস, তুমি যদি আবার এই প্রেতাত্মাকে অথবা যাই হোক না কেন দেখ, তখুনি আমায় বলতে ভয় পেও না।

৬

২২শে নভেম্বর——সেই তরুণ যুবকের প্রেতাত্মা আমি আবার দেখেছি।

আমি বিকেলবেলা রাস্তায় একটু বেড়াতে বেরিয়েছি এবং ঘুরতে ঘুরতে উইমব্লেডন গীর্জের কবরে এসে পড়েছি। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছি, স্মৃতিপ্রস্তরগুলো দেখছি আর ভাবছি যদি তাদের কোন অসাধারণ নাম অথবা অদ্ভুত লিপি উৎকীর্ণ করা থাকত; ঠিক সেই সময় হঠাৎ আবার আমি প্রেতাত্মা দেখলাম——গীর্জার পূর্বাংশের শেষে একটা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক আগের মতো পোশাক, একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে——একটু ঝুঁকে, হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে। মুখ সেইরকম দুঃখ ও কষ্ট ভারাক্রান্ত এবং বিহ্বলতায় ভরা। বড় বড় নীল রঙের ছেলেমানুষী চোখ দুটো একবার কবরের দিকে আর একবার কবরের মাথার দিকে দেখছে. মনে হচ্ছে কিছু যেন পড়বার বা দেখবার চেষ্টা করছে। তারপর সমস্ত কবরখানায় চোখ বোলাতে লাগল।

আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। যে কবরের কাছে প্রেতাত্মা দাঁড়িয়েছিল সেই কবরের প্রস্তরখণ্ডের উপর লিপির দিকে তাকালাম——প্রকৃতপক্ষে আমি প্রেতাত্মার কয়েক ফুটের মধ্যে এগিয়ে গেলাম। মনে হল সে যেন আমাকে দেখেছিল——এমনি, উদাসীনভাবে যেন একজন অজানা থেকে অপরের দিকে তাকায়।

লিপিটা ছোট এবং অনাড়ম্বর :

এখানে মেজর জেনারেল স্যার আর্থার ডেবেনহাম, কে. সি. বি.-র দেহ শায়িত;
জন্ম ১৫ই জানুয়ারি ১৮৩১; মৃত্যু ৪ঠা অক্টোবর ১৮৯২।
ফ্লোরেন্স জর্জিয়ানা, তাঁর স্ত্রীর দেহও শায়িত;
জন্ম ১১ ই সেপ্টেম্বর ১৮৩৪, মৃত্যু ৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।
তাঁদের একমাত্র পুত্র ইভরার্ড-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে;
জন্ম ১২ই আগস্ট ১৮৭৪,
মৃত্যু ২৩শে জুলাই ১৮৯৩ হুডিক্সভাল, সুইডেন, যেখানে সে সমাহিত।

যখন আবার মাথা ফিরিয়ে তাকালাম, সে প্রেতাত্মা অদৃশ্য।

আমি সোজা ডাক্তার স্ক্রাইবারের বাড়িতে ফিরে এলাম এবং ঘটনাক্রমে সেই সময়

তাঁকে ঢুকতেই ধরলাম। এই দ্বিতীয়বার প্রেতাত্মার আবির্ভাবের কথা তাঁকে বললে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে কোন মন্তব্য না করে আমাকে তাঁর সঙ্গে বাগানে যেতে বললেন। তিনি মালীর কাছে গেলেন—খুব বুড়ো, বহুদিন এখানে কাজ করছে।

গ্রেগসন, তুমি এখানে বহুদিন বাস করছ, তাই না?

সেই ছেলেবেলা থেকে, পঞ্চান্ন বছর স্যার।

মেজর জেনারেল স্যার আর্থার ডেবেনহ্যামের নাম কখনও শুনেছ?

বুড়ো জেনারেলের নাম স্যার? আমি শুনেছি বৈকি! তিনি তো এখান থেকে আধ মাইল দূরে থাকতেন। আমি তাঁদের সবাইকে জানি। সেই তরুণ ভদ্রলোকটি, বেচারা ইভরার্ড এখানে এই বাড়িতে আপনার পূর্বতন ডাক্তার টারেলের সঙ্গে লেডী ডেবেনহাম মারা যাবার পর কয়েকমাস বাস করেছিল। ডাক্তার টারেল এবং সে কন্টিনেন্টে ঘোরবার সময় মিঃ ইভরার্ড মারা যায় স্যার।

তার কি হয়েছিল—মিঃ ইভরার্ডের?

কি হয়েছিল, স্যার? বলতে পারি তাঁর দ্রুতগতিতে দেহের ক্ষয় হচ্ছিল। সে বরাবর দুর্বল ও ফ্যাকাসে ছিল। ডাক্তারের সঙ্গে বাস করবার পব থেকে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তাই তারা বিদেশে গিয়েছিল যদি কোন কিছু উপকার হতে পারে।

কেন সে ডাক্তার টারেলের সঙ্গে ছিল—তার কি নিজের কোন আত্মীয় ছিল না যেখানে গিয়ে থাকতে পারে?

তারা বলত স্যার, তাদের কোন আত্মীয়-পবিজন নেই। ডাক্তাব টারেল বুড়ো জেনারেলের চিকিৎসক ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীরও। কাছাকাছি তিনিই একমাত্র তাঁদের বন্ধু ছিলেন স্যার। তারা একটু বিচিত্র ধরনের ছিল—বুড়ো ভদ্রলোক এবং লোকে বলত তাঁর স্ত্রী ছিল খামখেয়ালী।

জেনারেল কি ধনী ছিল?

গ্রেগসন মাথা চুলকাল। বলল, তিনি প্রাণবন্ত মানুষ ছিলেন স্যার, সব সময়ে একই রকম। তিনি গাড়ি রাখতেন, ইত্যাদি।

আরো কিছু প্রশ্ন করে ডাক্তার চলে গেলেন। কিন্তু সেই থেকে আমি গ্রেগসন ও বাড়ির পরিচারককে নানা প্রশ্ন করতাম। তাদের বর্ণনা অনুযায়ী ইভরার্ড ডেবেনহামের সেই অশরীরী প্রেতাত্মা যাকে আমি দু'বার দেখেছি।

৭

২৮শে নভেম্বর—আমার মনে হয় মেজর কেনেডিও কি এখন বিশ্বাস করবেন যে আমার সাধারণত অদৃশ্য কিছু দেখার অদ্ভুত শক্তি আছে।

গতকাল বেলা দুটো নাগাদ যখন ডাক্তার স্ক্রাইবার, মিঃ পোলার্ড এবং আমি লাঞ্চ খাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ আমি সেই প্রেতাত্মাকে ডাইনিংরুমে ঢুকতে দেখলাম।

খুব নিঃশব্দে সে এল—তার স্বাভাবিক ঝুঁকেপড়া ভঙ্গিমায়। ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে থেমে গেল এবং অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক দেখতে লাগল। তার মুখের ভাব আরো উদ্বিগ্ন, দৃষ্টি হতাশায় জর্জরিত।

আমার সঙ্গীরা আমাকে ছুরি-কাঁটা টেবিলে রেখে একদৃষ্টে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল।

কি হয়েছে, অ্যাঙ্গাস? ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

আবার এখানে এসেছে! আমি উত্তর দিলাম। মিঃ পোলার্ড এই সময়ের মধ্যে এ ব্যাপার জেনে ফেলেছেন।

কোথায় সে?

আপনার এবং দরজার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে কোথায় যাবে সে জানে না বা কি করবে বা যেন কাউকে বা কিছু খুঁজছে।

খুব ভালভাবে দেখ, তারপর আমাদের বল কি ঘটে।

তখন আমি প্রেতাত্মার গতিবিধি তাঁদের বলতে লাগলাম।

সে হেঁটে জানালায় গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে বাগান দেখছে—এখন সে আগুনের কাছে কার্পেটের উপর এল, আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে—এখন সে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে—।

ওকে অনুসরণ কর, ডাক্তার বললেন।

আমরা তিনজনেই টেবিল ছেড়ে প্রেতাত্মাকে ঘরের বাইরে অনুসরণ করতে লাগলাম। এবার সে অদৃশ্য হল না, তার পরিবর্তে সে হলের ভেতর দিয়ে গিয়ে ডানদিকে ঘুরে ডাক্তারের স্টাডিরুমে গেল।

সে কি করছে? আমরা ভেতরে ঢুকলে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

আপনার ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার চেয়ারের দিকে দেখছে। মনে হচ্ছে আগের থেকে আরো বেশি বিহ্বল। এবার সে ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে ম্যান্টলপিসের উপর কিছু যেন খুঁজছে—এখন সে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

অনুসরণ কর।

প্রেতাত্মা হলের ভেতর দিয়ে বাগানে গেল—আমরা তিনজন তার খুব কাছে কাছে যাচ্ছি। দরজার বাইরে সিঁড়ির উপর একমুহূর্ত দাঁড়াল। খুব মনমরা দেখাচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে বাগান পার হয়ে লনের মাঝখানে দু'-একবার ঘুরল। এখন সে আরো ঝুঁকে পড়েছে, এবং তার মাথাটা সামনের দিকে এমন ঝুঁকে পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন কোন কষ্ট বা ব্যথা পাচ্ছে। হঠাৎ সে ঘুরে একটা সরু পথ দিয়ে এগোতে লাগল যেখানে বাগানের ময়লা ফেলা হয়। তার আরও গতিবিধি আমি সঙ্গীদের বলতে লাগলাম।

সেই সরু পথ দিয়ে সে সামার-হাউসের দিকে যাচ্ছে—এবার সে সামার-হাউসের ভেতরে ঢুকল—সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে দেখাচ্ছে যেন আরো হতাশা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে—এখন সে—ওঃ।

কি দেখছ, অ্যাঙ্গাস? ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন।

সে চলে গেছে—অদৃশ্য হয়েছে।

আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম।

পোলার্ড, এ সম্পর্কে তুমি কি ভাব? ডাক্তার জানতে চাইলেন।

অদ্ভুত! বিচিত্র!

এর বেশি কেউ কিছু বললেন না। এরপরেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দু'জন একসঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। ঘন্টাখানেক পরে তাঁরা ফিরে এলেন। সঙ্গে একজন ছুতোর ও তার সহকারী এবং আরো দু'জন লোক যাদের দেখে মনে হচ্ছিল তারা মাটি খোঁড়ার মজুর। ডাক্তার স্ক্রাইবার আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বললেন এবং তিনি আমাদের সামার-হাউসে নিয়ে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হলে তিনি ছুতোরকে বললেন:

আমি চাই এ জায়গাটা খুঁড়তে হবে, যতক্ষণ না বলব খোঁড়া থামবে না। এখুনি শুরু কর।

ছুতোর ও তার লোকেদের মেঝে খুঁড়তে বেশি সময় লাগল না কারণ চৌকো পাইন কাঠ দিয়ে তৈরি যা সহজে সরান যায়।

তারপর তারা খুঁড়তে আরম্ভ করল।

এই ভয়ঙ্কর অনুসন্ধানের বিবরণ লেখার কোন দরকার নেই। আমরা একজন তরুণের মৃতদেহ পেলাম যার প্রেতাত্মা আমি বেশ কয়েকবার দেখেছি। এর পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিক প্রেতাত্মার মতো। গ্রেগসন তৎক্ষণাৎ সেটা ইভরার্ড ডেবেনহামের বলে সনাক্ত করল।

ডাক্তার স্ক্রাইবার স্বরাষ্ট্র দপ্তর, পুলিশ ও করোনারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

৮

৩০শে নভেম্বর—করোনারের অনুসন্ধান সবেমাত্র শেষ হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অভিজ্ঞ লোক, একজন বিখ্যাত ডাক্তার, বলেন যে ইভরার্ড ডেবেনহামকে বিষ খাওয়ান হয়েছিল, এবং জুরিগণ ডাক্তার টারেলের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত হত্যার রায় দেন। দেখা যায়, ইভরার্ডের বিবাহ ও সন্তান জন্মের পূর্বে তার মৃত্যু ঘটলে মেজর ডেবেনহামের যাবতীয় সম্পত্তি তারই হবে। আমরা শুনেছি ডাক্তার টারেলকে এডিনবরাতে গ্রেপ্তার করা হয়। ডাক্তার স্ক্রাইবারের কাছে তার এই বাড়ি বিক্রি করে সেখানে বাস করতে থাকে।

৯

২১শে মার্চ—অ্যালাসিও, ইটালি—বিকালে এখানে পৌঁছে ইংরাজী কাগজে দেখি গত সপ্তাহে ওয়ান্ডসওয়ার্থ বন্দীশালায় ডাক্তার টারেলের ফাঁসি হয়েছে এবং তিনি স্বীকারোক্তি করে গেছেন। এছাড়াও অন্য লেখার মধ্যে যে অদ্ভুত পরিস্থিতিতে এই অপরাধ আবিষ্কার হয় সে ব্যাপারে মন্তব্য করা হয়।

কিন্তু সেগুলো আমার কাছে কিছুই অদ্ভুত নয়।

অনুবাদ: রবীন্দ্রনাথ বসু

তোমাকেই চিরদিন ভালবাসব

I'll love you—always—এ্যাডোব জেমস্

ছেলেবেলায় আমি যখন ব্যাটমভিলে বাস করতাম তখন মর্গানের বাগানবাড়িটা ভুতুড়ে বলে জানতাম।

কিন্তু গত বছর শরৎকালে সেই বাড়িটা যখন আমি কিনলাম তখন ভূতের ভয় কোনরকম বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

আসলে নিউইয়র্ক শহরের গরম, গোলমাল আর আর্দ্র আবহাওয়া আমার ভাল লাগত না এবং সহ্য হত না। তার উপর একটা থিয়েটারে নাট্যপরিচালক হিসাবে আমাকে সপ্তায় নটা নাটকের অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে হত।

মর্গানের ভূসম্পত্তির এজেন্টকে সঙ্গে করে আমি একদিন গাড়িতে করে দেখতে গেলাম বাড়িটাকে। মাঠের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা ধরে গাড়ি আমাদের এগিয়ে চলল। মাঝখানে একটা ছোট নদীর কাঠের পুল পার হলাম।

অবশেষে এক জায়গায় গিয়ে গাড়িটা থেমে গেল। আমি দেখলাম গাছগুলোর আড়ালে পুরনো আমলের বড় বড় থামওয়ালা বাড়িটা একা দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে বৃত্তাকার যে উঠোনটা একদিন সবুজ পান্নার মতো ঘাসে ঢাকা ছিল, আজ সেখানে কত আগাছা গজিয়ে উঠেছে। বাড়িটার দু'পাশে সুগন্ধি ফুলেভরা কয়েকটা ম্যাগনোলিয়া গাছ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। উঠোনের মাঝখানে নিগ্রো ভৃত্যের এক পাথরের প্রতিমূর্তি অতিথিদের ঘোড়ার লাগাম ধরার জন্য দু' হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি এজেন্টকে বললাম, আমি কিনব বাড়িটাকে।

এজেন্ট বলল, বাড়িটার ভিতরে গিয়ে একবার দেখবেন না?

আমি বললাম, কোন দরকার নেই, দালাল বলেছে বাড়িটার অবস্থা ভালই আছে।

এজেন্ট টুপি খুলে মাথা চুলকে বলল, বাড়িটাকে ঠিক করতে কিছু টাকা খরচ হবে।

বাড়িটার দিকে আবার তাকালাম আমি। শেষ অপরাহ্ণের রঙীন সূর্যের নরম আলো আলোকিত করে তুলছিল বাড়ির প্রান্তভাগগুলোকে। গৃহযুদ্ধের আগে বাড়িটাকে কেমন দেখতে লাগত তা আমি কল্পনায় ভাবতে লাগলাম আবার এটা মেরামৎ করার পর কেমন দেখতে লাগবে তাও ভাবতে লাগলাম। আমি আবার বললাম, বাড়িটা আমি কিনব।

এজেন্ট বলল, তাহলে আগামী সপ্তার মধ্যেই কাগজপত্র সব ঠিক করে ফেলব।

দশ দিন পর বাড়িটা আমার দখলে চলে এল। বাড়িটা ভালভাবে সারাবার জন্য আমি দশজন লোক নিযুক্ত করলাম। তিনজন মেয়েলোক বাড়ির ভিতরটা পরিষ্কার করতে লাগল। দেখতে দেখতে সপ্তা দুয়েকের মধ্যে বাড়িটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বাড়িটার উপর থেকে পঞ্চাশ বছরের পুঞ্জীভূত সব ধুলো-ময়লা উঠে গেল। পরিত্যক্ত বাড়িটা থেকে দীর্ঘকাল পর আবার ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে লাগল।

পীয়ের স্যাভোর নামে আমার এক ফরাসী সহকারী নিউইয়র্ক থেকে এসে আমার কেনা বাড়ির ভিতরকার সাজসজ্জা তদারক করতে লাগল। পুরনো আমলের বাড়িটার ভিতরে এক হলঘরে গিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি আর একশো বছর আগেকার টালিগাঁথা মেঝেটা সে প্রথমে দেখেই চমকে ওঠে। বাড়িটার মধ্যে ৫৫ ফুট লম্বা ও ৩৫ ফুট চওড়া দশখানা শোবার ঘর আছে আর আছে এক বিরাট পড়ার ঘর। প্রায় কয়েক সপ্তা ধরে ঘরগুলো সাজাবার জন্য আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম কেনার জন্য শহরে যাওয়া-আসা করতে লাগল পীয়ের।

একদিন বাড়ির উঠোনে আমি একা ঘোরাঘুরি করতে করতে দেখলাম উঠোনের শেষ প্রান্তে একটি পুকুরে দুটি জেলে মাছ ধরছে। তারাই আমার বাড়িতে প্রথম অতিথি। আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্যে এগিয়ে যেতেই তারা ছিপ দাঁড়া ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। অথচ আমি বলতে চেয়েছিলাম তারা ইচ্ছামতো যখন তখন এসে এ পুকুরে মাছ ধরতে পারে।

এরপর টড জনসন নামে একজন সাংবাদিক এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। সে 'ব্যাটসভিল বেকন' কাগজে কাজ করত। আমার 'মর্গান ম্যানসন' কেনার ব্যাপারটাকে অবলম্বন করে ইনিয়ে-বিনিয়ে একটা কাহিনী রচনা করতে চায়। টড ছিল আমার ছেলেবেলাকার পরিচিত। সে কয়েক পাত্র মদ খাওয়ার পর একথা-সেকথা বলার পর অবশেষে হঠাৎ মর্গানের বাড়িটার কথা তুলল।

চশমার ফাঁক দিয়ে আমার পানে বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাকিয়ে টড প্রশ্ন করল, মেয়েটিকে এখনো দেখনি হয়ত? দেখেছ কি?

আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম, কোন্ মেয়ের কথা বলছ?

টড বলল, কেন, স্যালি মর্গান। তার নাম শোননি? সে-ই তো এখানে ভূত হয়ে আছে।

আমার মনে পড়ছে না।

টড জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় মনে আছে তোমার। যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখন জনি মর্গানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। মেয়েটি জনিকে ভালবাসত বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে তার নিজের কয়েকজন জ্ঞাতি ভাই আর জনির কয়েকজন বন্ধুকেও ভালবাসত। স্যালি আবার কয়েকজন নিগ্রোর সঙ্গেও মেলামেশা করত। লোকে বলে তার স্বামী তার এই সব অবাধ ভালবাসাবাসির কথা জানত না। পরে জনি যখন

যুদ্ধে যায় আর সরকারী সেনাবাহিনী এ অঞ্চলে এসে শিবির স্থাপন করে তখন স্যালি আবার আমেরিকান সৈন্যদের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকে।

এই সময় টডের গলায় মদ আটকে গিয়ে বিষম লাগায় সে কাশতে লাগল। কাশি থামলে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে টড আবার বলতে লাগল, উত্তরাঞ্চলের কোন এক সামরিক হাসপাতালে সে যখন ছিল তার কানে স্যালির কথাটা ওঠে।

তা শুনে জনি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আড়াইশো মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরে এসেই সিঁড়ির উপর স্যালিকে দেখেই তাকে গুলি করে মারে। স্যাল সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। জনি তাকে সেইদিনই কবর দিয়ে দেয়। মৃত্যুকালে তার স্বামীকে অভিশাপ দেয় স্যালি। বলে, জীবনে তুমি আর কোন মেয়ে নিয়ে সুখে ঘর করতে পারবে না।

এ কথায় কান দেয়নি জনি। যুদ্ধ শেষ হতেই সে আবার স্টুয়ার্টবংশীয় এক মেয়েকে বিয়ে করে। বাইরে মধুচন্দ্রিমা কাটিয়ে আসার পর নতুন স্ত্রীকে নিয়ে এই বাড়িতে ওঠে জনি। নতুন গৃহিণীকে বরণ করার জন্যে হলঘরের দু'ধারে সার দিয়ে বাড়ির ঝি-চাকরেরা দাঁড়িয়েছিল।

জনি যখন তার নববধূকে নিয়ে উপরতলায় শোবার ঘরে যাবার জন্য সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল তখন সিঁড়ির উপর চাতালটায় স্যালিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাকে দেখে নতুন বউ আর সব ঝি-চাকরেরা একযোগে ছুটে পালিয়ে যায় বাড়ি থেকে। জনির খুব সাহস ছিল, সে পালায়নি। সে স্তম্ভিত হয়ে সেইখানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণভাবে দেখতে থাকে স্যালিকে। সে আশ্চর্য হয়ে যায়। সে তো নিজের হাতে স্যালির কবরের উপর মাটি দিয়েছে। মৃত মানুষ কখনো উঠে আসতে পারে কবর থেকে ?

জনি নড়াচড়া করেনি। সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল। স্যালি নাইটগাউন পরা অবস্থায় ধীর পায়ে উপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে আলিঙ্গন করে তার স্বামীকে! বব রয় নামে একজন চাকরের খুব সাহস ছিল। সে প্রথমে পালিযে গেলেও পরে কি হচ্ছে তা দেখার জন্য আবার ফিরে আসে। সে একটু দূরে থেকে দেখে তার মালিক জনি ভূতটাকে তাড়াবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও পারেনি। স্যালি তার স্বামীকে ছেড়ে কিছুতেই যাবে না। অবশেষে স্যালিকে নিয়েই উপরতলার শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকে জনি।

পরদিন সকাল হবার আগেই শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসে জনি। সে সম্পূর্ণরূপে পাগল হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরেই সে আস্তাবলে গিয়ে নিজেকে গুলি করে হত্যা করে। বাড়ির চাকরেরা স্পষ্ট শুনতে পায় গুলির শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্যালি খুব জোরে হেসে ওঠে। স্যালিকে তখন চোখে দেখা না গেলেও তার হাসির শব্দে গোটা বাড়িটা ফেটে পড়তে থাকে। তার পর থেকে স্যালি এ বাড়িতে কুড়িজন লোকের প্রাণ সংহার করেছে। এই সব মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রার্থনার স্তোত্র গানের এক গায়ক যাজকও ছিলেন যিনি এখানে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

কিছুক্ষণের জন্য আমরা চুপ করে বসে রইলাম। আমার ছেলেবেলায় স্যালির এই যৌনজীবনের এই সব খুঁটিনাটি আমি কিছুই শুনিনি কিন্তু এ কাহিনী মোটেই আমার বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল না। মনে হলো নিউইয়র্কের যুবকদের এক চটুল প্রেমের বাতিকগ্রস্ত এক প্রেতিনী অধ্যুষিত এই ভুতুড়ে বাড়ির চমকপ্রদ কাহিনী শুনতে খুব ভাল লাগবে।

টড আমাকে লক্ষ্য করছিল। সে আমার মুখে হাসি দেখে আমার অবিশ্বাসের কথাটা বুঝতে পারল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আমি এসব বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু কয়েকটা কারণের জন্যই বিশ্বাস করতে বাধ্য হই আমি।

অবিশ্বাসের সুরে আমি বললাম, বলে যাও।

আমার এই অবিশ্বাস থেকে আমি বেশ মজা পাচ্ছিলাম।

টড বলতে লাগল, এক নম্বর কারণ হলো স্যালিকে এবাড়িতে বেশ কয়েকবার দেখা গেছে, সম্প্রতি বছরখানেক আগেও একবার দেখা যায়। দু' নম্বর কারণ হলো কুড়ি বছরের মধ্যে তোমাকে নিয়ে পাঁচজন লোক এই বাড়িটা কিনেছে। তুমি হচ্ছ পঞ্চম ক্রেতা। তুমি ছাড়া আগেকার মালিকদের তিনজনই স্বীকার করেন এ বাড়িটা ভুতুড়ে ; আর একজন কোন কথা বলেনি, সে শুধু আত্মহত্যা করে।

টড চলে যাবার পর আমি স্কচের খালি বোতলটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম টড কেন ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করে। ভাবলাম মদের নেশার ঘোরেই সে এই সব অবিশ্বাস্য কাহিনী সত্য বলে বিশ্বাস করে।

এক মাসের মধ্যে এই নির্জন বাগানবাড়িটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠল। নিউইয়র্ক থেকে পীয়ের পোশাকের কাপড়ের কিছু নমুনা, আমার সই করার জন্য চেকবই, আমার পাঁচজন বন্ধুকে নিউইয়র্ক থেকে নিয়ে এল। আমার এই বাড়ি কেনার কথা তারা সবাই শুনেছিল।

সেদিন রাতে হোটেলে খাওয়ার পর কফি খেতে খেতে স্যালির কাহিনীটা তাদের শোনালাম। কাহিনীটা তাদের সকলেরই ভাল লাগল। সবাই বেশ উপভোগ করল। ভাবলাম এ কাহিনী নিউইয়র্কের পরের সপ্তাতেই ছড়িয়ে পড়বে শহরে। আর সত্যিই কয়েক দিন পরে আর্ল উইলসন ও উইঞ্চেলের কাগজে এ কাহিনী সংক্ষেপে প্রকাশিত হয়।

আমি তখনো এ বাড়িতে বাস করতে শুরু করিনি। হোটেলে থেকেই বাড়ির মেরামতের কাজকর্ম দেখাশোনা করতাম দিনের বেলায়। দেখলাম যে হারে কাজ হচ্ছে তাতে সপ্তাহখানেক পরেই এ বাড়িতে এসে বসবাস করতে পারব।

আমার এই নতুন বাড়িতে আসার প্রথম দিন রাত্রিতে আমি আমার পড়ার ঘরে আগুনের ধারে বসে একটা নাটক পড়ছিলাম। নাটকটা থিয়েটারের এক এজেন্ট আমাকে পাঠিয়ে দেয়। এক নিবিড় তৃপ্তি আর আনন্দের অনুভূতি ফুটে উঠেছিল আমার চোখে-মুখে। মোট কথা আমার নতুন বাড়িতে এসে আমি খুব সুখে ছিলাম।

ঘরের বাইরে গাছেদের কানে কানে বাতাস অন্ধকারে ফিস ফিস করে যে সব

কথা বলছিল আমি তা শুনছিলাম। ঘরের ভিতর আগুনের শিখাগুলি তাদের অলস জিব বাড়িয়ে কাঠগুলোকে যখন লেহন করছিল আমি তখন তা দেখছিলাম।

জীবনে প্রথম আমি এই নিজের বাড়িতে থাকার সুখ অনুভব করছি। আমি বুঝলাম কবিরা কেন বাড়ি নিয়ে এত কবিতা লেখে।

অবশেষে আমি শুতে চলে গেলাম। বিছানায় শোবার পর আমার মনে হলো এইটাই হয়ত স্যালির শোবার ঘর ছিল। শোবার ঘর নয়, যেন তার যৌনজীবনের লীলাভূমি।

ভাবতে ভাবতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম আমি। হঠাৎ চোখে এক ঝলক আলো লাগায় ঘুম ভেঙে গেল আমার। আমি চমকে উঠলাম। দেখলাম আমার সামনে স্যালি দাঁড়িয়ে। সত্যিই অসাধারণ তার সৌন্দর্য। তার ঠোঁট দুটো ছিল সিক্ত, জাম রঙের চুলগুলো পিঠের উপর ঝর্ণাধারার মতো নেমে এসেছে, তার চোখগুলো ছিল চকচকে সবুজ। তার সুডৌল সুপুষ্ট স্তন দুটি সোনালী অশ্রুস্তম্ভের মতো জমাট বেঁধে আছে তার বুকের উপর। তার গায়ের নাইট গাউন ছিল খুবই পাতলা। তার ভিতর দিয়ে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লাবণ্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তার প্রতিটি অঙ্গ ছিল যেন এক অফুরন্ত যৌন আনন্দের এক একটি গোপন উপত্যকা।

আমি উঠে বসলাম। চিৎকার করে বললাম, কে, কে তুমি? কি করছ এখানে?

আমার গলা থেকে শুধু এই কথাগুলি বেরিয়ে এল কোনরকমে।

তার ঠোঁট দুটো বাতির আলোয় চকচক করছিল। সে স্পষ্ট গলায় বলল, তুমি তো ডন স্পেনসার, নাট্যপরিচালক। তাই না?

আমি একটু সাহসে মুখের উপর হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম স্যালির প্রেতাত্মা। তারপর দেখলাম এক জীবন্ত মানবীর দেহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আমার সামনে। আমার মনে হলো, স্যালি নয়, নিউইয়র্কের কোন যুবতী আমাকে ভয় দেখিয়ে ঠকাতে এসেছে।

তার পোশাক ও দেহ থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছিলাম না আমি। আমি বললাম, কে তোমাকে পাঠিয়েছে সুন্দরী?

আমার কথা শুনে নারীমূর্তিটি হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সে বিস্ময়বিমূঢ় কণ্ঠে বলল, কে আবার আমায় পাঠাবে! কি বলছ তুমি? আমি নিজেই এসেছি।

তার কণ্ঠস্বর মানুষের কণ্ঠস্বরের মতোই স্পষ্ট এবং বাস্তব ছিল। তার কণ্ঠস্বর শুনে আমার মনে হলো এই নারী হয়ত কোন অভিনেত্রী, আমাকে ঠকাতে এসেছে। তবে তাকে আমি কখনো দেখিনি এর আগে বলে একটা সন্দেহ হলো। আবার মনে হলো সে হয়ত স্থানীয় কোন সুন্দরী যুবতী এক চটুল প্রেমের ছলনা দিয়ে আমার মন ভুলিয়ে এক গোপন সুড়ঙ্গপথ ধরে অভিনেত্রীরূপে নাট্যজগতে প্রবেশ করতে চায়।

মনে মনে আমি যখন এই সব কথা ভাবছিলাম তখন আমার দৃষ্টি কিন্তু সর্বক্ষণ নিবদ্ধ ছিল সেই নারীমূর্তির উপর। তার দেহ, তার চেহারা, চোখ-মুখ, তার কণ্ঠস্বর—সব

মিলিয়ে অভিনেত্রী হবার তার যে স্বাভাবিক যোগ্যতা আছে তাতে সে এমনিতেই যে কোন নাটকে অভিনয়ের সুযোগ পেতে পারে। আমি তাকে তার কাছ থেকে কোন প্রতিদান না নিয়েই যে কোন একটা নাটকে অভিনয়ের সুযোগ দিতে পারি।

সাহস করে আমি কথা বললাম আবার। আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম, তুমি ভুল করছ। আগে তোমার পরিচয় দেওয়া উচিত। আমার নাম ডন স্পেন্সার এবং আমি একজন নাট্যপরিচালক একথা ঠিক। কিন্তু আমি তোমাকে মোটেই চিনি না।

আমার আপাদমস্তক ভাল করে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে নারীমূর্তি বলল, আমার নাম মিস লেল্যান্ড।

আমি দেখলাম তার মুখের উপর হাসি ফুটে উঠল। সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল এবং হঠাৎ বাতির আলোটা নিবিয়ে দিল।

সব কিছুই অন্ধকার হযে গেল। আমার বিছানাটা একটু দুলে উঠল। তারপর সে আমার বিছানার উপর উঠে আমার পাশে এসে শুল। তার নরম দেহের উত্তপ্ত স্পর্শ আমি অনুভব করলাম। এ দেহ রক্ত-মাংসের কোন মানবীর ছাডা আর কারো হতে পারে না। এ দেহ কখনই কোন ভূত-প্রেতের হতে পারে না।

ভূতের কথাটা মন থেকে আবার মুছে যেতে আমার মনে অন্য একটা ভয এসে গেল—এ যুবতী যদি অবিবাহিতা হয তাহলে তার বাবা আমার বিরুদ্ধে মামলা করবে, আবার যদি বিবাহিতা হয তাহলে একদিন তার স্বামী তার পিছু পিছু এসে আক্রমণ করবে আমাকে।

পরদিন সকালে আমি ঘুম থেকে ওঠার কিছু আগেই মিস লেল্যান্ড চলে যায আমার ঘর থেকে। গত রাতের অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে গিয়ে আমার শুধু এই কথাই মনে পডে যে সারারাত ধবে আমি যেন একটা খাঁচার মধ্যে এক বাঘিনীব নখদন্তের ভযাবহ তীক্ষ্ণতা হতে নিজেকে মুক্ত করাব জন্য হাঁকপাক করেছি।

সে তীক্ষ্ণতা ভযাবহ হলেও ভাল লেগেছে আমার। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। পরদিন রাতে সে না আসায হতাশ হলাম আমি। যে অনুভূতি সে আমায দিয়ে গেছে, সে আস্বাদ আবার প্রাণভবে পেতে চাইলাম আমি। তার কথা ভেবে সারারাত ঘুম হলো না আমাব। পর পব কযেকটি বাত সে এল না। তার কথা ভেবে কোন রাতে ঘুম আসত না আমার। এইভাবে পবপর কযেকটি বিনিদ্রপ্রায রাত্রি যাপনের পর আমি তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলাম।

মাঠে যে সব লোক কাজ কবছিল তাদের একদিন জিজ্ঞাসা করতে তারা হতবুদ্ধি হয়ে মাথা চুলকাতে লাগল। তারা সারা ব্যাটসভিল অঞ্চলের মধ্যে ঐ নামে কোন মেয়ের অস্তিত্ব আছে বলে জানে না। এ নাম তারা কখনো শোনেনি। আমার বাড়ির চাকর-বাকরেরাও এ বিষয়ে কিছুই বলতে পাবল না।

যাই হোক, মূর্তিমতী এক সুখস্বপ্নের মতো পরপর চারদিনের পর পঞ্চম দিন রাত্রিতে দরজা খুলে ধীর পাযে হাসি মুখে আমার শোবার ঘরে এসে দাঁডাল। তখন

আমি বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলাম। ঘরে ঢুকেই সে বলল, তুমি আমার খোঁজ করছিলে।

তার কথা শুনে মনে হলো গরম দুধের পাত্র পাওয়া বিড়ালের মতো সে খুশি এবং তৃপ্ত।

আমি ঘাড় নাড়লাম। সে তখন তার পাছার উপর হাত দিয়ে একদিকে ঘাড়টা বাঁকিয়ে বলল, তুমি কেন আমার খোঁজ করছিলে বল তো?

আমি কেন তাঁর খোঁজ করছিলাম তা বললাম।

সে হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ সে গাউনটা খুলে আলো নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় উঠে এসে আমার পাশে শুল।

আমার এই প্রিয় রাতের অতিথি পর পর কয়েক রাত এল। সে যতক্ষণ আমার কাছে ছিল ততক্ষণ প্রতিটি মুহূর্ত আমার ভাল লাগত।

এইভাবে বারোটি রাত কেটে যাওয়ার পরও আমি এই মেয়েটি সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারলাম না। সে প্রথম যখন এসেছিল তখন যেমন তার সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না, এখনো তেমনি কিছুই জানি না। আমি যতবার তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতাম ততবারই সে শুধু বলত, আমার পরিচয় জানার কোন দরকারই নেই প্রিয়তম।

এর পর হঠাৎ কিছু না বলে আসা বন্ধ করে দিল মিস লেল্যান্ড। আবার আমি তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে শুরু করলাম। কিন্তু এবারও আগের মতোই কিছুই জানতে পারলাম না। আমি যে সব কারণে তাকে কাছে পেতে চাইতাম সে সব কারণ হলো সম্পূর্ণ দেহগত। সে কোন রাতে না এলে আমার ঘুম হত না। দুর্বিষহ হয়ে উঠত আমার নিঃসঙ্গতা।

পীয়ের যখন একদিন শহর থেকে তিনজন সহকারীকে সঙ্গে করে আমার বাড়ি সাজাবার জন্য অনেক আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম আর ছবি নিয়ে এল তখন আমার এই নিঃসঙ্গতাটা অনেকটা ভঙ্গ হলো। বাড়ির ভিতরে চারদিক ঘুরে ঘুরে তার সহকারীদের নির্দেশ দিতে লাগল।

এক সপ্তার মধ্যেই গোটা বাড়িটা অন্য রূপ ধারণ করল। অবশেষে বৃহস্পতিবার পীয়ের তার লোকদের বিদায় দিল সব কাজ সারা হতে।

সেই বৃহস্পতিবার দিনই রাত্রিতে আবার এল লেল্যান্ড। সে হাঁপাচ্ছিল। তার চোখে ছিল নতুন আলো। বুকের মধ্যে জমানো ছিল এক সপ্তার পুঞ্জীভূত প্রেমাবেগ।

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, নিচে যে লোক থাকে ও কে?

কোন্ লোক?

সে হাসিমুখে বলল, ওই বেঁটেখাটো, যার বাদামী চোখে আছে এক মেদুর দৃষ্টি। সে তার ঠোঁট দুটো উত্তেজনার সঙ্গে চাটছিল জিব দিয়ে।

আমি বললাম, ওর কথা ছেড়ে দাও, তুমি তো আমাকে পেয়েছ।

সে বলল, আমি অবশ্য তোমাকে পেয়েছি।

এর পর সে তার চোখের দৃষ্টিটাকে সংকুচিত করে আবার বলল, কিন্তু লোকটা ধরা দিতে চায় না। তার এই অনমনীয় ভাবটা আমার ভাল লাগে। তুমি—তুমি বড় বেশি আগ্রহী এবং উপর-পড়া।

আমি বিস্ময়ে ফেটে পড়ে বললাম, আমি উপর-পড়া। হা ভগবান! হে নারী, কি বলছ? আমার পিঠে নখের দাগগুলো কি আমার হাতের সৃষ্টি?

মিস লেল্যান্ড চিন্তান্বিতভাবে কি ভাবতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে আমার পিঠের দাগটার উপর হাত বুলিয়ে তার উপর চুম্বন করল। তারপর সেখানটা কামড়ে দিল।

সে রাতে তার চলে যাবার সময় আমি তাকে আমার সঙ্গে কিছুদিনের জন্য বোস্টন যেতে বললাম। সেখানে আমার দ্বারা পরিচালিত এক নতুন নাটকের উদ্বোধন হবে। কিন্তু সে লাল চুলওয়ালা মাথাটা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলল, না, আমি যেতে পারি না।

আমি বললাম, কেন পার না?

সে বলল, এটা অসম্ভব, আমার যাওয়া হবে না।

এরপর সে কাতর কণ্ঠে বলল, দয়া করে যেও না। তুমি কাছে না থাকলে...একজন লোক ছাড়া আমার চলে না। তুমি চলে গেলে আমি কি করব তা বুঝতে পারছি না।

বিছানার উপর খাড়া হয়ে বসল সে। তীক্ষ্ণ গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার মুখপানে। তারপর একসময় বলল, বল তুমি আমায় ভালবাস। বল চিরদিন ভালবাসবে আমায়। বল ডান। তোমার অন্তর না চাইলেও মুখে অন্তত একবার বল।

তার চোখে জল এসেছিল। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে তার জলভরা সেই চোখের উপর পড়ল। তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার মতো সুন্দরী মেয়ে এর আগে দেখিনি কখনো আমি।

আমি তার চোখের উপর চুম্বন করে তার চোখের সব জল মুছে দিয়ে বললাম, আমি তোমাকে ভালবাসি প্রিয়তমা, চিরদিন তোমাকে ভালবেসে যাব।

কয়েক মুহূর্ত পরে এক তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমার বিছানা থেকে নেমে পড়ল সে। বলল, আমি চলে যাচ্ছি। বোস্টনে সাবধানে থাকবে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। মনে রাখবে এর আগে আমি কখনো কাউকে ভালবাসিনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল সে। আমি নিজের মনেই বললাম, আমি তোমাকে ভালবাসি।

পরদিন সকালে আমি নিচে নেমে গিয়ে দেখলাম পীয়ের খুব রেগে গেছে। খাবার সময় তাকে সুপ্রভাত জানাতেই সে রাগান্বিতভাবে বলল, দেখ ডান, ঠাট্টার একটা সীমা আছে। তুমি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছ। মেয়েটি কে?

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বললাম, কোন্ মেয়েটির কথা বলছ?

খুব হয়েছে, ভালমানুষি করতে হবে না। যে মেয়েটাকে তুমি আজ ভোরে আমার বিছানায় পাঠিয়েছিলে।

দেখলাম পীয়ের সত্যিই প্রচণ্ড রেগে গেছে। আমি ভাবতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম না কোন্ মেয়ের কথা সে বলছে। মিস লেল্যান্ড নিশ্চয় আমার বিছানায় প্রায় সারারাত কাটাবার পর শেষ রাতে পীয়েরের কাছে শুতে যায়নি। এটা অসম্ভব। আমি তবু তাকে বললাম, মেয়েটির চেহারা কেমন বল তো?

অবদমিত রাগের চাপে কাঁপছিল পীয়ের। সে মেয়েটির চেহারার যে বর্ণনা দিল তাতে বুঝলাম সে-ই বটে। সেই মেয়ে, মিস লেল্যান্ড।

আমি বললাম, কি হয়েছিল বল তো?

আমি প্রশ্ন করলাম বটে, কিন্তু এর উত্তরটা শুনতে চাইনি।

কিছুই না। তুমি কি মনে ভাবছ যে কোন মেয়ে আমার বিছানায় এসে উঠলেই তাকে আমি গ্রহণ করব! আমার নীতি বলে একটা জিনিস আছে। একটা বাজারের বারবনিতা কোথাকার! আবার তার সাহস দেখ, আমাকে বলছে আমি নাকি ধরা দিতে না চাওয়ার ভান করছি।

আমি ভাবলাম তাহলে সেই মেয়েটি সারারাত আমার কাছ থেকে এত ভালবাসা পাবার পরও শেষ রাতে পীয়েরের কাছে গেছে আরও ভালবাসা পাবার আশায়।

আমি বললাম, আমি দুঃখিত পীয়ের। সত্যিই দুঃখিত। মেয়েটি কে সত্যিই তা আমি জানি না। আমি অনেক খোঁজ-খবর নিয়েছিলাম, কিন্তু কিছুই জানতে পারিনি।

ফরাসী যুবক পীযেরের রাগ তবু গেল না। তবে দেখলাম তার রাগটা আর আমার উপব নেই। সে এবার সাধারণভাবে সব নারীদের উপর বিষোদ্গার করতে লাগল। সে বলল, নারীরা জন্তুদের মতো। ওরা কখনো তৃপ্ত হয় না।

সে শান্ত হলে আমি বললাম, আমি বোস্টনে যাচ্ছি, তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

পীয়ের বলল, না, আমার এখনো কিছু কাজ আছে। আগামীকাল সব শেষ করে ফেলব। হ্যাঁ, একটা কথা, ক্ল্যারা কেলেট আসছে একজন ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে করে। তোমার একটা ফটোকে নিয়ে একটা বড ছবি আঁকতে চায় সে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো বোস্টন থেকে।

আমি বললাম, কাল বিকালেই ফিরব আমি।

এই বলে আমি নিজেই গাড়ি চালিযে রওনা হলাম। যাবার সময় খবরের কাগজের অফিসে একবার নেমে টডের সঙ্গে দেখা করলাম। আমি তাকে মিস লেল্যান্ডের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। কথাটা শুনে সে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সে বলল, ঐ নামে এ অঞ্চলে কোন মেয়ে নেই।

তবে তার মনে একটা সন্দেহ এসেছিল। সে সন্দিগ্ধ মনে আমাকে বলল, হঠাৎ এই মেয়েটির খোঁজ করছ কেন? এটা কি খুব দরকারী?

আমি কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে ঠিক করলাম আমি সব কথা তাকে বলব না। ব্যাপারটা গোপন রাখাই ঠিক।

টড বলল, ঠিক আছে। এতে কিছু যায় আসে না। আমি নাম খুঁজে তাকে বার করবই। তুমি বোস্টন থেকে ফিরে এলেই আমি তার পরিচয় দিয়ে দেব তোমাকে।

বোস্টন যাওয়া আমার ভুল হয়ে গেল। কোন ফল হলো না। নাটকটা একেবারেই চলল না। প্রথম দৃশ্যের যবনিকাপাত হতে না হতেই অর্ধেক দর্শক চলে যায় হল থেকে। তার উপর আবহাওয়াও খুবই খারাপ ছিল।

আমি যখন ব্যাটসভিল ফিরে এলাম তখনও মেঘে মেঘে অন্ধকার হয়ে উঠেছে আকাশখানা। মনে হলো এখনি দারুণ ঝড় উঠবে। আমি সোজা টডের অফিসে চলে গেলাম। আমি তার ঘরে ঢুকতেই টড উত্তেজনার আবেগে লাফিয়ে উঠল।

টড বলল, ডান, আমি একটা হদিশ পেয়েছি।

সে তখন মদ খাচ্ছিল।

আমি বললাম, ভাল কথা।

সে বলল, শোন। আচ্ছা, কোথায় দেখেছিলে তুমি মেয়েটিকে?

আমি বললাম, সে কথা বলতে পারব না টড।

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, তাতে কিছু যায় আসে না।

এই বলে সে তার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ফটো বার করে আমার সামনে তুলে ধরে উত্তেজনার সঙ্গে বলল, বল, এই মেয়েটা কি?

আমি ভাল করে ছবিটা দেখলাম। হ্যাঁ, সেই মেয়েটি, তবে পরনে তার রয়েছে অভিনয়ের পোশাক। মনে হলো সে যেন স্কারলেট ও হারার ভূমিকায় অভিনয় করছে।

আমার চোখের নীরব দৃষ্টিই টডের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। টড বলল, আমি জানতাম। ঐ বাড়িতে সে আছে। তার মাথার চুল লাল, চেহারাটা এই রকম।

আমি হতাশ হয়ে চেয়ারে বসে পড়লাম। এই ঘটনার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভেবে ভয়ে শিউরে উঠলাম আমি। আমি বললাম, ঠিক আছে টড, কি জান তুমি?

টড বলল, এই মেয়েটিই তো স্যালি। তার কুমারী বয়সে নাম ছিল লেল্যান্ড। স্যালি লেল্যান্ড। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন। তুমি তাহলে তাকে দেখেছ। এইবার ভূত বিশ্বাস করতে শিখবে।

টড হাসতে লাগল। কিন্তু আমার মুখের উপর স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে তার হাসি থামিয়ে দিল। সে অনুতপ্ত হয়ে বলল, আমি দুঃখিত ডান। আমি তোমাকে উপহাস করতে চাইনি।

সে আমার কাছে যখন এইভাবে ক্ষমা চাইছিল তখন আমি তার ঘর থেকে নীরবে বেরিয়ে এলাম।

ঘন কালো মেঘে ভারী হয়ে আছে আকাশের সব দিগন্তগুলো। মুহুর্মুহু বজ্র গর্জন হচ্ছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। তারই মাঝে আমি আমার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে পীয়েরের দেখা পেলাম না। আমি উপরতলায় গিয়ে বাড়ি থেকে চলে যাবার জন্য জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করতেই ঝড় শুরু হলো।

জানালার সার্সির উপর আছাড় খেয়ে পড়ে বাতাস যেন আর্তনাদ করছিল। বৃষ্টির ধারাগুলো যেন বন্য জন্তুর মতো আঁচড় কাটছিল ছাদের উপর। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের

চকিত আলো ঝলকে উঠে পরক্ষণেই নিবিয়ে যাচ্ছিল। বাইরে বজ্রপাত হলো যেন কোথায়। আমার মনে হলো অগ্নিবর্ষী এক ঘোরতর যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে এসে পড়েছি আমি যেন সহসা।

সত্যিই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম আমি। তবে একটা জিনিস আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে আমায় আপাতত। পরে ভাবনা-চিন্তা করে যা কিছু হোক একটা ঠিক করা যাবে। আমার পড়ার ঘরে আগুন জ্বেলে রেখে গিয়েছিল বাড়ির চাকরেরা। সারাদিন ধরে কাজ করে সন্ধ্যের আগে চলে যায় তারা। আগুনের ধারে বসে আমি কি করা যায় তা নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

টডের কথা শোনার পর থেকে আমার চেতনা অসাড় হয়ে আসছিল ক্রমশ যেন। আমার সমস্ত বাড়িটাকে এক অবাস্তব অতিপ্রাকৃত বস্তু বলে মনে হচ্ছিল। সমস্ত বাস্তবতাবোধটাই আমি হারিয়ে ফেলছিলাম একে একে। এমন সময় সহসা পীয়েরের আর্তনাদ শুনে আমি চমকে উঠলাম।

আমি ছুটে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম। দেখলাম পীয়ের সিঁড়ির নিচে প্রথম ধাপে কুঁজো হয়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি যেতেই সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'ভাল।' আর কোন কথা বলতে পারল না।

তার মুখখানা বিবর্ণ। তার চোখদুটো ঘুরছিল। সমস্ত শরীর অবসন্ন দেখাচ্ছিল। আমার দিকে এগিয়ে আসার জন্য সিঁড়ির উপর একটা ধাপ উঠতেই সে গড়িয়ে পড়ে গেল।

আমি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলাম, পীয়ের, হা ভগবান, কি হয়েছে তোমার?

সে ক্ষীণকণ্ঠে কোনরকমে বলল, হ্যাঁ সেই, সেই মেয়ে।

উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কোন বৈদ্যুতিক তারের দ্বারা স্পষ্ট কোন দেহের মতো তার সর্বাঙ্গ ভীষণভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সে কোনরকমে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে আমার পায়জামার আঁচল ধরে সকরুণ কণ্ঠে বলল, ওকে সরিয়ে দাও আমার কাছ থেকে। ওকে আমার কাছে আর আসতে দিও না।

এই কথা বলেই সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি তাকে ধরে জোর নাড়া দিতে লাগলাম তার দেহটাকে। আমি বারবার বলতে লাগলাম, কি হয়েছে তোমার পীয়ের?

পীয়ের বলল, গতরাতে সে আমার বিছানায় আবার এসেছিল। সারারাত ধরে জ্বালাতন করে আমায়। তুমি জান আমার গায়ে তেমন জোর নেই। ও আমায় মেরে ফেলবে। আমাকে এ বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে চল।

আমি তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলাম। বললাম, ঠিক আছে। আমরা চলে যাব। তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।

তার চোখদুটো ঘুরছিল। আবার এক দারুণ ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে। ভয়ে ভয়ে বলল, না, না, এখনি চল। সে দাঁড়িয়ে আছে কাছাকাছি কোথাও।

তার ভয়টা আমার মধ্যেও সংক্রামিত হলো। আমি যেন ঐ বাড়ির সর্বত্র সাড়িন্ন

অদৃশ্য অতিপ্রাকৃত উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করছিলাম। কিন্তু তার উপস্থিতির মধ্যে তপ্ত কোন যৌন আবেদন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এখন শুধু আমার মনে হচ্ছিল সে যেন এক হিংস্র জন্তু। সহসা নরকের দ্বার খুলে নারকীয় এক জন্তু যেন দুর্যোগঘন এই নৈশ অন্ধকার ভেদ করে তার শিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় বাতির আলোগুলো ক্ষীণ হতে হতে নিবে গেল একেবারে। শুধু ঘরের ভিতর জ্বলন্ত আগুনের আভা ছাড়া আর কোথাও কোন আলো ছিল না সারা বাড়িটার মধ্যে।

এমন সময় পীয়ের হঠাৎ বলে উঠল, ডান, ঐ দেখ, সে আসছে।

আমি সাহস দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ব্যাগগুলো গাড়িতে রেখে আসছি।

বাড়ির উঠোনে আমার গাড়িটা ছিল। আমি যখন গাড়িতে মালপত্রগুলো রাখার জন্য বাইরে বেরিয়ে গেলাম তখন পীয়ের ভয়ে আমার সঙ্গ ছাড়ল না। বিদ্যুতের চকিত আলোয় দেখলাম অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় সারা উঠোনটা ভেসে যাচ্ছে। বাড়িটার পাশে একটা ম্যাগনোলিয়া গাছের মাথায় বাজ পড়তে গাছটা আমার গাড়ির কাছে ভেঙে পড়ে গেল। আমরা মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য বেঁচে গেলাম।

কোথা থেকে এক অবর্ণনীয় ভয় এসে বুকে চেপে বসল আমার। আমি ছেলেবেলা থেকে বড় শহরে মানুষ হয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি, ভূত কাকে বলে তা আমি জানি না, কখনো বিশ্বাস করি না। তবু এ বাড়িতে আছে স্যালির অস্তিত্ব। শুধু তাই নয়, একটু আগে যে বজ্রপাতের ফলে গাছটা পড়ে আমাদের গাড়ির পথটা আটকে দিল, সে বজ্রপাত স্যালিরই কাণ্ড। আরো মনে হলো আমরা যদি অন্যপথে উঠোন পার হয়ে চলে যেতে চাই তাহলে সে হয়ত আবার আমাদের পথ রুদ্ধ করে দেবে এবং এবার হয়ত সে পথরোধের ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াবে। বাড়িটার গাড়িবারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে আমি নির্বাক দর্শকের মতো দেখে যেতে লাগলাম, ঝড়বৃষ্টির ক্রমাগত আঘাতে আমার বাড়িটা যেন ধ্বংস হয়ে যেতে বসেছে। উঠোনের সব ফুলগাছ ও অন্যান্য গাছপালাগুলো ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। বাড়ির ভিতর সব ঘরের জানালার কাঁচগুলো ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। একদিকের একটা ঘর ভেঙে পড়ল।

আমি বাড়ির ভিতর ছুটে গেলাম। পীয়েরও একা থাকতে সাহস না পেয়ে আর্তনাদ করতে করতে আমার পিছু পিছু ছুটে গেল। আমরা বাড়ির ভিতর ঢুকতেই সদর দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। মনে হলো ও দরজা যেন চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল এবং আর কেউ কখনো খুলতে পারবে না সেটা।

বাড়ির ভিতর সর্বত্র বাতাসে যেন স্যালির গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। ঝড়বৃষ্টির প্রবল শব্দকে ছাপিয়ে উঠেছিল যেন তার উদ্ধত অতৃপ্ত প্রেমাবেগের দুর্মর স্পন্দন। এক নিদারুণ আশঙ্কা আর অস্থিরতায় স্তম্ভিত হয়ে আমি সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। অবশেষে আমি আকুলভাবে ডাকতে লাগলাম গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে, স্যালি লেল্যান্ড, কোথায় তুমি?

কিন্তু ঝড়ের গর্জন ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেলাম না আমি।

আমি আবার ডাকতে লাগলাম। একবার মনে হলো, এটা আমার নিছক নির্বুদ্ধিতা, এক অতিনাটকীয় আতিশয্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আবার মনে হলো, না, এটা আমার নির্বুদ্ধিতা নয়। আমার কম্পিত হিমশীতল মস্তিষ্ক এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে স্যালি আমার কথা, আমার ডাক বেশ শুনতে পাচ্ছে। আমি পিছন ফিরে তাকাতেই দরজার কাছে স্যালির চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেলাম।

পিছন ফিরে এগিয়ে দরজাটা খোলার চেষ্টা করলাম আমি মরীয়া হয়ে। কিন্তু দরজাটা খুলল না কোনমতে, অথচ তাতে খিল ছিল না। আসলে বৃষ্টির জলের ঝাপটায় দরজার কাঠগুলো ফুলে ওঠায় দরজাটা বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আপনা থেকে এঁটে যায়। কিন্তু আমার কেবলি মনে হচ্ছিল স্যালি যেন এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সব পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

আমি আবার সেই সিঁড়ির তলায় ফিরে গেলাম। চিৎকার করে বললাম, স্যালি, দয়া করে আমাদের যেতে দাও।

আবার সেই হাসির শব্দ। এবার সে হাসির শব্দটা আরো জোর মনে হলো। আসন্ন বিপদের এক বিভীষিকা তার দানবিক হাত দিয়ে আমার পেটের নাড়িভুঁড়ির মধ্যে আঁচড় কাটতে লাগল যেন।

অসহায় পীয়ের সিঁড়ির কাছে পড়ে গেল। তার সর্বাঙ্গ তখনো কাঁপছিল। হাতদুটো আপনা থেকে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

আমি আবার ডাকলাম। বললাম, স্যালি, শোন আমার কথা।

কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না। কিন্তু পরে উপরতলা থেকে গানের শব্দ আসতে লাগল। মনে হলো যেন কোন স্বামীঘাতিনী মাকড়শা তার নতুন স্বামীকে হত্যা করার জন্য তার জালের মধ্যে আবদ্ধ করে হত্যার আগে এক যৌনলীলায় মত্ত হয়ে চলেছে।

আমি পীয়েরকে সেইখানে রেখে নিজে সিঁড়ি বেয়ে উঠে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে তেড়ে দৌড় লাগালাম। স্যালির গানটা হঠাৎ থেমে গেল। আমি আরো বেশি করে ভয় পেয়ে গেলাম। তবু আমি বুঝলাম স্যালি একমাত্র শোবার ঘর ছাড়া আর কোথাও দেখা দেবে না আমায় অথবা কোন কথাও বলবে না। একমাত্র শয্যারূপ সমরক্ষেত্রেই স্যালির সঙ্গে দেখা হবে আমার।

আমি আমার শোবার ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বাইরে ঝড়ের বেগটা বেড়ে উঠল আরো। বাড়ির আর একদিকে আর একটা ম্যাগনেলিয়া গাছ ছিল। সেটা রান্নাঘরের উপর ভেঙে পড়ে গেল।

এবার আমার শোবার ঘরের দরজা খুলে গেল। দেখলাম, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে স্যালি। তার মাথাটা একদিকে বাঁকানো ছিল।

আমি জোরে চিৎকার করে উঠলাম, হ্যালো স্যালি! আমার কণ্ঠস্বর ঝড়ের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল। তার সবুজ চোখ দুটো একবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠার পর সংকুচিত হয়ে উঠল। সে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি ভয় পাওনি?

ঘাড় নেড়ে আমি বোঝালাম আমি ভয় পাইনি। আমার লুব্ধ চোখের দৃষ্টি তার পাতলা গাউনটার উপর পড়ল। ভয় সত্ত্বেও এক জারজ যৌন কামনা আবার উত্তাল হয়ে উঠল আমার মধ্যে। আমি ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। বাইরে ঝড়ের গর্জন অপ্রশমিত প্রবলতায় ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল সামনে। ছাদে প্রকাণ্ড শব্দে কি একটা পড়তে সমস্ত বাড়িটা কেঁপে উঠল।

স্যালি তার একটা হাত বাড়িয়ে আমাকে থামতে বলল। সে বলল, কেন তুমি এখানে এসেছ?

আমি বললাম, একথা কেন বলছ?

সে বলল, আমার কথার উত্তর দাও।

আমি বললাম, কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।

ব্যথাহত ও অপ্রতিভ অবস্থায় স্যালি বলল, আমাকে কেউ ভালোবাসেনি, সবাই শুধু আমার দেহটাকে ভালবেসেছে। তুমিও তাদের থেকে পৃথক নও।

আমি বললাম, তুমি আমার সম্বন্ধে ভুল বুঝছ স্যালি। আমি তোমার সম্বন্ধে সব জানি...একশো বছর ধরে যত প্রেমিক এসেছে তোমার কাছে আমি তাদের সবাইকে জানি। সবাই জানে তুমি মৃত, কিন্তু আমার কাছে তুমি অন্য নারীর থেকে বেশি জীবন্ত। আমি তোমাকে আজও ভালবাসি।

সে গভীর দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাল। সে যেন আমার অন্তরের কথা বোঝার চেষ্টা করছিল। সে তার চোখের জল মুছে বলল, এর আগে কেউ আমায় ভালবাসেনি ডান।

আমি তাকে আলিঙ্গন করার জন্য দু' হাত বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু সে আমার হাত দুটোকে সরিয়ে দিয়ে বলল, থাম,—আমাকে ভাবতে দাও।

আমি তার কাঁধের উপর হাত রাখলাম। তার কাঁধ দুটো নরম আর তপ্ত মনে হচ্ছিল। সে কাতর কণ্ঠে বলল, না, এখন নয়।

স্যালি নীরবে একটুখানি হাসল। তারপর গম্ভীরভাবে বলল, নিচে চল ডান।

আমরা হাত ধরাধরি করে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম যেখানে পীয়ের অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিল। আমি তাকে জোর করে মুখের উপর হাসি ফুটিয়ে বললাম, তুমি বেচারাকে আধমরা করে ফেলেছ। সে আমার মতো তোমার সঙ্গে পেরে ওঠে না।

স্যালি অন্যমনস্কভাবে বলল, তুমি বড় বেশি উগ্রকামা, উপর-পড়া। কিন্তু পীয়ের মোটেই ধরা দিতে চায় না।

পিছনের দিকে একবার তাকিয়ে স্যালি আবার গম্ভীরভাবে বলল, তোমার কথা আবার বল ডান।

আমি বললাম, আমি তোমাকে ভালবাসি স্যালি। চিরদিন ভালবেসে যাব। এটাই সবচেয়ে বড় সত্য।

স্যালি এবার চোখ দুটো বন্ধ করে মনে মনে কি যেন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

তারপর সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার কাছে গিয়ে আমাকে ডাকল, এখানে এস।

আমি তার কাছে যেতেই বলল, দরজা খোল।

এবার কিন্তু দরজায় হাত দিতেই দরজা খুলে গেল। দরজা খুলতেই একঝলক বৃষ্টি তীরের মতো আমার চোখে এসে লাগল। আমি টাল সামলাতে না পেরে দরজার বাইরে গিয়ে পড়লাম। বাইরে ঝড়ের ধ্বংসলীলা দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ স্যালি চিৎকার করে বলে উঠল, বিদায় ডান।

আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সদর দরজাটা আবার পিছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আমি চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম, স্যালি, দরজা খোল। আমাকে ঢুকতে দাও।

কিন্তু শুধু ঝড়ের গর্জন ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলাম না।

আমি আবার বললাম, স্যালি, পীয়েরের কি হবে?

এ প্রশ্নের কোন জবাব পেলাম না। আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। বাড়ির পিছন দিকে ছুটে গিয়ে পিছনের দরজাটা খোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেটা এমন শক্তভাবে বন্ধ ছিল যে কোনমতেই তা খুলতে পারলাম না। আমার তখন একমাত্র চিন্তা পীয়েরের জন্য। তাকে যেমন করে হোক বাঁচাতেই হবে।

আমি তখন ভাঙা গাছপালা ডিঙিয়ে জল-কাদার মধ্যে দিয়ে অন্ধকারে প্রায় চার মাইল পথ হেঁটে অবশেষে টডের অফিসে গিয়ে পৌঁছলাম। আমি টডকে মিথ্যা কথা বললাম। বললাম, আমার এক বন্ধু সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে আছে। আমি তাকে সেখান থেকে সরাইনি, কারণ ভাবলাম মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

পৌরকর্তৃপক্ষের একজন লেক, একজন ডাক্তার আর টডকে নিয়ে গাড়িতে করে যখন আমি আমার মর্গান ম্যানসনে পৌঁছলাম, তখন রাত দুপুর হয়ে গেছে।

গিয়ে দেখলাম সদর দরজাটা খোলা আছে। বাতাসে সেটা দুলছে। কিন্তু পীয়েরের কোন চিহ্ন নেই। সিঁড়ির নিচে যেখানে তাকে অচৈতন্য অবস্থায় ফেলে রেখে গিয়েছিলাম সেখানে সে নেই। বাড়ির সব ঘর সব জায়গা আলো নিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাকে পাওয়া গেল না।

তাব কি হয়েছে একমাত্র আমিই তা জানতাম। টডও তা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু আইন বাঁচিয়ে চলতে গিয়ে সেকথা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না আমরা।

সবাই বলল, ঝড়ের মাঝে ঘুরতে ঘুরতে পুকুরে হয়ত ডুবে গেছে।

একটা প্রবাদবাক্যের কথা মনে পড়ে গেল আমার, একজনেব স্বর্গ, অন্যজনের নরক। স্যালির সাহচর্যে যৌন জারজ সুখের যে স্বর্গরাজ্যে অধিষ্ঠিত হতাম আমি, সেই স্বর্গরাজ্যই পীয়েরের এক সাক্ষাৎ নরকের মতো। অতৃপ্ত কামনায ভয়ঙ্কর, প্রেমাবেগে তপ্ত এক আশ্চর্য মেয়ে স্যালিকে আমি কখনো ভুলব না। সে আমাকে সত্যিই ভালবাসত। কিন্তু পীয়েরকে তার প্রেতপুরীতে খেলার সাথী হিসাবে চিরদিনের

জন্য পেতে চেয়েছিল। পীয়ের যে সত্যি সত্যিই সহজ সরল এবং অকপট এবং নারী সম্বন্ধে সত্যি কোন উৎসাহ ছিল না তার, একথা মানতে পারেনি স্যালি। সে ভাবল পীয়েরের মনের ভিতর কামনা থাকলেও সে বাইরে অনীহার ভান করছে, সে দিতে চাইছে না। তাই সে ইহলোক ও ইহজীবন থেকে চিরদিনের মতো বিদায় নিয়ে যায়।

অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

কুটিরে একরাত

A night at a Cottage—রিচার্ড হেউযেস

সেদিন সন্ধ্যায় আমি দশ-বিশটা আরামদায়ক গোলাবাড়ি আর ছাউনি পেরিয়ে এসেছিলাম ঠিকই কিন্তু তার একটাও আমার পছন্দ হযনি। ওরচেসটারশায়ারের গলিগুলো বড় আঁকা-বাঁকা আর কাদায় ভরা। সন্ধ্যার মুখোমুখি আমি একখানা খালি কুঁড়েঘর দেখতে পেলাম। রাস্তা থেকে একটু দূরে আগাছায় ভরা একটা নোংরা বাগানের মধ্যে ঘরখানা। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান রক্তিম আলোয় ঘরখানাকে কেমন অদ্ভুত লাগছিল। লাগুক অদ্ভুত, এই হবে আমার রাতের আস্তানা।

সারাদিন প্রচণ্ড ঝড-বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি থামলেও হাওয়ার বেগ এখনও কমেনি। বাগানের ফলের গাছগুলোর ডালপালার মধ্য দিযে এখনও সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে। বাতাসের বেগে পাতার উপর জমে থাকা বৃষ্টির জল ছিটকে পড়ছে বাগানের এদিকে—ওদিকে। বাইরে বর্ষণ থামলেও এ বাগানে বুঝি এখনও বৃষ্টির শেষ হয়নি।

কুটিরের ছাদটাকে তো বেশ শক্তপোক্ত বলেই মনে হচ্ছে। আশা করা যায় বৃষ্টির জল ঢোকেনি ভিতরে—ভিতরটা বেশ শুকনোই আছে। একটা পছন্দমতো শুকনো জায়গা দরকার। হ্যাঁ একান্তই দরকার। না হলে মারা পডব। কেননা আমার পোশাক-পরিচ্ছদ বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে।

মনস্থির করে ফেললাম। এ বাড়িতেই রাত কাটাব। রাস্তার সামনের দিকে তাকালাম, তাকালাম পিছনের দিকে। কোন লোকজন নেই। ওরচেসটারশায়ারের এদিকটা এমনিতেই জনবিরল। তার উপর আবার বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যা। এমনি সময়ে ঝড়ের মধ্যে কাদায় ভরা পথে কে বেরোবে? অতএব একটা দিক থেকে নিশ্চিন্ত। অনধিকার প্রবেশের দায়ে কেউ আমাকে অভিযুক্ত করতে পারবে না।

কোটের 'লাইনিং'-এর ভিতর থেকে একটা লোহার কাঠি বের করলাম। সেটার

সাহায্যে বন্ধ দরজা খুলে ফেলতে খুব একটা অসুবিধা হল না। দরজার এপিঠে ছিল একটা মরচেধরা পুরনো তালা আর ওপিঠে ছিল দু'টো ছিটকিনি। এগুলো খোলা কোন সমস্যার ব্যাপারই নয়।

ঢুকলাম। ভিতরে অন্ধকার। স্যাঁতসেঁতে আর ভারী অন্ধকার, দেশলাই জ্বাললাম। একটা ওয়াটারপ্রুফ মোড়কের মধ্যে থাকায় এটা ভিজে অকেজো হয়ে যায়নি। কাঠির ম্লান আলোয় দেখলাম একটা অন্ধকার পথের কালো মুখ। হাওয়ার দমকে কাঠিটা নিভে গেল, আমি দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। অবশ্য এতটা সতর্কতার কোন প্রয়োজন ছিল না কারণ লোকালয় থেকে দূরে নির্জন পথে আসন্ন রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারে আমার দেশলাই কাঠির অতিক্ষীণ আলো আর কোন পথিকের চোখে পড়ে তাকে কৌতূহলী করে তুলবে, এমন আশঙ্কা করবার কোন কারণ ছিল না। তবু কথায় বলে সাবধানের মার নেই।

আর একটা কাঠি জ্বাললাম। তার আলোটুকু সম্বল করে এগোলাম অন্ধকার পথে। কাঠি নিভে গেল। জ্বাললাম আর একটা কাঠি। এমনি করে কাঠি জ্বালতে জ্বালতে এসে পড়লাম পথের শেষে। সেখানে ছোট একখানা ঘর। ভাগ্যক্রমে সে ঘরের দরজায় কোন তালা-টালা লাগানো নেই। ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকলাম।

এ ঘরের বাতাস অনেক পরিষ্কার—অনেক স্বাভাবিক। ঘরখানাও যেন একটু ছিমছাম। একটা জানালা রয়েছে কিন্তু সেটা বন্ধ। ঘরের এক কোণে একটা মরচেধরা চুল্লী। বহুৎ আচ্ছা! ভাবলাম অন্ধকার রাতে কেউ ধোঁয়া দেখতে পাবে না, সুতরাং চুল্লীটা জ্বালান যেতে পারে। ভিজে পোশাকটাকে আগুনে সেঁকে নেওয়া দরকার।

কিন্তু জ্বালাব কি দিয়ে? কাঠ-কুটো কোথায়? অসহায়ভাবে চারপাশে তাকালাম---দু'এক টুকরো কাঠও কি পাওয়া যাবে না? সমস্যার সমাধান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, ঘরের ভিতরকার দেওয়াল তো ঢাকা রয়েছে ওক গাছের চমৎকার তক্তা দিয়ে। বড় ছুরিখানা দিয়ে খানিকটা তক্তা কেটে নিলাম। ঘরখানায় খুঁত হয়ে গেল। কিন্তু তাতে আমার কি? আমি তো এ বাড়ির মালিক নই। আমি তো মোটে একরাতের বাসিন্দা।

শুকনো ওক কাঠের চুল্লীতে চমৎকার আগুন জ্বলল। চা-এর জল চড়িয়ে আমি আগুনের উত্তাপে ভিজে পোশাক শুকোতে লাগলাম। বুট-জোড়াকেও রাখলাম আগুনের কাছাকাছি।

জল আর চায়ের সরঞ্জাম আমার সঙ্গেই ছিল।

চা খেলাম। পোশাকও শুকোল। এবার শুয়ে পড়া ছাড়া করণীয় কিছু নেই। ক্ষিধে পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে যে খাবার ছিল তা পথেই শেষ হয়ে গিয়েছে। অগত্যা পেটের ক্ষিধে পেটে রেখেই শুয়ে পড়তে হল। একসময় ঘুমিয়েও পড়লাম।

কিন্তু খুব বেশি সময় ঘুমুতে পারলাম না কেননা যখন জাগলাম তখনও চুল্লীতে আগুন বেশ উজ্জ্বলভাবেই জ্বলছিল, মেঝের শক্ত তক্তার উপর ঘুমোনো সহজ নয়।

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে, একটু নড়াচড়া করলেই ঘুম ভেঙে যায়। পাশ ফিরে আবার ঘুমুবার চেষ্টা করলাম।

আচম্বিতে একটা শব্দ শুনে চমকে উঠলাম, অন্ধকার পথটায় পায়ের শব্দ। শব্দটা এগিয়ে আসছে এই ঘরের দিকেই।

আগেই বলেছি এ ঘরে একটিমাত্র জানালা আর সেটাও বন্ধ। যে দরজা দিয়ে আমি এ ঘরে এসেছি সেটি ছাড়া আর কোন দরজাও নেই। ঘরের মধ্যে লুকোবার মতো কোন আলমারি অথবা কাবার্ডও নেই। বাড়ির মালিক আসছে। এখন আমি পালাই কি করে? আমি তো হাতেনাতে ধরা পড়ে যাব। কিন্তু এই অবস্থার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আমার সামনে তো দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। বাড়ির মালিক নিশ্চয়ই অনধিকার প্রবেশের দায়ে আমাকে অভিযুক্ত করবে। তার অর্থ যে কি তা আমার অজানা নয়। আমাকে আবার ওরচেসটার জেলে ফিরে যেতে হবে। অথচ এই তো সবে দু'দিন হল আমি সেই জেল থেকে খালাস পেয়েছি। সেখানে ফিরে যাবার ইচ্ছে আমার আদৌ নেই।

আগন্তুকের কোন তাড়াহুড়ো নেই। সে বেশ ধীরে সুস্থে অন্ধকার পথ ধরে এগিয়ে আসছে। দরজার ফাক দিয়ে বাইরে আলো পড়েছে। আলো দেখেই লোকটি বোধ হয় এগিয়ে আসছে এই ঘরখানার দিকে। সে বোধ হয় ভাবছে তার অন্ধকার ঘরে কে আলো জ্বালল?

লোকটি ঘরে ঢুকল। মনে হল ও আমাকে দেখতেই পায়নি। আমি এক কোণে গুঁটিসুঁটি মেরে বসেছিলাম, কোন দিকে না তাকিয়ে লোকটা সোজা চলে গেল জ্বলন্ত চুল্লীটার কাছে। জলে ভেজা ঠাণ্ডা হাত দু'খানা গরম করতে লাগল আগুনের তাপে।

সত্যি সাংঘাতিক ভিজেছে লোকটা। ওর সমস্ত শরীর থেকে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। স্বীকার করি আজকে সারাদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। সন্ধ্যার আগে একটু থেমে আবারও শুরু হয়েছে ঝড় বৃষ্টি। কিন্তু এরকম বৃষ্টিঝরা রাতেও বা লোকে এরকম ভিজে যায় কি করে! লোকটার পোশাক-পরিচ্ছদ পুরনো আর জীর্ণ। ওর সমস্ত শরীর থেকে জল ঝরে পড়ছে। পড়ছে ঘরের মেঝেতে। লোকটার মাথায় টুপি নেই। চুল ভিজে সপসপে। চুল থেকে জল ঝরে পড়ছে চুল্লীর জ্বলন্ত কাঠের উপর। একটা হিস্ হিস্ শব্দ হচ্ছে। সে শব্দের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছে যেন একটা অন্ধ আক্রোশ...একটা দুর্বোধ্য অসূয়া।

বুঝলাম লোকটি মোটেই একজন আইন মেনে চলা সুনাগরিক নয়। ও আমার মতোই একজন ভবঘুরে। পথের ভদ্রলোক। সুতরাং একই পথের পথিক আমরা। একটু হেসে ওকে সম্ভাষণ করলাম,

—"কি মশাই, আপনিও কি রাতের আশ্রয়ের খোঁজে?"

—"তা ছাড়া কি! বাইরে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে, শুনছেন না ঝড়ের গর্জন?"

—"হ্যাঁ তা তো শুনছি। সারারাত বোধ হয় এমনিই চলবে।"

—"উঃ কি জঘন্য আবহাওয়া! একেবারে ভিজে গিয়েছি। কি ঠাণ্ডা! সমস্ত শরীর যেন জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে!" অনুযোগের সুরে আগন্তুক বলল। তারপর আগুনের আরো কাছে গিয়ে গুঁটিসুঁটি মেরে বসল।

—"না", আমি বললাম, "রাস্তায় চলার পক্ষে আবহাওয়াটা মোটেই ভাল নয়। কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছি..."

—"কি কথা?" আমাকে শেষ করতে না দিয়েই আগন্তুক প্রশ্ন করল।

—"ভাবছি এ বাড়িখানা পরিত্যক্ত কেন? এখানে মাঝে মাঝে লোকজন তো আসতে পারে, কেননা পুরনো হলেও এ বাড়িখানা এখনও বাসের অযোগ্য হয়ে ওঠেনি।"

বাইরে ঝড়ের গর্জন বেড়ে গেল। খোলা দরজা দিয়ে দেখলাম আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চিবে ফালাফালা করে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। বিদ্যুতের আলোয দেখলাম বাগানের গাছপালা আর আগাছাগুলো ঝড়ের বেগে কি বকম অদ্ভুতভাবে আন্দোলিত হচ্ছে।

কড়্ কড়্ করে বাজ ডাকল।

সৃষ্টি যেন রসাতলে যেতে বসেছে।

—"একটা সময ছিল যখন এমন একখানা চমৎকার সুন্দর কুটিব বা এ রকম সুন্দর বাগান আর এ তল্লাটে ছিল না। আর এখন? এখন কোন লোক এখানে থাকে না। কোন পথ-ভোলা পথিক বা ভবঘুরেও রাত্রিবাস কবে না এখানে," খস্‌খসে গলায আগন্তুক বলল।

—"কিন্তু কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

আমাব কথাব কোন জবাব না দিযে আগন্তুক বলতে লাগল:

"আর আজ? আজ ভিখারীরা পর্যন্ত এ বাড়িতে রাত কাটায না। যে সব পোড়ো বাড়িতে ভিখারীবা রাত কাটায সেখানে ছড়িযে ছিটিয়ে থাকে তাদের ছেঁড়াখোড়া পোশাকের টুকরো, খাবারের অবশেষ। এখানে কি সেরকম কিছু দেখতে পাচ্ছেন?"

—"না, কিন্তু বাড়িখানার এবকম হাল হল কি করে?" আমি আবার প্রশ্ন করলাম।

—"হানাবাড়ি, বুঝলেন মশাই, এ বাড়িখানা হল হানাবাড়ি।"

—"হানাবাড়ি!"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করল লোকটি, শ্বাস ফেলতেও যেন ওর কষ্ট হচ্ছে।

—"আপনি দেখছি এ বাড়ি সম্বন্ধে অনেক খবর রাখেন। ব্যাপারটা জানা থাকলে খুলে বলুন না মশাই।"

—"ভূত, এ বাড়িতে নাকি ভূতের উপদ্রব। লোকটা এ বাড়িতেই থাকত। সে এক মহা দুঃখের কাহিনী, সব কথা আপনাকে বলবার প্রয়োজন নেই। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে হতভাগ্য লোকটিকে শেষে মিলের পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করতে হল। ওকে যখন পাড়ে তোলা হল তখন ওর মৃতদেহটা জলের উপর ভাসছে। দেহটাব

উপর অতিসূক্ষ্ম পাতলা ও পিছল মাটির একটা আস্তরণ পড়ে গিয়েছে। আঠাল মাটির গায়ে আটকে ছিল জলের পানা আর শেওলা।

মরবার পরও নাকি লোকটাকে দেখা গিয়েছে। গাঁয়ের অনেকেই দেখেছে তাকে। মৃত মানুষটা যেন ক্লান্ত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে পুকুরের পাড় দিয়ে। ওকে বেশি দেখা গিয়েছে ইস্কুলের মোড়ে ছেলের জন্যে অপেক্ষা করতে। ও বোধ হয় ভুলেই গিয়েছে যে ছেলে বা ওর পরিবারের কেউ আর বেঁচে নেই। বসন্ত রোগে সবাই মারা গিয়েছে। আর এজন্যই ও জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে। পরিবারের সবাই মারা যাবার পর লোকটা আর বাইরে বেরোত না। বাড়ির মধ্যেই ক্রমাগত পায়চারি করত। মরার পরও তার পায়চারি বন্ধ হয়নি। এখনও নাকি তার অশান্ত আত্মা দেহধারণ করে ঘুরে বেড়ায় এই বাড়ির মধ্যে। লোকটা জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিল। এখন সে ঘুরে বেড়ায়...কেবলই ঘুরে বেড়ায়। হানা দেয় তার একদা বড় সাধের বাগান-ঘেরা বাড়িতে।"

আগন্তুক আবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করল। সে একটু নড়েচড়ে বসতেই তার বুটজোড়ার মধ্যে জলের পঁচ্ পঁচ্ শব্দ শুনতে পেলাম।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। বাইরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, শোনা যাচ্ছে ঝড়ো হাওয়ার হু-হুংকার। হাজার হাজার অদৃশ্য ক্রুদ্ধ দানব যেন দারুণ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই ছোট্ট কুটিরখানার উপর। বাড়িখানাকে যেন ওরা উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায় বহুদূরের দানবলোকের পথে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে বজ্রের ক্রুদ্ধ গর্জন।

শেষ পর্যন্ত নীরবতা ভেঙে আমি বললাম, "আমাদের কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলে চলবে না। অলীক ভূতের ভয়ে আমরা যদি এবাড়ির আশ্রয় ছেড়ে চলে যাই তবে এই দুর্যোগের রাতে খোলা আকাশের নিচে জল-কাদা ভরা রাস্তাতেই আমাদের রাত কাটাতে হবে।"

—"না না, এবাড়ি ছেড়ে যাব কেন, ওসব ভুতুড়ে হানার গালগল্প আমি বিশ্বাস করি না," আগন্তুক বলল।

হেসে বললাম, "আমিও করি না। শুনি কম লোকে নাকি ভূত দেখে, আমি কিন্তু কোনদিন ভূত দেখিনি।"

আগন্তুক তাকাল আমার দিকে। ওর দৃষ্টি কি অদ্ভুত! কি বিষণ্ন! মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে সে বলল, "দেখেননি। আপনার বোধ হয় ধারণা ভবিষ্যতেও কোনদিন ভূতের সঙ্গে আপনার মোলাকাত হবে না, ভাল। কোন কোন লোক তো সারা জীবনেও ভূতের দেখা পায় না, গরীব মানুষের বাড়িতে টাকা-পয়সা না থাকাটাই একটা দারুণ কষ্টকর ব্যাপার। তার উপর যদি আবার ভূতের ভয় দেখাতে শুরু করে তবে তো চমৎকার!"

—"ভূত নয়, পুলিশের লোকেরাই আমার ঘুমকে অস্বস্তিকর করে তোলে",

আমি বললাম, "পুলিশ আর পরের ব্যাপারে অহেতুক নাকগলানে লোকদের জন্যই আজকাল রাতের বিশ্রাম পাওয়াটা খুব শক্ত হয়ে উঠেছে।"

লোকটার জীর্ণ পোশাক থেকে তখনও জল ঝরে পডছিল। ঘরের মেঝেটা ভেসে যাচ্ছিল সে জলে। ওর গা থেকে কেমন স্যাঁতসেঁতে...ভেজা ভেজা গন্ধ আসছিল।

—"আরে মশাই, এতক্ষণ আগুনের পাশে বসে আছেন, এখনও আপনার পোশাক শুকালো না। গা আর মাথা থেকে তো দেখছি এখনও সমানে জল ঝরছে। শরীর শুকোতে আপনার আর কতখানি তাপ লাগবে?" বেশ অবাক হয়েই আমি প্রশ্নটা করলাম।

—"শুকোতে?" কাশতে কাশতেই আগন্তুক একটু হাসল। বোধ করি ওর হাসিটাই কাশির মতো। তারপর খসখসে গলায় বলল, "আমার শরীর শুকোবার কথা বলছেন? না মশাই, আমার শরীর কোনদিনই শুকোবে না, কি করে শুকোবে? আমার মতো যারা তাদের শরীর চিরকালই ভেজা থাকবে। তাদের শরীর থেকে চিরদিনই জল ঝরবে। কোন দিন আর শুকনো হতে পারবে না তারা। বৃষ্টি...রোদ্দুর...শীত...গ্রীষ্ম যাই হোক না কেন তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখুন তবে..."

লোকটা তার কাদামাখা হাত দু'খানা ঢুকিযে দিল চুল্লীব আগুনের মধ্যে। কব্জি পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল। তারপর ভ্রূকুটি করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল জ্বলন্ত আগুনের দিকে, ওর চোখের দৃষ্টি ভয়ঙ্কর...এ যে বদ্ধ উন্মাদের দৃষ্টি! না না, এ দৃষ্টি অমানুষিক...এ দৃষ্টি অপার্থিব!

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা যেন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিযে বয়ে গেল আতঙ্কের তুহিন-শীতল স্রোত, গলা চিরে বেরিয়ে এল এক নিদারুণ আর্তনাদ। বুটজোড়া হাতে নিয়ে আমি একছুটে বেরিয়ে এলাম ঘব থেকে।

কি করে যে অন্ধকার পথ আর বাগান পেরিযে বাইরের রাস্তায় এসে পড়লাম তা বলতে পারি না, বাইরের দুর্যোগের প্রকৃতিটাই যেন পাল্টে গেল আমার কাছে। বৃষ্টিধানাকে মনে হল ঈশ্বরের আশীর্বাদ, কাদায় ভরা পথটাকে মনে হল পরম আশ্রয়। বিদ্যুতের আলোয় আমি পথ দেখছি। বজ্রের গর্জন এখন আমার কাছে এগিয়ে যাবার সংকেত।

সেই বৃষ্টিঝরা ঝড়ো রাতে হানাবাড়িখানাকে পিছনে রেখে আমি জল কাদায় ভরা পথ ধরেই ছুট দিলাম সামনের দিকে।

অনুবাদ: অনিরুদ্ধ চৌধুরী

দুঃস্বপ্ন

The Corpse that Rose—লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

[এ কাহিনীটি লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের কাছে পাঠিয়েছিলেন রেভারেন্ড আর. এ. কেন্ট। কেন্ট সাহেবের ঠাকুর্দা ছিলেন বিখ্যাত শিল্পী মিঃ রেজিনাল্ড ইস্টন]

আমার ঠাকুর্দা, মিঃ রেজিনাল্ড ইস্টন, এক সময় আমাদের সঙ্গে থাকতেন। আমরা তখন থাকতাম লুডলো নামে একটা জায়গায়। 'ডিনহ্যম হল' ছিল বাড়িটার নাম। সে আজ প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। সময়টা যতদূর মনে হচ্ছে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ। ঠাকুর্দা ঘুমোতেন আমার পাশের ঘরে। দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজা ছিল। সুতরাং বাইরের বারান্দায় না বেরিয়েও এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাওয়া যেত।

একদিন ভোর রাতে "আর্থার! আর্থার!" ডাক শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। এ যে ঠাকুর্দার গলা! বুড়ো মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লেন নাকি?

ছুটে পাশের ঘরে গেলাম। দেখলাম ঠাকুর্দা বিছানায় বসে আছেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাসে, শরীরটা কাঁপছে। তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হচ্ছে।

-"কি ব্যাপার? কি হয়েছে দাদু?" আমি উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছি", কাঁপা কাঁপা গলায় ঠাকুর্দা বললেন।

- "কি স্বপ্ন দেখেছেন?"

"থাক সে কথা," দাদু বললেন।

"না, বল তুমি।"

আমার আগ্রহ দেখে ঠাকুর্দা শুরু করলেন তাঁর কাহিনী।

"স্বপ্নে দেখলাম আমি যেন আমার এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে স্ট্যাফোর্ডশায়ারের একটা বাড়িতে রয়েছি। বাড়িটার নাম 'ব্রীড হল'। এক আলোয় ভরা সুন্দর দিনে পার্কের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি যেন যাচ্ছিলাম গ্রামের পুরনো গীর্জাটার দিকে। পার্কের ছোট দরজাটা পার হয়ে সমাধিপ্রস্তর আর সমাধিস্তম্ভগুলির মাঝখানের পথ ধরে আমি এসে পড়লাম গীর্জার পুরনো বারান্দায়। ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় গীর্জার ঘণ্টা বেজে উঠল। এ তো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ঘণ্টা! হ্যাঁ, একটা শবযাত্রীদল আসছে। গীর্জার ভিতরে না ঢুকে আমি আবার পথে নেমে এলাম। ভাবলাম যতক্ষণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলে ততক্ষণ সমাধিপ্রস্তর আর সমাধিস্তম্ভগুলোই দেখা যাক না কেন। গীর্জার প্রাঙ্গণে তো অনেক স্মৃতিসৌধ রয়েছে; সেগুলি দেখতে দেখতেই সময় কেটে যাবে।

শবযাত্রীর দল কাছে এসে পড়ল। এবার পুরনো বারান্দার দিকেই এগিয়ে আসছে দলটা। নিছক কৌতূহলের বশেই একজন শবযাত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম, "কে মারা গিয়েছেন ?"

—"মিঃ মঙ্কটন।"

নামটা পরিচিত, তাই আবার জিজ্ঞেস করলাম,

—"কোথায় থাকতেন তিনি ?"

"সামারফোর্ড হলে," শবযাত্রী উত্তর দিল।

—হা কপাল! সামারফোর্ড হলের মিঃ মঙ্কটন তো আমার পুরনো বন্ধু, তার বাড়িটা তো এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। হওয়াই স্বাভাবিক। বাল্যবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ শুনলে কার না মন খারাপ হয়।

প্রোগ্রামটা পাল্টে ফেললাম, ঠিক করলাম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেব। গীর্জার ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বসলাম গিয়ে পিছন দিকের একখানা আসনে। গীর্জার পূর্বাংশে (চান্‌সল্)* শবযানের উপর কফিনটা রাখা হল। এবার কফিন যাত্রা করবে কবরের দিকে। ঠিক এই সময় গীর্জার একজন কর্মচারী এগিয়ে এল আমার দিকে, লোকটা বুড়ো এবং বেশ বেঁটে। ওর চেহারার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যে ওকে দেখলেই নিদারুণ ঘৃণা এবং বিরক্তিতে সমস্ত শরীব ঘিন ঘিন করে ওঠে।

আমার কাছে এসে লোকটা বলল, "আমার ধারণা আপনি প্রয়াত মিঃ মঙ্কটনের সবচেয়ে পুরনো বন্ধু—শুধু তাই নয়, আপনি তাঁর বাল্যবন্ধু, আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তবে শবযাত্রীদের পুরোভাগে আপনারই থাকা উচিত। শোকমিছিলটা 'ভল্ট' বা ভূগর্ভের সমাধিকক্ষ পর্যন্ত যাবে। আপনি হবেন মিছিলের নেতা।"

প্রস্তাবটা এমনভাবে এল যে অস্বীকার করতে পারলাম না।

মৃতের আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা শেষ হল। শেষ হল যাজক মশাই-এর নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। যাজক মশাই-এর মুখখানা দেখতে শুকনো আপেলের মতো। এবার শুরু হবে অন্তিম যাত্রা। চারজন বাহক কফিনটাকে কাঁধের উপর তুলল। ওরাই কফিনটাকে সমাধিকক্ষে বয়ে নিয়ে যাবে। গীর্জার সেই বুড়ো কর্মচারীটা আবার আমার কাছে এগিয়ে এল। চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল পথটা।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নামবার পর আমি মাথা নিচু করতে বাধ্য হলাম। ঢাকা পথটার উপরের 'সিলিং'-টা এত নিচু যে এ না করে উপায় ছিল না। সমাধিগৃহের পুরনো দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবার সময় শরীরটাকে আরো নিচু করতে হল।

ভূগর্ভের সমাধিগৃহের মধ্যে একটু উঁচু প্লাটফরম। তার উপর কফিন রাখা হয়। মঙ্কটন পরিবারের তিরিশ চল্লিশজন প্রযাত মানুষের কফিন রয়েছে উঁচু মঞ্চটার উপর। কতকগুলো পুরনো কফিন আবার ভেঙে গিয়েছে। ভাঙা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দেহাবশেষ কঙ্কালের অংশ। মঞ্চের উপর নতুন কফিনটা রাখার পর শবযাত্রীরা সার

* এখানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

বেঁধে সমাধিগৃহ থেকে বেরিয়ে গেল। ঢুকবার সময় আমি ছিলাম সবার আগে, এবার আমি সবার পিছনে পড়ে গেলাম। দরজার দিকে এগোচ্ছি এমনি সময়ে গীর্জার কর্মচারী সেই বেঁটে বুড়োটা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল আমার পাশে। হঠাৎ বদমাশটা আমাকে একটা ধাক্কা মারল। আমাকে যে টর্চটা দেওয়া হয়েছিল আচমকা ধাক্কা খেয়ে তা আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। কাদাভরা মাটিতে পড়ে নিভে গেল টর্চের আলো। পরমুহূর্তেই একটা শব্দ শুনতে পেলাম, ভূগর্ভের সমাধিগৃহের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ক্লিক...বুঝতে পারলাম দরজায় তালা পড়ে গেল, আমার অবস্থা অবর্ণনীয়...অকল্পনীয়। এই ভয়ঙ্কর সমাধিগৃহে জীবিত মানুষ বলতে আমি একা—একেবারে একা, অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজ করে দরজার দিকে ছুটে গেলাম, বন্ধ দরজায় কপালটা ঠুকে গেল। দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম...পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগলাম, "দরজা খুলুন...দরজা খুলুন...আমি ভিতরে রয়ে গিয়েছি।"

কিন্তু বাইরে থেকে কোন সাড়া পেলাম না।

অন্ধকারের মধ্যে সেই মড়ার রাজ্যে আমার একটি ঘণ্টা কেটে গেল। অবশ্য সেই এক ঘণ্টাকে আমার এক যুগ বলে মনে হচ্ছিল। আস্তে আস্তে অন্ধকারটা আমার চোখে সয়ে এল। অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম মঞ্চটা আর তার উপরের কফিনগুলো, হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পেলাম, কোন কিছুতে চিড় খাওয়ার আকস্মিক তীক্ষ্ণ শব্দ।

"জয় ভগবান! শেষ পর্যন্ত ওরা ভুলটা বুঝতে পেরেছে, এই মড়ার রাজ্য থেকে আমাকে বের করার জন্যে আসছে ওরা!"

কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙল আমার, আমাকে উদ্ধার করার জন্য কেউ আসছে না। চিড় খাওয়ার শব্দটা আসছে কিছুক্ষণ আগে রেখে যাওয়া কফিনটার দিক থেকে।

দারুণ ভয়ে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। অবর্ণনীয় আতংকের সঙ্গে দেখলাম নতুন কফিনটার চিড বড় হচ্ছে...আরও বড হচ্ছে। কফিনের ভিতর থেকে হিঁচড়ে বেরিয়ে আসছে বুড়ো মঙ্কটনের মৃতদেহ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দেহটা সম্পূর্ণ বেরিয়ে এল। দাঁড়াল নিজের ভাঙা কফিনটার পাশে। দেহটাতে পচন ধরেছে। কি ভয়ানক—কি বীভৎস দৃশ্য!

গলিত দেহটা টলোমলো পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ঐ ভয়ঙ্কর জীবন্ত মৃতদেহটাকে এড়াবার জন্য আমি সমাধিকক্ষের এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটি করতে লাগলাম। কিন্তু যেদিকেই যাই না কেন বুড়ো মঙ্কটনের মৃতদেহ আমার পিছু ছাড়ল না।

দুশ্চিন্তায়...ক্লান্তিতে আর নিদারুণ আতংকে অবসন্ন হয়ে আমি মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম, পচা-গলা মৃতদেহটাও হুড়মুড় করে এসে পড়ল আমার উপর। আমার দু'গালের মধ্যে তীক্ষ্ণ নখ বসিয়ে দুটি গালকেই চিরে ফাঁক করে দিল আমার মৃত বাল্যবন্ধু। দারুণ যন্ত্রণায় আমি চিৎকার করে উঠতে গেলাম, কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোল না।

বীভৎস মৃতদেহটার মরণ আলিঙ্গন থেকে ছাড়া পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, ভাবলাম জীবন্ত সমাধি তো তার আগেই হয়ে গিয়েছে, এবার হবে মৃত্যু। প্রেতের আলিঙ্গনে মৃত্যু।

আমার বুক চিড়ে একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল আর নিজের সেই চিৎকারেই ঘুম ভেঙে গেল আমার।

দেখলাম সমাধিগৃহের মেঝেতে নয়, নিজের বিছানাতে শুয়ে আছি আমি। আমার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছে। শেষ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। স্বপ্নের রেশ তখনও কেটে যায়নি। একা থাকতে ভয় করছিল, তাই তোমাকে ডাকলাম। এ বুড়োটার জন্য তোমার ঘুম হল না।"

ঠাকুর্দা থামলেন।

পরদিন ঠাকুর্দার কাছে খবর এল যে তাঁর বাল্যবন্ধু মিঃ মঙ্কটন মারা গিয়েছেন। আগের রাতে তিনি যখন সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটা দেখছিলেন তখনই মৃত্যু হয়েছে মিঃ মঙ্কটনেব।

অনুবাদ : অনিরুদ্ধ চৌধুরী

কলঙ্ক

The Brand of Coin—জর্জ বার্নার্ড শ'

চার্চ বোড। রাস্তাটা লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে। শহরের ভিড় নেই এখানে, বেশ সুন্দর খোলামেলা জায়গা, আমরা তখন থাকতাম ঐ রাস্তায়। বেশ আনন্দেই ছিলাম।

কিন্তু তবুও ও রাস্তা আমাদের ছাড়তে হল। দুঃখের সঙ্গেই ছাড়লাম ঐ সুন্দর এলাকাটা। ছাড়তে হল সামনে ঐ বিশ্রী বাড়িটার জন্য। আমরা যখন এ পাড়ায় এলাম তখনও বাড়িটা ছিল না, ওখানে জায়গাটা ফাঁকাই পড়ে ছিল।

আমাদের বাড়িখানা চার্চ রোডের একেবারে শেষ মাথায়, বলতে গেলে আর্ল স্ট্রীটের মোড়ে। আমরা আসবার অনেকদিন পরে উল্টো দিকের ফাঁকা জায়গাটায় একটা বিরাট চৌকোনা বাড়ি উঠল, বাড়ির গড়নে কোন শিল্পসুষমা নেই, বাড়িখানা দর্শকের চোখ দুটিকে পীড়িত করে, এক কথায় বাড়িখানা অত্যন্ত কুদর্শন। এত টাকা খরচ করে এমন বিশ্রী বাড়ি কে তৈরি করল ?

তারপর মিস স্পেনসার নামে এক ভদ্রমহিলা সে বাড়িতে থাকতে এলেন, তাঁর সঙ্গে এল কয়েকজন ঝি-চাকর। ভদ্রমহিলার সঙ্গে কোন আপনজন ছিল না। নতুন

প্রতিবেশিনীকে লক্ষ্য করবার অনেক সুযোগ ছিল আমার, সুযোগটাকে কাজে লাগালাম, অনেক কিছুই জানলাম তাঁর সম্বন্ধে।

রোজ সকালে ভদ্রমহিলা বাড়ির পাশের একটা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেন। প্রায় একঘণ্টা ধরে তিনি চার্চ রোডের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতেন, মিস স্পেনসারের চেহারা লম্বা, দোহারা, চেহারায় একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে, তার পোশাক-পরিচ্ছদও বেশ সুরুচিপূর্ণ, তাঁর হাটাচলার মধ্যেও ফুটে উঠত আভিজাত্য। রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় ছায়ায় যখন তিনি চলতেন তখন আমার দেখতে বেশ ভাল লাগত। নামটুকু ছাড়া ভদ্রমহিলার আর কোন পরিচয় জানতাম না। তবে তিনি যে অভিজাত পরিবারের সন্তান সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ভদ্রমহিলার গাড়িখানাও বেশ দামী। কাজেই তাঁর যে অর্থের অভাব নেই, তা বেশ বোঝা যেত। রোজ বিকালে তিনি গাড়ি করে বেড়াতে বেরোতেন। কিন্তু সকালে হেঁটে চলবার সময় কিংবা বিকেলে গাড়ি করে বেড়াবার সময় ভদ্রমহিলা একাই থাকতেন, তাঁর জীবন ছিল একক নিঃসঙ্গ।

তাঁর এই নিঃসঙ্গ জীবন দেখে আমার সমবেদনা হত, তার কি কোন আপনজনই নেই?

একদিন সকালে চায়ের টেবিলে বসে আমি বললাম, "অত বড় একখানা বাড়িতে থাকতে মিস স্পেনসারের নিশ্চয়ই কষ্ট হয়। ও রকম একলা থাকাটা খুবই একঘেয়ে ব্যাপার।"

"ঠিক বলেছ," খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে আমার স্বামী বললেন, "কোন বৈচিত্র্য নেই ওঁর মহিলার জীবনে। অথচ মহিলা বেশ সুন্দরী এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্না। দেখলেই মনে হয় অভিজাত বংশের।

একটু থেমে স্বামী বললেন, "আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না?"

"কি কাজ?"

"বলছিলাম কি তুমি তো গিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করলে পার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এক সুন্দরী আবার আর এক সুন্দরীকে সহ্য করতে পারে না।"

কথাটা বলেই আমার স্বামী হেসে ফেললেন।

"খুব হয়েছে মশাই, আমিই একদিন গিয়ে মিস স্পেনসারের সঙ্গে আলাপ করে আসব," হাসতে হাসতে আমি বললাম।

আর সেইদিনই একটা ছোট ঘটনা ঘটল। না ঘটলে এত তাড়াতাড়ি হয়ত আমার মনের বাসনা পূর্ণ হত না।

আমাদের পোষা কুকুর কার্লোকে সঙ্গে নিয়ে চার্চ রোডে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ দূরে দেখলাম মিস স্পেনসারকে। ভদ্রমহিলা এদিকেই আসছেন। কার্লো এতক্ষণ মহাখুশিতে আমার চারপাশে ছোটাছুটি করছিল, ওর গলা থেকে বেরিয়ে আসছিল আনন্দের ডাক। হঠাৎ কুকুরটার কি যেন হল। ওটা দাত বের করে হিংস্রভাবে তীব্র বেগে ছুটল মিস স্পেনসারের দিকে, কার্লো ভদ্রমহিলাকে এমন জোরে ধাক্কা মারল।

যে তিনি পড়তে পড়তে টাল সামলে নিলেন। আমিও ছুটে গেলাম ওঁর দিকে। আমার কুকুরটার আচরণের জন্য বার বার ক্ষমা চাইলাম ভদ্রমহিলার কাছে।

ভদ্রমহিলা ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন; আমার দিকে তাকিয়ে কোমল গলায় উনি বললেন, "ঠিক আছে, আপনি এত অপ্রস্তুত হচ্ছেন কেন! আমি কিছু মনে করিনি, আর তা ছাড়া আমি নিজেও কুকুর ভালবাসি।"

কার্লো বুঝতে পেরেছিল যে সে অন্যায় করে ফেলেছে, আমার পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল কুকুরটা, মিস স্পেনসার ওকে আদর করবার জন্য হাত বাড়াতেই চাপা গর্জন করে পিছিয়ে গেল কুকুরটা। বেশ বোঝা গেল ও রেগে গিয়েছে, ওর এরকম আচরণের কারণ বুঝতে পারলাম না।

— "আপনার কুকুরটা কি সুন্দর!"—একথা বলে মিস স্পেনসার আবার কার্লোর গায়ে হাত বুলাবার জন্য হাত বাড়ালেন।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! কার্লো দাঁত বার করে হিংস্রভাবে গর্জন করে উঠল, কুকুরটার গায়ের সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠল। ওর আচরণে একই সঙ্গে ফুটে উঠল নিদারুণ ভীতি আর প্রচণ্ড ক্রোধ।

"আপনার কুকুরটি দেখছি আমাকে মোটেই পছন্দ করতে পারছে না," বিষন্ন গলায় মিস স্পেনসার বললেন।

—"ওর এরকম আচরণের অর্থ আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা পরস্পরের প্রতিবেশী, আপনার সঙ্গে ওর এমন আচরণ করা উচিত নয়।"

—"প্রতিবেশী?"

—"হ্যাঁ, আপনার বাড়ির উল্টো দিকের বাড়িখানায় আমি থাকি।"

—"তাই নাকি!"

এরপর নিজের পরিচয় দিলাম, দু'একদিনের মধ্যেই তার বাড়িতে আমি যেতাম।

খুশির হাসিতে ভরে গেল ভদ্রমহিলার মুখ। বললেন, "বেশ তো, খুবই আনন্দের কথা। আচ্ছা, কালকেই আসুন না কেন।"

—"বেশ।"

ভদ্রমহিলাকে কথা দিয়ে তখনকার মতো বিদায় নিলাম।

গেলাম মিস স্পেনসারের বাড়িতে। ওঁকে আমার খুব পছন্দ হল। ভদ্রমহিলারও আমাকে ভাল লাগল। আলাপ-পরিচয়ের পর প্রায়ই তার বাড়িতে যেতাম, ভদ্রমহিলা বিদুষী, সুরুচিসম্পন্না। সঙ্গী হিসেবেও তিনি চমৎকার। ওঁর মধ্যে একটা প্রচণ্ড আকর্ষণী শক্তি বর্তমান। যখন তাঁর কাছাকাছি থাকতাম, তখন সেই আকর্ষণী শক্তি যেন আমাকে অভিভূত করে ফেলত। যখন তাঁর কাছে থাকতাম না তখন সেই শক্তি যেন আমাকে টানত, ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে আমার প্রকৃত মনোভাবটা যে কি তা আমি সঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না। তাঁকে আমি ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমার মনের এক কোণে একটা ক্ষীণ বিরূপ ভাবও ছিল। কেন যে ছিল তা আমি বলতে পারব না। ভদ্রমহিলার কথাবার্তা বা আচার-আচরণে এমন কিছু ছিল না

যার ফলে এই বিরূপতার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু থাক এসব জটিল মনস্তত্ত্বের কথা। সোজা কথায় ভদ্রমহিলার প্রতি আমার মনোভাবকে আমি ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না।

তবে যাঁরা মিস স্পেনসারের কাছাকাছি আসতেন তাঁদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশের কম নয়। কিন্তু এখনও ওঁর যা রূপ, তাতে অভিজাত সমাজের সুন্দরী তরুণীরা পর্যন্ত ম্লান হয়ে যাবে তাঁর সৌন্দর্যের কাছে, কিন্তু ভদ্রমহিলা সমাজে মিশতে চাইতেন না, বরং এড়িয়েই যেতেন সমাজকে, একমাত্র আমার সঙ্গেই তাঁর কিছুটা অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, সমাজকে এড়িয়ে একক নিঃসঙ্গ জীবনই বুঝি তাঁর কাম্য ছিল।

আমি অনেকবার মিস স্পেনসারের বাড়িতে গিয়েছি, কিন্তু উনি আমাদের বাড়ি বেশি আসেননি, আসতে বললে নানা অজুহাতে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। আর যদিবা কখনও আমাদের বাড়িতে আসতেন তাহলে নিজের বাড়ির মতো কখনও স্বস্তি বোধ করতেন না। নিজের বাড়ির মতো সহজ হয়ে উঠতে পারতেন না। হয়ত কার্লোর অদ্ভুত অস্বাভাবিক আচরণে উনি বিব্রত হয়ে পড়তেন। ওঁকে দেখলে কুকুরটা যে কেন ওরকম করত তা আমি বুঝতে পারতাম না। উনি আমাদের ঘরে এলেই কার্লো গুটিসুঁটি মেরে সোফার তলায় ঢুকে পড়ত। একবার ওঁকে দেখে কার্লো এমন করুণ আর্তনাদ করে উঠল যে মিস স্পেনসার দস্তুরমতো ঘাবড়ে গেলেন। ভদ্রমহিলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তাঁর প্রায় অজ্ঞান হবার মতো অবস্থা।

ভাবুন দেখি কি অস্বস্তিকর ব্যাপার।

জোর করে মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনলেন মিস স্পেনসার। ম্লান হেসে বললেন, "দেখুন দেখি কাণ্ড, মাঝে মাঝে আমার কি যে হয়! সামান্য ব্যাপারেই ঘাবড়ে যাই—ভয় পেয়ে যাই, নিজের বাড়ি ছাড়া স্বস্তি পাই না—সহজ হয়ে উঠতে পারি না।"

—"না না কি হয়েছে; মানুষমাত্রেই তো হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পডতে পারে।" আমি ভদ্রমহিলার অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

—"লৌকিকতার কথা ছেড়ে দিন, আপনার যখনই সুবিধা হবে তখনই আমার বাড়িতে চলে আসবেন," মিস স্পেনসার বললেন, "মাঝে মাঝে অবশ্য আমিও আসব আপনাদের এখানে। তাছাড়া আপনি তো বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, কাজেই আপনিই বেশি যাবেন।"

হাসলেন ভদ্রমহিলা।

আমিও হাসলাম।

মিস স্পেনসারের বাড়িতে প্রায়ই যেতাম। তিনি কেবল আমাকে আকৃষ্টই করতেন না, তাঁর সম্পর্কে আমার মনে জেগে উঠেছিল এক অদম্য কৌতূহল। ভদ্রমহিলার চারপাশে যেন ছিল একটা রহস্যের আবরণ। সে আবরণ দুর্ভেদ্য। রহস্যটাকে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি, আলাপ করবার সময় তিনি কখনও বাবা, মা, ভাই,

বোন, প্রেমিক বা বন্ধু বান্ধবেব প্রসঙ্গ উত্থাপন কবতেন না। সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, বাজনীতি এবং আবও অনেক টুকিটাকি ব্যাপাব নিয়ে তিনি আলোচনা কবতেন, কিন্তু নিজেব অতীত জীবন সম্পর্কে তিনি ছিলেন একেবাবেই চুপ। মিস স্পেনসাবকে কোনদিন অতীত স্মৃতিব বোমন্থন কবতে দেখিনি। একবাব আমি সোজাসুজি প্রশ্ন কবেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে তাঁব বাবা-মাব কেউই বেঁচে নেই। আমাব প্রশ্ন শুনে মিস স্পেনসাবেব মুখে নিমেষেব যে ভাব ফুটে উঠেছিল তা দেখে আমি আব ভবে ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন কবিনি।

মিস স্পেনসাবেব টাকাব কোন অভাব ছিল না। তাঁব দামি পোশাক পবিচ্ছদ এবং জীবনযাত্রাব ধবন দেখে মনে হত তিনি প্রচুব অর্থেব অধিকাবিণী। তাঁব ঝি চাকবেবাও বেশ খানদানী ঘবেব ঝি চাকবেব মতো তাদেব মাইনেপত্রবও নিশ্চযই খুব ভাল ছিল। তবে বাঁধুনী আব খাস ঝি ছিল ইংবেজ। খানসামা লুই ছিল ফবাসী। মিস স্পেনসাব যখন গাড়ি কবে বেড়াতে বেবোতেন, তখন লুই তাব সঙ্গে যেত। মাঝে মাঝে লুই আমাব কাছে আসত মিস স্পেনসাবেব চিঠি নিয়ে। চিঠিতে তাঁব সঙ্গে বেড়াতে যাবাব আমন্ত্রণ থাকত। আমাদেব গাড়ি ছিল না। ফাঁকা হাওযায় বেড়াবাব লোভে আমি খুশি মনেই সে আমন্ত্রণ গ্রহণ কবতাম। একবাব এক সপ্তাহে বিশেষ কাবণবশত দু' দু' বাব আমাকে মিস স্পেনসাবেব আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান কবতে হল। উনি হযত আমাকে অভদ্র ভেবেছেন একথা চিন্তা কবে আমি ওব সঙ্গে দেখা কবতে গেলাম। ভাবলাম কেন দু'দিন ওব সঙ্গে বেড়াতে যেতে পাবিনি তা ভদ্রমহিলাকে খুলে বলে বুঝিযে বলব। উনি নিশ্চযই বুঝবেন। আমাব সম্বন্ধে ওব মনে যদি কোন বিরূপ মনোভাবেব সৃষ্টি হযে থাকে তাবও অবসান হবে।

গিযে দেখলাম ভদ্রমহিলা যেন খুবই বিচলিত। একটা চাপা উত্তেজনায তিনি যেন মানসিক ভাবসাম্য হাবিযে ফেলেছেন।

কেন দু'দিন তাব সঙ্গে বেড়াতে যেতে পাবিনি সে কথা বুঝিযে বলতে গেলাম, কিন্তু আমাব ব্যাখ্যায কান না দিযে তিনি বললেন, "জানেন, আমাব বাড়িতে একজন ভদ্রলোক এসেছিলেন, বলুন দেখি কে এসেছিলেন- অনুমান করুন।"

"বোধ হয গীর্জাব যাজক মিঃ মার্শাল।"

–"ঠিক বলেছেন। যাজক মশাই বলছিলেন যে তাব গীর্জাব এলাকায পড়ে এমন সব বাড়িব লোকজনেব সঙ্গেই তিনি দেখা কবতে যান। নিযমিতই যান। কিন্তু...কিন্তু মনে হয আমাব সঙ্গে আব তিনি দেখা কবতে আসবেন না।"

মিস স্পেনসাব মৃদু হাসলেন।

–"কেন?" একটু আশ্চর্য হযেই প্রশ্ন কবলাম।

–"কাবণ আমি পবিষ্কাবভাবেই আমাব মনেব কথা বলেছি, এটা বলতেও ভুলিনি যে ধর্মেব ব্যাপাবে আমাব নিজস্ব একটা মতামত বযেছে। তা ছাড়া আমি কোন দিন গীর্জায় যাইনি।"

—"যাজক মশাই কি বললেন?" আমার বেশ মজাই লাগছিল, মনে পড়ছিল যাজক মশাই-এর আতংকভরা মুখখানা।

—"উনি খুব একটা কিছু বললেন না, তবে মনে হল অনেক কথাই ভাবলেন। ধর্মের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত মতের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনা করা পুরুষ মানুষের পক্ষেই বিরাট অপরাধ, মেয়েদের পক্ষে তো এ অপরাধের কোন মার্জনা নেই।"

—"কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে তো আপনি ধর্মায়তনের প্রতিষ্ঠিত মতের বিরুদ্ধে নন," একটু অবাক হয়ে বললাম, কারণ আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে যে একাধিকবার আমি মিস স্পেনসারকে আমাদের এলাকার গীর্জায় যেতে দেখেছি। কিন্তু উনি যদি তা অস্বীকার করেন তবে আমার বলবার কি আছে। এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি বলতে যাবই বা কেন।

এরপর যে দিন মিস স্পেনসারের বাড়ি গেলাম, দেখলাম তিনি বাইবেল পড়ছেন। প্রিয় 'ইজিচেয়ার'খানায় গা ঢেলে দিয়েছেন তিনি। তাঁর কোলে খোলা বাইবেল, আমাকে স্বাগত জানালেন মিস স্পেনসার। আমি তাঁর পাশের চেয়ারখানায় বসলাম। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে মিস স্পেনসার বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই বাইবেলের 'কেইন আর অ্যাবেল'-এর কাহিনী পড়েছেন?"

এমনভাবে তিনি প্রশ্নটা করলেন যেন তিনি সদ্য প্রকাশিত কোন উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে চাইছেন।

আদিম মানব-মানবী আদম আর ইভের পুত্র কেইন তার ভাই অ্যাবেলকে হত্যা করে। বাইবেলের এ গল্প তো সবাইকারই জানা।

—"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পড়েছি," মিস স্পেনসারের প্রশ্নের উত্তরে বললাম।

—"আপনি কি পৃথিবীর প্রথম খুনীর মুখে যে কলঙ্ক চিহ্ন ফুটে উঠেছিল, তার কথা কখনও ভেবেছেন?"

—"মাঝে মাঝে ভেবেছি," আমি উত্তর দিলাম।

—"এ বিষয়ে আপনার মত কি?" নির্লিপ্ত স্বরে প্রশ্ন করলেও মিস স্পেনসারের কালো চোখের দৃষ্টিতে কেমন যেন এক অতলান্ত গভীরতা—কেমন এক অনির্দেশ্য রহস্যময়তা।

—"এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা খুবই শক্ত। আমাদের জ্ঞান এতই সীমিত যে এ ব্যাপারে অনুমান ছাড়া অন্য কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

—"ঠিকই বলেছেন। অনুমানের ফলে আসতে পারে কৌতূহল। হ্যাঁ ব্যাপারটা খুবই কৌতূহলজনক।"

একটু থেমে মিস স্পেনসার বললেন "যেমন ধরুন ঐ কলঙ্ক চিহ্ন। তা কি সব সময়েই থাকত? না কি বিশেষ বিশেষ পরিবেশে অথবা অবস্থায় চিহ্নগুলি ফুটে উঠত?"

—"বলতে পারব না। এ সম্পর্কে আমি কোন দিন ভাবিনি। সত্যি কথা বলতে কি—এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাই আমার কাছে একেবারে নতুন।"

—"কলঙ্ক চিহ্ন সব সময় থাকুক কি না থাকুক, কেইনের তাতে কি?" মিস স্পেনসারের কণ্ঠে শোনা গেল বিষণ্ন সুর, "কেইন নিজে তো জানত কি প্রচণ্ড অন্যায়—কি মহাপাপ সে করেছে, কৃতকর্মের জন্য অনুতাপে ভরে গিয়েছিল তার মন। পাপ স্খালনের জন্য সে আকুলভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু কেইন জানত যে জীবনের শেষ দিন—শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈশ্বরের ক্রোধের প্রতীক স্বরূপ ঐ নিদারুণ কলঙ্ক চিহ্ন তাকে বহন করতে হবে নিজের শরীরে, উঃ কি দুর্ভাগ্য! কি শাস্তি!"

দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় হাত কচলাতে লাগলেন মিস স্পেনসার।—"কিন্তু কেইন মহাপাপ করেছিল। সে তার নিজের ভাইকে হত্যা করেছিল," কেইনের মতো একজন নৃশংস হত্যাকারীর উপর মিস স্পেনসারের সহানুভূতি দেখে আমি অবাক হয়ে বললাম, "কেইনের শাস্তি পাওয়াই উচিত। হ্যাঁ, সে যে মহাপাপ করেছিল সে জন্য ও রকম শাস্তিই ছিল তার প্রাপ্য। ঈশ্বর তাকে ঠিক শাস্তিই দিয়েছেন। কেইনের উপর আমার কোন সহানুভূতি নেই।"

—"ওরকম কথা বলবেন না," যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে মিস স্পেনসার বললেন। তাঁর কথাগুলো আর্তনাদের মতো শোনাল।

তাঁর চোখের দিকে চোখ পড়তেই আমার সমস্ত শরীরটা শিউরে উঠল। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

কি দেখলাম তাঁর চোখে? জানি না, গুছিয়ে বলতে পারব না। মিস স্পেনসার দেখলেন আমার ভাবান্তর। মুহূর্তের মধ্যে আবার ফিরে এল তাঁর আগেকার শান্ত ভাব। একটা মুখোশ যেন খুলে পড়েছিল ক্ষণিকের জন্য।

"মানুষের প্রথম অপরাধের মূলে ছিল হিংসা। পরবর্তীকালে এই হিংসা প্রবৃত্তিই আত্মপ্রকাশ করেছে মানুষের বিভিন্ন অপরাধের মধ্য দিয়ে। হিংসা হল মহা অমঙ্গল। এ হল মানুষের উপর শয়তানের প্রভাবের ফল। ঈশ্বরের সৃষ্টিকে নষ্ট করে দিতে চায় শয়তান। তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে সে প্রলুব্ধ করে নানাভাবে," মিস স্পেনসার থামলেন।

"ব্যাপারটা খুবই খারাপ। মানুষ তার ভালবাসার পাত্রপাত্রীকে খুন করবে আর হিংসাকে দেখাবে তুচ্ছ অজুহাত হিসেবে...এরকম কথা ভাবতেই তো খারাপ লাগে," আমি বললাম।

—"একজন মানুষ তার ভালবাসার পাত্রকেও খুন করতে পারে—একথাটা কি আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না?"

—"না, একথা আমি বিশ্বাস করি না।"

—"কেন?" মিস স্পেনসার ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন।

—"কারণ ভালবাসা কখনও হত্যা করতে পারে না। মানুষের অশুভ কামনা জাগিয়ে তোলে অসৎ প্রবৃত্তিকে। অন্ধ আবেগের তাড়নায় মানুষ করে অপরাধ। ভালবাসা শেখায় আত্মত্যাগ। হিংসা নিয়ে আসে দুঃখ...বেদনা আর ভালবাসা?

যে মানুষ ভালবাসে সে প্রিয়জনের সুখের জন্য নিজেকে বিলিযে দিতে পাবে নিঃশেষে...সম্পূর্ণভাবে। ভালবাসা সব সময়ই সুখী কবতে চায প্রেমেব পাত্রকে।”

আমাব দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিযে রইলেন মিস স্পেনসাব, তাবপব ধীরে ধীবে বললেন,

“প্রবল প্রলোভনেব শক্তি যে কি প্রচণ্ড তা আপনি জানেন না। প্রলোভনেব শিকাব হযে মানুষ যে কত খাবাপ কাজ কবতে পাবে, তা আপনি জানেন না। মানুষ যে কত নিচে নামতে পাবে তা আপনাব ধারণাবও বাইবে। আপনি খুব ভাল মানুষ মিসেস হোপ,...খুব সবল। আপনি এলে আমি খুব আনন্দ পাই, সত্যি বলছি খুব আনন্দ পাই।”

সেদিনকাব মতো কথাবার্তা ওখানেই শেষ হল।

কযেকদিন পবে মিস স্পেনসাবেব কাছ থেকে চিঠি নিযে খানসামা লুই আমাব কাছে এল। মিস স্পেনসাব জানতে চেযেছেন সেদিন আমি তাব সঙ্গে গাড়ি কবে বেড়াতে যেতে পাবব কি না? তাছাড়া দুপুবেব খাওযাটা তাব ওখানেই সেবে নিতে আমাব কোন অসুবিধা আছে কিনা সে কথাও জানতে চেযেছেন মিস স্পেনসাব।

লুই এর মারফৎ জানালাম যে খেতে বা বেড়াতে যেতে আমাব কোন অসুবিধা নেই।

বেলা প্রায় বারটার সময় মিস স্পেনসাবেব গাড়ি এসে দাঁড়াল আমাদেব বাড়িব সামনে।

তৈরি হয়েই ছিলাম। গাড়িটা আসতেই বেরিয়ে পড়লাম।

দুপুরের খাওয়া সেবে গাড়ি করে বেবোলাম। খানসামা লুই যথারীতি সঙ্গেই বইল।

ঘণ্টা দুই ঘুরলাম আমবা। তাবপব ফেরবার পালা। বড় রাস্তা ধরে আমরা ফিরছিলাম। বাড়ি এখনও আধ মাইল দূবে, একটা টুপিব দোকানেব সামনে এসে পড়েছি আমরা। এ দোকানে মেয়েদের নানা বকমেব টুপি পাওয়া যায়, এ দোকানটার পাশে একটা ফটো তোলবাব স্টুডিও।

মিস স্পেনসার গাড়ি থামাবাব নির্দেশ দিলেন। গাড়িটা থামল টুপির দোকানেব সামনে। ভাবলাম ভদ্রমহিলা হয়ত টুপি কিনবেন।

‘এখানে নয়, স্টুডিওব সামনে চল, ফটো তুলব,” অস্বাভাবিক দৃঢ় স্ববে মিস স্পেনসাব বললেন।

গাড়ি থামল স্টুডিওব সামনে।

খানসামা লুই নামল দবজা খুলবার জন্য। কিন্তু দবজা না খুলে হাতলে হাত বেখে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বইল। ওব চোখে মুখে দুশ্চিন্তাব ছাপ দেখে অবাক হলাম।

“মাদাম,” লুই বলল আব ঐ একটা শব্দেব মধ্যেই যেন ঝবে পড়ল একরাশ মিনতি। তাব মুখে যেন ফুটে উঠল নিষেধের রেখা।

মিস স্পেনসাবেব দুটি চোখ যেন বিদ্যুতেব মতো ঝলসে উঠল। তিনি হুকুম দিলেন “দবজা খোল।”

সেই শীতল অথচ দৃঢ়কণ্ঠের আদেশ অমান্য করা অসম্ভব।

গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। শুনতে পেলাম লুই-এর দীর্ঘনিশ্বাস। সে আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। ওর ভাব দেখে মনে হল লুই যেন কিছু বলতে চায় আমাকে। কিন্তু সে কথা বলবার সাহস নেই ওর। এর অর্থ কি? কিছুই বুঝতে পারলাম না।

স্মিথের স্টুডিওর সামনে গাড়ি থেমেছে। আমাদের এ শহরতলীতে ভাল ফটোগ্রাফার হিসেবে স্মিথের খুব নামডাক। আমি আর আমার স্বামী এখান থেকে কয়েকবার ফটো তুলিয়েছি। খুব যত্ন করে ছবি তুলেছে স্মিথ। ছবিও খুব সুন্দর হয়েছে।

আমাদের ঢুকতে দেখে কাউন্টার থেকে একটি অল্পবয়সী মেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল :

—"ছবি তুলবেন?"

—"হ্যাঁ," মিস স্পেনসার বললেন।

"আপনাদের কি আসবার কথা ছিল?"

"হ্যাঁ, দুটোর সময় আসবার কথা ছিল।"

মিস স্পেনসার তাঁর নাম বললেন।

"আসুন, আপনারা ভিতরে আসুন," মেয়েটি আমাদের নিয়ে গেল ভিতরের একখানা ঘরে — ছবি তুলবার জায়গায়।

একটু পরেই স্মিথ বেরিয়ে এল 'ডার্কচেম্বার' থেকে। আমাকে দেখে একটু হেসে বলল, "এই যে মিসেস হোপ, কি রকম 'পোজ' এ ছবি তুলবেন?"

"আমি নয়, ছবি তুলবেন আমার বান্ধবী," জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন মিস স্পেনসার। তার দিকে আঙুল তুলে দেখালাম।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই মিস স্পেনসার আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালেন। তার দিকে তাকিয়ে ফটোগ্রাফার স্মিথ চমকে উঠল।

হ্যাঁ, চমকাবারই কথা। ভদ্রমহিলার মুখে অদ্ভুত পরিবর্তন। মাত্র দশ মিনিট আগে আমি কি এই মহিলার সঙ্গেই গল্প গুজব, হাসি ঠাট্টা করছিলাম? মিস স্পেনসারের চোখ দুটো বসে গিয়েছে। মুখখানা পাণ্ডুর, সেখানে যেন এক বিন্দু রক্ত নেই। তার সুন্দর গোল মুখখানা কেমন যেন লম্বাটে হয়ে গিয়েছে। তাঁর মুখের রেখায় ফুটে উঠেছে অসহনীয় যন্ত্রণার নির্ভুল ইঙ্গিত। ভদ্রমহিলা অমানুষিক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন।

—"আপনি অসুস্থ...আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি চিৎকার করে বললাম, "একটু জল...তাড়াতাড়ি একটু জল আনুন কেউ।"

—"না, জলের প্রয়োজন নেই" মিস স্পেনসার অদ্ভুত গলায় বললেন, তারপর আসনে বসে স্মিথকে ইঙ্গিত করলেন ছবি তুলবার জন্য।

স্মিথ তাড়াতাড়ি কালো পর্দা ঘেরা কোনায় গিয়ে ঢুকল। পরে আমার মনে হয়েছিল স্মিথ মিস স্পেনসারের বসার ভঙ্গি ঠিক করে দেয়নি, এমনকি একটা কথাও বলেনি এ সম্পর্কে।

—"এখন ছবি তুলে কি হবে? কি দরকার?" মিস স্পেনসারের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে তাঁর বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত দু'খানা ঘষতে ঘষতে বললাম, "আপনি অসুস্থ। এখন আপনার শরীরের অবস্থা ফটো তুলবার মতো নয়। আপনার আসল চেহারা ছবিতে উঠবে না। দেখে মনে হবে মৃত মানুষের ছবি।"

মিস স্পেনসারের গলা চিড়ে বেরিয়ে এল এক অমানুষিক দুঃসহ আর্তনাদ। পৃথিবীর সমস্ত যন্ত্রণা যেন ধরা পড়ল ঐ তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মধ্যে। তাঁর ডান হাতখানা ধরল চেয়ারের হাতল, দাঁতে দাঁত আটকে গেল। মিস স্পেনসারের কপালে ফুটে উঠল বড় বড় ঘামের ফোঁটা। একটা প্রচণ্ড ভয় যেন আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে তাঁকে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তিনি যুঝে চলেছেন সেই মহাভয়ের সঙ্গে।

ভদ্রমহিলার এরকম অবস্থা দেখে আমার দারুণ ভয় হল। আমি কাঁপতে লাগলাম।

—"আসুন...চলে আসুন আপনি," ভদ্রমহিলাকে চেয়ার থেকে টেনে তুলবার চেষ্টা করতে করতে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

মিস স্পেনসার বাধা দিলেন। ভাঙা গলায ফ্যাস ফ্যাস করে তিনি বললেন: "আমি জানব...আমাকে জানতেই হবে...আপনি আমার কাছে থাকুন...কাছে থাকুন আমার...আমাকে একটু সাহায্য করুন..."

মিস স্পেনসারের পাশে বসলাম। নিজের মুখ ঢেকে ফেললাম দু'হাত দিয়ে। ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকাবার সাহস আমি হারিযে ফেলেছিলাম। মনে হচ্ছিল একটা বিয়োগান্তক নাটকে আমি যেন কোন ভূমিকায অবতীর্ণ হয়েছি। কিসের জন্য ভয় তা না জানায় আমার ভয় যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল।

সময় কেটে যাচ্ছে। সময় কারো জন্য বসে থাকে না, কালো কাপড়ে ঘেরা জায়গাটার মধ্যে ফটোগ্রাফার স্মিথের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। অভিভূতের মতো বসে রইলাম।

হঠাৎ স্মিথের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম। স্মিথ বলছে,—"খুবই দুঃখিত ম্যাডাম, আপনার ফটো তোলা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

একটা কথা বললেন না মিস স্পেনসার। চেযার থেকে উঠে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিযে গেলেন। তাঁর মুখে নিদারুণ হতাশার ছাপ। ভদ্রমহিলাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল।

বাড়ি ফিরবার পথে আমাদের দু'জনের মধ্যে কোন কথা হল না। আমাদের বাড়ির গেটের সামনে গাড়ি পৌঁছলে তিনি এই প্রথম আমাকে জড়িযে ধরে চুমু খেলেন। তারপর বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, "বিদায় মিসেস হোপ...চিরবিদায়।"

আমার দু'চোখ জলে ভরে এসেছিল। গলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল কান্না। মিস স্পেনসারের কথার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। কান্নাভরা গলায় তাঁকে জিজ্ঞেসও করতে পারলাম না কোন কথা, ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই যথাসময়ে আমাকে খুলে বলবেন সব কথা।

সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী ফিরলেন, স্টুডিওতে যা ঘটেছিল তা তাঁকে খুলে বললাম।

একটি কথাও বাদ দিলাম না। আমার স্বামী ব্যাপারটাকে হালকাভাবেই নিলেন। বললেন, "এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। এ হল স্নায়ুর দোষ, খেয়ালী মনের উৎকট কল্পনা-বিলাসও বলা যেতে পারে একে।"

—"কক্ষণো না," প্রতিবাদের সুরে আমি বললাম, "তুমি যদি মিস স্পেনসারের পাল্টে যাওয়া মুখখানা দেখতে তাহলে কিছুতেই এরকম কথা বলতে পারতে না।"

আমার কথা শেষ হতে না হতেই পরিচারিকা এসে বলল, "ফটোগ্রাফার মিঃ স্মিথ এসেছেন, তিনি গিন্নীমার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

আমি বললাম, "ওঁকে এখানেই নিয়ে এস।"

মিঃ স্মিথ ঘরে এলে আমার স্বামী বললেন, "এই যে মিঃ স্মিথ, আপনার স্টুডিওতে আজকে নাকি কি সব রহস্যময় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে? আমার স্ত্রী তো একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছেন।"

—"তাতে অবাক হব না কারণ আমি নিজেও ঘাবড়ে গিয়েছি। মিসেস হোপের সঙ্গে যে মহিলা আজকে আমার স্টুডিওতে গিয়েছিলেন তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমি। ভদ্রমহিলা যদি মিসেস হোপের বান্ধবী হন, তবে একথা বলতে আমি বাধ্য হব যে ভদ্রমহিলা ঠিক স্বাভাবিক নন। কোন একটা অবিশ্বাস্য অদ্ভুত ব্যাপার জড়িয়ে আছে ওঁর জীবনের সঙ্গে। হয়ত ব্যাপারটা অলৌকিক...অপ্রাকৃত।"

—"আপনার এরকম ধারণার কারণ?"

—"ভদ্রমহিলার ছবি তোলা সম্ভব নয়।"

—"শুধু এই কারণেই আপনার এরকম ধারণা হল?" অবজ্ঞার সুরে আমার স্বামী প্রশ্ন করলেন।

—"না, শুধু আজকের ব্যাপারে নয়। মিস স্পেনসারকে আমি আগেও দেখেছি। পাঁচ বছর আগে আমি একটা বিখ্যাত কোম্পানির ফটোগ্রাফার ছিলাম। উনি ফটো তুলবার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও আমি ওঁর ফটো তুলতে পারিনি। ভদ্রমহিলার ছবি তোলা যে অসম্ভব সেকথা তখন ওঁকে জানিয়েও দিয়েছিলাম।"

"—অসম্ভব কেন?" আমার স্বামী প্রশ্ন করলেন।

—"কারণ প্রত্যেকটা নেগেটিভ অসংখ্য দাগে ভরা। ভদ্রমহিলা জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন, কাজেই তাঁর মুখটা আমি প্রথমে দেখতে পাইনি। কিন্তু উনি যখন ঘুরে আমার দিকে তাকালেন তখন দেখলাম একখানা শঙ্কা-বিহ্বল মুখ। দেখেই চিনতে পারলাম ওঁকে। আমি ফটো তুলবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা করলাম, বৃথা চেষ্টা।"

—"কেন? কি হল?" আমি প্রশ্ন করলাম। উত্তেজনায় আমার গলা থরথর করে কাঁপছিল।

—"ফল সেই একই রকম। তবু আপনাদের দেখাবার জন্য আমি দু'খানা 'নেগেটিভ' 'প্রিন্ট'-ও করেছি। ফল কি হয়েছে দেখুন। মিঃ হোপ, আপনিই আগে দেখুন।"

ব্যাগের ভিতর থেকে দু'খানা ফটো বের করে মিঃ স্মিথ আমার স্বামীর হাতে দিলেন।

ফটো দেখে আমার স্বামীর মুখের চেহারা পালটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। প্রচণ্ড কৌতূহল আর উৎকণ্ঠায় আমি যেন ফেটে পড়ছিলাম। আমার আর তর সইছিল না। আমিও ফটোগুলির দিকে তাকালাম।

হায় ভগবান! একি দৃশ্য দেখলাম! দারুণ আতংকে আমার সমস্ত শরীরটা কাঁপতে লাগল থরথর করে। সমস্ত ছবি দাগে ভরে গিয়েছে। প্রতিটি দাগে একটি করে মুখের ছাপ। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, পরিষ্কার মুখের ছাপ...নিখুঁত ছাপ!

আর সে মুখের ছাপ মৃত মানুষের!

দারুণ আতংকে শিউরে উঠলাম। আমার চারপাশ দুলে উঠল। অন্ধকার! অন্ধকার! আমার চারপাশে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার! চারপাশ থেকে অন্ধকারের মহাসমুদ্র যেন আমাকে গ্রাস করবার জন্য ছুটে আসছে।

আর কিছু মনে নেই আমার। আমি বোধ হয় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলাম ঘরের মেঝেতে।

পরদিন আমার স্বামী আমাকে ওবাড়ি থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলেন।

পনের দিন পরে যখন ফিরলাম তখন সামনের বাড়িটা খালি। মিস স্পেনসার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি। হয়ত ভবিষ্যতেও দেখা হবে না, ভদ্রমহিলা যতবড় অপরাধই করে থাকুন না কেন, আমি জানি তিনি অনেক শাস্তি পেয়েছেন...অনেক যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। সে যন্ত্রণা দুঃসহ।

তিনি যে মহাপাপ করেছেন তার জন্য তার মনে অহরহ অনুতাপ হচ্ছে...অনুশোচনা হচ্ছে। এ থেকে তার মুক্তি নেই - কোনদিনই মুক্তি নেই।

মিস স্পেনসারের জন্য সমবেদনা বোধ করি, আমার সমস্ত মন দিয়ে তার উদ্দেশ্যে জানাই আমার সহানুভূতি।

অনুবাদ : অনিরুদ্ধ চৌধুরী

কখনো সন্ধ্যায়

Christmas Meeting —রোজমেরি টিমপারলি

এর আগে কোনদিন একা বড়দিনের ছুটি কাটাইনি, ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিলাম এই নির্জন অঞ্চলে। একা একা বসেছিলাম সাজানো গোছানো ঘরে। কেমন একটা অলৌকিক... অপ্রাকৃত অনুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলছিল আমার মনকে। মাথায় একরাশ ভৌতিক চিন্তা। এ ঘরে কত লোক থেকে গিয়েছে। অতীতের শব্দ আর গন্ধে ভরা ঘরখানা, সে শব্দ আর সে গন্ধ যেন আমার চেতনার প্রান্তসীমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। একটু চেষ্টা করলেই সেগুলি যেন ধরা পড়বে আমার কাছে, আমি যেন অতীতের মধ্যেই ডুবে যাচ্ছি। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্যে ধরা পড়তে চাইছে গোটা অতীত।

অতীতের সমস্ত বড়দিনগুলো পাগলের মতো তালগোল পাকিয়ে আসছে আমার মনে।

শৈশবের বড়দিন! বাড়িভরতি আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব। জানালায় ক্রিসমাস গাছ। পুডিং এর মধ্যে লুকানো ছয় পেন্স। প্রত্যুষের তরল অন্ধকারে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা, পায়ে মোজা পরা —সমস্ত খুঁটিনাটিই মনে পড়ছে এক এক করে।

বয়ঃসন্ধিকালের বড়দিন! বাড়িতে মা বাবার সঙ্গে দিন কাটানো, যুদ্ধ! প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, বিদেশ থেকে আসা পত্রগুচ্ছ, না কিছুই ভুলে যাইনি আমি।

মনে পড়ছে যৌবনোচ্ছল দিনগুলির কথা। যৌবনের বড়দিন! প্রেমের ছোঁয়া লেগেছে জীবনে। সঙ্গে প্রেমিক। বরফ পড়ছে, আমার মন মন্ত্রমুগ্ধ। লাল মদ। চুমু। মধ্যরাত্রির আগ পর্যন্ত অন্ধকার পথে মনের খুশিতে হেঁটে বেড়ানো, পায়ের নিচের জমি বরফে ঢেকে সাদা। মাথার উপরে কালো আকাশ, সেখানে অসংখ্য তারা। তারাগুলো হীরের মতো উজ্জ্বল।

সারাজীবনের সমস্ত বড়দিনগুলো এসে যেন ভিড় করছে আমার মনের আকাশে।

আর এই প্রথম একলা কাটানো বড়দিন, আজ আমি নিঃসঙ্গ —একান্ত একলা।

কিন্তু না, আমার মুহূর্তগুলো নির্জনতায় ভরা নয়। অতীতে এবং বর্তমানে যারা ক্রিসমাসের অবকাশের দিনগুলো একা একা কাটিয়েছে বা কাটাচ্ছে, অনুভূতির জগতে আমি তাদের সাথী। মনে হচ্ছে এখন যদি চোখ বন্ধ করি তাহলে আমার কাছে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে না, থাকবে শুধু সীমাহীন বর্তমান। আর তা হল সময়।

কিন্তু যতবড় বিশ্বনিন্দুকই হও না কেন, হও না কেন যতবড় অধর্মাচারী, বড়দিনের সময় একলা দিন কাটাতে হলে একটা অদ্ভুত অনুভূতি তোমাকে পেয়ে বসবেই বসবে। বিশেষ করে আজকের মতো এই বিষণ্ন সন্ধ্যায়।

তাই এক যুবক যখন এসে আমার ঘরে ঢুকল, তখন কেমন যেন স্বস্তি পেলাম, না না, এর মধ্যে কোন রোমান্টিক ব্যাপার নেই। একথা ঠিকই যে আমি একজন মহিলা। কিন্তু আমার বয়স প্রায় পঞ্চাশ, আমি একজন অবিবাহিতা স্কুল-শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রী শাসন করতে করতে আমার মুখখানাই বোধ করি করালদর্শন হয়ে গিয়েছে। মাথার চুল অবশ্য এখনও কালোই রয়েছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি হয়ে পড়েছে ক্ষীণ। অথচ একদা আমার চোখ দু'টি কি সুন্দর...কি উজ্জ্বল ছিল। লোকে আমার চোখের প্রশংসা করত। গর্বে ভরে উঠত আমার মন।

যে ছেলেটি আমার ঘরে ঢুকল, সে একেবারে ছেলেমানুষ। ওর বয়স কুড়ি বছরের বেশি নয়! ছেলেটির পোশাক-পরিচ্ছদ রীতিনীতিবর্জিত। মদের মতো রঙের টাইটা ভাঁজে ভাঁজে ঢেউ-খেলানোভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বুকের উপর। গায়ে কালো রঙের মখমলের জ্যাকেট, থোকা থোকা বাদামী রঙের চুল এসে পড়েছে কপালের উপর, চুলে অনেকদিন নাপিতের কাঁচির ছোঁয়া পড়েনি। পড়লে ভাল হত। ছেলেটির পোশাক পরিচ্ছদের দুর্বলতাটা ঢাকা পড়ে গিয়েছে তার চেহারার বৈশিষ্ট্যে। ওর চোখ দুটি সংকীর্ণ, চোখের তারা দুটি নীল, দৃষ্টি মর্মভেদী, খাড়া নাক আর দৃঢ় চিবুকের গড়নের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছে একটা গর্বের ভাব। না, ছেলেটাকে দেখে মোটেই শক্তিশালী মনে হচ্ছে না, ওর দেহের মাংস বা মেদের বাহুল্য নেই। দেহের কাঠামোর উপর যেন কেবল মসৃণ চামড়ার আবরণ রয়েছে। চামড়ার রঙ সাদা—খুব সাদা। ফ্যাকাশেও বলা যেতে পারে।

আচমকা ঘরে ঢুকল ছেলেটি। কোনরকম জানান না দিয়ে ঢুকেই আমাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

—"দুঃখিত, আমি ভেবেছিলাম এ আমার ঘর।"

ছেলেটি বেরিয়ে যাচ্ছিল ; তারপর দরজার বাইরে গিয়ে একটু ইতস্তত করে বলল,

—"আপনি কি একলা ?"

—"হ্যাঁ।"

—"বড়দিনের সময় একলা থাকতে কেমন...কেমন যেন অদ্ভুত লাগে, তাই না? আমি কিছুক্ষণ বসে আপনার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করলে বিরক্ত হবেন না তো ?"

—"নিশ্চয়ই না, বরং খুশিই হব", মৃদু হেসে আমি বললাম। ছেলেটি আবার ঘরে ঢুকল, বসল আগুনের পাশে।

—"আমি এ ঘরে ঢুকে পড়ায় আশা করি আপনি কিছু মনে করেননি। আমি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এ ঘরে আসিনি। আমি সত্যিই ভেবেছিলাম এ ঘরখানা আমার। এ বড্ড ভুল হয়ে গিয়েছে।"

—"আপনি ভুল করেছেন বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। ভুলটা করেছিলেন বলেই তো আপনার সঙ্গে আলাপ হল। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না।"

—"কি ব্যাপার?" তরুণ আগন্তুক প্রশ্ন করল।

—"আপনি তো দেখছি একেবারে ছেলেমানুষ, বড়দিনের সময় আপনি একলা কেন?"

—"গাঁয়ে আমাদের বাড়িতে আমি যাব না। হ্যাঁ, লোকজনের ঝামেলা আমার একদম ভাল লাগে না। লোকজনের ভিড়ে আমার কাজের ক্ষতি হয়, আমার লেখার কাজ আটকে যায়।"

—"আপনি বুঝি একজন লেখক?"

—"হ্যাঁ।"

যুবকের মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল।

"তাই নাকি," মৃদু হেসে বললাম, "তবে তো আপনার প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। আপনার তো এক মুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা উচিত নয়।"

যুবকের পোশাক-পরিচ্ছদ আর ভাবভঙ্গির একটা মানে এতক্ষণে খুঁজে পেলাম। ও সত্যিই নিজেকে লেখক বলেই বিশ্বাস করে।

"নয়ই তো!" উৎসাহের সঙ্গে যুবক বলে উঠল। "কিন্তু মুশকিল কি জানেন, আমার বাড়ির লোকেরা এটা মোটেই বুঝতে চায় না। তাদের ধারণা আমি অকর্মণ্য...অপদার্থ...জীবন-পলাতক," উত্তেজিত স্বরে যুবক বলে উঠল।

—"সংসারী লোকেরা কবেই বা শিল্পীর সমাদর করতে পেরেছে?"

—"ঠিক বলেছেন, একটা দামী কথা বলেছেন। তেল-নুন-লকড়ীর চিন্তা যাদের সারা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তারা কি করে কবি বা শিল্পীর প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন করবে?...কিন্তু তাই বলে অনাবশ্যক সমালোচনাই বা কেন করবে?" যুবকের কথার সুরে কেমন একটা আর্তি ফুটে উঠল।

—"যাক, যাক—ও সব বিষয়ী লোকেদের কথা ছেড়ে দিন। আপনি এখন কি লিখছেন?"

—" 'আমার কবিতা এবং আমি'। কবিতা আর ডায়েরী একসঙ্গে। ডায়েরীটা খুব মূল্যবান। এটা সঙ্গে থাকায় কবিতাগুলোর সঠিক তাৎপর্য বোঝা যাবে, অর্থাৎ কবির কোন্ মানসিকতা থেকে কোন্ কবিতার জন্ম তা ধরতে পারা যাবে।"

—"বাঃ চমৎকার!" তরুণকে একটু উৎসাহ দেবার জন্য বললাম।

—"হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ফ্রান্সিস র‍্যান্ডেলের 'আমার কবিতা এবং আমি' একবার ছেপে প্রকাশিত হোক, দেখবেন কি রকম সাড়া পড়ে যায়। আমারই নাম ফ্রান্সিস র‍্যান্ডেল," যুবক নিজের বুকে হাত দিয়ে সগর্বে বলল।

একটু থামল তরুণ। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে ও। তারপর আবার শুরু করল।

—"জানেন আমার বাড়ির লোকেরা কি বলে? বলে কবিতা লিখে কি হবে? আমি নাকি এখনও ছেলেমানুষ। কিন্তু আমি তো নিজেকে একেবারেই ছেলেমানুষ

ভাবি না, বরং এক এক সময় মনে হয় আমি যেন পরিণত চিন্তাশক্তির অধিকারী এক বৃদ্ধ। সামনে মৃত্যু নিয়ে আসছে অবলুপ্তির অন্ধকার—অথচ জীবনে কত কিছু করা বাকি রইল।"

—"সৃজনশীলতার চাকায় আপনি দ্রুততর বেগে আবর্তিত হতে চান?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিক ধরেছেন। আপনি আমায় ঠিক বুঝতে পেরেছেন। জানেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার সৃজনীশক্তি আছে। একদিন না একদিন আপনি আমার লেখা পড়বেনই। বলুন—বলুন আপনি পড়বেন তো?"

যুবকের গলার স্বরে মিনতি আর ব্যগ্রতা ঝরে পড়ল।

—"নিশ্চয়ই পড়ব," ছেলেটিকে আশ্বস্ত করবার জন্য বললাম।

—"ঠিক বলছেন তো?" যুবকের কণ্ঠে যেন মরীয়া ভাব, চোখের দৃষ্টিতে যেন ভীরু ভাব।

—"ঠিকই বলছি। কিন্তু এতক্ষণ গল্প করছি, আপনাকে একটু কফি খাওয়ানো হয়নি; একটু বসুন, আমি এক্ষুণি কবে নিযে আসছি।"

ভিতরে ছোট্ট কিচেন-এ গেলাম। 'পারকোলেটর'-এ কফি তৈরি করলাম। দু'-কাপ কফি আর কেক নিয়ে যখন বসবাব ঘরে এলাম তখন যুবককে আর দেখতে পেলাম না। সে চলে গিযেছে। খেযালী তরুণ কি নিজের খেয়ালেই চলে গিযেছে? নাকি আমার কোন আচরণে ও মনে মনে আহত হযেছে? ওকে না দেখে আশাহত হলাম।

একা একাই কফিটা শেষ করলাম। ঘবের এক কোণে একটা বই-এর 'সেলফ' ছিল। সেলফ'-টা বইয়ে ঠাসা। এব জন্য বাড়িওয়ালী বারবার আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, "আশা কাব এই বই-এব তাকটার জন্য আপনি কিছু মনে করবেন না, মিস। এ হল আমাব স্বামীর বই। তিনি হলেন বই অন্ত প্রাণ। কিছুতেই এসব বই হাতছাড়া করবেন না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এ বইগুলো রাখবার জন্য বাড়িতে অন্য কোন জাযগাও নেই। বইগুলো ঘরের একটা কোণ আটকে রেখেছে, তাই ঘরের ভাড়াও একটু কম ধরেছি।"

—"না না, আমি কিছু মনে কবব না," ল্যান্ডলেডীকে আশ্বস্ত করবার জন্য আমি বলেছিলাম, "বই-এব চেযে বড বন্ধু আর কেউ নেই।"

কিন্তু 'সেলফ'-এর এই বইগুলিকে দেখে তো ঠিক বন্ধু ভাবতে ইচ্ছে হচ্ছে না। অলসভাবে একখানা বই টেনে বেব করলাম। আর বের করেই চমকে উঠলাম। একি অদ্ভুত ব্যাপার! এ কোন্ বই আমাব হাতে এল। ভাগ্যদেবতাই কি আমার হাত দিয়ে এ বইখানাকে টেনে বের করলেন? একি বিচিত্র খেয়াল ভাগ্যদেবতার!

একটা সিগারেট ধরিয়ে পুরনো ছেড়াখোঁড়া বইখানা খুললাম। পাতলা চটি বই। নাম 'আমার কবিতা এবং আমি', প্রকাশকাল ১৮৫২. খ্রিস্টাব্দের বসন্তকাল। কবিতাগুলো কাঁচা হাতের হলেও জীবন্ত। কবির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে কবিতাগুলির মধ্যে। সঙ্গে আবার ডায়েরীও বয়েছে। ডায়েরীর লেখা ব্যক্তিগত আবেগের দ্বারা প্রভাবিত নয়, বরং বেশ বাস্তবধর্মী।

কৌতূহলী হয়ে পাতা ওলটাতে লাগলাম। শেষ পাতায় এসে ডায়েরীতে শেষ 'এনট্রি' টা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। শেষ পাতায় ছাপার অক্ষরে রয়েছে:

"বড়দিন, ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ। এই প্রথম একলা বড়দিনের ছুটি কাটাচ্ছি। আজকে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। বিকেলে বেরিয়ে সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরে এলাম, দেখলাম মধ্য-বয়সী এক ভদ্রমহিলা আমার ঘরে বসে আছেন। প্রথমটায় ভাবলাম আমার নিজেরই ভুল হয়েছে---আমি নিজেই ভুল করে অন্য কারুর ঘরে ঢুকে পড়েছি। পরে দেখলাম তা নয়, আমি আমার ঘরেই ঢুকেছি। অনেকক্ষণ কথা বললাম ভদ্রমহিলার সঙ্গে, তারপর কি আশ্চর্য, ভদ্রমহিলা আমার চোখের সামনেই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। উনি নিশ্চয়ই কোন জীবিত মানুষ নন—নিশ্চয়ই কোন প্রেতাত্মা। কিন্তু আমি ওঁকে ভয় পাইনি...মোটেই ভয় পাইনি। বরং ভদ্রমহিলাকে আমার বেশ পছন্দই হয়েছিল।

আর লিখতে পারছি না, আজ রাতে আমার শরীরটা মোটেই ভাল লাগছে না। বুকটা কেমন ধড়ফড় করছে। সারা শরীরে কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব। এরকমটা তো আমার আগে কখনও হয়নি। এর আগে কোনবার বড়দিনের সময় তো অসুস্থ হয়ে পড়িনি।

তবে কি আমি ভয় পেয়েছি? আর ভয়ের ফলেই কি এই শারীরিক অস্বস্তি?"

শেষ 'এনট্রি' র পর প্রকাশকের কয়েক লাইন মন্তব্য রয়েছে:

"ডায়েরীর শেষ 'এন্ট্রি' ই ফ্রান্সিস র‍্যান্ডেলের শেষ লেখা। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের বড়দিনের রাতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তরুণ বাবর মৃত্যু হয়। ডায়েরীতে যে মধ্য বয়সী ভদ্রমহিলার কথা বলা হয়েছে, সম্ভবত ফ্রান্সিস র‍্যান্ডেলকে জীবিত অবস্থায় তিনিই শেষ দেখেছেন। আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছি, তাকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের চেষ্টা সফল হয়নি। উল্লিখিত ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে দেখাও করেননি। সেই মধ্য বয়সী ভদ্রমহিলার পরিচয় আজও রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।"

অনুবাদ: অনিরুদ্ধ চৌধুরী

মৃত্যুদূত

Vampire—জে. নেরুদা

সেবার বেড়াতে গিয়েছিলাম নিকট প্রাচ্যে, কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে স্টিমার ছাড়ে ট্যুরিস্টদের নিয়ে। ঘুরিয়ে দেখায় আশেপাশের দ্বীপগুলো। সেই স্টিমারে করে আমরা এসে পৌঁছলাম প্রিঙ্কি-পো দ্বীপে। এখন বেড়াবার মরসুম নয়, কাজেই ট্যুরিস্টদের সংখ্যা খুবই কম। যাত্রীদের মধ্যে ছিল পোল্যান্ডের একটি পরিবার। সে পরিবারে ছিলেন বাব-মা, মেয়েটি আর তার স্বামী। আমরা ছিলাম দু'জন। গোল্ডেন হর্ন* পেরিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল যাবার পথে দেখা হল এক গ্রীক যুবকের সঙ্গে। তার লম্বা চুল নেমে এসেছে কাঁধের উপর, মুখ পাণ্ডুর, চোখ দুটি কালো কিন্তু কোটরগত। ছেলেটির হাতে পোর্টফোলিও ব্যাগ। ওকে দেখে শিল্পী বলেই মনে হয়।

আশেপাশের এলাকা যুবকের বেশ ভাল করেই চেনা, ফলে কোথায় কোথায় কি কি দর্শনীয় বস্তু রয়েছে সে সম্বন্ধে সে ভ্রমণকারীদের বেশ ভালভাবেই পরামর্শ দিতে পারে। সে জন্য তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বেশ ভালই লেগেছিল; কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপের পরই বুঝলাম যে, ছেলেটি বড্ড বেশি বকবক করে। আমার আবার বকবকানি মোটেই সহ্য হয় না। সুতরাং এরপর ছেলেটির কাছ থেকে একটু নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখবারই চেষ্টা করলাম।

পোল পরিবারটি বেশ ভদ্র এবং সুরুচিসম্পন্ন। তরুণী মেয়েটি সুস্থ নয়। হয় সে কোন কঠিন রোগ থেকে সেরে উঠেছে, না হয় কোন মারাত্মক রোগের আক্রমণ শুরু হয়েছে তার দেহে। ডাক্তার মেয়েটিকে হাওয়া বদল করতে উপদেশ দিয়েছেন; আর সেজন্যই সুদূর পোল্যান্ড থেকে এই পরিবারটি এসেছে প্রিঙ্কি-পো দ্বীপে।

মেয়েটি খুবই দুর্বল। একটু হেঁটেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ভর দেয় স্বামীর শরীরে। মাঝে মাঝেই অবসন্নভাবে বসে পড়ে—বিশ্রাম নেবার জন্য। মেয়েটির কণ্ঠস্বর নিস্তেজ। কিন্তু সে স্বরও আটকে যায় কাশির দমকে। কাশতে কাশতে হাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটি। তরুণ যুবকটি তাকায় ওর দিকে। যুবকের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে গভীর সহানুভূতি—আন্তরিক সমবেদনা। একটু সুস্থ হলেই মেয়েটি তাকায় স্বামীর দিকে। তার মৌন দৃষ্টির মধ্য দিয়ে যেন ফুটে ওঠে এক অকথিত বাণী।

---

*গোল্ডেন হর্ন হল এ অঞ্চলের একটি বিরাট পোতাশ্রয়।

—"আমার জন্য ভাবছ কেন? আমার তো কিছু হয়নি, তুমি পাশে আছ, আমার আর ভয় কি? আমি তো ভালই আছি।"

গ্রীক যুবকের কাছ থেকে হোটেলের খবর নিয়েছিলাম। কয়েকটা হোটেল আছে এ দ্বীপে। একটা হোটেলের কথা বিশেষ করে বলেছিল গ্রীক যুবক। তার কথামতো সেই হোটেলেই ঘর নিলাম। পোল পরিবারও উঠল সেখানে। হোটেলটা পাহাড়ের উপরে। মালিক ফরাসী। হোটেলটি ফরাসী কায়দাতেই সাজানো-গোছানো।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলাম। বাইরে সৌরকরের খর দীপ্তি। চারদিক ঝকঝক করছে। এখন বিশ্রাম, রোদের তেজ একটু না কমলে বেড়াতে বেরোনো যাবে না।

দুপুরের তাপ কমল। সূর্য এখন আর মাথার উপরে নয়। আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পোল পরিবারও বেরোল আমাদের সঙ্গে। অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ পরিবারের সবাইকার সঙ্গেই আমাদের একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমরা পাহাড়ের উপর উঠলাম। উপরে পাইন গাছের অগভীর বন, গাছের তলায় বসলাম। চারপাশের মনোরম দৃশ্যে মন ভরে গেল—জুড়িয়ে গেল চোখ। স্বর্গের একটা টুকরো যেন খসে পড়েছে এখানে।

আর সেই গ্রীক তরুণও দেখি এখানে এসেছে। আমাদের কাছে এসে সে হাসিমুখে আমাদের অভিবাদন জানাল। আমাদের কাছ থেকে সামান্য দূরে সে বসল। বসল আমাদের দিকে পিছন ফিরে। বসেই ও শুরু করল ছবি আঁকতে।

—"ওর ছবি যাতে আমরা দেখতে না পাই সে জন্যই ও বোধ হয় পিছন ফিরে বসেছে," আমি মন্তব্য করলাম।

—"আমাদের চারপাশে প্রকৃতি দেবী এমন চমৎকার ছবি এঁকে রেখেছেন যে ওর ছবি না দেখলেও আমাদের চলবে," পোল যুবক বলল।

—"তা বটে!"

—"ঐ গ্রীক শিল্পীটি বোধ হয় পটভূমি হিসেবে আমাদের ব্যবহার করছে," কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর পোল যুবক বলল।

সুন্দর...সুন্দর...আমাদের চারপাশে যেন সুন্দরের মেলা বসেছে। পৃথিবীতে যে এমন সুন্দর জায়গা থাকতে পারে তা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। প্রিঙ্কি-পো-র সৌন্দর্যের কোন তুলনা নেই। কালির আঁচড়ে এ সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব, বাক-বিন্যাস করে এ সৌন্দর্যকে বোঝান যায় না।

মহামহিমান্বিত সম্রাট চার্লসের সমকালীন পূর্ব রোমক সম্রাজ্ঞী আইরিনকে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। নির্বাসনকালে তাঁকে একটি মাস কাটাতে হয়েছিল এই প্রিঙ্কি-পো দ্বীপে। আমি যদি এখানে একটি মাস থাকতে পারতাম তবে তার স্মৃতি যে চিরদিন আমার মনে থেকে যেত সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। মোটে একটি দিন ছিলাম প্রিঙ্কি-পো-তে। কিন্তু সেই দিনটির স্মৃতি আজও আমার মনে অম্লান হয়ে রয়েছে। সে দিনটির কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি।

চমৎকাব হাওযা। ঝডো নয়, হাওয়াব পবশ বড নবম—বড মোলাযেম; কেউ যেন আলতোভাবে অদৃশ্য হাত বুলিযে আদব কবছে আমাদেব। বাতাসেব অদৃশ্য পাখায় ভব দিযে মন যেন হাবিযে যেতে চায নিকট থেকে দূবে—দূব থেকে দূবান্তবে।

ডানদিকে সংকীর্ণ সমুদ্রেব ওপাবে দেখা যায এশিযা ভূখণ্ডেব বাদামী বঙেব শৈলচূডা। বা দিকে খাডা হযে উঠেছে ইউবোপেব বক্তিম সৈকত। বাজকুমাবী দ্বীপমালাব দ্বীপগুলিকে দেখা যায় কাছে...দূবে। কাছেই দ্বীপপুঞ্জেব নবম দ্বীপ চাল্কী, সেখানে সাইপ্রিস বৃক্ষেব অবণ্য। মৃত্যু বা শোকেব প্রতীক সাইপ্রস বৃক্ষেব অবণ্যে ভবা চাল্কী দ্বীপকে দেখে মনে হচ্ছে এ যেন এক বেদনাময স্বপ্নেব বিষাদ করুণ জগৎ।

মর্মব সাগব শান্ত। ঢেউগুলো খুব ছোট ছোট। পাহাডেব উপব থেকে প্রথম নজবে মনে হয যেন কোন ঢেউ ই নেই এখানে। অপবাহ্নে বৌদ্রে সাগবেব বুকে নানা বঙেব খেলা। দূবে সমুদ্রেব বঙ দুধ সাদা, তাবপব পশ্চিম আকাশেব সূর্যেব আলোয জলেব বঙ গোলাপী, দুই দ্বীপেব মাঝখানে জল কমলা-বাঙা আব আমাদেব নিচে সাগবেব বঙ সবুজেব পবশ মাখানো সনীল। পাহাডেব উপব থেকে সাগবেব দিকে তাকালে মনে হয কযেক খণ্ড উজ্জ্বল পোখবাজ যেন পাশপাশি বসিযে দিযেছে কোন এক মহাশিল্পী।

এই মুহূর্তে কোন বড জাহাজ নেই মর্মব সমুদ্রে। দেখা যায কেবল দু'খানা ছোট নৌকা। পাল তুলে তীবেব কাছ দিযে যাচ্ছে নৌকা দু'খানা। দাঁডিদেব দাড জলে পডছে আব উঠছে। উঠবাব সময দাড থেকে জল ঝবে পডছে সাগবেব বুকে। জল তো নয, ঝবে পডছে যেন গলিত রূপো। দাঁডিবা বুঝি পাডি দিচ্ছে কোন এক স্বপ্নলোকেব উদ্দেশ্যে, মাঝে মাঝে সুনীল আকাশে দেখা যাচ্ছে উডন্ত ঈগল, এশিযা আব ইউবোপ এই দুই মহাদেশেব মাঝখানে যে শূন্যতা বযেছে তাকেই যেন মাপতে চায আকাশচাবী মহাবিহঙ্গেব দল।

আমবা যেখানে বসেছি তাব ঠিক নিচেই পাহাডেব পাদদেশে গোলাপকুঞ্জ। অসংখ্য গোলাপ ফুটে আছে সেখানে। হাওযায ভেসে আসছে সগন্ধ। আবো নিচে সমুদ্রেব পাডে কফিখানা। সেখানে গান হচ্ছে। হাওযায ভেসে আসছে সে গান। বাতাস গানেব ধ্বনিকে বযে নিযে যাচ্ছে দূবে...আবও দূবে। সে সুব...সে ধ্বনি হাবিযে যাচ্ছে দূব সাগবেব পথে।

মানুষেব মনেব উপব পবিবেশেব প্রভাব অসীম। আমাদেব চাবপাশে এমন সুন্দব পবিবেশ। মনে হল আমবা বুঝি আব ব্যথা বেদনায ভবা পৃথিবীতে নেই। চলে এসেছি চিবসুন্দব চিব আনন্দময দেবলোকে। আমবা সবাই চুপ, কাবো মুখে কোন কথা নেই। আমবা তন্ময হযে বসেছি। কাচ কচি নবম ঘাসেব উপব শুযে আছে মেযেটি। তাব মাথা স্বামীব বুকেব উপবে। অপবাহ্নেব নবম আলো এসে পডেছে মেযেটিব মুখে। মুখখানি বড শান্ত...বড কোমল। মেযেটিব নীল চোখে জল, তরুণ স্বামীটি বুঝল তাব চোখেব নীবব ভাষা। ঝুঁকে পডে বাব বাব চুমু খেতে লাগল প্রিযতমাকে।

মেয়েটির মা-র চোখেও জল। আমি বিদেশী। কিন্তু আমার মনেও বেজে উঠল বিষণ্ণ বেদনার করুণ সুর।

—"এখানে থাকলে আমার অসুখ সেরে যাবে," মৃদু কণ্ঠে মেয়েটি বলল, "এ বড় সুন্দর জায়গা...বড় সুন্দর জায়গা গো।"

—"ভগবান জানেন, আমার কোন শত্রু নেই। যদি থাকত তবে এখানে এসে পরম শত্রুকেও ক্ষমা করতে পারতাম আমি," কাঁপা গলায় মেয়েটির বাবা পোল ভদ্রলোক বললেন।

এটুকু কথার পর আবার নেমে এল স্তব্ধতা। আমাদের সবাইকার মনে প্রগাঢ় শান্তি। আমরা এ শান্তির ভাগ দিতে চাই জগতের সবাইকে। কথা বলে আমরা যেন শান্তি ভঙ্গ করতে চাইছি না—কেউ বিরক্ত করতে চাইছি না কাউকে।

মাথা নুইয়ে চলে গেল গ্রীক শিল্পী, ওর ছবি আঁকা বোধ হয় শেষ হয়েছে। আমরা এত তন্ময় হয়ে বসে আছি যে ওকে ভাল করে লক্ষ্যই করলাম না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম আমরা। চারপাশের রঙ পাল্টে যাচ্ছে। অস্ত সূর্যের লালিমায় পরিবেশটা হয়ে উঠল রক্তিম। তারপর ঘনিয়ে এল তরল অন্ধকার।

"এবার আমাদের ফিরতে হবে," মেয়েটির মা মৃদুস্বরে বললেন।

হ্যাঁ, সত্যিই ফিরতে হবে। অন্ধকার নেমে এলে দুর্বল মেয়েটিকে নিয়ে পাহাড় থেকে নামতে অসুবিধা হবে। উঠলাম। প্রগাঢ় শান্তি আর অনির্বচনীয় আনন্দে আমাদের মন কানায় কানায় ভরা। দুঃখ, ব্যথা, বেদনা—এ সবই যেন আমাদের একান্ত অজানা।

পাহাড় থেকে নামতে লাগলাম। একটু পরেই এসে পৌঁছলাম আমাদের হোটেলে। নিজেদের ঘরে না ঢুকে দোতালার ঝুল-বারান্দায় বসলাম।

বারান্দায় বসেই শুনতে পেলাম কথা-কাটাকাটি আর ঝগড়ার আওয়াজ। দেখলাম হোটেলের মালিক আর সেই গ্রীক শিল্পী তর্জন-গর্জন করছেন। দু'জনেই খুব রেগে গিয়েছেন। মালিক চিৎকার করে বলছেন, "আমার হোটেলে অন্য অতিথিরা রয়েছেন, তা যদি না থাকতেন তবে তোমাকে আমি দেখে নিতাম। সম্ভ্রান্ত অতিথিদের সামনে আমি কোন অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা করতে চাই না; না হলে তোমার মতো লোকদের কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমার জানা আছে।"

উত্তরে গ্রীক যুবক কি বলল তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওর সঙ্গে আর বাক্যব্যয় না করে হোটেলের মালিক রাগে গর গর করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলেন। বারান্দায় আমাদের দেখে ভদ্রলোক পা চালিয়ে এলেন আমাদের কাছে: সৌজন্যের সঙ্গে অভিবাদন করলেন আমাদের।

—"ঐ গ্রীক যুবকটি কে? ওর নাম কি?" পোল যুবকটি জিজ্ঞেস করল।

—"কে জানে, ও হতভাগা কোন্ নরক থেকে এসেছে। ওর নাম আমি জানি না," ক্রুদ্ধকণ্ঠে হোটেলের মালিক উত্তর দিলেন।

—"ও, তা হলে ওকে চেনেন না?" পোল যুবকটি আবার প্রশ্ন করল।

—"চিনি মশাই, খুব চিনি। নাম না জানলেও চিনি। আমরা ওকে বলি ভ্যাম্পায়ার বা রক্তশোষা," ক্রুদ্ধ চোখে নিচের দিকে তাকিয়ে হোটেলমালিক বললেন।

—"ভ্যাম্পায়ার!" পোল যুবকের গলার স্বর যেন একটু কেঁপে গেল।

—"হ্যাঁ।"

—"আচ্ছা ঐ গ্রীক যুবক কি একজন শিল্পী?"

—"শিল্পী!" হোটেলমালিকের কণ্ঠে অকৃত্রিম বিস্ময়।

—"আমাদের তো তা-ই মনে হয়েছিল।"

—"হ্যাঁ, লোকটা আঁকে ভাল। তবে প্রকৃত শিল্পী কি কেবল মৃতদেহের ছবি আঁকে?" হোটেলমালিক এবার পাল্টা প্রশ্ন করলেন।

—"কেবল মৃতদেহের ছবি!" পোল যুবকের কণ্ঠস্বর একই সঙ্গে বিস্ময়বিহ্বল এবং শঙ্কাতুর।

—"হ্যাঁ ঠিক তাই, আসলে লোকটা ব্যবসায়ী। ও কেবল মৃতদেহেরই ছবি আঁকে। এখানে বা আশেপাশের কোন লোকের মৃত্যু যদি আসন্ন হয় তবে ও মুমূর্ষুর ছবি এঁকে ফেলে। তারপর সে লোক মরবার আগেই তার মৃতদেহের ছবি ছেপে ফেলে। আত্মীয়স্বজনের কাছে সে ছবির মূল্য হয় অনেক। লোকটার হিস্লেব একেবারে নিখুঁত, কি করে যে ও কারো আসন্ন অন্তিম মুহূর্ত বুঝতে পারে তা কেউ জানে না। তবে শকুন যেমন দূর আকাশ থেকে মৃতদেহের পাশে নেমে আসে, ও লোকটাও তেমনি চলে আসে মুমূর্ষুর কাছাকাছি। কোথা থেকে আসে—কেমন করে আসে তা কেউ বলতে পারে না।"

একটা আর্ত চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম। পোল্যান্ডের বয়স্কা মহিলাটি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠেছেন। তরুণী মেয়েটি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে মায়ের কোলে। তার মুখ অস্বাভাবিক পাণ্ডুর, এক ফোঁটা রক্ত যেন নেই সে মুখে। মা আঁকড়ে ধরেছেন মেয়ের অচেতন দেহটিকে। বাবা কাঁপছেন। দু'জনের চোখেই দারুণ আতংক।

বিদ্যুৎগতিতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল পোল যুবক। গ্রীক যুবকটিকে চেপে ধরে তার ব্যাগটাকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল সে, একটু সামলে নিয়ে আমরাও নিচে নেমে এলাম। দেখলাম পোল যুবক আর গ্রীক যুবক একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। চিত্রকরের ব্যাগের জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

আর সে জিনিসপত্রের মধ্যে রয়েছে একখানা ছবি। কাগজের উপর পেন্সিল দিয়ে আঁকা একটি তরুণীর মুখ। তরুণীর চোখ দুটি নিমীলিত—কপালের উপর শুভ্র সুগন্ধ ম্যার্‌ট্‌ল্‌ ফুলের মালিকা।

মুখখানি পোল তরুণীর।

অনুবাদ: অনিরুদ্ধ চৌধুরী

অলৌকিক

A Harz Mountain Werewolf Tale—বেরুহারডট জে. হুরউড

জার্মানীর হার্জ পর্বত এবং সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ে রয়েছে নানা কাহিনী এবং কিংবদন্তী। এখানে যে কাহিনী বলা হচ্ছে তাকে সত্যি কাহিনী হিসেবে দাবি করা হয়েছে। এ ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে একশো বছরের কিছু আগে।

আমাদের আজকের জ্ঞান এরকম ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না, হয়ত সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে এই রহস্যময় অলৌকিক ঘটনার কারণ এবং ফলাফলের ব্যাখ্যা সম্পর্কে। পণ্ডিতজনেরা ব্যাখ্যা আর ভাষ্য নিয়ে মাথা ঘামান গিয়ে, আমরা এখানে মূল কাহিনীটিই পরিবেশন করব।

কাউন্ট ফন ব্রেবার ছিলেন জার্মানীর একজন ধনী ভূস্বামী। তিনি বেড়াতে এসেছিলেন হার্জ পর্বতে। সঙ্গে তাঁর তরুণী বধূ কাউন্টেস হিল্ডা। এক রাতে কাউন্ট আর কাউন্টেসকে এক সরাইখানায় রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। এ সরাইখানাটি ছিল গ্রাউৎস নামক একটি গ্রামে।

সন্ধ্যার পর স্বামী-স্ত্রী সরাইখানার বৈঠকখানা ঘরে আগুনের পাশে বসে সরাইওয়ালার সঙ্গে ন্যনা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। কথা প্রসঙ্গে কাউন্টেস হিল্ডা বললেন,—"জানেন একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী পার হতে আমাদের খুব বেগ পেতে হয়েছিল। আমাদের কুকুরগুলো তো কিছুতেই জলে নামবে না। শেষ পর্যন্ত জোর করে তাদের জলে নামাতে হল। অথচ মজার ব্যাপার কি জানেন, নদীতে সাঁতার কাটতে ওরা খুবই পছন্দ করে। সাঁতারের সুযোগ পেলে আমাদের পোষা কুকুরগুলো আর কিছু চায় না।"

সরাইখানার মালিকের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, ঐ জায়গাটার কোন অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কথা কি আপনাদের মনে আছে?"

—"হ্যাঁ, নদী পেরোবার জায়গাটার কথা আমাদের পরিষ্কার মনে আছে।"

সরাইখানার মালিক জায়গাটার একটা বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানে একটা অদ্ভুত ধরনের বিশ্রী রকমের গন্ধ পেয়েছেন?"

—"আপনি যে জায়গার বর্ণনা দিলেন, সেখানেই আমরা নদী পার হয়েছি। আর একটা অদ্ভুত বিশ্রী গন্ধও পেয়েছি আমরা," কাউন্টেস হিল্ডা বললেন।

"জায়গাটা আমি ভাল করেই চিনি," সরাইখানার মালিক বললেন, "ওদিকটা মোটেই ভাল নয়, খুবই কুখ্যাত। ও এলাকাটার নাম 'উলফ হলো'। অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার পর কেউ ওখানে যেতে সাহস করে না।"

—"হিংস্র জীবজন্তু আছে বুঝি?" কাউন্ট ব্রেবার প্রশ্ন করলেন।

—"না, তা নয়।"

—"তবে?" কাউন্ট অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—"এখানকার লোকদের বিশ্বাস যে ঐ জায়গাটা অভিশপ্ত। পৃথিবীর বুকে যখন অন্ধকার নেমে আসে তখন ওখানে হানা দেয় এক অপ্রাকৃত অশুভ শক্তি। মহা অমঙ্গল যেন মূর্তিমান হয়ে ওঠে ওখানকার নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে।"

একথা শুনে কাউন্ট ব্রেবার উপহাসের হাসি হাসলেন। সরাইখানার মালিক উত্তেজিত হয়ে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কাউন্ট বিরক্তভাবে তাঁর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললেন, "—এ প্রসঙ্গে আলোচনা এখন বন্ধ থাক।"

কাউন্ট বন্ধ করতে বললেও কাউন্টেস হিল্ডার কিন্তু এ আলোচনা ভালই লাগছিল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন সরাই-মালিকের কথাগুলি। সরাইওয়ালা থামতেই তিনি বললেন,—"এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনি আরো অনেক কিছু জানেন, বলুন সে সব কথা।"

একটু ইতস্তত করলেন সরাই-মালিক। তারপর বললেন,—"লোকের বিশ্বাস ওখানে ঐ পাহাড়ী নদীর জল যে পান করে, তার জীবনে নেমে আসে ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য।"

—"কি ধরনের দুর্ভাগ্য?" কাউন্টেস জিজ্ঞেস করলেন।

—"ঢের হয়েছে!" কাউন্ট গর্জন করে উঠলেন, "কাউন্টেস ওখানে ঐ নদীর জল খেয়েছেন। আপনার ও সব ভুতুড়ে গাল-গল্প বলে ওঁকে ভয় পাইয়ে দেবেন না।"

—"আমি দুঃখিত ইয়োর এক্সেলেন্সী, আমরা কিন্তু এসব কাহিনী বিশ্বাস করি। আমাদের কাছে কিন্তু এগুলি নিছক ভুতুড়ে গাল-গল্প নয়।"

—"আপনি আমার কথা শুনেছেন," কঠিন স্বরে কাউন্ট ফন ব্রেবার বললেন, "যান, এখন নিজের কাজে যান।"

সরাইওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। খানিক বাদেই কাউন্টের ভ্যালিট* এল তাঁর কাছে। বলল, "মহামান্য কাউন্ট এক্ষুণি আপনাকে তাঁর কাছে যাবার আদেশ দিয়েছেন।"

ভ্যালিট-এর সঙ্গে সরাইওয়ালা এলেন কাউন্টের সামনে। প্রভুর চোখের ইঙ্গিতে ভ্যালিট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরে কাউন্ট একলা। কাউন্টেস হিল্ডা নেই সেখানে।

—"হুজুর আমাকে স্মরণ করেছেন?" সরাইখানার মালিক বিনীতভাবে জানতে চাইলেন।

---

*ভ্যালিট: জামা-কাপড় ও অঙ্গরাগেব তত্ত্বাবধানের ভাবপ্রাপ্ত ভৃত্য, সাজভৃত্য।

—"হ্যাঁ, শুনুন আমার কথা," কঠিন আদেশের সুরে কাউন্ট ফন ব্রেবার বললেন, "আদেশটা আমি একবারই দেব। কিন্তু এ আদেশ যাতে ঠিকমতো পালিত হয়, সেদিকে আমার কড়া নজর থাকবে। এবার শুনুন আমার আদেশ। যদি আপনি বা আপনার কোন চাকর-বাকর ঐ পাহাড়ী নদী সম্পর্কে আর একটি কথা কাউন্টেস বা আর দলের কোন লোককে বলেন, তবে আপনাকে ঐ বনের ভিতর নিয়ে গিয়ে আমি গাছের ডালে ফাঁসি দেব। আপনার কোন চাকর বললেও আপনি রেহাই পাবেন না—একথাটা ভালভাবে মনে রাখবেন। আমার আদেশের অর্থ বুঝতে পেরেছেন?"

—"হ্যাঁ, ইয়োর এক্সেলেন্সী, পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি।"

—"তা হলে এবার নিজের ঘরে যান।"

পরদিন সকালে কাউন্টেস হিল্ডাকে খুব বিবর্ণ দেখাল, কাউন্ট ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

—"কি ব্যাপার, তোমাকে এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ?"

—"কাল রাতে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছি। বার বার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। মোটেই ভাল ঘুম হয়নি। শরীরটাও খুব দুর্বল লাগছে।"

—"বিশ্রাম করো। শরীর ঠিক হয়ে যাবে।"

—"আচ্ছা..." স্বামীকে কি কথা বলতে গিয়ে হিল্ডা থেমে গেলেন।

—"বল," ফন ব্রেবার বললেন।

—"না, ঠিক আছে থাক!"

—"আহা, বলই না," একটু অধৈর্যের সুরেই কাউন্ট বললেন।

—"মানে বলছিলাম কি আমি তো ওখানে নদীর জল খেয়েছিলাম, কিছু হবে না তো!"

—"আরে না না, এখানকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেদের কথায় এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন? এ সব কথা নিয়ে বোধহয় সারারাত ভেবেছ আর সে জন্যই নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখেছ। আমি বলছি কিচ্ছু হবে না," স্ত্রীকে আশ্বস্ত করবার জন্য কাউন্ট বললেন।

—"কিন্তু..."

—"না, কোন কিন্তু নয। এ নিযে আব কোন আলোচনা নয়। এসব কুসংস্কারের কথা মোটে ভাববেই না।"

কাউন্টেস কিন্তু স্বামীর কথায় পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারলেন না।

কাউন্টেসের অবস্থার কিন্তু কোন পরিবর্তন হল না। রোজ রাতে তিনি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগলেন, তাঁর শরীর শুকিয়ে যেতে লাগল। মুখের রঙ হতে লাগল বিবর্ণ থেকে বিবর্ণতর। কাউন্ট ভাবলেন হার্জ পর্বতমালার জলহাওয়া কাউন্টেসের সহ্য হচ্ছে না। তাছাড়া সরাইখানার মালিকের অলৌকিক কাহিনী তাঁর মনে দাগ কেটে বসেছে। কিছুতেই তিনি ঐ কাহিনীর প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারছেন না। এ সব কারণেই স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এ জায়গা ছেড়ে নিজের

বাড়িতে ফিরে যাওয়াই ভাল। সেখানে অনুকূল পরিবেশে কাউন্টেস তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন।

কাউন্ট স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে এলেন ম্যাগডেবুর্গে—নিজের প্রাসাদ-দুর্গে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নিজেদের প্রাসাদে এসেও কাউন্টেস হিল্ডার শরীর ভাল হল না, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের হাত থেকে তিনি রেহাই পেলেন না। তাছাড়া তিনি আগের মতোই ভুগতে লাগলেন নিদ্রাহীনতা রোগে। কাউন্ট ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে ডাকলেন, ডাক্তার ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন যে কাউন্টেস অজীর্ণ রোগে ভুগছেন। আর তারই ফলে দেখছেন এই রকম দুঃস্বপ্ন। তাঁর নিদ্রাহীনতার কারণও হল ঐ একই রোগ। ডাক্তার ওষুধপত্র দিলেন। পথ্য হিসেবে দিলেন সহজপাচ্য হাল্কা খাবার।

কিন্তু এতেও দুঃস্বপ্নের অবসান হল না, দুঃস্বপ্ন তো রইল, তার সঙ্গে কাউন্টেস হিল্ডার আচরণও হয়ে উঠল অদ্ভুত। তিনি প্রাসাদ-দুর্গে এক নির্জন প্রায় পরিত্যক্ত অংশে একা একা রাত্রিবাস করতে চাইলেন। তরুণী বধূর এমন অদ্ভুত ইচ্ছার কোন কারণ খুঁজে পেলেন না তরুণ কাউন্ট। কাউন্টেস বুঝিয়ে বললেন, "আমি রাতে ঘুমোতে পারি না, আর সে জন্যই আমার শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছে। আমার ঘুমের জন্য চাই পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। আর সে রকম নিস্তব্ধতা আমি পেতে পারি প্রাসাদের ঐ প্রায় পরিত্যক্ত অংশে। আমাকে যদি সুস্থ করে তুলতে চাও তবে রাতে আমাকে ওখানে থাকতে দাও।"

অগত্যা কাউন্ট ফন ব্রেবারকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হতে হল।

কপালের এমনই লেখন যে ঘরের সমস্যার সঙ্গে কাউন্টকে এবার বাইরের একটা বিরাট সমস্যার মুখোমুখি হতে হল। বাইরের এ সমস্যা ঘরের সমস্যা থেকেও অনেক বড়।

কাউন্ট ফন ব্রেবার ছিলেন ম্যাগডেবুর্গের পুলিশ প্রশাসনের প্রধান। স্বয়ং রাজার কাছ থেকে তিনি এ ক্ষমতা পেয়েছিলেন। এতকাল ম্যাগডেবুর্গ পুলিশের সামনে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু এবার এক বিরাট সমস্যার সামনে পড়ে পুলিশ একেবারে নাজেহাল হয়ে গেল, আর পুলিশ-প্রধান হিসেবে কাউন্টও বিব্রত হয়ে পড়লেন।

ম্যাগডেবুর্গের বিভিন্ন পল্লী থেকে শিশুদের রহস্যময় অন্তর্ধান শুরু হল। সমাজের নিচুতলার অনেক পরিবারের বাচ্চারা কোনরকম সূত্র না রেখে যেন কর্পূরের মতো উবে যেতে লাগল। রাতের পর রাত পুলিশ কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট সাবধানতা এবং সতর্কতা সত্ত্বেও এ রহস্যময় অন্তর্ধানগুলি ঘটেই চলল। কে বা কারা এর পিছনে রয়েছে, শত চেষ্টা করেও পুলিশ তা বের করতে পারল না।

সমস্ত ম্যাগডেবুর্গে দেখা দিল দারুণ আতংক, এ আতংক ছড়িয়ে পড়ল আশে-পাশের অঞ্চলে। কাউন্ট ফন ব্রেবারের চোখের ঘুম ছুটে গেল। দারুণ দুশ্চিন্তায় তিনি কাটাতে লাগলেন বিনিদ্র রজনী।

ব্যাপারটা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, একরাতে একজন প্রভাবশালী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর

মেয়ে অদৃশ্য হবার পরে। এতদিন সমাজের নিচুতলার বাচ্চারাই নিখোঁজ হচ্ছিল, এবার দেখা গেল উপরতলার শিশুরাও রেহাই পাচ্ছে না। কয়েক রাত পরে এক ধনী আইনজীবীর মেয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল। ব্যাপারটা চরমে উঠল যখন জেনারেল রিটেনবার্গের মেয়ে অদৃশ্য হল।

রাত বেশি হয়নি। কাউন্ট নিজের অফিসেই বসেছিলেন, অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে হুড়মুড় করে কাউন্টের অফিসে ঢুকলেন জেনারেল রিটেনবার্গ।

নিদারুণ ক্রোধে জেনারেলের বিরাট দেহটা কাঁপছে। মুখের রঙ হয়েছে সীসের মতো। ঘরে ঢুকে কাউন্টের ডেস্কে সজোরে মুষ্টাঘাত করে জেনারেল উন্মাদের মতো অভিসম্পাত দিয়ে গর্জন করে উঠলেন, "আমার মেয়ে অদৃশ্য হয়েছে ফন ব্রেবার।"

—"কবে ? কখন ?" বিমূঢ়ভাবে কাউন্ট জিজ্ঞেস করলেন।

—"আজ বিকেলে...আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি মেয়েকে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। তাকে পেলাম না। কেউ ধরে নিয়ে গেছে তাকে। শহরের রাস্তার উপর থেকে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে...আমার মেয়ে...আমার একমাত্র মেয়ে...ওহো হো!"

কঠিন হৃদয় জেনারেল মেয়ের শোকে ভেঙে পড়লেন।

—"আপনি স্থির হোন জেনারেল। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

কাউন্টকে কথা শেষ করতে দিলেন না জেনারেল। তীব্র দৃষ্টিতে ফন ব্রেবারের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,—"প্রিয় কাউন্ট, এক্ষুণি আমার মেয়ের উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন, নইলে আমিও আপনার সর্বনাশ করব। আপনার ঐ সাধের প্রাসাদ-দুর্গ আমি তোপের মুখে উড়িয়ে দেব।"

আর একটি কথা না বলে জেনারেল রিটেনবার্গ কাউন্টের অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ফন ব্রেবার এবার সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অন্তর্ধান সমস্যার সঙ্গে যোগ হল আর এক নতুন সমস্যা, জেনারেল রিটেনবার্গ শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী মানুষ। তিনি শূন্যগর্ভ আস্ফালন করেননি। বৃথা ভয় দেখাননি। ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তেই ফন ব্রেবারের কেল্লাটিকে কামানের গোলায় উড়িয়ে দিতে পারেন।

সেই রাতেই ফন ব্রেবার তাঁর সমস্ত পুলিশবাহিনীকে কাজে নামিয়ে দিলেন। যত রকম ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে তার কিছুই বাদ দেওয়া হল না। প্রতিটি বাড়ি, বিশেষ করে গরীব এলাকার বাড়িগুলি খানাতল্লাস করা হল, প্রতিটি পার্ক, প্রতিটি বাগান এবং প্রতিটি সম্ভাব্য লুকোবার জায়গা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু সবই নিষ্ফল। শিশু অপহরণকারীর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

পরদিন রাতে কাউন্ট নিজের অফিসে বসে অনুসন্ধানকারীদের রিপোর্টগুলি পড়ছিলেন। রিপোর্টগুলির মধ্যে কোন আশার আলোই খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। আর তা না পেয়ে তিনি ক্রমেই ঘাবড়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর পরবর্তী কাজ যে কি হওয়া উচিত তা তিনি কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না।

হঠাৎ কাউন্টের অফিস কামরার দরজার কাছে একটা হইচই শোনা গেল, চমকে উঠে তিনি দরজার দিকে তাকালেন।

নোংরা ছেঁড়া পোশাক পরা একজন নারী ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকল কাউন্টের খাস কামরায়। নারীর চোখের দৃষ্টি বন্য। তার মাথার লম্বা চুলগুলো লট্‌পট্‌ করছে। মধ্যযুগের এক ডাইনী এসে ঢুকল নাকি কাউন্টের ঘরে!

—"কে তুমি? কি চাও?" কাউন্ট ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল একজন পুলিশ কর্মচারী। ঢুকেই হাত চেপে ধরল সেই নারীর। কাউন্টের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুতভাবে সে বলল, "আমি খুবই দুঃখিত—খুবই লজ্জিত ইয়োর এক্সেলেন্সী; আমাদের এড়িয়ে ও একছুটে ঢুকে পড়েছে আপনার ঘরে, ও একটা পাগলী। ওর মেয়ে হারিয়ে যাবার পর ও পাগল হয়ে গিয়েছে।"

—"ওর মেয়ে কবে হারিয়েছে?"

—"প্রথম দিকে। এ উৎপাত যখন প্রথম শুরু হল সেই সময়," পুলিশ কর্মচারীটি উত্তর দিল।

—"ওকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও," কাউন্ট হুকুম দিলেন।

—"না! না!" পাগলী তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল। এক ঝটকায় পুলিশ কর্মচারীটির হাত ছাড়িয়ে কাউন্টের ডেস্কের সামনে এসে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলতে লাগল:

—"শুনুন ইয়োর এক্সেলেন্সী! শুনুন...আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে। আমি পাগল নই...পাগল নই...শোকে আমার মাথাটা কেমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। আমি জানি ও ঘুরে বেড়ায়...অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়...আঁধারের সন্তান ঘন আঁধারেই ঘুরে বেড়ায়...আলো নেই...এক ফোঁটা আলো নেই...অন্ধকার...পিচ-কালো অন্ধকার...ভয়ঙ্কর অন্ধকার...।"

ফন ব্রেবারের ধৈর্যচ্যুতি হল। পুলিশ কর্মচারীটির দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি গর্জন করে উঠলেন,—"আমার হুকুম শুনতে পাওনি তুমি? বের করে নিয়ে যাও। ওকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও।"

—"হ্যাঁ হুজুর, এক্ষুণি নিয়ে যাচ্ছি।"

শক্ত হাতে মেয়েটার হাত চেপে ধরে পুলিশ কর্মচারীটি ওকে টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করবার চেষ্টা করতে লাগল।—"আমি যাব না...যাব না..." মেয়েটি বিলাপের সুরে আর্তনাদ করে উঠল, "আমি হুজুরকে বলব সব কথা...আমি দেখেছি ওকে...হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখেছি...যে আমার ছোট্ট সোনাকে নিয়ে গিয়েছে তাকে আমি দেখেছি। আমার সোনা!...আমার ছোট্ট সোনা!"

পুলিশের কর্মচারীটি মেয়েটাকে টানতে টানতে রাস্তায় বের করে দিল। তার আর্ত কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল দূর থেকে।

আচম্বিতে কাউন্ট ফন ব্রেবারের মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে এই পাগলীই হয়ত একমাত্র আশার আলো! তাঁর কানে বাজতে লাগল পাগলীর একটা কথা, "আমি দেখেছি ওকে...হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখেছি..."

এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে কাউন্ট ঘরের বাইরে চলে এলেন। দূর থেকে তখনও পাগলীর বিলাপভরা কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিল। ওকে হারালে চলবে না। একছুটে লম্বা বারান্দাটা পেরিয়ে সদর দরজাটার কাছে পড়লেন তারপর একলাফে নেমে পড়লেন রাস্তায়।

বাইরে অন্ধকার, তার সঙ্গে ঘন কুয়াশা। তারই মধ্যে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল সন্তানহারা মাকে। সে ছুটছে...হোঁচট খাচ্ছে, আর্তনাদ করছে মৃগী রোগীর মতো।

কাউন্ট ছুটলেন ওর পিছু পিছু। ওকে হারালে চলবে না...কিছুতেই চলবে না। হয়ত ওর মাধ্যমেই শিশু-অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান হবে। ভীত মাতালের মতো টলমল পায়ে যাচ্ছে মেয়েটি—কিন্তু সে যাচ্ছে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে। ওর সঙ্গে তাল রেখে ছোটা কাউন্টের পক্ষে খুব শক্ত হয়ে পড়ছে। বড় রাস্তা ছেড়ে এবার আঁকাবাঁকা গলিপথে ছুটছে মেয়েটি গাঢ় অন্ধকার আর ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়ে। মেয়েটি যে কোথায় তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে তা-ই বুঝতে পারলেন না কাউন্ট।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থেমে গেল সামনের নারীমূর্তি। আতঙ্কভরা গলায় তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল :

—"ওই যে!...ওই যে ও!...আঁধার রাতের সন্তান...আঁধার রাতেই চরতে বেরিয়েছে। তুই আমার সোনাকে নিয়েছিস...তোকে আমি ছাড়ব না...কিছুতেই ছাড়ব না...।"

অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিয়ে কাউন্টের মনে হল তিনি যেন একটা বোরখা ঢাকা ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন। মূর্তির কাঁধে একটা বস্তা। পাগলী মা উন্মাদের মতোই ছুটল ছায়ামূর্তির দিকে। কাউন্ট ব্রেবারও ছুটলেন মা-এর পিছু পিছু। কাউন্টের মনে হল একটা পাথরের দেওয়ালের পাশ দিয়ে তাঁরা ছুটছেন। কোথায় এসে পড়েছেন সে সম্পর্কে কাউন্টের মনে কোন ধারণাই ছিল না।

ছুটতে ছুটতে এক সময় আতংকভরা চোখে কাউন্ট দেখলেন যে ছুটন্ত ছায়ামূর্তি একলাফে দেওয়াল টপকে ওপাশে চলে গেল। রক্তলোলুপ শিকারী কুকুরের মতো তাকে অনুসরণ করে পাগলী মা-ও অদ্ভুতভাবে হামাগুড়ি দিয়ে পাঁচিল টপকাল। কাউন্টের কিন্তু দেওয়াল বেয়ে উঠতে খুব কষ্ট হল।

দেওয়ালের ওপাশে পৌঁছে কাউন্ট দেখলেন তাঁর সামনের দুটি মূর্তি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। কাউন্টও ছুটলেন। মনে হচ্ছে তিনি বোধ হয় আসল জায়গায়ই এসে পড়েছেন। শিশু-অন্তর্ধান রহস্যের সমাধান বুঝি আসন্ন।

উঁচু ঝোপঝাড়ের কাঁটা এবং ডালপালায় কাউন্টের মুখ আর শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিঁড়ে গেল ; হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কুয়াশার আবরণ ক্ষণিকের তরে ছিন্ন হল। সামনে ভেসে উঠল একটা বিরাট দরজা। কাউন্ট দরজার

কাছে পৌঁছবার আগেই সন্তানহারা জননী বোরখাপরা ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে দরজার ওপাশে চলে গেল। দড়াম্ করে বন্ধ হয়ে গেল দরজার ভারী পাল্লা।

দরজা খুলবার গোল কড়াটায় হাত দিতে না দিতেই কাউন্ট শুনতে পেলেন একটা রক্তজমাট করা আর্তনাদ আর তার পরই শোনা গেল হুড়মুড় করে কোন ভারী জিনিস পড়বার শব্দ। এরপর কাউন্ট একই সঙ্গে শুনতে পেলেন আর্তনাদ এবং ক্রুদ্ধ গর্জন, গর্জনটা মানুষের কণ্ঠের নয়, কোন ক্রুদ্ধ জন্তুর কণ্ঠ থেকে যেন এই ভয়ঙ্কর বীভৎস গর্জন বেরিয়ে আসছে।

কাউন্ট ইতস্তত করতে লাগলেন। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে আসতে লাগল ধস্তাধস্তির শব্দ। আসবাবপত্র ভাঙল, কাঠ ফাটল, ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল আয়না। এসব শব্দের মাঝে মাঝে শোনা যেতে লাগল জান্তব গর্জন আর মানুষের কণ্ঠের তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। তারপর শোনা গেল একটা বীভৎস গল্ গল্ শব্দ। একটা ভারী জিনিস পড়ে গেল ধপাস্ করে।

আর কোন শব্দ শোনা গেল না। চারপাশ স্তব্ধ।

এতক্ষণ ফন ব্রেবার যেন স্তম্ভিত হয়ে ছিলেন। এবার তিনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন। দরজার কড়া ধরে টানলেন তিনি। অবাক হয়ে দেখলেন দরজাটা খুলে গেল। ওপাশের ঘরখানা দেখে মনে হল এক পল্টন কশাক সৈন্য যেন হানা দিয়ে এ ঘর বিধ্বস্ত করে গিয়েছে।

একখানা চেয়ারও সোজা অবস্থায় নেই, এমন একটি আসবাবও নেই যা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অন্ধকারটা চোখে সয়ে এলে কাউন্ট দেখলেন ঘরের দেওয়ালে রক্ত...মেঝেতে রক্ত...সর্বত্র রক্ত। চারপাশে যেন রক্তের স্রোত বইছে।

সামনের দিকে এগোলেন কাউন্ট। এ কোন্ মৃত্যুপুরীতে তিনি এসে পড়েছেন? হঠাৎ নরম কিছুতে ধাক্কা লাগল। কাউন্ট হোঁচট খেলেন। পড়ে গেলেন রক্তমাখা মেঝের উপর।

একটা ছিন্নভিন্ন মৃতদেহের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছে কাউন্টের। এ দেহ সেই পাগলী মায়ের, যাকে অনুসরণ করে কাউন্ট এই পিশাচ-পুরীতে এসে পৌঁছেছেন। পাগলী মায়ের বিকৃত দেহটাকে প্রায় চেনাই যায় না। তার কণ্ঠনালী ছিন্ন। পেটটাকেও চিরে ফেলা হয়েছে—বেরিয়ে এসেছে ভিতরের নাড়িভুঁড়ি। মৃতের চোখ দুটি খোলা—দারুণ আতংকে আর যন্ত্রণায় বিস্ফারিত। বিকৃত মুখে মরা চোখে পাগলী মা তাকিয়ে আছে 'সিলিং'-এর দিকে।

কাউন্ট ফন ব্রেবারের গাটা গুলিয়ে উঠল, একটা তীব্র বিবমিষা যেন পেয়ে বসল তাঁকে। একটু পরে কোনরকমে টলতে টলতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

নিচু গলায় ক্রুদ্ধ গর্জনধ্বনি শুনে কাউন্ট বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়ালেন। অজ্ঞাতসারেই তাঁর হাত চলে গেল কোমরে গোঁজা পিস্তলের উপর। খাপ থেকে এক টানে পিস্তল বের করলেন তিনি।

বোরখাপরা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে জানালার পাশে। সে কাউন্টকে লক্ষ্য করছে।

—"কে তুমি শয়তান?" কাউন্ট চিৎকার করে উঠলেন, "একটু নড়লেই আমি তোমাকে খ্যাপা কুকুরের মতো গুলি করে মারব।"

মূর্তিটি বোরখা খুলে ফেলল। অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা না গেলেও কাউন্ট এটুকু বুঝলেন যে এ কোন নারীমূর্তি! খোলা বোরখাটা দূরে ছুঁড়ে দিল। কাউন্ট দেখলেন তার হাতখানা, মনে হল হাতখানা ঘন লোমে ঢাকা। এমন রোমশ হাত কোন নারীর হতে পারে না। এ যেন কোন বন্যজন্তুর শরীরের অঙ্গ। মূর্তিটার মুখ থেকে আবার একটা জান্তব ধ্বনি বেরিয়ে এল। কাউন্টের দিকে লক্ষ্য রেখে মূর্তিটা জানালার একেবারে কাছে চলে এল। এবার বুঝি ওই পথেই পালাবে ছায়ামূর্তি। কিন্তু না, এখন ওকে কিছুতেই পালাবার সুযোগ দেওয়া হবে না। একবার যদি ও হারিয়ে যায় তবে আর কোনদিনই হয়ত ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে কাউন্ট ফন ব্রেবার দু'-দু'বার গুলি করলেন। তীব্র মর্মবিদারী আর্তনাদে ভরে গেল ঘরখানা। কাউন্ট নিজেও পড়ে গেলেন ঘরের মেঝেতে। আলো...এখন একটা আলো চাই। ভগবানের অসীম দয়া। ঘরের মেঝেতে একটুকরো মোমবাতিও পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে আলো হাতে কাউন্ট এগিয়ে গেলেন ভূপতিত আহত রহস্যময় ছায়ামূর্তির দিকে। ছায়ামূর্তিটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

কাছে গিয়ে কাউন্ট যা দেখলেন তাতে আর একটু হলেই জ্বলন্ত মোমবাতিখানা তাঁর হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল। কাউন্ট দেখলেন রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে তাঁর তরুণী পত্নী হিল্ডার আহত দেহ। যন্ত্রণায় কাউন্টেসের চোখ বিস্ফারিত। হাঁটু মুড়ে বসলেন, কাউন্ট মুমূর্ষু হিল্ডাকে টেনে নিলেন বুকের মধ্যে।

—"হায় ভগবান! এ যে দেখছি আমারই গ্রীষ্মাবাস!"

কাউন্টেসের তখন শ্বাস উঠেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে দুর্বলভাবে তিনি বললেন, "কার্ল...সেই জল...সেই পাহাড়ী নদী...আমি পারিনি...নিজেকে রক্ষা করতে পারিনি...অভিশাপ নেমে এসেছিল আমার উপর...আমি চেষ্টা করেছি... আমি...আমি..."

স্বামীর কোলে ঢলে পড়লেন কাউন্টেস হিল্ডা।

অনুবাদ : অনিরুদ্ধ চৌধুরী

সেই রাত সেই সময়

The Night And The Time—বেনেট কার্ফ

নিউইয়র্ক থেকে যে প্রধান পথটা (এক নম্বর সড়ক) বেরিয়ে এসেছে, বাল্টিমোরের বারো মাইল দূরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কের সঙ্গে তার ক্রশিং হয়েছে। এ ক্রশিংটা খুবই বিপজ্জনক! এখানে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য পথচারীদের জন্য মাটির তলা দিয়ে একটা 'সাবওয়ে' তৈরি করবার কথা অনেকদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটা পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে। সরকারী লাল ফিতের বাঁধন কেটে এখনও পরিকল্পনাটার বাস্তবে রূপায়িত হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

শনিবারের রাত। ডাক্তার একারমল এক গ্রাম্য ক্লাব থেকে গাড়ি করে ফিরছিলেন। ক্লাবে একটা নাচের আসর ছিল। ডাক্তার নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ক্রশিংটার কাছে এসে গাড়ির গতি কমিয়ে দিলেন ডাক্তার।

একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অবাক হলেন ডাক্তার; এত রাতে নির্জন পথে একলা একটি মেয়ে! তার পরনে সান্ধ্য গাউন। মেয়েটি গাড়ি থামাবার ইশারা করছে। ও নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েছে! বোধহয় কোন পার্টিতে গিয়ে সময়ের হিসেব রাখতে পারেনি! এখন যান-বাহন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাড়ি ফিরতে পারছে না।

গাড়ি থামালেন ডাক্তার। বললেন:

—'আপনি পিছনের সিটে বসুন। সামনে—আমার পাশে—গলফ্ খেলবার সাজসরঞ্জাম রয়েছে, এখানে আর বসবার জায়গা নেই।'

মেয়েটি গাড়িতে উঠল। ডাক্তার গাড়ি ছেড়ে দিলেন।

—'এত রাতে আপনি এখানে কি করছিলেন? আপনার মতো এক তরুণীর পক্ষে এত রাতে একলা পথে থাকা কি খুব নিরাপদ?' গাড়ি চালাতে চালাতে ডাক্তার বললেন।

—'সে এক বিরাট কাহিনী,' মেয়েটির কণ্ঠস্বর মিষ্টি কিন্তু তীক্ষ্ণ, অনেকটা স্লেজ গাড়ির ঘণ্টাধ্বনির মতো।

—'দয়া করে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিন। সেখানে গিয়ে আমি আপনাকে সব কথা খুলে বলব,' মেয়েটির গলার স্বরে আকুলতা।

'আপনার ঠিকানা?'

—'ঠিকানা ? ঠিকানা হল...নং নর্থ চার্লস স্ট্রীট। মনে হয় আপনার নিজের পথ থেকে খুব বেশি দূর যেতে হবে না।'

—'ঠিক আছে। জায়গাটা আমার একেবারে অচেনা নয়।' ডাক্তার বললেন।

মেয়েটির শংকাতুর মুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল।

গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলেন ডাক্তার একারমল। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। মেয়েটির বাড়িও ডাক্তারের নিজের বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ওকে পৌঁছে দেবার দাযিত্ব ঘাড়ে চাপায বাড়ি পৌঁছতে ডাক্তারের আরো মিনিট দশেক বেশি সময লাগবে। যাক, কি আর করা যাবে! বিপন্ন মেযেটিকে সাহায্য করা একটা নৈতিক এবং সামাজিক কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।

নর্থ চার্লস স্ট্রীটে ঢুকে গাড়ির গতি কমিযে দিলেন ডাক্তার। এবার দু'পাশের বাডিব নম্বরগুলি দেখতে দেখতে যেতে হবে। বেশি দূর যেতে হল না। একটু এগোতেই মেযেটি যে নম্বরেব কথা বলেছিল, সে নম্বরের বাড়িখানা পেযে গেলেন ডাক্তার। গাড়ি থামালেন।

—'এই যে, আমরা এসে গিয়েছি,' ডাক্তার পিছনের দিকে মুখ ফেরালেন।

কি আশ্চর্য! পিছনের আসন একদম ফাঁকা। কেউ নেই সেখানে।

—'একি অদ্ভুত ব্যাপাব ?' আপনমনেই বললেন ডাক্তার, 'মেযেটা নিশ্চযই গাড়ি থেকে পড়ে যাযনি!...কর্পূরের মতো উবেও যেতে পারে না।

তবে কি এ রাস্তায ঢুকে গাড়ির গতি যখন কমিয়েছিলাম তখনই ও নেমে গেল ? কিন্তু তাই বা নামবে কেন ? গাড়ি তো ওর বাড়ির দিকেই নিযে যাচ্ছিলাম।'

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িখানার দিকে এগোলেন ডাক্তার। সদর দরজা বন্ধ। ভিতরে একটি আলোও দেখা যাচ্ছে না। বাড়িখানা নিঝুম...নিস্তব্ধ! পোড়ো বাড়ি নাকি! কিন্তু না, তাও তো মনে হচ্ছে না।

হতবুদ্ধি ডাক্তার 'কলিং-বেল' টিপলেন। এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে আর কখনও হযনি। কোন সাড়া নেই। বাড়িতে কোন লোকজন নেই নাকি! আবার 'বেল' টিপলেন ডাক্তার। এ রহস্যের মীমাংসা না করে তিনি যেতে পারছেন না।

শেয পর্যন্ত দরজা খুলল। একজন লোক চৌকাঠের ওপাশ থেকে ডাক্তারের দিকে তাকালেন। লোকটি বৃদ্ধ, তার মাথার চুল ধূসর। চোখে মুখে ক্লান্তির ছাপ।

—'কাকে চাইছেন ?' ক্লান্ত গলায় বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

'দেখুন, একটা অদ্ভুত ব্যাপার,' ডাক্তার বললেন, 'একটি অল্পবয়সী মেয়ে আমার গাড়িতে উঠেছিল। সে এই বাড়ির ঠিকানাই দিয়েছিল। আমি তাকে নিযে এলাম, কিন্তু এখন দেখছি...'

'সে আর গাড়িতে নেই, এই তো ?' বৃদ্ধ প্রশ্নের সুরে বললেন।

-'হ্যা, ঠিক তাই।'

-'মেযেটি কোথায আপনার গাড়িতে উঠেছিল ?'

'[illegible] হাইওয়ের ক্রশিং এ ' ডাক্তার উত্তর দিলেন।

'জানি,' ক্লান্ত স্বরে বৃদ্ধ বললেন। 'এই তিনবার হল। ও আমারই মেয়ে। তিন বছর আগে ঐ ক্রশিং-এর কাছে এক মোটর দুর্ঘটনায় ও মারা যায়। আজ ওর মৃত্যুর তারিখ। প্রতি মৃত্যুর তারিখেই ও বাড়ি ফিরে আসতে চায় কিন্তু পারে না। ওর আগের দুটি মৃত্যুদিনেও এমনি ঘটনা ঘটেছিল।'

বৃদ্ধের গলার স্বর কেঁপে উঠল। চোখের কোণে টলমল করে উঠল অশ্রুবিন্দু।

বিমূঢ় ডাক্তার গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

অনুবাদ : অনিরুদ্ধ চৌধুরী

রাতের অতিথি

The Gentleman with the Lace-Key—লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

ফিলিমোর গার্ডেনস্-এ রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে ভদ্রলোক যখন বাসায় ফিরছিলেন তখন বেশ রাত হয়েছে। এগারটা অনেকক্ষণ বেজে গিয়েছে, ঘড়ির কাঁটা বারোটার কাছাকাছি।

গার্ডেনস্ থেকে বেরিয়ে একটা ছোট রাস্তায় এসে পড়লেন ভদ্রলোক। রাস্তাটার নাম বোধহয় ফিলিমোর স্ট্রীট। এত রাতে রাস্তার লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বলতে গেলে ভদ্রলোক রাস্তায় প্রায় একা। অবশ্য একেবারে একা নন। সামনে কিছু দূরে এক মহিলা যাচ্ছেন, আরো খানিকটা দূরে দেখা যাচ্ছে এক ভদ্রলোককে। ব্যস, রাস্তায় আর জনমানব নেই।

দূরের ভদ্রলোক যাচ্ছেন অত্যন্ত ধীর গতিতে। তাঁর তুলনায় ভদ্রমহিলার গতি দ্রুততর। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিলা তাঁকে পেরিয়ে গেলেন। সামনে এগিয়ে ভদ্রলোকের দিকে ঘুরে একবার তাকালেন মহিলা, সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল মহিলার কণ্ঠ থেকে। দারুণ আতংকে চিৎকার করতে করতে তিনি মোড় পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে পাশের একটা গলিপথে ঢুকে পড়লেন।

ব্যাপার কি ? কি হল ভদ্রমহিলার ? উনি হঠাৎ ওরকম ভয় পেলেন কেন ? সামনের ঐ ধীরগামী লোকটিকে তো গুণ্ডা বা বদমায়েশ বলে মনে হচ্ছে না। উনি তো এখনও আপনমনে হেঁটে চলেছেন। তবে ? নাঃ ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করতে হবে।

পিছনের ভদ্রলোক গতি দ্রুততর করলেন, উনি যখন সামনের লোকটির কাছাকাছি এসে পড়ছেন, তখন তিনি একটি বাড়ির সামনে এসে থেমেছেন। বোঝা যাচ্ছে এ বাড়িতেই তিনি থাকেন।

পকেট থেকে 'ল্যাচ্-কি' বের করলেন ভদ্রলোক, তারপর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেলেন। ভিতরে ঢুকবার সময় রাস্তার গ্যাসের আলোয় সামনের লোকটির মুখ দেখলেন পিছনের ভদ্রলোক। দেখে আঁতকে উঠলেন তিনি। এ কি জীবিত মানুষের মুখ! এ মুখ তো মৃত্যু-পাণ্ডুর! ভদ্রমহিলা মিছে ভয় পাননি। মধ্যরাতে নির্জন পথে এ রকম একখানা মুখ দেখলে ভয় পাওয়াটা কিছু অন্যায় নয়।

বাড়ির নম্বরটা দেখলেন পিছনের ভদ্রলোক তারপর একসময় ফিরে এলেন নিজের বাসায়। খাওয়া-দাওয়ার পাট তো চুকেই গিয়েছে, কাজেই সোজা বিছানায় আশ্রয় নিলেন। কিন্তু ভাল ঘুম হল না ; সারারাত বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন ভদ্রলোক। কানে বাজতে লাগল ভদ্রমহিলার শঙ্কাবিহ্বল আর্ত কণ্ঠস্বর, চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠতে লাগল সামনের ভদ্রলোকের মড়ার মতো ফ্যাকাসে মুখখানা। শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন কাল নিজের দরকারী কাজকর্মগুলো সেরে নিয়েই তিনি ঐ বাড়ি আর তার বাসিন্দার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবেন। তা না নিলে তাঁর নিজের মনেই শান্তি ফিরে আসবে না।

পরদিন বাড়িখানা খুঁজে বের করতে ভদ্রলোকের কোন কষ্টই হল না। রাস্তার নাম আর বাড়ির নম্বর তো তাঁর জানাই ছিল। বাড়ির সামনে এসে দেখলেন দরজার মাথায় একখানা ঘর ভাড়ার নোটিশ টাঙানো রয়েছে। এ নোটিশখানা কাল রাতে ছিল না।

'যাক ভালই হল, বাড়িতে ঢুকবার একটা ছুতো পাওয়া গেল।' ভদ্রলোক আপনমনেই বললেন।

দরজার বেল টিপলেন ভদ্রলোক। একটু পরে একজন বয়স্কা মহিলা দরজা খুলে দিলেন। মহিলার চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনার ছাপ। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন ভদ্রলোকের দিকে।

-- 'বাড়িভাড়ার নোটিশ দেখে খোঁজ-খবর নিতে এলাম।'

—'হ্যাঁ, আমার বাড়ির কয়েকখানা ঘর ভাড়া দেওয়া হবে।'

—'ঘরগুলো একটু দেখতে পারি ?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

—'নিশ্চয়ই পারেন, তবে আপনি দয়া করে আর একদিন আসুন। এই মুহূর্তে ঘরগুলো দেখাতে একটু অসুবিধা রয়েছে।'

—'দেখুন, আমি লন্ডন ছেড়ে একটু বাইরে যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগেই আমি ঘরের ব্যবস্থাটা পাকা করে যেতে চাই। ঘরগুলো না দেখলে সেটা সম্ভব নয়। আমার একটু তাড়া রয়েছে, এখন ঘর না দেখতে পারলে আমাকে হয়ত ভাড়া নেবার পরিকল্পনাটাই ত্যাগ করতে হবে।'

—'বেশ আসুন তবে।' ভদ্রমহিলা নাচারভাবে বললেন।

মহিলা ভদ্রলোককে উপরতলায় নিয়ে গেলেন। দেখালেন কয়েকখানা চমৎকার সাজানো-গুছানো ঘর। সুন্দর সুন্দর জিনিস রয়েছে ঘরগুলোর মধ্যে। এসব জিনিস

দিয়ে যে ঘর সাজিয়েছে সে জানে কি করে জীবনযাত্রাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে হয়।

—'বাঃ চমৎকার! ঘরগুলো আমার খুব পছন্দ হয়েছে। বেশ আরামেই থাকতে পারব এখানে। কিন্তু এসব জিনিসপত্র কার?'

—'এ ঘরে যিনি ছিলেন তাঁরই জিনিসপত্র এসব।'

—'তিনি এখন কোথায়?'

ভদ্রমহিলা প্রথমটা এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে গেলেন।

গত রাতের ঘটনা এবং বাড়িওয়ালীর এড়িয়ে যাওয়ার ভাবভঙ্গি দেখে ভদ্রলোকের মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল। তিনি একটু কড়া গলায় এবার জিজ্ঞেস করলেন:

—'বলুন, আপনার আগেকার ভাড়াটে কোথায়?'

শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়লেন মহিলা। কান্না-ভেজা গলায় বললেন, 'বলব মশাই, আপনাকে সব কথা খুলেই বলব। এ ফ্ল্যাটের ভাড়াটে একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি অনেক বছর এ বাড়ির ভাড়াটে ছিলেন। ওর আচার ব্যবহার যেমন চমৎকার ছিল তেমনি আমিও আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব ওর সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করিনি।

'বছরের এ সময়টায় ভদ্রলোক এখানে থাকতেন না। প্রতি বছরই মন্টি কার্লো তে যেতেন। এবারেও গিয়েছিলেন প্রায় মাসখানেক আগে। আজ সকাল আটটায় একখানা টেলিগ্রাম পেয়েছি। তা থেকে জানতে পারলাম আমার ভাড়াটেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হোটেলের একখানা ঘরে পাওয়া গিয়েছে। ভদ্রলোক বোধহয় আত্মহত্যা করেছেন। কেননা মৃতদেহের হাতে একটা পিস্তল ছিল। গুলি মাথা ভেদ করে যাওয়ায় ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে সঙ্গে সঙ্গেই। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটা ঘটেছে গতকাল রাত প্রায় পৌনে বারোটা নাগাদ।'

হ্যাঁ, গতকাল রাতে ঠিক এই সময়েই ভদ্রলোক মৃত ব্যক্তিকে এ বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিলেন, প্রয়াত মানুষটির আত্মা কি তার প্রিয় আবাসভূমির মায়া ত্যাগ করতে পারেনি?

এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

অনুবাদ: অনিরুদ্ধ চৌধুরী

অপূর্ণ আশা

The deferred appointment—এলগারনন ব্ল্যাকউড

রাস্তার ধারে ছোট ফটো তোলার দোকানটায় সারাদিন ধরে কোন খদ্দের নেই। অতিমাত্রায় দাম্ভিকের কাছেও আলো অনাহূত। সেই সকাল থেকে লন্ডনের আকাশ আবছা অন্ধকারে ঢেকে রয়েছে। পথচারীরা কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরিয়ে যে যার বাড়িতে ঢুকে পডার জন্য ব্যস্ত। প্রথম তুষারপাত ধীরে ধীরে শুরু হয়েছে যদিও এখনও তাতে ময়লা জমবার মতো অবস্থা হয়নি। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসের গুনগুনানিতে মিঃ মার্টিমার জেনকিন তার ময়লা ছেঁড়া কোটের কলারটা ওপরে তোলার চেষ্টা করছে। সে এই দোকানের ফটোগ্রাফার। কোন খদ্দের না পাওয়ায় হতাশায় বাইরে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা হাতে দোকানের গেট বন্ধ করছে। তখন ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

গেটের শেষ তালাটা বন্ধ করার আগে শোকেসে সাজানো রাজকীয় স্থাপত্যের এক মোটা লোকের প্রতিকৃতির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর গেটে চাবি দিয়ে পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকবার জন্যে এগিয়ে গেল। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে তার মনে হল পেছনে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। ঘুরে দেখল সরু প্যাসেজে একজন লোক তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

জেনকিন আচমকা লাফিয়ে উঠল। লোকটা তার এত কাছে অথচ তাকে ভেতরে ঢুকতে দেখল না। তার চোখ দুটো বিষন্ন এবং সনির্বন্ধ অনুরোধের ভাব প্রকাশ করছে। জেনকিন আগেই তার সহকারীকে ছুটি দিয়েছে। সেই ছোট্ট দোতলা বাড়িতে আর কোন লোক নেই। সে যখন পেছন ফিরে ছিল সেই সময় অন্ধকারে লোকটা নিশ্চয়ই ভেতরে ঢুকে পড়েছে, এইরকম সে ভাবল। সে কে হতে পারে আর কিই বা চাইতে পারে? সে কি ভিখিরী, খদ্দের না কোন বদমাশ লোক?

গুড ইভিনিং, হাত ঘষতে ঘষতে জেনকিন বলল। তবে তার কথা বলার মধ্যে সামান্য ভদ্রতার সুরও ছিল না যা সাধারণত সে খদ্দেরকে দেখায়। সে 'স্যার' কথাটাও যোগ করতে যাচ্ছিল কিন্তু চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল। সেই সময় আগন্তুক একটু নড়লে আলোটা তার মুখের উপর পড়ল। তখন জেনকিন তাকে চিনতে পারল। যদি সে ভুল না করে থাকে তবে আগন্তুক হচ্ছে বড় রাস্তার পুরনো বইয়ের দোকানের মালিক।

ওঃ আপনি মিঃ উইলসন! আধোস্বরে বলল যদিও সে নিশ্চিত হতে পারছিল না। আমাকে মাফ করবেন। আলোটা ঠিকমতো না পড়ায় আপনাকে ধরতে পারিনি। আমি দোকানটা এইমাত্র বন্ধ করছি।

লোকটি নীরবে মাথা নিচু করে উত্তর দিল।

আপনি ভেতরে আসবেন না? দয়া করে আসুন।

জেনকিন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ব্যাপারটা কি সে ভাবতে লাগল। আগন্তুক তার খদ্দেরের মধ্যে পড়ে না, প্রকৃতপক্ষে সে যে তাকে চেনে তাও ঠিক করে উঠতে পারল না। মাঝে মাঝে তার দোকানে কিছু কাগজ কিনতে বা অন্য কিছুর জন্যে আসতে দেখেছে। সে এখন উপলব্ধি করতে পারছে লোকটা খুব অসুস্থ এবং ক্লান্ত, মুখটা তার ফ্যাকাসে ও বিষণ্ণ। তার এই হঠাৎ আগমন তাকে মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলল। সে দুঃখিত হল, বেদনার্ত হল। সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

স্টুডিওর মধ্যে তারা ঢুকল। আশ্চর্য, আগন্তুকই প্রথম ঢুকল যেন সে পথ চেনে। জেনকিন ভাবল নিশ্চয়ই সে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। কোন কথা না বলে আগন্তুক সোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে তুলিরং করা গাছের পর্দার দিকে পেছন করে, ক্যামেরার সামনে তাকিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। স্টুডিও ঘরে উজ্জ্বলভাবে আলো জ্বালানো ছিল। সে চেয়ারে বসে পা দুটো আড়াআড়িভাবে রেখে কৃত্রিম ফুল দিয়ে সাজানো টেবিলটা টেনে নিয়ে তার উপর হাত রেখে বিশেষ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল। সে বোঝাতে চায় তার ফটো তোলা হোক। তার চোখ দুটি সোজা লেন্সের দিকে, যদিও ক্যামেরাটা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। তার ভাবটা এমন যে সে ফটো তোলার লোককে গ্রাহ্য করছে না। কিন্তু জেনকিন তখনও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। তার বোধ হল একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস তার মুখের উপর দিয়ে বয়ে গেল যদিও তা রাস্তার ঠাণ্ডা বাতাস নয়। সে উপলব্ধি করল তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। তার শিরদাঁড়ায় একটা কাঁপুনি খেলে গেল। সে ফ্যাকাসে বিষণ্ণ মুখে এবং ঢাকা দেওয়া ক্যামেরার প্রতি স্থিরদৃষ্টি চোখ দুটো দেখে তার অসুস্থতার লক্ষণই স্পষ্ট দেখা গেল যেখানে কোন আশা, কোন ভরসা নেই। মৃত্যুই সে দেখতে পেল।

এক সেকেন্ডের জন্যে এই চিন্তাটা মনে উদয় হয়েই চলে গেল। সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে দু' মিনিটের বেশি সময় লাগল না। মিঃ জেনকিন নিজেকে শক্ত করে মন থেকে দুশ্চিন্তা তাড়িয়ে দিয়ে কাজের কথায় এল। বলল, আমাকে মাফ করুন। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি। আপনি নিশ্চয়ই আপনার ফটো তুলতে চান। সারাদিন আমার খুব ব্যস্ততায় কেটেছে এবং এই অসময়ে আমি কাউকে আশা করিনি। সে যখন কথা বলছিল তখন ঘড়িতে ছটার ঘণ্টা পড়ছিল। কিন্তু শব্দটা তার কানে যায়নি। মনের মধ্যে তার আর একটা চিন্তা খেলছিল: একজন লোকের অসুস্থ অবস্থায় তার ফটো তোলা উচিত নয়, বিশেষ করে যখন সে মরতে চলেছে। ভগবান! তার ফটোটা ভাল করতে গেলে অনেক মেহনত করতে হবে।

সে মনে মনে ছবিটার সাইজ, দাম ইত্যাদি আলোচনা করতে লাগল আর লোকটা

চুপচাপ চেয়ারে বসে রইল। কোন কথা তার মুখে নেই। তাকে দেখে মনে হয় তার যেন তাড়া আছে, কোন কথা না বলে কাজটা সেরে ফেললেই হয়। ফটোগ্রাফার ভাবতে লাগল অনেক লোকই এরকম, দাঁতের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার থেকে ফটো তোলা এক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। লোকদের ঠিকঠাক করে বসাতে সে যেন বেশ গর্ব অনুভব করে। কিন্তু এ লোকটা একেবারেই বাজে। সে লোকটাকে একবারও ছোঁয়নি এমনকি তার এরকম মারাত্মক অসুস্থতার ভাব দেখে তার খুব কাছে পর্যন্ত যায়নি।

একটা ফ্লাশলাইটের দরকার মিঃ উইলসন, এই বলে সে অবশেষে ক্যামেরা স্ট্যান্ডটাকে অস্থিরভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে একটু কাছে নিয়ে এল। লোকটা অধৈর্যভাবে মাথাটা একটু নাড়াল। জেনকিনের একবার ইচ্ছে হল তাকে বলে অন্য সময় আসতে, তার অসুস্থতার সম্বন্ধে একটু সমবেদনা জানাতে, আসলে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে তার জিবটা যেন জড়িয়ে গেল। তার সঙ্গে এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। ব্যবসার খাতিরে কিছু গল্প করা যেতে পারে মাত্র। সত্যি বলতে কি জেনকিন যেন হতভম্ব হয়ে গেল—তার মধ্যে নিজেকে সে খুঁজে পেল না। এরই মধ্যে তার অস্বস্তিবোধটা ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল। সে তাড়াতাড়ি করতে লাগল। সেও চাইল কাজটা যত শীঘ্র সেরে তাকে বিদায় করতে পারলে ভাল হয়।

অবশেষে সব ঠিকঠাক করে কেবলমাত্র ফ্লাশলাইটটা ঘোরাবার অপেক্ষায় রেখে তার মাথার উপর কালো ভেলভেটের কাপড় চাপিয়ে ক্যামেরার লেন্স দিয়ে উঁকি মেরে দেখল—কিছুই দেখতে পেল না। একটা আলোর ঝলক, একটা মুখ—হা ভগবান! এমন মুখ তার, অথচ সে নয়—একটা আলোর চমক! বিদ্যুতের মতো ক্যামেরার পর্দায় খেলে গেল। চোখ ধাঁধিয়ে উঠল—প্রায় অন্ধকার ছিল। একেবারে পুরোদস্তুর তীব্র আলোকের ঝলমলানি।

জেনকিনের মনে হল সে যেন কাপড়ের সঙ্গে জড়িয়ে রইল, চোখ বন্ধ, দম নিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে। মন থেকে সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার ঠিক করে দাঁড়িয়ে লেন্সের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয়বার দেখে চমকে উঠল—কেউ নেই। বাঁ হাতে টুপিটা উত্তেজিতভাবে চেপে ধরে ক্যামেরার উপর দিয়ে চেয়ারের দিকে তাকাল। জেনকিনের পা কাঁপতে লাগল—ঘরের চারদিকে চকিতে তাকিয়ে দেখল তারপরে দৌড়ল, চেয়ার উল্টে ফেলে দিয়ে একছুটে প্যাসেজে গেল। প্যাসেজ ফাঁকা, বাইরে যাবার দরজা বন্ধ। আগন্তুক উঠে গেল যেন কখনই সে এখানে ছিল না। ভয়ে তার মাথার চুল আবার খাড়া হয়ে উঠল, গায়ের চামড়া কুঁচকে গেল, শিরদাঁড়ায় কেউ যেন বরফ ঢেলে দিল।

কিছুক্ষণ পর স্টুডিও ঘরে ফিরে এসে উত্তেজিতভাবে আবার দেখতে লাগল। চেয়ারটা খালি পড়ে রয়েছে, পেছনে ময়লা পর্দায় গাছ আঁকা—তার পাশেই ফুল সমেত ফুলদানী বসান গোল টেবিল। এক মিনিট আগেও ঐ চেয়ারে মরার মতো

দেখতে মিঃ উইলসন বসেছিল। তার ভয়ার্ত মনে উদয় হল—তাহলে আমি স্বপ্ন দেখছিলাম না তো! আমি নিশ্চয়ই কিছু দেখছিলাম। আবছাভাবে তার মনে পড়ল কাগজে এরকম গল্প পড়েছে—বিপদ থেকে মানুষকে বাঁচাবার অদ্ভুত সঙ্কেত জানানোর গল্প, অথবা স্বপ্নে দেখা কোন মুখের অমঙ্গলের আশঙ্কা থেকে রক্ষা করতে, এই ধরনের নানা গল্প। তার সব তালগোল পাকিয়ে গেল—মনে হল তার যেন কিছু ঘটতে চলেছে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আশা হল হয়ত যেমন হঠাৎ সে উধাও হল তেমনি আবার হঠাৎ এসে পড়বে। ঘটনাটা আবার সে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাবতে লাগল। সেই সময় দুটো ব্যাপার সে দেখতে পেল যা আগে ভাবেনি কিন্তু এখন খুবই অদ্ভুত লাগছে। আগন্তুক একটি কথাও বলেনি আর সে নিজেও তাকে একবারও ছোঁয়নি। বেশি কিছু চিন্তা না করে সে টুপি ও কোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সামনের বড় রাস্তার উপর ছোট দোকানের উদ্দেশ্যে কিছু কালি ও কাগজ কেনার জন্যে, যদিও সেগুলো তার কোন দরকারই ছিল না।

দোকানটা সেইরকমই আছে তবে মিঃ উইলসনকে দেখা যাচ্ছে না। একজন লম্বা মতো লোক তার সহকর্মীর সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে। জেনকিন মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে ভেতরে ঢুকল। সস্তা দামের স্টাইলোগ্রাফিক পেন দেখতে লাগল আর অপেক্ষা করতে থাকল কখন তাদের কথাবার্তা শেষ হয়। তাদের কথা জেনকিনের কানে আসতে লাগল। তাছাড়া সে শুনেছে এই ছোট দোকানে মাঝে মাঝে নামকরা লোকের আগমন ঘটে, এ নিশ্চয়ই সেই ধরনের কোন লোক। তাদের কথার কিছুটা তার কানে এল। লম্বা লোকটা বলছে, হ্যাঁ, মৃত্যুপথযাত্রী লোকের এই শেষ কথাগুলো সত্যিই অনন্যসাধারণ, খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আপনার নিউম্যানের কথা মনে পড়ে—আরো আলো। ঠিক সেরকম না? বই বিক্রেতা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, খুব সুন্দর বলেছেন।

জেনকিন কলমগুলোর উপর একটু ঝুঁকে পড়ল। লোকটি চলে যেতে উদ্যত হয়ে বলল, এটাও সেদিক থেকে সুন্দর, পুরনো প্রতিজ্ঞা বুঝলে কিনা, অপূর্ণ অথচ বিস্মৃত নয়। বিকারের ঘোরে হঠাৎ এর প্রকাশ। অদ্ভুত, সত্যিই অদ্ভুত! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সৎ ও বিবেকী ছিল। বিশ বছর ধরে আমি তাকে দেখে আসছি, কথার খেলাপ কখনও সে করেনি...।

একটা গাড়ির আওয়াজে বাকি কথাগুলো তার শোনা গেল না। লোকটা দরজার দিকে এগোতে থাকলে বই বিক্রেতাকে বলতে শোনা গেল...তারা যখন তাকে দেখেছিল সে তখন অর্ধেক সিঁড়ি নেমেছে আর একই কথা বারবার বলে চলেছে—আমার স্ত্রীকে কথা দিয়েছি, আবার উপরে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সে পীড়াপীড়ি করছিল, সেরকম কথাই আমি শুনেছি। আর আমার মনে হয় তার তাড়াতাড়ি মৃত্যুর জন্যে ওটাই কারণ। পনের মিনিট পরেই তার মৃত্যু হয়। আগের আগের মতোই তার শেষ কথা—আমার স্ত্রীকে কথা দিয়েছি...।

লম্বা লোকটা চলে গেল। জেনকিনও তার জিনিস কেনার কথা ভুলে গেছে।

কখন এটা ঘটেছে? তার গলার স্বর সে নিজেই বুঝতে পারল না। যে উত্তরটা সে শুনেছিল এক মিনিট পরে বাড়ি যাবার জন্যে রাস্তায় নেমে তার কানের মধ্যে সেটা সজোরে বাজতে লাগল। ছ'টা বাজার কয়েক মিনিট আগে। বেশ কয়েকদিন ধরে ভুগছিল সে। প্রচণ্ড জ্বরে বিছানা ছেড়ে যাবে বলে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল সেই সময় তাকে ধরে ফেলা হয়। চিৎকার করে বলছে তার ছবি তোলার জন্যে আপনার কাছে যেতে ভুলে গেছে। হ্যাঁ, খুব দুঃখের ব্যাপার।

কিন্তু জেনকিন তার স্টুডিওতে ফিরে গেল না। ঘরে তার সারারাত আলো জ্বলতে লাগল। পাশের একটা ছোট ঘরে সে রাত কাটিয়ে দিল। পরের দিন সে তার সহকারীকে ছবির প্লেটটা ধুতে দিল। এটাতে দোষ হয়েছে স্যার, জবাব এল। কোন ছবি নেই কেবল একঝলক আলো—অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল।

যা পার, প্রিন্ট কর, জেনকিন বলল। ছ'মাস পরে জেনকিন হঠাৎ একদিন সেই প্লেট ও প্রিন্টটা দেখল। সে আশ্চর্য হয়ে দেখল দুটো থেকেই আলোর রেখা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বলতা যে সেগুলোতে কখনও ছিল তা দেখে মনে হয় না।

অনুবাদ : রবীন্দ্রনাথ বসু

নিশার আলো

Ghost of Black John —উইলিয়ম ম্যাকেলাব

চাক অ্যাডামস ও তার মা জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। পাতলা কুয়াশা ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে। চাদরের মতো গাছপালা ঢেকে যাচ্ছে। আলো আঁধারির মধ্যে তারা দু'জন যেন হতাশায় ভেঙেপড়া ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাইরের এই অসহ্য আবহাওয়ায় মনমরা হয়ে চাক জানালা থেকে সরে গেল।

তার মাও তার পাশে এসে মৃদুহাস্যে বলল, বৃষ্টি, কুয়াশা আর হেরিং মাছ। আমি ভেবে পাচ্ছি না স্কটল্যাণ্ডের এইসব দ্বীপগুলোয় সূর্যের মুখ দেখা যাবে কি না। বাছা, আবার কি আমি লং আইল্যাণ্ড দেখে খুশি হব।

একটু থেমে আবার বলল, তবে সেরকম কিছু খারাপ মনে হয় না, চাক। হেব্রাই ডিস-এর বাসিন্দারা যারা সারা বছর এখানে থাকে, অন্তত এ আবহাওয়াকে কিছু

ভয় করে না। তাছাড়া তোমার বাবার সরকারের তরফ থেকে জরিপ হওয়া পর্যন্ত আমরা তো এখানে কয়েক সপ্তাহ মাত্র আর আছি।

এই অবস্থাতেই বাবা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে উঠতে পারবে না। বাজে কথা বলছি না, আচ্ছা তুমি কি এমন ঝিমুনো জায়গা কখনও দেখেছ?

সত্যিই জায়গাটা খুব শান্ত, চাক। আর হেরিং-এর হিসেবের পক্ষে তো নয়ই। তোমার বাবাকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট হেরিং মাছ ধরার ও সংরক্ষণ করার প্রণালী বাতলাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এর অর্থ স্কটল্যান্ডের লোকেরা আরো বেশি মাছ পাবে।

তারা আমার ভাগটাও নিতে পারে, যেকোন সময়। বেশ একটু বিরক্তিভরে কথাগুলো বলে সে জানালায় গিয়ে বাইরের নিরানন্দ দৃশ্যের দিকে হতাশভাবে তাকিয়ে রইল।

কুয়াশা কিছুটা দূর হয়েছে, ধূসর মেঘগুলো হাওয়ার বেগে ছুটে চলেছে, পাহাড়ের মাথার থেকে সাপের মতো এঁকেবেঁকে কুয়াশা আকাশের দিকে উঠছে। কি জায়গা!

হঠাৎ চাক লক্ষ্য করল একটা ছেলে সরু পথ দিয়ে তাদের বাড়ির দিকে আসছে। সে তার মায়ের দিকে হাসিমুখে তাকাল।

স্যান্ডি ম্যাকলীন আসছে সাপ্তাহিক কাগজ নিয়ে। কি করে খবর ভর্তি করে কাগজে ভেবে আমি শিউরে উঠি।

সে দরজা খুলে কালো চুলওলা যুবককে অভ্যর্থনা জানাল।

বেশ হাসিখুশির দিন তাই না? শান্ত পাহাড়ী স্বরে স্যান্ডির সুর উঠানামা করল। এই আমেরিকান ছেলেটা যেমন ভেবেছিল সব স্কটদেব মতো তাব প্রাদেশিক ভাষা বোঝা শক্ত কিন্তু তার কাছে কিছু শক্ত মনে হল না।

হাসিখুশির দিন? চমকে উঠে চাক পুনরাবৃত্তি করল। সারাক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছে।

স্কট ছেলেটার ঠোঁটে হাসি এসে মিলিয়ে গেল। হ্যাঁ, কিন্তু এখনই সূর্য দেখা দেবে, চাক। বাতাস, রৌদ্র, বৃষ্টি; এই দ্বীপে নানা প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখতে পেয়ে আমরা ভাগ্যবান।

চাক মনে মনে ভাবল, এর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। সে মোটেই বুঝবে না। তাছাড়া সে সত্যিই খুব খারাপ ছেলে নয়। তার হাবভাব একটু রাশভারী তবে খুব মিশুকে। তার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে চাক দেখল ছেলেটা বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা, চওড়া কাঁধ, উলের জামা গায়ে, মোটা শক্ত আঙুলে কাগজ ধরে রয়েছে।

স্যান্ডি, নতুন কিছু আছে? কাগজটা হাতে নিয়ে সামনের পাতায় চোখ বুলিয়ে জানতে চাইল চাক। মাঝে-মধ্যে কিছু এখানে ঘটে নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, একজন নতুন মন্ত্রী শীঘ্রই এখানে আসবেন, কিছু একটা হবে মনে হয়।

চাক ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে কাগজটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল। অন্যমনস্কভাবে বলল, আমি বুঝতে পারছি। স্কট বালকটি তাকে নীরবে লক্ষ্য করছে দেখে সে সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে উঠল। খারাপ কিছু নয়, স্যান্ডি, স্কটল্যান্ড সমুদ্রতীরে একটা ছোট্ট দ্বীপ। এখানে এমন কি ঘটতে পারে মনে করি, এই যা। সে ভাবল সে তাকে কিছু আঘাত দেয়নি।

স্কট বালকটির চোখটা একটু চকচক করে উঠল। আজ এই দ্বীপে কিছু ঘটবে, সে শান্তভাবে বলল। যা সমস্ত আমেরিকায় ওরকম হবে না।

কি ব্যাপার ? চাক বিস্মিত হয়ে জানতে চাইল।

ওঃ ব্যাপার, যেমন ধর ভুতুড়ে ব্যাপার, বেশ চালাকির সঙ্গে কথাগুলো বলল স্যান্ডি।

ভূত ? তীক্ষ্ণস্বরে বেরিয়ে এল চাকরের মুখ থেকে। সে কি ঠিক শুনেছে ?

স্কট বালক মাথা নেড়ে সায় দিল। তার চেরা রহস্যময়ভাবটা ঢেকে শান্ত, গলদেশীয় গর্বে ফুলে উঠল।

হ্যাঁ, এমন অনেক কম জায়গা আছে যা কালো জনের ভূত সম্বন্ধে গর্ব করতে পারে।

তুমি আমাকে বলতে চাইছ না যে তুমি ভূত বিশ্বাস কর। চাক তার বিস্ময়ভাব চাপতে পারল না।

আজ থেকে তিনশ' বছর আগে ব্ল্যাক জন তার ছেলেকে সমুদ্রে যেতে দেখেছিল। সে আর ফিরে আসেনি। কিন্তু বুড়ো লোকটা বিশ্বাস করতে পারেনি তার ছেলে মারা গেছে। হ্যাঁ, তার শেষ কপর্দক পর্যন্ত তার ছেলের খোঁজে খরচ করেছিল। গরীব ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা গেলেও, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। এখনও তার ভুতুড়ে দেহটা সমুদ্রের ধারে কবরে, জড়ানো কাপড় গায়ে, একটা লণ্ঠন নিয়ে রাতের বেলায় ছেলেকে ঘরে ফেরার জন্যে অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়।

সে একটু থামল, চোখে তার গর্বের ভাব। আবার বলল, আমি নিজে তাকে দেখেছি।

স্যান্ডির কথা শুনতে শুনতে বিস্ময়ে চাকের চোয়াল কেঁপে উঠতে লাল।

তুমি ভূত বিশ্বাস কর। এর বেশি আর কিছু সে বলতে পারল না।

ব্ল্যাক জনের ভূত নিশ্চয়ই।

চাক ভাবল এ ব্যাপারে বেশি কথা বলা পাগলামী। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুখে শিস দিতে দিতে জানালার কাছে চলে গেল।

তুমি ভাবছ চাক, ব্ল্যাক জনের কোন অস্তিত্ব নেই ? শান্ত চেহারার এই পার্বত্য দেশের বালকের স্বরে কোন অসন্তুষ্টি বা বিরক্তিভাব নেই। কেবলমাত্র ভেতরে ঢোকা চোখ দুটো চকচক করে জ্বলছে।

চাক কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছু বলার আগেই দরজা খুলে গেল এবং তার বাবার স্নেহভরা কণ্ঠ ভেসে উঠল।

বাছা, আমি ক্লান্ত ! আজ সকালে সমুদ্র খুব ঠাণ্ডা। জুতো খুলতে খুলতে তার দৃষ্টি পড়ল স্কট বালকটির উপর। এই যে স্যান্ডি ! আমাদের সঙ্গে লাঞ্চের জন্যে থাক।

ধন্যবাদ মিঃ অ্যাডামস। কিন্তু এখন যে আমার এই কাগজগুলোর ব্যবস্থা করতে

হবে। সে দরজার কাছে গিয়ে থামল। বলল, অনেকেই খবরের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। শুভদিন, বিদায়।

ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই চাক হতভম্ব হয়ে মাথা চুলকাতে লাগল। তার বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলল, ভাবুন তো, আজও কেউ ভূতে বিশ্বাস করে। আমি স্যান্ডির মনে কোন আঘাত দিতে চাইনি কিন্তু এই ব্ল্যাক জনের ব্যাপারটা! সে হতাশভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

ব্ল্যাক জন'' ভুরু কুঁচকে চাকের বাবা কথাটা বলল। আমি তার সম্বন্ধে শুনেছি। এখানকাব সেই নামজাদা লোক আমার মনে হয়। এই নামজাদা লোকের ব্যাপারে আজ গ্লাসগো থেকে আমাদের গভর্নমেন্টের কয়েকজন ইন্সপেক্টর এসেছে। মনে হচ্ছে কিছু চোরাই কারবার হচ্ছে।

নিশ্চযই এখান থেকে কেউ হেরিং-এর চোবাই কারবার করছে। বিড়বিড় করে চাক কথাগুলো বলে তার মায়ের লাঞ্চের খাবার সাজানোর দিকে চেযে রইল। আমি যদি বেশি খাই তবে ওরা আমাকে টিনের মধ্যে পুরে লেবেল সেঁটে আমেবিকায চালান দেবে। ভয়ের ভান করে সে বলল।

সেই দিন বেলাব দিকে আবার তার স্যান্ডিব সঙ্গে দেখা হল। সে তখন তাব ছোট্ট গ্রামেব বাসায যাচ্ছিল, চাককে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চাকও তার দিকে তাকিযে রইল। ঐ ভুতুড়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করাব এই সময, সে ভাবল। শোন স্যান্ডি, আমি তোমার মনে ব্যথা দিতে চাই না, তবে আমাব ইচ্ছা তুমি ঐ ভুতুড়ে গল্প বন্ধ কর।

কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি, বেন-এ-গ্লোর পাহাড়ের উপর ভাঙা দুর্গ থেকে তাকে হেঁটে যেতে দেখেছি। স্যান্ডির মুখের শান্তভাব কেটে গিযে প্রতিবাদেব ভাব ফুটে উঠল। হয়ত তুমি এখানে আগন্তুক বলে নিজে দেখতে ইচ্ছুক নও।

চাকের দেহের মধ্যে একটা রাগের ঝলক খেলে গেল।

ঠাকুবমার গল্পে ভয পাব? যেকোন সময় তোমার পোষা ভূতের কাছে যেতে চাও, আমাকে জানিও স্যান্ডি।

তাহলে আজ বাতেই যাওয়া যাক। ঠোঁটে তার কৌতুকের হাসি মাখিযে তার কাছ থেকে বিদায় জানাল।

ঠিক আছে আজই রাতে। চাক গম্ভীরভাবে বলল। স্কট ছেলেটা তার সামনে থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে খুব সহজ ভঙ্গিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। ব্যাবিলনের লং আইল্যান্ডে যত ভূত আছে, তার একটাও যে হেব্রাডিস-এ নেই সেটা স্যান্ডিকে বিশ্বাস করার আনন্দে চাকের মন নেচে উঠল।

সমুদ্রের উপর থেকে ভারী কুয়াশার স্তর সরে গেছে, রাতটা বেশ পরিষ্কার এবং ঠাণ্ডা। চাক ও স্যান্ডি নিঃশব্দে ঝোপঝাড় পেরিয়ে কুয়াশার পর্বত বেন-এ-গ্লোর দিকে এগোচ্ছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। আলো-আঁধারি পথে তারা

এগিয়ে চলেছে। দূরে সমুদ্রের জল রুপোর মতো চকচক করছে। নির্জন নিস্তব্ধ পাহাড়ের ধার ঘেঁষে যেতে যেতে আটলান্টিক সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ চাকের কানে এসে মাঝে মাঝে ধাক্কা মারছে। সে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তুমি ঠিক জানো স্যান্ডি, বুড়ো জন রাতে বাড়ি থাকবে ? সে গলার স্বরটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। কিন্তু সে ভালভাবেই মালুম পাচ্ছে তার বুকের মধ্যে উত্তেজনায় হাতুড়ি পেটানো শুরু হয়ে গেছে।

হয়ত আমরা দেখতে পাব।

স্কট ছেলেটা আর কোন কথা বলল না। চাকও কোন কথা না বলে তাকে নীরবে অনুসরণ করতে লাগল। কালো পাহাড়ের সরু দুর্গম পথ দিয়ে তারা উঠতে লাগল। হঠাৎ একবার চাক ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের পথ থেকে মাত্র এক ফুট পাশে এক বিরাট অতল গহ্বর। সেইদিকে চেয়ে সে আঁতকে উঠল। মাথা ঘুরে গেল। অতি কষ্টে সেদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে চলার পথের উপর রাখল। পায়ের তলায় টুকরো পাথর ভরা পথ শেষ হয়ে সমান্তরাল পথে এসে পড়ল। তারা পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছল।

সেই সময় নিঃশব্দে স্যান্ডি চাককে টেনে বসিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে একদিকে দেখাল। চাকের দৃষ্টিতে যা পড়ল সেটা তার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হল।

চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল কালো ছায়ার এক প্রতিমূর্তি। মাত্র একশো গজ দূরে একটা বিরাট কালো পাথর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একসময় যেটা নামকরা হেব্রিডিয়ান দুর্গ ছিল আজ সেটা একটা ঝোপ জঙ্গলে ভরা, ভাঙা পাথরের স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তার তিনটে বিরাট দেওয়াল এখনও তার বাহ্যিক চাল প্রকাশ করছে। চারটে চূড়ার একটা সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু ধ্বংসের বিষণ্নতা, কিছু ভয়াবহ ও অশুভ ইঙ্গিত কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যেও চাকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘামের সৃষ্টি করছে।

ব্ল্যাক জনের বাড়ি, চাপা উত্তেজনায় স্যান্ডির গলার স্বব কম্পিত। দুর্গ থেকে অবর্ণনীয় ভয়াবহতাকে চাক আবার দমন করবার চেষ্টা করল। আবার সে কেঁপে উঠল।

তারা নিঃশব্দে বুকের উপর ভর দিয়ে ছোট বাগানটা পেরিয়ে জড় করা পাথরের দিকে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। তিনশো বছব আগে এখান থেকে ব্ল্যাক জন তার ছেলেকে বিদায় জানিয়েছিল। হঠাৎ দুর্গের চূড়ায় একঝলক আলো দেখা গেল। যেমন হঠাৎ দেখা গিয়েছিল তেমনি হঠাৎ চলে গেল।

ওটা দেখলে ? চাকের চাপা দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথাগুলো হিসহিস শব্দে বেরিয়ে এল।

স্যান্ডি নীরবে মাথা নাড়ল। এই হচ্ছে ব্ল্যাক জন, তার লণ্ঠন দিয়ে আলো দেখাচ্ছে। ফিসফিস করে সে বলল। ভয়ে আতঙ্কে চাকের দেহের চামড়া কুঁকড়ে উঠলো। জীবনে এমন ভয় সে কখনও পায়নি।

আবার একঝলক আলো দেখা গেল। তবে এবার সেটা দুর্গের চূড়া থেকে নয়, সমুদ্রের দিকের দেওয়ালের একটা ছিদ্র থেকে।

তার ছেলের জন্যে সে এবার নিচে নেমে আসছে। চাকের হাতটা ধরে স্যান্ডি বলল।

চাক নীরবে মাথা নাড়ে। কথা বলতে তার ভয় হল পাছে উত্তেজনা তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

এই যে সে আসছে! ফিসফিস করে স্যান্ডির গলার আওয়াজ হল।

আবার চাক মাথা নেড়ে ঝোপের তলায় গুঁড়ি মেরে পড়ে রইল। আলোটা নড়তে নড়তে দুর্গ থেকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ক্রমে ক্রমে একটা রোগা আকারহীন মূর্তি দেখা গেল। মূর্তিটার গায়ে লম্বা কালো, কবরের আচ্ছাদন জড়ানো—ব্ল্যাক জনের প্রেতমূর্তি।

সেই লম্বা মৃত পাহাড়ী সর্দার ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে এগোতে লাগল—যে সমুদ্র তিনশ' বছর আগে তার ছেলেকে কেড়ে নিয়েছে, যে ঝোপের নিচে ছেলে দুটো লুকিয়েছিল সেখান থেকে কয়েক ফুট দূর দিয়ে সে হেঁটে গেল, শীর্ণ হাড় বের করা হাতে তারলণ্ঠনধরা।

চল আমরা যাই, সেই ছায়ামূর্তি চলে যাবার পর স্যান্ডি ফিসফিস করে বলল। একটা মানুষের কষ্ট দেখা অশুভ। সে থামল। তারপর হঠাৎ বলল, শুনছ।

প্রথমে আস্তে আস্তে, পরে ক্রমশ উচ্চস্বরে হতাশায় ভরা একটা কাঁপা আর্তনাদ পাহাড়ের ধারে দাঁড়ানো সেই রোগা মূর্তির মুখ থেকে ভেসে উঠছে।

ব্ল্যাক জন তার মরা ছেলেকে ডাকছে। এটা খুব খারাপ, চল আমরা যাই। স্যান্ডি চাপা স্বরে বলল।

এক মিনিট, স্যান্ডি। ভয় ও আতঙ্ক সত্ত্বেও চাক একটু অপেক্ষা করল। কিছুক্ষণ আগে ব্ল্যাক জনের প্রেতমূর্তি যাবার একটা কিছু তার নজর পড়েছিল। লণ্ঠনধরা হাড় বের করা আঙুলের মধ্যে একটা ছোট নীল আলো জ্বলজ্বল করছিল।

আচ্ছা স্যান্ডি, ব্ল্যাক জন যদি তার ছেলের জন্যে শেষ কপর্দক খরচ করেছিল, তবে সে আঙুলে হীরের আংটি পরে আছে কেন?

হীরের আংটি? স্যান্ডি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। চাক ইশারায় তার আঙুলটা স্যান্ডির হাতে খোঁচা দিয়ে দেখাল।

দেখ স্যান্ডি, সে সমুদ্রে কাকে যেন সঙ্কেত করছে।

তারা আবার মাটিতে বুক দিয়ে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইল। খুব বেশি হলে দশ গজ দূরে কালো পোশাকে মুড়ি দেওয়া ব্ল্যাক জন লণ্ঠন দোলাচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে মিনিট পার হতে লাগল। ছেলে দুটো অবাক বিস্ময়ে সেই ভুতুড়ে মূর্তির কাজ দেখছে। মাঝে ব্ল্যাক জনের ভুতুড়ে আর্তনাদ সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। এই চিৎকার চাকের দেহের রক্ত হিমশীতল করে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর সেই ব্ল্যাক জন আবার ফিরে চলল দুর্গের দিকে। [illegible]

তাকে খুব সন্তর্পণে পেছনে অনুসরণ করে চলল। দুর্গের বাগানের মধ্যে সেই মূর্তিটা এসে কোথায় মিলিয়ে গেল। সেই সময় আকাশে চাঁদ মেঘমুক্ত হল। চাঁদের আলোয় তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাগানের চারধার দেখতে লাগল। কিন্তু কোথাও সেই মূর্তি দেখতে পেল না। আর সেখানে থাকার মতো তাদের সাহস হল না। চাঁদের আলোয় পথ দেখে তারা দু'জন লাগাল ছুট। সেই যে দৌড় দিল আর কোথাও না থেমে একদমে একেবারে চাকের বাড়ি এসে পৌঁছল।

অনুবাদ : রবীন্দ্রনাথ বসু

শেষ চক্র

The Last Se´ arce—আগাথা ক্রিস্টি

সীন নদীর উপরের সেতু পার হল রাউল। মনটা খুশিতে ভরা, নিজের মনেই সে গানের কলি ভাঁজছিল। ফরাসী যুবক রাউল বয়সে তরুণ। ওকে দেখতে বেশ সুন্দর। সুন্দর মুখে ছোট সাইজের বাহারী কালো গোঁফটি চমৎকার মানিয়েছে। চাকরিটাও তার ভালো। রাউল একজন ইঞ্জিনীয়ার।

কারদোনে এল রাউল, ঢুকল সতেরো নম্বর বাড়িতে। পরিচারিকা কেতামাফিক 'সুপ্রভাত' জানাল বটে, কিন্তু জানাল অত্যন্ত বেজার মুখে। রাউল বোধ হয় সেটা লক্ষ্যই করল না। সে হাসিমুখেই সুপ্রভাত জানাল।

রাউলের গন্তব্যস্থল চারতলার একটি ফ্ল্যাট। খুশি মনেই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগল সে। একটু পরে ফ্ল্যাটের সামনে এসে পড়ল, কলিংবেল-এর সুইচ টিপে দরজা খুলবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল রাউল। গলায় আবার গানের সুরটা এসে গেল, আপন মনেই গুন গুন করে একটা কলি গাইতে লাগল সে। আজ সকালে মনের মধ্যে যেন খুশির জোয়ার এসে গিয়েছে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলল—খুলে দিল একজন বৃদ্ধা ফরাসী মহিলা, রাউলকে দেখে তার বলিরেখাঙ্কিত মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—"সুপ্রভাত, মঁশিয়ে" মহিলা হাসিভরা মুখে বলল।

—"সুপ্রভাত, এলিস" হাসিমুখে রাউল উত্তর দিল।

ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করল এলিস, তারপর রাউলের দিকে তাকিয়ে বলল, "বৈঠকখানায় একটু বসুন আপনি, আমি মাদামকে খবর দিচ্ছি। একটু পরেই তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে।"

—"মাদাম কি ব্যস্ত আছেন ? কি করছেন তিনি ?"

—"তিনি একটু বিশ্রাম করছেন," এলিস উত্তর দিল।

—"বিশ্রাম করছেন ? এখন ?" একটু অবাক হয়েই রাউল প্রশ্ন করল, "কেন মাদামের কি শরীর খারাপ হয়েছে ?"

—"খারাপ হবে না তো কি ?" এলিস একটু মুখঝামটা দিয়েই বলল।

ছোট বৈঠকখানার দরজা খুলে দিল এলিস তারপর রাউল সোফায় বসতেই আগের কথার জের টেনে বলল, "মাদামের শরীর তো খারাপ হবেই, এরকম বারবার চক্রে বসতে হলে কারো শরীর কি ভাল থাকে! আমরা ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করছি। আমি তো বলব আমরা...আমরা শয়তানের সঙ্গে কাজ-কারবার করছি। দেখছেন না, মাদাম দিন দিন কেমন রোগা আর ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছেন, ওঁর শরীরটা রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছে। আজকাল আবার শুরু হয়েছে মাথাধরা, মাথার যন্ত্রণায় অনেক সময়ই তো বিছানায় শুয়ে থাকেন।"

—"রাগ করছ কেন এলিস ?" ওর কাঁধে হাত দিয়ে মিষ্টি গলায় রাউল বলল, "ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না, এর মধ্যে শয়তানের কোন ব্যাপারই নেই। অনর্থক শয়তান বেচারাকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন ?"

রাউলের কথায় আশ্বস্ত হতে পারল না এলিস। আপন মনে নিচু গলায় সে বলতে লাগল, "এসব শয়তানী কাণ্ড-কারখানা আমার মোটেই পছন্দ হয় না, মাদামের শরীরের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন—দেখুন দিনের পর দিন কি হাল হচ্ছে। আমরা ইহজগতের মানুষ। পরলোকের আত্মাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি আমাদের ? আমাদের এটুকু জানলেই হল যে, ভাল আত্মারা স্বর্গে যান আর খারাপ আত্মাদের যেতে হয় নরকে। পাপীরা তাদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি পায় নরকে।"

—"পরলোক সম্পর্কে তোমার চিন্তা-ভাবনা দেখছি একেবারে জটিলতা মুক্ত। এ সম্পর্কে তোমার হিসেব-নিকেশ দেখছি খুবই সহজ।"

—"আপনাদের বিয়ের পরে আর প্রেতাত্মা নিয়ে এসব চক্র-টক্র করবেন না তো, মঁশিয়ে ?" এলিস প্রশ্ন করল, তার ক[illegible]রে অনুরোধের সুর।

—"আরে না, না," এলিসের দিকে তাকিয়ে রাউল হাসল।

—"সত্যি বলছেন ?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি মাদামকে খুব ভালবাস, তাই না এলিস ?"

—"হ্যাঁ", বৃদ্ধা অকপটে স্বীকার করল।

—"মাদামও তোমাকে খুব বিশ্বাস করেন।"

—"আমার তো তা-ই মনে হয়।"

—"তোমার কোন চিন্তা নেই এলিস, বিয়েটা একবার হয়ে যাক, তারপর এসব প্রেতাত্মা আর পরলোকের কারবার একেবারে তুলে দেব, আমার স্ত্রীকে আর এসব অপ্রাকৃ[illegible] ব্যাপার নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে দেব না। এ নিয়ে কোন ঝামেলায়ই পড়তে [illegible]বে না ওঁকে।"

এলিসের বলিরেখায় ভরা মুখখানা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, ব্যগ্রভাবে সে বলল।

—"সত্যি ?...সত্যি এটা ঠিক করে ফেলেছেন মঁশিয়ে ?"

—"হ্যাঁ," গম্ভীরভাবে রাউল সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল স্নেহময়ী এলিস, বৃদ্ধা পরিচারিকা সত্যি সত্যিই তার তরুণী মাদামকে ভালবাসে।

চাপা গলায় অনেকটা স্বগত ভাষণের মতো রাউল বলতে লাগল, "সত্যি, সিমোনের মধ্যে একটা অদ্ভুত—একটা আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে। আর সে অলৌকিক ক্ষমতা ও প্রয়োগও করেছে বারবার। কিন্তু আর নয়। এবার এ ব্যাপারে ইতি টানা উচিত। আমি সিমোনকে ভালবাসি। আমি কি আর ওর অবস্থা লক্ষ্য করিনি ? তুমি মাদামকে ভালবাস এলিস, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। তোমার মাদাম যে দিন দিন রোগা আর ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছেন তা আমার নজর এড়ায়নি। সবই জানি আমি। জানি, একজন 'মিডিয়াম'-এর দেহ এবং মনের উপর কি প্রচণ্ড চাপ পড়ে। সেই দারুণ স্নায়বিক চাপ সহ্য করা খুবই শক্ত। কিন্তু এলিস, একটা কথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। কথাটা হল এই যে তোমার মাদাম প্যারিস শহরের সবচেয়ে শক্তিশালী 'মিডিয়াম'। কিন্তু না, কেবল প্যারিস শহর বলছি কেন, সারা ফরাসী দেশে ক্ষমতার দিক দিয়ে মাদামের সমতুল্য মিডিয়াম আর নেই। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না এলিস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক তোমার মাদামের কাছে আসে। তাঁদের ধারণা এ মিডিয়ামের কাছে কোন ভণ্ডামি বা জালিয়াতি নেই। এখানে এলে তাঁরা ঠকবেন না।"

—"ঠকবে ? মাদামের কাছে ?" তপ্তস্বরে এলিস বলল, "আমার মাদামের মতো সৎ মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। উনি শত চেষ্টা করলেও কাউকে ঠকাতে পারবেন না—এমনকি একটা হাবাগোবা বাচ্চাও ঠকবে না তাঁর কাছে।"

—"ঠিকই বলছ তুমি। এক এক সময় মনে হয় তোমার মাদাম যেন এ পৃথিবীর কেউ নয়, ও যেন নেমে এসেছে স্বর্গের নন্দনকানন থেকে। মর্ত্যলোকে নিয়ে এসেছে স্বর্গলোকের অমৃত বার্তা।"

এলিস খুশিভরা মুখে তাকিয়ে রইল রাউলের দিকে।—"আচ্ছা এলিস, তোমার মাদামকে তো আর মিডিয়ামের কাজ করতে হবে না; এরপর থেকে তো তিনি মনের সুখে ঘরকন্না করবেন। এ খবর শুনে তুমি নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছ ?"

এলিস হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। রাউল ভেবেছিল খবরটা শুনে বৃদ্ধা খুবই খুশি হবে। কিন্তু ও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল কেন ?

—"কি ব্যাপার এলিস ?"

—"ভাবছি একটা কথা," গম্ভীর মুখে এলিস বলল।

—"কি কথা ?"

—"মঁশিয়ে, আপনি তো বলছেন মাদাম প্রেতাত্মাদের সঙ্গে কাজ-কারবার ছেড়ে দেবেন, কিন্তু প্রশ্ন হল প্রেতাত্মারা যদি মাদামকে ছেড়ে না দেয় ?"

—"তার অর্থ?"

—"প্রেতাত্মারা যদি না ছাড়ে?"

—"কি বলতে চাইছ তুমি?" একটু অসহিষ্ণু স্বরেই রাউল প্রশ্ন করল।

—"ব্যাপারটা কি জানেন মঁশিয়ে, পরলোকের বাসিন্দাদের নিয়ে বেশি কারবার করলে অনেক সময় তারা আর মিডিয়ামকে ছাড়তে চায় না। আমার ভয় তো সেখানে।"

—"আমার তো ধারণা ছিল যে তোমার মধ্যে কোন কুসংস্কার নেই," রাউল বলল।

—"অহেতুক কুসংস্কার আমার মধ্যে নেই মঁশিয়ে, তবে..."

—"তবে কি? তোমার বক্তব্যটা গুছিয়ে বল।"

—"আমি যা বলতে চাই, তা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারব না মঁশিয়ে। আগে ভাবতাম মিডিয়ামরা হল ধূর্ত এবং প্রতারক। প্রিয়জনের বিয়োগে ব্যথাতুর মানুষদের তারা নানা কৌশলে ঠকায়। কিন্তু মাদামকে দেখে বুঝেছি যে আমার ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। আমার মাদাম সহজ-সরল মানুষ, উনি অত্যন্ত সৎ।"

—"সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই," রাউল বলল।

চাপা গলায় শঙ্কা-বিহ্বল গলায় এলিস বলল, "এখানে যা ঘটে তার মধ্যে কোন কৌশল বা চাতুরি নেই। যা দেখা যায় তা সত্যি সত্যিই ঘটে। আর...আর সে জন্যই আমার ভয় হয়...খুব ভয় হয়। মঁশিয়ে, এসব কাজ করা মোটেই উচিত নয়। এ জগৎ আর পর জগতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন প্রকৃতির বিধান নয়। আমরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করছি—কাজ করছি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এই অস্বাভাবিক কাজের জন্য একদিন চরম মূল্য দিতেই হবে।"

এলিসের দু' কাঁধে হাত রেখে রাউল তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল। বলল,

"স্থির হও এলিস, কেন ঘাবড়ে যাচ্ছ? শোন, তোমাকে একটা সুসংবাদ দেই। আজকেই আমার শেষ প্রেত-বৈঠক। এরপর আর পরলোক বা ভূত-প্রেত নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না।"

—"আজকেও আবার একটা বৈঠক আছে?" আতংকভরা গলায় এলিস প্রশ্ন করল।

—"হ্যাঁ, আর এটাই শেষ বৈঠক।"

এলিস যে অসন্তুষ্ট হয়েছে, ওর মুখের ভাবে তা স্পষ্ট বোঝা গেল। মাথা নেড়ে ও বলল, "কিন্তু মাদাম বোধহয় আজ চক্রে বসতে পারবেন না।"

—"কেন?" রাউলের কণ্ঠে স্পষ্ট অসন্তোষের সুর।

—"মাদাম অসুস্থ, মাথার যন্ত্রণায় তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। আজ চক্রে বসলে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

—"কিন্তু আমরা যে কথা দিয়েছি। শুধু তা-ই নয়, আগাম টাকা পর্যন্ত নিয়েছি।"

—"তাতে কি, জানিয়ে দিন মিডিয়াম অসুস্থ। আজ তিনি চক্রে বসতে পারবেন না।"

ওদের কথার মাঝখানে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল এক সুতনুকা নারী, দীর্ঘকায়া, গৌরবর্ণা, ক্ষীণদেহে কমনীয়তা আর লাবণ্যের অভাব নেই, মেয়েটির মুখখানা মহাশিল্পী বত্তিচেলির আঁকা ম্যাডোনার ছবির মতো। রাউলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এলিস তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধার বিবেচনা-বোধ আছে।

—"সিমোন!" রাউলের কণ্ঠে আবেগ।

—"রাউল, প্রিয়তম।"

নিজের দু'হাত বাড়িয়ে রাউল সিমোনের দীর্ঘ শুভ্র হাত দু'খানি ধরল। তারপর দু'বার চুমু খেল সেই সুন্দর হাত দু'খানিতে। সুতনুকা নারী আবেগভরে মৃদুস্বরে বলতে লাগল, "রাউল, প্রিয়...প্রিয়তম!"

রাউল আবার ওর সাদা হাত দু'খানিতে চুমু খেল। তারপর ব্যগ্রভাবে তার দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, "সিমোন, তোমার চেহারাটা বড্ড ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, এলিস বলল তোমার নাকি মাথায় যন্ত্রণা, বলল তুমি বিশ্রাম করছ। তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে? তুমি কি অসুস্থ?"

—"না না, ঠিক অসুস্থ নই," দ্বিধাভরা গলায় সিমোন বলল।

সিমোনের হাত ধরে সোফার দিকে এগোল রাউল। ওকে সোফায় বসাল। নিজে বসল ওর পাশে, তারপর জিজ্ঞেস করল,

—"তা হলে বল কি হয়েছে তোমার?"

ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল সিমোনের মুখে। অস্পষ্টভাবে সে বলল,

—"না না, সে কথা শুনলে তুমি আমাকে বোকা মনে করবে।"

—"আমি? আমি তোমাকে বোকা মনে করব? কিছুতেই নয়...কখনই নয়। একথা তুমি কি করে ভাবলে সিমোন?"

রাউলের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িযে নিল সিমোন, কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসে রইল, ওর দৃষ্টি মেঝের কার্পেটের দিকে। তারপর নিচু গলায় দ্রুত বলে ফেলল,

—"আমি ভয় পেয়েছি...বড্ড ভয় পেয়েছি, রাউল।"

কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রাউল। ভাবল সিমোন হয়ত আরো কিছু বলবে। কিন্তু যখন দেখল মেয়েটি আর কিছু বলছে না তখন তাকে কিছুটা সাহস আর উৎসাহ দেবার জন্য বলল,

—"ভয়! কিসের জন্য ভয়? কাকে ভয়?"

—"জানি না, তবে ভয় পেযেছি।"

—"কিন্তু কেন?" বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টিতে রাউল তাকাল সিমোনের দিকে।

রাউলের প্রশ্নের উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গেই। তার দিকে তাকিয়ে সিমোন বলল,

—"জানি তুমি অবাক হবে। কিন্তু আমি যে ভয় পেয়েছি তার মধ্যে এক বিন্দু মিথ্যে নেই। কিসের ভয়...কেন ভয়...কাকে ভয় এসব আমি কিছু জানি না, সব সময়েই এক অজানা আতংক কালো মেঘের মতো আমার মনের আকাশকে ছেয়ে

ফেলেছে। মনে হয় আমার জীবনে একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, তার উপর এই অজানা আতংক, রাউল, আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাব।"

শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল সিমোন। নরম হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে রাউল বলল, "না ডার্লিং, এভাবে হাল ছাড়ছ কেন? এমন করে ভেঙে পড়লে তো চলবে না, তোমার কি হয়েছে তা আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। অতি-পরিশ্রমের ফলেই এসেছে এই ক্লান্তি। মিডিয়ামের জীবনে এরকম ক্লান্তি আসতেই পারে। তোমার এখন যা দরকার তা হল বিশ্রাম—পরিপূর্ণ বিশ্রাম। আর সেই সঙ্গে চাই মানসিক শান্তি।"

সিমোনের মুখে ফুটে উঠল কৃতজ্ঞতার ছাপ। রাউলের দিকে কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল, "তুমি ঠিক কথাই বলেছ রাউল। এখন আমার দরকার পরিপূর্ণ বিশ্রাম আর শান্তি।"

চোখ বুজে রাউলের বাহুমূলে মাথা রাখল সিমোন। নিজের দেহটাকে এলিয়ে দিল রাউলের হাতের উপর।

—"আমি তোমার উপর এমনি করে নির্ভর করতে চাই, একটুখানি সুখ। আমার চাহিদাটা খুব বেশি নয় রাউল," অস্ফুটস্বরে সিমোন বলল।

তাকে আরও কাছে টেনে নিল রাউল, সিমোনের চোখ দুটি তখনও বন্ধ। তার বুক থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘনিঃশ্বাস। মৃদু কণ্ঠে সে বলল, "রাউল, প্রিয়তম, তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরলে আমি সব কথা ভুলে যাই। ভুলে যাই কি ধরনের জীবন আমাকে কাটাতে হচ্ছে। মিডিয়ামের জীবন বড় দুর্বিসহ—বড় ভয়ংকর। কিন্তু তোমার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়লে এ শঙ্কাতুর জীবনের কথাও আমি ভুলে যাই। তখন নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আমার মনে আর কোন সংশয় থাকে না। তুমি তো অনেকটাই জান রাউল, কিন্তু তাহলেও বলব মিডিয়ামের জীবনের সবকিছু তুমি জানো না।"

রাউলের মনে হল তার আলিঙ্গনে বাঁধা সিমোনের শরীরটা যেন ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছে, একটা আড়ষ্টতা যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে তার সুন্দর দেহ-লতাটিকে।

চোখ খুলল সিমোন। শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই সে বলতে লাগল :

—"ছোট একখানা অন্ধকার ঘর। তার মধ্যে আমি বসে থাকি। অপেক্ষা করি। আমার চারপাশে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। বড় ভয়ঙ্কর এই নিরন্ধ্র অন্ধকার। এ অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে কেবল শূন্যতা আর শূন্যতা। স্বেচ্ছায় এই অন্ধকার রাজ্যে নিজেকে ছেড়ে দিই। আমার চারপাশে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আরো ঘন হয়ে ওঠে। সেই অন্ধকারে অপেক্ষা করতে করতে আমার চেতনার উপরও ধীরে ধীরে নেমে আসে অন্ধকার। আমি অচেতন হয়ে পড়ি। তারপর যা ঘটে তার কিছুই জানতে পারি না আমি। আমার কোন অনুভূতি পর্যন্ত থাকে না। শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে অনেক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ফিরে আসে আমার চেতনা, মনে হয় দীর্ঘ ঘুমের পর

আমি যেন জেগে উঠলাম, তারপর এক অপরিসীম ক্লান্তিতে আমার সমস্ত দেহ-মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।”

—“জানি ডার্লিং, আমি জানি,” নরম গলায় রাউল বলল।

—“সে যে কি ভয়ঙ্কর ক্লান্তি তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না,” নিস্তেজ গলায় সিমোন বলল, একথা বলতে বলতে সিমোনের শরীরটা যেন আরো এলিয়ে পড়ল।

—“তোমার তুলনা নেই সিমোন,” নিজের দু'হাত দিয়ে সিমোনের হাত দুটো চেপে ধরে রাউল বলল, “তুমি অনন্যা। তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়াম। এ ব্যাপারে তোমার শ্রেষ্ঠতা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য।”

একটু হেসে নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সিমোন।

—“তুমি মাথা নাড়লে কি হবে, আমি সত্যি কথাই বলছি। এই দেখ...” পকেট থেকে দু'খানা চিঠি বের করল রাউল, বলল, “এই যে, এই চিঠিখানা এসেছে অধ্যাপক রোশের কাছ থেকে আর এই চিঠিখানা লিখেছেন ডক্টর জেনির, দু'জনে একই অনুরোধ করেছেন।”

—“কি অনুরোধ?” ভীরু গলায় সিমোন জিজ্ঞেস করল।

—“দু'জনেই অনুরোধ করেছেন তুমি যেন মাঝে মাঝে মিডিয়াম হিসেবে তাঁদের প্রেত-চক্রে অংশগ্রহণ করো।”

—“না—না—না—মোটেই না!” সোফা ছেড়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল সিমোন, “কক্ষনো করব না ও কাজ। সবকিছুরই একটা সীমা আছে। এবার এ কাজে ইতি টানব। তুমি...তুমি নিজেও তো আমায় কথা দিয়েছ রাউল।”

অবাক হয়ে সিমোনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাউল। ভয়ে, উত্তেজনায় সিমোন কাঁপছে। ওকে দেখাচ্ছে কোণঠাসা প্রাণীর মতো। সোফা থেকে উঠে ওর হাত ধরল রাউল, যেন সাহস দিতে চাইল ওকে। তারপর আশ্বস্ত করবার সুরে বলল, “হ্যাঁ, ও সব প্রেত-চক্রের ব্যাপার-স্যাপার তো শেষই হয়ে গিয়েছে। তোমাকে নিয়ে আমার খুব অহংকার সিমোন, তাই চিঠি দু'খানা দেখালাম।”

সন্দেহের দৃষ্টিতে রাউলের দিকে তাকাল সিমোন, বলল, “তা হলে এটাই ধরে নিচ্ছি যে তুমি আর কখনও আমাকে প্রেত-চক্রে বসতে বলবে না।”

—“না না,” রাউল আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে বলল, “তবে...”

—“তবে কি?” রাউলকে তার বক্তব্য শেষ করতে না দিয়েই সিমোন প্রশ্ন করল।

—“মানে...এসব বিখ্যাত লোকদের জন্য তুমি যদি স্বেচ্ছায় মাঝে মাঝে বসতে রাজী হও তবে।”

—“না না, মোটেই না। আর কখনও চক্রে বসব না আমি,” উত্তেজিতভাবে রাউলকে বাধা দিল সিমোন, “চক্রে বসার মধ্যে বিপদ আছে। আমি বলছি সে বিপদ বড় ভয়ঙ্কর।”

দু'হাতে নিজের কপাল টিপে ধরল সিমোন, দাঁড়াল গিয়ে জানালার কাছে। রাউলের দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুনয়ের সুরে বলল, "কথা দাও, আর কখনও আমাকে চক্রে বসতে বলবে না।"

রাউল এগিয়ে গেল ওর দিকে। সিমোনের দু'কাঁধের উপর নিজের হাত দু'খানা রেখে কোমল কণ্ঠে বলল, "সিমোন, ডারলিং। কথা দিচ্ছি আজ রাতের পর আর কোনদিন তোমায় প্রেত-চক্রে বসতে বলব না।"

চমকে উঠল সিমোন। রাউল পরিষ্কার বুঝতে পারল ওর চমকানি।

—"আজ!" ভীরু গলায় সিমোন বলল, "হ্যাঁ, আজকেই তো মাদাম একস্-এর আসবার কথা। আমি তো একদম ভুলেই গিয়েছিলাম তাঁর কথা।"

ঘড়ির দিকে তাকাল রাউল। বলল, "মাদাম একস্-এর আসবার সময় হয়ে গিয়েছে। এখন যে কোন মুহূর্তে তিনি এসে যেতে পারেন। কিন্তু সিমোন, তোমার শরীর যদি সুস্থ না থাকে..."

রাউলের কথা যেন শুনতেই পেল না সিমোন। সে তখন নিজের চিন্তাতেই ডুবে গিয়েছে।

"মাদাম একস্! সত্যি বলছি রাউল, বড় অদ্ভুত মহিলা উনি। ওঁকে দেখলে আমার ভয় হয়। বড় ভয় হয়।"

"সিমোন।"

রাউলের গলায় ভর্ৎসনার সুর বেজে উঠল। সে সুরটা ধরতে পারল সিমোন। রাউলের দিকে তাকিয়ে সে বলতে লাগল, "জানি রাউল, তুমি অন্য ফরাসীদের মতো। তোমার কাছে মা হল অত্যন্ত পবিত্র। সন্তানহারা শোকাকুলা মা সম্পর্কে এরকম ধারণা পোষণ করা যে উচিত নয় তা আমি ভাল করেই জানি। এটা আমার নির্বুদ্ধিতা, নিষ্ঠুরতাও বলতে পার। কিন্তু রাউল...আমি তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না...ভদ্রমহিলা এত মোটা...ওঁর গায়ের রঙটা কেমন অদ্ভুত রকমের তামাটে। তার উপর আবার মহিলার হাত দু'খানা...হাত দুটো লক্ষ্য করে দেখেছ? কি বিরাট...কি বলিষ্ঠ হাত দু'খানা! ঠিক যেন পুরুষের হাত! উঃ কি ভয়ানক!"

কেঁপে উঠল সিমোন। চোখ বুজল। কাঁধের উপর থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিল রাউল তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, "তোমাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না সিমোন।"

—"কেন?"

—"আচ্ছা, তুমি তো একটি মেয়ে, আর একজন মেয়ের প্রতি তোমার সহানুভূতি এবং সমবেদনা থাকা উচিত। ভদ্রমহিলা সদ্য সন্তানহারা হয়েছেন। মেয়েটিই ছিল ওঁর একমাত্র সন্তান। সন্তানহারা শোকাকুলা মায়ের উপর তোমার দয়া হয় না? হওয়া তো উচিত।"

অস্থির হয়ে উঠল সিমোন, অস্থিরভাবেই অঙ্গভঙ্গি করে সে বলল, "তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না রাউল। মনের এ আতঙ্ককর অনুভূতি কারো চাওয়া-না-চাওয়ার

উপর নির্ভর করে না। মাদাম একস্‌কে যখন প্রথম দেখলাম তখনই এ আতংকের অনুভূতি আমার মনকে ছেয়ে ফেলল।"

—"তোমার ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই," রাউল বোঝাবার চেষ্টা করল।

অস্থিরভাবে নিজের হাত দু'খানা ছড়িয়ে দিল সিমোন, উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল, "তোমাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না রাউল। তুমি বুঝতেই চাইছ না, মাদাম একস্‌-কে দেখলে আমি আঁতকে উঠি। দারুণ ভয়ে আমার মনটা কুঁকড়ে যায়। তোমার বোধহয় মনে আছে তাঁর হয়ে প্রেত-চক্রে বসতে আমি ইতস্তত করছিলাম—রাজী হয়েছিলাম অনেক পরে। আমার ধারণা হয়েছিল, তাঁর জন্য আমার ভয়ঙ্কর কোন অমঙ্গল হবে। যেমন করেই হোক তিনি জীবনে মহাবিপদকে আবাহন করে আনছেন।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাউল বলল, "আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল ঠিক উল্টো। মাদাম একস্‌-এর জন্য তুমি যে ক'টা প্রেত-চক্রে বসেছ তার সবকটিই খুব সফল হয়েছে। ছোট্ট অ্যামেলির বিদেহী আত্মা খুব সহজেই তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। প্রয়াতা অ্যামেলির দেহধারণগুলো হয়েছিল অতি চমৎকার। শেষ বৈঠকের সময় যদি অধ্যাপক রোশ উপস্থিত থাকতেন তবে খুব ভাল হত।"

—"দেহধারণের কথা বলছ," গলার স্বর নামিয়ে সিমোন বলল, "ব্যাপারটা একটু ভাল কবে বল রাউল। তুমি তো জান, আমি যখন আবিষ্ট অবস্থায় থাকি তখন বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকি। এই রূপধারণের ব্যাপারগুলো কি সত্যি হয় ?"

—"হ্যাঁ।"

—"খুব সুন্দর হয় ?" সিমোন আবার জিজ্ঞেস করল।

বিপুল উৎসাহে ঘাড় নাড়ল রাউল। বলল, "প্রথম দিকের কয়েকটা প্রেত-চক্রে অ্যামেলিয়াকে দেখা যাচ্ছিল একটা অস্পষ্ট কুয়াশার বৃত্তের মধ্যে। তাকে ঠিক পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু শেষ বারে যা হল তা একেবারে অকল্পনীয়।"

—"কি হলো শেষ বারে ?" সিমোনের স্বরে একই সঙ্গে উৎকণ্ঠা আর কৌতূহল।

ধীর গলায় রাউল বলল, "শেষ বারে বাচ্চাটা একেবারে রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে এসেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল শিশুটি যেন সত্যিই জীবন্ত! আমি তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করে দেখেছিলাম। কিন্তু দেখলাম তাতে তোমার খুব কষ্ট হয়। মাদাম একস্‌-ও বাচ্চাকে স্পর্শ করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে স্পর্শ করতে দেইনি, কারণ আমার মনে হয়েছিল যে প্রয়াত সন্তানকে স্পর্শ করবার সুযোগ পেলে সন্তানহারা জননীর ধৈর্যের বাঁধ হয়ত ভেঙে যেতে পারে। তার ফলে নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়ত তিনি তোমার কোন মারাত্মক ক্ষতি করে ফেলতে পারেন।"

জানালার দিকে মুখ ফেরালো সিমোন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপর নিস্তেজ গলায় বলল,

—"যখন জ্ঞান হলো তখন আমি বড় ক্লান্ত। দেহ-মনে তখন আমি খুবই দুর্বল

হয়ে পড়েছি। কিন্তু রাউল, এসব কাজ কি ঠিক হচ্ছে? আমরা কোন অন্যায় কাজ করছি না তো? এলিস কি বলে তা জান?"

—"কি বলে?"

—"ও বলে আমরা নাকি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শয়তানের সঙ্গে কাজ-কারবার করছি।"

সিমোন হাসল। কিন্তু কেন যে হাসল তা সে নিজেই বলতে পারে না।

"আমি কি বিশ্বাস করি জানো?" গম্ভীরভাবে রাউল বলল, "অজানাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার মধ্যে সব সময়েই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কাজের পিছনের উদ্দেশ্যটা যদি ভাল হয় তবে বিজ্ঞানের স্বার্থে এটুকু বিপদের ঝুঁকি নেওয়াটা আমি সঙ্গত বলেই মনে করি। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—বিজ্ঞানের স্বার্থে বহু লোক জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রাণ দিয়েছে। যুগ যুগ ধরে এটা চলে আসছে। এক যুগের মানুষ প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অনুপ্রাণিত করে গিয়েছে পরের যুগের মানুষদের। তুমি যে প্রেত-চক্রে বসছ, তা বিজ্ঞানের জন্যই বসছ। জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবার কাজে তোমার প্রচুর অবদান রয়েছে। দীর্ঘদিন এ কাজ করবার ফলে আজ তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছ, এবার তোমার কাজের ইতি টানা হবে। আজকেই তোমার শেষ প্রেত-চক্র। এরপর থেকে শুরু হবে তোমার জীবন।"

একটানা এতক্ষণ বলে রাউল থামল।

রাউলের দিকে তাকাল সিমোন। একটুখানি হাসল, স্নেহের হাসি বলেই মনে হল তার, এতক্ষণে তার উত্তেজনা বোধহয় কেটে গিয়েছে। ফিরে এসেছে আগেকার স্বাভাবিক স্থিরতা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিস্তেজ গলায় সে বলল, "মাদাম একস্-এর আসবার সময় পার হয়ে গিয়েছে। উনি তো দেরি করেন না। হয়ত আজকে আর আসবেনই না উনি।"

—"আমার কিন্তু মনে হয় উনি ঠিকই এসে যাবেন। তোমার ঘড়িটা বোধহয় ঠিক সময় দিচ্ছে না, হয়ত সঠিক সময় থেকে এগিয়ে রয়েছে।"

ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ছোটখাট জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে সিমোন বলল।

"মাদাম একস্ কে? তাঁর সত্যিকারের পরিচয় কি? কোথা থেকে এলেন তিনি? তিনি কোন্ দেশের—কোন্ জাতের? তাঁর আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব বলতে কে আছে?—এর একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারব না আমরা। আসলে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানি না আমরা। 'একস্' তাঁর আসল নাম হতে পারে না। তিনি আমাদের কাছে এসেছেন ছদ্ম পরিচয়ে।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাউল বলল, "এর মধ্যে আর অবাক হবার কি আছে? অনেক লোকই মিডিয়ামের কাছে আসল পরিচয় গোপন করেই আসে। সাবধানতার জন্যই এটা করা হয়।"

—"বোধহয় তাই," নিরুত্তাপ গলায় সিমোন বলল। ওর হাতে ছিল একটা ছোট চীনেমাটির ফুলদানী। হঠাৎ সেটা পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। চমকে সেদিকে ফিরে তাকাল সিমোন। তারপর রাউলের দিকে ফিরে বলল, "দেখেছো আমার মধ্যে আর আমি নেই! আচ্ছা রাউল, আমি যদি মাদাম একস্‌কে একথা বলি যে, আজ চক্রে বসা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তবে তা কি খুব কাপুরুষতার কাজ হবে?"

রাউলের মুখে ফুটে উঠল একই সঙ্গে বিস্ময় এবং বেদনাবোধ। তা দেখে সিমোনের মুখখানা লাল হয়ে উঠল।

ধীর গলায় রাউল বলল, "তুমি কিন্তু কথা দিয়েছিলে সিমোন।"

পিছিয়ে গেল সিমোন। তার পিঠ দেওয়াল স্পর্শ করল। আর্তকণ্ঠে সে বলল, "এ কাজ থেকে আমাকে মুক্তি দাও রাউল। আমি আর পারছি না...সত্যিই পারছি না...।"

রাউলের চোখে ফুটে উঠল নরম ভর্ৎসনার দৃষ্টি। সে দৃষ্টির সামনে সিমোন আবার গুটিয়ে গেল।

রাউল বলতে লাগল, "টাকার জন্য আমি মোটেই ভাবছি না, সিমোন। অবশ্য এই শেষ প্রেত-চক্রের জন্য মাদাম একস্‌ যে টাকাটা দিতে চাইছেন তার অঙ্কটা বিরাট।"

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সিমোন বলল, "সবকিছু কি টাকা দিয়ে কেনা যায় রাউল?"

—"নিশ্চয়ই যায় না। এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু লক্ষ্মী সিমোন, একটা কথা ভেবে দেখ।"

—"কি কথা?"

—"মনে কর তুমি সত্যিই অসুস্থ নও। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কোন ধনী মহিলার অনুরোধে চক্রে-বসা বা না-বসাটা সম্পূর্ণভাবে তোমার ইচ্ছাধীন। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। ভেবে দেখ, মাদাম একস্‌ একজন মা। এই মা সদ্য সদ্য তাঁর একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছেন। তিনি যদি শেষবারের মতো তাঁর সন্তানকে দেখতে চান, তুমি তাঁকে দেখবার সুযোগ দেবে না? সন্তানহারা মাকে তুমি এটুকু দয়া দেখাবে না?"

গভীর হতাশায় সিমোন নিজের হাত দু'খানা ছুঁড়তে লাগল। ও যে খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে তা আর বলবার অপেক্ষা রাখে না।

একটু আত্মস্থ হয়ে নিস্তেজ গলায় ও বললো, "তোমার কথায় বড় কষ্ট পাচ্ছি রাউল। হয়ত তুমি যা বলছ তা-ই ঠিক। তোমার কথামতোই কাজ করব আমি। কিন্তু এবার বুঝেছি আমি ভয় পাচ্ছি কেন। আমার ভয়ের কারণ হল ছোট্ট একটি শব্দ—আর সেই শব্দটি হল, 'মা'।"

—"কি বলছ সিমোন!"

—"ঠিকই বলছি। জানো রাউল, প্রকৃতির রাজ্যে কিছু আদিম মৌলিক প্রবৃত্তির

অস্তিত্ব রয়েছে। অবশ্য সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাদের অনেকগুলিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মাতৃত্ব—মায়ের প্রবৃত্তি কিন্তু আগের মতোই রয়েছে। এ নষ্ট হয়ে যায়নি। এর রূপও পাল্টায়নি। এ ব্যাপারে পশু আর মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার কোন তুলনা নেই পৃথিবীতে। এ ভালবাসাকে আইনের বাঁধনে বাঁধা যায় না। এ ভালবাসা নির্ভয়ে যে কোন পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াতে পারে। এই অন্ধ ভালবাসা নিজের পথে দাঁড়ানো যে কোন বাধাকে নির্মমভাবে—নৃশংসভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে। আমার ভয় এই প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন মৌলিক প্রবৃত্তিটিকে।"

একটানা এতক্ষণ কথা বলে সিমোন থামল। উত্তেজনায় ও ক্লান্তিতে ও হাঁফাচ্ছে। রাউলের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল ও। তারপর বলল, "আজ আমি নিতান্ত নির্বোধের মতো কথা বলছি—আচরণ করছি, তাই না রাউল?"

সস্নেহে সিমোনের হাত দু'খানি ধরে রাউল বলল, "বুঝতে পেরেছি, দেহ-মনে তুমি খুব ক্লান্ত। যাও, যতক্ষণ মাদাম একস্ না আসেন, ততক্ষণ একটু বিশ্রাম কর। শোবার ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে থাক।"

—"বেশ," রাউলের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে সিমোন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চিন্তায় ডুবে গেল রাউল। তারপর বসবার ঘরের দরজা খুলে চলে এল পাশের হলঘরে। ছোট হলঘরটা পার হয়ে এবার সে এল পাশের আর একখানা ঘরে। এ ঘরখানাও আগের ঘরখানারই মতো। ঘরের এক প্রান্তে রয়েছে একখানা ছোটমতো ঘর, ঘর না বলে তাকে কুঠুরী বলাই ভাল। কুঠুরীর মধ্যে রয়েছে একখানা বড় হাতলওয়ালা বিরাট 'ইজিচেয়ার'। কালো ভেলভেটের ভারী পর্দাগুলো এমনভাবে সাজান রয়েছে যে ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে এই ছোট ঘরখানাকে ঢেকে ফেলে দেওয়া যায়। আবার প্রয়োজন হলে পর্দার আবরণ সহজেই সরিয়ে ফেলে ছোট কুঠুরীখানাকে লোকচক্ষুর সামনে আনা যায়।

এলিস ঘর সাজাচ্ছিল। কুঠুরীর সামনে দু'খানা চেয়ার আর একখানা গোল টেবিল। টেবিলের উপরে রয়েছে একটা খঞ্জনি, একটা শিঙে, কয়েকখানা কাগজ আর পেন্সিল।

রাউলকে দেখে এলিস বলল, "মঁশিয়ে, এই কিন্তু শেষ প্রেত-চক্র। আজকের ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেলে রক্ষে পাই।"

'কলিংবেল'-টা বেজে উঠল তীব্র তীক্ষ্ণস্বরে।

—"যাও, দেখ গিয়ে কে এসেছেন। মনে হয় মাদাম একস্‌ই এসেছেন।"

—"ঐ মহিলা তো গীর্জায় গিয়ে সন্তানের আত্মার মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করতে পারেন।" গম্ভীর গলায় অনুযোগের সুরে এলিস বলল।

'কলিংবেল'-টা আবার যেন আর্তনাদ করে উঠল।

—"যাও, দেখ গিয়ে কে এসেছেন," আদেশের সুরে রাউল বলল।

গজগজ্ করতে করতে এলিস চলে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এল। তার সঙ্গে একজন মহিলা। মহিলার দিকে তাকিয়ে এলিস বলল,

—"আপনি একটু বসুন মাদাম। আমার মাদামকে খবর দিচ্ছি যে আপনি এসেছেন।"

মাদাম একস্-এর সঙ্গে করমর্দন করবার জন্য রাউল এগিয়ে গেল। সিমোন ঠিকই বলেছে। বিরাট চেহারা ভদ্রমহিলার। যেমন লম্বা তেমনি মোটা। ওঁর গায়ের রঙ অদ্ভুত রকমের তামাটে। হাত দু'খানা সত্যিই পুরুষালি। ফরাসী দেশের প্রথা অনুযায়ী ওঁর পরনে ফরাসী দেশের কালো পোশাক। মহিলার কণ্ঠস্বরও অত্যন্ত গম্ভীর।

"আমার বোধ হয় আসতে একটু দেরি হয়ে গেল," গম্‌গমে গলায় মাদাম একস্ বললেন।

হাসিমুখে রাউল বলল, "হ্যাঁ, দেরি হল। তবে বেশি নয়. মাত্র কয়েক মিনিট।"

—"মাদাম সিমোন কোথায়?"

—"মাদাম সিমোনের শরীরটা সুস্থ নয়। তিনি শুয়ে আছেন," রাউল উত্তর দিল।

করমর্দনের পর ভদ্রমহিলা হাত সরিয়ে নিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি শক্তভাবে রাউলের হাতটা চেপে ধরলেন। গম্ভীর অথচ তীক্ষ্নস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "ও তাই বুঝি, তা মাদাম সিমোন আজ চক্রে বসতে পারবেন তো?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বসবেন," রাউল দ্রুত উত্তর দিল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মহিলা। তারপর মুখের কালো আবরণটার বাঁধন খুলতে খুলতে একখানা চেয়ারে বসে পড়লেন।

আপন মনে নিচু গলায় তিনি বলতে লাগলেন, "মঁশিয়ে রাউল, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না এরকম প্রেত-চক্র আমার মনে কত আনন্দের সৃষ্টি করে। আমি অবাক হয়ে যাই। আমার একমাত্র সন্তান অ্যামেলি! সে আর আমার কাছে নেই। কিন্তু মাদাম সিমোন চক্রে বসলে আমি আমার ছোট্ট বাচ্চাকে দেখতে পাই...তার সঙ্গে কথা বলতে পারি...হয়ত সম্ভব হলে তাকে আমি স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারি।"

দ্রুত কণ্ঠে রাউল বলল, "না মাদাম একস্, স্পর্শ করবার চেষ্টা মোটেই করবেন না। আমার স্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া আপনি কোন কিছুই করতে পারবেন না। করলে সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে।"

—"আমার বিপদ হবে?"

—"না মাদাম, বিপদের সম্ভাবনা মিডিয়ামের। প্রেত-চক্রে বিদেহী আত্মার দেহধারণের সময় যা ঘটে বিজ্ঞান তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছে। খুঁটিনাটি বা জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমি সহজভাবে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছি। আমার কথাগুলো আপনি মন দিয়ে শুনুন।"

—"বলুন," মাদাম একস্-এর স্বর গম্‌গম্ করে উঠল।

—"কোন বিদেহী আত্মা যদি স্থূলদেহ ধারণ করতে চায় তবে মিডিয়ামের দেহ থেকে তাকে দেহধারণের উপাদান গ্রহণ করতে হয়। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে প্রেত-চক্রের সময় মিডিয়ামের মুখ থেকে সূক্ষ্ম ধোঁয়ার মতো বাষ্প বেরোয়। এই বাষ্পই ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়ে প্রেতাত্মার নিখুঁত দেহের সৃষ্টি করে। মিডিয়ামের

দেহ থেকে যে সূক্ষ্ম বাষ্প বেরিয়ে আসে তাকে বলে 'এক্টোপ্লাজম্'। যাঁরা প্রেততত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন তারা বলেন যে এই 'এক্টোপ্লাজম্' মিডিয়ামেরই দেহের অতিসূক্ষ্ম বস্তুকণা। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওজনের সাহায্যে এ জিনিসটা প্রমাণ করা যাবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ দেহধারী প্রেতাত্মাকে স্পর্শ করলেই মিডিয়ামের দেহে অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। রূপধারী প্রেতাত্মাকে স্পর্শ করলে মিডিয়ামের ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারে। এমনকি এক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়।"

গভীর মনোযোগের সঙ্গে মাদাম একস্ শুনছিলেন রাউলের কথা।

রাউল আবার বলতে লাগল, "তা হলেই বুঝতে পারছেন মাদাম, মিডিয়ামের গুরুত্ব কোথায়। মিডিয়ামের সাহায্য ছাড়া বিদেহী আত্মা দেহধারণই করতে পারে না। মিডিয়াম হল ইহলোক আর পরলোকের মধ্যে সংযোগের সেতু। যে কোন লোক মিডিয়াম হতে পারে না। কারণ সবার মধ্যে মিডিয়াম হবার জন্য প্রয়োজনীয় গুণগুলো নেই। দু'একজনের মধ্যেই এ দুর্লভ ক্ষমতার স্ফুরণ হয়।

—"আশ্চর্য ! আচ্ছা মঁশিয়ে রাউল, এমন দিন কি আসবে না যখন এই দেহধারণের ব্যাপারটা উন্নতির এমন স্তরে পৌঁছবে যে দেহধারী আত্মা মিডিয়ামের দেহ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারবে ?"

—"এ যে সাংঘাতিক কল্পনা, মাদাম।"

—"হোক সাংঘাতিক, অসম্ভব তো নয় ?"

—"হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অসম্ভব। অন্তত এখনও পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়েছে তার ভিত্তিতে বলা যায় এটা একেবারেই অসম্ভব।"

—"কিন্তু আজকের কথাই তো শেষ কথা নয়, আজকে যা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে তা তো সম্ভব হয়ে উঠতে পারে ?"

এ কূট প্রশ্নের উত্তর আর রাউলকে দিতে হল না। সিমোন ঘরে ঢুকল। ওকে অত্যন্ত ক্লান্ত এবং বিবর্ণ দেখাচ্ছে। তাহলেও ও যে অনেকটা সামলে উঠেছে তা বেশ বোঝা যায়।

সিমোন এগিয়ে এসে মাদাম একস্-এর সঙ্গে করমর্দন করল। কিন্তু এই হাত মেলাবার সময় সে যে শিউরে উঠল তা লক্ষ্য করল রাউল।

—"শুনে দুঃখিত হলাম যে, আপনার শরীর নাকি ভাল নেই". মাদাম একস বললেন।

—"ঠিক আছে, ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।"

—"আজকে চক্রে বসতে পারবেন তো ?" মাদাম একস্ প্রশ্ন করলেন।

—"নিশ্চয়ই পারব", একটু রুক্ষস্বরেই সিমোন বলল। ওর স্বরের রুক্ষতায় রাউল তো বটেই,মাদাম একস্ পর্যন্ত যেন চমকে উঠলেন।

—"দেরি করে লাভ কি, তাহলে কাজ শুরু করা যাক", একথা বলে সিমোন ঢুকে পড়ল ছোট কুঠরীখানার মধ্যে। বসল গিয়ে বড় হাতলওয়ালা 'ইজিচেয়ার'খানায়।

আচমকা এক অজানা আতংকের তুহিন-শীতল স্রোত যেন বয়ে গেল রাউলের মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে। আবেগের সঙ্গে সে বলল।

—"আজকে তোমার শরীরটা ভাল নেই সিমোন। আজ প্রেত-চক্র বন্ধ থাক। আশা করি মাদাম একস্ কিছু মনে করবেন না।"

—"একি কথা মঁশিয়ে!" ক্রুদ্ধস্বরে মাদাম একস্ বললেন।

—"ঠিকই বলছি আমি", রাউলও দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "অসুস্থ শরীর নিয়ে আজকে চক্রে না বসাই ভাল।"

—"কিন্তু মঁশিয়ে, মাদাম সিমোন তো আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে, আজ আমার জন্য শেষবারের মতো উনি চক্রে বসবেন", মাদাম একস্-এর কণ্ঠ থেকে একই সঙ্গে ক্রোধ আর ঘৃণা ঝরে পড়ল।

—"ঠিক, আমি কথা দিয়েছি। আর সে কথার খেলাপও আমি করব না", ঠাণ্ডা গলায় সিমোন বলল।

— "এই তো চাই," কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে মাদাম একস্ বললেন। রাউলের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ধীরকণ্ঠে সিমোন বলল, "ভয় পাচ্ছ কেন রাউল ? ভয় পেয়ো না। আমি তো শেষবারের মতো প্রেত-চক্রে বসছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! এই আমাব শেষবারের মতো কষ্ট পাওয়া। আর...আর কখনও এই অসহ্য কষ্ট পেতে হবে না আমাকে। এই শেষ...এই শেষ।"

সিমোনেব ইঙ্গিতে রাউল কুঠরীর কালো ভারী পর্দাটা টেনে দিল। তারপর জানালার পর্দাগুলো টেনে দিতেই আধো আলো আধো ছায়ার পরিবেশ সৃষ্টি হল ছোট ঘরখানার মধ্যে। মাদাম একস্‌কে একখানা চেয়ারে বসবাব ইঙ্গিত করে রাউল অন্য চেয়ারখানায় বসল। মাদাম একস্ একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললেন কথাটা।

—"আমাকে মাপ করবেন মঁশিয়ে, আমি আপনার বা মাদাম সিমোনের সততাকে অবিশ্বাস কবিছ না। জানি আপনারা দু'জনেই অত্যন্ত সৎ। আর এই প্রেত-চক্রের মধ্যেও কোন জালিযাতি বা কারচুপি নেই। কিন্তু তবুও আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে চাই আর এই জিনিসটা আমি সঙ্গে করে নিযে এসেছি।"

একথা বলে নিজের হাত-ব্যাগ থেকে একটা সরু অথচ শক্ত দড়ি বের করলেন মাদাম একস্।

—"মাদাম," রাউল চিৎকার করে উঠল, "এ তো অপমান...ভীষণ অপমান!"

—"না, এ হল নিছক সাবধানতা," অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় মাদাম একস্ বললেন।

—"না না, এ হল অপমান...মারাত্মক অপমান...আপনি আমাদের দু'জনকেই অপমান করেছেন," উত্তেজিতভাবে রাউল চিৎকার করে উঠল।

—"মঁশিয়ে রাউল, আপনার আপত্তির কারণ তো আমি বুঝতে পারছি না," বিদ্রূপের সুরে মাদাম একস্ বললেন, "আপনাদের চক্রে যদি কোন জালিয়াতি বা কারচুপি না থাকে তাহলে আপত্তি করছেন কেন ? আপনাদের মধ্যে যদি কোন ছলনা না থাকে তবে ভয় পাওয়ার তো কোন কারণ নেই।"

দারুণ ঘৃণায় রাউলের মুখ বিকৃত হল। তারপর একটা অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। মাদাম একস্-এর দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ-ভরা স্বরে সে বলতে লাগল,

—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মাদাম একস্, এ ব্যাপারে আমার ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। ভয় পাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই এখানে। বেশ তো, যদি আমার হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধলে খুশি হতে পারেন, তবে বাঁধুন।"

রাউল ভেবেছিল এই বিদ্রূপের পর মাদাম একস্ আর বাঁধাবাঁধির মধ্যে যাবেন না। কিন্তু তার ভাবনাটা যে একেবারেই ভুল তা বোঝা গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

মাদাম একস্ অবিচলিত স্বরে বললেন, "ধন্যবাদ মঁশিয়ে," তারপর দড়িটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন রাউলের দিকে।

আচম্বিতে পর্দার পিছন থেকে সিমোনের তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল,

—"না না রাউল, মাদাম একস্-এর অপমানকর প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হয়ো না।"

ব্যঙ্গের হাসি হেসে মাদাম একস্ বললেন, "মাদাম সিমোন, আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি!"

—"হ্যাঁ, স্বীকার করছি আমি ভয় পেয়েছি।"

রাউল চিৎকার করে উঠল, "কি বলছ সিমোন? মাদাম একস্ ভাবছেন আমরা তাঁকে ঠকাতে যাচ্ছি। আমরা জালিয়াত—জোচ্চোর।"

—"আমাকে তো সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে হবে," গম্ভীর কণ্ঠে মাদাম একস্ বললেন।

কাজ শুরু করলেন মাদাম একস্। রাউলকে চেয়ারের সঙ্গে বাঁধলেন খুব শক্ত করে।

—"বাঁধতে আপনি খুব ওস্তাদ," বিদ্রূপ-ভরা গলায় রাউল বলল। মাদাম একস্-এর বাঁধার কাজ শেষ হল।

—"কেমন এবার খুশি হয়েছেন?"

মাদাম একস্ কোন উত্তর দিলেন না। তিনি যেন রাউলের উপহাস গায়েই মাখলেন না। তিনি ঘরের দেওয়ালগুলি ভাল করে পরীক্ষা করলেন। হলঘরে যাবার দরজাটায় তালা লাগিয়ে চাবিটা খুলে নিলেন। চাবিটা তিনি রাখলেন নিজের কাছেই। তারপর এগিয়ে এসে বসলেন চেয়ারে।

—"হ্যাঁ, এবার আমি তৈরি। প্রেত-চক্র শুরু হোক," যেরকম অদ্ভুত সুরে তিনি কথাগুলো বললেন তা লিখে বোঝান যায় না।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। পর্দার পিছনে সিমোনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ক্রমেই ভারী হয়ে উঠতে লাগল। একসময় সে শব্দ প্রবল হয়ে উঠল। তারপর সে শব্দ থেমে গেল। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। তারপর শোনা গেল একটা চাপা গোঁ-গোঁ আওয়াজ। একটু পরে তা-ও থেমে গেল। আবার নিস্তব্ধতা, আচমকা খঞ্জনিটার ঝন-ঝন আওয়াজে নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে শিঙে পড়ে গেল ঘরের মেঝেতে।

কোন অদৃশ্য শক্তি যেন ওটাকে ছুঁড়ে ফেলল। খল খল করে কে যেন হেসে উঠল, মহাবিদ্রূপের হাসি। কুঠরীর ভারী পর্দাটা একটু সরে গেল। দেখা গেল মিডিয়াম সিমোনকে। মিডিয়াম চেতনা হারিয়েছে, তার মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকের উপর।

হঠাৎ মাদাম একস্ জোরে শ্বাস টানলেন। মিডিয়াম সিমোনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে হাল্কা কুয়াশা। মনে হচ্ছে যেন একটা সরু ফিতে বের হয়ে আসছে সিমোনের ঈষৎ উন্মুক্ত মুখ থেকে।

কুয়াশা ক্রমেই ঘন হতে লাগল। মিডিয়ামের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুকণা, কণাগুলো অতিসূক্ষ্ম। কণাগুলির মধ্যে একটা আলোড়ন উঠেছে। সূক্ষ্মকণাগুলো জমাট বাঁধছে...ঘনীভূত হচ্ছে। আকার নিচ্ছে। সে আকার একটি শিশুর...একটি বাচ্চা মেয়ের।

"অ্যামেলি...আমার ছোট্ট অ্যামেলি...আমার বাচ্চা আসছে আমার সামনে।" মাদাম একস্ বলে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ফিসফিসে হলেও তীক্ষ্ণ।

অস্পষ্ট মূর্তিটা ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। প্রায় অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাউল। এমন নিখুঁত দেহধারণ এর আগে কখনই দেখা যায়নি। সত্যিকারে রক্ত-মাংসে গড়া একটি জীবন্ত শিশু যেন এসে দাঁড়িয়েছে ঐ ছোট্ট কুঠরীখানার প্রবেশপথে।

—"মা...মামণি," শিশুর মতো কচি গলার ডাক শোনা গেল।

— "আমার মেয়ে...আমার অ্যামেলিসোনা..." চিৎকার করে বলতে বলতে উত্তেজনায় চেযার ছেড়ে অর্ধেকটা উঠে পড়লেন মাদাম একস্।

—"সাবধান মাদাম, অত উত্তেজিত হবেন না," রাউল চেঁচিয়ে উঠে সতর্ক করলো।

ইতস্তত করতে করতে বাচ্চা মেয়েটি এগিয়ে আসতে লাগল সামনের দিকে। দু'খানি ছোট হাত সামনে বাড়িয়ে ছোট্ট অ্যামেলি আবার ডাকল, "মা...মামণি...।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

মাদামের গলা থেকে এক অজানা অদ্ভুত স্বর বেরিয়ে এল। তিনি আবার উত্তেজিতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল রাউল, "একি করছেন মাদাম? বসুন, বসে পড়ুন, নইলে মিডিয়ামের...।" রাউলের কথায় কান না দিয়ে মাদাম একস্ তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠলেন, "আমার একমাত্র সন্তান অ্যামেলি...ওকে আমি ধরব...ওকে আমি বুকে নেব..."

পাগলের মতো সামনের দিকে এক পা এগিয়ে গেলেন মাদাম একস্।

—"ঈশ্বরের দিব্যি! নিজেকে সংযত করুন মাদাম। নিজের চেয়ারে বসুন। বসে পড়ুন এক্ষুণি।"

রাউল সত্যি খুব ভয় পেয়েছে।

—"আমার বাচ্চা! আমি ওকে ধরবই। আমি ওকে কোলে নেবই। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।"

—"সাবধান মাদাম! আমি আদেশ করছি, আপনি বসে পড়ুন। আর একটি পা-ও এগোবেন না।"

বন্ধনের মধ্যে রাউলের শরীরটা ছটফট করতে লাগল। বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মাদাম একস্ তাঁর কাজটি বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন করেছেন।

আসন্ন বিপদের চিন্তায় রাউলের মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। আর্তকণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠল, "ঈশ্বরের দিব্যি! দযা করে বসে পড়ুন...বসে পড়ুন দয়া করে। মিডিয়ামের কথাটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন...দয়া করে তার কথাটা মনে রাখুন।"

মাদাম একস্ যেন শুনতেই পেলেন না রাউলের কথা। তিনি যেন একেবারে পাল্টে গিয়েছেন। এক অদ্ভুত আনন্দ আর উন্মাদনার ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর মুখমণ্ডলে। বাচ্চা মেয়েটি এসে দাঁডিযেছিল পর্দার ফাঁকে। মাদাম একস্ হাত বাডিয়ে তাকে স্পর্শ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়াম সিমোনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল এক তীব্র আর্তনাদ। অসহ্য যন্ত্রণায যেন কষ্ট পাচ্ছে মিডিয়াম।

—"হা ভগবান! এ কি সাংঘাতিক ব্যাপার! এ যে সহ্য করা যায না, মিডিযাম যে..."

রুক্ষ গলায় হেসে উঠে মাদাম একস্ বললেন, "মঁশিয়ে রাউল, আপনার মিডিযামের জন্য আমার একটুও মাথাব্যথা নেই। আমি কেবল আমার হারানো মেযেকে ফিরে পেতে চাই।"

—"আপনি উন্মাদ হযে গিয়েছেন মাদাম। ঐ শিশু এ জগতের নয। ওকে আর স্পর্শ করবেন না।"

—"স্পর্শ করব না মানে? ওকে যে আমার চাই। আমার দেহের মধ্যে ও তিল তিল করে গডে উঠেছে। আমার কাছ থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছিল বাছা। কিন্তু মৃতের রাজ্য থেকে আমার অ্যামেলিসোনা আবার ফিরে এসেছে আমারই কাছে। ও তো মরে যায়নি...ও বেঁচে আছে। আমার সোনা আমার কোলে আয়।"

রাউল আবাব চিৎকার করে উঠতে গেল। কিন্তু অপরিসীম আতংকে তাব গলা শুকিযে কাঠ হযে গিযেছে। একটি শব্দও বেরোল না তার মুখ থেকে।

মাদাম একস্ ভযঙ্কর হয়ে উঠেছেন। পৃথিবীর সমস্ত নির্দয়তা, নির্মমতা, আদিম অসভ্যতা যেন মূর্তিমতী হযে উঠেছে তাঁর মধ্যে। অন্যের কথা ভাববার মতো মানসিকতা আর তাঁর মধ্যে নেই। নিজের অন্ধ আবেগেই তিনি মত্ত।

শিশু অ্যামেলিব দু' ঠোঁট ফাঁক হলো। তৃতীয়বারের মতো শোনা গেল কচি গলার ডাক, "মা...মামণি!"

—"ও আমার সোনা...ও আমার মণি...কে বলে তুই মরে গিয়েছিস!...আয় আয় আমার কোলে আয়...আমার ভাঙা বুকখানাকে জুড়ে দে..."

উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলেন মাদাম একস্। পর্দার ওপাশ থেকে ভেসে এল অসহ্য যন্ত্রণার এক দীর্ঘায়িত আর্তনাদ।

—"সিমোন...সিমোন।" রাউল চিৎকার করে উঠল। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে রাউল দেখল শিশুটিকে কোলে নিয়ে মাদাম একস্ দ্রুত চলে গেলেন তার পাশ দিয়ে। তালা খুলবার শব্দ শোনা গেল। তারপর শোনা গেল সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ। দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন মাদাম একস্।

পর্দার ওপাশ থেকে তখনও ভেসে আসছে আর্তনাদ। অসহ্য যন্ত্রণা ছাড়া এরকম আর্তনাদ কেউ করে না। এরকম আর্ত বিলাপ-ধ্বনি রাউল তাঁর জীবনে কোনদিন শোনেনি। আর্তনাদ ক্রমে মিলিয়ে গেল। শোনা গেল একটা বিশ্রী-বীভৎস ঘড় ঘড় শব্দ। তারপর ধপাস্ করে একটা শব্দ শোনা গেল। শব্দটা দেহপতনের।

উন্মাদের মতো দেহের বাঁধন খুলবার চেষ্টা করতে লাগল রাউল। শেষ পর্যন্ত তার উন্মত্ত চেষ্টার কাছে মাদাম একস্-এর কঠিন বাঁধনও হার স্বীকার করতে বাধ্য হল। অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল রাউল। সে শক্ত বাঁধন থেকে মুক্ত হল।

রাউল উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই এলিস ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকে চিৎকার করে উঠল, "মাদাম!...মাদাম!" গলা চিরে, "সিমোন!" ডাকটা বেরিয়ে এল রাউলের।

দু'জনে ছুটে গেল কালো পর্দাটার দিকে। একটানে সরিয়ে দিল পর্দাটা।

আর তক্ষুণি চমকে গিয়ে পিছিয়ে এল রাউল। উদ্‌ভ্রান্তভাবে সে বলে উঠল, "হায় ভগবান! রক্ত, এত রক্ত! জায়গাটা যে লালে লাল হয়ে গিয়েছে।"

রাউলের পাশে শোনা গেল এলিসের রুক্ষ কণ্ঠস্বর। সে স্বর ভয়ে, বিস্ময়ে এবং উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে।

"তা হলে শেষ পর্যন্ত আমার মাদামকে জীবনটাই দিতে হল! কিন্তু মঁশিয়ে রাউল, সত্যি করে বলুন কি হয়েছে? কি করে মাদাম এতটুকুন হয়ে গেলেন। তাঁর দেহটা যে ছোট হয়ে গিয়েছে—অর্ধেকেরও বেশি ছোট হয়ে গিয়েছে। এ কি করে হল? কি কাণ্ড হচ্ছিল এখানে। বলুন মঁশিয়ে...বলুন...বলুন।"

"জানি না!" রাউল উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠল, "আমি জানি না।...আমি কিচ্ছু জানি না। একি হল। এ আমি কি করলাম...হায় ভগবান! মৃত্যুপুরীর বাসিন্দাকে জীবনলোকে নিয়ে এসে সিমোন নিজেই যে মৃত্যুপুরীতে চলে গেল! আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না এলিস। আমি জানি না...কিচ্ছু জানি না...সিমোন! সিমোন!"

অনুবাদ: অনিরুদ্ধ চৌধুরী

পাইপ মুখে লোকটি

Pipe Smoker—মার্টিন্ আর্মস্ট্রং

বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে কখনও আমি অপছন্দ করি না। কিন্তু আজকের এই মুষলধারা বৃষ্টি আমার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে। এখনও আমাকে দশ মাইল যেতে হবে। বাধ্য হয়েই প্রথম বাড়িটার সামনে থামতে হল। এই বাড়িটার থেকে গ্রাম এখন এক মাইল দূরে। বাগানের গেট থেকে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যাচ্ছে বাড়িটা ফাঁকা, কেউ নেই। সমস্ত জানালা বন্ধ, কোনটাতেই পর্দা নেই। নিচের তলার ঘরের দেওয়ালগুলো আবরণহীন। ফায়ারপ্লেস আর জাফরিগুলো খালি।

বাগানটাকে আর এখন ঠিক বাগান বলা যায় না। শুধু বুনো আগাছায় ভর্তি। ভাবতে কষ্ট হয় যে এটা একটা বাগান। শুধুমাত্র বেড়াটা দেখলেই বাগানের কথা মনে পড়ে, যেটা যাবার সোজা পথটাকে দেখিয়ে দেয। লাইলাক ঝোপগুলো যেন ফুটে রয়েছে। ভেজা লাইলাকের ঝোপগুলো থেকে টুপটাপ করে জলের ফোঁটা ঘাসের উপর ঝরে পড়ছে।

এইরকম এক অদ্ভুত পরিবেশে হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলাম, একটা লোক লাইলাকেব ঝোপের আড়াল থেকে ধীরে-সুস্থে হেঁটে হেঁটে আমার দিকেই আসছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হলো, লোকটি উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে বেডাচ্ছে। এই ভয়ঙ্কর বৃষ্টির দিনে বর্ষাতি না পরেই বেরিয়েছে। মোটাসোটা লোকটির পরনে পাদ্রীর পোশাক। মাথার ধূসর চুলের ফাঁকে টাকটা চোখে পড়ে। দাড়িটা নিখুঁতভাবে কামানো। মাথাটা একটু বড আকারের আর চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যা উইলিয়াম ব্লেকের প্রতিকৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়। তার অদ্ভুত পোশাকের চেয়েও আরও অদ্ভুত এই যে, মনে হয় সে ওই দারুণ বৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করছে। কিন্তু আমি তা পারছি না, বৃষ্টির জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে আমার চুলের থেকে ঘাড়ে এসে পড়ছে।

আমি বললাম—এই যে মশাই শুনছেন! আমি কি ভেতরে আসতে পারি?

সে চমকে উঠে তার বিস্ময়ভরা চোখ দুটো তুলে আমার দিকে তাকালো। অবাক হয়ে নিজের মনেই যেন বলল—'আশ্রয়?'

আমি বললাম—এই বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যেই।

এতক্ষণে লোকটি বুঝতে পারল সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছে। তাই বলল, ওঃ বৃষ্টির জন্যে, ঠিক আছে ভিতরে চলে আসুন।

আমি বাগানের গেটটা খুললাম এবং তাকে অনুসরণ করে দরজার সামনে পথটা ধরে এগোতে লাগলাম। সে মাথাটা নেড়ে আমাকে আগে যেতে ইশারা করল। দরজা পেরিয়ে যেতেই হলঘরে পা দিতেই লোকটা বলল, আপনার এখানে খুব একটা ভাল লাগবে না। যাই হোক, এই বাঁ দিকের দরজাটা দিয়ে আসুন।

ঘরটা বেশ বড়, জানালাগুলো ধনুকের মতো পাঁচটা খণ্ডে ভাঁজ করা। ঘরের চারিদিক খালি। শুধু ব্যবহারের জন্যে একটা টেবিল ও বেঞ্চ রয়েছে। আর একটা ছোট টেবিল দরজার কোণার দিকে রয়েছে, তার উপর একটা নেভানো বাতি রাখা আছে।

লোকটি জানালার সামনের বেঞ্চটার দিকে দেখিয়ে বলল—দয়া করে বসুন। তার আচরণের মধ্যে একটা বনেদী বিনয়ের ভাব ফুটে উঠেছিল। সে নিজে কিন্তু বসল না বরং জানালার দিকে গিয়ে দাঁড়ালো। একদৃষ্টিতে জলস্রোতে প্লাবিত বাগানটাকে দেখতে লাগলো। তার দুই বাহু অসাড়ভাবে দুই দিকে ঝুলছিল।

আলাপ জমানোর উদ্দেশ্যে আমি বললাম—আপনি বোধহয় আমার মতো বৃষ্টিকে এতটা পাত্তা দেন না।

সে আমার দিকে ঘুরতেই আমি বুঝতে পারলাম, লোকটি তার ঘাড় ঘোরাতে পারে না। তাই সে পুরো শরীরটাকেই ঘুরিয়ে আমাকে দেখল, আর বলল—না, না, না! আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, আপনি না বললে আমি লক্ষ্যই করতাম না যে বৃষ্টি হচ্ছে।

আমি বললাম—আপনি খুব ভিজে গেছেন। এখন উচিত পোশাকটা বদলে নেওয়া।

লোকটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগল আর বিস্ময়ে প্রশ্ন করল, বদলাবো?

—আপনার ভেজা পোশাক বদলানো উচিত—আমি আবার বললাম।

—পোশাক বদলাবো? আরে না ঠিক আছে। যদি ভিজে থাকে তাহলে নিশ্চয় শুকিয়ে যাবে, তাছাড়া ঘরে তো আর বৃষ্টি হচ্ছে না?

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। মনে হলো, সত্যিই ও যেন প্রশ্নের উত্তর চাইছে। তাই আমি বললাম, না, এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না।

সে বিনীতভাবে বলল—আমি খুবই লজ্জিত যে আপনাকে যথাযোগ্য আপ্যায়ন করতে পারছি না।...একজন স্ত্রীলোক রোজ সকালে ও বিকালে গ্রাম থেকে এখানে এসে সব কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। কিন্তু এই মাঝখানের সময়টা আমি খুবই অসহায়। কিছুই করতে পারি না। কথা বলতে বলতে সে তার ঝোলানো হাত দুটো একবার খুলছিল আর বন্ধ করছিল।—যদি আপনি ইচ্ছা করেন তাহলে রান্নাঘরে ঢুকে নিজের জন্যে এক কাপ চা করে নিতে পারেন।

আমি বললাম—তার দরকার হবে না। বরং আমি একটা সিগারেট খেতে পারি?

সে বলল—অবশ্যই। আমি খুবই দুঃখিত, আমার কাছে একটাও সিগারেট নেই। আমার পূর্বসূরী সিগারেট খেতেন, কিন্তু আমি পাইপ খাই।

সে তার পকেট থেকে পাউচ বের করে পাইপে তামাক ভরতে লাগলো। তার হাত দুটো কাজ করতে দেখে আমার মনের অস্বস্তি ভাবটা দূর হলো।

এবার আমরা দু'জনেই আগুন জ্বালালাম। আমিই আবার কথা বলতে শুরু করলাম। কারণ আমি জেনে গেছি এখানে কথা বলবার দায়িত্ব শুধুমাত্র আমার। আমার গৃহস্বামী এই নীরবতা ভঙ্গ করবার দায়িত্ব নেবে না। বরং সে তার আসল হাত দুটো ঝুলিয়ে একদৃষ্টে আমার দিকে দেখবে নয়তো বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

শূন্য ঘরটার চারিদিক দেখতে দেখতে বললাম, এইখানে আপনি হয়তো নতুন এসেছেন তাই না? আমার কথাটা শুনে একটু নড়ে উঠল, তারপর আমার দিকে ঘুরে অস্বস্তিকর এক তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে তাকালো আর বলল—নতুন এসেছি।

আমি ভাবলাম ও বুঝতে পারেনি তাই ফের বললাম—আমি বলছি আপনি এখানে নতুন এসেছেন কি?

—আরে না, না মশায় না। সত্যি বলতে কি আমি এখানে এক বছরের মতো আছি। তবে আমার পূর্বসূরী তারও পাঁচ বছর আগে থেকে ছিলেন, এই সাত মাস হতে চলল তিনি গত হয়েছেন।

একটা বিষাদ মাখানো হাসি তার সারা মুখে উঠল তারপর ধীর কণ্ঠে বলল—যদি বলি, আমি এখানে মাত্র সাত মাস বা তার চেয়েও কিছু বেশি দিন আছি তাহলে আপনি আমাকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন না। কারণ মিসেস বেলোস্‌ও আমার কথা বিশ্বাস করেন না।

—যদি আপনি বলেন, তাহলে আমি বিশ্বাস করবো না কেন?

লোকটি আমার সামনে কয়েক পা এগিয়ে এলো, তার ডান হাতটা তুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মোটা থলথলে ঠাণ্ডা হাতটা তুলে নিলাম। যদিও আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। লোকটি খুশি হয়ে বারবার বলতে লাগল—ধন্যবাদ মহাশয়, ধন্যবাদ। একমাত্র আপনিই প্রথম, যে আমার কথা বিশ্বাস করেছেন। কথা বলার মধ্যেই আমি তার হাতটা নামিয়ে দিলাম। দেখে মনে হলো সে যেন কল্পনার মধ্যে ডুবে আছে, স্বপ্নের থেকে জেগে ওঠার মতোই বলল—সবকিছুই ভাল হতো যদি না আমার পূর্বসূরীর খুড়তুতো' দাদা তাকে এই বাড়িটা না দিয়ে যেত। আগে সে যেখানে ছিল সেখানে খুবই ভাল ছিল। আপনি হয়তো জানেন—আমার পূর্বসূরী একজন ধর্মযাজক ছিলেন। সে তার পাদ্রীর পোশাক দেখিয়ে বলল—এইটা ছিল তার পোশাক।

আবার সে অতীত জগতে ডুবে গেল। হঠাৎ কি মনে করে সে আমায় জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আপনি কি মৃত্যুর আগের স্বীকারোক্তিতে বিশ্বাস করেন?

—ওঃ স্বীকারোক্তি! আপনি ধর্মীয় অর্থে কথাটা বলছেন তো?

সে আরও এগিয়ে এলো আমার কাছে, বলতে গেলে আমাকে ছুঁয়েই ফেলল।

সে তার গাঢ় দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকালো তারপর কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল—আমি বলতে চাই যে আপনি কি বিশ্বাস করেন, পাপ বা অপরাধ স্বীকার করলে মানুষ মুক্তি পেতে পারে?

ভদ্রলোক কি যে বলতে চাইছেন কে জানে? ভাবলাম বলি এই সব স্বীকারোক্তিতে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু পারলাম না। ও এমন আবেগভরে জিজ্ঞাসা করছিল যে ওকে আমি না বলে হতাশ করতে পারলাম না। তাই বললাম, হ্যাঁ, আমার মতে মানুষ স্বীকার করে তার মনের বোঝা অনেক কমাতে পারে।

লোকটা কৃতজ্ঞভরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—সত্যিই আপনি খুবই সহানুভূতিশীল। সে উদাসীনভাবে অলস হাতটা একবার উপরে তুলল আবার নামালো। তারপর জিজ্ঞাসা করল—আপনি কি ধৈর্য ধরে আমার সব কথা শুনবেন?

তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন দর্জির দোকানের পুতুলের মতো আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পা দুটো আমার হাঁটুতে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। সে আমার এত কাছে ছিল যে মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল কাছ থেকে ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দিতে। মনের ভাব সংবরণ করে বললাম—আপনি বসবেন না? আমার বেঞ্চটার অপর প্রান্ত দেখিয়ে বসতে বললাম। বসুন, তাহলে আপনার কথা শুনতে আমার খুব সুবিধা হবে।

সে তার শরীরটা ঘুরিয়ে স্থির দৃষ্টিতে আগ্রহভরে বেঞ্চটার দিকে তাকালো। তারপর আমার দিকে মুখ করে বেঞ্চের দুই ধারে পা ঝুলিয়ে বসল। কথা বলার আগে ঘরের জানালা, দরজার উপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। মুখের পাইপটা টেবিলের উপর রাখল। এইবার চোখের দৃষ্টি আমার উপর রেখে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল—এইটা আমার গোপন কথা, ভয়ঙ্কর রকম গোপন কথা। কারণ আমি একজন খুনি।

শুনে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলেও, নিজের কাছে খুব আশ্চর্য হইনি; কারণ, তার হাবভাব, কথাবার্তা সবই আমার কাছে খুবই ভয়ানক মনে হচ্ছিল। আমি রুদ্ধশ্বাসে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম। আর লোকটির ভয়ার্ত চোখ দুটোও স্থির দৃষ্টিতে আমার উপর নিবদ্ধ রইল। সে যেন অপেক্ষাই করছিল আমার কাছে কিছু শোনবার জন্যে। কিন্তু প্রথমে আমি কিছু বলতে পারছিলাম না। এই রকম অবস্থায় কোন সুস্থ মানুষ কথা বলতে পারে! অবশেষে আমি অদ্ভুতভাবে প্রশ্ন করলাম—ওঃ এই ব্যাপার! এই আপনার গোপন কথা!

লোকটি তার অসাড় হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে তার সামনের বেঞ্চের উপর ঠুকে বলল—হ্যাঁ। এইটেই আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে! আপনার কি ধৈর্য থাকবে আমার কথা শোনার?

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম—বলুন, কি হয়েছিল?

সে বলল, আমার পূর্বসূরী যদি এই বাড়িটা উইল করে না দিয়ে যেতেন তাহলে এই সব কিছু ঘটতো না। আমার পূর্বসূরী যদি তাঁর মঠে থাকতেন, তাহলে আমি ঘটনার সাথে কখনোই এভাবে জড়িয়ে পড়তাম না। যদিও আমার পূর্বসূরী স্বীকার

করেছেন যে তাঁর মঠে তিনি শান্তিতে ছিলেন না, সেখানে সৌহার্দ্য ছিল না। প্রথমে তাই তিনি শান্তি পাবার আশায় এই বাড়িতে এলেন। উইলে শুধুমাত্র তাঁকে এই বাড়িটা দেওয়া হয়েছিল। কোনরকম আসবাবপত্র ও টাকাপয়সা কিছু তাঁকে দেওয়া হয়নি। প্রথমে তিনি এই খালি ঘরেই এলেন, তারপর দু'-একটা জিনিস কিনলেন। যেমন এই টেবিল, বেঞ্চ, রান্না করবার কিছু সরঞ্জাম ও উপরের ঘরে শোবার জন্যে একটা ভাঁজ করা খাট প্রভৃতি। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন তিনি এই বাড়িতে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। বাড়িটার নির্জনতা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু তিনি অন্য ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন।

আপনি নিশ্চয় জানেন কিছু বাড়ি খুবই নিরাপদ, আবার কিছু বাড়ি খুবই বিপজ্জনক। তাই তিনি এই বাড়িতে থাকার আগে দেখতে চেয়েছিলেন বাড়িটা থাকার পক্ষে উপযুক্ত কিনা। বলতে বলতে সে একটু থামলো তারপর খুব আন্তরিকভাবে বলতে শুরু করল—আমি আপনাকে বন্ধু হিসাবে উপদেশ দিচ্ছি। যদি কখনও আপনি কোন অপরিচিত বাড়িতে যান তো আগে নিশ্চিত হবেন যে সেই বাড়ি সম্পূর্ণ নিরাপদ কিনা!

আমি বললাম—ঠিকই বলেছেন, যেমন নোনাধরা দেওয়াল, উপযুক্ত জল নিষ্কাশনের অভাব, এমনি আরও অনেক।

সে তার মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল—না, মোটেই তা নয়। যা বলছেন তার চেয়ে ভয়ানক ভয়ঙ্কর। আমি বলতে চাইছি এই বাড়িতে কোন প্রেতাত্মা আছে কিনা! আপনি অনুভব করতে পারছেন না?

তার মর্মস্পর্শী দৃষ্টি আমার অন্তর ভেদ করে গেল। বলল, এই বাড়িটা আপনার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে না?

আমি তাচ্ছিল্যভাবে বললাম—ফাঁকা বাড়ি সব সময়ই অদ্ভুত মনে হয়।

আমার কথায় সে সচকিত হয়ে বলল—তাহলে আপনি কি এই বাড়িটার অদ্ভুত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেননি?

তার প্রশ্ন শুনে আমার এই প্রথম মনে হলো সত্যিই বাড়িটা অদ্ভুত কিন্তু তার চেয়ে লোকটাকে আমার বেশি অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। যদিও বুঝতে পারছিলাম ওর কথার মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু আছে যার জন্যে সমস্ত কিছুই ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল।

আমি বললাম—আর পাঁচটা ফাঁকা বাড়ির মতো এই বাড়িটাকেও অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

তার অবিশ্বাসী চোখ দুটো স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে দেখল আর বলল—অদ্ভুত, আশ্চর্য ব্যাপার, এখনও আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। অবশ্য এটাও সত্যি, আমার পূর্বসূরী ঠিক আপনার মতোই প্রথমে এইরকম কিছুই অনুভব করতে পারেননি। কিন্তু মশায় এই ঘরটা, ঠিক এই ঘরটাই হলো সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ঘর, যা আমার পূর্বসূরীর প্রথমে নজর পড়েনি।

যদি বৃষ্টি না পড়তো তাহলে এই বুড়ো লোকটার বকবক শুনতামই না, কখন

উঠে চলে যেতাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, অনবরত বৃষ্টি হয়ে চলেছে। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, মনে হচ্ছে এখনই বজ্রপাত হবে।

বুড়ো লোকটা বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এইবার আমি আপনাকে এই ঘরের রহস্যটা দেখাতে পারি। কারণ এটা দেখতে গেলে অন্ধকারের দরকার। এখন যথেষ্ট অন্ধকার হয়ে এসেছে। এখন আমি দেখাতে পারি।

সে কোণার ছোট টেবিলটার কাছে গেল। বাতিটা জ্বালালো তারপর কাঁচের চিমনিটা লাগিয়ে বড় টেবিলটার উপর রাখল। ঠিক আমার বাঁ দিকে রেখে বলল, এইবার টেবিলের দিকে ফিরে বসুন।

আমি তাই করলাম। এই খালি ঘরটার শেষ প্রান্তে পর্দাহীন পাঁচ পাল্লার ধনুকের মতো কাঁচের জানালাটা আমার ঠিক সামনেই ছিল। লোকটা তার ভারী হাতটা আমার কাঁধের উপর রেখে বলল, এখন আপনি যে জায়গায় বসে আছেন, ঠিক এই জায়গায়ই বসে আমার পূর্বসূরী রোজ খাবার খেতেন।

এইবার আমি কিছুতেই নিজেকে আটকে রাখতে পারলাম না। ঘুরে তাব দিকে তাকালাম। আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল, কাবণ সে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না।

সে বিস্ময়ে বলল—দয়া করে ভয় পাবেন না এখন। পিছন ফিরে বসুন, এখন কি দেখতে পাচ্ছেন ?

আমি তার কথামতো পিছন ফিরে বললাম—

—শুধু জানালা দেখতে পাচ্ছি।

—শুধুমাত্র এইটুকু ?

আমি ওর কথা শুনে একদৃষ্টিতে জানালা দেখতে লাগলাম। বললাম—না, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। শুধু জানালার পাঁচটা সার্সিতে আমারই [illegible] প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি।

বুড়ো লোকটি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ঠিক তাই। ঠিক [illegible] [illegible] আর একজন দেখতেন, যখন তিনি খেতেন। তিনি দেখতেন ঠিক তাঁর [illegible] আরও পাঁচজন একা বসে বসে খাচ্ছে। যখন তিনি পাত্রে জল ঢালতেন [illegible] তারাও জল ঢালতো। যখন তিনি সিগারেট ধরাতেন তখন তারাও সিগারেট ধরাতো।

আমি বললাম, অবশ্যই। সেই কারণেই আপনার পূর্বসূরী [illegible] পেয়েছিলেন ?

বুড়ো লোকটি গম্ভীর গলায় বলল—তাঁর নাম ছিল [illegible] জেমস্ ব্যাকস্টাব। মশায়, এই নামটা কিন্তু মনে রাখবেন। বাইরের কেউ [illegible] [illegible] কাছে জানতে চায় ওই বাড়িতে কে থাকে, তাহলে আপনি [illegible] [illegible] রেভারেন্ড জেমস্ ব্যাকস্টার। দেখুন মশায়, বাইরে কেউ জানে না যে...

আমি বললাম—ওঃ, বুঝেছি। আপনি যা [illegible] [illegible] না।

সে তার গলার স্বরটাকে অস্বাভাবিকভাবে নিচে [illegible] [illegible]—[illegible] তাই, কেউ

জানে না। একটা প্রাণীও জানে না। একমাত্র আপনিই প্রথম যার কাছে আমি সব বলছি।

—আপনাদের এখানে কি কোন তদন্ত হয়নি? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। মিঃ ব্যাকস্টারের কেউ কোন খোঁজ-খবর করেনি?

সে তার মাথাটা নাড়িয়ে বলল—না। মিসেস বেলোস্, যে প্রথম থেকে তাঁর সব কিছু দেখাশুনা করত, সে পর্যন্ত জানে না কি ঘটে গেছে।

আমি তার দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম, বললাম, আপনি কি বলতে চাইছেন? কি বিষয়ে অবগত ছিলেন না?

—আমি বলতে চাইছি যে সে আমি নই, তা সে বুঝতে পারেনি। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমরা দু'জনই একই রকম দেখতে। এত মিল যে আপনাকে ওনার ফটো দেখালে আপনিও আমাকেই ভাববেন। ঠিক আছে, যাবার আগে আপনাকে ফটোটা দেখাবো, তখন মিলিয়ে দেখে নেবেন।

এই সব কথা শুনে ভাবলাম বৃষ্টি পড়ুক আর নাই পড়ুক এখনই আমাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। বৃষ্টির জন্যে এখানে আটকে থাকার কোন মানেই হয় না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—ঠিক আছে মশায়, আমি আশা করছি এবার নিশ্চয় আপনি মনের গোপন কথাটা বলে অনেকটা শান্তি পেয়েছেন।

আমার কথা শুনে বুড়ো লোকটা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল। সে উত্তেজনায় নিজের হাত দুটো খুলতে আর বন্ধ করতে লাগল।

উত্তেজিত কণ্ঠে লোকটি বলল—এখন আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না। এখনও পর্যন্ত আপনি ঘটনার অর্ধেকটাও শোনেননি। কি করে ঘটলো তাও শোনেননি। আমি আশা করছি আপনি নিশ্চয় দয়া করে ধৈর্য সহকারে আমার সব কথা শুনবেন।

আবার আমি বেঞ্চটায় বসে পড়লাম। কোন উপায় না দেখে বললাম—ঠিক আছে, আপনি বলুন।

—আমি শুধু এইটুকুই আপনাকে বলছি যে আমার পূর্বসূরী রোজ এখানে বসে খেতেন আর জানালার আয়নায় দেখতেন আরও পাঁচজন তাঁকে অনুকরণ করে খাচ্ছে। যখন তিনি সিগারেট ধরাতেন তখন আর পাঁচজনও সিগারেট ধরাতো।

আমি বললাম—এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার।

বুড়ো লোকটি বিষণ্ন মুখে বলল—হ্যাঁ, সে তো স্বাভাবিকই। এই সবই স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। কিন্তু এক ভয়ংকর রাত্রিতে আর স্বাভাবিক কিছুই রইল না। লোকটি একটু থেমে ভীতু চোখে আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর কি হলো?

—তারপরই তো সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল। যখন আমার পূর্বসূরী তাঁর সিগারেট জ্বালাতেন তখন তিনি আর পাঁচজনকেও লক্ষ্য করতেন। কিন্তু সেদিন সিগারেট ধরাতে গিয়ে তিনি দেখলেন একদম বাঁ দিকের শেষের লোকটি সিগারেট ধরালো না, সে পাইপ ধরালো।

আমি তো হাসিতে ফেটে পড়ে বললাম, আচ্ছা এইবার বলুন তো মহাশয় তারপর কি হলো ?

বুড়ো লোকটি উত্তেজনায় তার হাত দুটো পাকাতে লাগল আর বলল, জানি এটা আপনার কাছে খুব হাসির ব্যাপার। কিন্তু আসলে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। আচ্ছা আপনি যদি এই অবস্থায় থাকতেন আর এই রকম দৃশ্য দেখতেন তখন আপনিও কি বিচলিত হতেন না !

—তা তো নিশ্চয় হতাম। যদি সত্যিই এটা ঘটতো আর যদি সত্যিই এই দৃশ্য দেখতাম, তাহলে নিশ্চয় হতাম।

সে বলল—সত্যিই এটা ভয়ানক ঘটনা। এতে কোনরকম ভুল নেই। তার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছিল সে যেন নিজেই সব কিছু দেখেছে।

আমি তাকে বললাম—দূর মশায়। আপনি তো মিস্টার ব্যাকস্টারের কাছ থেকে সব শুনেছেন। এ তো ওনার কথা।

সে তার দৃঢ় প্রত্যযপূর্ণ স্থির দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—আমি সত্যিই জানি, এটাই ঘটেছিল। আমি নিজের চোখে দেখার চেয়েও বেশি নিশ্চিতভাবে জানি। তাহলে শুনুন, এই ঘটনাটা পাঁচদিন ধরে চলেছিল। আমাব পূর্বসূরী রোজ বিকালে ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা লক্ষ্য করতেন।

আমি প্রশ্ন করি—তাহলে তিনি কেন এই রাজবাড়ি ছেড়ে চলে যাননি ?

বুড়োটা ফিস্‌ফিস্ গলায বলল—তিনি সাহস করে যেতে পারেননি। তাঁকে এই বাড়িতে থাকতে হযেছিল এবং আতঙ্কেব সাথে প্রতিদিন এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে হয়েছিল।

নিশ্বাস চেপে লোকটি বলল—ষষ্ঠ রাত্রে সেই পঞ্চম ছায়াটি মিলিয়ে গেল।

—চলে গেল ?

—হ্যাঁ, জানালা থেকেই চলে গেল। তখন পূর্বসূরী ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ঘরের এই ফাঁকা পঞ্চম সার্সিটার দিকে তাকিযে ছিলেন এবং অন্যান্য চারটে সার্সিতে তাঁর প্রতিফলনগুলিও ভযার্ত দৃষ্টিতে ঘরেব দিকে তাকিয়েছিল। তিনি ভয়ে ভযে ফাঁকা সার্সিটার দিক থেকে দৃষ্টি সরিযে এনে বাকি চারটের দিকে তাকিয়েছিলেন এবং তারাও সভয়ে তাকিযেছিল তাঁর দিকে অথবা তাঁর পিছনে কারও দিকে। এরপর তাঁর শ্বাসরোধ হযে এল।

বলতে বলতে বুড়ো লোকটির যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, বলল—দমবন্ধ হয়ে এল কারণ তাঁর গলার উপর চেপে বসেছে দুটো শক্ত হাত। যা তাঁর নিশ্বাস বন্ধ করে দিয়েছিল।

আমার খুব ভয় লাগছিল লোকটার এত ভয দেখে। তাই অবিশ্বাসী হাসিটা ঠোঁটে এসেও আটকে গেল। বললাম—আপনি তাহলে বলছেন, সেই হাত দুটো পঞ্চম লোকটার ছিল !

সাপের মতো হিস্ হিস্ করে সে তার মোটা ভারী হাত দুটো তুলে নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে দেখে বলল, হ্যাঁ, সে দুটো ছিল আমার হাত।

এই প্রথম আমি সত্যিই ভয় পেলাম। আমরা পরস্পর কেউ কোন কথা বলতে পারলাম না। সে খুব কষ্টে সাঁ সাঁ করে নিশ্বাস ফেলছিল। আমি তাকে শান্ত করবার জন্যে খুব নরম গলায় বললাম—তাহলে আপনি সেই পঞ্চম ব্যক্তি?

সে তার টেবিলের উপর পাইপটা দেখিয়ে খুব জোরে নিশ্বাস ফেলে বলল—হ্যাঁ, আমি হচ্ছি সেই পাইপ স্মোকার।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমাকে কে যেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দরজার কাছে। কিন্তু আমার বিবেক আমাকে যেতে দিল না। তাকে একা ফেলে যাওয়া অমানবিক কাজ হবে এই ভেবে যেতে পারলাম না। তার এই ভয়ঙ্কর কল্পনা এবং তার বাজে চিন্তাভাবনা, তার ক্ষতবিক্ষত মন সব কিছুর জন্য কষ্ট হচ্ছিল। আমি তাকে বললাম—তাঁর দেহটাকে নিয়ে কি করলেন?

মনে হলো লোকটির যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। তার দেহ উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। কাঁপা কাঁপা হাত দুটো সামনে প্রসারিত করে সে সজোরে নিজের বুক চাপড়ে বলল—

—এই; এই সেই দেহ!

অনুবাদ: প্রীতি পালচৌধুরী

স্বপ্নলোকের বধূ

The Dreamland Bride—থিওফিল গোতিয়েব

ভাইরে, তুমি প্রশ্ন করেছ আমি কখনও ভালবেসেছি কি না। হ্যাঁ, আমি ভালবেসেছি! সে গল্প যেমন অসাধারণ তেমনই ভয়ঙ্কর। ছেষট্টি বছর বয়সেও সে স্মৃতির ভস্মাবরণকে নাড়া দিতে আমার সাহস হয় না।

তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই; তোমার চাইতে নরম মনের কাউকে আমি কোনদিন এ গল্প বলতে পারতাম না। ঘটনাগুলি এতই অদ্ভুত যে আমার জীবনেই তারা ঘটেছিল একথা যেন বিশ্বাসই হয় না। তিনটি বছর এক শয়তানের হাতছানিতে আমি ভুলে ছিলাম। তিনটি বছর ধরে আমি দিনে ছিলাম এক গ্রাম্য গির্জার পাদ্রী, আর রাতে স্বপ্নের মধ্যে (ঈশ্বর করুন সেগুলি যেন স্বপ্নই হয়।) আমি ছিলাম এই জগতের সন্তান, এক বিপথগামী সন্তান।

এক নারীর মুখের দিকে মাত্র একটিবার দৃষ্টিপাতের ফলে আমার আত্মার ধ্বংস হতে বসেছিল, কিন্তু ঈশ্বরের সহায়তায় ও আমার আশ্রয়দাতা সন্তের কৃপায় শেষ পর্যন্ত সেই শয়তানের কবল থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলাম।

রাত ও দিনে তখন আমার ছিল এক দ্বৈত জীবন। সারাদিন আমি প্রভুর এক পবিত্র পুরোহিত, আমার দিন কাটে প্রার্থনায় ও পবিত্র কর্মের অনুষ্ঠানে; কিন্তু ঘুমে দুই চোখ বুজে এলেই হয়ে উঠি এমন এক যুবক নাইট—যে নারীকে ভালবাসে, ভালবাসে ঘোড়া ও শিকারী কুকুর, যে মদ খায়, পাশা খেলে, পাপ কথা বলে; আবার প্রত্যুষে ঘুম ভাঙলেই মনে হয়, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেও একজন পাদ্রীই ছিলাম। সেইসব স্বপ্নের কিছু কিছু স্মৃতি এখনও আমার মনে আছে; এমন সব কথা ও বস্তুর স্মৃতি যা কখনও স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে না। আরে, যদিও আমি কখনও আমার পল্লীযাজকের বাসভবনের বাইরে যাইনি তবু আমার কথা যে শুনেছে সেই মনে করবে যে আমি এমন একজন মানুষ যে এই পৃথিবীতে একদিন ছিল, আর এখান থেকে চলে গেছে ধর্মকে বুকে নিয়ে মৃত্যুকে বরণ করতে, ঈশ্বরের কোলে শুয়ে তার দুর্যোগভরা দিনগুলিকে শেষ করে দিতে! এই জগৎ থেকে অনেক দূরে এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত গির্জার পুরোহিত হয়েই সে যে বৃদ্ধ হয়েছে একথা কেউ মনে করবে না।

হ্যাঁ, আমি ভালবেসেছি, এমন ভাল কোন মানুষ কোনদিন বাসে নি—এক উন্মাদ ভালবাসা, ভয়ংকর ভালবাসা; তার ফলে আমার বুকটা যে ফেটে চৌচির হয়ে যায়নি তাতেই আমি বিস্মিত। আহা, অনেককাল আগের সেই রাতগুলি! শৈশব থেকেই পুরোহিত হবার ডাক আমি অনুভব করতাম। আমার সব পড়াশুনার সেটাই ছিল একমাত্র লক্ষ্য; চব্বিশ বছর পর্যন্ত আমার দিনগুলি ছিল এক দীর্ঘ শিক্ষণ-কাল। ধর্মশাস্ত্রের পাঠ শেষ করে অনেকগুলি ছোট ছোট উপাধি পেলাম, এবং শেষ পর্যন্ত পবিত্র সপ্তাহের শেষে আমার ধর্মযাজকের পদে নিয়োগের লগ্ন সমাগত হল।

এ জগতে আমি আগে কখনও পদার্পণ করিনি; আমার জগৎ ছিল কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মেয়েরা আছে এইটুকুই শুধু জানতাম, কিন্তু তাদের কথা কখনও ভাবিনি। আমার অন্তর ছিল একান্ত পবিত্র; এমন কি আমার বৃদ্ধা অথর্ব মাকে পর্যন্ত আমি বছরে মাত্র দু'বার দেখতে যেতাম; অন্য কোন আত্মীয়স্বজন আমার ছিল না।

অলঙ্ঘনীয় শপথ গ্রহণ করে আমি কখনও অনুতাপ করিনি, বা তা নিয়ে কোনরকম ইতস্তত করিনি; বরং এক ধৈর্যহারা আনন্দের মধ্যে যেন ডুবে ছিলাম। কোন যুবক বর কখনও এমন আগ্রহের সঙ্গে তার বিয়ের জন্য দিন গোণেনি। ঘুমের মধ্যেও প্রার্থনা করার স্বপ্নই দেখতাম। আমার কাছে পুরোহিত হওয়াটাই ছিল জগতের মহত্তম কাজ; কবি বা রাজা হবার মর্যাদাকেও আমি হয়তো ঘৃণা করতাম। শুধু পুরোহিত হতে চাই! এর চাইতে মহত্তর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না।

এসব কথা তোমাকে বলছি যাতে তুমি বুঝতে পার, আমার ভাগ্যে যা ঘটেছিল

সেটা মোটেই আমার প্রাপ্য ছিল না; যে মোহ আমাকে পরাভূত করেছিল সে যে কত দুর্জ্ঞেয় সেটা বুঝতে পার।

সেই পরম লগ্নটি এল; আমি গির্জায় গেলাম যেন দুই পাখায় উড়ে, অথবা বাতাসের উপর দিয়ে হেঁটে। একটা পরম স্বর্গীয় সুখ অনুভব করলাম; সঙ্গী-সাথীদের বিষণ্ণ, চিন্তিত মুখগুলি দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

সারাটা রাত প্রার্থনায় কাটল। আমি যেন আনন্দে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। পরম শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বিশপ যেন আমার চোখে ঈশ্বর হয়ে দেখা দিলেন; মনে হল, বড় গির্জার খিলানের ওপাশে বুঝি স্বর্গের দরজা খুলে গেছে।

অনুষ্ঠানটা তুমি জানই: প্রার্থনা, উভয়বিধ শেষ ভোজনানুষ্ঠান, দুই হাতে মন্ত্রপূত তেল মালিশ, এবং সর্বশেষ বিশপের সঙ্গে একযোগে পবিত্র আচারানুষ্ঠান।

এসব কথা বেশি বলব না, কিন্তু হায়, জোবের কথাগুলি কত সত্য—নিজের চোখের সঙ্গে যে মানুষ চুক্তিবদ্ধ না হয় সে কত বড় মূর্খ! হঠাৎই মাথাটা তুলতেই আমার সামনেই তাকে দেখলাম; এত কাছে যে মনে হল আমি তাকে ছুতে পারি, যদিও আসলে সে বেশ কিছুটা দূরেই ছিল; দেখলাম একটা রেলিংয়ের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণী; রানীর পোশাক পরিহিতা একটি অতুলনীয়া সুন্দরী।

আমি যেন নতুন দৃষ্টিলাভ করলাম; কোন অন্ধ যখন হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় তারই মতো হল আমার অবস্থা। একমুহূর্ত আগে যে বিশপ ছিল এত চমৎকার, সে যেন ম্লান হয়ে গেল; সারা গির্জাটা অন্ধকারে ঢেকে গেল; ভোরের আকাশের তারার মতো সোনার বাতিদানে মোমবাতির আলোও বিবর্ণ হয়ে এল।

চতুর্দিকের বিষণ্ণতার মাঝখানে সেই মনোরমা যেন স্বর্গীয় দীপ্তিতে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে, সে যেন সমস্ত আলোর উৎসস্বরূপা।

চোখ নামিয়ে নিলাম; প্রতিজ্ঞা করলাম দ্বিতীয়বার চোখ তুলব না; কিন্তু মনের জোর টিকল না, কি করছি তা নিজেই বুঝতে পারিনি। মুহূর্তকাল পরেই চোখ মেলে তাকালাম; চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে দেখলাম একটা আলোর বৃত্তের মাঝখানে তার মূর্তিটি জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে; ঠিক সূর্যের দিকে তাকালে যে রকম হয়। আহা, সে কী সুন্দরী!

বড় বড় চিত্রকর যারা আদর্শ সৌন্দর্যের সন্ধানে স্বর্গের দিকে তাকিয়েছে আর পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে "আমাদের জননী"র প্রতিকৃতি, তারাও তো এই অপরূপ দৃশ্যের কাছাকাছিও পৌঁছতে পারেনি। সে দীর্ঘাঙ্গী, চলনে দেবী মহিমা। তার সোনালী চুলের রাশি ভুরুর উপর দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। চওড়া সাদা কপাল, ঘন কালো ভুরু। মুকুটধারিণী রানীর মতো সে দাঁড়িয়ে আছে; দুই চোখে সবুজ সমুদ্রের উজ্জ্বলতা ও জীবনের আভাস; তার একটি কটাক্ষপাত মানুষের ভাগ্যকে গড়তে পারে, আবার ভাঙতেও পারে। সে চোখে বিস্ময়কর দীপ্তি ও প্রখরতা যেন তীরের মতো বিচ্ছুরিত; মনে হল সে কটাক্ষ যেন সোজা আমার অন্তরকে লক্ষ্য করেই ছুটে আসছে। সে অগ্নিশিখা স্বর্গ থেকে আসছে, না নরক থেকে, তা আমি জানি না, কিন্তু এ দুইয়ের

যেকোন একটা জায়গা থেকে নিশ্চয় আসছে। সে হয় দেবদূত, অথবা শয়তান, অথবা দুইই; এই নারী আমাদের সকলের মাতৃসমা ইভের সন্তান কখনও হতে পারে না। হাসলে তার সাদা দাঁতে ঝিলিক খেলে, মুখ নড়লেই গোলাপী গালে ছোট ছোট টোল খায়, আবার মিলিয়ে যায়। আধঢাকা কাঁধের মসৃণ চকচকে চামড়ায় সোলেমানি পাথরের উজ্জ্বলতা; গলা থেকে বুক পর্যন্ত ঝোলানো বড় বড় মুক্তোর হারটি তার গলার চাইতে বেশি সাদা নয়।

তার মাথাটা থেকে থেকে সাপের মতো দুলছে, আর তার ফলে তার পোশাকও কেঁপে কেঁপে উঠছে। তার পরিধানে আগুন-রং ভেলভেটের পোশাক, সাদা পাড় বসানো আস্তিনের ভিতর থেকে সুন্দর দু'খানি হাত একবার বেরিয়ে আসছে আবার ঢুকে যাচ্ছে; সে দু'খানি হাত বুঝি ঊষার আঙুলের মতোই স্বচ্ছ। তার দিকে তাকিয়ে মনে হল, আমার মনের যে দ্বার এতদিন অর্গলবদ্ধ ছিল তা যেন খুলে গেল; চোখের সামনে দেখা দিল অজ্ঞাত ভবিষ্যতের আকস্মিক দৃশ্য; সমস্ত জীবনটাই যেন পাল্টে গেল; মনে জাগল নতুন চিন্তা। একটা ভয়ংকর ব্যথা আমাকে পেয়ে বসল; প্রতিটি মুহূর্তকে যুগপৎ একটি মুহূর্ত ও একটি যুগ বলে মনে হতে লাগল। অনুষ্ঠান সমানে চলছে, আর আমিও যেন এ জগৎ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছি; আমার নতুন বাসনারা যেন সে জগতের দুয়ারে মাথা কুটছে। যখন আমি বলতে চাইছি "না," জিহ্বায় যে শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে সমস্ত মন যখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে, তখন আমি মুখে বলছি "হ্যাঁ"। একটা গোপন শক্তি যেন আমাকে সবকিছু থেকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠান যত এগিয়ে চলেছে, সেই অজ্ঞাত মনোরমার মুখের ভাবও ক্রমেই বদলে যাচ্ছে। প্রথমে যা ছিল নরম আদরে ভরা, তাই হয়ে ওঠে তাচ্ছিল্য ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ। পাহাড়-টলানো শেষ প্রচেষ্টায় চিৎকার করে বলতে চাইলাম আমি পুরোহিত হতে চাই না; কিন্তু বৃথা চেষ্টা, আমার জিভ থেকে কোন চিৎকার বের হল না, এমন-কি ইঙ্গিতেও কোন আপত্তি জানাতে পারলাম না। সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আমার মনে হল আমি যেন সেই দুঃস্বপ্নের কবলে পড়েছি যখন সেই কথাটি কিছুতেই উচ্চারণ করা যায় না যার উপর নির্ভর করে জীবন মরণ। আমার যন্ত্রণা সে বোধ হয় বুঝতে পারল; স্বর্গীয় করুণা ও প্রতিশ্রুতিভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

যেন বলতে চাইল, "তুমি আমার হও, আমি তোমাকে ঈশ্বরের চাইতেও বেশি সুখী করব; স্বর্গ ও দেবদূতরাও তোমাকে ঈর্ষা করবে। যে শবাচ্ছাদন তোমাকে বেঁধেছে তাকে ছিঁড়ে ফেল, কারণ আমিই রূপ, যৌবন ও জীবন; আমার কাছে চলে এস, দু'জনে আমরা দু'জনকে ভালবাসব। তোমার যৌবনের বিনিময়ে জিহোভা তোমাকে কী দিতে পারে? আমাদের জীবন বয়ে চলবে স্বপ্নের মতো একটি চুম্বনের অন্তহীনতার পথ ধরে। ঐ পাত্র থেকে মদটা ফেলে দাও, তাহলেই তুমি মুক্ত হবে, আর আমি তোমাকে নিয়ে যাব সেই অজ্ঞাত দ্বীপে; রুপোলি চন্দ্রাতপের নিচে সোনার শয্যায় তুমি ঘুমবে আমার বুকে; কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি, সাগ্রহে তোমাকে

নিয়ে যাব তোমার সেই ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে, যার কাছে অনেক মহৎ হৃদয় তাদের ভালবাসাকে ধূপের মতো পুড়িয়েছে অথচ ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছবার আগেই সে ধূপ নিঃশেষে নিভে গেছে।"

এই কথাগুলি যেন মধুরতম সুরে আমার কানে বাজতে লাগল; তার দৃষ্টির সেই বাণী এমনভাবে আমার অন্তরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল যেন কেউ আমার আত্মার কানে কানে সেগুলি বলছে। শপথ করে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করতে তখন আমি প্রস্তুত, তবু সব অনুষ্ঠানই যথারীতি পালন করতে লাগলাম। সে আর একবার আমার দিকে তাকাল; মিনতি ও হতাশায় ভরা সে দৃষ্টি; আমার মনে হল, স্বয়ং দুঃখের দেবী যত না অস্ত্রে বিদ্ধ হয়েছে, তার চাইতে বেশি অস্ত্র বিদ্ধ করছে আমার অন্তর।

অনুষ্ঠান শেষ হল। আমি পুরোহিত হলাম। আমার তখনকার মতো এত তীব্র দুঃখ বুঝি, কোনদিন কোন মানুষ পায়নি; একটি মেয়ের বাকদত্ত স্বামী যখন তার পাশেই মারা যায়, মা যখন দেখে তার শিশুর দোলনা শূন্য হয়ে গেছে, ইভ যখন দেখে সে ইডেনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, কৃপণ যখন তার সঞ্চিত ধনের সন্ধানে এসে দেখে শুধু একখণ্ড পাথর, তাদের দুঃখও এত তীব্র, এত সান্ত্বনার অতীত নয়। মেয়েটির সুন্দর মুখ থেকে সব রক্ত সরে গেল; হাত দু'খানি অসহায়ভাবে ঝুলে পড়ল, দাঁড়াবারও শক্তি নেই, কোনরকমে একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। স্খলিত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম; মুখ বিবর্ণ, চোখে জল, শ্বাস রুদ্ধপ্রায়; গির্জার সব ভার যেন আমারই মাথায় চেপে বসেছে। চৌকাঠ পার হতে গিয়েই কে যেন আমার হাতটা চেপে ধরল। একটি নারীর হাত; সে হাত শীতল হলেও আমার হাতে যেন পোড়া কাঠের ছ্যাঁকা লাগল।

"আহা বেচারি, এ তুমি কি করলে?" আমার কানে কানে কথাগুলি বলেই সে নারী ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল।

বুড়ো বিশপ থামলেন, কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন; সে দৃষ্টি বড় করুণ—কখনও লাল, কখনও ম্লান, কখনও বিস্মিত, কখনও অস্পষ্ট। একটি সহকর্মী দয়া করে আমাকে সঙ্গে করে বাড়িতে পৌঁছে দিল। আমি একা যেতেই পারতাম না। রাস্তার একটা কোণে পৌঁছে তরুণ পুরোহিতটি মাথাটা ঘোরাতেই অদ্ভুত পোশাক পরা একটি কৃষ্ণকায় বালকভৃত্য আমার কাছে এগিয়ে এসে সোনার কাজ-করা একটা ছোট চামড়ার থলে আমার হাতে দিয়ে ইশারায় লুকিয়ে রাখতে বলল। সেটাকে আস্তিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম; একাকি নিজের ঘরে না ফেরা পর্যন্ত সেখানেই থলেটাকে রেখে দিলাম। তারপর খুললাম, তাতে শুধু এই কথাগুলি লেখা ছিল:

ক্লারিমোঁদে

পালাজ্জো কন্‌সিনি-তে

পৃথিবীর খবর আমি এত রকম রাখতাম যে তার অনেক সুখ্যাতি সত্ত্বেও ক্লারিমোঁদের

নাম আমি কখনও শুনিনি, পালাজ্জো কন্‌সিনি কোথায় তাও জানি না। অনেকরকম অনুমান করলাম, কিন্তু তাকে আর একবার দেখতে পাবার আশায় ক্লারিমোঁদে কোন সম্ভ্রান্ত মহিলা, অথবা কোন দুষ্টা নারী তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামালাম না। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে জন্ম নিয়েও সে ভালবাসা আমার অন্তরে এমনভাবে শিকড় গজিয়েছে যে তাকে ত্যাগ করার স্বপ্ন দেখাও আমার পক্ষে অসম্ভব। এই নারী আমাকে একান্তভাবেই তার করে নিয়েছে। একটি কটাক্ষপাতেই আমাকে বদলে দিয়েছে, তার ইচ্ছাই এখন বলবতী, আমি বেঁচে আছি তারই জন্য, নিজের জন্য নয়।

অনেক পাগলের মতো কাণ্ড আমি করতে লাগলাম: তার হাত আমার হাতের যেখানে স্পর্শ করেছিল সেখানে চুমো খেলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার নাম ধরে ডাকলাম—ক্লারিমোঁদে, ক্লারিমোঁদে। চোখ বুজলেই দেখি, সে যেন সশরীরে আমার সামনে উপস্থিত। তারপরই অস্ফুট কণ্ঠে সেই কথাগুলি উচ্চারণ করি, গির্জার খিলানের নিচে যে কথাগুলি সে আমাকে বলেছিল: "আহা বেচারি, এ তুমি কি করলে?"

আমি তখন যে অবস্থায় পড়েছি তার আতঙ্ক মর্মে মর্মে অনুভব করলাম; জীবনের যে ভয়ংকর মৃত দিকটাকে আমি বেছে নিয়েছি সেটা আমার কাছে উদ্ঘাটিত হল। পুরোহিত হলাম! কখনও ভালবাসব না, যৌবনের আহ্বান কাকে বলে কোনদিন তা জানব না। সুন্দরের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকব, দুই চোখ বুজে মঠ বা গির্জার শীতল ছায়ায় হামাগুড়ি দিয়ে চলব। মৃত মানুষ ছাড়া কারও দিকে তাকাব না, মৃতদেহের পাশে জেগে থাকব, যে যাজকের পোশাক পরিয়ে ওরা আমাকে একদিন কবর দেবে সারা জীবন সেটাই পরতে হবে!

তখনই বন্যাস্ফীত নদীর মতো আমার বুকের মধ্যে জীবন যেন উদ্বেল হয়ে উঠল, শিরায় শিরায় রক্তে জাগাল বিদ্রোহ, মুহূর্তের মধ্যে আমার যৌবন যেন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। আবার কেমন করে ক্লারিমোঁদের দেখা পাব? গির্জা ছেড়ে যাবার কোন অজুহাত আমার ছিল না, কারণ শহরে কাউকে আমি চিনি না; আসলে কোন পল্লীগির্জায় নিয়োগের জন্যই আমি সেখানে অপেক্ষা করছিলাম।

জানালার শিক খুলে ফেলার চেষ্টা করলাম. কিন্তু মই ছাড়া সেখান থেকে নিচে নামা অসম্ভব। তাছাড়া, একমাত্র রাতের বেলাতেই পালানো সম্ভব, কিন্তু তখন পালালে তো শহরের পথের গোলকধাঁধায় নিজেই পথ হারিয়ে ফেলব। এসব অসুবিধা অন্যের কাছে হয় তো কিছুই নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতা, অর্থ ও জাগতিক জ্ঞানবিহীন প্রথম প্রেমে পড়া একটি অসহায় পুরোহিতের কাছে এসবই যে প্রচণ্ড বাধা।

আহা! আমি যদি পুরোহিত না হতাম তাহলে তো প্রতিদিন তাকে দেখতে পেতাম। তার প্রেমিক হতে পারতাম, স্বামী হতে পারতাম—অন্তরের অন্ধ আবেগে এই সব কথাই নিজেকে বললাম। একটা জোব্বায় শরীরটাকে না ঢেকে, তরুণ নাইটদের মতো পরতে পারতাম রেশম ও ভেলভেট, সোনার চেন, তরবারি ও পালক। আমার মাথা মুড়ানো হত না, গুচ্ছ গুচ্ছ সুবাসিত কোঁকড়া চুল গলার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু বেদীর সামনে একটি ঘণ্টা সময় আর কিছু অসংলগ্ন উক্তি আমাকে

জীবন্ত মানুষের দল থেকে ছাঁটাই করে দিয়েছে। নিজের হাতে আমার অতীত জীবনের সমাধির উপর আমি পাথর চাপিয়ে দিয়েছি; আমার কারাকক্ষের তালায় ঘুরিয়ে দিয়েছি চাবি।

জানালার কাছে হেঁটে গেলাম। আকাশ স্বর্গীয় নীলে ভরা, গাছগুলি সব বসন্তের সাজে সেজেছে, গোটা প্রকৃতির মুখে যেন পরিহাসের হাসি। স্কোয়ারটা লোকজনের আসা-যাওয়ায় পরিপূর্ণ: সুন্দর তরুণরা, সুন্দরী তরুণীরা জোড়ায় জোড়ায় বাগানের দিকে হেঁটে চলেছে।

মজুররা চলেছে গান গেয়ে। চারদিকের জীবন, গতি ও ফুর্তি শুধু আমার দুঃখ ও নির্জনতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফটকের সিঁড়িতে একটি তরুণী মা ছেলের সঙ্গে খেলা করছে, আর ছোট্ট গোলাপী মুখখানাকে চুমোয় চুমোয় ভরে দিচ্ছে।

অদূরে সুখী বুকের উপর দুই হাত ভাঁজ করে রেখে বাবাটি তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। দেখে আমার কষ্ট হল, জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। তীব্র ঈর্ষা ও ঘৃণায় বিছানার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, ক্ষুধার্ত বন্য পশুর মতো আঙুল দিয়ে বিছানার চাদরটা ছিঁড়তে লাগলাম।

সেভাবে কতক্ষণ শুয়েছিলাম জানি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রোধের বশে মুখ ফিরিয়েই দেখলাম মঠাধিকারী সেরাপিয়ন কৌতুকের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। লজ্জায় মাথা নিচু করে দুই হাতে মুখ ঢাকলাম।

তিনি বললেন, "বন্ধু রোমন্ড, একটা বিচিত্র অবস্থায় তুমি পড়েছ। শয়তান তোমার উপর ভর করেছে; ক্রুদ্ধ সিংহের মতো সে ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমাকে খাবার জন্য। সাবধান হও, প্রার্থনার বক্ষস্ত্রাণে নিজেকে সুরক্ষিত কর, সেটাই মরণশীল মানুষের একমাত্র কর্ম। ভয় পেয়ো না। নিরুৎসাহ হয়ো না, কারণ যাদের হৃদয় অত্যন্ত দৃঢ় এবং একান্তভাবে সুরক্ষিত, তাদের সামনেও এরকম দুঃসময় এসেছে। প্রার্থনা কর, উপবাস কর, ধ্যান কর, তাহলেই শয়তান তোমাকে ছেড়ে যাবে।"

সেরাপিয়ন বললেন সি-র পুরোহিত মারা গেছেন, তার জায়গায় বিশপ আমাকেই নিয়োগ করেছেন, কালকের মধ্যেই আমাকে যাবার জন্য তৈরি হতে হবে। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম, মঠাধিকারী চলে গেলেন। ধর্মগ্রন্থ খুলে পড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু অক্ষরগুলো এলোমেলোভাবে কাঁপতে লাগল, আর পুঁথিখানাও অজান্তেই হাত থেকে পড়ে গেল।

পরদিন সেরাপিয়ন আবার এলেন; আমাদের যৎসামান্য মালপত্র নিয়ে দুটো খচ্চর ফটকে দাঁড়িয়ে আছে। যথাসম্ভব ভালভাবে তাতেই চেপে বসলাম। পথ দিয়ে যেতে যেতে প্রতিটি বারান্দায় ও জানালায় ক্লারিমোঁদের সন্ধান করলাম। কিন্তু অত সকালে শহরটিই তখনও ঘুমিয়ে আছে। ফটক পার হয়ে পাহাড়ে উঠবার আগে শেষবারের মতো যেদিকে ফিরে তাকালাম সেখানেই ক্লারিমোঁদের বাড়ি। শহরের উপর একটা মেঘের ছায়া পড়েছে, লাল ছাদ ও আকাশের নীল একই কুয়াশার মধ্যে মিশে গেছে। মাঝে মাঝে ধোঁয়ার সাদা কুণ্ডলী উঠছে। কুয়াশাঢাকা ছাদগুলির ভিতর থেকে সোনালী

রঙের একটা উঁচু বাড়ি চোখে পড়ল। বাড়িটা এক লীগ দূরে হলেও মনে হল যেন খুব কাছে—সবকিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে; গম্বুজ, বারান্দা, ছাদের আলসে, এমনকি হাওয়া পাখিটা পর্যন্ত।

সেরাপিয়নকে জিজ্ঞাসা করলাম, "সূর্যের আলোয় দূরে ঐ যে প্রাসাদটা দেখা যাচ্ছে ওটা কি?"

হাত দিয়ে চোখটাকে ঢেকে সেদিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "ওটা তো সেই পুরনো রাজপ্রাসাদ যেটা প্রিন্স কন্‌সিনি ক্লারিমোঁদেকে দিয়েছেন। সেই থেকে ওখানে ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে।"

ঠিক সেই মুহূর্তে—এটা স্বপ্ন না কল্পনা তা আমি জানি না—আমার মনে হল একটি শ্বেতবরণা সুন্দরী ছাদটা পার হয়ে একবার তাকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সে ক্লারিমোঁদে।

আহা! সে কি জানত, যে বন্ধুর পথ আমাকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তার চূড়া থেকেও সেই সময় আমি অস্থির চিত্তে ও অধীর আগ্রহে সেই প্রাসাদের দিকেই তাকিয়েছিলাম যেখানে সে বাস করে, তাকিয়েছিলাম তারই সন্ধানে? মরীচিকা অথবা আলো-ছায়ার মায়া, যেকোন কারণেই হোক প্রাসাদটাকে খুবই কাছে মনে হল; মনে হল প্রাসাদটা যেন আমাকে ডাকছে তার ভিতরে ঢুকে সবকিছুর প্রভু হয়ে বসতে। সে যে সবই জানত তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ আমাদের দু'জনের হৃদয় তখন একসূত্রে বাঁধা! তাই তো রাতের পোশাকেই সে এই কুয়াশা-ঢাকা ভেতরে প্রাসাদের ছাদে উঠে এসেছে। ছায়ামূর্তি প্রাসাদের উপর থেকে মিলিয়ে গেল, পড়ে রইল শুধু নিশ্চল ছাদের সারি। সেরাপিয়ন তার বাহনটিকে খোঁচা দিল, আমার বাহনটিও গতি বাড়িয়ে দিল, আর রাস্তাটা একটা বাঁক নিতেই এস্—শহরটি চিরদিনের মতো আমার কাছ থেকে হারিয়ে গেল; আর কোনদিন আমার সেখানে ফেরা হবে না। নিরানন্দ মাঠের ভিতর দিয়ে তিন দিন পথ চলার পরে গাছপালার অনেক উপরে আমার পল্লীগির্জার চূড়াটা দেখতে পেলাম। অনেক আঁকাবাঁকা গলি, দুই পাশে কুটীর ও বাগান, অরপরেই যে বাড়িটাতে আমরা পৌঁছে গেলাম তাতে জাঁকজমক বিশেষ কিছু নেই। কয়েকটি ছাঁচের মূর্তিসহ একটা খিলান, চুনাপাথরে খোদাই-করা দু'-তিনটে স্তম্ভ, টালির ছাদ—ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। বাঁ দিকে লম্বা ঘাসের ভিতরে একটা কবরখানা, মাঝখানে একটা লোহার ক্রুশ। ডান দিকে গির্জার ছায়ায় পুরোহিতের বাড়ি। সরলতা আর সরলতর হতে পারে না, পরিচ্ছন্নতাও ন্যূনতম মানের। বাড়িতে আছে একটা পুরনো কুকুর ও একটি বয়স্কা গৃহকর্ত্রী; সে যখন জানল যে দু'জনই আমরা চাকরিতে বহাল থাকব তখন তার আনন্দ আর ধরে না।

আমাকে কাজে বসিয়ে দিয়ে সেরাপিয়ন কলেজে ফিরে গেলো। আমি একা পড়ে গেলাম।

সাহায্য করার কেউ নেই, সান্ত্বনা দেবারও কেউ নেই; এ অবস্থায় ক্লারিমোঁদের

চিন্তা আবার আমাকে পেয়ে বসল; সবরকম চিন্তা সত্ত্বেও তার স্মৃতিকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলাম না। একদিন সন্ধ্যায় আমার ছোট বাগানের চৌখুপি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হল গাছগাছালির মধ্যে একটি নারীমূর্তিকে দেখতে পেলাম; আমার সব গতিবিধির উপর তার নজর। পাতার ফাঁকে ফাঁকে চকচক করছে তার সবুজ দুটি চোখ। তার চোখে সমুদ্রের সবুজ দীপ্তি, কিন্তু সেটা কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ বাগান পার হয়ে গলির অপর প্রান্তে পৌঁছেও বালির উপর একটি ছোট পায়ের ছাপ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না—আর সেটা একটি শিশুর পায়ের ছাপ। বাগানটা উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, কিন্তু অনেক খুঁজেও প্রাচীরের ভিতরে কোন জীবিত প্রাণীকে দেখতে পেলাম না। এ ঘটনার কোন ব্যাখ্যা আমি কোনদিন পাইনি; অবশ্য এর পরে যে সব বিচিত্র ঘটনা ঘটল তার তুলনায় এটা কিছুই নয়।

এইভাবে একটা বছর কেটে গেল; যাজকের সব কর্তব্যই যথারীতি পালন করতে লাগলাম—প্রচার, প্রার্থনা, উপবাস, রোগীর সেবা, জীবনের যেসব প্রয়োজনীয় জিনিস গরীবদের দেওয়া যায় তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা—সব কিছু। কিন্তু আমার ভিতরটা শুষ্ক, অনুর্বর—লাবণ্যের উৎস যে অবরুদ্ধ। একটা মহৎ কর্তব্য পালনের সচেতনতা থেকে যে সুখের জন্ম তা আমি ভুলে গেছি। আমার মন পড়ে আছে অন্যত্র; ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষ যে কাহিনী উচ্চারণ করে, ঠিক সেই রকম ক্লারিমোঁদের কথাগুলিও আমার ঠোঁটে লেগে আছে। ভাইরে, একটা কথা ভেবে দেখ! একটি নারীকে দেখতে চোখ তুলে তাকাবার জন্য বছরের পর বছর কত জ্বালা আমি সয়েছি, আমার জীবনটাই দুঃখে ভরে আছে।

এই সব জয়-পরাজয়ের গল্প বলে তোমাকে আর আটকে রাখব না; এবার আসা যাক নবজীবনের সূচনায়।

একদিন রাতে আমার ফটকে প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দ হল। বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রীটি সেটা খুলে দিতে গেল। তার লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল দামী পোশাক পরিহিত বাদামী রংয়ের একটি মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে; হাতে একটা লম্বা ছোরা। সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল; কিন্তু আগন্তুক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল যে আমার কর্তব্যকর্মের ব্যাপারে সে তৎক্ষণাৎই আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। বারবারা তাকে দোতলায় আমার ঘরে নিয়ে এল। সেই ঘরেই আমি তখন শুতে যাচ্ছিলাম। সেখানেই লোকটি আমাকে বলল যে তার উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কর্ত্রীঠাকরুণ মৃত্যুশয্যায় একজন পুরোহিতের দর্শনপ্রার্থিনী। জবাবে তাকে জানালাম যে আমি তার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত, এবং চরম অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে তড়িৎগতিতে নিচে নেমে গেলাম। দরজায় দুটো ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল; রাতের মতো কালো রং, তাদের নিশ্বাস বেরিয়ে আসছে বাষ্পের সাদা মেঘের মতো। লোকটি আমার রেকাবটা ধরলে আমি ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। লোকটি ছোরার হাতলে হাত রেখে লাফিয়ে অন্য ঘোড়ায় চড়ল। দুই হাঁটুর মধ্যে ঘোড়াটাকে চেপে ধরে সে মাথাটা এগিয়ে দিল। তীব্রগতিতে শুরু হল যাত্রা; আমার ঘোড়াটাও তার সঙ্গে তাল রেখে ছুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে

আমরা যেন রাস্তাটাকে গিলে খাচ্ছি; কালো কালো গাছগুলো অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছে পরাজিত সৈন্যদের মতো। একটা বন পার হয়ে গেলাম। এমন জমাটবাঁধা ঠাণ্ডা যে আমার শিরায় শিরায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভীতির শিহরন বইতে লাগল। ঘোড়ার ক্ষুর থেকে ছিট্‌কে বেরুচ্ছে আগুনের ফুলকি; সারাপথ একটা অগ্নি-রেখা যেন আমাদের অনুসরণ করছে। এ অবস্থায় যে কেউ আমাদের দেখছে তারাই নির্ঘাৎ ভাবছে যে আমরা স্বপ্নের ঘোড়ায় সওয়ার দুই প্রেতাত্মা। পথের দু'ধারে জ্বলছে আলেয়ার আলো; বনের গভীরে রাত-জাগা পাখিরা ডাকছে, মাঝে মাঝেই দেখতে পাচ্ছি বনবেড়ালের জ্বলন্ত চোখের ঝিলিক। বাতাসে উড়ছে ঘোড়ার ঘাড়ের লোম, শরীর থেকে ঘাম ঝরছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে সজোরে। যেই তাদের গতি একটু শ্লথ হচ্ছে অমনি সহিস এমনভাবে চিৎকার করে তাদের ডাকছে যে শব্দ কোন মানুষের গলা থেকে বের হতে পারে না; সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া দুটিও আবার প্রচণ্ড বেগে ছুটছে। অবশেষে তাদের ঝড়ের গতি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিল; হঠাৎ আমাদের সামনে দেখা দিল অন্ধকারের স্তূপ; তার মাঝে মাঝে আগুনের বিন্দু। একটা টানা-সেতুর উপর আমাদের ঘোড়ার ক্ষুরের খটাখট শব্দ উঠল; দুটো দৈত্যাকার দুর্গের মাঝখানে হাঁ-করা খিলানওয়ালা ফটকের ভিতর দিয়ে ঝড়ের গর্জন তুলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। দুর্গের মধ্যে সবই কেমন যেন গোলমেলে অবস্থা—জ্বলন্ত মশাল হাতে চাকরেরা এঘরে-ওঘরে ছুটাছুটি করছে; সিঁড়িতে আলোগুলি বাড়ছে-কমছে। দেখতে পেলাম একটা প্রকাণ্ড বাড়ি, স্তম্ভ, খিলান, বারান্দা, আল্‌সে: কোন রাজকীয় অথবা স্বপ্নের প্রাসাদের এক বিস্ময়কর জগৎ। যে নিগ্রো চাকরটা আমার হাতে দিয়েছিল ক্লারিমোঁদের চিঠি, একবার দেখেই তাকে চিনতে পারলাম; সেই আমাকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল। কালো ভেলভেটের পোশাক পরা গলায় সোনার চেন ঝোলানো, হাতির দাঁতের লাঠি হাতে নায়েবমশায় এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা তাঁর দুই গাল বেয়ে বরফ-সাদা দাড়ির উপর ঝরে পড়ছে।

বললেন, "বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে পুরোহিত মশায়, বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু যথাসময়ে এসে তাকে বাঁচাতে না পারলেও দয়া করে মৃতার দুঃখী দেহটাকে একবার ভাল করে দেখুন।"

তিনি আমার হাত ধরলেন; যেখানে শবদেহ রাখা আছে সেই হলে নিয়ে গেলেন; এই মৃতা ক্লারিমোঁদে ছাড়া অন্য কেউ নয় বুঝতে পেরে আমিও তাঁর মতোই অঝোরে কাঁদতে লাগলাম। পাগলের মতো তাকে যে বড় বেশি ভালবেসেছি! বিছানার পাশে রয়েছে একটা শ্যামাদান: পিতলের প্রদীপ থেকে একটা নীল শিখা কেঁপে কেঁপে উঠে ঘরময় একটা অদ্ভুত আলো ছড়িয়ে দিয়েছে; এখানে-ওখানে ছায়াগুলো কাঁপছে।

টেবিলের উপর কারুকার্যময় ফুলদানিতে একটিমাত্র শ্বেত গোলাপ ঝরে গেছে; ডাঁটার সঙ্গে লেগে আছে মাত্র একটি পাপড়ি; বাকিগুলো ঝরে গেছে সুগন্ধি অশ্রুবিন্দুর মতো; ফুলদানির পাশেই পড়ে আছে। চেয়ারগুলোর উপর স্তূপীকৃত হয়ে আছে একটা ভাঙা কালো মুখোশ, একখানি পাখা ও নাচগানের নানাবিধ উপকরণ; দেখলেই

বোঝা যায়, এই চমৎকার বাড়িটাতে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটেছে অপ্রত্যাশিত ও ঘোষণাহীনভাবে। বিছানার দিকে দৃষ্টিপাতের সাহস হল না ; হাঁটু ভেঙে বসে একান্তভাবে প্রার্থনা করতে লাগলাম ; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম এই কারণে যে এই নারী ও আমার মাঝখানে তিনি একটা কবর রচনা করে দিলেন ; তার ফলে তার নাম এখন আমার কাছে আকাশের মতো উঁচু হয়ে উঠল, আমার প্রার্থনায় সন্তদের সঙ্গে তার নামটিও উচ্চারণ করতে পারব।

ধীরে ধীরে এ উৎসাহ কমে এল ; আবার আমি স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেলাম। যাই হোক না কেন, এ ঘরে তো মৃত্যুপুরীর পরিবেশ নেই। এ ধরনের নৈশ-প্রতীক্ষায় যে শবগন্ধবাহী বাতাসে প্রশ্বাস নিতে আমি অভ্যস্ত তার বদলে এ ঘরের মৃদু হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে প্রাচ্য গন্ধদ্রব্য, নারী ও প্রেমের সৌরভের আতপ্ত বাষ্প। বাতির ম্লান কম্পিত শিখাকে মৃতের পাশে জ্বালিয়ে রাখা মোমবাতির হলুদ আলোর পরিবর্তে সুখের গোধূলি আলো বলেই মনে হচ্ছে। মনে পড়ল, যেমুহূর্তে আমি ক্লারিমোঁদেকে চিরদিনের মতো হারিয়েছি ঠিক তখনই একটা আকস্মিক বিপদ আমাকে তার পাশে এনে হাজির করেছে ; বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল। মনে হল, পিছন থেকে কে যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ; নিজের অজ্ঞাতেই মুখ ফেরালাম। একটা প্রতিধ্বনিমাত্র ; কিন্তু মুখটা ফেরাতেই আমার চোখ পড়ল সেই বিছানাটার উপর যেখানে ক্লারিমোঁদে রাজকীয় মহিমায় শুয়ে আছে। অন্য সকলেই ঘর থেকে চলে গেছে। সোনার দড়ি দিয়ে ঝোলানো ফুলে-সাজানো লাল মশারির ভিতর দিয়ে মৃতাঁকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ; দুই হাত বুকের উপর রেখে টান-টান হয়ে শুয়ে আছে। খুব সাদা চকচকে একটা সুতীর অবগুণ্ঠনে ঢাকা, গাঢ় লাল রংয়ের পর্দার জন্য আরও বেশি সাদা মনে হচ্ছে। শব-আবরণীটা এত সূক্ষ্ম যে সুন্দর দেহটা যেন তার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে ; হাঁসের গলার মতো ঢেউ-খেলানো নরম, মধুর দেহভঙ্গিমাকে মৃত্যুও কঠিন করে তুলতে পারেনি। সে যেন কোন রানীর সমাধির জন্য নিপুণ শিল্পীর হাতে খোদাই-করা মর্মর-মূর্তির মতোই সুন্দরী ; সদ্য ঝরা বরফের নিচে নিদ্রামগ্ন তরুণীর মতোই সুন্দরী।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। প্রেম-নিকুঞ্জের এই বাতাস, ঝরে-পড়া গোলাপের সুবাস আমাকে মাতাল করে তুলল। ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম ; প্রতিবার বাঁক নেবার আগে একবার করে চোখ পড়ছে স্বচ্ছ শব-আবরণে ঢাকা সেই সুন্দরীর দিকে। নানা বিচিত্র চিন্তা মাথায় আসছে। মনে মনে ভাবলাম, সে হয়তো সত্যি মারা যায়নি, আমাকে তার দুর্গের ভিতরে নিয়ে আসার এবং আমাকে তার প্রেমের সব কথা বলার এটা হয়তো একটা কৌশলমাত্র। এমনকি, একবার মনেও হল, সাদা আবরণীর নিচে তার পাটা বোধ হয় নড়ে উঠল, শব-আচ্ছাদনের শক্ত রেখাটা যেন একটু ভেঙে গেল।

নিজেকে প্রশ্ন করলাম, "এ কি সত্যি ক্লারিমোঁদে ? তার কি প্রমাণ আমার আছে ?

কৃষ্ণকায় চাকরটি তো অন্য কোন মহিলার কাছেও চাকরি নিয়ে থাকতে পারে। কেন আমি এভাবে পাগলের মতো নিজেকে বিচলিত করছি!"

কিন্তু আমার বুকের টিপ্-টিপ্ শব্দই যেন জবাব দিল।

"এ সেই...এ সেই!"

বিছানার আরও কাছে এগিয়ে গেলাম; নতুন মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখলাম। স্বীকার করব কি? মৃত্যুতে পরিম্লান ও পবিত্র হয়ে ওঠা সত্ত্বেও তার অপরূপ সৌন্দর্য আমার অন্তরকে উদ্বেল করে তুলল; দীর্ঘ বিশ্রামের ফলে তাকে দেখাচ্ছে নিদ্রামগ্ন কোন জীবন্ত নারীর মতো। ভুলে গেলাম যে আমি সেখানে এসেছি একটি শবদেহকে পাহারা দিতে; স্বপ্নের ঘোরে আমার মনে হল, আমি যেন অবগুণ্ঠিতা, অর্ধ-লুক্কায়িত কোন বধূর শয়নকক্ষের দ্বারে সমাগত এক তরুণ বর।

দুঃখে ভগ্নহৃদয়, আনন্দে উন্মত্ত, ভয়ে ও বাসনায় কম্পমান অন্তরে সেই স্বপ্নলোকের বধূর উপর ঝুঁকে পড়ে তার আচ্ছাদনের একটি কোণ তুলে ধরলাম। তুললাম অতি সন্তর্পণে শ্বাসরুদ্ধ করে, পাছে তার ঘুম ভাঙিয়ে ফেলি। রক্তের স্রোত এমন তীব্রগতিতে বইতে লাগল যে কপালের শিরার ভিতরে যেন তার কল্লোল-ধ্বনি শুনতে পেলাম। ভুরু ঘামে ভিজে উঠল, আমি যেন একটা পাতলা চাদর তুলিনি, তুলেছি একটা ভারী পাথর।

ওই তো শুয়ে আছে ক্লারিমোঁদে; যেদিন আমি পুরোহিতপদে অভিষিক্ত হয়েছিলাম সেদিনও ঠিক এমনি দেখতে ছিল। তার বিবর্ণ গাল, মৃত ঠোঁট দুটির প্রবাল বর্ণ, মর্মরশুভ্র গালের উপর নিমীলিত চোখের পাতার বাদামী আঁখিপক্ষ—সবকিছু মিলিয়ে ফুটে উঠেছে একটি বিষণ্ন পবিত্রতার ভাব, বিষাদময় ধৈর্যের এক সহর্ষ যাদুর শক্তি। ছোট ছোট নীল ফুল ছড়ানো দীর্ঘ খোলা কেশরাশির উপর মাথাটা শায়িত; তাতে ঢাকা পড়েছে ঘাড়ের নরম মাংসের শ্বেত সৌন্দর্য। সুন্দর দু'খানি হাত ভাঁজ করা। বাহুর হাতির দাঁতের উজ্জ্বলতা ও কমনীয় ডৌলটি মৃত্যুতেও যেন পরম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

নীরবে তার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম; যত দেখেছি ততই মনে হচ্ছে এই সুন্দর দেহ থেকে জীবন হয়তো চিরতরে বিদায় নেয়নি। দৃষ্টি-বিভ্রম নাকি আলোর প্রতিফলন তা জানি না, কিন্তু মনে হল তার মৃত্যুপাণ্ডুর মাংসের নিচে যেন রক্তের স্রোত আবার বইতে শুরু করেছে; অথচ সে তো অনন্তকালের জন্য অনড়, অচল হয়েই শুয়ে আছে। তার হাতখানা স্পর্শ করলাম, হাতটা ঠাণ্ডা, কিন্তু সেদিন গির্জার বারান্দায় যখন তার হাতে হাত ছুঁয়েছিল তখনকার চাইতে বেশি ঠাণ্ডা তো নয়।

পুরনো অভ্যাসমতো আবার তার মুখের পর ঝুঁকে দাঁড়ালাম; আমার চোখের জলের তপ্ত শিশিরবিন্দুগুলো তাকে বৃষ্টিধারার মতো ভিজিয়ে দিল। হায়, অক্ষমতা ও হতাশার কী তিক্ততা! হায়, এই মৃত্যু-প্রতীক্ষা কী তীব্র যন্ত্রণাময়! রাত বাড়ছে।

বুঝতে পারলাম অনন্ত বিচ্ছেদ সমাসন্ন; যে দুটি মৃত ওষ্ঠ আমার সব ভালবাসাকে ধরে রেখেছে তাতে একটি চুম্বন এঁকে দেবার শেষ বিষণ্ণ সুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে পারলাম না।

আহা কী অলৌকিক ঘটনা! একটি হাল্কা প্রশ্বাস মিশে গেল আমার নিশ্বাসের সঙ্গে; আমার স্পর্শের প্রতিদান দিল ক্লারিমোঁদে! সে চোখ মেলল; তা থেকে ঝরে পড়ল নরম আলো। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, দুই হাত ছড়িয়ে দিল, মুগ্ধ উল্লাসে আমার গলা জড়িয়ে ধরল,—

"আঃ, রোমল্ড, তুমি!" সে কথা বলল; বেহালার শেষ কম্পমান সুরের মতো মিষ্টি ও বিলীয়মান সে কণ্ঠস্বর। "আঃ, রোমল্ড, তুমি কেন এখানে এসেছ? তোমার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে আজ আমি মৃত। তবু এখন আমরা বাকদত্ত, মিলনে অঙ্গীকারবদ্ধ; এখন আমি তোমাকে দেখতে পারি, তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি। বিদায় রোমল্ড, বিদায়! আমি তোমাকে ভালবাসি। শুধু এই কথাটাই তোমাকে বলার ছিল; একটি চুম্বনের সঙ্গে যে জীবন তুমি আমাকে দান করেছ আবার আমি সে জীবন তোমাকেই দিলাম। অচিরেই আবার আমাদের দেখা হবে।"

তার মাথাটা ঝুলে পড়ল, কিন্তু হাত দুটি আমাকে জড়িয়ে ধরেই থাকল, যেন সে চিরদিন আমাকে ধরে রাখবে। একঝাপ্টা দুরন্ত হাওয়া জানালাটাকে খুলে ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকল। শ্বেত গোলাপের শেষ পাপড়িটি পাখির ডানার মতো ডাঁটার উপরে কাঁপতে লাগল, তারপর ঝরে পড়ে খোলা জানালা দিয়ে উড়ে গেল; সঙ্গে করে নিয়ে গেল ক্লারিমোঁদের আত্মাকে।

বাতিটা নিভে গেল; সুন্দর শবদেহের বুকের উপর আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন পুরোহিতের বাসভবনে আমার ছোট ঘরটাতেই আমি শুয়ে আছি। হাতটা চাদরের ভিতর থেকে বাইরে ঝুলে পড়েছে, আর বুড়ো কুকুরটা সেটা চাটছে। বারবার কাঁপতে কাঁপতে ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে, একটার পর একটা টানা খুলছে আর বন্ধ করছে, গুঁড়ো ওষুধ গ্লাসে ঢেলে ঝাঁকাচ্ছে। আমাকে চোখ মেলতে দেখে বৃদ্ধা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ শব্দ করে লেজ নাড়াতে লাগল; কিন্তু আমি তখন এত দুর্বল যে একটা কথা বলার বা সামান্য নড়াচড়া করার শক্তিও আমার নেই। পরে জেনেছিলাম, তিন দিন আমি এই একইভাবে শুয়েছিলাম, ন্যূনতম শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া জীবনের আর কোন লক্ষণই আমার মধ্যে ছিল না। এই তিনটে দিন আমার জীবনের গণনার মধ্যে আসে না; সেই তিনটে দিন আমার আত্মা যে কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছিল তা আমি জানি না, তার তিলমাত্র স্মৃতিও আমার নেই। বারবারা আমাকে বলেছে, তামাটে রংয়ের যে লোকটি রাতে আমাকে নিতে এসেছিল পরদিন সকালে সেই আমাকে একটা ঢাকা পাল্কিতে করে ফিরিয়ে এনে সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়েছিল। চিন্তার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ামাত্রই সেই মারাত্মক রাতের প্রতিটি ঘটনাকে আমি বিচার করতে লাগলাম। প্রথমে মনে হল, কোন সুকৌশল যাদুবিদ্যা আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অচিরেই কতকগুলি

প্রকৃত বাস্তব ঘটনা সে ধারণাকে নস্যাৎ করে দিল। আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তাও বলতে পারি না, কারণ আমার মতোই বারবারাও দুটি কয়লা-কালো ঘোড়াসহ সেই লোকটিকে দেখেছিল এবং তার যথাযথ বর্ণনাও সে দিল। অথচ যে দুর্গের মধ্যে আমি ক্লারিমোঁদেকে পুনরায় দেখেছিলাম, এতদঞ্চলে সেরকম কোন দুর্গের কথা কেউ জানে না।

একদিন সকালে সেরাপিয়ন আমার ঘরে এলেন ; বারবারার চিঠিতে আমার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি অতি দ্রুত চলে এসেছেন।

যদিও এতে আমার প্রতি তাঁর স্নেহ প্রকাশ পেল, তবু তিনি আমাকে দেখতে আসায় আমি মোটেই খুশি হলাম না। সেরাপিয়নের চোখের দৃষ্টি এমনই সপ্রশ্ন ও অন্তর্ভেদী যে তার উপস্থিতিতে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। আমার মনের এই গোপন চাঞ্চল্যকে তিনিই প্রথম ধরতে পেরেছিলেন ; এতটা স্বচ্ছদৃষ্টির অধিকারী হওয়ায় তাঁর প্রতি আমি কিছুটা বিরূপই হয়েছিলাম।

তিনি যখন মধুমাখা কপটতার সঙ্গে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন তখনও তাঁর সিংহের মতো হলুদ দুটি চোখ আমার অন্তরের গভীরে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

একসময় তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, "বিখ্যাত বারবনিতা ক্লারিমোঁদে মারা গেছে—মারা গেছে আটদিনব্যাপী এক হৈ-হুল্লোড়ের শেষে। বল্‌বাজার অথবা ক্লিওপেট্রার স্মরণে একটা ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল। হা ঈশ্বর, কী দিনকালই না পড়েছে ! কালো কালো ক্রীতদাসরা অতিথিদের খাবার পরিবেশন করেছে ; তারা যে ভাষায় কথা বলেছে তা কোন মানুষ বোঝে না : তারা যেন অন্ধকার গহ্বর হতে উঠে আসা প্রেতাত্মার দল। তাদের মধ্যে যে সকলের নিচে তার সাজপোশাক দেখেও মনে হবে যেন কোন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক হচ্ছে। এই ক্লারিমোঁদে সম্পর্কে অনেক কথাই রচনা করা হয়ে থাকে ; তার প্রেমিকরা সকলেই শোচনীয়ভাবে বা নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে। লোকে বলে সে একটি প্রেতাত্মা, রক্তচোষা বাদুড়, কিন্তু আমার বিশ্বাস সে স্বয়ং শয়তান।"

তিনি থামলেন। আমাকে দেখতে লাগলেন। ক্লারিমোদের নাম শুনে আমি হঠাৎ চমকে না উঠে পারিনি।

কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে সেরাপিয়ন বললেন, "শয়তানের থাবা বড় লম্বা ; আজ পর্যন্ত অনেক কবর থেকে শব খোয়া গেছে। ক্লারিমোঁদের কবরে তিন-ডবল শিলমোহর করতে হবে, কারণ লোকে বলে এই প্রথমবার তার মৃত্যু হয়নি। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন রোমল্ড।"

এই পর্যন্ত বলে সেরাপিয়ন ধীর পদক্ষেপে চলে গেলেন।

* * *

দিন কাটে।

আমি আবার ভাল হয়ে উঠেছি। এখন মনে হয়, সেরাপিয়নের আশংকা এবং আমার আতংক দুই-ই বড় বেশি হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম...পাত্র থেকে স্বল্প কয়েকটি ফোঁটা সবে মুখে ঢেলেছি এমন সময় আমার বিছানার মশারি ফাঁক হয়ে যাবার শব্দ শুনতে পেলাম, আর ঘণ্টাগুলো বেজে উঠল। হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে যাকে দেখলাম তাকে সরাসরিই ক্লারিমোঁদে বলে চিনতে পারলাম।

তার হাতে একটা ছোট বাতি যা সাধারণত কবরে রাখা হয়। বাতির আলো পড়ে তার সুন্দর আঙুলগুলোতে যে গোলাপী আভা ফুটে উঠল সেটা ধীরে ধীরে তার হাতের দুগ্ধশুভ্র রংয়ের সাথে মিশে গেল।

যে চাদরের শবাচ্ছাদনে ঢাকা অবস্থায় সে শুয়েছিল, তার পরনে সেটা ছাড়া আর কিছুই নেই। তাকে এত সাদা দেখাচ্ছে যে বাতিরই ম্লান আলোয় তার শবাচ্ছাদন ও তার শরীর যেন এক হয়ে মিশে গেছে।

এই রকম সূক্ষ্ম বস্ত্রের আবরণে ঢাকা থাকায় তার দেহের প্রতিটি রেখা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে; ফলে তাকে দেখে একটি জীবন্ত নারীর পরিবর্তে স্নানরতা কোন মহিলার মর্মর-মূর্তি বলেই মনে হচ্ছে। মৃত হোক আর জীবিত হোক, মূর্তি হোক আর নারী হোক, বিদেহী আত্মা হোক আর রক্ত-মাংসের মানুষ হোক, তার রূপ কিন্তু সেই একই রকম আছে, শুধু সমুদ্রসবুজ চোখের ঝিলিক কিছুটা নিষ্প্রভ হয়েছে—শুধু লাল মুখখানিতে লেগেছে তার শ্বেত গোলাপী গালের মতোই ঈষৎ গোলাপী ছোঁয়া। তার চুলে যে ছোট ছোট নীল ফুলগুলো দেখেছিলাম সেগুলো এখন শুকিয়ে গেছে; তাদের ফোটার বাহার আর নেই, তথাপি সে এতই আকর্ষণীয়া, এত বেশি মনোহারিণী যে তার এই বিচিত্র অভিযান, আমার ঘরে এই দুর্বোধ্য আগমন সত্ত্বেও আমি মুহূর্তের জন্যও ভয় পেলাম না।

টেবিলের উপর বাতিটা রেখে সে আমার বিছানার পায়ের দিকটাতে বসল। তারপর যে নরম রুপোলি উচ্চারণ একমাত্র তার দুটি ঠোঁট ছাড়া আর কোথাও কোনদিন শুনিনি সেই ভঙ্গিতে সে বলতে লাগল—

"তোমাকে আমি দীর্ঘকাল প্রতীক্ষায় রেখেছি; তুমি হয়তো ভেবেছিলে আমি তোমাকে ভুলে গেছি। কিন্তু দেখ, আমি এসেছি, বহু বহু দূর থেকে এসেছি—এমনকি এসেছি সেই দেশ থেকে যেখান থেকে কোন যাত্রী কোনদিন ফিরে আসে না। যে দেশ থেকে আমি এসেছি সেখানে সূর্যের আলো নেই, চাঁদ নেই, আছে শুধু ছায়া ও মহাশূন্য। সেখানে পায়ের কোন বিশ্রাম নেই, পথ চলার নেই কোন শেষ; তথাপি আমি এখানে এসেছি—আমাকে দেখ, কারণ প্রেম মৃত্যুকেও জয় করতে পারে। আহা আমার যাত্রাপথে কত বিষণ্ণ মুখ ও ভয়ংকর চোখ আমি দেখেছি। আমার দেহকে খুঁজে বের করতে এবং তার মধ্যে নতুন করে বাসা বাঁধতে আমার আত্মাকে কত কষ্টই না করতে হয়েছে! আমাকে ঢেকে দিতে যে পাথরখানা তারা বসিয়েছিল সেটাকে তুলতে কী কষ্ট! দেখ, সে কাজ করতে গিয়ে আমার হাত

দুটি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে! প্রিয় আমার, সে হাতে তুমি চুমো খাও, ক্ষত সারিয়ে দাও।" ঠাণ্ডা হাত দুটি সে আমার মুখের উপর রাখল, তাতে আমি অনেক চুমো খেলাম, অবর্ণনীয় এক সুখের মাধুর্যভরা হাসিতে আমার দিকে তাকাল।

লজ্জার সঙ্গেই একথা বলছি যে মঠাধিকারী সেরাপিয়নের উপদেশ ও আমার কর্তব্যের পবিত্র স্বরূপকে আমি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। প্রথম আক্রমণেই আমি বিনা বাধায় ধরাশায়ী হলাম। না, সে প্রলোভনকারিণীকে দূরে সরিয়ে দেবার কোন চেষ্টাই আমি করিনি, ক্লারিমোঁদের সুন্দর দেহের তাজা মিষ্টি গন্ধের কাছে বিনা সংগ্রামেই পরাজয় স্বীকার করেছি। আহা বেচারি! যা কিছুই ঘটে থাকুক না কেন, আমি এখনও বিশ্বাস করি না যে সত্যি ছিল শয়তান; তবে আচরণে শয়তানীর কোন লক্ষণই ছিল না। শয়তান আগে কখনও তার থাবা ও শিংকে এত ভালভাবে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। উদাসীন অথচ আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে গোড়ালির উপর ভর রেখে সে আমার বিছানার পাশে উপুড় হয়ে বসেছে। ছোট হাতখানি দিয়ে বারবার আমার মাথার চুলে বিলি কাটছে, যেন চুলের কোন্ ভঙ্গিটা আমার মুখের সঙ্গে মানায় সেটাই পরীক্ষা করে দেখছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তার এই আশ্চর্য কাণ্ডকারখানায় আমি মোটেই বিস্মিত হইনি—বরং স্বপ্নে যেমন অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনাও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে না তেমনি গোটা সাক্ষাৎকারটাই আমার কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে।

"প্রিয়তম রোমল্ড, তোমাকে দেখার আগেই আমি তোমাকে ভালবেসেছি; সর্বত্র তোমাকে খুঁজে বেড়িয়েছি। তুমি ছিলে আমার স্বপ্ন; তারপর সেই চরম মুহূর্তে গির্জায় তোমার দেখা পেলাম। নিজের মনেই বললাম, 'এই তো সে', আর যে ভালবাসা দিয়ে তোমাকে এতদিন ভালবেসেছি, এখনও বাসছি, চিরদিন ভালবাসব, সেই ভালবাসায় পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকালাম; সে দৃষ্টি যেকোন প্রধান পুরোহিতের আত্মার সর্বনাশ ঘটাতে পারত, যেকোন রাজা পারিষদবর্গসহ আমার পায়ে নত হতে পারত।

"কিন্তু তুমি বিচলিত হলে না; আমার ভালবাসার উপর স্থান দিলে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাকে।

"হায়, সেই ঈশ্বরকেই তো আমি ঈর্ষা করি—যে ঈশ্বরকে তুমি ভালবাস, আমার চাইতেও বেশি ভালবাস।

"হতভাগিনী নারী আমি! কখনও তোমাকে সম্পূর্ণ আমার করে পাব না—শুধুই আমার করে, যে আমিকে তুমি জাগিয়ে তুলেছ একটিমাত্র চুম্বনে; যে আমি শুধু তোমারই জন্য কবরের দুয়ার ভেঙে বেরিয়ে এসেছি, বেরিয়ে এসেছি সেই জীবন তোমাকে দিতে যা আমি পুনরায় লাভ করেছি শুধু তোমাকে সুখী করতে।"

এইভাবে সে কথা বলতে লাগল, আর প্রতিটি কথার সঙ্গে উন্মাদ-করা আদরে আদরে আমাকে অভিভূত করে ফেলল, আমার মাথা ঘুরতে লাগল, আর তাকে সান্ত্বনা দিতে ভয়ংকর এক অপবিত্র ভাষা ব্যবহার করতেও আমার ভয় হল না;

বললাম—তার প্রতি আমার ভালবাসা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাকেও অতিক্রম করে গেছে।

নতুন করে জ্বলে উঠল তার চোখের অগ্নিশিখা; গোমেদ মণির মতো জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে লাগল।

দুই হাত বাড়িয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে সে বলল, "ঈশ্বরের প্রতি তোমার যে ভালবাসা, সেই ভালবাসা দিয়ে তুমি আমাকে ভালবেসেছ। তাহলে তো আমার সঙ্গে তোমাকে আসতেই হবে, যেখানে আমি যাব তোমাকেও সেখানেই যেতে হবে। ছেড়ে ফেলতে হবে এই কুৎসিত কালো পোশাক, তুমি হবে সব নাইটের সেরা নাইট, সকলের গর্ব ও ঈর্ষার পাত্র। যে ক্লারিমোঁদে পোপকেও প্রত্যাখ্যান করেছে, তুমি হবে তার স্বীকৃত প্রেমিক! আহা, কী সুখের দিন, আহা, কী সোনালী দিন আমরা পাব। বল তো, কখন আমরা ঘোড়ায় চেপে যাত্রা করব?"

"আগামীকাল," উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে বললাম।

সে বলল, "আগামীকাল। পোশাক বদলাবার সময়টা পাওয়া যাবে? এ পোশাকটা অপর্যাপ্ত, ভ্রমণের উপযোগী নয়। অনুচরদেরও সব কথা বলতে হবে; তারা তো আমাকে মৃত বলেই ধরে নিয়েছে, সাধ্যমতো আমার জন্য শোক করছে। অর্থ, যানবাহন, পোশাক পরিবর্তন—তোমার জন্যও সব ব্যবস্থাই করা হবে; কাল ঠিক এই সময় আমি তোমাকে খুঁজে নেব। বিদায় প্রিয়তম!" ওষ্ঠদ্বয় দিয়ে সে আমার ভুরু স্পর্শ করল, বাতিটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, পর্দাগুলি নেমে এল, সীসের মতো ভারী হয়ে ঘুম নামল আমার চোখে—স্বপ্নহীন ঘুম। স্বপ্নের স্মৃতি নিয়ে ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে; শেষ পর্যন্ত সে স্বপ্নকে রাতের অপচ্ছায়া বলেই মনে হল। তবু মনের ভয় গেল না; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালাম, আমার ঘুমের পবিত্রতা যেন তিনি রক্ষা করেন।

আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম; আবার এল সেই স্বপ্ন। পর্দা সরে গেল, সামনে দাঁড়িয়ে ক্লারিমোঁদে; বিবর্ণ শবাচ্ছাদনে ঢাকা ম্লান মূর্তি নয়, গালে নেই মৃত্যুর বেগুনী আভা; সে এখন আনন্দিত, উজ্জ্বল, চমৎকার; সোনালী পাড় বসানো সবুজ ভেলভেটের ভ্রমণের পোশাক; একপাশে সাটিনের তলবাস দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য সাদা পালক বসানো মস্ত বড় কালো বীভার হ্যাটের নিচ থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ সুন্দর কোঁকড়ানো চুলের রাশি নেমে এসেছে; মাথায় সোনালী বাঁশি বসানো একটা ছোট চাবুক তার হাতে। সেটা দিয়ে আস্তে আমাকে ছুঁয়ে বলল—

"ঘুমন্ত সুন্দর, জাগো! এইভাবে কি তুমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ? আমি তো ভেবেছিলাম তোমাকে প্রস্তুতই দেখব। ওঠ, শীঘ্র ওঠ; নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই।"

বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠলাম।

হাতের ছোট প্যাকেটটা দেখিয়ে বলল, "এস, পোশাক পরে নাও, রওনা হতে

হবে। ফটকে ঘোড়া দুটো পা ছুঁড়ছে, দাঁত কামড়াচ্ছে। এখান থেকে দশ লীগ দূরে যেতে হবে।"

সে নির্দেশ দিতে লাগল, নাইটের নানারকম সাজ-পোশাক আমার হাতে তুলে দিল, আর আমি তালগোল পাকিয়ে ফেলায় হাসতে লাগল। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। সে আমার চুল আঁচড়ে দিল; সবকিছু হয়ে গেলে রুপো-বাঁধানো একটা ছোট ভেনিস পকেট-আয়না দিয়ে বলে উঠল—

"এখন নিজেকে কেমন মনে হচ্ছে? এবার আমাকে তোমার শয়ন-কক্ষের দাসী করে নেবে তো?"

আয়নায় নিজের মুখ আমি চিনতে পারলাম না; কাটার আগেকার পাথর যেমন মূর্তির মতো থাকে না, আমিও যেন আর আমার মতো নেই। সুন্দর হয়ে উঠেছি, এ পরিবর্তনের জন্য গর্ব বোধ করছি। সোনালী কাজ-করা বীরের পোশাক আমাকে অন্য মানুষ করে তুলেছে; বিশেষ কৌশলে সাজানো কয়েক গজ কাপড়ের এই যাদুর খেলা দেখে আমার বিস্ময়ের শেষ রইল না। এই পোশাকের চরিত্রই যেন আমার চরিত্র হয়ে গেছে, দশ মিনিটের মধ্যেই যথেষ্ট দাম্ভিক হয়ে উঠেছি। যেন নতুন পোশাকটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই ঘরময় হাঁটতে লাগলাম; ক্লারিমোঁদে মাতৃসুলভ স্নেহে আমাকে দেখতে লাগল। তারপর—সে চেঁচিয়ে বলল, "চল, যথেষ্ট ছেলেমানুষী হয়েছে। রোমল্ড আমার, এবার ঘোড়ায় চড়ে ছোটা! আমাদের অনেক দূর যেতে হবে; কোনদিন পৌঁছনো হবে না।"

সে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। তার ছোঁয়ায় ফটক খুলে গেল; কুকুরটার পাশ দিয়ে গেলাম, তার ঘুম ভাঙল না।

ফটকে দেখলাম, সহিস তিনটে ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; আগেকার ঘোড়ার মতোই স্পেনীয় ঘোড়া, বাতাসের বেগে ছুটতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা একটা মাঠে পৌঁছলাম, সেখানে একখানা গাড়ি ও চারটে ঘোড়া আমাদের জন্যই অপেক্ষা করে আছে। কোচযান দুরন্ত বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এক হাতে জড়িয়ে ধরলাম ক্লারিমোঁদের কোমর, তার মাথা আমার কাঁধে, তার বুক চেপে রইল আমার দেহে। তখন থেকেই শুরু হল আমার দ্বৈত জীবন; আমার মধ্যে বাস করতে লাগল এমন দুটি মানুষ যারা পরস্পরকে চেনে না—একটি পুরোহিত যে স্বপ্ন দেখে যে রাতে সে হয়ে যায় একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ, আবার সম্ভ্রান্ত পুরুষটি স্বপ্ন দেখে যে রাতে সে হয়ে যায় একজন পুরোহিত।

অবশ্যই আমি তখন ছিলাম ভেনিসে, গ্র্যান্ড ক্যাস্‌লের উপরে একটি মস্ত বড প্রাসাদে, অন্তত আমি তাই মনে করতাম। ক্লারিমোঁদে বিলাসবহুল জীবন পছন্দ করে। চিরাচরিত প্রথা তাকে সাধারণ করে তুলতে পারেনি। তাকে ভালবাসা মানেই এককুড়ি প্রিয়াকে ভালবাসা। আমার ভালবাসাকে যে শতগুণ করে ফিরিয়ে দেয়। একসময় সে কিছুদিন অসুস্থ ছিল; সেই সময় একদিন আমি হাতটা কেটে ফেললাম; সঙ্গে সঙ্গে সে আমার ক্ষতস্থান থেকে রক্তটা চুষে নিল।

সোচ্চারে বলল, "আমি মরব না! আমি মরব না! এখনও অনেক কাল আমি তোমাকে ভালবাসব, কারণ আমার জীবন তো তোমার জীবনের মধ্যেই বেঁচে আছে। তোমার রক্তই তো আমার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে!"

এই ঘটনা ও তার বিচিত্র আতংক অনেকদিন পর্যন্ত আমাকে তাড়া করে ফিরেছে।

সেরাপিয়ন প্রায়ই আমাকে বকেন। একদিন তিনি বললেন—

"যে দানবী তোমাকে ভর করেছে তাকে তাড়াবার একটিমাত্র উপায় আছে। আমি জানি ক্লারিমোঁদেকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে। তাকে মাটি খুঁড়ে তুলতে হবে; মৃত্যুর কীট ও ধুলোর দৃশ্য দেখলেই তুমি আবার আত্মস্থ হতে পারবে।"

দ্বৈত জীবন নিয়ে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে তাঁর প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম, আর মধ্যরাত্রে তার কবরের শিলালিপি খুঁজে বের করলাম। তার উপরে এই কথাগুলি পড়লাম :

ICI GIT CLARIMONDE,
QUI FUT DE SON VIVANT
LA PLUS BELLE DU MONDE

শেষ পর্যন্ত সেরাপিয়নের গাঁইতি শবাধারের ঢাকনাটা খুলে সেটাকে তুলে ধরল, আর আমি দেখলাম ক্লারিমোঁদেকে—তার পাণ্ডুর মুখের উপর একফোঁটা রক্ত চিকচিক করছে।

সেরাপিয়ন সক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন—

"আঃ, এখানেই তুমি আছ...শয়তান, বারজীবিনী, রক্তচোষা বাদুড়; তুমিই মানুষের রক্ত চুষে খাও!"

এই কথা বলে তিনি তার উপর পবিত্র বারি ছিটিয়ে দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সে ধুলো হয়ে গুঁড়িয়ে গেল।

তিনি বললেন, "স্যার রোমল্ড, ওই তোমার প্রিয়া শুয়ে আছে; এবার যাও, তোমার সুন্দরীকে নিয়ে লিডোতে গিয়ে খেলা করোগে।"

মাথা নিচু করলাম। অন্তরের মধ্যে শুধুই ধ্বংসস্তূপ। আমার অতি সাধারণ পুরোহিতের বাড়িতে ফিরে গেলাম। প্রেমিক রোমল্ড পুরোহিতকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাল। কিন্তু পরদিন রাতে আবার ক্লারিমোঁদেকে দেখলাম।

চিৎকার করে সে বলল, "হতভাগ্য পুরুষ, এ তুমি কি করলে? কেন ঐ মূর্খ পুরোহিতের কথায় কান দিলে? আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি যে তুমি আমার কবরকে অপবিত্র করলে? এখন থেকে আমাদের দেহ ও আত্মার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। তবু তুমি আমাকে কামনা করবে। বিদায়!"

তারপর সে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। আর কোনদিন তাকে দেখতে পাইনি।...হায়! সে তো সত্য কথাই বলেছিল; আজও তাকে আমি কামনা করি। বড় বেশি দামে আমার মুক্তিকে কিনেছি, আমার প্রভুর ভালবাসা তো তার ভালবাসার ক্ষতিপূরণ করতে পারেনি।

ভাইরে, এই আমার যৌবনের কাহিনী।

তোমাব চোখ যেন কোন নারীকে না দেখে। পথ চলবে শুধু মাটির দিকে চোখ বেখে। কাবণ, যত পবিত্র ও শান্তই হও না কেন, একটি মুহূর্ত তোমাকে অনন্তকালের জন্য অভিশপ্ত করে তুলতে পারে।

অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত

কালো কফি

Black Coffe—জোন জ্যাফাযাব ফাবনল

অধ্যাপক জার্ভিস নানা তথ্যসম্বলিত বইয়েব স্তূপেব মধ্যে বসে আছেন; নানা মন্তব্য ও টুকিটাকি লেখা কাগজপত্র চাবিদিকে ছড়িয়ে আছে, কলমেব খসখস শব্দ ছাড়া একটা নিববচ্ছিন্ন নীববতা তাঁকে ঘিবে বয়েছে।

অধ্যাপক জার্ভিস সববকম হৈ-হল্লাকেই ঘৃণা কবেন, কাবণ যে অবিচ্ছিন্ন চিন্তা, প্রমাণিত ঘটনাবলী থেকে প্রাথমিক অনুমানে যাওযাব যে প্রস্তুতিকে তিনি বেঁচে থাকাব প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে মনে কবেন, হৈ-হল্লা তাকে নষ্ট কবে দেয়; তাই তিনি থাকেন বাড়িব ত্রিশ তলায়।

প্রায একমাস হল খানসামা জন ছাড়া আব কাউকে তিনি চোখে দেখেননি; এই বড় শহবটাব একেবাবে মাথায বাতেব পব বাত জেগে বসে থেকে তিনি সেই কাজটিব মধ্যেই ডুবে আছেন, অনেক বছব ধবে যাব স্বপ্ন তিনি দেখছেন—"দর্শনেব উচ্চতব নীতিশাস্ত্র" বিষয়ক একখানি গ্রন্থ বচনাব কাজ, আব সে কাজটি প্রায় সমাপ্তিব মুখে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ কাজেব নেশা যেন তাকে পেয়ে বসেছে, সে নেশা শয়তানেব মতো নিষ্ঠুর, নির্দয়,—জটিল চিন্তা ও স্নায়ুছিন্নকাবী পাবশ্রমেব চাপেব হাত থেকে সে নেশা তিলমাত্র বেহাই দেয না; তাই বাতেব পব বাত অধ্যাপক কেবল লিখেই চলেছেন; ইদানীং যৎসামান্য ঘুম ও অনেক বেশি কালো কফি নিয়েই তাঁর দিন কাটছে।

আজ বাতে কিন্তু তিনি একটা বিচিত্র ক্লান্তি বোধ কবছেন। কলমটা নামিয়ে বেখে ধুক ধুক কবা কপালটাকে দুই হাতেব মধ্যে ধবে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সামনে বাখা পাণ্ডুলিপিব পাতাব দিকে।

এইভাবে ঝুঁকে বসে গত কয়েকদিন যাবৎ যে বমিব ভাবটা মাঝে মাঝেই দেখা [illegible] করতে গিয়ে ঠাসাঠাসিভাবে লেখা দীর্ঘ পংক্তিগুলো

যেন তাঁর চোখে জীবন্ত "বস্তু" হয়ে দেখা দিল; সেগুলি যেন হাজার পা মেলে সাদা কাগজের উপর ইতস্তত হেঁটে বেড়াচ্ছে।

অধ্যাপক জার্ভিস চোখ বুজে ক্লান্তিসূচক নিশ্বাস ফেললেন। নিজের মনেই বললেন, "এবার একটু ঘুমোতেই হবে। কখন যে শেষ ঘুমিয়েছি কে জানে?" বলতে বলতে তিনি শরীরটাকে টান করে একটা হাই তুলতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর দৃষ্টি টেবিলের উপরকার বাতির উপরে এসে থেমে গেল; সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, সেই "বস্তুগুলি" কাগজের উপর থেকে উঠে এসে এঁকেবেঁকে সবুজ ঢাকনাটা বেয়ে উঠছে। তিনি আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন; বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটার জন্য পাশের কাগজপত্রগুলি হাতড়াতে লাগলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হল, বাতিটার আলোর পিছনে ঘনায়মান ছায়ার ভিতর থেকে জনের অস্পষ্ট দূরাগত কণ্ঠস্বর যেন তাঁর কানে এল।

অধ্যাপক বললেন, "তুমি যদি সত্যি ওখানে এসে থাক তাহলে দয়া করে সুইচটা জ্বালিয়ে দাও। আচ্ছা জন, আমি শেষ কখন ঘুমিয়েছিলাম বল তো?"

"সে কি স্যার? আজ এক সপ্তাহ হল আপনি তো ঠিকমতো ঘুমোননি; কখনও-সখনও কোচে বসে একটু ঝিমুনি দিযেছেন মাত্র; কিন্তু স্যার সেটা তো কিছুই না; দেখুন স্যার, আমার কথা যদি শোনেন তো বলি, এই মুহূর্তে ঘুমাতে যাওয়াটাই আপনার পক্ষে সবচাইতে ভাল কাজ।"

"হুম!" অধ্যাপক বললেন। "তোমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জন; পরামর্শটা ভাল হলেও অবাস্তব। এখন আমি শেষ অধ্যায়টি লেখার কাজে ব্যস্ত; সেটা শেষ না করে ঘুমানো অসম্ভব।"

জন আবার বলতে শুরু করল, "আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি স্যার, পোশাক ছেড়ে ভাল মতো ঘুমাবার একটু চেষ্টা—"

তাঁর শান্ত স্বভাবের সঙ্গে নেহাৎই বেমানানভাবে হঠাৎ রেগে গিযে অধ্যাপক চেঁচিয়ে বললেন, "বোকার মতো কথা বলো না জন! তুমি কি মনে কর ঘুমাতে পারলে আমি ঘুমাতাম না? দেখতে পাচ্ছ না, আমি ঘুমাতেই চাইছি। তোমাকে বলছি, ঘুমাতে পারলে নিশ্চয়ই ঘুমাতাম, কিন্তু পারছি না—আমি জানি বইটা শেষ না করা পর্যন্ত আমার কপালে বিশ্রাম নেই, আর শেষ করতে প্রায ভোর হয়ে যাবে।" অধ্যাপক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জনের দিকে তাকালেন; তাঁর ঘন ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে, ডিমের মতো পাণ্ডুর মুখে চোখ দুটি জ্বলছে অপ্রীতিকর দীপ্তিতে।

"এত বেশি কালো কফি খাওযাটা যদি ছেড়ে দিতেন স্যার; লোকে বলে ওটা স্নায়ুর পক্ষে খুবই খারাপ—"

চিরদিনের মতো শান্ত গলায় অধ্যাপক এবার বললেন, "আমিও মনে করি তারা ঠিকই বলে। হ্যাঁ, আমিও তাই মনে করি। যেমন ধর, এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে ঐ পর্দাটার আড়ালে একটা হাত কি যেন হাতড়ে বেড়াচ্ছে। অথচ এই মানসিক অবস্থাটা আমার শেষ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে; সেখানেও প্রকৃতির

মানস শক্তির কথাই বলা হয়েছে। জন, আমি বিশেষ করে নিম্নোক্ত অংশটির উল্লেখ করছি:

'যে রহস্যময় শক্তিকে অনেকে আত্মা বলে, যথেষ্ট শিক্ষণলাভ করলে সে কিছু সময়ের জন্য এই রক্ত-মাংসের দেহটাকে ছেড়ে বাতাসের ঘাড়ে চেপে, সমুদ্র ও নদীর বুকের উপর দিয়ে হেঁটে অন্তহীন মহাশূন্যে পাড়ি জমাতে পারে, এবং যারা অনেকদিন আগে মারা গেছে তাদের দেহের মধ্যেও নতুন করে বাসা বাঁধতে পারে, অবশ্য সে সব দেহ যদি নিষ্কলুষ থাকে।' অধ্যাপক তাঁর চেয়ারে হেলান দিয়ে সোচ্চার চিন্তার মতোই বলতে লাগলেন:

"অনেক শতাব্দী আগে মানুষ এসব জানত, বিশেষ করে আইসিস ও আদি চেল্ডীয়রা তো জানতই; আজও কোন কোন অঞ্চলে ভারতবর্ষের ফকিররা এবং তিব্বতের লামারা এসব অনুশীলন করে থাকে; অথচ অজ্ঞান জগৎ এসব কাজকে সস্তা চালবাজি ছাড়া আর কিছুই মনে করে না।" হঠাৎ জনের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে বলে উঠলেন, "ভাল কথা, তুমি কি আগামীকাল পর্যন্ত ছুটি চেয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ স্যার, তা চেয়েছিলাম," জন স্বীকার করল, "তবে পরে ভাবলাম ছুটিটা এখন থাক, কারণ আপনি এখন এত—এত ব্যস্ত স্যার।"

"বাজে কথা। আজকের সন্ধ্যাটা নষ্ট করো না, এতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। শোন জন, সামোভারে আরও কিছুটা কফি তৈরি করে রেখে তারপরই তুমি চলে যেতে পার।" কিছুটা ইতস্তত করেও অধ্যাপকের চোখেব দিকে তাকিয়ে জন হুকুম মতোই কাজ করল। ধূমায়মান সামোভারটাকে টেবিলের উপর মনিবের হাতের কাছে রেখে দিয়ে এবং ঘরটাকে ঠিকঠাক করে দিয়ে সে দরজার দিকে মুখ ফেরাল।

"সকাল আটটায় আমি ফিরে আসব স্যার।"

কফিতে চুমুক দিতে দিতে অধ্যাপক বললেন, "খুব ভাল কথা জন। শুভরাত্রি।"

প্রত্যুত্তরে "শুভরাত্রি স্যার" বলে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে মাথাটা নাড়তে নাড়তে জন একমুহূর্ত দাঁড়াল। অস্ফুট স্বরে বলল, "ওঁকে একলা রেখে যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমি তো সকাল আটটার আগেই ফিরে আসব; হ্যাঁ, আটটার আগে ফিরতে যথেষ্ট চেষ্টা করব।" এই কথা বলে সে ধীরে ধীরে বারান্দা ধরে এগিয়ে গেল।

২

অধ্যাপক অনেক সময় তাঁর ডেস্কের উপর উপুড় হয়ে বসে রইলেন, অথচ বিগত আধ ঘণ্টার মধ্যে সামনের খোলা পাতায় একটি শব্দও লেখেননি, কারণ তাঁর মস্তিষ্কের ভিতরে কোথায় যেন একটা ছোট হাতুড়ি ধীরে, নিয়মিতভাবে, আস্তে আস্তে ঠুক-ঠুক শব্দ করে চলেছে; ফলে তাঁর চারপাশের স্তব্ধতা আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে। ক্রমে ক্রমে তাঁর মনের মধ্যে একটা অর্থহীন একান্ত প্রত্যাশা যেন হাতুড়ির প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু তার দিকে এগিয়ে আসছে, নিকট হতে নিকটতর হচ্ছে—এমন কিছু যা তিনি ধারণা করতে পারছেন না। আবার ঠেকাতেও পারছেন না, শুধু বুঝতে

পারছেন যে সেটা আসছে, আসছে; একটা অজানাকে জানবার আশায় তিনি কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সহসা যেন নিচের জগতের অনেক দূর থেকে একটা ঘড়িতে মধ্যরাতের ঘণ্টা বেজে উঠল; তার শব্দটা মিলিয়ে যাবার আগেই বাইরের বারান্দায় দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল, একটা টোকা, কে যেন হাতলটা খুঁজছে। অধ্যাপক উঠে দাঁড়াতেই দরজাটা খুলে গেল, আর একটি বেঁটে মতো, শক্তসমর্থ মানুষ দ্রুত পা ফেলে ঘরে ঢুকল। গোলাকার লাল মুখ ও খাড়া-খাড়া পাকা চুলই তার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপকের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে সেইরকম দ্রুততালে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে লোকটি কথা বলতে লাগল যেটা ম্যাগ্‌নাস ম্যাকমেনাস-এর বৈশিষ্ট্য। গত দশ বছর যাবৎ মিশরের নিম্নাঞ্চল ও নীলনদের তীর বরাবর অনুসন্ধান কার্য চালাবার ফলে ম্যাগ্‌নাস ম্যাকমেনাস-এর নামটা বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

তিনি বলতে শুরু করলেন, "প্রিয় ডিক, আরে, তোমাকে এরকম অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন? ভয়ের কথা—যথারীতি অতিরিক্ত পরিশ্রম করছ তো?"

অধ্যাপক সোল্লাসে বলে উঠলেন, "আরে ম্যাগ্‌নাস! আমি তো জানতাম তুমি এখনও মিশরেই আছ?"

"ঠিক জানতে—তাই ছিলাম—একটা নমুনা নিয়ে গত সপ্তাহে ফিরেছি—তিনদিন নিউইয়র্কে ছিলাম—এখনই নীলনদের তীরে ফিরে যেতে হবে—গতকাল টিকিট কেটেছি—জাহাজ ছাড়বে আগামীকাল—দুপুরে। কি জান ডিক," ঘরময় ছুটতে ছুটতেই ম্যাগ্‌নাস বললেন, "তারান্তের কাছ থেকে একটা তার পেয়েছি— তারান্তকে তুমি তো জান, আমাদের খনন-কার্যের ওভারসীয়ার; লিখেছে, তারা একটা একপ্রস্তর স্তম্ভ পেয়েছে—তাতে কপ্টীয় লিপি—আশ্চর্য—গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে—খুব?"

"ঠিক," অধ্যাপক মাথা নাড়লেন।

"তাই তো তোমার কাছে এসেছি ডিক—তোমাকে বলতে এসেছি যে নমুনাটি সঙ্গে করে এনেছি সেটা তোমার কাছে রেখে যাব। আশা করি আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত সেটা তোমার কাছেই রাখতে আপত্তি করবে না।"

"নিশ্চয় রেখে যাবে, অবশ্যই রেখে যাবে," অধ্যাপক অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন।

"নিঃসন্দেহে এটি এ যুগের মহত্তম আবিষ্কার," ম্যাগ্‌নাস বলতে লাগলেন, "বিরাট ব্যাপার—মিশরের ইতিহাসের উপর নতুন আলোকপাত করবে—যতদূর জানা যায় সারা পৃথিবীতে এরকম আর একটা মমিও নেই।"

"কি বললে?" অধ্যাপক চেঁচিয়ে বললেন, "মমি?"

ম্যাগ্‌নাস ঘাড় নাড়লেন, "নিশ্চয়। তবে শব্দটা বোধহয় ঠিক হল না।—সাধারণ শুকনো মমির চাইতেও এটা স্বতন্ত্র কিছু।"

"তুমি—তুমি কি সেটাকে সঙ্গে করে এনেছ ম্যাগ্‌নাস?"

"নিশ্চয়—বাইরের বারান্দাতেই রয়েছে।"

অকারণেই অধ্যাপক ভীষণভাবে কাঁপতে শুরু করলেন, বমির ভাবটা আবার দেখা দিল।

"এমন অসময়ে এখানে নিয়ে এসেছ—তুমি তো জান ওটাকে সরানো নাড়ানো খুব অসুবিধা,"—অধ্যাপক কথা বলতে বলতেই ম্যাগ্‌নাস ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে অনেক গলা শোনা গেল, একটা ভারী জিনিস বয়ে আনার মতো অনেক মানুষের হৈ-চৈ ও পায়ের শব্দ হতে লাগল। আর সেসব ছাপিয়ে কানে এল ম্যাগ্‌নাসের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

"আস্তে—কোণটা সাবধান—আস্তে, আস্তে, ঝাঁকি লাগিও না; এবার আস্তে—ঠিক আছে।" ম্যাগ্‌নাস ঘরে ঢুকলেন, তার পিছনে চারটি লোক প্যাকিং-বাক্স ও শবাধারের মাঝামাঝি আকারের একটা কিছু বয়ে নিয়ে ঢুকল; ম্যাগ্‌নাসের নির্দেশমতো ঘরের একটা সুবিধাজনক কোণে সেটাকে সাবধানে নামিয়ে রাখল।

লোকগুলি চলে গেলে পকেট থেকে একটা ছোট স্ক্রু-ড্রাইভার বের করে ম্যাগ্‌নাস বললেন, "এবার তোমাকে এমন কিছু দেখাব যাতে নিজের চোখকেই তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না—প্রথমে আমিও পারি নি—একটা বিস্ময়কর জিনিস ডিক—যত সমিতি—প্রতিষ্ঠান আছে সব একেবারে বোকার মতো হাঁ করে ঢোক গিলতে থাকবে।"

ম্যাগ্‌নাস একটার পর একটা ঢাকনার স্ক্রুগুলো খুলতে লাগল, আর অধ্যাপক চোখ বড় বড় করে তাকিয়েই রইলেন—অপেক্ষাই করতে লাগলেন।

শেষ স্ক্রুটা খুলতে খুলতে ম্যাগ্‌নাস বললেন, "এই নমুনাটি সুগন্ধি তেলে মৃতদেহ রক্ষার কলাকৌশলের উপর নতুন আলোকপাত করবে। এটা কোন খড়ভর্তি শুকিয়ে-যাওয়া মানুষের নুড়ো নয়। একাজ যে করেছে সে একটি প্রতিভা—নির্ঘাৎ—এক্ষেত্রে পেট থেকে নাড়িভুঁড়িও বের করা হয়নি—এই স্ক্রুটা তো বহাল দেখছি—এর ভিতরে থেকে জীবন যখন প্রথম বেরিয়ে গিয়েছিল, দেহটা আজও ঠিক তেমনি আছে—আমার কথা শোন ডিক—এটা কম করেও ছ'হাজার বছরের পুরনো—হয় তো আরও বেশি পুরনো। আমি বলছি, এটা সব বিস্ময়ের অতীত, কিন্তু এই তো দেখতে পাচ্ছ—এবার নিজেই বিচার কর।" এই কথা বলে স্ক্রু-ড্রাইভারটা এক পাশে রেখে ম্যাগ্‌নাস ভারী ঢাকনাটা তুলে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।

সামনে কাঁচ-লাগানো শবাধারের মধ্যে যে বস্তুটি শুয়ে আছে—অথবা বলা যায় দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে নিলেন, কাঁপা আঙুল দিয়ে হাতল-চেয়ারটাকে-চেপে ধরলেন।

তিনি যা দেখলেন তা কালো চুলের মাঝখানে একখানি ডিমের আকারের মুখ, একটুও কুঁচকে যায়নি, অথচ বীভৎস ছাই ছাই ধূসর রং, পাতলা, খাড়া, বাঁকা নাকে দুটি সুস্পষ্ট নাসারন্ধ্র, মুখের ঠোঁট দু'খানি নীল, তার পরিপূর্ণ নিষ্ঠুর রেখায় এমন একটা ভৌতিক পরিহাস লুকিয়ে আছে, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটা নামহীন আতঙ্ক।

ম্যাগ্‌নাস বললেন, "একসময় বেশ সুন্দরী ছিলেন। খুবই সুন্দরী—নাক, চোখ, মুখ সবই ভাল—একেবারে খাঁটি মিশরীয় ছাঁদ, কিন্তু—"

অধ্যাপক তাড়াতাড়ি যোগ করলেন, "কেমন কেমন যেন শয়তানের মতো মুখ। ওই দুটি আঁখি-পল্লবের নিচে কি আছে জানি না, মনে হচ্ছে যেকোন মুহূর্তে ও দুটি খুলে যেতে পারে, আর তা যদি ঘটে—ওঃ, সে তো ভয়ংকর ব্যাপার হবে।"

ম্যাগ্‌নাস হাসলেন। "জানতাম, এই সুন্দরী তোমাকে চমকে দেবে—বিজ্ঞানকে করবে মূক-বধির—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর এই যে পাথরগুলো," তিনি যেন পরিতৃপ্তির সঙ্গেই বলতে লাগলেন, "ওর গলায় জড়ানো রয়েছে—আস্ত মরকত মণি—এ তো পঞ্চম রাজবংশের আমলের—অথচ ওর বুকের উপরকার ঐ জোনাকিমূর্তিটা, ওটা তো মনে হয় আরও প্রাচীনকালের—ওর জামার জরির কাজ তো আমাকেও হার মানিয়েছে—আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আংটিটার আকৃতি দেখে তো মনে হয় ওটা পঞ্চদশ রাজবংশের আমলের। সব মিলিয়ে ইনি এক বিচিত্র রহস্যময়ী। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ঐ মুখ ও নাসারন্ধ্র—এক ধরনের সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করা—সেগুলো ছাড়াতে অনেক সময় লাগবে।"

তিনি বলেই চললেন, "পাথরের শবাধারের উপর যে শিলালিপি লেখা আছে, তাতে ওকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: 'রমন কাউ রা-র রাজত্বকালে রা বংশের রাজকুমারী হাসুয়েরা।' রমন কাউ রা-র সম্ভবত দ্বিতীয় সেতির অন্য উপাধি। আমি আরও পেয়েছি একটা প্যাপিরাস-পাতা—খুবই গুরুত্বপূর্ণ—ও কয়েকটা শিলালিপি, কোনরকমে সেগুলোতে একবার চোখ বুলিয়েছি মাত্র—কিন্তু যতটুকু বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় এই হাসুয়েরার অনেক সুখ্যাতি ছিল—সে ছিল সেমিরামিস, ক্লিওপেত্রা ও মেসালিনার যোগফলের তিনগুণ। তার অন্যতম প্রেমিক ছিলেন জনৈক পণ্টোমেস, ওরিসিস মন্দিরের প্রধান পুরোহিত; বলা হয়ে থাকে তিনি 'আইসিস ও উচ্চ কোটির দেবতাদের কলা-কৌশল ও গুপ্ত রহস্যের ব্যাপারে খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন।' প্রথম যখন এই পাথরের শবাধারটি খুললাম, তখন এলোমেলো আবরণগুলো দেখে মনে হয়েছিল ইনি বোধহয় নড়াচড়া করছেন, যে সোনার মৃত্যু-মুখোশটি এঁর মুখে আঁটা ছিল সেটাও খুলে পড়ে ছিল—সেটাও তো অদ্ভুত, খুবই অদ্ভুত। মুখোশটা পরীক্ষা করে—কপাল বরাবর একটা শিলালিপি পেয়েছি—দিনের পর দিন সেটা আমাকে ভাবিয়েছে—কিন্তু অর্থটা হঠাৎই পেয়ে গেলাম—বিছানায় শুয়ে—অসম ছন্দের হাসির কবিতার অনুবাদ করলে অর্থটা এইরকম দাঁড়াতে পারে:

'আইসিস ক্ষণ তরে শ্বাসরোধ করেছে আমার,
আমাকে যে জাগাইবে সেই হবে মৃত্যুর শিকার।'

এটাও তো খুব অদ্ভুত, কি বল? আরে, কী আশ্চর্য, তোমার কী হয়েছে?" এই প্রথম বন্ধুর দিকে তাকিয়ে ম্যাগ্‌নাস নিজের কথা থামিয়ে প্রশ্ন করলেন।

সেই গাঢ়স্বরে অধ্যাপক বললেন, "কিছু হয়নি। শুধু এটাকে ঢেকে ফেলো—ঈশ্বরের দোহাই, ঢেকে ফেলো!"

ম্যাগ্নাস বললেন, "নিশ্চয়—অবশ্যই। এটা দেখে তুমি এতটা বিচলিত হবে ধারণা করতে পারিনি। তোমার স্নায়ুগুলি একেবারে তচ্নচ্ হয়ে গেছে, নিজের আরও যত্ন নেওয়া তোমার উচিত ডিক; ওই বাজে কালো কফি খাওয়া বন্ধ করে দাও।"

শেষ স্ক্রুটা আটকে দেওয়া হতেই অধ্যাপক ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। "আঠারোটা স্ক্রু আছে, প্রতিটি প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা, কি বল ম্যাগ্নাস?"

"ঠিক," বলেই ম্যাগ্নাস আবার একদৃষ্টিতে তাকালেন।

সেই একই বিস্ময়কর হাসি হেসে অধ্যাপক বললেন, "ভাল।" ম্যাগ্নাস যেন জোর করে হাসলেন।

বললেন, "আরে ডিক, তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন ধরেই নিয়েছ—"

অধ্যাপক তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "ওই দুটি চোখ আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে। ও দুটি যেন এমন একজনের চোখ যে আচম্বিতে তোমাকে আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করে আছে, চোখ দুটি যেন পিছন থেকে তোমার উপর নজর রেখেছে, তোমাকে অনুসরণ করছে—"

ম্যাগ্নাস তখনই চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "ফুঃ। যত সব বাজে কথা ডিক। এসব কল্পনা ছাড়া কিছু না—স্রেফ কল্পনা! এখনই তোমার কোথাও বেড়াতে যাওয়া উচিত, নইলে এর পরে তুমি মতিভ্রম-রোগে ভুগবে।"

"চুপ করে বসে শোন," বলে অধ্যাপক সামনে খোলা পাণ্ডুলিপি থেকে পড়তে শুরু করলেন:

"যে রহস্যময় শক্তিকে অশেষ আত্মা বলে, যথেষ্ট শিক্ষশলাভ করলে সে কিছু সময়ের জন্য এই রক্ত-মাংসের দেহটাকে ছেড়ে বাতাসের ঘাড়ে চেপে, সমুদ্র ও নদীর বুকের উপর দিয়ে হেঁটে অন্তহীন মহাশূন্যে পাড়ি জমাতে পারে, এবং যারা অনেকদিন আগে মারা গেছে তাদের দেহের মধ্যেও নতুন করে বাসা বাঁধতে পারে, অবশ্য সেসব দেহ যদি নিষ্কলুষ থাকে।"

"হুম!" পায়ের উপর পা তুলে ম্যাগ্নাস বললেন, "তারপর?"

"অবশ্য সেসব দেহ যদি নিষ্কলুষ থাকে," কথাগুলি আর একবার বলে অধ্যাপক হঠাৎ হাত তুলে ঘরের কোণটা দেখিয়ে বলে উঠলেন, "ওটা তো মৃত্যু নয়।"

ম্যাগ্নাস লাফিয়ে উঠলেন; চেঁচিয়ে বললেন, "আরে বাবা, তুমি দেখছি এক পাগল। কি বলতে চাইছ তুমি?"

"জীবনের সাময়িক বিরতি!" অধ্যাপক বললেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত একেবারে চুপচাপ, দু'জন দু'জনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন; ম্যাগ্নাসের মুখ থেকে অনেকখানি রং মুছে গেছে, আর অধ্যাপকের আঙুলগুলো তখনও হাতল-চেয়ারটার গায়ে নড়াচড়া করছে। হঠাৎ ম্যাগ্নাস হেসে উঠলেন, সম্ভবত কিছুটা উচ্চকণ্ঠেই হাসলেন।

"বাজে কথা!" ম্যাগ্নাস বললেন, "কী বোকার মতো কথা বলছ ডিক? তোমার এখন দরকার হবে এক গ্লাস ব্র্যান্ডি, আর তারপর একটা বিছানা।" পুরনো বন্ধুর

মতোই সবজান্তা স্বাধীনভাবে কোণের আলমারির কাছে গিয়ে একটা ডিকেন্টার ও গ্লাস নিয়ে এসে দুটো গ্লাসে পুরো এক পেগ করে ঢাললেন।

"তার মানে, আমার সঙ্গে তুমি একমত নও ম্যাগ্নাস?"

একচুমুকে নিজের ব্র্যান্ডিটা গিলে ম্যাগ্নাস বললেন, "একমত, না। সবই স্নায়ুর ব্যাপার। ওসব কথা থাক।"

অধ্যাপক মাথা নাড়লেন। "স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন অনেক কিছুই আছে—"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি জানি—ঐ একই উদ্ধৃতির জন্য শেকস্‌পীয়ারকে আমি প্রায়ই গালমন্দ করে থাকি।"

"কিন্তু ম্যাগ্নাস, কয়েক বছর আগে মিশরীয়দের কৃত্রিম মোহাচ্ছন্নতার অনুশীলন সম্পর্কে তুমি নিজেই তো একটি প্রবন্ধ লিখেছিলে।"

ম্যাগ্নাস প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, "দেখ ডিক, ঈশ্বরের দোহাই, যুক্তিপূর্ণ কথা বল! কোন মোহাচ্ছন্নভাব কি ছ'-সাত হাজার বছর থাকা সম্ভব? অত্যন্ত অযৌক্তিক কথা। চল, বুদ্ধিমান ছেলের মতো শোবে চল—জন কোথায়?"

"আগামীকাল পর্যন্ত তাকে ছুটি দিয়েছি।"

"এটা কি করেছ?" অস্বস্তির সঙ্গে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে ম্যাগ্নাস বললেন। "যাক গে, তার জায়গাটা না হয় আমিই নেব—তোমাকে বিছানায় নিয়ে যাব, আরও সব কাজই করব।"

মাথা নাড়তে নাড়তে অধ্যাপক বললেন, "ধন্যবাদ ম্যাগ্নাস, কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। এই শেষ অধ্যায়টা লিখে সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত আমি ঘুমাতে পারছি না; আর সে কাজটা করতে আর বেশি সময়ও লাগবে না।"

নিজের ঘড়িটা দেখে ম্যাগ্নাস বললেন, "হা ঈশ্বর, একটা বাজে! আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে ডিক—হোটেলে—তুমি তো জান কালই জাহাজ ছাড়ছে।"

অধ্যাপক শিউরে উঠে দাঁড়ালেন। করমর্দন করে বললেন, "বিদায় ম্যাগনাস। আশা করি তোমার এক-প্রস্তর স্তম্ভটি একটি ভাল আবিষ্কার বলেই প্রমাণিত হবে। বিদায়।"

বন্ধুর হাতে চাপ দিয়ে ম্যাগ্নাস বললেন, "ধন্যবাদ। কিন্তু মনে রেখো, ঐ বিষময় কফি চলবে না।" এই বলে দরজা পর্যন্ত গিয়ে মাথাটা নেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

অধ্যাপক ভুরু কুঁচকে একমুহূর্ত বসে রইলেন; তারপর হঠাৎ উঠে দরজার কাছে গিয়ে হাতলটা ঘোরালেন, বারান্দায় আবছা আলোয় উঁকি মেরে দেখলেন।

"ম্যাগ্নাস," চাপা কর্কশ স্বরে ডাকলেন, "ম্যাগ্নাস।"

"বল?" জবাব এল।

"তাহলে এটা যে চোখ মেলে তাকাবে তা তুমি মনে কর না, কি বল ম্যাগ্নাস?"

"হা ঈশ্বর—না!"

"আঃ!" বলে অধ্যাপক দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

৩

কলমটা হাতে নিয়ে অধ্যাপক বললেন, "মনে হচ্ছে জনকে যেতে না দিলেই ভাল করতাম, আজ রাতটা বড়ই একলা লাগছে; জন খুবই কাজের লোক," এই বলে তিনি আবার উপুড় হয়ে লিখতে শুরু করলেন। মাথাটা অসাধারণ রকমের ঝকঝকে ও পরিষ্কার লাগছে; সব শক্তিগুলোই যেন উচ্চতম গ্রামে বাঁধা হয়েছে; পূর্ণতার একটা অনুভূতি তাঁকে ভর করেছে। ধারণাগুলো ঝলসিত হয়ে উঠছে, জটিল চিন্তাগুলো সুসংবদ্ধ হয়ে উঠছে একটা সূক্ষ্ম শক্তি ও সাবলীলতায়, কথাগুলি যেন কলমের মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে আসছে।

তথাপি কোন আপাত কারণ না থাকা সত্ত্বেও একটা পংক্তির মাঝখানে পৌঁছেই হঠাৎ তাঁর মনে তীব্র বাসনা জাগল। মাথাটা ঘুরিয়ে ঘরের কোণে রাখা বস্তুটিকে একবার দেখলেন। অনেক চেষ্টা করে সে বাসনাকে চাপা দিলেন; আবার কলমের খস্‌খস্‌ শব্দ হতে লাগল; অবশ্য সর্বক্ষণই তিনি বুঝতে পারছেন যে সেই বাসনা ক্রমেই বাড়ছে। আগে হোক আর পরে হোক একসময় তাঁকে পরাস্ত করবেই। তিনি যে অস্বাভাবিক কিছু দেখার আশা করছেন তা নয়; সেটা তো একান্তই অবাস্তব। তিনি স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন, যে ঢাকনা দিয়ে সেই বস্তুটিকে চাপা দেওয়া হয়েছে তাতে কতগুলি স্ক্রু আছে—হঠাৎ অধ্যাপক মাথাটা ঘোরালেন। হাতের কলমটা সামনে বাড়িয়ে নিজের মনেই অস্পষ্ট স্বরে স্ক্রুর চকচকে মাথাগুলি গুণতে শুরু করলেন।

"এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়—প্রত্যেক দিকে ছ'টা করে, উপরে ও নিচে তিনটে করে—মোট আঠারোটা। স্ক্রুগুলো সবই ইস্পাতের; এক-চতুর্থ ইঞ্চি মোটা আর আড়াই ইঞ্চি লম্বা; স্ক্রুগুলি যথেষ্ট শক্ত হবারই কথা, তবে আঠারোটা স্ক্রু মোটেই বেশি নয়; কেন যে ম্যাগ্‌নাস আরও কিছু বেশি স্ক্রু ব্যবহার করেনি, তাহলে তো আরও মজবুত"—অধ্যাপক নিজেকে সংযত করে কাজে মন দিলেন। কিন্তু বৃথাই লেখার চেষ্টা করলেন; একটা আবেগ তাঁকে পেয়ে বসেছে, প্রতিমুহূর্তেই জোরদার হচ্ছে; সে আবেগের অন্তরালে আছে ভয় আর সে ভয় পিছনে চলাফেরা করছে এমন কিছুকে নিয়ে। "হ্যাঁ, পিছন দিকে—সে যে কেন এটাকে চেয়ারের ঠিক পিছন দিকের কোণটাতেই রেখে গেল?" তিনি উঠলেন, ডেস্কটাকে টানাটানি করলেন, কিন্তু সেটা খুব ভারী, সরাতে পারলেন না; তবু শারীরিক পরিশ্রমটা কোন কাজে না এলেও তার ফলে মনটা কথঞ্চিৎ শান্ত হল। কিন্তু সেই মহাগ্রন্থ শেষ করার কাজে যতই মন দিতে চেষ্টা করছেন, কিছুতেই তাতে মন বসছে না; আঙুলের ফাঁকে ধরা কলমটা কাগজের উপর অলস কল্পনার ছবি ও অর্থহীন হিজিবিজি লিখতে লাগল; তাই কলমটাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে দুই হাতে মুখটা ঢাকলেন।

এটা কি সম্ভব হতে পারে যে আঠারোটি স্ক্রু দিয়ে আঁটা ঢাকনার নিচেকার অন্ধকারে সেই চোখ দুটি এখন বন্ধই আছে, না কি চোখ দুটি—? অধ্যাপক শিউরে উঠলেন। আহা, সে যদি জানত, যদি নিশ্চিত হতে পারত—জন থাকলে বড় ভাল হত,

জন খুব কাজের লোক—সে বসে বসে এটাকে পাহারা দিতে পারত—হ্যাঁ। জনকে যেতে দিয়ে খুবই বোকামি করেছি। অধ্যাপক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, চোখ মেলে তাকালেন, একেবারে নিশ্চুপ—একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সামনে ফুলস্কেপ কাগজখানার দিকে—তাকিয়ে রইলেন তার উপর এবড়ো-খেবড়ো বড় হরফে লেখা দুটি অসমান পংক্তির দিকে—সে পংক্তি দুটি তাঁব নিজের হাতে লেখা নয়:

"আইসিস ক্ষণ তরে শ্বাসরোধ কবেছে আমার,
আমাকে যে জাগাইবে সেই হবে মৃত্যুর শিকার।"

একটা আকস্মিক তীক্ষ্ণ শব্দ, একটা অট্টহাসি তাঁকে চমকে দিল--"এ শব্দ কি তাঁর নিজের ঠোঁট থেকেই বেরিয়েছে?" তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, আব তিনি জানেন যে সেটাই ঠিক? তিনি বসে আছেন; তাঁব প্রতিটি স্নায়ু ঝন্‌ঝন্ কবছে - আশা করলেন, প্রার্থনা করছেন যে একটা কিছু এসে এই নীববতাকে ভেঙে দিক---একটা পায়ের শব্দ—একটা চিৎকার— একটা আর্তনাদ—এই অট্টহাসি ছাড়া অন্য যা কিছু; অপেক্ষা কবে থাকতেই আবার সেই হাসি তাঁর কানে এল--- আরও জোবে, আরও দুর্বার হয়ে। এবার সে শব্দ তাঁর দাতে দাতে কঁপুনি ধবিয়ে দিল, গলার মধ্যে গড্-গড্ কবে উঠল, তাঁকে ঝাকুনি দিতে লাগল। অধ্যাপকেব চোখ পড়ল তাঁর পায়ের কাছে ইতস্তত ছড়ানো ছেঁড়া কাগজের উপর। কাপা হাতে ডেস্কেব উপরকার তাক থেকে পাইপটা নামিয়ে নিলেন। সেটাতে তামাক ভরা ছিল, আগুন ধরালেন; তামাকের ধোঁয়াটা ভাল লাগল, জোরে টান দিলেন, পাকানো নীল ধোঁয়া মাথার উপর দিয়ে উঠতে লাগল, হাল্কা মেঘের মতো ভাসতে লাগল; শেষ পর্যন্ত তার খেয়াল হল যে সব ধোঁয়া একইদিকে ভেসে গিয়ে একটা জায়গায় পর্দার মতো ঝুলে আছে, আর সেই চলমান পর্দার ওপাশেই সেই ছায়া ঢাকা "সার্কোফেগাসটি" এখন একেবেঁকে নড়ছে।

অধ্যাপক স্খলিত পায়ে উঠে দাড়ালেন।

অস্ফুট স্বরে বললেন, "ম্যাগ্নাস ঠিকই বলেছে। আমি অসুস্থ, ঘুমাবার চেষ্টা করতে হবে---করতে হবে – করতেই হবে– করতেই হবে।" কিন্তু টেবিলের কোণায় কাপা হাত রেখে তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। যে অন্ধ ভয়, অহেতুক ত্রাসেব বিরুদ্ধে তিনি সারা রাত বৃথাই লড়াই করেছেন, তা যেন একটা দুর্বার ঢেউয়েব মতো এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল; দম বন্ধ হয়ে এল, একটা জঘন্য ভয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল, অথচ সারাক্ষণ সেই বড় সাদা বাক্সটার উপর থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারলেন না; বাক্সটার ছোট স্ক্রুর মাথাগুলো ছোট ছোট অনুসন্ধানী চোখের মতো তাঁর দিকে যেন হাঁ করে তাকিয়ে আছে। পাশে মেঝের উপর কি যেন চকচক করছে। কোন কিছু বোঝবাব আগেই তিনি স্ক্রু-ড্রাইভারটা তুলে নিলেন। অস্থিরভাবে সেটাকে ঘোরাতে লাগলেন: মাত্র একটা স্ক্রু বাকি; একটু থেমে গালের উপর থেকে ঘামটা মুছতে গিয়েই তিনি অবাক হয়ে গেলেন—অনেক বছর আগে

কলেজ-জীবনে একটা গানেব আসবে শোনা একটা গান তিনি নিজেই গাইছেন, তাবপবই শেষ স্ক্রুটা খুলে যেতেই তিনি দম বন্ধ কবে দাঁড়ালেন।

...কালো চুলেব কুয়াশাব মাঝখানে সেই ডিমেব মতো মুখ, ভাবী আঁখি-পল্লবেব নিচে সেই দীর্ঘায়ত চোখ, খাড়া নাক, নাসাবন্ধ্রেব নিষ্ঠুব বেখা, কামার্ত মুখেব পবিপূর্ণ ওষ্ঠদ্বয় আব তাব চিবন্তন বিদ্রূপ, সবই তিনি আগেই দেখেছেন, তবু সেদিকে তাকিয়ে একটা পবিবর্তন তাঁব নজবে পডল, সে পবিবর্তন সূক্ষ্ম হলেও ভযংকব, সে পবিবর্তনেব স্বরূপ তিনি ঠিক ধবতে পাবছেন না। অথচ সে পবিবর্তন তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধ কবে বেখেছে। জোব কবে চোখ ফিবিযে নিলেন, ঢাকনাটা বসিযে দেবাব চেষ্টা কবলেন, কিন্তু পাবলেন না, চাবদিকে তাকিযে ভাবী থলেব থেকে একটা কম্বল টেনে নিযে সেই ভযংকব জিনিসটাকে ঢেকে দিলেন।

আবাব বলে উঠলেন, "ম্যাগ্নাস ঠিকই বলেছে। আমাকে ঘুমাতে হবেই।" কোচেব কাছে গিযে ধপাস কবে শুযে পডে কুশনেব মধ্যে মুখ ঢাকলেন।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেখানে শুযে বইলেন, কিন্তু ঘুম এল না কিছুতেই, আবাব সেই হাতুডিব শব্দ কানেব মধ্যে বাজতে লাগল, এবাব আবও জোবে, মনে হল হাতুডিটা যেন তাব মস্তিষ্কেব মধ্যেই ঘা দিচ্ছে। হাতুডিব আঘাতেব আডাল থেকে আবও একটা শব্দ আসছে—সেটা কিসেব শব্দ? কোন পাযেব শব্দ কি? উঠে কান পাতলেন, আব তখনই খেযাল হল যে কম্বলেব ঝালবটা নডছে। বিশ্বাস না হওযায চোখ দুটো কচলে দিলেন, আব ঠিক তখনই ঢেউযেব মতো গতিতে আবও একটা কিছু এসে সেটাকে নাডিযে দিল। উঠে কাঁপতে কাঁপতে হামাগুডি দিযে এগিযে গিযে কম্বলটাকে দু' খানা কবে ছিঁডে ফেললেন। আব তখনই তিনি সেই পবিবর্তনটাকে দেখতে পেলেন, বুঝতে পাবলেন যা আগে তাব কাছে দুর্বোধ্য মনে হযেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সব বিদ্যাবুদ্ধি, পুরুষত্বেব সব শক্তি যেন তাকে ছেডে গেল, অধ্যাপক জার্ভিস দুই হাতে মুখ ঢেকে ছোট শিশুব মতো বিচিত্র এক সুবে ঘ্যান্ ঘ্যান্ কবতে কবতে শবীবটাকে এদিক ওদিক দোলাতে লাগলেন, মুখেব ছাই ধূসব বংটাও মিলিয়ে গেল, কালো ঠোঁট দুটি হযে উঠল বক্ত লাল। কিছুক্ষণ এইভাবে চলাব পবে অধ্যাপক সহসা এক বিচিত্র উন্মাদ ভঙ্গিতে দুই হাত সবেগে মাথাব উপবে ছুঁডতে লাগলেন।

চিৎকাব কবে বললেন, "হে ঈশ্বব! আমি যে পাগল হযে যাচ্ছি... আমি পাগল, ওঃ, কিন্তু না। পাগল ভিন্ন অন্য কিছু—পাগল নয়, পাগল নয়... আমি পাগল নই—না।" হঠাৎ আযনাব মধ্যে নিজেকে দেখতে পেযে মাথা নাডতে নাডতে মুচকি হাসলেন। নিজেব প্রতিবিম্বকেই ফিস্‌ফিস্ কবে বললেন, "পাগল নই, না, না।" পুনবায বাক্সটাব কাছে গিযে কাঁচটাব উপব হাত বুলিযে টোকা দিতে লাগলেন।

"হে মৃত্যুব আঁখি, তোমাব দুটি পাতা খোল, যে বহস্য সেখানে লুকিযে আছে আমি জানতে চাই। আমি না হয সেই পুবোহিত পতোমেসই হলাম যে তোমাকে এভাবে মন্ত্রমুগ্ধ কবে বেখেছে... কিন্তু তাতে কি হযেছে...

কাছেই ফিরে এসেছি প্রিয়তমা, সেদিনের থিবিসের মতোই আমার আত্মা আজও তোমাকে ডাকছে। হে মৃত্যুর আঁখি, তোমার দুটি পাতা খোল, যে রহস্য সেখানে লুকিয়ে আছে তাকে আমি জানতে চাই। তোমার আত্মা এতকাল ঘুমিয়ে ছিল, আর গমনাতীত বছর ধরে আমার আত্মা তোমাকেই খুঁজে ফিরেছে, এতদিনে সে প্রতীক্ষার অবসান হল। হে মৃত্যুর আঁখি, তোমার দুটি পাতা খোল, যে রহস্য সেখানে লুকিয়ে আছে তাকে আমি জানতে চাই। হায় ঈশ্বর," হঠাৎ তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, "সে তো জাগবে না—আমি তাকে জাগাতে পারি না।" নিজের আঙুলগুলি সজোরে মোচড়াতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেহারা বদলে গেল, ধূর্ত হাসিতে বেঁকে গেল মুখ, হামাগুড়ি দিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো ছোট আয়নাটার কাছে এগিয়ে গেলেন, দ্রুত হাতে সেটাকে কোটের নিচে লুকিয়ে নিয়ে ডেস্কের কাছে গিয়ে আয়নাটাকে তার উপর রেখে নিজের সামনে ধরলেন।

নিজের দিকেই তাকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "যতক্ষণ আমি এর দিকে তাকিয়ে আছি, এর জন্য অপেক্ষা করছি, ততক্ষণ ঐ দুটি চোখের পাতা খুলবে না। সে দুটি চোখ যে সেই মানুষের যে তোমাকে অতর্কিতে আক্রমণ করার অপেক্ষায় আছে। যে পিছন থেকে তোমার উপর নজর রেখেছে, তোমাকে অনুসরণ করছে; তবু সে চোখকে আমি দেখব, হ্যাঁ, আমি দেখবই।"

নিচের জগৎ থেকে নদীবক্ষের স্টিমারের একটানা হুইস্‌লের শব্দ ভেসে এল; অস্পষ্ট ও অনেক দূরের হলেও সেই শব্দে বুঝি অধ্যাপকের বুদ্ধি-বিবেচনা ফিরে এল।

হাসবার চেষ্টা করে তিনি বলে উঠলেন, "হা ঈশ্বর, আমি কি এতই বোকা যে করুণার পাত্র একটি মৃত মানুষ আমাকে ভয়ে আধা-পাগল করে তুলেছে, আর তাও নিউইয়র্ক শহরে। এ যে ধারণারও অতীত।" এই কথা বলে অধ্যাপক ব্র্যান্ডির দিকে এগিয়ে গেলেন, ইচ্ছা করেই পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে গ্লাসটা খালি করলেন; তখনও কিন্তু তাঁর মনে হতে লাগল যে সেই দুটি চোখ তাঁকে দেখছে, সর্বত্র তাঁকে অনুসরণ করছে; অনেক কষ্টে তিনি ঘুরে দাঁড়ানো থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করলেন। সেই একই লৌহ-কঠিন ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা বিদ্রোহী স্নায়ুগুলোকে দমন করে তিনি কাগজপত্র গুছিয়ে কলমটা তুলে নিলেন।

মানুষের শরীরে বোধ হয় খেঁকি কুকুরের স্বভাবটা আছে; মনিব, মন, যতই তাড়াক, সে ঠিক পিছন পিছন চলতে থাকে, হুকুম করলেই তা পালন করবে। কাজেই অধ্যাপক আসনে বসলেন, চোখ মুছলেন, হাত শক্ত করে পাশের আয়নাটার দিকে না তাকিয়ে আর একটা কাগজ খুলে নিলেন।

একটু থেমে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, জানালায় রুগ্ন, পাণ্ডুর ঊষার আবির্ভাব হয়েছে। ধীরে ধীরে বললেন, "আর আধ ঘণ্টা, তাহলেই আমার কাজ শেষ, সমাপ্ত ..." কথাটা তাঁর ঠোঁটেই শেষ হয়ে গেল হঠাৎই তাঁর চোখ পড়ল আয়নার

উপর, চোখ দুটি সম্পূর্ণ খোলা। একটি দীর্ঘ মুহূর্ত সে দুটি চোখ তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপরই সে চোখের পাতাগুলি কাঁপতে কাঁপতে বন্ধ হয়ে গেল।

অধ্যাপক আর্তনাদ করে উঠলেন, "আমি ভুল দেখেছি, মতিভ্রম রোগে ভুগছি। এটাও অনিদ্রার ফল। জন ফিরে এলে বেঁচে যাই, জন খুব কাজের লোক—"

তাঁর পিছনে একটা শব্দ হল, নরম, শান্ত শব্দ, গাছের ফাঁকে বাতাসের ফিসফিস বা দেওয়ালের গায়ে পর্দাব খস্‌খস্‌ শব্দের মতো—শব্দটা যেন তার পিছন দিক দিয়ে মেঝেটা পার হয়ে চলেছে। মৃত্যুর মত শীতল স্রোত বয়ে গেল তাঁর ভিতর দিযে; মূক আতংক কাকে বলে তা তিনি বুঝতে পারলেন।

চোখ তুলে তাকাতে সাহস হল না; প্রত্যাশার আতংকে মন উঠল ভরে, তিনি আয়নাটার দিকে তাকালেন। পিছনের বাক্সটা খালি; দ্রুত মুখ ফেরালেন, আর ঐ তো সে, এত কাছে যে প্রায় ছোঁযা যায়, সেই "জিনিস" যাকে তিনি বলেছেন করুণার পাত্র একটি মৃত মানুষ। ধীরে ধীরে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে, শক্ত পোশাকের খস্‌খস্‌ শব্দ তুলে সে তার দিকে এগিযে আসছে:

'আইসিস ক্ষণ তরে শ্বাস রোধ করেছে আমার,
আমাকে যে জাগাইবে সেই হবে মৃত্যুর শিকার।'

আর্তনাদ ও অট্টহাসির মাঝামাঝি একটা অদ্ভুত চিৎকাব করে তিনি লাফ দিযে সেটার উপর ঝাঁপিযে পড়লেন; একটা আঘাত ও খাবি খাওযাব শব্দ হল; অধ্যাপক জার্ভিস মেঝের উপর পড়ে গেলেন; হাত দু'খানি ছড়ানো, কম্বলের ভাঁজের মধ্যে মুখটা ঢাকা।

* * *

পরদিন সংবাদপত্রের একটি অনুচ্ছেদে এই কথাগুলি প্রকাশিত হল:

বিচিত্র মৃত্যু

"বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক জার্ভিসকে গতকাল তাঁব স্টাটের ঘরে মৃত অবস্থায পাওযা গেছে; সম্ভবত হৃদরোগেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। ঘটনাটিব একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল, ঘরের বিপরীত দিকের কোণে দাঁড় করানো একটা ভ্রমণোপযোগী বাক্সের মধ্যে যে মমিটা ছিল সেটাকে অধ্যাপকের মৃতদেহের পাশেই শাযিত অবস্থায পাওযা গেছে।"

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

ডরোথি ডিংলে-র ভূত

The Ghost of Dorothy Dingley—ড্যানিয়েল ডিফো

এই বছরের গোড়ার দিকে এই লনচেস্টন শহরে একটা রোগ দেখা দিল আর আমার কয়েকটি ছাত্র তাতে মারা গেল। এই রোগে যাঁরা মারা গেল তাদের মধ্যে একজন হল ট্রেহাস্-এর এডোয়ার্ড ইলিয়ট, এস্কোয়ারের বড় ছেলে জন ইলিয়ট। ছেলেটির বয়স বছর ষোল, কিন্তু অসাধারণ ক্ষমতা ও বুদ্ধির অধিকারী। বিশেষ অনুরোধে ১৬৬৫-র ২০শে জুন তারিখে তার অন্ত্যেষ্টিকার্যে আমিই পৌরোহিত্য করলাম। বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই যুবকটির সম্পর্কে কিছু প্রশংসার কথা আমি বললাম; উদ্দেশ্য, যারা তাকে জানত তাদের কাছে তার স্মৃতি যাতে প্রিয়তর হয়, এবং যেসব ছাত্র তার সঙ্গে স্কুলে আসত আর তারপরেও যারা স্কুলে আসবে, তাদের সকলের কাছেই সে যেন দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকে। আমার কথাগুলি শুনে গির্জার একজন প্রবীণ ভদ্রলোক খুবই অভিভূত হয়েছিলেন। বক্তৃতায় ভার্জিলের যে উক্তিটি আমি ব্যবহার করেছিলাম সেদিন সন্ধ্যায়ই তাঁকে বার বার সেটি আবৃত্তি করতে শোনা গেল:

Et peur ipse fuit cantari dignus,

এই ছাত্রটির ব্যাপারে গম্ভীর ভদ্রলোকটির এতটা অভিভূত হবার কারণ সম্পর্কে তিনি তাঁর নিজের একটি ছেলে সম্পর্কে কিছু কথা বললেন। ছেলেটি একই বয়সী, কয়েক মাসের বড়; মিঃ ইলিয়টের চরিত্রের যে বিবরণ আমি দিয়েছি, তাঁর ছেলেটিও তার অযোগ্য নয়। কিন্তু একটা বিচিত্র দুর্ঘটনার ফলে তাকে নিয়ে এখন বাবা-মার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নষ্ট হতে বসেছে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলে আমি গির্জার বাইরে আসামাত্রই এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অত্যন্ত ভদ্রভাবে আমাকে ডাকলেন; এবং অস্বাভাবিক আগ্রহাতিশয্যের সঙ্গে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জোর করে সেই রাতেই আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলেন। আর মিঃ ইলিয়ট যদি মাঝখানে পড়ে না বলতেন যে সারাটা দিন আমি তাঁর সঙ্গে কাটাব বলে কথা দিয়েছি, এবং কোনমতেই তিনি সে কথার নড়চড় হতে দেবেন না, তাহলে হয়তো সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির হাত থেকে আমি কিছুতেই রেহাই পেতাম না।

এর ফলে তখনকার মতো ছাড়া পেলাম বটে, কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়ে কথা

দিতে হল যে পরবর্তী সোমবারে তাঁর বাড়িতে গিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তখনকার মতো তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু সোমবার আসার আগেই তিনি নতুন করে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখলেন, সম্ভব হলে আমি যেন রবিবারেই সেখানে যাই। সেটা আমার পক্ষে সুবিধা হবে না এবং আমার নিজের লোকজনের প্রতি আমার কর্তব্যের দিক থেকেও সেটা অসুবিধাজনক—এই কথা বলে তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টাকেও ঠেকিয়ে দিলাম।

ভদ্রলোক কিন্তু সেখানেই থামলেন না; রবিবারে আর একটা চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন, আমি যেন কোন কারণেই সোমবারে যাওয়াটা বন্ধ না করি, এবং এমনভাবে কাজকর্মের ব্যবস্থা করে যাই যাতে অন্তত দু'তিনটে দিন তাঁর সঙ্গে কাটাতে পারি। বিনা কারণে এত আগ্রহ এবং যাওয়ার জন্য এত তাড়ার বহর দেখে সত্যি আমি বিস্মিত হলাম; মনে সন্দেহ দেখা দিল যে এত অতি-ভদ্রতার অন্তরালে নিশ্চয় কোন অভিসন্ধি আছে। কারণ এই ভদ্রলোক বা তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার কোনরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল না; এমনকি সাধারণ পরিচয়টুকুও নয়; হঠাৎ কোথা থেকে এই বন্ধুত্বের উচ্ছ্বাস গজিয়ে উঠল তাও ভেবে পেলাম না।

কথামতো সোমবাব সেখানে গেলাম এবং আমন্ত্রণ যেরকম উচ্ছ্বাসপূর্ণ ছিল, অভ্যর্থনাও পেলাম তদনুরূপ প্রচুর ও পরিপূর্ণ। সেখানে একজন প্রতিবেশী পাদরীর সঙ্গেও দেখা হল; তিনি হঠাৎই এসে পড়ার ভান করলেও পরবর্তী ঘটনা থেকে আমার অন্যরূপ ধারণাই হল। ডিনারের পরে ভদ্রলোকটি আমাকে বাগান দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখানে বেডাতে বেডাতেই তিনি আমার কাছে এই পুরো ব্যাপারটির প্রথম রহস্যটি উদ্ঘাটন করলেন।

প্রথমে তিনি সাধারণভাবে পরিবারের দুর্ভাগ্যের বিবরণ দিয়ে শুরু করলেন, তারপরে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছোট ছেলের কথা উল্লেখ করলেন। ওকে নিয়ে সকলের কত আশা ছিল, ছেলেটি কত ফুর্তিবাজ ছিল; কিন্তু ইদানীং কেমন যেন মন-মরা আর আধ-ভোলা হযে পডেছে। তখন থেকেই কেমন যেন কান্নাকাটি করে, যুক্তি-বুদ্ধিও হারিয়ে ফেলছে; কারণ, সে নিজেই বলেছে, তাকে নাকি ভূতে পেয়েছে; সে জোর দিয়েই বলে যে, একটা বিশেষ পথ দিযে যতবার সে স্কুলে যায়, ততবারই এখান থেকে আধ মাইল দূরের একটা বিশেষ মাঠে তার সঙ্গে একটা ভূতের দেখা হয়।

আমাদের কথার মাঝখানেই বুড়ো ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী এসে হাজির হলেন। পাদরীটিও সামনের কুঞ্জবনটি দেখিয়ে আগেকার কথাই বলতে শুরু করলেন, আর তাঁরাও (যুবকটির বাবা-মা) তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে বিস্তারিতভাবে আরও অনেকক্ষণ ধরে সব কথাই আমাকে শোনালেন। অবশেষে তাঁরা তিনজনই এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য ও পরামর্শ চাইলেন।

তাঁদের বক্তব্য সম্পর্কে হঠাৎই কোনরকম মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না; শুধু এইটুকু বললাম যে ছেলেটি তাঁদের যা বলেছে সেটা অদ্ভুত হলেও অবিশ্বাস্য নয়, আর এ বিষয়ে এক্ষুণি আমি কিছু ভাবতে বা বলতে পারছি না; কিন্তু ছেলেটি

যদি আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে এবং আমার পরামর্শ শোনে তাহলে পরদিন তাঁদের আমার মতামত জানাতে পারব বলে আশা করি।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম, এই দম্পতিটি আমার জন্য যে জালটি পেতে রেখেছিল, আমি তার মধ্যেই পা দিয়ে ফেলেছি; বৃদ্ধা মহিলাটি তাঁর অধৈর্যকে মোটেই চেপে রাখতে পারলেন না, তখন ছেলেকে ডেকে আনার প্রস্তাব করে বসলেন। বাধ্য হয়েই সে প্রস্তাব মেনে নিয়ে সম্মতি জানালাম, আর মহিলাটিও আমাদের ফেলে নিকটবর্তী একটি বাগানে গিয়ে নিজেই ছেলেকে সঙ্গে করে এনে আমার হাতে তুলে দিলেন।

তিনজনের বক্তব্যের একটাই মূল সুর: তাঁরা আমাকে বোঝাতে চাইলেন, হয় ছেলেটি আলস্যপরায়ণ এবং যে কোন ছুতো করে স্কুল পালাতে চায়, অথবা কোন মেয়ের প্রেমে পড়েছে, কিন্তু সেটা স্বীকার করতে লজ্জা পাচ্ছে অথবা বাবার উপর চাপ দিয়ে কিছু টাকা ও নতুন জামাকাপড় বাগাবার তালে আছে, যাতে লন্ডনে তার যে দাদা থাকে তার কাছে পাড়ি জমাতে পারে; তাই তাঁরা আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন আসল ব্যাপারটা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি এবং তদনুযায়ী ছেলেটিকে এসব করা থেকে নিবৃত্ত করি, সৎ পরামর্শ দেই, বা তিরস্কার করি, মোট কথা, যেভাবেই হোক তার মাথা থেকে এই ভূত-প্রেতের চিন্তাটা যেন দূর করে দেই।

অচিরেই যুবকটির সঙ্গে একটি গোপন বৈঠকে বসে গেলাম। প্রথমেই সে যাতে আমার প্রতি বিরূপ না হয় সে বিষয়ে সতর্ক হলাম, মিষ্টি কথায় মন ভিজিয়ে তার মনের মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করলাম, কারণ আমার সন্দেহ ছিল যে সে হয় তো আমাকে বিশ্বাস করবে না, বা মুখই খুলবে না। কিন্তু প্রথম পর্বটা পার হয়ে আসল কাজের কথা শুরু করার আগেই বুঝে ফেললাম যে তার মনের মধ্যে ঢুকতে কোনরকম কৌশল অবলম্বনের দরকারই হবে না; কারণ বেশ অনুগতভাবেই সে খোলাখুলিই বলল যে সে তার পুঁথিপত্রই ভালবাসে এবং একটি ভাল ছাত্র হওয়া ছাড়া আর কিছুই চায় না; তার মা যাই বলুক, কোন মেয়েছেলের প্রতিই তার কোন টান নেই; বাবা-মার কাছে তার শুধু একটিই অনুরোধ, "হায়ারক্রম কোয়ার্টর্ল্‌স্‌"-এর মাঠে যে স্ত্রীলোকটি তাকে বিরক্ত করছে তার সম্পর্কে বার বার সে যা বলছে সেকথা তারা বিশ্বাস করুক। অনেক চোখের জলে ভেসে সে একেবারে খোলাখুলিই আমাকে বলল যে, তার বন্ধুরা তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর ও অন্যায় ব্যবহার করছে; তারা তার কথা বিশ্বাস করে না, তার প্রতি কোন সহানুভূতি দেখায় না; যে কেউ আমার সঙ্গে একবার সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা সত্য, ইত্যাদি।

ততক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে যে আমি তার প্রতি সহানুভূতিশীল, তার কথাগুলি মন দিয়ে শুনছি, আর তাই সে বলতে লাগল:

"যে স্ত্রীলোকটি আমাকে দেখা দেয় সে এখানে আমার বাবার প্রতিবেশী ছিল; আট বছর আগে মারা গেছে; নাম ডরথি ডিংলে; এইরকম উঁচু, এইরকম বয়স,

আর এইরকম গায়ের রং। সে কখনও আমার সঙ্গে কথা বলে না, তাড়াতাড়ি আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, সব সময়ই ফুটপাথটা আমাকে ছেড়ে দেয়, এবং মাঠটা পার হবার মধ্যে সাধারণত দু'বার কি তিনবার আমাকে দেখা দেয়।

"এইভাবে মাস দুই চলার পরে ব্যাপারটা নজরে এল; মুখের আদলটা মনে থাকলেও তার নামটা তখন মনে পড়েনি; কাজেই এ নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে ধরে নিয়েছিলাম যে এই স্ত্রীলোকটি হয় তো কাছাকাছি কোথাও থাকে, আর মাঝে মাঝেই তাকে এই পথ দিয়ে চলাফেরা করতে হয়। অন্যরকম কোন কল্পনা আমার মাথায়ও আসেনি। কিন্তু ক্রমে সকালে ও সন্ধ্যায় অনবরত তার সঙ্গে আমার দেখা হতে লাগল; সব সময় ঐ একই মাঠে, আর অনেক সময় মাঠটা পাড়ি দেবার পথেই দুই কি তিন বার করে।

"এই স্ত্রীলোকটির প্রতি প্রথম আমার নজর পড়ল প্রায় এক বছর আগে, তখনই আমার সন্দেহ হল, বিশ্বাস হল যে এটা একটা ভূত; কিন্তু তাতে ভয় পাবার ছেলে আমি নই; বেশ কিছুদিন ব্যাপারটা নিজের মনের মধ্যেই চেপে রাখলাম, অনেক ভাবলাম। অনেক সময় তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনও জবাব পাইনি। তারপর আমি পথটাই বদলে ফেললাম; স্কুলে যেতে লাগলাম আস্তার হর্স রোড ধরে; আর তখন সেও আমাকে দেখা দিত কোয়ারি পার্ক ও নার্সারির মাঝখানের সরু গলিটাতে। সেটা তো আরও খারাপ ব্যাপার।

"শেষ পর্যন্ত আমার ভয় করতে লাগল; অনবরত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম, হয় এর হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও, আর না হয় তো ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে দাও। রাতে ও দিনে, নিদ্রায় ও জাগরণে, মূর্তিটা সব সময় আমার মনের মধ্যে ছুটে বেড়ায়, ধর্মগ্রন্থের এই জায়গাটা আমি বার বার আবৃত্তি করি (পকেট থেকে একখানি ছোট বাইবেল বের করল), জোব vii, ১৪: 'স্বপ্নে তুমি আমাকে ভয় দেখাও আর অপচ্ছায়া দেখিয়ে সন্ত্রস্ত কর।' আর ডিউটেরনমি, xxviii, ৬৭: 'সকালে তুমি বলবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন যদি সন্ধ্যা হত; আর সন্ধ্যায় তুমি বলবে, ঈশ্বরের ইচ্ছায এখন যদি সকাল হত; কারণ মনের ভয় থেকেই তোমার ভয়ের জন্ম, আর চোখের দৃষ্টির জন্যই তুমি সব কিছুই দেখতে পাও।"

ধর্মগ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অংশগুলিকে তার অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োগ করার ব্যাপারে ছেলেটির সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে আমি খুব খুশি হলাম; তাকে আরও সব কথা বলতে বললাম।

সে বলতে লাগল: "ধীরে ধীরে আমি এতদূর মনমরা হয়ে পড়লাম যে সেটা বাড়ির সকলেরই চোখে পড়ল; তারপর নানা প্রশ্নের জবাবে আমার ভাই উইলিয়ামকে ব্যাপারটা বললাম। সে গোপনে বাবা ও মাকে কথাটা জানাল, আর তারাও কিছুদিন পর্যন্ত কথাটা নিজেদের মধ্যেই চেপে রাখল।

"এই জানাজানির একটি মাত্র ফল হল; তারা কখনও আমাকে দেখে হাসে, কখনও বকে কিন্তু সব সময় স্কুলে যাবার হুকুম করে এবং এই সব আবোল-তাবোল

ধারণা মাথা থেকে দূর করতে বলে। ফলে আমি প্রায়ই স্কুলে যেতাম, আর সব সময়ই পথে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেখা হত।”

বাগানে বসে এই কথা এবং একই রকমের আরও অনেক কথা হল পায় দু' ঘণ্টা ধরে। অবশেষে আমি প্রস্তাব করলাম, কোনরকম গোপন না করেই পরদিন সকালে ছ'টা নাগাদ আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে সেই জায়গাটায় যাব। কথাটা বলতেই সে আনন্দে লাফিয়ে উঠল ; বলল, “সত্যি যাবেন স্যার ? সত্যি তো স্যার ? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! এখন আশা হচ্ছে আমি স্বস্তি পাব।”

এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা বাড়ির ভিতর গেলাম।

ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী ও মিঃ শ্যাম ঘটনাটা জানবার জন্য এতই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে তাঁরা বৈঠকখানা থেকে হলঘরে বেরিয়ে এলেন। ছেলেকে বেশ উৎফুল্ল দেখে বৃদ্ধ লোকটিই প্রথম প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করলেন। “আসুন মিঃ রুভল, ওর সঙ্গে কথা বলবেন ; আশা করি এবার তার সুবুদ্ধি হবে। ছেলেটা অলস। ছেলেটা অলস।”

একথা শুনে কোন জবাব না দিয়েই ছেলেটি তার নিজের যাবার সিঁড়ির দিকে ছুটে গেল ; আমিও এই বলে তিনটি অপেক্ষমাণ প্রাণীর কৌতূহলকে নিবৃত্তি করলাম যে আমি কথা দিয়েছি চুপ করে থাকব, আর সে কথা রাখতে আমি কৃতসংকল্প ; যথাসময়ে তাঁরা সব কিছুই জানতে পারবেন। বর্তমানে তাঁরা যেন আমার কথার উপর ভরসা রাখেন, আমি সাধ্যমতো তাঁদের সেবা করতে চেষ্টা করব, তাঁদের ছেলের যাতে ভাল হয় তাই করব। একথায় তাঁরা চুপ করে গেলেন ; সন্তুষ্ট হলেন একথা বলতে পারব না।

পরদিন সকাল পাঁচটার আগেই শ্রীমান আমার ঘরে এসে হাজির। বেশ চটপটে ভাব। আমিও উঠে তার সঙ্গে চললাম। যে মাঠে সে আমাকে নিয়ে গেল, আমার অনুমান সেটা বিশ একর, চারিদিক খোলা, সব বাড়ি-ঘর প্রায় তিন ফার্লং দূরে। মাঠে ঢুকে এক-তৃতীয়াংশ যাবার আগেই স্ত্রীরূপধারী সেই ছায়ামূর্তি—আকস্মিক আবির্ভাব ও প্রস্থান সমেত হুবহু শ্রীমানের দেওয়া বর্ণনারই অনুরূপ—এসে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আমিও কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম। যদিও মনে মনে স্থির করেই গিয়েছিলাম যে তার সঙ্গে কথা বলব, তথাপি পিছন ফিরে তাকাবার শক্তি বা সাহস কোনটাই আমার হল না ; তবু আমার ছাত্র তথা পথপ্রদর্শকের সামনে কোনরকম ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করলাম না। তাকে শুধু জানালাম, তার কথার সত্যতায় আমি সন্তুষ্ট। আমরা মাঠটার শেষ পর্যন্ত গেলাম, আবার ফিরে এলাম, কিন্তু ভূতটি একবারের বেশি আমাদের দেখা দিল না। ছেলেটির মধ্যে বিস্ময়মিশ্রিত একধরনের সাহসিকতা লক্ষ্য করলাম ; তার সাহসের কারণ অবশ্যই আমার উপস্থিতি এবং তার কথার সত্যতার প্রমাণ, আর বিস্ময়ের কারণ ছায়ামূর্তির আবির্ভাব।

এককথায় আমরা বাড়ি ফিরে গেলাম : আমি কিছুটা বিচলিত, আর ছেলেটি উত্তেজিত। আমরা ফেরামাত্রই কৌতূহলী ভদ্রমহিলাটি আমাদের সঙ্গে কথা বলার

জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। সুযোগমতো তাঁকে বললাম, আমার মতে তাঁর ছেলের অভিযোগ উপেক্ষা করা বা অবিশ্বাস করার মতো নয়; তবু এ ব্যাপারে আমার মতামত এখনও স্থির করতে পারিনি। তাঁকে সতর্ক করে দিলাম, কথাটা যেন প্রচার না হয়; তাহলে যে বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি তা নিয়ে গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে যাবে।

ঠিক সেই সময় আমার এমন কাজ পড়ে গেল যাতে আর অপেক্ষা করতে পারলাম না, সেই সন্ধ্যায়ই লন্ডনে যাত্রা করলাম, তবে কথা দিয়ে গেলাম যে পরের সপ্তাহে আবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করব। তবু একটা বিশেষ কারণে আটকা পড়ে গেলাম; সেই সপ্তাহেই আমার স্ত্রী এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে অসুস্থ অবস্থায় ফিরে এল। যাই হোক, সেই অভিযানের নেশাটা আমার মন থেকে গেল না। ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা করলাম, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটা হেস্তনেস্ত করার সংকল্প নিয়ে তিন সপ্তাহ পরে আবার সেখানে ফিরে গেলাম।

পরদিন ১৬৬৫-র ২৭শে জুলাই তারিখ সকালে আমি একাই সেই ভুতুড়ে মাঠে হাজির হলাম এবং সারা মাঠ হেঁটেও কারও দেখা পেলাম না। ফিরে এসে অন্য একটা পথ ধরলাম; এবার কিন্তু প্রেতমূর্তিটা দেখা দিল, আগের বার ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে সেটাকে যেখানে দেখেছিলাম, অনেকটা সেই জায়গাতেই। মনে হল, এবার সেটা আগেকার চাইতে দ্রুতগতিতে আমার ডান পাশে প্রায় দশ ফুট দূর দিয়ে চলে গেল; তাই আগে থেকে মনস্থিব করে এলেও আমি কথা বলার মতো সময়ই পেলাম না।

সেদিন সন্ধ্যায় বাবা-মা, ছেলে ও আমি নিজে আমার শোবার ঘরে সমবেত হবার পরে আমি প্রস্তাব করলাম যে পরদিন সকালে আমরা সকলে একসঙ্গে সেখানে যাব, এবং এতে যে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই সে বিষয়ে কিছু কথাবার্তার পরে সেটাই স্থির হল। সকাল হলে পাছে চাকর বাকররা ভয় পেয়ে যায় তাই একটা গমের ক্ষেত দেখতে যাবার অছিলায় তারা তিনজন বেরিয়ে গেল, আর আমি একটা ঘোড়া আনিয়ে অন্য পথ ধরে একটা কম্পাস নিয়ে গেলাম এবং পূর্ব নির্দিষ্ট সিঁড়িটার কাছে তাদের সঙ্গে মিলিত হলাম।

সেখান থেকে চারজন ধীরে ধীরে কোয়ার্টার্লিস্-এর দিকে হাঁটতে লাগলাম এবং অর্ধেক মাঠ পার হবার আগেই ভূতের দেখা পেলাম। সিঁড়ির উপর দিয়ে সেটা ঠিক আমাদের সামনে এসে হাজির হল, আর তারপরেই এত দ্রুত চলতে শুরু করল যে আমরা ছ'-সাত পা যেতে না যেতেই সেটা আমাদের ছাড়িয়ে চলে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গিয়ে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে তার দিকে ছুটতে লাগলাম; দেখলাম, যে সিঁড়ি দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম সেটার উপর দিয়ে সে চলে গেল; ব্যস, আর কিছুই দেখতে পেলাম না। এক জায়গায় আমি একটা বেড়ার উপর উঠলাম আর সে আর একটার উপর, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না; আমি জোর দিয়ে বলতে

পারি—ইংলন্ডের দ্রুততম ঘোড়াও এত অল্প সময়ের মধ্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতে পারত না। তার একদিনকার আবির্ভাব সম্পর্কে দুটো জিনিস আমি লক্ষ্য করলাম।

১। যে শিকারী কুকুরটা আমাদের অগোচরে আমাদের অনুসরণ করছিল, সেটা কিন্তু প্রেতমূর্তিটাকে চলে যেতে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে করতে পালিয়ে গিয়েছিল; তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে প্রেতমূর্তিটা আমাদের ভয় অথবা কল্পনার সৃষ্টি নয়।

২। প্রেতমূর্তিটার চলন পা ফেলে ফেলে একটার পর একটা ধাপে ধাপে নয়, অনেকটা ভেসে চলার মতো, ঠিক যেভাবে ছেলেমেয়েরা বরফের উপর দিয়ে চলে, অথবা কোন নৌকা যেভাবে খরস্রোতা নদীর উপর দিয়ে চলে; প্রাচীনকালের লেখকরা (হেলিওডোরাস) প্রেতাত্মাদের চলার যে বিবরণ দিয়েছেন ঠিক তার মতো।

কিন্তু আমার কথায়ই ফিরে যাই। নিজেদের চোখে এই সব দেখে বৃদ্ধ দম্পতি ছেলের কথায় যেমন বিশ্বাস করল তেমনই খুব ভয়ও পেল; কারণ এই ডরোথি ডিংলেকে তার জীবিতকালে তারা চিনত, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিল, আর এখন এই প্রেতমূর্তির মধ্যে অবিকল তার মূর্তিই দেখতে পেল। আমি সাধ্যমতো তাদের উৎসাহ দিলাম, কিন্তু তারা আর অগ্রসর হতে চাইল না। যাই হোক, আমি স্থির করলাম শেষ পর্যন্ত দেখব, এবং এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনার ক্ষেত্রে ঈশ্বর যে সব আইনসম্মত পন্থা আবিষ্কার করেছেন, আর পণ্ডিত লোকরা যাকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন তারই সাহায্য নেব।

পরদিন বৃহস্পতিবার। খুব ভোরে উঠে আমি একাই গেলাম। কোয়ার্টিলস্-এর ঠিক পাশের মাঠটাতে মনে মনে প্রার্থনা করতে করতে আধ ঘণ্টা ধরে হাঁটলাম। পাঁচটার পরেই আমি সিঁড়ি বেয়ে সেই ভুতুড়ে মাঠে পা ফেললাম, আর ত্রিশ বা চল্লিশ পা যেতে না যেতেই পরের সিঁড়িতে ভূতটা দেখা দিল। এসব ক্ষেত্রে যেরকম করতে হয় সেইভাবে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করে তাকে ডাকলাম, আর সেটাও ধীরে ধীরে এগোতে লাগল এবং আমি যখন কাছে গেলাম তখন আর সেটা নড়ল না। আবার কথা বললাম, সে জবাব দিল, কিন্তু তার কথা স্পষ্ট শোনাও গেল না, বোঝাও গেল না। আমি কিন্তু মোটেই ভয় পেলাম না, কথা চালিয়ে গেলাম, আর শেষ পর্যন্ত সেও কথা বলল, আমি খুশি হলাম। কিন্তু তখন সব কাজটা শেষ করা গেল না; সেদিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা পরে সেই একই জায়গায় সেটা আবার আমার সঙ্গে দেখা করল, আর দু'পক্ষেরই কিছু কথাবার্তার পরে সেটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই থেকে আর কোনদিন সে দেখা দেয়নি, বা কোন মানুষের ক্ষতি করেনি। আমার সকাল বেলাকার আলোচনাটা প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরে চলেছিল।

এরা সত্য, আর তাই আমি জানি; চোখ ও কান যতটা নিশ্চয়তা দিতে পারে ততটা নিশ্চিতভাবেই জানি; আর যতদিন না আমি বুঝব যে আমার ইন্দ্রিয়গুলি আমাকে প্রতারিত করে, আর সেই বোঝার ফলে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আমার অবিচল

বিশ্বাস থেকে আমি বিচ্যুত না হব, ততদিন আমি জোরের সঙ্গেই বলব যে এখানে যা কিছু লেখা হল সে সবই সত্য।

এ ব্যাপারে আমার কার্যক্রম নিয়ে লজ্জিত হবারও কোন কারণ দেখি না, কারণ যারা নীতিবান, সুবিবেচক ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী, সেই সব মানুষের কাছে আমি একটা প্রমাণ করতে পারি, যদিও এক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পেরেই আমি খুশি হয়েছি, অন্যকে বিশ্বাস করাবার লাভবিহীন কষ্টের দায় বহন করতে চাইনি; কারণ এ ধরনের অসাধারণ ঘটনাকে বিশ্বাস করানো যে কত কঠিন তা আমি ভাল করেই জানি। এ ধরনের গল্প যে বলে তার কপালে ডাকাতদের হাতে পোলাণ্ডের পথিকের মতো আচরণই জুটে থাকে: যথা, আগে খুন করে তারপর তল্লাশি—প্রথমে মিথ্যাবাদী হিসাবে দণ্ড দিয়ে তারপর অনেক বিলম্বে তার যুক্তি ও প্রমাণগুলি পরীক্ষা করে দেখা। এই অবিশ্বাসের অনেকগুলি কারণ হতে পারে:

১. পোপতন্ত্রের অন্ধকার যুগে জনসাধারণের সীমাহীন অপপ্রয়োগ এবং চতুর সন্ন্যাসী ও ফকির কর্তৃক তাদের বিশ্বাসের উপর নানাভাবে চাপসৃষ্টি, ইত্যাদি; কারণ তারা খুশিমতো অপচ্ছায়া সৃষ্টি করে নিজেদের কৌশলে গড়া সেই সব অসাধারণ শক্তিকে শান্ত করে টাকা ও বাহবা দুই-ই আদায় করত।

২. সেই সময়ে প্রচলিত বস্তুতন্ত্র ও হব্‌সের বিধান, যা নাকি সাড্ডুচিদের (সন্দেহবাদীদের) মতবাদেরই পুনরাবির্ভাব স্বরূপ; আর যেহেতু সে মতবাদ প্রকৃতিকেই অস্বীকার করে, সেইহেতু প্রেতমূর্তিকে স্বীকার করে নিতে পারে না; এই প্রসঙ্গে "লেভিয়াথান," পুঃ ১, সি ১২ দ্রষ্টব্য।

৩. আত্মার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ বিষয়ক দর্শন ও ধর্মের এই বিশেষ রহস্যময় অধ্যায় সম্পর্কে আমাদের যুগের মানুষের অজ্ঞতা। দশ হাজারে একজন পণ্ডিতও (অন্যক্ষেত্রে চমৎকার জ্ঞানের অধিকারী হলেও) এ বিষয়ে কিছুই জানে না, অথবা কিছু করতেও পারে না। যা হয়তো মানবজাতির অতুলনীয় কল্যাণ করতে পারত, এই অজ্ঞতার ফলে তার প্রতি জন্ম নিয়েছে আতংক ও ঘৃণা।

কিন্তু যেহেতু আমি একজন পাদরী ও বয়স্ক যুবক, এবং এ অঞ্চলে অপরিচিত, তাই নীরবতা ও গোপনীয়তাকেই আমি আমার শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা বলে মনে করি।

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

বাগানের মালী

The Gardener— —এডওয়ার্ড ফ্রেড্রিক বেনসন্

আমাব দুই বন্ধু হিউ গ্রেইঞ্জাব ও তাব স্ত্রী বডদিনেব ছুটি কাটাবাব জন্য যে বাডিটা একমাসেব জন্য নিয়েছিল সেখানে অদ্ভুত সব ঘটনাব সাক্ষী আমাদেব হতে হয়েছিল। তাদেব সঙ্গে একপক্ষকাল কাটিয়ে আসাব আমন্ত্রণ পাওযামাত্রই আমি তাদেব সোৎসাহ সম্মতি জানিযে দিলাম। ঝোপঝাডে ভবা সেই সুন্দব গ্রামাঞ্চলেব কথা আমি ভাল কবেই জানতাম, এবং সেখানকাব মনোবম গল্‌ফেব মাঠেব ছোট-খাট বিপদেব সঙ্গেও আমাব যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ পবিচয ছিল। আমাকে জানিযে দেওযা হযেছে যে গল্‌ফ নিযেই হিউ ও আমাব গোটা দিন কাটবে, আব যেহেতু মার্গাবেট খেলাটাকে মোটেই পছন্দ কবে না, তাই যে সব যন্ত্রপাতি দিযে খেলাটা খেলতে হয তাতে তাকে কখনই হাত দিতে দেওযা হবে না।

সেখানে যখন পৌঁছলাম তখনও দিনেব আলো আছে, বাডিব মালিকবা তখনও বাইবেই থাকায আমি চাবিদিকটা ঘুবে দেখতে লাগলাম। দক্ষিণমুখী একটা উঁচু জাযগাব উপব বাডি ও বাগানটা অবস্থিত, তাব নিচে একব দুই ঘাসেব জমি একটা আঁকাবাঁকা স্রোতধাবাব দিকে নেমে গেছে, সেটাকে পাব হবাব জন্য আছে একটা পাযে চলাব মতো সেতু, আব তাব পাশেই বযেছে সাজানো বাগানে ঘেবা একটা খডেব বাডি। তাব ঠিক পাশ দিযে ঘাস জমিব ভিতব দিযে একটা বাস্তা চলে গেছে বাগানেব পাশেব ফটকেব দিকে, বাস্তাটা পাযে চলাব সেতুটাব উপব দিযে চলে গেছে; এখানকাব ভৌগোলিক অবস্থান যতটা স্মবণে আছে তা থেকেই বুঝলাম যে এটাই আধ মাইল দূবেব গলফেব মাঠে যাবাব সোজা পথ। কুটিবটা ছোট জমিদাব বাডিব জমিতেই অবস্থিত, তাই আমি সঙ্গে সঙ্গেই ধবে নিলাম যে এটাই মালীব ঘব। কিন্তু এই সহজ অনুমানে একটা খটকা দেখা দিল, কাবণ কুটিবে কোন লোক নেই। সন্ধ্যাটা বেশ ঠাণ্ডা, অথচ চিমনি দিযে ধোঁযাব কুণ্ডলি উঠছে না; আবও কাছে যেতেই মনে হল কুটিবটাকে ঘিবে এমন একটা ভাব বযেছে যেটা আমবা সাধাবণত পোডো বাডিব ক্ষেত্রে কল্পনা কবে থাকি। কুটিবেব কোথাও জীবনেব চিহ্নমাত্র নেই, যদিও তাব ছিমছাম অবস্থা দেখে মনে হয যে নতুন ভাডাটেব জীবন স্পন্দনেব জন্য সেটা সম্পূর্ণ তৈবি হযে আছে। বাগানেব নতুন বং কবা পবিষ্কাব খুটিগুলোও সেই একই কাহিনীর সাক্ষী; ফুলের কেয়ারিগুলোব কোন যত্ন নেওয়া হয়নি, আগাছাগুলি কেউ

তুলে ফেলেনি ; সামনের দরজায় পাশের একসারি ক্রিসেন্থিমামের বোঁটাগুলি শুকিয়ে গেছে। কিন্তু এসবই মুহূর্তের ধারণামাত্র, কুটিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমি সেখানে থামলাম না, পায়ে-চলা সেতুটা পেরিয়ে ঝোপঝাড়ে ঢাকা মাঠ বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। জায়গাটা চিনতে আমার ভুল হয়নি, কারণ আমার ঠিক সামনেই ক্লাব-হাউসটা দেখতে পেলাম। বিকেলের ভ্রমণ সেরে হিউ নিশ্চয় এখনই ফিরে আসবে, আর আমরা একসঙ্গেই ফিরে যেতে পারব। কিন্তু ক্লাব-হাউসে পৌঁছতেই ভাণ্ডারী জানাল যে পাঁচ মিনিটও হয়নি মিসেস গ্রেইঞ্জার গাড়ি নিয়ে স্বামীর খোঁজ করতে এসেছিলেন ; কাজেই আমি যে পথে এসেছিলাম সেই পথ ধরেই ফিরে চললাম। কিন্তু একজন গল্‌ফ-খেলোয়াড়ের মতোই আমি একটু ঘুরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ গর্তের পথটা চিনতে পারি কি না দেখবার জন্য অন্য একটা পথ ধরলাম।

শীত-সন্ধ্যার আলো দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে ; ফিরবার পথে যখন পায়ে-চলা সেতুটা পার হলাম তখন অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। আমার ডান দিকে পথের পাশেই কুটিরটা ; সূর্যাস্তের আলোয় তার চুনকাম-করা সাদা দেওয়াল চকচক করছে ; চোখ ফিরিয়ে সেতুর সংকীর্ণ কাঠের দিকে দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে মনে হল যেন কুটিরের জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে ; আর তাই কুটিরে কেউ বাস করে না বলে আমার যে ধারণা হয়েছিল সেটা ভুল প্রমাণিত হল। কিন্তু পুনরায় সেদিকে ভাল করে তাকাতেই বুঝলাম যে আমারই ভুল হয়েছে ; পশ্চিম আকাশ থেকে সূর্যাস্তের লাল আলো কাঁচের উপর প্রতিফলিত হয়ে আমাকে ঠকিয়েছে, কারণ গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় কুটিরটা আগের মতোই জনশূন্য দেখাচ্ছে। তবু আমি নিচু খুঁটিওয়ালা বাঁশের ফটকটার পাশেই দাঁড়িয়ে পড়লাম, কারণ যদিও বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে যে বাড়িটা ফাঁকা, তবু অকারণেই একটা দুর্বোধ্য অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসল যে সেটা ঠিক নয়, কেউ না কেউ ওখানে বাস করে। অবশ্য লোকজন কাউকেই দেখা যাচ্ছে না, তবু আমার মনে একটা অবাস্তব ধারণা জন্মাল যে হয়তো কুটিরটার পিছনে কেউ বাস করে, কুটিরটা সামনে থাকায় আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি না, আর তার চাইতেও যুক্তিহীন একটা ধারণা আমাকে পেয়ে বসল : ওখানে কেউ থাকে কি না সেটা আমাকে দেখতেই হবে। এই কৌতূহলের স্বপক্ষে আমার মন বলল যদি কাউকে সেখানে পাই তো তার কাছ থেকেই জেনে নিতে পারব যে আমার অভীষ্ট বাড়িতে যাবার এটাই সোজা পথ কি না। এই সব ভেবেই বাগানটা পার হয়ে দরজায় টোকা দিলাম। কোন জবাব এল না ; দ্বিতীয়বার টোকা দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দরজাটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেটা তালাবন্ধ ; অগত্যা বাড়িতে ফিরে গেলাম। অবশ্যই সেখানে কেউ থাকে না ; মনে মনে বললাম, আমার অবস্থা সেই লোকটির মতো যে বিছানার নিচে চোর খুঁজতে গিয়ে সেখানে তাকে পেয়ে গেলে সাতিশয় অবাক হয়ে যায়।

যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন মালিকরা দু'জনেই ফিরে এসেছে। ডিনারের আগে দুটি ঘণ্টা গল্প-গুজবে বেশ আনন্দেই কেটে গেল। গল্‌ফ, রাজনীতি, রাশিয়ার প্রয়োজন,

রান্না, ভূতপ্রেত, মাউন্ট এভারেস্ট জয়ের সম্ভাবনা, আয়কর—যেকোন বিষয় নিয়েই আলোচনা হোক, গ্রেইঞ্জার দম্পতির সব কিছুতেই সমান আগ্রহ। নানা ধরনের কথার জাল বুনতে বুনতে যেকোন একটা বিষয়কে জোরদার করে তোলা খুবই সোজা, আর আমাদের কথাবার্তার মধ্যে বারবারই ভূতের কথা এসে পড়ল।

একসময় হিউ মন্তব্য করল, "মার্গারেট তো পাগল হতেই চলেছে, কারণ সে প্ল্যাঞ্চেট ব্যবহার করতে শুরু করেছে। শুনেছি, তুমি যদি ছ'মাস প্ল্যাঞ্চেট ব্যবহার কর, তাহলে অত্যন্ত সাবধানী ডাক্তারও সজ্ঞানে তোমাকে উন্মাদ বলে সার্টিফিকেট দেবে। তার অবশ্য বেড্‌লাম যেতে এখনও পাঁচ মাস বাকি আছে।"

"ওতে কি কোন কাজ হয়?" আমি শুধালাম।

মার্গারেট বলল, "হ্যাঁ, অনেক মজার মজার কথা বলে। এমন সব কথা বলে যা কখনও আমার মাথায়ই আসেনি। আজ রাতে একবার পরীক্ষা করব।"

হিউ বলে উঠল, "না, আজ রাতে নয়। একটা সন্ধ্যা বাদ দেওয়া হোক।"

মার্গারেট একথা মানল না।

বলতে লাগল, "প্ল্যাঞ্চেটকে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই, কারণ কোন না কোন জবাব তোমার মনের মধ্যে থাকেই। ধরা যাক, যদি প্রশ্ন করি কাল দিনটা পরিষ্কার থাকবে কি না তাহলে হয় তো—ইচ্ছা করে ঠেলে না দিলেও—আমিই পেন্সিলটা ঘুরিয়ে লিখে ফেলি হ্যাঁ।"

"আর সেদিনই বৃষ্টি হয়," হিউ বলল।

"সবসময়ই নয়, বাধা দিও না। আসল মজা হল পেন্সিলটাকে তার খুশিমতো লিখতে দেওয়া। প্রায়ই পেন্সিলের মুখে ফাঁস ও বাঁকা লাইন আঁকা পড়ে—যদিও তার কোন অর্থ থাকতেও পারে—আর প্রায়ই এমন একটা শব্দ আসে যার অর্থই আমি জানি না, সুতরাং সেটা আমার মনের কথা হতেই পারে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কাল সন্ধ্যায় আমি বার বার লিখেছি 'মালী'। তার অর্থ কি হতে পারে? এখানকার মালীটি মেথডিস্ট গির্জার লোক, তার থুতনিতে নুর আছে। প্ল্যাঞ্চেট কি তার কথাই বলেছে? আরে, প্রসাধনের সময় হয়ে গেছে। দয়া করে দেরি করবেন না, ঝোলের ব্যাপারে আমার রাঁধুনিটি বড়ই খুঁতখুঁতে।"

উঠে পড়লাম; "মালী" কথাটার সঙ্গে কিছু ধারণা আমার মনের মধ্যে গেঁথে রইল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাল কথা, পায়ে-চলা সেতুর পাশের এই কুটিরটা কিসের? ওটাই কি মালীর ঘর?"

"তাই ছিল," হিউ বলল। "কিন্তু নুর-দাড়ি এখন আর সেখানে থাকে না: আসলে কেউ থাকে না। ওটা খালি। আমি যদি এখানকার মালিক হতাম তাহলে নুর-দাড়িকে এখানেই রেখে তার মাইনে থেকে ভাড়াটা কেটে নিতাম। অনেকেরই ব্যয়হ্রাসের কোন ধারণা থাকে না তো। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

দেখলাম, মার্গারেট সাগ্রহে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

"কৌতূহল," আমি বললাম। "নেহাৎই কৌতূহল।"

"আমি বিশ্বাস করি না," মার্গারেট বলল।

"কিন্তু সত্যি তাই," আমি বললাম। "বাড়িটাতে কেউ থাকে কি না সেটা জানবার একটা অর্থহীন কৌতূহল। ওটার পাশ দিয়ে ক্লাব-হাউসে যাবার সময় ওটাকে খালি বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু ফিরবার সময় ওখানে কেউ থাকে বলে এত বেশি মনে হল যে দরজায় পর্যন্ত টোকা দিয়েছি, আর শেষ পর্যন্ত ফিরেই এসেছি।"

হিউ ততক্ষণে উপরে উঠে গেছে; মার্গারেট দাঁড়িয়ে পড়ল।

শুধাল, "সেখানে কেউ ছিল না? আশ্চর্য! এ ব্যাপারে আমার ধারণাও কিন্তু ঠিক আপনার মতো।"

আমি বললাম, "প্ল্যাঞ্চেটে বারবার 'মালী' কথাটা লেখার ব্যাপারটাও ওতেই পরিষ্কার বোঝা গেল। মালির কুটিরটার কথা সর্বদাই আপনার মনের মধ্যে ছিল।"

"কী বুদ্ধি!" মার্গারেট বলল। "তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিন।"

সে রাতে যখন বিছানায় শুতে গেলাম তখন আমার জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে উজ্জ্বল চাঁদের আলো এসে পড়ায় বাইরে তাকালাম। আমার ঘরের সামনেই বাগান আর সেই মাঠটা বিকেলে যেটা আমি পার হয়ে এসেছি। সবকিছুই পূর্ণ চাঁদের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে। ছোট নদীটার পাশে সাদা দেওয়ালের কুটিরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; জানালার কাঁচের উপর আলো পড়ায় আরও একবার মনে হল যেন ঘরের ভিতরে আলো জ্বলছে। একই দিনে দু'বার এই ভ্রান্ত দর্শন ঘটাটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হল, কিন্তু এবার অধিকতর অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। আমি দেখতে দেখতেই আলোটা নিভে গেল।

রাত পরিষ্কার থাকায় পরদিন সকালটাও পরিষ্কার থাকবে বলে যে আশা করা গিয়েছিল সেটা হল না। ঘুম ভাঙতেই দেখি বাইরে বাতাস হাহাকার করছে, আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বৃষ্টির ছাঁট এসে আমার জানালার কাঁদের উপর আছড়ে পড়ছে। গল্‌ফ খেলার কোন প্রশ্নই ওঠে না; যদিও বিকেলের দিকে ঝড়ের বেগ কিছুটা কমল, তবু একটানা বৃষ্টি পড়েই চলল। ঘরের ভিতরে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠলাম, অপর দু'জন বাইরে পা বাড়াতে কিছুতেই রাজী না হওয়ায় খোলা হাওয়ায় একটু শ্বাস নিতে গায়ে ম্যানিনটোশ চাপিয়ে আমি একাই বেরিয়ে পড়লাম। বেড়াতে বেরিয়ে মাঠের ভিতরকার কর্দমাক্ত সোজা পথটার বদলে গল্‌ফের মাঠের রাস্তাটা ধরলাম; মনের ইচ্ছা, পরদিন সকালের জন্য হিউ ও আমার দুটো বক্স ঠিক করে রাখব। ধূমপানের ঘরে বসে ছবিওয়ালা পত্রিকাগুলি নিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম, পড়ার মধ্যে কতক্ষণ ডুবে ছিলাম মনে নেই, কিন্তু অস্তসূর্যের কিরণ এসে হঠাৎ আমার পাতাটাকে আলোকিত করে দিল; চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম। বৃষ্টি থেমে গেছে, আর সন্ধ্যা নেমে আসছে দ্রুত পায়ে। তাই আবারও ঘোরা পথে না গিয়ে মাঠের ভিতরকার পথটা ধরেই বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। সেটাই দিনের মতো সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি, আর চব্বিশ ঘণ্টা আগের মতোই আবার আমি সেতুটা পার হয়ে এগোতে

লাগলাম। যতদূর মনে পড়ে, সেই সময় পর্যন্তও সেতুর কথাটা আমি একবারও ভাবিনি, কিন্তু কাল রাতে সেখানে যে আলোটাকে হঠাৎ নিভে যেতে দেখেছিলাম সেই কথাটা চকিতে মনে পড়ে গেল, আর সেই মুহূর্তে আমার মনে দুর্জয় প্রত্যয় জাগল যে ঐ কুটিরে মানুষ বাস করছে। এই কথাগুলি ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম, দরজার পাশে একটি মনুষ্য মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। গোধূলির আলোয় মুখটা চিনতে পারলাম না। শুধু এইটুকু বুঝলাম যে লোকটি দীর্ঘকায়, মজবুত গড়ন। সে দরজাটা খুলল, ভিতর থেকে বাতির একটা আবছা আলো বেরিয়ে এল; ঘরে ঢুকে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

তাহলে আমার ধারণাই ঠিক। অথচ আমাকে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে কুটিরটা খালি: তাহলে যেন বাড়িতেই ফিরেছে এমনভাবে কে ভিতরে ঢুকল? আর একবার, এবার ঈষৎ ভয়ের সঙ্গেই, দরজায় টোকা দিলাম, মনের ইচ্ছা দু'একটা সাধারণ প্রশ্ন করব; আবার টোকা দিলাম, একবার বেশ জোরে, যাতে আমার ডাক না শোনার কোন প্রশ্নই উঠতে না পারে। কিন্তু তথাপি কোন জবাব না আসায় শেষ পর্যন্ত দরজায় হাতলটা লক্ষ্য করলাম। সেটা তালাবন্ধ। তারপর অনেক কষ্টে ক্রমবর্ধমান ভয়কে সংযত করে কুটিরের চারদিকটা ঘুরলাম। প্রতিটি খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। ভিতরে সব অন্ধকার, অথচ দু'মিনিট আগে খোলা দরজা দিযে একঝলক আলো বেরিয়ে আসতে দেখেছি।

যেহেতু আমার মনের মধ্যে অনেকরকম অনুমান গডে উঠেছিল তাই এই বিচিত্র অভিযানের কথা কাউকে বললাম না। ডিনারের পরে হিউর প্রতিবাদের মধ্যেই মার্গারেট সেই প্ল্যাঞ্চেটটা বের করল যেটা অনবরত "মালী" কথাটা লিখে যাচ্ছে! আমার অনুমানটা অবশ্য খুবই অদ্ভুত, কিন্তু মার্গারেটকে কোনরকম ইঙ্গিত করতে আমি চাইলাম না...অনেকক্ষণ যাবৎ পেন্সিলটা তার কাগজের উপর নডেচডে কতকগুলি ফাঁস, বাঁকা রেখা ও আবহাওয়ার চার্টের মতো উঁচু-নিচু চড়াই এঁকে চলল, আর এই পরীক্ষা চালাতে চালাতে কোন সুসংবদ্ধ শব্দ গড়ে ওঠার আগেই ক্লান্তিতে হাই তুলতে তুলতে মার্গারেটের মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল; মনে হল সে বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছে।

বই থেকে মুখ তুলে হিউ আমার কানে কানে বলল, "কাল ও এইভাবেই ঘুমিযে পডেছিল।"

মার্গারেটের চোখ বুজে এল, ঘুমন্ত মানুষের মতো নিশ্বাস পড়তে লাগল, তারপর আশ্চর্য দৃঢ়তার সঙ্গে তার হাতটা নডতে লাগল। মস্ত বড কাগজখানার উপর সোজা এক পংক্তি লেখা হয়ে গেল; একেবারে শেষে গিযে তার হাতটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল; সে জেগে উঠল।

কাগজটার দিকে তাকাল।

বলল, "হ্যালো! তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে চালাকি করেছ!"

সেটা যে সত্যি নয় সেকথা তাকে বোঝালাম; যা লিখেছে সেটা সে পড়ল।

লেখাটা এইরকম: "মালী, মালী, আমিই মালী। আমি ভিতরে আসতে চাই। তাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না।"

"হায় প্রভু, আবার সেই মালী!" হিউ বলল।

কাগজ থেকে চোখ তুলে দেখলাম, মার্গারেটের দুই চোখ আমার উপর স্থিরনিবদ্ধ; সেকথা বলার আগেই আমি তার মনের কথা বুঝতে পারলাম।

"আপনি কি খালি কুটিরটার পাশ দিয়ে বাড়ি এসেছিলেন?" মার্গারেট প্রশ্ন করল। সে নিচু গলায় বলল, "এখনও খালি আছে? অথবা—অথবা অন্য কিছু?"

আমি সত্যি যা দেখেছি—অথবা দেখেছি বলে আমার ধারণা—সেটা তাকে বলতে চাইলাম না। যদি অদ্ভুত কিছু, দেখার যোগ্য কিছু ঘটে, সেক্ষেত্রে আমাদের নিজ নিজ ধারণা যাতে পরস্পরকে সমর্থন না করে সেটাই তো ভাল।

বললাম, "আবার টোকা দিয়েছিলাম, কিন্তু কোন জবাব পাইনি।"

ইতিমধ্যে শুতে যাবার প্রস্তাব হল: মার্গারেটই কথাটা তুলল; সে উপরে চলে যাবার পরে হিউ ও আমি আবহাওয়ার খোঁজ করতে সামনের দরজায় গেলাম। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠেছে, আমরা বাড়ির সামনেকার ঘাসে ঢাকা পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ দ্রুত ঘুরে গিয়ে হিউ বাড়ির কোণের দিকে আঙুল তুলে বলল, "ওটা কে? দেখ। ওখানে! ঐ তো মোড়টা ঘুরে গেল।"

শক্তসমর্থ গড়নের একটি ঢ্যাঙা লোককে মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম।

হিউ শুধাল, "দেখতে পাওনি? আমি ঘুরে যাচ্ছি, ওকে ধরতেই হবে। রাতের বেলায় কেউ আমাদের চারধারে ঘোরাঘুরি করবে সেটা আমি চাই না। তুমি এখানেই অপেক্ষা কর, লোকটি যদি ওদিক থেকে ঘুরে এখানে আসে তো সে কি জন্যে এসেছে জিজ্ঞাসা করো।"

হিউ চলে গেল; সামনের খোলা দরজাটার কাছে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। সে সবে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে এমন সময় দ্রুত অথচ ভারী পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম; উল্টোদিক থেকে সে শব্দ আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। অদৃশ্য পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল। তারপরই আমি আতংকে কেঁপে উঠলাম, মনে হল অদৃশ্য কেউ আমাকে ধাক্কা দিয়ে চৌকাঠ পার হয়ে গেল। কেঁপে উঠলাম—ভূতের ভয়ে নয়, কারণ আমার হাতে তার বরফ-ঠাণ্ডা ছোঁয়া আমি অনুভব করেছি। অদৃশ্য অতিথিটিকে ধরতে চেষ্টা করলাম কিন্তু সে পিছনে চলে গেল। আর পরমুহূর্তেই ভিতরকার মেঝের কার্পেটের উপর পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ভিতরকার একটা দরজা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল, তারপর আর কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। পরমুহূর্তেই যেদিক থেকে পায়ের শব্দ এসেছিল, বাড়ির সেই কোণের দিক থেকে হিউ ছুটতে ছুটতে এল।

জানতে চাইল, "কিন্তু সে কোথায়? আমার থেকে বিশ গজের বেশি দূরে তো ছিল না—একটি বড়, ঢ্যাঙা লোক।"

আমি বললাম, "কালকে দেখতে পাইনি। রাস্তায় তার পায়ের শব্দ শুনেছি, কিন্তু কিছুই দেখতে পাইনি।"

"তারপর?" হিউ শুধাল।

বললাম, "সে যেই হোক আমাকে ঠেলে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছে।"

ওক কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হয়নি। বাড়ির একতলার এঘর থেকে ওঘর আমরা অনেক খুঁজলাম। খাবার ঘর ও ধূমপানের ঘরের দরজা তালাবন্ধ, বৈঠকখানা ঘরে ঢুকবার দরজাটা খোলা; একমাত্র যে দরজাটা দেখলে খুলে আবার বন্ধ করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে সেটা হল রান্নাঘর ও চাকরদের ঘরে যাবার দরজা। সেখানে খোঁজ করেও কোন ফল হল না; রান্নাঘর, বাসন মাজার ঘর, জুতোর ঘর, চাকরদের ঘর—সর্বত্র খোঁজ করা হল, কেউ কোথাও নেই, সব ফাঁকা। আগুনের পাশে একটা দোলনা-চেয়ার পাতা আছে; সেটা তখনও দুলছে, যেন কেউ সেটাতে বসেছিল, এইমাত্র উঠে গেছে। চেয়ারটা ধীরে ধীরে দুলছে, মনে হচ্ছে কেউ সেখানে আছে, কিন্তু এখন অদৃশ্য। মনে পড়ছে, এগিয়ে গিয়ে সেটাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার হাতটাই যেন সেদিকে যেতে চাইল না।

যা দেখেছিলাম, এবং বিশেষ করে যা দেখতে পাইনি, অধিকাংশ মানুষের ঘুম কেড়ে নেবার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট, আর নিশ্চয়ই আমি খুব শক্ত মনের লোক নই। খোলা চোখে ও খোলা কানে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়েছিলাম; তারপব একসময় যখন ঘুমের কোলে ঢলে পডলাম তখন ঘরের মধ্যে সঞ্চরমান একটি মানুষের অস্পষ্ট অথচ অভ্রান্ত শব্দ আমাকে ঘুমের দেশের সীমান্ত থেকে তুলে নিয়ে এল। আমার মনে হল, হিউ হয়তো একা একাই খোঁজ করতে এসেছে, আর এগুলো তারই পায়ের শব্দ, কিন্তু তখনই আমাদের দুই ঘরের মাঝখানের দরজায় একটা টোকার শব্দ হল, আর আমার প্রশ্নের জবাবে মনে হল যে আমিই এখন অস্বস্তির সঙ্গে কথা বলছি কি না জানবার জন্যই হিউ এসেছে। আমরা যখন কথা বলছি তখনই পায়ের শব্দটা আমার দরজাটা পার হয়ে গেল, এবং উপরে যাবার সিঁড়িতে মচমচ শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তেই ছাদের কোন ঘরে আমাদের ঠিক মাথার উপরে পায়ের শব্দ হতে লাগল।

হিউ বলল, "ওখানে তো চাকরদের শোবার ঘর নয়। ওখানে কেউ ঘুমোয় না। চল তো, দেখে আসি: নিশ্চয় কেউ এসেছে।"

মোমবাতি জ্বালিয়ে পা টিপে টিপে উপরে উঠতে লাগলাম। আর যেই একেবারে উপরের সিঁড়িটায় পা দিয়েছি অমনি আমার ঠিক এক পা আগে থেকে কিন্তু হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় কথা বলে উঠল।

"কিন্তু কে যেন আমার পাশ দিয়ে চলে গেল!" বলেই সে বাতাসকেই আঁকড়ে ধরল। আমারও সেই একই অনুভূতি হল, আর পরমুহূর্তেই আমাদের নিচের দিককার সিঁড়িতে মচ্‌মচ্‌ শব্দ উঠল; অদৃশ্য মানুষটি নেমে গেল।

সারারাত ধরে সেই পায়ের শব্দ বারান্দায় ঘুরে বেড়াতে লাগল, কেউ যেন সারাবাড়িটা খুঁজে ফিরছে। শুয়ে শুয়ে সেই শব্দ শুনতে শুনতে মার্গারেটের আঙুল থেকে প্ল্যাঞ্চেটের পেন্সিলের মুখে যেকথা লেখা হয়েছিল সেটা আমার মনে পড়ে গেল। "আমি ভিতরে যেতে চাই। তাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না।"...সত্যি, কেউ একজন এসেছে, সর্বত্র খোঁজ করছে। মনে হতে পারে, তাহলে তো সেই মালী। কিন্তু অদৃশ্য অনুসন্ধানকারী এ কোন্ মালী, আর কাকেই বা সে খুঁজছে?

কোন শারীরিক ব্যথা সেরে গেলে যেমন ব্যথাটা ঠিক কি রকম ছিল সেটা মনে করা বেশ শক্ত, ঠিক সেইরকম পরদিন সকালে পোশাক পরতে পরতে গতকালের নৈশ অভিযানের সঙ্গে যুক্ত প্রেতাত্মার ভয়ের ব্যাপারটাকে অনেক চেষ্টা করেও সঠিকভাবে মনে করতে পারলাম না। শুধু মনে আছে, আবার রাতে দোলনা-চেয়ারটাকে দুলতে দেখে এবং বাইরের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে আমার ভিতরটা কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এবং আমার গায়ে যে অদৃশ্য ছোঁয়া লেগেছিল তাতেই বুঝেছিলাম যে একজন কেউ বাড়িতে ঢুকেছিল। কিন্তু এখন এই সুন্দর, শান্ত সকালে, শীতের সূর্যস্নাত সারাটা দিনমানে কিছুতেই বুঝতে পারছি না সেটা কি ঘটেছিল। শারীরিক ব্যথার মতোই সেটা উপস্থিত থাকলে তবেই তাকে বোঝা যেত, কিন্তু সারাটা দিন সে তো অনুপস্থিত। হিউয়েরও সেই একই অবস্থা, বরং ব্যাপারটা নিয়ে সে হাসি-ঠাট্টাই শুরু করে দিল।

বলল, "দেখ, সে যেই হোক, আব যাকেই খুঁজুক, সে কিন্তু দেখতে ভাল। ভাল কথা, মার্গারেটকে কিন্তু একটি কথাও বলো না। এই চেযারের দুলুনি বা আবির্ভাবের কথা সে কিছুই শোনেনি। আর যাই হোক, সে কিছুতেই মালী নয়; কে কবে শুনেছে যে মালী সারাক্ষণ বাড়িময ঘুরে বেড়ায়?"

সেদিন বিকেলে মার্গারেট গাড়ি নিয়ে তার কোন বন্ধুর বাড়ি চা খেতে গিয়েছিল; ফলে হিউ ও আমি খেলার শেষে ক্লাব হাউসেই কিছু খেয়ে নিলাম, আর পরপর এই তৃতীয় দিন চুনকাম-করা কুটিরের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু আজ রাতে কেউ সেখানে আছে বলে মনে হল না; কুটিরটা ভয়ানক নির্জন, ভাড়াটেবিহীন খালি বাড়ি যেরকম হয়ে থাকে, জানালা দিযে কোন আলো অথবা আলোর মতো কিছুও দেখা গেল না। হিউকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলায় সে তাকেও রাতের স্মৃতির মতোই হেসে উড়িয়ে দিল; বাড়ির দরজায় যখন পৌঁছে গেল তখনও সে ব্যাপারটা নিয়ে ইয়ার্কি করেই চলেছে।

বলল, "আরে বাবা, এও একধরনের মনের রোগ। মাথায লাগাবার মতো। আরে, দরজা যে তালাবন্ধ!"

সে কড়া নাড়ল, দরজায় টোকা দিল; ভিতর থেকে চাবি ঘোরানো ও হুড়কো তোলার শব্দ এল।

যে চাকরটি দরজা খুলে দিল তাকে হিউ শুধাল, "দরজায় তালা কেন?"

লোকটি এক পা থেকে অপর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। বলল, "আধ ঘণ্টা আগে ঘণ্টা বেজেছিল স্যার; তা শুনে এসে দেখি একটি লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আর—"

"আচ্ছা?" হিউ বলল।

"তার চাউনি আমার ভাল লাগেনি স্যার; তার কি কাজ জানতে চাইলাম। তিনি কিছুই বললেন না, আর তার পরেই চটপট সরে পড়লেন; আর তাকে দেখতে পেলাম না।"

আমার দিকে তাকিয়ে হিউ শুধাল, "তিনি কোন্‌দিকে গেলেন বলে মনে হল?"

"ঠিক বলতে পারব না স্যার। ঠিক চলে গেলেন বলে মনে হল না। কেউ যেন আমার পাশ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল।"

"ঠিক আছে," হিউ শক্ত গলায় বলল।

মার্গারেট তখনও বাড়ি ফেরেনি। একটু পরেই যখন তার মোটরের চাকার শব্দ শোনা গেল তখন হিউ আর একবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা যেন কিছুই তাকে না বলা হয়; ইতিমধ্যেই তো সে অভিজ্ঞতার একজন তৃতীয় অংশীদার জুটেছে। চোখে-মুখে প্রচুর উত্তেজনা নিয়ে মার্গারেট ঘরে ঢুকল।

বলল, "আমার প্ল্যাঞ্চেট নিয়ে আর কখনও হাসবে না। মড অ্যাশ্‌ফিল্ডের মুখে একটা অসাধারণ গল্প শুনে এলাম—ভয়ঙ্কর, কিন্তু কি নিদারুণভাবে আকর্ষণীয়।"

"ওসব কথা থাক," হিউ বলল।

"শোন, এখানে একজন মালী ছিল। পায়-চলা সেতুটার পাশের ঐ ছোট কুটিরটায় সে থাকত; পরিবারের লোকজন যখন লন্ডনে চলে যেত, তখন সে আর তার স্ত্রী বাড়িটার দেখাশুনা করত আর এখানে থাকত।"

হিউয়ের সঙ্গে আমার দৃষ্টি-বিনিময় হল; তারপর সে চলে গেল। তখন আমি যা ভেবেছি সেও যে ঠিক তাই ভেবেছে এ-কথা আমি হলফ করে বলতে পারি।

মার্গারেট বলতে লাগল, "বিয়ে করেছিল নিজের চাইতে অনেক কম বয়সের একটি মেয়েকে; ধীরে ধীরে সে স্ত্রীর প্রতি ভয়ানক ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠল। একদিন রাগের মাথায় নিজের হাতে স্ত্রীকে গলা টিপে মেরে ফেলল। কিছুক্ষণ পরে একজন কুটিরে এসে দেখল সে স্ত্রীকে ধরে কাঁদছে, তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। সকলে পুলিশ ডাকতে গেল, কিন্তু তারা আসার আগেই সে নিজের গলা কেটে ফেলল। কী ভয়ংকর, তাই না? কিন্তু এটাও তো অবাক ব্যাপার যে প্ল্যাঞ্চেট বলে, 'মালী। আমি মালী। আমি মালী। আমি ভিতরে আসতে চাই। এখানে তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।' জানেন, এসব কিছুই আমি জানতাম না। আজ রাতে আবার প্ল্যাঞ্চেটে বসব। আরে, আধ ঘণ্টার মধ্যেই তো ডাক চলে যাবে, আর আমাকে তো একগাদা চিঠিপত্র পাঠাতে হবে। কিন্তু হিউ, ভবিষ্যতে আমার প্ল্যাঞ্চেটকে সম্মান দিয়ে চলো।"

মার্গারেট চলে গেলে আমরা ব্যাপারটা নিয়ে কথা বললাম; নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিশ্বাস করলেও হিউ কিন্তু এই "প্ল্যাঞ্চেটের বুজরুকি"র পিছনে ঘটনার আকস্মিক

যোগাযোগ ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করতে চাইল না। কিন্তু তবু সে আবার বলল, "গত রাতে এই বাড়িতে আমরা যা শুনেছি ও দেখেছি, এবং আজ সন্ধ্যায়ই পুনরায় যে বিচিত্র অতিথিটি এসেছিল তার কথা যেন মার্গারেটকে কিছুই বলা না হয়।"

সে বলল, "সে বেচারি ভয় পাবে, আর আজেবাজে কল্পনা করতে শুরু করবে। আর প্ল্যাঞ্চেটের কথা, ওতে হিজিবিজি লেখা ও ফাঁস আঁকা ছাড়া আর কিছুই হবে না। ওটা কি? হ্যাঁ; ভিতরে আসুন!"

ঘরের ভিতরে কোন এক জায়গা থেকে একটা তীক্ষ্ণ, দৃঢ় ঠোক্করের শব্দ এল। শব্দটা দরজার কাছ থেকে এল বলে আমার মনে হল না, কিন্তু হিউ যখন দেখল যে আসতে বলার জবাবে কেউ সাড়া দিল না তখন সে লাফিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। বাইরের হলঘরে কয়েক পা গিয়েই ফিরে এল।

"শুনতে পাচ্ছ না?" সে শুধাল।

"পাচ্ছি। ওখানে কেউ নেই?"

"একটি প্রাণীও না।"

হিউ অগ্নিকুণ্ডের কাছে ফিরে এল; বিরক্তির সঙ্গে সদ্য ধরানো সিগারেটটা আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিল।

বলল, "শব্দটা কী বিশ্রী। যদি জানতে চাও আমি আরাম বোধ করছি কি না তাহলে তোমাকে বলি, এর চাইতে কম আরাম আমি জীবনে কখনও পাইনি। যদি জানতে চাও তো বলি, আমি ভয় পেযেছি, আর আমার বিশ্বাস তুমিও ভয় পেয়েছ।"

একথা অস্বীকার করার তিলমাত্র ইচ্ছা আমার ছিল না; সে আবার বলতে লাগল।

"আমাদের খুব সংযত হয়ে চলতে হবে। ভয়ের মতো সংক্রামক আর কিছু নেই। আমাদের কাছ থেকে ভয় যেন মার্গারেটকে না ধরে। কিন্তু তুমি তো জান, আমাদের ভয়ের চাইতেও বড কিছু আছে। একটা কিছু এ বাড়িতে ঢুকেছে, আর আমরাও তার পিছনে লেগেছি। আগে কখনও আমি এসব জিনিসে বিশ্বাস করতাম না। এক মিনিটের জন্য এটার মুখোমুখি হওয়া যাক। আসলে এটা কি?"

আমি বললাম, "আমি এটাকে কি মনে করি যদি জানতে চাও তো বলি, আমি বিশ্বাস করি যে-লোকটি স্ত্রীকে গলা টিপে মেরে ফেলে তারপর নিজের গলা কেটেছিল, এটা তারই আত্মা। কিন্তু এটা আমাদের কেমন করে আঘাত করতে পারে তা আমি বুঝি না। আসলে নিজেদেব ভয়কেই আমরা ভয় করছি।"

হিউ বলল, "কিন্তু আমরা তো এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। তাহলে এ কি করবে? হে ঈশ্বর, শুধু যদি জানতাম এ কি করবে, তাহলে তো কোন কথাই থাকত না। কিন্তু এই যে না জানা...আরে, পোশাক পরার সময় হয়ে গেছে।"

ডিনারের সময় মার্গারেটের মন-মেজাজ খুবই ভাল ছিল। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যেসব আবির্ভাব ঘটেছে তাব কিছুই জানে না বলে তার প্ল্যাঞ্চেট মালীর সম্পর্কে যে "অনুমান" (ভাষাটা তারই) করেছে সেই চিন্তায়ই সে মশগুল হয়ে আছে। সেই আলোচনা থেকেই সে বিষয় পরিবর্তন করে একটা নতুন ধরনের তিনজনে মজার

পেশেন্স খেলার কথা বলতে লাগল; খেলাটা সে তার বন্ধুর কাছ থেকে শিখে এসেছে, এবং তাকে কথা দিয়েছে যে ডিনারের পরে আমাদের দু'জনকেও শিখিয়ে দেবে। তাই সে করল; আর আমরা দু'জনই যে প্ল্যাঞ্চেটকে এড়িয়ে যেতেই চাইছি সেটা না জেনেই সে খেলা নিয়ে মেতে উঠল। কিন্তু হঠাৎ তার খেয়াল হল যে রাত অনেক হয়ে গেছে; তাড়াতাড়ি সে সব তাস গুটিয়ে ফেলল।

বলল, "এবার আধ ঘণ্টার জন্য প্ল্যাঞ্চেটে বসা যাক।"

হিউ বলল, "আহা, আরও একটা হাত কি খেলা যায় না? অনেকদিন পরে একটা ভাল খেলা দেখলাম। এ খেলার পরে প্ল্যাঞ্চেট একেবারেই জমবে না।"

মার্গারেট বলল, "লক্ষ্মীটি, মালীটি যদি আবার ধরা দেয়, তাহলে বেশ জমবে।"

"কিন্তু এসব তো প্রলাপ," হিউ বলল।

"তুমি এত কঠোর! তাহলে বই পড় গে।"

হিউ উঠে পড়ল। মার্গারেটও ততক্ষণে তার যন্ত্র ও একটা কাগজ বের করে ফেলেছে।

হিউ বলল, "মার্গারেট, আজ রাতে দয়া করে প্ল্যাঞ্চেটে বসো না।"

"কিন্তু কেন? তোমার তো থাকার দরকার নেই।"

"দেখ তবু বলছি, আজ ওটা থাক," হিউ বলল।

মার্গারেট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাল।

বলল, "হিউ, তোমার মনে যেন কিছু আছে। সেটা ঝেড়ে ফেল। মনে হচ্ছে তুমি ভয় পেয়েছ। ভাবছ, এর মধ্যে রহস্যময় কিছু আছে। সেটা কি?"

বুঝতে পারলাম, কথাটা বলবে কি বলবে না তাই নিয়ে হিউ ইতস্তত করছে। কিন্তু প্ল্যাঞ্চেটে কিছু হিজিবিজি লেখা হোক এটাই সে শেষ পর্যন্ত বেছে নিল।

বলল, "বেশ, তাহলে শুরু করে দাও।"

মার্গারেট ইতস্তত কবতে লাগল; হিউকে বিরক্ত করতে সেও চায় না। কিন্তু হিউয়ের এই পীড়াপীড়ি তাব কাছে খুবই যুক্তিহীন বলে মনে হচ্ছে। বলল, "বেশ, ঠিক দশ মিনিট; কথা দিচ্ছি, মালীদের কথা মোটেই ভাবব না।"

বোর্ডের উপর হাত রাখা মাত্রই মার্গারেটের মাথাটা সামনে ঝুলে পড়ল, তার যন্ত্রটা চলতে শুরু কবল। আমি তার খুব কাছেই বসেছিলাম; সেটা কাগজেব উপর ঘুরতে লাগল আর লেখাটা পবিষ্কার ফুটে উঠল।

লেখা হল: "আমি ভিতরে এসেছি, কিন্তু তবু তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তোমরা কি তাকে লুকিয়ে রেখেছ? তোমরা যেখানে আছ সে ঘরটা আমি খুজে দেখব।"

আরও কি লেখা প্ল্যাঞ্চেটেব তলায় চাপা পড়েছিল তা আমি জানি না, কারণ সেই মুহূর্তে একটা বরফ-ঠাণ্ডা বাতাসের স্রোত ঘরের মধ্যে বয়ে গেল, আর প্রচণ্ড জোরে দরজায় একটা ধাক্কা পড়ল। এবার আর ভুল হবার কোন সুযোগ নেই। হিউ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "মার্গারেট, জাগ, কি যেন আসছে।"

দরজাটা খুলে গেল; একটি মনুষ্য মূর্তি দেখা দিল। ঠিক দরজায় দাঁড়িয়ে সে মাথাটাকে সামনে গলিয়ে এদিক-ওদিকে নাড়তে লাগল; মনে হল, দুটি চোখের একাগ্র ও একান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে ঘরের প্রতিটি কোণ খুঁজে ফিরছে।

হিউ আবার চেঁচিয়ে ডাকল, "মার্গারেট, মার্গারেট।"

কিন্তু মার্গারেটের চোখ দুটিও বিস্ফারিত; এই ভয়ংকর অতিথির উপর স্থিরনিবদ্ধ।

মার্গারেট উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে চাপা গলায় বলল, "শান্ত হও হিউ।" ভূতটি এখন সরাসরি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। মরচে-রঙের পুরু দাড়ির উপরকার ঠোঁটটা একবারমাত্র নড়ল, কিন্তু কোন শব্দ বের হল না, শুধু মুখটা নড়ল, আর লালা গড়িয়ে পড়ল। ভূতটা মাথা তুলল, আর—ত্রাসের উপর ত্রাস—আমি দেখলাম তার গলার একটা দিকে একটা লাল, চকচকে ঘা হাঁ করে আছে...

তিনজনই অনড়, জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম; একটা মারাত্মক নিশ্চলতা আমাদের না দিল নড়তে, না দিল কথা বলতে। এ অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম জানি না; মনে হয় খুব বেশি হলে দশ সেকেন্ড। তারপরই অপচ্ছায়াটা ঘুরে দাঁড়াল, যেমন এসেছিল তেমনিই চলে গেল। কার্পেট-পাতা মেঝের উপর দিয়ে তার চলমান পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম; সামনের দরজার হুড়কো খোলার শব্দ হল, আর বাড়ি-কাঁপানো শব্দ করে দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল!

"সব শেষ হয়ে গেল," মার্গারেট বলল। "ঈশ্বর আমাদের প্রতি করুণা করুন।"

মৃত্যুর দেশ থেকে এই আবির্ভাবের যেকোন ব্যাখ্যা পাঠকরা খুশিমতো করতে পারেন। এটাকে যে মৃত্যুর দেশ থেকে আবির্ভাব বলেই মনে করতে হবে তারও কোন কথা নেই। তিনি একথাও বলতে পারেন, যেখানে এই হত্যা ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছিল সেখানে এমন কোন আবেগদীপ্ত প্রমাণ রয়ে গেছে যেটা কোন বিশেষ পরিবেশে দৃশ্য ও অদৃশ্য মূর্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। ইথারের ঢেউ, অথবা অন্য অনেক কিছুই, এ ধরনের দৃশ্যের ছাপ ধরে রাখতে পাবে; সমস্যার সমাধানের জন্য এও বলা যায় যে সেই সব ছাপ যেকোন সময়েই বাস্তবে রূপায়িত হবার যোগ্য। অথবা পাঠক একথাও বলতে পারেন যে মৃত মানুষটির আত্মা সত্যি সত্যি আত্মপ্রকাশ করেছিল; যে স্থানে সে অপরাধটি করেছিল, আত্মিক প্রায়শ্চিত্ত ও অনুশোচনার জন্য সেখানেই ফিরে এসেছিল। স্বভাবতই কোন বস্তুবাদীই মুহূর্তের জন্যও এই ব্যাখ্যাকে মেনে নেবেন না; আবার একজন বস্তুবাদীর মতো একগুঁয়ে যুক্তিহীন মানুষও তো দ্বিতীয়টি নেই। একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা যে সেখানে ঘটেছিল সেটা তো সন্দেহের অতীত, আর মার্গারেটের শেষ উক্তিটিও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত

মাদাম ক্রোল-এর ভূত

Madam Crowl's Ghost—-জোসেফ সাবিডন লে ফানু

আজ আমি একটি বুড়ি; কিন্তু যে রাতে অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েল হাউসে এসেছিলাম সেদিন আমার বয়স সবে তেরো পার হয়েছে। পিসি ছিল সে বাড়ির গৃহকর্ত্রী; একটা এক-ঘোড়ার গাড়ি লেক্সহো-তে অপেক্ষা করছিল আমাকে ও আমার বাক্সটাকে অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েল-এ নিয়ে যেতে।

লেক্সহোতে পৌঁছেই আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম; গাড়ি ও ঘোড়ার চেহারা দেখেই মনে হয়েছিল মাকে নিয়ে তখনই হেজেল্‌ডেন-এ ফিরে যাই। "শে"—তে চড়েই—গাড়িটাকে আমরা ঐ নামেই ডাকতাম—আমি কাঁদতে শুরু করলাম, আর বুড়ো কোচয়ান ভাল মানুষ জন মুল্‌বেরি আমাকে খুশি করার জন্য গোল্ডেন লায়ন-এ একমুঠো আপেল এনে দিল; মুখে বলল, সেই বড় বাড়িতে পিসির ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে গরম-গরম কিসমিস দেওয়া কেক, চা ও শূকর-মাংসেব চপ। জ্যোৎস্নালোকিত সুন্দর রাত; শে-র জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আমি আপেল খেতে লাগলাম।

আমার মতো একটি অসহায় বোকা শিশুকে ভয় দেখানো ভদ্রলোকদের পক্ষে অবশ্যই লজ্জার কথা। মাঝে মাঝে মনে হয়, ওটা ওদের চালাকি। আমার পাশেই দুটি ভদ্রলোক বসেছিল। রাতে চাঁদ উঠবার পরে তারা আমাকে প্রশ্ন করল, আমি কোথায় যাচ্ছি। আমি বললাম, লেক্সহো র নিকটবর্তী অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েল হাউসের আরাবেলা ক্রোল ঠাকরুণের সঙ্গিনী হতেই আমি সেখানে যাচ্ছি।

একজন বলে উঠল, "তাই বুঝি; বেশিদিন সেখানে টিকতে পারবে না।"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম।

সে বলল, "কারণ—যদি বাঁচতে চাও তো এ-কথা কাউকে বলো না—তাঁকে তো শয়তানে ভর করেছে; তিনি নিজেই তো আধা ভূত। তোমার সঙ্গে বাইবেল আছে তো?"

"হ্যাঁ স্যার," আমি বললাম। আমার বাক্সটাতে মা একখানা ছোট বাইবেল ভরে দিয়েছে; আমি জানি সেখানা আজও বাক্সেই আছে। আমার বুড়ো চোখের পক্ষে ছাপার অক্ষরগুলো খুব ছোট হলেও সেখানা আজও আমার কাছে আছে।

"হ্যাঁ স্যার," বলতে গিয়ে চোখ তুলে তাকাতেই মনে হল যে তার সঙ্গীকে চোখ টিপল; কিন্তু সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই।

সে বলল, "দেখ, প্রতি রাতেই বইখানাকে অবশ্যই বালিশের নিচে রেখে দিও তাহলেই বুঁড় খুকির নখগুলো তোমার কাছ থেকে দূরে থাকবে।"

তার কথা শুনে আমি যে কি ভয় পেয়েছিলাম তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। বৃদ্ধা মহিলাটি সম্পর্কে তাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছাও হয়েছিল, কিন্তু আমি তখন খুব লাজুক ছিলাম, আর তারা দু'জনও নিজেদের কথাই বলতে শুরু করে দিল। যথাসময়ে আমি লেক্সহোতে নেমে গেলাম। অন্ধকার পথ ধরে চলতে চলতে আমার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে লাগল। বড বড সব গাছ ঘন হযে দাঁডিযে আছে; গাছগুলিও পুরনো বাডিটারই মতোই পুরনো; চারজন লোক হাতে-হাত ধরেও সে সব গাছকে বেড দিযে ধরতে পারবে না।

যাই হোক, বড বাডিটাকে প্রথমবারেব মতো দেখবার জন্য জানালা দিযে গলাটা বাডিযে দিলাম, আর তখনই হঠাৎ গাডিটা থেমে গেল।

মস্ত বড একটা সাদা কালো রংযের বাডি; বড বড কালো বরগা, পাশকপালিগুলো চাঁদের আলোয কাগজের মতো সাদা দেখাচ্ছে, বাডির ঠিক সামনে দু'-তিনটে গাছের ছাযা পডেছে, বড হলের জানালাগুলির হীরকাকৃতি কাঁচের শার্সির উপর চাঁদের আলো পডে চিক চিক কবছে, সামনের দেওয়াল থেকে ঝোলানো সেকেলের বড বড পর্দা ঝুলছে, সামনেব বাকি জানালাগুলি হুডকো দিযে আটকানো, কারণ বাডির অধিবাসী বলতে তিন চাবটি চাকব ও একটি বৃদ্ধা মহিলা; অধিকাংশ ঘরই তালাবন্ধ হযে পডে আছে।

যখন বুঝতে পারলাম যে যাত্রা শেষ হযেছে তখন আমাব প্রাণটা যেন মুখেব ভিতব উঠে এল।

হলে ঢুকতেই পিসি আমাকে চুমো খেল, তার ঘবে নিযে গেল। পিসির চেহাবা লম্বা ও সরু, পাণ্ডুব মুখে দুটি কালো চোখ, কালো দস্তানা পবা লম্বা সরু হাত। বযস পঞ্চাশ পেরিযে গেছে, অল্প কথা বলে, কিন্তু তার কথাই আইন। তার বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই; কিন্তু তাব মনটা বড কঠোর; মনে হয, তাব ভাইয়ের মেযে না হযে আমি যদি তার বোনের মেযে হতাম তাহলে পিসি হয তো আমার প্রতি আরও সদয ব্যবহার করত। কিন্তু এখন আর সেকথা ভেবে লাভ কি।

জমিদাববাবু—তাব নাম মিঃ শের্ভেনিক্স ক্রোল, ক্রোল গিন্নির নাতি—বছরে দু' তিনবাব নিচে নামতেন বৃদ্ধা মহিলার খোঁজখবর নিতে। আমি যতদিন অ্যাপ্‌ল্‌ওযেল হাউসে ছিলাম তাব মধ্যে তাকে মাত্র দু'বার দেখেছি।

ঠিক বলতে পাবি না, তবে তার দেখাশুনা বেশ ভালভাবেই চলছিল, কারণ আমার পিসি ও দাসী মেগ ওয়াইভার্ন দু'জনেরই বিবেক ছিল, আর দু'জনই তার প্রতি কর্তব্য পালন করত।

মিসেস ওয়াইভার্ন—পিসি নিজে তাকে মেগ ওয়াইভার্ন বলে ডাকত আর আমার কাছে তার নাম বলত মিসেস ওয়াইভার্ন—মোটাসোটা ও আমুদে স্বভাবের মেয়েমানুষ, বয়স পঞ্চাশ, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, সব সময় হাসি-খুশি, হাঁটা-চলা ধীরে-সুস্থে। ভাল মাইনে পায়, কিন্তু কিছুটা কঞ্জুস, ভাল জামাকাপড় সব তালা-চাবি দিয়ে আটকে রেখে আর বেশির ভাগ সময় পরে থাকে চকোলেট রংয়ের সুতীর জামা, তাতে লাল-হলুদ টান, আর সবুজ পাতা ও বল আঁকা; জামাটা টেকেও খুব।

যতদিন সেখানে ছিলাম সে আমাকে কিছু দেয়নি, একটা পিতলের অঙ্গুলিত্রাণ পর্যন্ত না; কিন্তু সে ছিল খুব মজার মানুষ, আর সব সময় হাসত; চা খেতে বসে আমাকে মন-মরা হয়ে থাকতে দেখে হাসি-গল্পে মাতিয়ে তুলত। মনে হয় পিসির চাইতে তাকেই আমি বেশি পছন্দ করতাম—একটু হাসলে বা গল্প করলেই ছোটরা বশ হয়ে যায়—যদিও পিসি আমাকে খুবই ভালবাসত, তবুও কোন কোন বিষয়ে তার ব্যবহার ছিল কঠোর, কিন্তু নিঃশব্দ।

পিসি আমাকে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল, যাতে তার ঘরে চায়ের টেবিল সাজাবার ফাঁকে আমি একটু বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারি। কিন্তু প্রথমেই আমার কাঁধে হাত বুলিয়ে বলল, বয়সের তুলনায় আমি তো বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছি, আর জানতে চাইল যে আমি সাদামাঠা কাজ ও সেলাই করতে পারি কি না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তার যে ভাই মারা গেছে আমি নাকি তার মতো অর্থাৎ আমার বাবার মতোই দেখতে; অবশ্য সে এ আশাও প্রকাশ করল যে আমি যেন একজন ভাল খ্রিস্টানের মতো চলি এবং কোন বাজে কাজ না করি।

মনে হল, তাব ঘরে প্রথম পা দিয়েই কথাগুলি বড়ই কড়া লাগল।

পাশের ঘরে—অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর ঘরে ঢুকলাম; ঘরটা খুব আরামদাযক, চারিদিকে কেবল ওক কাঠ—সুদৃশ্য অগ্নিকুণ্ডে কযলা, পচা ঘাস ও কাঠের আগুন জ্বলছে, টেবিলের উপর চা, গরম কেক ও ধূমায়মান মাংস; আর আছে মিসেস ওয়াইভার্ন—মোটাসোটা ও হাসিখুশি; এক ঘণ্টার সে যত কথা বলে পিসি এক বছরেও তা বলে না।

আমাকে চাযের টেবিলে বসিয়ে রেখে পিসি উপরে গেল মাদাম ক্রোলকে দেখতে।

মিসেস ওয়াইভার্ন বলল, "বুড়ি জুডিথ স্কোয়াইলেস জেগে আছে কি না দেখতেই উনি উপরে গেলেন। আমি এবং মিসেস শাটার্স"—আমার পিসির নাম—"যখন না থাকি তখন জুডিথই মাদাম ক্রোলের পাশে বসে থাকে। মহিলাটি বড়ই গোলমেলে। তার সঙ্গে কথা বলতে হলে খুব সতর্ক থাকতে হবে, নইলে তিনি তোমাকে আগুনের মধ্যে অথবা জানালা দিযে বাইরে ছুঁড়ে দেবেন। তিনি যেন বিদ্যুৎগতিতে চলেন, সত্যি, বুড়ি হলেও সেইভাবেই চলেন।"

"তার বয়স কত মা'ম?" আমি বললাম।

"গত জন্মদিনে তার বয়স ছিল তিরানব্বই বছর; তারপর আট মাস কেটে গেছে," বলে সে হাসল। "তোমার পিসির সামনে তার বিষয়ে কোন প্রশ্ন করো না—বলে

দিলাম, মনে থাকে যেন; তাকে যেমনটি দেখবে, তেমনটি চলবে, ব্যস, তাহলেই হল।”

আমি বললাম, “আচ্ছা মা'ম, তার কাছে আমার কাজ কি হবে?”

“ওই বৃদ্ধার কাছে? দেখ, তোমার পিসি মিসেস শাটার্সই তোমাকে সেকথা বলে দেবেন; তবে আমার ধারণা তোমার কাজ নিয়ে তোমাকে ঐ ঘরে বসে থাকতে হবে, তিনি কোন কিছুর ক্ষতি না করেন সেদিকে নজর রাখতে হবে, টেবিলে তার যেসব জিনিসপত্র আছে তাই নিয়ে তিনি যাতে মেতে থাকেন তার ব্যবস্থা করতে হবে, তার কথামতো খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, তাকে সব রকম ক্ষতির বাইরে রাখতে হবে, এবং তিনি বড় বেশি গোলমাল শুরু করলে সজোরে ঘণ্টা বাজাতে হবে।”

“তিনি কি কালা মা'ম?”

“না, অন্ধও নন; তার বুদ্ধি সূঁচের মতো তীক্ষ্ণ কিন্তু কোন কিছুই ঠিক ঠিক মনে রাখতে পারেন না; আর রাজ-দরবার অথবা জাতীয় সমস্যার আলোচনায় তিনি যতটা সুখ পান ঠিক ততটাই সুখ পান দৈত্য নিধনকারী জ্যাক অথবা ভাল জুতোজোড়ার গল্প শুনে।”

“আর গত শুক্রবারে যে ছোট মেয়েটি চলে গেছে, সে চলে গেল কেন? পিসি আমার মাকে লিখেছে যে তাকে যেতে হয়েছে।”

“হ্যাঁ; সে চলে গেছে।”

“কিসের জন্য?” আমি আবার বললাম।

“আমার মনে হয় সে মিসেস শাটার্সের ডাকে সাড়া দেয়নি বলে। আমি ঠিক জানি না। অত কথা বলো না। তোমার পিসি বক-বক করা মেয়েকে সইতে পারেন না।”

“দয়া করে বলুন মা'ম, বৃদ্ধা মহিলার স্বাস্থ্য ভাল তো?” আমি বললাম।

“সেকথা জিজ্ঞাসা করাটা দোষের নয়। সম্প্রতি একটু ভুগছেন বটে, কিন্তু গত সপ্তাহ থেকে ভাল আছেন; আমি জোর গলায় বলতে পারি তিনি শত বছর বেঁচে থাকবেন! হিস্! বারান্দায় তোমার পিসি আসছেন।”

পিসি ঘরে ঢুকে মিসেস ওয়াইভার্নের সঙ্গে কথা বলতে লাগল; কিছুটা স্বস্তি বোধ করায় আমি ঘরময় ঘুরে ঘুরে এটা-সেটা দেখতে লাগলাম। কাবার্ডে সুন্দর সুন্দর পুরনো চিনেমাটির পুতুল ছিল; দেওয়ালে ছবি টাঙানো; একটা দরজা খোলাই ছিল; ভিতরে একটা অদ্ভুত পুরনো চামড়ার কুর্তা ঝোলানো দেখতে পেলাম; তাতে পটি ও বকলস আঁটা; হাত দুটো খাটের ছত্রির সমান লম্বা।

ভেবেছিলাম আমার দিকে পিসির নজর নেই; কিন্তু সে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, “ওখানে কি করছ মেয়ে? তোমার হাতে ওটা কি?”

চামড়ার কুর্তাটা হাতে নিয়েই মুখ ফিরিয়ে বললাম, “এটা মা'ম? এটা কি আমি জানি না মা'ম।”

পিসির ম্লান গাল দুটি রাঙা হয়ে উঠল, রাগে দুই চোখ জ্বলে উঠল, মনে হল তার আব আমার মাঝখানে দু' পায়ের ব্যবধান না থাকলে সে আমাকে আচ্ছা করে ধোলাই দিত। কিন্তু আমার ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়েই পিসি এক ঝটকায় জিনিসটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, "যতদিন এখানে থাকবে, নিজের জিনিস ছাড়া অন্য কোন কিছুতে কখনও হাত দেবে না।" কুর্তাটা যেখানে ছিল সেখানেই ঝুলিয়ে রেখে পিসি সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল।

মিসেস ওয়াইভার্ন দুই হাত তুলে হাসতে লাগল; নিজের চেয়ারে একটু যেন গড়াগড়িও খেল।

আমার চোখে তখন জল এসে গেছে। পিসির দিকে চোখ টিপে নিজের চোখের জল মুছতে মুছতে—হাসতে হাসতে তাব চোখে জল এসে গিয়েছিল—মিসেস ওয়াইভার্ন বলল, "ধুৎ, মেয়েটি কোন ক্ষতি করতে চায়নি—আমার কাছে এস মেযে। ওটা খোঁড়াদের জন্য একটা ক্রাচ; কিন্তু মনে বেখো, কোন প্রশ্ন করো না, তাহলে আমরাও তোমাকে মিথ্যা বলব না; এখানে এসে বস; শুতে যাবার আগে এক মগ বীয়ার খেয়ে নাও।"

মনে রাখবে, আমার ঘরটা ছিল দোতলায, বৃদ্ধা মহিলার ঘবের ঠিক পাশে, আর মিসেস ওয়াইভার্নের বিছানা ছিল মহিলাটির ঘরে তার বিছানার কাছে। দরকার হলে ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরে যাবাব জন্য আমাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

সেই রাত এবং আগের দিনের কিছু সময থেকেই বৃদ্ধা মহিলাটিব মেজাজ ছিল খুবই খবাপ। মাঝে মাঝেই রাগে গোঁ ধরছেন। কখনও কাউকে পোশাক পরাতে দিচ্ছেন না, কখনও বা পোশাক ছাড়াতেও দিচ্ছেন না। সকলে বলে সমযকালে তিনি ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। কিন্তু অ্যাপল্‌ওযেলেব আশেপাশে এমন কেউ নেই যে মহিলাটির যৌবনকালেব কথা স্মরণ কবতে পাবে। কিন্তু তাব পোশাকের বাতিক ভযংকর; ঘন রেশম, ঘন সাটিন, ভেলভেট, লেস,—সববকম পোশাক তার এত আছে যে অন্তত সাতটা দোকান তা দিযে সাজিযে দেওযা যায। তার সব পোশাকই সেকেলে ধরনের আর অদ্ভুত, কিন্তু অত্যন্ত দামী।

যাই হোক, আমি শুতে গেলাম। কিছুক্ষণ জেগে কাটল। আমাব কাছে সবই নতুন; মনে হল, আমার স্নায়ুর উপব চাযেব চাপ পডেছে, কারণ উৎসবেব দিন ছাড়া আমি চা খেতে অভ্যস্ত নই। মিসেস ওয়াইভার্নেব কথা কানে এল; কানের কাছে হাত রেখে ভাল করে কান পাতলাম; কিন্তু মিসেস ক্রোলের কথা শুনতে পেলাম না; তিনি একটি কথাও বলেছেন বলে মনে হল না।

সকলেই তার খুব যত্ন নিত। অ্যাপল্‌ওয়েলের লোকরা জানত যে তিনি মারা গেলে প্রত্যেকেরই চাকরি যাবে; আর তাদের চাকরিগুলো যেমন আয়েসেব, তেমনই মাইনেও খুব ভাল।

বৃদ্ধাকে দেখতে সপ্তাহে দু'দিন ডাক্তার আসেন, আর তিনি যা বলে যান সকলেই সেইমত কাজ করে। একটি কথা তিনি প্রতিবারই বলেন: তাঁকে যেন কখনও কোনভাবেই

বিরক্ত করা বা রাগানো না হয়; সব ব্যাপারেই তাঁকে তুষ্ট ও হাসিখুশি রাখতে হবে।

কাজেই একই পোশাকে তিনি সারারাত ও পরের দিনটাও কাটালেন, একটি কথাও বললেন না; আমি সারাটা দিন আমার নিজের ঘরে সেলাই করেই কাটিয়ে দিলাম; নিচে গেলাম শুধু খেতে।

বৃদ্ধাকে একবার দেখার, এমনকি তার কথা শোনার বড় ইচ্ছা হল। কিন্তু আমার কাছে তিনি যেন সারাক্ষণ লন্ডনেই কাটিয়ে দিলেন।

ডিনারের পরে পিসি আমাকে ঘণ্টাখানেকের জন্য বাইরে বেড়াতে পাঠাল। ফিরে এসে যেন বেঁচে গেলাম। পথের দু'ধারে মস্ত বড় বড় সব গাছ, জায়গাটা অন্ধকার ও নির্জন, আকাশ মেঘে ঢাকা, একলা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির কথা ভেবে আমি অনেক কাঁদলাম। সেদিন সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে নিজের ঘরেই বসেছিলাম; মাদাম ক্রোলের শোবার ঘরে দিককার দরজাটা খোলাই ছিল; পিসিও সেখানেই ছিল। এই প্রথম আমি এমন কিছু শুনলাম যেগুলি ঐ বৃদ্ধা মহিলার কথা বলেই মনে হল।

একটা অদ্ভুত আওয়াজ কানে এল; সেটা পাখির না জন্তুর তা জানি না, তবে এক ধরনের সংক্ষিপ্ত ভ্যা-ভ্যা শব্দ।

যত বেশি শুনতে পারি সেইভাবে কান খাড়া করলাম। কিন্তু তার কথার একবিন্দুও বুঝতে পারলাম না। আমার পিসি কিন্তু জবাব দিল:

"প্রভুর ইচ্ছা না হলে শয়তান কাউকে আঘাত করতে পারে না।"

বিছানা থেকে সেই একই অদ্ভুত আওয়াজ এল, কিন্তু আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমার পিসি আবার জবাব দিল: "ওদের মুখ ভার করতে দিন মা'ম, ওরা যা খুশি বলুক; প্রভু যদি আমাদের পক্ষে থাকেন তো কে আমাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে?"

দরজার দিকে কান পেতে দম বন্ধ করে সব শুনতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে ঘর থেকে আর কোন শব্দ বা আওয়াজই এল না। প্রায় বিশ মিনিট পরে টেবিলের পাশে বসে পুরনো ঈশপের গল্পের ছবি দেখছি, এমন সময় মনে হল দরজার কাছে কি যেন নড়ছে, তাকিয়ে দেখলাম পিসি দরজার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে; তার হাতটা তোলা।

"হিস্!" নরম গলায় কথাটা বলে সে পা টিপে টিপে আমার কাছে এল, তারপর ফিসফিস করে বলল: "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ শেষ পর্যন্ত তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন; আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনরকম আওয়াজ করবে না; চা খেতে নিচে যাচ্ছি, এখনই ফিরে আসব—আমি ও মিসেস ওয়াইভার্ন; উনি ঐ ঘরেই ঘুমিয়ে থাকবেন; আমরা এলেই তুমি ছুটে নিচে চলে যাবে, আমার ঘরেই জুডিথ তোমাকে রাতের খাবার এনে দেবে।"

এই কথা বলে পিসি চলে গেল।

আগের মতোই আমি আবার ছবির বইটা দেখতে লাগলাম; মাঝে মাঝেই কান খাড়া করছি, কিন্তু কোন শব্দ বা নিঃশ্বাসের আওয়াজ কিছুই শুনতে পেলাম না; বড ঘরটাতে বসে ক্রমেই আমার ভয় ভয করতে লাগল, তাই মনে বল আনতে ছবিগুলোর সঙ্গে ফিস্‌ফিস্‌ করতে শুরু করলাম, কথা বলতে লাগলাম নিজের সঙ্গেই।

শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালাম, ঘরময হাঁটতে হাঁটতে একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকালাম, কোনরকমে মনটাকে প্রফুল্ল রাখা আর কি। আর শেষ পর্যন্ত কি আর করা যায়, উঁকি দিলাম মাদাম ক্রোলেব শয়ন-কক্ষে।

চমৎকার ঘরখানা; মস্ত বড পালংক, সিলিং থেকে ঝোলানো ফুল-কাটা রেশমী মশারি মেঝে পর্যন্ত নেমে এসে ভাঁজ হয়ে পড়েছে। যে আয়নাটা রযেছে তত বড আয়না আগে কখনও দেখিনি; ঘরখানা আলোয উদ্ভাসিত। গুণে দেখলাম বাইশটা মোমবাতির সবগুলিই জ্বলছে। এরকমটাই তাঁর পছন্দ, তাই কেউ না বলতে সাহস করে না।

দরজার কাছে কান পাতলাম; হাঁ করে চারদিকে তাকালাম। একটা নিঃশ্বাসেব শব্দও যখন শুনতে পেলাম না, মশাবিটাকে একবারও নডতে দেখলাম না, তখন আমার বুকে সাহস এল, পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকে চারদিকে তাকালাম। তারপরই বড় আয়নাটায নিজেকে দেখতে পেলাম, আর তখনই আমার মাথায ঢুকল, “বিছানায শোয়া বৃদ্ধা মহিলাটির দিকে একবাব তাকাতে দোষ কি?”

ক্রোল ঠাকরুণকে দেখার সাধ যে আমার কত তার অর্ধেকটা জানলেও তুমি আমাকে পাগল মনে কববে; মনে মনে চিন্তা কবলাম, এখন যদি উঁকি দিযে না দেখি তা হলে এত ভাল আর একটা সুযোগ পেতে আমাকে হয তো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

তারপর বিছানার কাছে তো গেলাম, মশারিটা কত কাছে, মনের জোর একেবাবেই কমে গেল! কিন্তু সাহসে ভর কবে ভাবী পর্দার ফাঁক দিযে আঙুলটা ঢুকিয়ে দিলাম, তারপর হাতটাও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবলাম; সবকিছু মৃত্যুর মতো স্তব্ধ। কাজেই ধীরে-ধীরে মশারিটাতে টান দিলাম, আর সত্যি বলছি, চোখেব সামনে দেখলাম লেক্সহো গির্জার কবরের পাথবের উপর আঁকা যীশু-জননীর ছবির মতো টান-টান হয়ে শুয়ে আছেন অ্যাপ্‌ল্‌ওযেল হাউসের বিখ্যাত ক্রোল ঠাকরুণ। অপূর্ব সাজে সজ্জিত। আজকাল তুমি সেরকমটা দেখতে পাবে না। লাল ও সবুজ সাটিন ও রেশম, সোনালী লেস; জেনের দিব্যি! সে একটা দৃশ্য বটে! পাউডার মাখানো মস্ত বড পরচুলা মাথার উপর বসানো, আর, আহা, এত বলী-রেখা কোথায় আছে?—গলার ঢিলে চামড়া পাউডার ঢেলে সাদা করা হয়েছে, দুই গালে রুজ ঘসা হয়েছে, ভুরু দুটো আঁকা। তিনি শুয়ে আছেন যেমন মহিমমযী তেমনই শক্ত হয়ে; পবনে রেশমী পাজামা। ওই দেখ! তাঁর নাকটা বেঁকে গেল; সরু হযে উঠল; চোখের অর্ধেক সাদা অংশ খুলে গেল। এই পোশাক পরে হাতে একটা পাখা নিয়ে বডিসে একটা বড় ফুলের তোড়া গুঁজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি করা তাঁর অভ্যাস। লতার বালা পরা

ছোট হাত দু'খানি দু'পাশে পড়ে আছে; সরু করে কাটা এরকম লম্বা নখ আমি জীবনে দেখিনি। এরকম নখ রাখা কি বড়লোকদের ফ্যাশন না কি?

দেখ, আমি মনে করি এরকম দৃশ্য দেখলে তুমি নিজেও ভয় পেতে! মশারিটা ছাড়তে পারলাম না, এক ইঞ্চি নড়তে পারলাম না, তার উপর থেকে চোখও সরাতে পারলাম না; হৃৎপিণ্ডটা তখনও স্তব্ধ হয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে তিনি চোখ মেললেন, উঠে বসলেন। সহসা ঘুরে গিয়ে লম্বা গোড়ালি দুটো মেঝের উপর ঠুকে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। কাঁচের মতো চক্‌চকে দুটি বড় চোখ আমার মুখের উপর রেখে কোঁচকানো ঠোঁটে ও লম্বা নকল দাঁতে একটা দুষ্টু হাসি ফোটালেন।

দেখ, মৃতদেহ একটা স্বাভাবিক বস্তু; কিন্তু এরকম ভয়ংকর দৃশ্য আমি কখনও দেখিনি। সবগুলো আঙুল সোজা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন, বয়সের ভারে কোমরটা বেঁকে গেছে। তিনি বলে উঠলেন:

"ওরে মেয়েটা! তুই কেন বলছিস্ যে আমি ছেলেটাকে খুন করেছি? গলা টিপে তোকে ঠাণ্ডা করে দেব।"

পারলে সেই মুহূর্তেই আমি মুখ ফিরিয়ে ছুটে পালাতাম। কিন্তু তাঁর উপর থেকে চোখ সরাতে পারলাম না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে লাগলাম; আর যেন তারের উপর দিয়ে হাঁটছেন এমনিভাবে খটখট শব্দ করে তিনি আমার দিকে তেড়ে এলেন; তাঁর আঙুলগুলো আমার গলা লক্ষ্য করে উদ্যত, আর জিভ দিয়ে অনবরত একটা শব্দ করছেন—হিজ্—হিজ্—হিজ্!

যত তাড়াতাড়ি পারছি পিছিয়েই চলেছি; তার আঙুলগুলো আমার গলা থেকে আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে; মনে হল তিনি আমাকে ছুঁলেই আমি সব জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলব।

এইভাবে পিছিয়ে পিছিয়ে ঘরের একেবারে কোণে গিয়ে পৌঁছলাম। গলা দিয়ে একটা আর্তনাদ বের হল, শুনলে মনে হবে আমার দেহ ও আত্মা পরস্পরকে ছেড়ে যাচ্ছে; আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পিসি দরজা থেকেই একটা হাঁক দিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা মহিলাটি তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল, আর আমিও সেই ফাঁকে একছুটে আমার ঘর পেরিয়ে সাধ্যমতো দ্রুতগতিতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম।

তোমাকে বলি, নিচে গৃহকর্ত্রীর ঘরে ঢুকে প্রাণ খুলে একচোট কাঁদলাম। সব কথা শুনে মিসেস ওয়াইভার্ন হো-হো করে হেসে উঠল। কিন্তু বৃদ্ধা মহিলার কথাগুলি শুনেই তার গলার পর্দা নেমে গেল।

"আর একবার বল তো," সে বলল।

কথাগুলি আর একবার বললাম।

"ওরে মেয়েটা! তুই কেন বলেছিস যে আমি ছেলেটাকে খুন করেছি? গলা টিপে তোকে ঠাণ্ডা করে দেব।"

মিসেস ওয়াইভার্ন বলল, "কি বললে, তিনি একটা ছেলেকে খুন করেছেন?"

"আমি না মা'ম," আমি বললাম।

সেই থেকে জুডিথ আমার উপর ক্ষেপে গেল। বয়স্ক মহিলা দুটি না থাকলে তার সঙ্গে একলা এক ঘরে থাকার চাইতে আমি বরং জানালা দিয়ে লাফিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি।

যতদূর মনে পড়ে, এক সপ্তাহ পরের কথা ; আমাকে একলা পেয়ে মিসেস ওয়াইভার্ন মাদাম ক্রোল সম্পর্কে এমন একটা কথা আমাকে বলল যা আমি আগে জানতাম না।

পুরো সত্তর বছর আগে তিনি যখন যুবতী ছিলেন, অপরূপ সুন্দরী ছিলেন, তখন অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলের জমিদার ক্রোলকে বিয়ে করেন। জমিদার ছিলেন বিপত্নীক, তাঁব নয় বছরের একটি ছেলে ছিল।

একদিন সকালে ছেলেটি নিখোঁজ হয়ে গেল ; সেই থেকে তার আব কোন খবরবার্তা পাওয়া গেল না। তাকে বড় বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হত ; কোনদিন হয় তো সকালেই চলে যেত শিকাব-রক্ষকের ঘরে, সেখানেই প্রাতরাশ খেত, তারপর চলে যেত গো-চারণের মাঠে, সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরত না ; আবাব কোনদিন হয় তো হ্রদে চলে যেত, সেখানেই স্নান করত, মাছ ধরে বা নৌকো চালিয়েই সারাদিন কাটিযে দিত। তারপর—তার কি যে হল তা কেউ বলতে পারে না ; শুধু হথর্নেব ঝোপের মধ্যে তার টুপিটা পাওয়া গেল ; সকলেই ধরে নিল যে স্নান কবতে গিযে হ্রদের জলে ডুবে গেছে। পরে জমিদারের দ্বিতীয়া স্ত্রী মাদাম ক্রোলের ছেলে জমিদার হলেন, অনেক বছর বাঁচলেন, আর তাবপরেই তাঁর ছেলে, এই বৃদ্ধা মহিলাব নাতি শেভেনিক্স ক্রোল যখন জমিদাব হযে বসলেন তখনই আমি এলাম অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলে।

আমার পিসি এখানে আসাব আগে এ নিয়ে এখানে অনেক কথা হত ; লোকে বলত, সৎমাটি অনেক কিছুই জানে, কিন্তু মুখ খোলে না। ছলাকলা ও তোষামোদ দিয়েই তিনি তাঁর স্বামী বুড়ো জমিদারকে ভুলিয়ে রাখতেন। কিন্তু ছেলেটিকে যখন আর কোনদিনই দেখা গেল না, তখন কালক্রমে সকলে তার কথা ভুলেই গেল।

এবার তোমাকে বলব যা আমি নিজের চোখে দেখেছি।

আমি সেখানে গিযেছি ছ'মাসও হযনি। শীতকাল। বৃদ্ধা মহিলাটি শেষবারের মতো অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ডাক্তারের ভয হল, আবার তাঁর উন্মাদ-রোগ দেখা দিতে পারে। পনেরো বছর আগেও তিনি একবার উন্মাদ হয়েছিলেন ; তখন অনেক সময়ই তাঁকে একটা খাটো ঘাঘরা পরিয়ে কোমরবন্ধের সঙ্গে বেঁধে রাখা হত। একদিন পিসির ঘরের বাইরে সেই চামড়ার কুর্তাটাই আমি ঝোলানো দেখেছিলাম।

কিন্তু তিনি পাগল হলেন না। দিনরাত শুধু ভাবেন আর ভাবেন, উঁ—আঁ করেন ; শেষ পর্যন্ত চলে যাবার দু' একদিন আগে বিছানায় শুয়ে কখনও ছটফট করছেন, কখনও বক্-বক্ করছেন, মনে হত একটা ডাকাত বুঝি তাঁর গলায় ছুরি চেপে ধরেছে। এই সময় তিনি বিছানা থেকে নেমে পড়তেন, কিন্তু তখন আর হাঁটবার অথবা দাঁড়াবার

মতো শক্তি না থাকায় মেঝেতে পড়ে যেতেন; অস্থিসার হাত দুটোকে মুখের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে কেবলই ক্ষমা চাইতেন।

বুঝতেই তো পারছ তার ঘরে আমি যেতাম না; মেঝেতে পড়ে তিনি গড়াগড়ি যেতেন, আছারি-পিছারি করতেন, মুখে এমন সব কথা বলতেন যাতে আমার চামড়া নীল হয়ে যেত; ভয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে থর্‌ থর্‌ করে কাঁপতাম।

আমার পিসি, মিসেস ওয়াইভার্ন, জুডিথ স্কোয়াইল্‌স্‌ এবং লেক্সহো থেকে আগত একটি স্ত্রীলোক সবসময় তাঁর কাছে থাকত। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিকার দেখা দিলে সকলে তাঁকে বাইরে নিয়ে এল।

টি' মহাশয় (পাদ্রী) এলেন, তাঁর জন্য প্রার্থনা করলেন, কিন্তু তখন তিনি সব প্রার্থনার অতীত। আমার মনে হল প্রার্থনা করাটাই ঠিক, কিন্তু তাতে কোন ফল হবে বলে কেউ মনে করল না। এইভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি চলে গেলেন, সব শেষ হয়ে গেল, বৃদ্ধা ক্রোল ঠাকরুণকে শবাচ্ছাদনে ঢেকে শবাধারে শোয়ানো হল, আর জমিদার শেভেনিক্সকে চিঠি লেখা হল। কিন্তু তিনি তখন ফ্রান্সে, ফলে এত দেরি হতে লাগল যে টি' মহাশয় ও ডাক্তার দু'জনই একমত হলেন যে মৃতদেহকে আর ফেলে রাখাটা ঠিক হবে না; স্থির হল, তাঁরা দু'জন আর অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েল থেকে পিসি ও আমরা বাকি সকলেই তাঁকে সমাধি দিতে যাব। এইভাবে অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলের বৃদ্ধা মহিলাটিকে লেক্সহো গির্জার ভূগর্ভ-কক্ষে সমাহিত করা হল। জমিদার ফিরে এসে যতদিন আমাদের সম্পর্কে তাঁর ইচ্ছার কথা না জানাচ্ছেন এবং আমাদের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে না দিচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত আমরা সেই বাড়িটাতেই থেকে গেলাম।

ক্রোল ঠাকরুণ যে ঘরে থাকতেন তার দুটো দরজার পরের একটা আলাদা ঘরে আমাকে থাকতে দেওয়া হল; আর এই ঘটনাটা ঘটল জমিদার শেভেনিক্সের অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলে আসার আগের দিন রাত্রে।

আমার নতুন ঘরটা বেশ বড আর চৌকো; ওক কাঠের প্যানেল করা কিন্তু পুরো সুসজ্জিত নয়; শুধু মশারিবিহীন একটা বিছানা, একটি চেয়ার, বড় একটা টেবিল, এই আর কি; এত বড় ঘরটার পক্ষে এ আসবাব যেন কিছুই নয়। যে আয়নাটায় বৃদ্ধা মহিলাটি নিজেকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতেন, তাঁর মৃত্যুর পরে সেটার প্রয়োজন শেষ হওয়ায় আয়নাটাকে আমার ঘরের দেওয়ালের গায়ে রেখে দেওয়া হয়েছে।

খবর এসেছে যে পরদিন সকালেই জমিদার অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েলে পৌঁছে যাবেন; আমার তাতে মোটেই দুঃখ নেই, কারণ আমি ঠিক জানি যে এবার আমাকে বাড়িতে মার কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বরং আমার খুব আনন্দ হতে লাগল; কেবলই ভাবছি বাড়ির কথা, বোন জ্যানেট, বিড়ালবাচ্চাগুলো, কুকুর ট্রিমার ও অন্য অনেকের কথা। ফলে মন এত চঞ্চল হয়ে উঠল যে ঘুমতেই পারলাম না। ঘড়িতে বারোটা বাজল, আমি জেগেই আছি, ঘরময় গাঢ় অন্ধকার। আমার পিঠ দরজার দিকে, আর চোখ দুটো বিপরীত দিকের দেওয়ালে।

তারপর, বারোটা বেজে পনেরো মিনিটও হয়নি এমন সময় সামনের দেওয়ালে একটা আলো দেখতে পেলাম, যেন পিছনে একটা কিছু জ্বলে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে বিছানা, চেয়ার ও দেওয়ালে ঝোলানো আমার গাউনের ছায়াগুলি যেন সিলিং-এর ববগায় ও ওক কাঠের প্যানেলের উপর নাচতে শুরু করে দিল, কোন কিছুতে আগুন লেগেছে মনে করে তাড়াতাড়ি মাথাটা ঘোরালাম।

হায় জেন, এ আমি কি দেখলাম! এ যে সেই বৃদ্ধা মহিলা, তাঁরই মৃতদেহ সাটিনে-ভেলভেটে সাজানো, ঠোঁটে অর্থহীন হাসি, চোখ দুটো পিরিচের মতো চওড়া, মুখটা যেন স্বযং শয়তানের। দেহের নিচের দিক থেকে একটা লাল আলো উঠে আসছে, যেন পায়ের চারদিকে তার পোশাকটা জ্বলছে। মূর্তিটা সোজা আমার দিকে ছুটে আসছে, কোঁচকানো জরাজীর্ণ হাত দুটি বাড়িযে দিয়েছে, যেন আমার গলা টিপে ধরবে; আমি নড়তেও পারলাম না, মূর্তিটা আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, ছড়িযে গেল এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া; তাকিযে দেখলাম, দেওযালের গায়ে দরজা-খোলা একটা কুঠুরি—আগেকার দিনে সেখানেই রাজকীয় শয্যা পাতা থাকত—আর মূর্তিটি সেখানে কি যেন খুঁজছে। আগে কখনও দরজাটা দেখিনি। মূর্তি আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল; ঠিক যেন একটা বিন্দুর উপর দাঁড়িয়েছে; তার দাঁত কড়মড় করছে; তারপরেই হঠাৎ ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল; বিছানার একপ্রান্তে আমি দাঁড়িযে আছি; কেমন করে সেখানে গেলাম তাও জানি না; শেষ পর্যন্ত গলায় স্বর ফুটল, চিৎকার করে বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে মিসেস ওযাইভার্নের দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে ফেলে তাকে ভয়ে একেবারে হতভম্ব করে দিলাম।

বুঝতেই পারছ সারারাত ঘুমাতে পারলাম না; ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে পিসির কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

আমি ভেবেছিলাম পিসি আমাকে বকবে, ধমকাবে, কিন্তু সেসব কিছুই করল না; হাতটা ধরে কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিযে রইল। বলল, আমি যেন ভয় না পাই। তারপর জিজ্ঞাসা করল:

"মূর্তির হাতে কি একটা চাবি ছিল?"

মনে করার চেষ্টা করে বললাম, "হ্যাঁ, পিতলের অদ্ভুত হাতলওয়ালা একটা বড় চাবি।"

"একটু থাম," বলে পিসি আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে কাবার্ডের দরজাটা খুলে আঙুল বাড়িয়ে একটা চাবি তুলে নিয়ে শুধাল, "এইরকম চাবি কি?"

তাড়াতাড়ি বললাম, "তাই হবে।"

চাবিটা ঘুরিয়ে পিসি বলল, "তুমি ঠিক জান?"

বললাম, "নিশ্চয়"; পরক্ষণেই মনে হল আমি বুঝি মূর্চ্ছা যাব।

"ঠিক আছে, এতেই হবে," বলে পিসি চাবিটাকে আবার তালা দিয়ে আটকে রাখল।

কি যেন ভেবে আবার বলল, "আজ বারোটার আগেই জমিদার স্বয়ং এখানে

আসছেন; এসব কথা তাঁকে অবশ্য বলবে। মনে হচ্ছে আমি শিগ্গিরই এখান থেকে চলে যাব; কাজেই বর্তমানে সবচাইতে ভাল ব্যবস্থা হচ্ছে তুমি আজ বিকেলেই বাড়ি চলে যাও; সুবিধামতো আমিই তোমার জন্য আর একটা কাজ খুঁজে দেব।"

বুঝতেই পারছ, একথা শুনে আমি খুশিই হলাম।

পিসি আমার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে দিল, বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য প্রাপ্য তিন পাউন্ড দিয়ে দিল। জমিদার ক্রোল সেইদিন অ্যাপল্ওয়েলে এলেন; সুপুরুষ, বয়স প্রায় ত্রিশ। এই দ্বিতীয়বার তাঁকে দেখলাম, কিন্তু এই প্রথমবার তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন।

গৃহকর্ত্রীর ঘরে বসেই পিসি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলল, তাঁদের মধ্যে কি কথা হল আমি জানি না। জমিদারকে দেখে একটু ভয়ই পেয়েছিলাম; কত বড় ভদ্রলোক তিনি; তাই না ডেকে পাঠানো পর্যন্ত তাঁর কাছে যাবার সাহস হয়নি। তিনি কিন্তু হেসে বললেন:

"তুমি কি দেখেছ গো মেয়ে? নির্ঘাৎ একটা স্বপ্ন দেখেছ কারণ পৃথিবীতে ভূতপেত্নী বলে কিছু নেই। সে যাই হোক, এখানে বসে সব কথা আগাগোড়া বলো তো মেয়ে।"

তারপর আমি সব কথা বলতেই তিনি একটু চিন্তা করে পিসিকে বললেন:

"জায়গাটা আমি ভালই চিনি। বৃদ্ধ স্যার অলিভারের সময় খোঁড়া ওয়াইন্ডেল আমাকে বলেছিল, ঐ কুঠুরির বাঁদিকে যেখানে মেয়েটি স্বপ্নের মধ্যে আমার ঠাকুরমাকে একটা দরজা খুলতে দেখেছে সেখানে সত্যি একটা দরজা ছিল। সে যখন আমাকে কথাটা বলেছিল তখন তার বয়স আশি পেরিয়ে গেছে, আর আমি তখন একটি বালকমাত্র। তারপর বিশ বছর পার হয়ে গেছে। অনেককাল আগে, পর্দা-ঢাকা ঘরের লোহার ঘরটা তৈরি হবারও আগে, সেখানেই সব মূল্যবান বাসনপত্র ও হীরে-জহরত রাখা হত। সে আমাকে বলেছিল, কুঠুরির দরজার চাবির হাতলটা ছিল পিতলের, আর আপনি বলছেন তিনি যেখানে তাঁর পুরনো পাখাগুলি রাখতেন সেই সিন্দুকের তলায় চাবিটা পাওয়া গিয়েছিল। এবার যদি আমরা সেখানে গিয়ে ভুল করে ফেলে যাওয়া কোন চামচ বা হীরে দেখতে পাই তাহলে কি ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত হবে না? তুমি আমাদের সঙ্গে চল তো মেয়ে, ঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দেবে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনটাকে মুখের মধ্যে নিয়ে পিসির হাতটা সজোরে চেপে ধরে সেই ভয়ংকর ঘরটাতে ঢুকলাম, তাঁদের দু'জনকেই বুঝিয়ে বললাম, কেমন করে তিনি এলেন, আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, ঠিক কোথায় তিনি দাঁড়ালেন আর কোথায় দরজাটা খুলে গেল বলে মনে হয়েছিল।

দেওয়ালের গায়ে তখন একটা পুরনো খালি আলমারি ছিল; সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতেই দেওয়ালের কাঠের আচ্ছাদনের উপর একটা দরজার চিহ্ন চোখে পড়ল; চাবির ছিদ্রটাকে কাঠ দিয়ে বন্ধ করে র‍্যাদা মেরে সমান করে দেওয়া হয়েছে, আর দরজার জোড়গুলোকে পটিং দিয়ে বন্ধ করে এক কাঠের রং লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে; আলমারিটা

সরানোর ফলে কব্জার দাগটা চোখে না পড়লে কেউ বুঝতে পারত না যে সেখানে একটা দরজা কোনকালে ছিল।

বিচিত্র হাসি হেসে জমিদার বললেন, "হ্যাঁ। সেইরকমই তো মনে হচ্ছে।"

একটা ছোট বাটালি ও হাতুড়ি এনে চাবির ছিদ্রের ভিতর থেকে কাঠটা বের করতে মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগল। চাবিটা ঠিক লেগে গেল; চাবিটাকে সজোরে একপাক ঘোরানো হল, ক্যাচ্ করে একটা টানা শব্দ হল, হুড়কোটা পড়ে গেল আর একটানে তিনি দরজাটা খুলে ফেললেন।

ভিতরে আর একটা দরজা, আগেরটাব চাইতেও মজবুত; কিন্তু তলায় না থাকায় সহজেই খুলে গেল। ভিতরে একটা ছোট মেঝে, দেওয়াল ও ইঁটের ঘর; ভিতরে কি আছে দেখতে পেলাম না, কারণ ভিতরটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

পিসি একটা মোমবাতি ধরালে জমিদার সেটা হাতে নিয়ে ভেতরে পা দিলেন।

পিসি পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে ভিতবটা দেখতে চেষ্টা কবল, কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না।

পিছিযে এসে জমিদার বললেন, "হ্যা! ওটা কি? কযলা ঠেলার শিকটা আমাকে এনে দিন তো—জলদি।" তিনি পিসিকে বললেন। পিসি অগ্নিকুণ্ডের খোঁজে চলে যেতেই আমি জমিদারের হাতের ফাঁক দিযে ভিতরে উঁকি দিলাম। দেখলাম মেঝের এককোণে সিন্দুকটার উপর বসে আছে একটা বাঁদর অথবা ছালছাড়ানো কোন জন্তু, আর তা না হলে অত্যন্ত কুঁচকে যাওয়া শীর্ণ-বিশীর্ণ কোন বৃদ্ধ।

শিকটা জমিদারের হাতে দিয়ে তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে সেই দুর্গন্ধ বস্তুটাকে দেখতে পেয়ে পিসি বলে উঠল, "হায় জেন! খুব সাবধান স্যাব; কী করছেন আপনি? ফিরে আসুন, দরজাটা বন্ধ করে দিন!"

তিনি কিন্তু তার পরিবর্তে শিকটাকে তলোয়াবের মতো তাক করে ধরে বস্তুটাকে একটা খোঁচা মারলেন, আর সেটা ধর-মাথাসুদ্ধ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল, একগাদা হাড় ও ধুলো—একটা টুপি-ভর্তির চাইতে কিছু বেশি।

হাড়গুলো একটা শিশুর; বাকি সবটা ছোঁয়ামাত্রই ধুলোর মতো গুঁড়ো হয়ে গেল। কারও মুখে কোন কথা নেই, কিন্তু তিনি মেঝের উপরকার খুলিটার দিকে তাকালেন।

বললেন, "একটা মরা বিড়াল!" পিছিযে এসে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়ে তিনি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। "মিসেস শাটার্স, আপনি ও আমি আবার এখানে আসব। এবং একটা একটা করে তাকগুলো খুঁজে দেখব। আপনার সঙ্গে অন্য ব্যাপারেও আমার কিছু কথা আছে; আর আপনিই তো বললেন, এই ছোট্ট মেয়েটি বাড়ি চলে যাচ্ছে। ওর মাইনে ও পেয়ে গেছে; আমি ওকে একটা উপহার দিতে চাই," বলে তিনি আমার কাঁধটা চাপড়ে দিলেন।

তিনি আমাকে একটা পুরো পাউন্ড দিলেন, আর ঘন্টাখানেক পরে লেক্সহো যাত্রা করলাম; সেখান থেকে যাত্রীগাড়িতে চেপে বাড়ি পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, অ্যাপলওয়েলের ক্রোল ঠাকরুণ আর কোনদিন আমাকে দেখা

দেননি—না সশরীরে, না স্বপ্নে। কিন্তু আমি বড় হয়ে উঠলে একবার পিসি লিট্‌লহোম-এ এসে একটা দিন ও রাত আমার কাছে কাটিয়েছিল; তখনই সে আমাকে বলেছিল, যে বেচারি ছেলেটি অনেকদিন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল, কুৎসিত দুষ্টু বুড়িটাই যে তাকে অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে মেরে ফেলেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছেলেটির চেঁচামেচি, প্রার্থনা, দাপাদাপি কিছুই কেউ শুনতে পায়নি; সে যে জলে ডুবেই মারা গেছে সেটা বোঝাবার জন্যই তার টুপিটা জলের ধারে ফেলে রাখা হয়েছিল; কাজটা কে করেছিল তাও কেউ জানে না। হাত দেওয়ামাত্রই তাঁর পোশাকগুলো একমুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে ছিল একমুঠো কালো বোতাম, সবুজ বাঁটের একটা ছুরি, আর দুটো পেনি; বেচারিকে যখন ভুলিয়ে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়, পেনি দুটো হয় তো তখন তার পকেটেই ছিল; তারপরে সে আর কখনও আলোর মুখ দেখেনি। জমিদারের কাগজপত্রের মধ্যে একটা বিজ্ঞপ্তির কপি পাওয়া গিয়েছিল। ছেলেটি হারিয়ে যাবার পরে বিজ্ঞপ্তিটা ছাপানো হয়েছিল; বুড়ো জমিদার ভেবেছিলেন, হয় সে পালিয়ে গেছে, নয় তো জিপ্‌সিরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে; বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ছিল, ছেলেটির সঙ্গে সবুজ হাতলওয়ালা একটা ছুরি ছিল, আর তাব বোতামগুলো ছিল জেট কেটে তৈরি। আর অ্যাপ্‌ল্‌ওয়েল হাউসের বৃদ্ধ ক্রোল ঠাকরুণ সম্পর্কে আমার কথাও এখানেই শেষ।

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

ইতালীয় ভদ্রলোকের কাহিনী

The Italian's Story—ক্যাথারিন ক্রো

"আপনার বন্ধুটি কি সুন্দর ইংরেজি বলেন!" আমি যখন বিদেশে ছিলাম তখন একদিন সবেমাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া ভদ্রলোকটি সম্পর্কে আমার পরিচিত লোকটির কাছে এই মন্তব্য করেছিলাম। "ওর নামটা কি?"

"কাউন্ট ফ্রান্সিস্কো ফেরাল্‌দি।"

"মনে হচ্ছে তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন?"

"নিশ্চয; দেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে তিনি সেখানে ইতালীয় ভাষা পড়াতেন। তাঁর ইতিহাসটি অদ্ভুত, আপনার ভাল লাগবে, কারণ অদ্ভুত জিনিস আপনি ভালবাসেন।"

"সে ইতিহাস আমাকে শোনাতে পারেন?'

"ঠিকমতো পারব না, কারণ তাঁর নিজের মুখ থেকে কখনও শুনিনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে ইতিহাস বলতে তাঁর কোন আপত্তি নেই—তবে যে রাজনৈতিক ঝামেলায় তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন আর যার জন্য তাঁকে অস্ট্রেলীয় রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, সেসব কথা বাদ দিয়ে; আমার বিশ্বাস, জীবনের সে অধ্যায়ের উল্লেখ করাটা তিনি সমীচীন বলে মনে করেন না। তাঁর সঙ্গে যদি দেখা করতে চান তো তাঁকে ডিনারে ডাকব, আর হয় তো তাঁর গল্প শোনাতে তাঁকে রাজীও করাতে পারব।" তদনুসারেই আমাদের দেখা হল, "আঁ পেতিত্ কোমিতে"-তে আমরা ডিনার খেলাম, আর কাউন্টও সানন্দে আমাদের অনুরোধ মেনে নিলেন; বললেন, "কিন্তু অনেকদিন আগেকার কথা দিয়ে শুরু করছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন, কারণ আমার কাহিনীর শুরু তিনশ' বছর আগে।"

"আমাদের পরিবার বহু প্রাচীনত্বের দাবিদার, কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষার্ধের আগে পর্যন্ত আমরা খুব বেশি সম্পদশালী ছিলাম না; ঠিক ঐ সময়েই কাউন্ট জাকোপো ফেরাল্দি পৈত্রিক সম্পত্তিকে বহুলাংশে বাড়িয়ে ফেললেন; শুধু উপার্জনের পথেই নয়, সঞ্চয়ের পথেও—আসলে তিনি ছিলেন কৃপণস্বভাব। তার আগে পর্যন্ত ফেরাল্দিরা ছিলেন যোদ্ধা; আমাদের ইতিহাসে বর্ণিত অনেক বিখ্যাত যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যই আমরা গর্ববোধ করতে পারি; কিন্তু দাদার মৃত্যুতে উপাধি এবং জমিদারির উত্তরাধিকার লাভ করলেও জাকোপো তাঁর জীবন আরম্ভ করেছিলেন পরিবারের ছোট ছেলে হিসাবেই এবং তাঁর নিজের অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ব্যবসা করে সম্পত্তি বাড়াবেন বলে স্থির করলেন।

"ফ্লোরেন্স তখন এখনকার মতো শহর ছিল না; ব্যবসা-বাণিজ্যের জম-জমাট অবস্থা, ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ ও বড় মাপের লেন-দেন ছিল ইওরোপের সব বড় বড় শহরের সঙ্গে। আমার সেই পূর্বপুরুষটি তাঁর যৎসামান্য ধন-সম্পত্তিকে এমন সুবিবেচনা ও সৌভাগ্যের সঙ্গে ব্যবসাতে লগ্নি করলেন যে প্রথম প্রচেষ্টাতেই সেটা তিনগুণ বেড়ে গেল; আর যেহেতু যেসব মানুষ উপার্জন করে কিন্তু খরচ করে না তারাই তাড়াতাড়ি ধনী হয়ে ওঠে, তাই তিনিও অচিরেই মনের সাধ মিটিয়ে সম্পদের অধিকারী হলেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কথাটা বলা বোধ হয় ভুল হল,—নিজের উপার্জনে কখনও তাঁর সাধ মেটেনি, সম্পত্তি বাড়াতে তাঁর পরিশ্রম চলতেই থাকল, কারণ ক্রমে তিনি অর্থের জন্যই অর্থকে ভালবাসতে শুরু করলেন, সে অর্থ দিয়ে যা কেনা যায় তাকে ভালবাসা নয়।

"অবশেষে তাঁর দুই দাদা মারা গেলেন, আর তাঁদের কোন সন্তান না থাকায় তিনি তাঁদের ধন-সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হয়ে পিতৃপুরুষের প্রাসাদেই বাস করতে লাগলেন; কিন্তু সম্পত্তিকে না খাটিয়ে শুধু জমাতেই লাগলেন; অত্যধিক কৃপণতার জন্য বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের আপ্যায়িত না করে মস্ত বড় বাড়িতে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো বাস করতে লাগলেন; সম্পত্তির সুখ নিয়েই তাঁর দিন কাটতে লাগল, সে সম্পত্তি কখনও ভোগ করলেন না। তাঁর সবচাইতে বড় আনন্দ ও প্রধান কাজই

হল টাকা গোণা; সে টাকা তিনি লুকিয়ে রাখতেন অদ্ভুত অদ্ভুত সব জায়গায়, অথবা মেঝেতে ও দেওয়ালে লুকানো লোহার সিন্দুকে। কিন্তু এত সব সতর্কতা সত্ত্বেও, কুকুরের মতো পাহারা দেওয়া সত্ত্বেও, একদিন তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পারলেন যে তাঁর দু'হাজার পাউন্ড খোয়া গেছে; তিনি টাকাটা লুকিয়ে রেখেছিলেন খাবার ঘরের মেঝের নিচে একটা কুঠুরি বানিয়ে, যার খবর একমাত্র সেই জানত যে সেটা বানিয়েছিল; অন্তত তিনি তাই বিশ্বাস করতেন। এ টাকাটা তাঁর সম্পত্তির তুলনায় খুবই সামান্য, তবু তিনি প্রচণ্ড আঘাত পেলেন; অপরাধীকে বিচারালয়ে টেনে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে তিনি বাড়ি থেকে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু লোকটির দোকানে পৌঁছে দেখলেন সে শয্যাশায়ী, তার মৃত্যু আসন্ন। তার বন্ধুরা ও ডাক্তার শপথ করে জানাল যে গত একপক্ষকাল সে বাড়ি থেকেই বের হয়নি; এককথায় তাদের হিসাবমতো কাউন্টের বাড়ির কাজ শেষ করে যেদিন সে বাড়ি ফিরেছে সেইদিনই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

"একথা সত্যি হলে তো সে চোর হতে পারে না, কারণ টাকাটা সেখানে রাখা হয়েছিল তারও দিনকয়েক পর। যদিও কাউন্টের মনে এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবু সকলে শপথ নিয়ে যে কথা বলেছে তাকে মিথ্যা প্রমাণ করাটা সহজ নয়, বিশেষত পরদিনই লোকটির মৃত্যু হয় এবং তার সমাধিও হয়। সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল দুই চাকরের উপর—মাত্র দুটি চাকরই তিনি রাখতেন, কারণ তিনি বাস করতেন প্রাসাদের একটি ছোট অংশে। তাদের দু'জনকে সন্দেহ করার অথবা গুপ্তস্থানের সন্ধান তারা জানতে পারে এ ধারণা করার তিলমাত্র কারণও ছিল না। তাছাড়া, টাকাটা সেখানে রেখে তিনি যেভাবে তালা লাগিয়েছিলেন, তালাটাকে ঠিক সেই অবস্থায়ই পাওয়া গেছে, আর চাবিটা যে কোন সময়ই তাঁর হাতছাড়া হয়নি সে বিষয়েও তিনি সুনিশ্চিত। তথাপি তিনি তাদের ছাড়িয়ে দিলেন, এবং নতুন কোন চাকর রাখলেন না। চোর যেই হোক সে যতখানি দক্ষতার পরিচয় রেখেছে সেকথা ভেবে তিনি ভয়ে শিউরে উঠলেন। কাজেই তিনি স্থির করলেন আর চাকর রাখবেন না। পাশের একটা খাবার দোকান থেকে নিজের খাবারটা আনিয়ে নেবেন, আর একটি লোক ঠিক করবেন যে সপ্তাহে একদিন এসে ঝাঁট দেবে ও ঘরদোর পরিষ্কার করবে, যাতে সে কখন কাজ করবে তখন তিনি তার উপর নজর রাখতে পারবেন। যেহেতু ডাকাতির কোন সূত্রই তাঁর হাতে ছিল না, আর যে লোকটিকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছিল সেও মারা গেছে, তাই এ ব্যাপার নিয়ে তিনি আর কিছু করলেন না; বরং পাছে তাঁর সঞ্চিত অর্থ সম্পর্কে একটা সোরগোল পড়ে যায় এই আশংকায় চুপ করেই গেলেন; তথাপি বাইরে শান্ত ভাব দেখালেও এই ক্ষতি তাঁর মনের উপর চেপে বসল, তাঁর মনে মহা অশান্তি বাসা বাঁধল।

"এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি তাঁর বোনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলেন। কয়েক বছর হল জনৈক ইংরেজের সঙ্গে সে বোনের বিয়ে হয়েছে। বোন লিখেছেন, তাঁর স্বামী মারা গেছে; এ অবস্থায় তাঁর একমাত্র ছেলে কোন ব্যবসায়ে ঢুকুক এটাই

তাঁর ইচ্ছা, আর সেইজন্যই তিনি ছেলেকে ফ্লোরেন্সে পাঠাচ্ছেন; তাঁর স্থির বিশ্বাস, দাদা তাকে সুপরামর্শই দেবেন এবং যে টাকা সে সঙ্গে নিয়ে যাবে তার যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করবেন।

"খবরটা মোটেই সুখবর নয়; নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্যের স্বার্থ দেখা তাঁর স্বভাব নয়; তাঁর মনে হল, এই যুবকটি সব সময় তাঁর উপর নজর রাখবে, তাঁর বাড়িতে অবাঞ্ছিত অতিথি হয়ে বাস করবে, আর সম্পত্তি-প্রত্যাশী ও লোভী উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণতে থাকবে; কারণ এই বোন ও তাঁর পরিবারই তাঁর নিকটতম আত্মীয়। অন্যরূপ কোন উইল করে না গেলে তাঁরাই হবে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। যাই হোক, যুবকটির আসা এখন আর আটকানো যাবে না! সেকালে চিঠিপত্র চলাচল করত ধীর গতিতে। তাঁর চিঠি যতদিনে ইংলন্ডে পৌঁছবে তার আগেই ভাগ্নে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বে; তাই তিনি স্থির করলেন, খুবই নিরাসক্তভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানাবেন, আর যত শীঘ্র সম্ভব তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন।

"এদিকে যুবকটি তো পূর্ণ আশা ও বিশ্বাস নিয়ে যাত্রা করল; গন্তব্যস্থানে পৌঁছে সঙ্গে সঙ্গেই ধনী মামার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। শুধু যে নিজের জন্যই সে অর্থবান হতে চাইছে তা নয়। তার মা ও বোন খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে; তাদের যৎসামান্য যা কিছু ছিল সবই এই প্রচেষ্টায় বিনিয়োগ করেছে; তাদের আশা, আত্মীয়টির সহায়তায় তাদের এই ত্যাগ একদিন পরিপূর্ণ হযে ফিরে আসবে।

"ঠিক বিশ বছর আগে আর্থার অ্যালেন ছিল খোলা মনের একটি চমৎকার ছেলে; এরকম মুখ, এরকম মানুষ অনেকদিন সেসব ঘরে দেখা যায়নি। সে ভালভাবে মানুষ হয়েছে, লেখাপড়াও ভালই শিখেছে। ছেলেবেলা থেকেই মায়ের চেষ্টায় সে ইতালীয় ও ইংরেজী ভাষা শিখেছিল।

"যদিও সে শুনেছিল যে তার মামা কৃপণ, তবু সে কৃপণতার পাগলামি যে কতদূর গিয়ে পৌঁছেছে তার কোন ধারণাই তার ছিল না। যেভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হল তাতেই তার সানন্দ প্রত্যাশায় অনেকখানি ভাটা পড়ল। মামার কঠিন, ধূসর চোখে ও কুঞ্চিত মুখে স্মিত হাসির একটা রেখাও সে দেখতে পেল না। তার আশংকা হল, বৃদ্ধ লোকটি হয় তো এই ভয় পেয়েছেন যে একটা ব্যবসা গড়ে তোলার কাজে সে তার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছে সাহায্যের আশায়; তাই সে তাড়াতাড়ি মামাকে প্রকৃত অবস্থা বোঝাতে জানিয়ে দিল যে সে দু' হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করে এনেছে।

মামাকে বলল, "মা অবশ্য আমার মতো অনভিজ্ঞ লোকের হাতে এতগুলি টাকা বিশ্বাস করে দিতেন না; কিন্তু তাঁর ইচ্ছা, সব টাকাটা আমি আপনার হাতেই তুলে *দেই, এবং সম্পূর্ণভাবে আপনার কথামতোই কাজকর্ম করি।"*

"কৃপণ লোকটির নিজের ভাষায়ই বলি"—এইসব বিবরণ তাঁর নিজের স্মৃতি-কথা থেকেই আমরা জেনেছি—'এই কথাগুলি শুনেই শয়তান এসে আমার মনে ভর

করল। যুবকটিকে বললাম, পরদিনই সে যেন টাকাটা নিয়ে আসে এবং আমার সঙ্গেই ডিনার খায়।'

"আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন যে শয়তান তো অনেকদিন আগেই তার মধ্যে বাসা বেঁধেছিল; যাই হোক, এতদিনে তিনি তার উপস্থিতিটা জানতে পারলেন, কিন্তু তবু তার পরামর্শমতো কাজ করা থেকে তিনি বিরত হলেন না।

"মামার শীতল ব্যবহারকে কিছুটা গলাতে পারায় খুশি হয়ে আর্থার পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে টাকার থলি নিয়ে হাজির হল: একটা ভিতরের ঘরে দু'জনের দেখা হল; টাকাপয়সা গুণে-গেঁথে পরীক্ষা করে বুড়োর লোহার সিন্দুকে রাখা হল। একটু পরেই ঘণ্টার টুং-টাং আওয়াজ জানিয়ে দিল যে পাশে দোকানের ওয়েটার ডিনার নিয়ে এসেছে। সব ব্যবস্থা ঠিক করতে বৃদ্ধ ঘর থেকে চলে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এসে অতিথিকে নিয়ে টেবিলে বসলেন। ভোজটা বড় রকমের কিছু নয়, কিন্তু এক বোতল পুরনো ল্যাক্রিমা ক্রিস্তি ছিল, আর যুবক সেটা খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করল। কিন্তু কী আশ্চর্য! প্রথম গ্লাসটি ঢালবার সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল—গলার মধ্যে একটা ঘর্-ঘর্ শব্দ উঠল—মুখটা বেঁকে গেল—আর শরীরটা শক্ত হয়ে গেল।

"বুড়ো তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আমি চোখ তুলে তাকাইনি, কারণ যে ছেলেটি এত খুশি মনে ডিনারে বসেছিল তার মুখটা আমি দেখতে চাইনি; আমি খেতে লাগলাম—কিন্তু গলার শব্দটা শুনেই বুঝতে পারলাম কি হয়েছে; পাছে ডিনারের জিনিসপত্র নিয়ে যেতে চাকরটা এসে পড়ে তাই আমি টেবিলটাকে টেনে সরিয়ে দিয়ে যে কুঠুরিটা থেকে আমার দু'হাজার পাউন্ড চুরি গিয়েছিল—চোরটার সর্বনাশ হোক!—সেটা খুলে মদের বোতলটা সমেত দেহটাকেও তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। তালা বন্ধ করে দুটো পেরেক ঠুকে দিলাম। তারপর টেবিলটাকে যথাস্থানে রাখলাম—ছেলেটার চেয়ার ও প্লেট সরিয়ে দিলাম, ভালভাবে এঁটে যাওয়া দরজার তালাটা খুলে নিলাম, এবং আমার ডিনার শেষ করতে বসে গেলাম। তার খাওয়াটা কিভাবে নষ্ট হল সেকথা ভেবে আমি মুচকি হাসি না হেসে পারলাম না।'

'বাড়ির সে অংশটাই বন্ধ করে দিলাম; ভাবলাম, কোনরকম গন্ধ বের হলে লোকের নজরে পড়ে যাবে; বারান্দার উল্টো দিকের একটা ঘরকে খাবার ঘর হিসাবে বেছে নিলাম। পরদিন পর্যন্ত ভালয় ভালয় কাটল। আমার দু'হাজার পাউন্ড বার বার গুণলাম—সেটা হাতাতে পারার জন্য আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম— মনে হল এ টাকা তো আমারই, যেখান থেকেই হোক সেটা হাতিয়ে নেবার অধিকার আছে। বোনকে চিঠি লিখে দিলাম যে তার ছেলে এসে পৌঁছয়নি; এসে পৌঁছলে তার অভিপ্রায় অনুযায়ী সাধ্যমতো সাহায্য করব। সেদিন আমার মনটা অনেক হালকা হল—লোকে বলে সেটা খারাপ লক্ষণ।'

'হ্যাঁ, এ পর্যন্ত বেশ ভালই ছিল; কিন্তু পরদিন আবার আমরা দু'জন ডিনারে বসলাম। অথচ আমি কাউকে নিমন্ত্রণ করিনি; আর তার পরদিন—তারপর

দিন—এইভাবে—চলতেই থাকল! আমি যেই বসতে যাই, অমনি সেই অনাহূত অতিথি ঘরে ঢুকে আমার বিপরীত দিকের চেয়ারটায় বসে। বাড়িতে ডিনার খাওয়া ছেড়ে দিলাম, কিন্তু তাতেও কোন তফাৎ হল না; যেখানেই খেতে বসি সে সেখানেই এসে বসে পড়ে। আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল; কিছু মনে না করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে না করেও উপায় নেই। যুক্তি-তর্ক বৃথা। ক্ষিদে চলে গেল, অকালে শুকিয়ে মরতে চললাম। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফ্রা গিসেপ্পের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি অনুতাপ করতে বললেন, টাকাটা ফিরিয়ে দিতে বললেন। চেষ্টা করলাম কিন্তু অনুতাপ করতে পারলাম না, কারণ টাকাটা যে আমার হাতে। ভাবলাম, টাকাটা যদি আর কাউকে দিতে পারি তাহলে হয় তো মুক্তি পাব। কাজেই একটা সুবিধাজনক লেনদেনের খোঁজ করতে লাগলাম। যখন শুনলাম যে বার্তোলোমিউ মালফি খুব অর্থকষ্টে পড়েছে তখন তার কাছেই প্রস্তাব দিলাম—তার জমিটার জন্য আমি নগদ দু'হাজার পাউন্ড দাম দিতে রাজী আছি, যদিও আমি জানতাম যে জমিটার দাম তার তিনগুণ; আমরা চুক্তি-পত্রে সই করলাম, তারপর বাড়ি ফিরে যে ঘরে টাকাটা ছিল সেই ঘরের দরজাটা খুললাম; কিন্তু এ কি! যে সিন্দুকের মধ্যে টাকাটা তালাবদ্ধ আছে তার উপরে যে সেই বসে আছে; তাই টাকাটা নিতে পারলাম না। দু'তিন বার উঁকি দিলাম, সে ঠিক বসে আছে। অগত্যা বাধ্য হয়ে অন্য টাকা দিয়ে জমিটা কিনতে হল; যদিও লেনদেনটা লাভজনকই হল, তবু আমি বিরক্ত হলাম। বন্ধু গিসেপ্পের সঙ্গে আবার পরামর্শ করলাম; সে বলল, টাকাটা ফিরিয়ে না দিলে কিছুই হবে না—কিন্তু সেটাও তো খারাপ; কাজেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। নিজেকে বোঝালাম, "আমি বসে খাব, সে এসে এখানে বসল কি না বসল তার তোয়াক্কা করব না।" কিন্তু তার সর্বনাশ হোক। সে যে আমার অস্থি-মজ্জা জমাট বরফ করে তুলেছে; কোনরকমেই তাকে তাড়াতে পারছি না। তাই একদিন বললাম, "আমি যদি টাকাটা নিয়ে ইংলন্ডে যাই তো কি হয়?" সে মাথা নোয়াল।

"সেই মতো বুড়ো মানুষটি সিন্দুক থেকে টাকার থলিটা নিয়ে ইংলন্ড যাত্রা করলেন। স্বামী জীবিত থাকতে তাঁর বোন যে বাড়িতে থাকতেন তখনও মেয়েকে নিয়ে সেই বাড়িতেই ছিলেন; এক কথায়, বাড়িটা নিজেদেরই ছিল; বাড়িটার উপর তাঁদের মায়াও পড়েছিল; আশা করেছিলেন, ছেলের ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি হলেই সে বাড়িটা রাখতে পারবেন। বাড়িটা ছোট; সামনে ফুলের বাগান; মা-মেয়েতেই বাগানের পরিচর্যা করেন। পাশেই ছিল গ্রামের গির্জা; গির্জার উঠোনটা বাগানের একেবারে গায়ে। আর্থারের পৌঁছানো সংবাদ না পেয়ে দু'জনেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। এদিকে বুড়ো যখন স্বয়ং হাজির হয়ে জানালেন যে আর্থারের সঙ্গে তাঁর দেখাই হয়নি, তখন তাদের দুঃখ ও যন্ত্রণার আর শেষ রইল না; তারা পরিষ্কার বুঝতে পারল যে ছেলেটি নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে, আর না হয় তো টাকাটা নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। যেটাই ঘটুক না কেন সবদিক থেকেই আঘাতটা তাদের পক্ষে বড়ই গুরুতর, কারণ আর্থারই তাদের একমাত্র অবলম্বন. তাকে তারা খুবই ভালবাসে।

"সেই ভ্রমণে বের হবার পর থেকে বুড়ো মানুষটি সেই ভয়ংকর অতিথির সঙ্গ থেকে অব্যাহতি পেলেন, তাঁর শরীরও একটু একটু করে ভাল হতে লাগল; কিন্তু যখনই মনে পড়ে যে দু'হাজার পাউন্ড মূল্য দিয়ে তাঁকে এই অব্যাহতি কিনতে হচ্ছে তখনই তাঁর ভীষণ যন্ত্রণা হয়। তিনি ভাবতে লাগলেন, কেমন করে এই ভূতকে ঠকানো যায়। কিন্তু এই সব কথা ভাববার সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে সেই টাকাটার নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি শংকিত হয়ে উঠলেন।

"পথ চলতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন, যখনই তিনি মালপত্র স্থানান্তরিত করেন তখনই তাঁর সঙ্গের একটা ভারী সিন্দুকের ওজন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে; এখানে পৌঁছবার পরে দুটি কুলিকে ডাকা হল সেটাকে বাড়ির ভিতর বয়ে নিয়ে যেতে; সেই সময় তিনি এমন কিছু মন্তব্য শুনতে পান যাতে তাঁর মনে হল যে সিন্দুকের মধ্যে কি আছে সে সম্পর্কে তারা একটা সঠিক অনুমান করতে পেরেছে। পরবর্তী সময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে সেই দুটি লোক সন্দেহজনকভাবে বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে; কাজেই পাছে সেটা লুট হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি না পারছেন বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে, না পারছেন রাতে ঘুমাতে।"

"জাকোপো ফেরাল্‌দির কাছ থেকে আমরা এই পর্যন্তই জানতে পারি; কিন্তু স্মৃতিকথা এখানেই শেষ হলেও জনশ্রুতি বলে যে একদিন সকালে তাঁকে তাঁর বিছানায় নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাঁর সিন্দুকটাও লুট হয়ে যায়। পরিবারের সকলকেই, অর্থাৎ মা, মেয়ে ও একটি চাকরকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়; তারা নিজেদের নির্দোষ বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

"যে স্মৃতিকথা থেকে এখানে উদ্ধৃত করলাম সেখানা তাঁর ড্রেসিং টেবিলের উপরেই পাওয়া যায়, মনে হয় হত্যাকারীরা যখন হঠাৎ তাঁকে আক্রমণ করে তখনও তিনি স্মৃতিকথা লিখছিলেন; কারণ তাঁর শেষ কথাগুলি ছিল—'মনে হচ্ছে আমি তাদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছি; কেউ বুঝতে পারবে না—' তারপরেই একটা মস্ত কালির ফোঁটা ও টান, যেন কলমটা তাঁর হাত থেকে ছিটকে পড়েছিল। তাঁর মতো একজন সন্দেহপ্রবণ গোপনীয়তাপ্রিয় মানুষ যে সেই সব কথাগুলিই লিখে রাখলেন যেটা গোপন রাখাই তাঁর পক্ষে উচিত ছিল—সেটা খুবই আশ্চর্য মনে হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের দৃষ্টান্তও নতুন কিছু নয়; অনুরূপ অন্য অনেক ঘটনায় দেখা গেছে, কোন রহস্য যখন মানুষের মনের উপর চেপে বসে, তখন ধরা পড়বার ঝুঁকি সত্ত্বেও সেটাকে প্রকাশ করবার একটা দুর্নিবার ইচ্ছা জাগে, আর সেই সময় বিশ্বাসভাজন কাউকে কাছে না পেলে হতভাগ্য মানুষটি তখন প্রায়ই কাগজ-কলমের আশ্রয় নিয়ে থাকে।"

"আর্থার অ্যালেনের পরিবার নির্বংশ হয়ে যাওয়ায় জাকোপোর ভ্রাতুষ্পুত্র জনৈক কপর্দকহীন সৈনিক তাঁর উপাধি ও জমিদারির উত্তরাধিকারী হয়, এবং ঘটনার পূর্ণ বিবরণসম্বলিত স্মৃতিকথাটি ইতালিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখন হারানো দু'হাজার পাউন্ডের অনেক খোঁজ করা হয়, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মেলে না। তখন প্রথমে

সকলেই ধরে নেয় যে ঐ মহিলা দুটিও এ ব্যাপারে জড়িত ছিল এবং টাকাগুলি সরিয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে বুড়ো ইংলন্ডে পৌঁছলে যে দুটি লোক সিন্দুকটা বাড়ির মধ্যে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই একজন কিছু ইতালীয় সোনা ও একটা হীরের আংটি বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। জানা যায় যে জাকোপোই ঐ আংটিটা পরতেন। ফলে তদন্ত শুরু হয় এবং লোকটি স্বীকার করে যে সে ও তার সঙ্গীই বুড়োকে খুন করেছিল। এইভাবে মহিলা দুটি খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার দায় থেকে অব্যাহতি পায়। সে লোকটি কিন্তু আরও বলে যে সিন্দুকের কোন জিনিস তারা লুট করতে পারেনি, কারণ তারা সেটা খুলতেই পারেনি; চাবির খোঁজ পাবার আগেই একটা কুকুব ঘেউ-ঘেউ করে তাদের দু'জনকে তাডা করে। তারা সিন্দুকটাকে বয়ে নিয়ে যেতেও ভয় পায়; কারণ অত বড় সিন্দুকটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ কবত। কাজেই বুড়ো লোকটির কাছে খুচরো টাকা-পয়সা যা ছিল এবং তাঁর গায়ে যেসব হীরে-মুক্তো ছিল তারা কেবল সেইগুলিই লুট করেছিল। কিন্তু সেকথা কেউ বিশ্বাস করেনি, বিশেষ করে যখন জানা গেল যে তার সঙ্গী নিখোঁজ হয়ে গেছে এবং সেই ঘটনার পরেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।"

"প্রায আড়াই শতাব্দী ধরে ব্যাপারটা সেখানেই থেমে ছিল। জাকোপো ফেরাল্‌দির জন্য কেউ শোক করল না, আলেন পরিবারের দুর্ভাগ্য নিয়েও কেউ মাথা ঘামাল না। তারপব অনেককাল কেটে গেল; পরিবারে অনেক উত্থান-পতন ঘটল; কিন্তু আমাব যখন জন্ম হল তখন আমার বাবা সেই পুবনো প্রাসাদেই বাস করতেন, আর আমাদের আর্থিক অবস্থাও তখন মোটামুটি ভাল। সেই বাডিতেই আমাব জন্ম হয়। মনে আছে, যে ঘরেব মেঝের নিচেকার গোপন কুঠুরিতে জাকোপো তার অতিথিকে কবর দিযেছিল, ছেলেবেলায সেই ঘরটা সম্পর্কে আমার মনে অনেক কৌতূহল ছিল। অতিথিব মৃতদেহটা সেখানেই পাওয়া যায এবং খ্রিষ্টীয বিধি অনুসারে তাকে কবরও দেওয়া হয়। কিন্তু কুঠুবিটা তখনও ছিল, আব ভুতুড়ে ঘর হিসাবে ঘরটাকে বন্ধ করে রাখা ছিল। আমি কখনও অসাধারণ কিছু চোখে দেখিনি, কিন্তু রাতের বেলায় মাঝে মাঝে সে ঘর থেকে যে ভয়ার্ত আর্তনাদ ও গোঙানির শব্দ ভেসে আসত, কাউকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িযে সবিস্ময়ে ও সভয়ে তা যে নিজের কানে শুনেছি একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু একলা কখনও আমি সে দরজার পাশ দিযে হাঁটিনি, বা সন্ধ্যার পরে কোন চাকরও সেদিকে কখনও যেত না। সে শব্দকে থামাবার জন্য দরজার সামনে দেওয়াল গেঁথে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতে ফল তো কিছু হলই না, ববং সেই আর্তনাদ ও গোঙানি বিশ গুণ বেড়ে গেল। আর যেহেতু দেওয়ালটা দেখতেও বিশ্রী লাগত, আর তাতে কোন কাজও হল না, তাই অশান্ত আত্মাকে তুষ্ট করতে দেওয়ালটা ভেঙে দেওয়া হল।"

"বুড়োর স্মৃতিকথা পারিবারিক দলিলপত্রের সঙ্গেই রক্ষিত আছে, তাঁর ছবি এখনও বারান্দায় টাঙানো রয়েছে। অনেক অপরিচিত লোক এই অসাধারণ কাহিনী শুনে [illegible] দেখতে চান: জনৈক মার্কিন সম্রান্ত ভদ্রলোক এখন সেই প্রাসাদে বাস

করেন। আজও সেই ভূত সেখানকার অধিবাসীদের তার আর্তনাদে বিরক্ত করে কি না আমি জানি না।”

কাউন্ট ফ্রান্সেস্কো বললেন, “এবার আমার নিজের কথায় আসছি। কয়েক বছর হল রাজনৈতিক কারণে আমি সপরিবারে ইতালি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। সঙ্গে করে নিয়ে আসা কিছু নগদ টাকা ছাড়া আর কোন সম্বলই আমাব ছিল না; তাই একসময়ে শখ করে যে সুরের চর্চা করেছিলাম, এবার সেটাকেই কাজে লাগাব বলে স্থির করলাম। জনসমক্ষে গান করবার মতো গলা আমার ছিল না, কিন্তু আমি গান শেখাতে পারতাম, আর ইতালিতে থাকতে অপেশাদারী শিক্ষক হিসাবে আমার বেশ নামও হয়েছিল। ইংলন্ড প্রবাসের প্রথম দিককার বিষণ্ন বিবরণ দিয়ে আপনাদের ক্লান্ত করে তুলতে চাই না; কোনরকম যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার আগে একজন ভাগ্যবিড়ম্বিত বিদেশীকে যে কতরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সে আপনারা বুঝতেই পারেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে আমার যৎসামান্য সম্বল সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গেল, এবং প্রায়ই আমাকে আর তার চাইতেও দুঃখের, আমার স্ত্রী-পুত্রকেও অনাহারে থাকতে হত, এবং জীবনের অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলির জন্য দেশের কোন সমৃদ্ধতর মানুষের কাছে ঋণ করতে হত; ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়লাম; আমি যদি একলা হতাম তাহলে যে কি করে বসতাম তা নিজেই জানি না; একটা পরিবার আমার উপর নির্ভর করে আছে; কাজেই অসুবিধা যত বড়ই হোক তার সামনে ভেঙে পড়লে তো আমার চলবে না।

“একদিন রাতে সেন্ট জেমস্ স্কোয়াবেব একজন সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে গান করেছিলাম; সেখানে একটি যুবক আমার গানেব খুব প্রশংসা কবলেন। মনে হল যুবকটি ইতালীয সঙ্গীত খুব ভালবাসেন, আর বোঝেনও। প্রথমতো, সেই আসরে উপস্থিত হতে পারাটাই আমার পক্ষে সৌভাগ্যসূচক, কারণ গৃহস্বামী ছিলেন আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত; আমার একজন পরিচিত গায়ক সিনব এ-কেই সেখানে গান গাইতে ডাকা হযেছিল; শেষ মুহূর্তে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায তিনিই একখানা পরিচয়-পত্র দিযে আমাকে সেখানে পাঠিযেছিলেন।”

“জানতাম যে সে রাতের কাজের জন্য আমি ভাল টাকাই পাব, তবু টাকাটা যদি সেই রাতেই পাওয়া যেত তাহলে প্রত্যাশিত টাকার অর্ধেক হলেও টাকাটা আমি সানন্দেই হাত পেতে নিতাম, কারণ আমাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় সেদিন ছিল সম্পূর্ণ নিঃশেষিত পরের দিনের জন্য প্রাতরাশ কিনবার মতো ছ'টা পেনিও তখন আমার হাতে ছিল না। আমার পিছনে বড় হলের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল; আমি পথে এসে দাঁড়ালাম; একদিকে বিলাসের উজ্জ্বলতা, অন্যদিকে সবরকম নিঃস্বতাকে নিয়ে আমি একা; এই বৈপরিত্য আমাকে নির্মমভাবে আঘাত করল, কারণ একদিন আমিও ধনী ছিলাম, আলোকোজ্জ্বল রাজপ্রাসাদে বাস করতাম, একদল তকমাধারী ভৃত্য আমার হুকুম তামিল করত, সুমধুর সঙ্গীত আমার ঘরে-ঘরে প্রতিধ্বনিত হত; বেপরোয়া হয়ে উঠলাম, টুপিটাকে চোখের উপর টেনে দিয়ে স্কোয়ারের মধ্যে পায়চারি করতে করতে

এই দুঃখের হাত থেকে স্বস্তিলাভ অথবা পলায়নের যত সব উদ্ভট ফন্দি আঁটতে লাগলাম। নিশ্চয়ই আমি খুব পাগলা হয়ে উঠেছিলাম, কারণ আপনারা তো জানেন ইতালীয়দের অঙ্গভঙ্গি করার অভ্যাস আছে, আর আমিও হয় তো চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হাত-পাও নাড়ছিলাম; তাই হয় তো অনেকেরই দৃষ্টি পড়ছিল আমার উপর। কিন্তু নিজের চিন্তায় আমি এতই ডুবে ছিলাম যে সে খেয়ালই আমার ছিল না; এমন সময় একটি কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠলাম: 'সিনর ফেরাল্‌দি, এই শীতের রাতে আপনি এখনও এখানে! আপনার গলাটার জন্যও কি ভয় নেই—ও গলার যে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া উচিত!'

"উদ্ধত গলায় বললাম, 'কিসের জন্য? এ গলা তো আমাকে খাওয়াবে না!'

"হঠাৎ আমার চিন্তায় বিঘ্ন না ঘটলে আমি হয়তো এরকম জবাব দিতাম না; কিন্তু কথাগুলি কে বলল সেটা জানবার আগেই জবাবটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, লর্ড এল্‌-এর বাড়িতে যে যুবকটি আমার গানের প্রশংসা করেছিলেন এ তিনিই। টুপিটা খুলে তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হতেই তিনি আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

"বললেন, 'ক্ষমা করবেন; আসুন না, একসঙ্গেই হাঁটা যাক।' একটু থেমে ক্ষমা পাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'মনে হচ্ছে, আপনি এদেশে নির্বাসিত।'

'তাই,' আমি বললাম।

"তিনি বলতে লাগলেন, 'আমার ধারণা, স্বেচ্ছায় যে গোপন কথা আপনি আমাকে বলতেন না, আপনাকে চমকে দিয়ে সেই কথাটিই আমি জেনে ফেলেছি। আপনারা যখন দেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হন তখন যে আপনাদের কত কষ্ট সইতে হয় তা আমি জানি; তাই আপনাকে মিনতি করে বলছি, আপনাকে যদি মন খুলে সব কথা জানাতে বলি তাহলে আমাকে সুবিনীত বলে মনে করবেন না।'

"সেই মুহূর্তে এই সহানুভূতির কথাগুলি ছিল এতই আন্তরিক আর আমার কাছে এতই স্বাগত যে নতুন বন্ধুটির অনুরোধ রক্ষা করতে আমি কোনরকম ইতস্তত করলাম না—সব কথাই তাকে বললাম—আরও জানালাম, একদিন আমি নিশ্চয়ই নাম করতে পারব, আর তখন যে নিজের পথ নিজেই করে নিতে পারব সে সম্পর্কেও আমার কোন আশংকা নেই; কিন্তু তার আগে এখনই যে আমরা অনাহারের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি।

"কথা বলতে বলতে আমরা স্কোয়ারের চারিদিকে হাঁটতে লাগলাম; আসলে যুবকটি সেখানেই থাকতেন। তাঁর দরজা থেকে বিদায় নেবার আগে তিনি আমার হাতে একটা উপহার তুলে দিলেন; আমি ওটাকে উপহারই বলছি, কারণ তাঁর সে দান যে আমি কোনদিন ফিরিয়ে দিতে পারব একথা মনে করার কোন কারণই তাঁর ছিল না; তিনি বললেন, তাঁকে গান শেখাবার জন্য আমি যে পারিশ্রমিক পাব এই দশ গিনি তারই অগ্রীম; তার প্রথম কিস্তির টাকাটা পরদিন আমাকে দেওয়া হবে।

"অনেক হাল্কা মনে বাড়ি ফিরলাম; পরদিন সকালে সেই ছাত্র বন্ধুটির সঙ্গে

দেখা করলাম; যেমনটি আশা করেছিলাম, ছাত্র হিসাবে যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করলাম। তিনি খোলাখুলিভাবেই জানালেন, এখানকার শৌখিন সমাজে তাঁর বিশেষ কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই, কারণ তাঁরা হঠাৎ বড়লোক হয়েছেন; তবে তাঁর দুটি বোন আছে; তাঁর মতোই গান ভালবাসে; শীঘ্রই তারা লন্ডনে আসবে এবং আমার কাছে গান শিখবে।

"আমার জীবনে এই প্রথম একটা শুভ ঘটনা ঘটল, আর সে শুভ সূচনা পূর্ণ হতেও দেরি হল না। পরিবারের সকলে লন্ডনে এলে তাদের কাছ থেকে আমি খুবই সদয় ব্যবহার পেলাম। তাদের গান শেখাতাম, তাদের আসরে গান করতাম, সুযোগ পেলেই তারা বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমার নাম সুপারিশ করত।

"গানের মরশুম যখন শেষ হয়ে এল, তখন আবার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার চিন্তা হতে লাগল—আর তো গানের আসর বসবে না, আমার ছাত্রীরাও শহর ছেড়ে চলে যাবে। ভাল কথা, আমার নতুন বন্ধুটির নাম ছিল গ্রেটহেড; আমার জন্য একটা মতলব তাদের মাথায় এল; সেই মতলব মতোই তারা আমাকে চলতে পরামর্শ দিল। তারা বলল, দেশে তাদের একটা বাড়ি আছে; তার আশেপাশে আরও অনেক বাড়ি-ঘর ও লোকজন আছে; আসলে বাড়িটা গরম জলের একটা বড় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে অবস্থিত। গ্রীষ্মের কয়েকটা মাস যদি আমি সেখানে গিয়ে থাকি তাহলে গান শেখাবার প্রচুর সুযোগ পাব; তারা আরও বলল, 'কি জানেন, এখানকার তুলনায় সেখানে আমরা আরও অনেক বড়লোক; সেখানে আমাদের প্রশংসা-পত্রে অনেক বেশি কাজ হবে।'

"বন্ধুদের পরামর্শ মতোই কাজ করলাম। তারা লন্ডন থেকে চলে যাবার কিছুদিন পরেই আমি সাল্টন-এ গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলিত হলাম; তাদের জায়গাটার নাম সাল্টন। সামান্য কিছু টাকা দিয়ে স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের শহরেই রেখে এসেছিলাম; কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের নিয়ে আসতে ব্যগ্র হয়ে পড়লাম। পরদিন সকালেই একটা বাসা খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম, এবং সেখানকার অধিবাসী ও আগন্তুকদের কাছে আমার সেখানে আসার উদ্দেশ্যের কথা জানাতে চেষ্টা করলাম। সে সব কাজ শেষ করে পথের নির্দেশ দিয়ে আমার পরিবারকে চিঠি লিখে সাল্টনে ফিরে গেলাম; আমার দয়ালু পৃষ্ঠপোষকদের কথা দিয়েছিলাম, কয়েকটা দিন তাদের সঙ্গেই কাটাব।

"বাড়িটা আধুনিক; আসলে মিঃ গ্রেটহেডের ঠাকুর্দাই বাড়িটা তৈরি করান; পরিবারের সৌভাগ্যও তাঁর হাতেই গড়া। অনেকটা জমির উপর বাড়ি, জানালার নিচেই সুন্দর একটা ঘাসে-ঢাকা মাঠ, একটা মনোরম ধ্বংসস্তূপ, কলস্বনা ছোট নদী, চমৎকার ফুলের বাগান। প্রাতরাশে বসে যে দৃশ্য দেখতে পেলাম তার চাইতে ভাল দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না। একটি মনোরম সুন্দর ইংরেজ পরিবারে বাস করার সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা; কি বাড়ির ভিতরে, কি বাইরে, আমার সব প্রত্যাশা একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। প্রাতরাশের পরে মিঃ গ্রেটহেড ও তাঁর

ছেলে আমাকে অনুরোধ করল তাঁদের সঙ্গে বাড়ির চারদিকটা একবার ঘুরে দেখতে, কারণ বাড়িটার কিছু অদল-বদল করার কথা তাঁরা ভাবছেন।

"মিঃ জি. বললেন, 'অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে এই ছোট নদীটার পথও আমরা ঘুরিয়ে দিতে চাই; নদীটার নতুন পথে যে গাছপালার পুরনো বেড়াটা পড়েছে সেটার প্রতি আমার স্ত্রীর একটা অদ্ভুত টান আছে, সে কিছুতেই ওটাকে ভেঙে ফেলতে দেবে না।'

"আমার মনে হল, উল্লেখিত বেড়াটা যেভাবে ফুল-বাগানের দুটো দিককে ঘিরে আছে সেটা কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছে।

"আমি বললাম, 'কেন! এই বেড়াটার প্রতি মিসেস গ্রেটহেডের কিসের এত আকর্ষণ?'

'কেন? এটা অনেক দিনের পুরনো; আগে তো এটাই গির্জার প্রাঙ্গণের সীমানা ছিল; ওই যেসব ধ্বংসস্তূপ দেখছেন ওখানেই ছিল গ্রামের গির্জা; আমার তো মনে হয়, কবরখানার উর্বরা মাটি পেয়েই ফুলের বাগানটা আরও সুন্দর হয়েছে। কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন, এই বেড়ায় এবং তার পার্শ্ববর্তী বাগানের অংশটায় সবই ইতালীয় ফুল; স্মরণাতীতকাল থেকে লোকে তাই দেখে আসছে। এটা যে কি করে হল তা কেউ জানে না, কিন্তু এখানকার মাটিতে নিশ্চয় এমন কোন পুরনো বীজ ছিল যা থেকে এই সব ফুলের গাছ জন্মেছে। বেড়ার গায়ে এই সাইক্লামেনের ঝোপটার দিকে তাকিয়ে দেখুন।'

"ডিনারের সময় বাড়ির অদল-বদলের কথাটা আবার উঠল। মিসেস গ্রেটহেড তখনও বেড়াটা ভেঙে দেওয়ায় আপত্তি করায় তাঁর ছোট ছেলে হ্যারি বলল, "মামণি এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন ফুলের জন্যই সে বেড়াটা ভেঙে দিতে আপত্তি করছে, কিন্তু আমি ঠিক জানি যে আসল কারণ হল, মামণি ভূতকে চটাতে ভয় পাচ্ছে।"

"মিসেস গ্রেটহেড বললেন, 'যত বাজে কথা হ্যারি। আপনি ওর কথা বিশ্বাস করবেন না মিঃ ফেরাল্‌দি।'

"ছেলেটি বলল, 'দেখ মামণি, তুমি যা দেখেছ সেটা কোন ভূত নয় সেকথা যে তুমি কোনদিন স্বীকার করবে না তা তো তুমিও জান।'

"তিনি বললেন, 'সেটা কি ছিল সেকথা থাক; ও বেড়া ভাঙতে আমি দেব না।' তারপর বললেন, 'আহা মিঃ ফেরাল্‌দি, কেউ ভূতে বিশ্বাস করে শুনলে আপনি নিশ্চয়ই হাসবেন।'

"আমি জবাব দিলাম, 'মোটেই না, বরং ঠিক উল্টো; আমি নিজেই ভূতে বিশ্বাস করি, আর তার যথেষ্ট কারণও আছে; আমাদের পরিবারেই একটি বিখ্যাত ভূত আছে।'

"তিনি বললেন, 'অথচ দেখুন না, মিঃ গ্রেটহেড ও ছেলেরা আমাকে ঠাট্টা করে। কিন্তু মিঃ গ্রেটহেডের ঠাকুর্দার মৃত্যুর পরে আমি যখন এখানে বাস করতে এলাম—তার বাবা কখনও এ বাড়িতে বাস করেননি, কারণ বৃদ্ধের মৃত্যুর আগেই

দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল—তখন কিন্তু আমি ঘুণাক্ষরেও শুনিনি যে এ জায়গাটা ভুতুড়ে, আর শুনলেও হয় তো আমি সেকথা বিশ্বাসই করতাম না। কিন্তু একদিন সন্ধ্যাবেলা—ছেলেমেয়েরা তখন শুতে চলে গেছে, আর মিঃ গ্রেটহেড ও জর্জ কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে খাবার ঘরে বসে আছে—তখন আমি ও আমার এক বোন (সে তখন আমার কাছেই ছিল) বাগানে হেঁটে বেড়াচ্ছিলাম। আগস্ট মাস, উজ্জ্বল তারা-ভরা রাত। একটা খুব আকর্ষণীয় কথা নিয়েই আমরা আলোচনা করছিলাম, কারণ আমার বোন সেইদিনই এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছিল, আর পরে তাকেই সে বিয়ে করেছিল। একথা বলার উদ্দেশ্য আপনাকে বোঝানো যে কোনরকম অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে আমরা তখন চিন্তা করছিলাম না, বরং সম্পূর্ণ জাগতিক একটা ব্যাপারের আলোচনাতেই ডুবে ছিলাম। সাগ্রহে তার কথাগুলি শুনতে শুনতে আমি মাটির দিকেই তাকিয়েছিলাম; হঠাৎ আমার বোন কথা বন্ধ করে আমার হাতে হাত রেখে বলে উঠল, 'ও কে?'

"চোখ তুলে দেখলাম, মাত্র কয়েক গজ দূরে একটি বুড়ো মানুষ দাঁড়িযে আছে; শীর্ণ-বিশীর্ণ চেহারা, অদ্ভুত একটা সেকেলে পোশাক পরা, মাথায় একটা খাড়া টুপি। ফুল-বাগানের এত কাছে দাঁড়িয়ে সে কি করছে, লোকটিই বা কে হতে পারে, কিছুই বুঝতে পারলাম না; তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাগানের এক কোণে একটা পুরনো সমাধির ভগ্নস্তূপ আপনি দেখেছেন কি না জানি না। লোকে বলে, ওটা গ্রাম্য গির্জার জনৈক প্রাক্তন রেক্টরের সমাধি; ১৫৫০ তারিখটা এখনও পড়া যায়। বুড়ো লোকটি বেড়ার এক কোণ থেকে সমাধির পাথরটা পর্যন্ত হেঁটে গেল, মনে হল সে যেন পা গুণে গুণে গেল। কোন জমি মাপতে হলে লোকে যেভাবে হাঁটে সেইরকম। তারপর থেমে গিয়ে হাতের কাগজ-পেন্সিলে মাপটা লিখে নিল বলে মনে হল; পুনরায় সেই একই কাজ করল; বেড়ার অন্য কোণ থেকে হেঁটে সমাধি পর্যন্ত গেল ও ফিরে এল।

"সেই সময় একবার কথা হয়েছিল, বেড়াটা সরিয়ে দিয়ে পুরনো সমাধিটা খুঁড়ে ফেলা হোক। আমার মনে হল, এ বিষয়ে আমার স্বামী যেন কার সঙ্গে কথা বলেছিল, সে ব্যাপারের সঙ্গেই এ লোকটির কোন যোগাযোগ থাকতে পারে; তবু তার পোশাক ও চেহারা দেখে আমার যেন অদ্ভুত লেগেছিল। আরও আশ্চর্য যে লোকটি যেন আমাদের দেখতেই পেল না; তাছাড়া, আমাদের খুব কাছে থাকা সত্ত্বেও তার কোন পায়ের শব্দ আমরা শুনতে পাইনি; কিন্তু তখন এ ব্যাপারগুলো ঠিক খেয়াল হয়নি। যাই হোক, এগিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করব যে সে কি চায়, সেই সময় বোনটি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ধপাস করে মাটিতে এলিয়ে পড়ল; আর ঠিক সেই মুহূর্তে রহস্যময় বুড়ো মানুষটি অদৃশ্য হয়ে গেল, তাকে আর দেখতে পেলাম না।"

"বোনটি মূর্চ্ছা যায়নি; সে বলল, তার হাঁটু দুটো হঠাৎ বেঁকে গেল, আর ভয় পেয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। আমি যে খুব স্বস্তি পাচ্ছিলাম তা নয়; বোনকে তুলে ধরে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতর চলে গেলাম এবং যা দেখেছি সব বললাম।

লোকজনরা ছুটে গেল, কিন্তু কিছুই দেখতে না পেয়ে আমাদের ঠাট্টা করতে লাগল; কিন্তু কিছুদিন পরে হ্যারির জন্ম হলে গ্রাম থেকে আমার জন্য একটি নার্স এসেছিল; একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, একটি বুড়ো মানুষকে আমি কখনও হেঁটে বেড়াতে দেখেছি কি না। সেদিনকার ঘটনার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, তাই জানতে চাইলাম সে কোন্ বুড়োর কথা বলছে। তখন সে আমাকে বলল, অনেককাল আগে এখানে একটি বিদেশী ভদ্রলোক খুন হয়েছিল,—অর্থাৎ এই বাড়িটা তৈরি করার সময় মিঃ গ্রেটহেডের ঠাকুর্দা যে পুরনো বাড়িটা ভেঙে ফেলেছিলেন সেই বাড়িতে; সেই থেকেই এ জায়গাটাকে ভূতে পেয়েছে, সন্ধ্যার পরে কেউ এই বেড়া ও পুরনো সমাধির পাশ দিয়ে হাঁটে না; কারণ ভূতটা ঐটুকু জায়গার মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়।

"আমি বললাম, 'কিন্তু আমার তো মনে হয় ও জিনিসগুলো অক্ষত না রেখে ভেঙে সরিয়ে দেওয়াই তো আপনার দিক থেকে ভাল, কারণ তাহলে হয় তো ভূতটা এখানে আসা একেবারেই বন্ধ করে দেবে।'

"জবাব দিলেন মিঃ জি., 'ঠিক উল্টো। আশপাশের লোকেরা বলে, এই বাড়ির আগেকার মালিকও সেইরকমই ভেবেছিলেন, এবং সবকিছু ভেঙে ফেলাই স্থির করেছিলেন; কিন্তু তার পর থেকেই বুড়ো লোকটি উৎপাত শুরু করে দিল, এমন কি বাড়িতে হানা দিতে লাগল। নার্সটি তো আমাকে নিশ্চিত করেই বলেছিল যে বুড়ো মিঃ গ্রেটহেডেরও সেই ইচ্ছাই হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তিনি পাল্টা আদেশ দিয়ে ভাঙচুর বন্ধ করে দিলেন; মুখে তিনি কিছু না বললেও লোকের বিশ্বাস তিনি ভূতটাকে দেখেছিলেন। একটা কথা তো ঠিক যে এই জায়গার মালিকরা সবসময়ই বেড়াটাকে অক্ষত রেখে দিয়েছেন।'

"যুবকরা হাসতে লাগল, এবং মায়ের এই সব কুসংস্কারের জন্য তাকে ঠাট্টা করতে লাগল; কিন্তু মহিলাটি তার প্রতিবাদে স্থিরসংকল্প; বললেন, ভূতের ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেও তিনি বেড়াটাকে ভালবাসেন ইতালীয় ফুলগুলির জন্য, আর কবরটাকে পছন্দ করেন তার প্রাচীনতার জন্য।

"ফলে মিঃ গ্রেটহেডের পরিকল্পনার পরিবর্তন করে স্থির হল যে বেড়া ও সমাধিকে যথাযথ রেখেই নালাটার গতি-পথ বদলে দেওয়া হবে।

"কয়েকদিনের মধ্যেই আমার পরিবারের লোকজন এসে পড়ল, আর আমিও গ্রীষ্মকালের মতো এস্ শহরে বাসা বাঁধলাম। আমার কাজকর্ম বেশ জমে উঠল, মিঃ ও মিসেস গ্রেটহেডের আনুকূল্যে এবং আমার ও আমার স্ত্রীর প্রতি তাঁদের ব্যক্তিগত সদয় ব্যবহারের ফলে বেশ আরামেই আমাদের দিন কাটতে লাগল। আমাদের লন্ডনে ফিরে যাবার সময় হয়ে এলে তাঁরা আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন, চলে যাবার আগে একটা পক্ষকাল যেন তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে যাই; তাই আমাদের বাসা ছেড়ে দেবার দিনই আমরা সাল্টনে চলে গেলাম।

"ততদিনে নালাটাকে ঘুরিয়ে দেবার কাজ শুরু হয়ে গেছে। পৌঁছবার পরেই আমি মিঃ গ্রেটহেডের সঙ্গে কাজকর্ম দেখতে বেরিয়ে গেলাম। মজুরদের মধ্যে বছর

চৌদ্দ বয়সের একটি ছেলে ছিল। আমরা তার পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। একটা কিছু তুলে নিয়ে মিঃ জি-র হাতে দিয়ে সে বলল, 'এটা কি আপনার স্যার?' পরীক্ষা করে দেখা গেল সেটা ষোড়শ শতাব্দীর একটা স্বর্ণমুদ্রা—তার উপরে তারিখ লেখা ১৫৪৫। ছেলেটি তখনও খুঁড়েই চলেছে; সে আরও একটা স্বর্ণমুদ্রা পেল; তারপর আরও কয়েকটা।

"মিঃ গ্রেটহেড বললেন, 'খুব মজার ব্যাপার তো; মনে হচ্ছে আমরা কোন গুপ্তধন পেয়ে গেছি;' ফিস্ ফিস্ করে বললেন, তিনি এখন সেখান থেকে যাবেন না।

"ফলে ডিনারের সময় পর্যন্ত তিনি সেখানেই রইলেন, এবং আগ্রহের বশে আমিও থেকে গেলাম। ইতিমধ্যে আরও অনেকগুলো মুদ্রা পাওয়া গেল। মিঃ গ্রেটহেড চলে যাবার সময় মজুরদের ছুটি দিয়ে দিলেন এবং জায়গাটা পাহারা দেবার জন্য একটি চাকরকে পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন আরও কয়েকটি মুদ্রা ওঠার পরেই মনে হল যে ভাণ্ডার শেষ হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা যখন এই টাকা পাওয়ার কথা শুনল তখন তারা সকলেই মনে করল যে এই জন্যই বুড়ো লোকটি এই জায়গাটাতে ভর করেছিল। কোন সন্দেহ নেই যে টাকাগুলি সেই পুঁতে রেখেছিল; এখন দেখা যাক, টাকাটা যখন পাওয়া গেছে তখন তার অশরীরী আত্মা শান্ত হয় কি না।

"সেই সময় আমার দুটি শিশুই আমার সঙ্গে সাল্টনে ছিল। তারা ঘুমাত চারতলার একটা ঘরে। একদিন সকালে আমার স্ত্রী বলল যে ছোট মেয়েটির অসুখ করেছে, তাই তাকে দেখতে আমি উপরে উঠে গেলাম। সুন্দর খোলামেলা ঘর, দুটি ছোট সাদা বিছানা, ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা পুরনো ছবির প্রিন্ট দেওয়ালে টাঙানো; সাধারণতই নার্সারিতে যেরকমটা দেখা যায়। মেয়ের সঙ্গে কিছু কথা বললাম; আমার স্ত্রী দাসীর সঙ্গে কথা বলল; তারপর দুই পকেটে হাত রেখে আমি অকারণেই চারদিকে তাকাতে লাগলাম। একটি জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল; প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি; কয়েকটি রেখা ও বিন্দু আঁকা এই বিবর্ণ পার্চমেন্ট কাগজখানাকে কেন যে ঝকঝকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে তাও বুঝিনি। এখানে-ওখানে কয়েকটি কথা লেখা আছে, কিন্তু আমি তা পড়তে পারিনি; তাই ফ্রেমটাকে পেরেক থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন বুঝলাম যে শব্দগুলো ইতালীয় ভাষায় সেকেলে আঁকাবাঁকা হাতে লেখা; প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল একটা শিবিরের নক্সা বা রেখাচিত্র—কিন্তু ভালভাবে নজর করে দেখতে পেলাম একটা গির্জার প্রাঙ্গণের অংশবিশেষ; তাতে অনেক কবর দেখানো রয়েছে, আর তারই একটা কবর থেকে অনেকগুলো রেখা টানা হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুর দিকে, সেই রেখাগুলোর মাঝে মাঝে সংখ্যা বসানো, আর এখানে-ওখানে ডাইনে-বাঁয়ে কিছু শব্দ। তাতে সমকোণ সৃষ্টিকারী দুটো সরলরেখা পুরো কাগজটাকে সমদ্বিখণ্ডিত করেছে। কিছুক্ষণ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার পরে আমার মাথায় এল, যে গির্জার প্রাঙ্গণ ও বেড়া নিয়ে কয়েকদিন আগে এত কথা হয়েছিল এটা তারই একটা মোটামুটি মানচিত্র।

"প্রাতরাশে বসে মিঃ ও মিসেস গ্রেটহেডকে কথাগুলি বললাম; তাঁরাও আমার কথা বিশ্বাস করলেন; পুরনো বাড়িটা ভেঙে ফেলার সময় ওটা পাওয়া গিয়েছিল, এবং পুরাবস্তু হিসাবেই ওটাকে রেখে দেওয়া হয়েছে।

"আমি শুধালাম, 'ওটা কোন্ যুগের জিনিস? আর একজন ইতালীয়ই বা ওটা তৈরি করেছিল কেন?'

"মিঃ গ্রেটহেড বললেন, 'শেষ প্রশ্নটার জবাব দিতে পারব না; কিন্তু তারিখটা তো ওটার উপরেই লেখা আছে বলে আমার বিশ্বাস।'

"আমি বললাম, 'না, আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি—কোন তারিখ নেই।'

'আঃ, আমার তো ধারণা ওতে তারিখ ও নাম দুই-ই আছে—তবে আমি নিজে কখনও ভাল করে দেখিনি।' ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার জন্য তিনি ছেলে হ্যারিকে উপরে পাঠালেন ওটা নিয়ে আসতে; বললেন, 'জানেন তো, কয়েক শতাব্দী আগে নানা ধরনের ইতালীয় স্থপতি ও নক্সাকারী এদেশে বিরল ছিল না।'

"হ্যারি ফ্রেমটা নিয়ে এল; সেটা নিয়ে অনেক কথাও হল, কিন্তু কোন তারিখ বা নাম খুঁজে পাওয়া গেল না।

"মিঃ গ্রেটহেড বললেন, 'তবু আমার মনে হচ্ছে আমি শুনেছি যে নাম ও তারিখ ছিল। ফ্রেম থেকে ওটাকে খুলে দেখা যাক।'

"কাজটা সহজেই করা গেল, আর তারিখ ও নামও পেয়ে গেলাম।

কাউন্ট একটু থেমে আবার বললেন:

'আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন?'

'জাকোপো ফেরাল্দি?' আমি বললাম।

'ঠিক তাই,' তিনি জবাব দিলেন; 'আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় এল, তাঁর খুন হবার রাতে যে টাকা চুরি হয়েছিল বলে মনে করা হয়েছিল সেটা তিনিই মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর এই নক্সাটা হচ্ছে সেই জায়গাটা, পরে খুঁজে বের করবার নির্দেশিকা। তাই যে কাহিনী এখন আপনাদের বললাম সেটাই মিঃ গ্রেটহেডকেও বলেছিলাম; তাঁকে আরও বলেছিলাম যে আমার এই অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে সেখানে আরও সোনা পাওয়া যাবে।

"বুড়ো লোকটির মানচিত্রটাকে নির্দেশিকা হিসাবে মেনে নিয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করে দিলাম—গোটা পরিবারই মহা উৎসাহে খোঁজার কাজে যোগ দিল; ঠিক যেমনটি আশা করেছিলাম, দেখা গেল যে বাগানের কবরের পাথরটাই হচ্ছে সেই জায়গাটি যেখান থেকে সবগুলি রেখা টানা হয়েছে, আর বিন্দুগুলো বোঝাচ্ছে কোথায় টাকাগুলি রাখা হয়েছে। মনে হল, টাকাটা ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন থলেয় ভর্তি করে রাখা হয়েছিল; কালক্রমে থলেগুলি পচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। স্মৃতিকথায় যত টাকার উল্লেখ ছিল তার সবটাই পাওয়া গেল; জমিদার-বাড়ির কর্তা হিসাবে মিঃ গ্রেটহেড উদারতাবশত আইনসম্মত উত্তরাধিকারী হিসাবে সব টাকাটা আমার

হাতেই তুলে দিলেন, যদিও আমি মোটেই সে টাকার উত্তরাধিকারী নই, কারণ আসলে সেটা খুন ও চুরির মাল, আর ন্যায্যত অ্যালেনরাই তার মালিক। কিন্তু সে পরিবারটি নির্বংশ হয়ে গেছে; অন্তত আমাদের তাই বিশ্বাস, কারণ ভাগ্যহীনা দুটি মহিলারই প্রাণদণ্ড হয়েছিল। তাই অনেক কৃতজ্ঞতার সঙ্গে এবং শান্ত বিবেকেই সে দান আমি গ্রহণ করলাম। সেটা পেয়ে আমি আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম এবং ভবিষ্যতে সুদিনের জন্য অপেক্ষা করার শক্তি পেলাম।

"আমি বললাম, 'আর ভূতের কি হল ?—এই পরিণতিতে সে কি খুশি না অখুশি হয়েছিল ?'

কাউন্ট জবাব দিলেন, 'তা বলতে পারব না; সেই থেকে তাকে আর দেখা গেছে বলে শুনিনি; এসব ব্যাপার আমাদের চাইতে গ্রামবাসীরাই ভাল বোঝে; আমার বিশ্বাস তারা বলবে, এখন যদি ভূত বিনা বাধায় বেড়া ও সমাধিটা সরাবার অনুমতি দেয়, তারা তো মোটেই অবাক হবে না; কিন্তু সে দুটি বস্তুকে এই সব অদ্ভুত ঘটনার স্মৃতি হিসাবে বেখে দেওযাই মিঃ গ্রেটহেডের মনেব বাসনা।'

অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত

গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্ট

Gabriel—Ernest—সাকি

"তোমাদের জঙ্গলে একটা বন্য জন্তু আছে," স্টেশনে যেতে যেতে শিল্পী কানিংহাম কথাটা বলল। গাড়িতে বসে সারাক্ষণ এই একটি কথাই সে বলল, কিন্তু ভ্যান শীল সারাক্ষণ এত বেশি বক্ বক্ করে চলল যে তার সঙ্গীর এই নীবৰতা কারও নজরে পড়ল না।

ভ্যান শীল বলল, "হঠাৎ-আসা দু' একটা শেয়াল আর কয়েকটা স্থানীয় ভোঁদড়। তার বেশি জবরদস্ত কিছু নয়।" শিল্পী আর কিছু বলল না।

প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে ভ্যান শীল শুধাল, "একটা বন্য জন্তুর কথা বলছিলে কেন ?"

"ও কিছু না। আমার কল্পনামাত্র। এই তো ট্রেন এসে গেছে," কানিংহাম বলল।

সেদিন বিকেলেই ভ্যান শীল যথারীতি তার জঙ্গল মহল ঘুরে দেখতে গেল। তার পড়ার ঘরে একটা খড়-ভর্তি বক পাখি আছে; অনেকরকম বুনো ফুলের নামও সে জানে; কাজেই তার পিসি যদি তাকে একজন প্রকৃতিবিদ্ বলে মনে করে থাকে তাতে দোষের কিছু নেই। আর যাই হোক, সে খুব হাঁটতে পারে। হাঁটতে হাঁটতে সে যা কিছু দেখে তাই মনে রাখতে চেষ্টা করে। এটা তার স্বভাব। সাম্প্রতিক বিজ্ঞানকে

সাহায্য করার চাইতে পরে এই নিয়ে কথা বলার উদ্দেশ্যেই সে একাজটা করে থাকে। জঙ্গলে যখন নীল রংয়ের ঘন্টা-ফুল ফুটতে শুরু করে তখন সে সব্বাইকে সেকথা বলে বেড়ায়।

কিন্তু সেদিন বিকেলে ভ্যান শীল যা দেখতে পেল সেটা তার সাধারণ অভিজ্ঞতার অনেক বাইরে। ওক গাছের জঙ্গলের মধ্যে একটা গভীর হ্রদের উপর বেরিয়ে আসা একখানা পাথরের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে বছর ষোল বয়সের একটি ছেলে তার ভেজা বাদামী শরীরটাকে ঝলমলে রোদে শুকিয়ে নিচ্ছে। সদ্য জলে ডুব দেবার ফলে তার পাট-করা ভিজে চুল মাথার উপর ছড়িয়ে পড়েছে; হাল্কা বাদামী চোখ দুটোতে যেন বাঘের চোখের ঝিলিক ফুটে উঠেছে। অলস চোখে সে ভ্যান শীলের দিকে তাকাল। একটি অপ্রত্যাশিত ছায়ামূর্তি যেন। কিছু বলার আগেই ভ্যান শীল ভাবতে লাগল : এই বুনো দেখতে ছেলেটা এখানে এল কোত্থেকে ? দু'মাস আগে কারখানার মালিকের স্ত্রীর ছোট ছেলেটি হারিয়ে গেছে; সকলেরই ধারণা কারখানার নালার স্রোতে সে ভেসে গেছে; কিন্তু সে তো একেবারে শিশু, উঠতি বয়সের ছেলে নয়।

বলল, "তুই এখানে কি করছিস ?"

"দেখতেই তো পাচ্ছ, শরীরে রোদ লাগাচ্ছি," ছেলেটি জবাব দিল।

"কোথায় থাকিস ?"

"এখানে, এই জঙ্গলে।"

"জঙ্গলে তো থাকা যায় না," ভ্যান শীল বলল।

"কেন যাবে না ? এ জঙ্গল তো খুব ভাল," ছেলেটির গলায় মুরুব্বিয়ানার সুর।

"কিন্তু রাত্রে কোথায় ঘুমোস ?"

"রাত্রে তো আমি ঘুমোই না ; তখনই তো আমার যত কাজ।"

ভ্যান শীল বিরক্ত হয়ে বলল, "কি খাস ?"

"মাংস," ছেলেটি এমনভাবে রসিয়ে কথাটা বলল যেন সত্যি মাংস খাচ্ছে।

"মাংস ? কিসের মাংস ?"

"যখন জানতে চাইছ তো বলি, খরগোস, বন-মোরাগ, হাঁস, ভেড়া, পাওয়া গেলে ছোট ছেলেমেয়ে। আমি তো রাতেই শিকার ধরি, তখন তো সবকিছুই ঘরে তালা দিয়ে আটকে রাখা হয়। পুরো দু'মাস আগে একদিন শিশু-মাংস খেয়েছিলাম।"

শেষ কথাটার পরিহাসকে উপেক্ষা করে ভ্যান শীল বলল, "কিন্তু আমাদের পাহাড়ি খরগোসকে ধরা খুব সহজ ব্যাপার নয়।"

"রাত্রে আমি তো চার পায়ে শিকার ধরি," ছেলেটি পাল্টা জবাব দিল।

"মানে তুই বলতে চাস যে সঙ্গে একটা কুকুর থাকে ?"

ছেলেটির মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল : সেটাকে মুচকি হাসিও বলা যায়, আবার ভেংচিও বলা যায়।

"আমার তো মনে হয় না কোন কুকুর আমার সঙ্গী হতে রাজী হবে, বিশেষ করে রাতের বেলায়।"

ভ্যান শীলের মনে হল, বিচিত্র চোখ ও বিচিত্র জিহ্বার এই ছেলেটির মধ্যে কোথায় যেন রহস্যময় একটা কিছু লুকিয়ে আছে। বেশ কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে বলল, "তোকে তো এই জঙ্গলের মধ্যে থাকতে দিতে পারি না।"

ছেলেটি বলল, "আমি তো মনে করি, বাড়িতে না গিয়ে আমাকে এখানে থাকতে দিলেই ভাল করবে।"

এই উলঙ্গ বুনো প্রাণীটি ভ্যান শীলের সুসজ্জিত বাড়িতে গিয়ে বাস করছে—একথা ভাবাটাই তো ভয়ংকর।

তবু ভ্যান শীল বলল, "স্বেচ্ছায় না গেলে তোকে জোর করে ধরে নিয়ে যাব।"

ছেলেটি বিদ্যুৎ চমকের মতো ঘুরে বসল, হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারপর চকচকে ভেজা শরীরটা নিয়ে হ্রদের পাড়ে যেখানে ভ্যান শীল দাঁড়িয়ে ছিল তার কাছাকাছি তীরে গিয়ে হাজির হল। একটা ভোঁদড়ের পক্ষে ব্যাপারটা আশ্চর্য কিছু নয়, কিন্তু একটা ছেলের পক্ষে খুবই চমকে দেওয়ার মতো। একটু পিছিয়ে যেতেই ভ্যান শীলের পা পিছলে গেল; হ্রদের শেওলা-ধরা পিছল তীরে সে সটান পড়ে গেল; তখন বাঘের মতো হলদে চোখ দুটি তার কাছ থেকে খুব একটা দূরে নয়। আপনা থেকেই তার একটা হাত গলার কাছে উঠে গেল। ছেলেটি আবার হেসে উঠল; সে হাসির ফলে তার মুচকি হাসির আভাস ভেংচির আড়ালে চাপা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য দ্রুততায় আর একটা লাফে হ্রদের জলে পড়ে সে শেওলা ও ফার্নের জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে ভ্যান শীল বলল, "কী এক অসাধারণ বন্য জন্তু!" আর তখনই কানিংহামের কথাটা তার মনে পড়ে গেল, "তোমাদের জঙ্গলে একটা বন্য জন্তু আছে।"

ধীর পায়ে বাড়ির পথে হাঁটতে হাঁটতে ভ্যান শীল মনে মনে সেই সব স্থানীয় ঘটনার কথা ভাবতে লাগল যার মধ্যে এই বিস্ময়কর অসভ্য বাচ্চাটার অস্তিত্বের একটা হদিস পাওয়া যায়।

ইদানীংকালে এসব জঙ্গলে শিকারের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে, খামারে গৃহপালিত পশু হারিয়ে যাচ্ছে, অকারণেই খরগোস বিরল হয়ে আসছে, পাহাড় থেকে ভেড়াগুলোকে তুলে নিয়ে যাবার অভিযোগও শোনা যাচ্ছে। তাহলে কি এই বুনো ছেলেটাই শিকারী কুকুর সঙ্গে নিয়ে গ্রামাঞ্চলে শিকার ধরে বেড়াচ্ছে? নিজেই বলল, রাত হলে সে "চার পায়ে শিকার করে," অথচ আবার একথাও বলল যে "বিশেষ করে রাত্রে" কোন কুকুর তার কাছেও ঘেঁষে না। ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় ভ্যান শীল পথের মাঝখানে থমকে দাঁড়াল; তার চিন্তার সুতোও কেটে গেল। দু'মাস আগে কারখানা থেকে একটা ছেলে হারিয়ে গেছে—সকলেই ধরে নিয়েছে যে সে নালার জলে ভেসে গেছে, কিন্তু তার মা বলেছে যে নালার বিপরীত দিকে পাহাড় থেকে আসা একটা চিৎকার সে শুনতে

পেয়েছিল। ব্যাপারটা অচিন্ত্যনীয় হলেও দু'মাস আগে শিশু-মাংস খাবার মতো বিশ্রী কথাটা ছেলেটি না বললেও পারত। পরিহাস করেও এ ধরনের ভয়ংকর কথা বলা উচিত নয়।

তার স্বভাববিরুদ্ধ হলেও জঙ্গলের এই আবিষ্কার সম্পর্কে ভ্যান শীল মোটেই মুখ খুলল না। সে স্বয়ং এ গ্রামের একজন কাউন্সিলর, শান্তির অধিকর্তা; আর তার জমিদারির মধ্যেই এরকম একটি দুষ্কৃতকারী মানুষ বাস করছে এটা তার সম্মানের পক্ষে খুবই ক্ষতিকব; এমনকি এর ফলে অপহৃত ভেড়া ও হাঁস-মুরগির একটা মোটা বিলও তো লোকে তার হাতে ধরিয়ে দিতে পারে। সে রাতে ডিনারে বসে সে তাই অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ কাটাতে লাগল।

পিসি বলল, "তোমার গলায কথা নেই কেন? মনে হচ্ছে যেন একটা নেকড়ে দেখেছ।"

ভ্যান শীল মনে মনে বলল, কি বোকার মতো কথা! আরে, আমার জমিদারিতে একটা নেকড়ে দেখলে তো চৌদ্দ কাহন করে সেকথা বলে বেড়াতাম।

পরদিন সকালে প্রাতরাশে বসেও ভ্যান শীলেব মনে হল গতকালকার অস্বস্তিকর ভাবটা তখনও মন থেকে দূর হয়নি; তাই সে স্থির করল ট্রেনে চেপে পার্শ্ববর্তী গির্জা-শহরে গিয়ে কানিংহামকে খুঁজে বের করবে; তার কাছ থেকে জেনে নেবে কেন সে জঙ্গলে একটা বন্য জন্তুর কথা বলেছিল। এ ব্যাপারে মনস্থির করার ফলে তার স্বাভাবিক হাসিখুশি ভাবটা আংশিক ফিরে এল; একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সিগারেটটা নিতে পাশেব ঘরে গিয়ে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল সুর। গদী-আঁটা চৌকিটার উপর হাত-পা ছড়িয়ে পরম আবামে শুয়ে আছে জঙ্গলের সেই ছেলেটি। তার শরীরটা এখন শুকনো; তাছাড়া আর কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না।

ভ্যান শীল গর্জে উঠল, "কোন্ সাহসে তুই এখানে এসেছিস?"

ছেলেটি শান্ত গলায বলল, "তুমিই তো বললে আমাকে জঙ্গলে থাকতে দেবে না।"

"কিন্তু এখানে আসতে তো বলিনি। আমার পিসি যদি দেখে ফেলে!"

সে বিপদকে যথাসম্ভব এড়াবার জন্য ভ্যান শীল তাড়াতাড়ি হাতেই "মর্নিং পোস্ট" কাগজখানার ভাঁজের আড়ালে এই অবাঞ্ছিত অতিথিটিকে যথাসম্ভব লুকিযে বাখতে সচেষ্ট হল। ঠিক সেই মুহূর্তে পিসি ঘরে ঢুকল।

সভয়ে ছেলেটির দিকে চোখ রেখে ভ্যান শীল বেপরোয়াভাবে বলে উঠল, "এই অসহায় ছেলেটি পথ হারিয়ে ফেলেছে—স্মৃতিশক্তিও হারিয়েছে। সে কে বা কোথা থেকে এসেছে কিছুই জানে না।"

মিস্ ভ্যান শীলের মনটা নরম হল।

বলল, "মনে হচ্ছে ওর পরনেও কিছু নেই।"

"মর্নিং পোস্ট" খানাকে যথাস্থানে ধরে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করে ভ্যান শীল বলল, "সেসব কোথায় হারিয়ে ফেলেছে কে জানে।"

একটা উট্‌কো বিড়াল-ছানা বা পথের কুকুর-বাচ্চাকে লোকে যেভাবে আদর করে ঠিক সেইভাবেই মিস্ ভ্যান শীলের করুণা এই গৃহহারা উলঙ্গ ছেলেটির জন্য উথলে উঠল।

বলল, "ওর জন্য সাধ্যমতো সবকিছুই করতে হবে।" সঙ্গে সঙ্গে রেক্টরের বাড়িতে লোক পাঠানো হল। সেখানে একটি বালক-ভৃত্য আছে। লোকটি এক সুট জামাকাপড়, জুতো, কলার—সব নিয়ে এসে হাজির হল। যতই পোশাক পরানো হোক, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হোক, সাজানো-গোছানো হোক, ভ্যান শীলের চোখে তার রহস্যময়তা এতটুকু হ্রাস পেল না। পিসির কিন্তু ছেলেটিকে খুব ভাল লাগল।

বলল, "ওর আসল পরিচয় না জানা পর্যন্ত ওকে আমরা গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্ট বলে ডাকব। নামটা খুবই লাগসই হবে।"

ভ্যান শীল রাজী হল, কিন্তু যার গায়ে নামাবলীটা পরানো হল, সে যে খুব সুবিধার ছেলে হবে সে বিষয়ে তার সন্দেহ মোটেই গেল না। আর সময় নষ্ট না করে কানিংহামের সঙ্গে দেখা করাই স্থির করল।

স্টেশনে যাবার জন্য সে যখন গাড়িতে উঠল তখন পিসি গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্টকে সাজিয়ে গুছিয়ে বিকেল বেলাকার রবিবারের স্কুলের শিশু-শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করার উপযুক্ত করে তৈরি করতে ব্যস্ত।

কানিংহাম প্রথমে কিছু বলতে চাইল না।

বলল, "দেখ, আমার মা মস্তিষ্কের রোগে মারা গেছেন। তাই যদি অসম্ভব রকমের অবাস্তব কোন কিছু আমি দেখে থাকি, অথবা দেখেছি বলে মনে করি, তো সে বিষয়ে কোনরকম আলোচনা করতে যে কেন আমি চাই না তা তো তুমি বুঝতেই পার।"

"কিন্তু তুমি কি দেখেছ?" ভ্যান শীল তবু প্রশ্ন করল।

"আমি যা দেখেছি বলে মনে করি সেটা এতই অসাধারণ যে কোন সুস্থ বুদ্ধির মানুষই সেটাকে একটা সত্যিকারের ঘটনা বলে ধরে নিতে পারে না। গত সন্ধ্যায় যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম তখন ফল-বাগানের ফটকের গাছগাছালির বেড়াটার আড়ালে প্রায় লুকিয়ে থেকে দাঁড়িয়ে অস্তসূর্যের ম্লান রশ্মির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা উলঙ্গ ছেলেকে দেখতে পেলাম; কাছাকাছি কোন হ্রদের জলে সদ্য স্নান করে এসেছে; খোলা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে সেও সূর্যাস্ত দেখছে। তার দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে আচম্বিতেই প্যাগান উপকথার বনদেবতার কথা আমার মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মডেল করে একটা ছবি আঁকার সাধ হল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল তাকে কাছে ডাকি। ঠিক তখনই সূর্য দৃষ্টির আড়ালে ডুবে গেল, দৃশ্যপটের উপর থেকে কমলা ও লালের আভা মুছে গিয়ে দেখা দিল একটা ধূসর প্রেক্ষাপট। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আরও একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল—ছেলেটিও অদৃশ্য হয়ে গেল।"

ভ্যান শীল উত্তেজিত গলায় শুধাল, "সে কি! একেবারে উধাও হয়ে গেল?"

শিল্পী জবাব দিল, "না, আর সেটাই আরও ভয়ানক; এক সেকেন্ড আগে খোলা পাহাড়ের যেখানটায় ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল, দেখা গেল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রকাণ্ড নেকড়ে; কালো রং, ঝকঝকে দাঁত, আর হলুদ নিষ্ঠুর দুটি চোখ। তুমি হয়তো ভাবতে পার—"

কিন্তু বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট করল না ভ্যান শীল। তীরবেগে সে ছুটল স্টেশনের দিকে। একটা টেলিগ্রাম করার কথা মনে হলেও সেটা নাকচ করে দিল। পরিস্থিতিটা বোঝাবার জন্য সে যদি তার করে—"গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্ট একটি নেকড়ে মানব"—তাহলেও সঠিক অবস্থাটা বোঝানো যাবে না। পিসি হয় তো ভাববে, আমি কোন সাংকেতিক খবর পাঠিয়েছি, কিন্তু তার নির্দেশিকাটা পাঠাতে ভুলে গেছি। এখন তার একমাত্র আশা সূর্য ডুবে যাবার আগেই বাড়ি পৌঁছাতে হবে। রেলপথের অপর প্রান্তে যে গাড়িটার ব্যবস্থা আগে থেকেই করা ছিল সেটা যখন গ্রামের পথ ধরে ছুটে চলল তখন অস্তসূর্যের শেষ রাঙা আলো মিলিয়ে আসছে। যখন বাড়ি পৌঁছে গেল, পিসি তখন ভুক্তাবশিষ্ট জ্যাম ও কেকগুলি তুলে রাখছে।

"গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্ট কোথায় ?" প্রায় আর্তনাদের মতো স্বরে ভ্যান শীল শুধাল।

পিসি বলল, "টুপদের ছোট ছেলেটিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেছে। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাবলাম তাকে একা যেতে দেওয়াটা নিরাপদ নয়। কী চমৎকার সূর্যাস্ত, তাই না ?"

পশ্চিম আকাশের আলোর ছটার কথা ভ্যান শীল ভোলেনি, কিন্তু তা নিয়ে কোন কথা বলার জন্য সে দাঁড়াল না। সরু গলি দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে গাড়ি ছুটিয়ে দিল টুপ-পরিবারের বাড়ির দিকে। পথের একদিকে কারখানার নালার তীব্র স্রোত, আর অন্যদিকে উঠে গেছে একটানা ন্যাড়া পাহাড়। আকাশের বুকে অস্তসূর্যের শেষ আলোটুকু তখনও ছড়িয়ে আছে; আর একটা মোড় ঘুরলেই সেই অসম যুগলযাত্রীদ্বয়কে সে দেখতে পাবে। হঠাৎ শেষ লাল আলোটুকুও মিলিয়ে গেল, একটা ধূসর আলো কাঁপতে লাগল দিগন্ত-রেখার উপরে। একটা কর্কশ ভয়ার্ত চিৎকার ভ্যান শীলের কানে বাজল। সে গাড়ি থামিয়ে দিল।

টুপদের ছেলেটিকে বা গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্টকে আর কোনদিন দেখা যায়নি; কিন্তু গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্টের পরিত্যক্ত পোশাকপত্র পাওয়া গেল রাস্তার ধারে। তাই সকলেই ধরে নিল, শিশুটি নালায় পড়ে গিয়েছিল, আর ছেলেটি পোশাক খুলে নালার জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাকে বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টায়। কাছাকাছি কাজ করছিল এরকম কয়েকজন শ্রমিক এবং ভ্যান শীল নিজেও সাক্ষী দিল, যেখানে পোশাকগুলি পাওয়া গেছে ঠিক সেখান থেকেই একটি শিশু-কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ তারা শুনতে পেয়েছিল। মিসেস টুপের আরও এগারোটি সন্তান ছিল; তাই এ শোক সে সহজেই সইতে পারল, কিন্তু মিস ভ্যান শীল তার প্রিয়পাত্রটির জন্য বড়ই শোকাকুলা হয়ে পড়ল। তার চেষ্টাতেই গ্রামের গির্জায় একটা পিতলের স্মৃতিফলক বসানো হল; তাতে

লেখা হল : "গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্ট একটি অপরিচিত বালক, যে সাহসের সঙ্গে অপরের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিল।"

ভ্যান শীল প্রায় সব ব্যাপারেই পিসির কথা শোনে, কিন্তু গ্যাব্রিয়েল—আর্নেস্ট স্মৃতিরক্ষা তহবিলে চাঁদা দিতে সে সরাসরি অস্বীকার করল।

অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত

কুহকিনীর কাহিনী

The Story of the Siren—ই. এম. ফর্‌স্টার

"দ্বৈতবাদ বিতর্ক"-এর উপর লেখা আমার পাণ্ডুলিপিটা যখন ভূমধ্যসাগরের জলে পড়ে তলিয়ে যেতে লাগল, তার চাইতে সুন্দর দৃশ্য আমি খুব অল্পই দেখেছি। একখণ্ড কালো পাথরের মতো বইখানা ডুবে গেল, অচিরেই খুলে গেল, ফিকে সবুজ পাতাগুলো খুলে গিয়ে নীল জলের মধ্যে কাঁপতে লাগল। এই অদৃশ্য হয়ে গেল, আবার দেখা দিল অনন্ত সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত একখণ্ড যাদুকরী রবারের মতো, আবার হয়ে উঠল একখানি বই, সর্ববিদ্যাসংগ্রহ পুঁথির চাইতেও বড। সমুদ্রের একেবারে তলায় পৌঁছে বইখানা যেন আরও অলৌকিক হয়ে উঠল ; একমুঠো বালুকণা যেন তাকে সাদরে গ্রহণ করে দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। বইটা কিন্তু আবার দেখা দিল ; ঈষৎ কাঁপলেও বেশ স্বাভাবিক ; পাতাখোলা অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে, আর অদৃশ্য আঙুলগুলি সেই পাতার মধ্যে নডাচড়া কবছে।

পিসি বলল, "খুবই দুঃখের কথা যে হোটেলে থাকতে তোমার বইটা শেষ করলে না। তাহলে এখন বেশ খোলা মনে বেডাতে পারতে, আর এ ঘটনাটাও ঘটত না।"

পাদরী বলল, "কিছুই নষ্ট হবে না ; সবই ফিরে আসবে আরও সমৃদ্ধ হয়ে, আর বিস্ময় নিয়ে।" তার বোন বলল, "সে কি, বইটা যে অতলে তলিয়ে গেল!" মাঝিদের একজন হেসে উঠল, আর অপরজন মুখে কিছু না বলে উঠে দাঁড়িয়ে পোশাক খুলতে শুরু করল।

কর্নেল চেঁচিয়ে উঠল, "পুণ্যাত্মা মোজেস! লোকটা কি পাগল ?"

পিসি বলল, "ঠিক, তাকে ধন্যবাদ দিন ; অর্থাৎ তাকে বলুন সে খুবই দয়ালু, কিন্তু এখন থাক।"

আমি অভিযোগের সুরে বললাম, "যাই বল, আমি চাই বইটা আমার কাছে

ফেরৎ আসুক। এটা যে আমার 'ফেলোশিপের আলোচনা'। আর অপেক্ষা করলে যে ওর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।"

ছাতার আড়াল থেকে কোন নারী-কণ্ঠ বলে উঠল, "আমি একটা কথা বলছি। প্রকৃতির সন্তানটি বইটা তুলে আনতে জলে ডুব দিক, আর আমরা অন্য কোন 'গ্রোটো'তে (বিশ্রামশালায়) চলে যাই। তাকে এই পাহাড়ে বা অন্য কোথাও নামিয়ে দিয়ে যাব, আর আমরা যখন ফিরব ততক্ষণে সেও সেখানে হাজির থাকবে।"

প্রস্তাবটা ভালই মনে হল; তাতে কিছুটা যোগ করে আমি বললাম, আমিও সেখানেই নেমে যাব; তাতে নৌকোটাও কিছুটা হাল্কা হবে। কাজেই ছোট গ্রোটোটির বাইরে একটি রৌদ্রস্নাত পাহাড়ের বুকে আমাদের দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হল।

নৌকোটা ছেড়ে যেতেই বুঝলাম, আমি কত বড় অবিবেচক। একটা গড়ানে পাহাড়ের উপর আমার একমাত্র ভরসা একজন অজ্ঞাত মিসীলীয় অধিবাসী। নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরে সে বলল, "গ্রোটোর শেষপ্রান্তে চলুন, আপনাকে একটা সুন্দর জিনিস দেখাব।"

তার কথামতো একলাফে পাহাড় থেকে বেরিয়ে-আসা পাথরটার উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। নিচে সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জন। সে আমাকে আলোর কাছ থেকে টেনে নিয়ে চলল। একেবারে শেষপ্রান্তে একটি ছোট পীরোজাচূর্ণের মতো বালুকাময় সৈকতভূমিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে আমার হাতে তার পোশাকপত্র দিয়ে সে দ্রুতপায়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল। মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল সূর্যালোকে সে উলঙ্গ দেহে একবার দাড়াল, নিচে যেখানে বইটা রয়েছে সেদিকে তাকাল। তারপর বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন একে দুই হাত মাথার উপর তুলে ঝাঁপ দিল।

বইটা যদি আশ্চর্য কিছু হয়, লোকটি সব বর্ণনার অতীত। সে যেন সাগরের তলে জীবন্ত একটি রুপোলি মূর্তি; তার মধ্যে জীবনের ধারাটি কাঁপছে সবুজে-নীলে। তার সুখ অনন্ত, জ্ঞান অনন্ত—কিন্তু রোদে-পোড়া, জল-ঝরা শরীর নিয়ে "দ্বৈতবাদী বিতর্ক"-এর পুঁথিখানা দুই সারি দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরে সে যে আবার উঠে আসবে সেটা তো একেবারেই অসম্ভব।

ডুবুরিরা সাধারণত কিছু আর্থিক পুরস্কার আশা করে। আমি যতই দেই না কেন সে নিশ্চয়ই আরও বেশি চাইবে; আর এরকম একটা সুন্দর নির্জন জায়গায় কোনরকম তর্কাতর্কি করার ইচ্ছাও আমার ছিল না। তাই কথাপ্রসঙ্গে সে যখন বলল, "এরকম জায়গায় কুহকিনীদের দেখা পাওয়া যেতে পারে," তখন আমি খুবই স্বস্তি বোধ করলাম।

তার কথায় তার পরিবেশের সুর বেজে ওঠায় আমি খুশি হলাম। এখন আমরা রয়েছি সাধারণ বাস্তব জগৎ থেকে অনেক দূরে এক মায়া-জগতে; এ যেন এক নীলের জগৎ—সমুদ্র যার মেঝে, যার পাহাড়ের দেওয়াল ও ছাদের ছায়া সমুদ্রের জলে পড়ে কাঁপছে। এখানে একমাত্র অলৌকিককেই সহ্য করা যায়। আর সেই

মনোভাব নিয়েই আমিও তার কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললাম, "সহজেই কুহকিনীর দেখা পাওয়া যেতে পারে।"

পোশাক পরতে পরতে সে সকৌতূহলে আমাকে দেখতে লাগল। বালির উপর বসে আমি বইয়ের লেপ্টে-যাওয়া পাতাগুলি খুলছিলাম।

অবশেষে সে বলে উঠল, "ওহো, আপনি হয় তো গত বছর ছাপানো বইটা পড়েছেন। কে ভাবতে পেরেছিল যে আমাদের কুহকিনী বিদেশীদেরও আনন্দ দিতে পারবে!"

(আমি পরবর্তীকালে সেটা পড়েছিলাম। যুবকটির একটা কাঠ-খোদাই ছবি থাকা সত্ত্বেও বিবরণটি স্বভাবতই অসম্পূর্ণ ছিল।)

আমি বললাম, "সে তো নীল সাগরের ভিতর থেকে উঠে আসে, তাই না? আর পাহাড়ের ঠিক মুখে বসে চুল আঁচড়ায়?"

সে শুধাল, "আপনি কি কোনদিন তাকে দেখেছেন?"

"প্রায়ই তো দেখি।"

"আমি কোনদিন দেখিনি।"

"কিন্তু তুমি তার গান তো শুনেছ?"

কোটটা গায়ে দিয়ে সে অধৈর্য গলায় বলল, "জলের নিচে সে গান করবে কেমন করে? কে তা পারে? অনেক সময় সে গাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু বড় বড় বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছুই তার মুখ থেকে বের হয় না।"

"তার তো পাহাড়ের উপর উঠে যাওয়া উচিত।"

এবার সে রেগে বলল, "তা কেমন করে যাবে? পুরোহিতরা তো বাতাসকে মন্ত্রপূত করে রেখেছে, সে-বাতাসে সে নিঃশ্বাস নিতে পারে না; পুরোহিতরা পাহাড়কে মন্ত্রপূত করে রেখেছে, সেখানে সে বসতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রকে কেউ মন্ত্রপূত করতে পারে না, কারণ সমুদ্র যে অনেক বড় আর সদা পরিবর্তনশীল। তাই সে সমুদ্রেই থাকে।"

আমি চুপ।

এবার তার মুখটা শান্তভাব ধারণ করল। এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন একটা কিছু তার মনে এসেছে। প্রবেশমুখের পাহাড়টায় গিয়ে সে বাইরের নীল সমুদ্রের দিকে তাকাল; তারপর ফিরে এসে বলল, "নিয়ম হচ্ছে একমাত্র ভাল মানুষরাই কুহকিনীকে দেখতে পায়।"

আমি কোন মন্তব্য করলাম না। একটু থেমে সে আবার বলতে শুরু করল। "সে এক আশ্চর্য ব্যাপার; পুরোহিতরাও তার ব্যাখ্যা করতে পারে না। অবশ্য সে খুব দুষ্টু। শুধু যে, যারা উপবাস ও প্রার্থনা করে তাদেরই বিপদ ঘটে তা নয়। যারা দৈনন্দিন জীবনে শুধুই ভাল মানুষ, তাদেরও বিপদ ঘটে। দুই প্রজন্ম ধরে কেউ তাকে দেখেনি। আমি তাতে অবাক হই না। জলে নামবার আগে আমরা

সকলেই ক্রুশ-চিহ্ন আঁকি, কিন্তু সেটা অদরকারী। আমরা ভাবতাম, গিসেপ্পি অন্য অনেকের চাইতে নিরাপদ। আমরা তাকে ভালবাসতাম, সেও আমাদের অনেককেই ভালবাসত; কিন্তু তাকে তো আর ভাল হওয়া বলে না।"

আমি জানতে চাইলাম, গিসেপ্পি কে।

"সেদিন—তখন আমার বয়স ছিল সতেরো আর দাদার বয়স কুড়ি; সে ছিল আমার চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী; আর যে অতিথিরা এই গ্রামকে দিয়েছে সম্পদ ও নানা রকমের পরিবর্তন, সেই বছরই তারা প্রথম আসতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে একজন ইংরেজ মহিলা এসেছিলেন; খুব বড় ঘরের মেয়ে; এই জায়গাটা সম্পর্কে একখানা বইও লিখেছেন; তাঁরই চেষ্টায় এখানে গড়ে উঠেছে ইম্প্রুভ্মেন্ট সিন্ডিকেট; আর সিন্ডিকেট একটি বিশেষ রেলপথের সাহায্যে হোটেলগুলিকে স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত করার কাজে নেমেছে।"

"সে মহিলার কথা না হয় এখন থাক," আমি বললাম।

"সেদিন তাঁকে ও তাঁর বন্ধুদের গ্রোটোগুলো দেখাতে নিয়ে গেলাম। পাহাড়ের ধার ঘেঁষে নৌকো চালিয়ে যেতে যেতে যেমন সকলেই করে থাকে আমিও তেমনি হাত বাড়িয়ে একটা ছোট কাঁকড়া তুলে নিয়ে তার দাঁড়াগুলো ভেঙে তাঁদের দিতে গেলাম। মহিলারা তো ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কিন্তু একটি ভদ্রলোক খুশি হয়ে টাকা দিতে চাইলেন। অনভিজ্ঞ লোক হওয়ায় আমি টাকা নিতে অস্বীকাব করলাম। বললাম, তিনি যে সুখী হয়েছেন সেটাই যথেষ্ট পুরস্কার। গিসেপ্পি পিছনের দাঁড়ে বসেছিল, আমার উপর খুব রেগে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে সে আমার মুখের কোণে এত জোরে আঘাত করল যে দাঁতে লেগে আমার ঠোঁটটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। আমি তাকে পাল্টা আঘাত করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে তাড়াতাড়ি সবে গিয়ে আবার আঘাত করল আমার বগলের নিচে। মহিলাদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল। পরে শুনেছিলাম, তাঁরা তখনই মতলব করেছিল যে আমাকে দাদার কাছ থেকে নিয়ে হোটেলের ওয়েটার বানিয়ে তুলবেন। অবশ্য, সেটা আর ঘটে ওঠেনি।

"যখন গ্রোটোতে পৌঁছলাম—এখানে নয়, সেটা আরও বড়—তখন ভদ্রলোকটি প্রস্তাব করল, আমাদের দু'জনের যেকোন একজনকে টাকার বিনিময়ে সমুদ্রে ডুব দিতে হবে। মহিলারাও তাতে সম্মতি জানাল। আমাদের জলে ডুব দিতে দেখে বিদেশীরা যে কত আনন্দ পায় গিসেপ্পি তা ভালই জানে। তাই সে গোঁ ধরে বসল যে রুপো না পেলে সে ডুব দেবে না। ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ একটা দুই-লিবার মুদ্রা সমুদ্রে ছুঁড়ে দিল।

"জলে ঝাঁপ দেবার ঠিক আগে দাদার চোখে পড়ল, যে আমি কাটা ঠোঁটটা চেপে ধরে কাঁদছি। সে হেসে বলে উঠল, 'কোন ভয় নেই রে! এবার অন্তত কুহকিনীর সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে না!' ক্রুশ-চিহ্ন না এঁকেই সে ডুব দিল। কিন্তু কুহকিনীর দেখা সে পেল।"

কথা থামিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট নিল। প্রবেশমুখের সোনারং পাহাড়, কম্পমান দেওয়াল ও যাদুকর সাগরের দিকে তাকালাম। সেখানে অনবরত বড় বড় বুদ্বুদ উঠছে।

অবশেষে সিগারেটের গরম ছাই ঢেউয়ের উপর ফেলে সে মুখটা ঘুরিয়ে বলল, "মুদ্রাটা না নিয়েই দাদা উঠে এল। তাকে টেনে নৌকোতে তুললাম। জল খেয়ে পেট ঢাক হয়ে গেছে, এত বেশি ভিজে গেছে যে পোশাকটা পরানো গেল না। কোন লোককে এত বেশি ভিজতে আমি কখনও দেখিনি। ভদ্রলোক ও আমি নৌকো বেয়ে ফিরে এলাম। গিসেপ্পিকে বস্তা দিয়ে ঢেকে মাস্তুলের গায়ে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলাম।"

আমি অস্ফুট গলায় বললাম, "সে তাহলে ডুবে যায়নি?"

লোকটি রেগে বলল, "না। সে কুহকিনীকে দেখতে পেয়েছিল। আপনাকে তো বলেছি।"

আবার চুপ করে গেলাম।

"অসুস্থ না হলেও তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ডাক্তাব এসে টাকা নিয়ে গেল। পুবোহিত এসে তার গায়ে পবিত্র জল ছিটিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সে তখন ভীষণ ফুলে উঠেছে—সাগরের মতোই। 'সান বিয়াগো'-র বুড়ো আঙুলের হাতে চুমো খেল; সন্ধ্যার আগে সে দাগ শুকোল না।"

"তখন সে কেমন দেখতে হয়েছিল?" সাহস কবে শুধালাম।

"যে কেউ কুহকিনীকে দেখলে যেমনটি হয ঠিক সেইরকম। আপনি যদি 'প্রাযই' তাকে দেখে থাকেন তো বুঝতে পারছেন না কেন? সুখ ছিল না, কারণ সে সবই জানত। যা কিছু জীবন্ত তাই তার দুঃখের কাবণ, কাবণ সে জানত সে মরে যাবে। সে তখন কেবল ঘুমোতে চাইত।"

আমার বইটাতে মন দিলাম।

"কাজ করে না, খেতে ভুলে যায, পোশাক পরেছে কি না তাও ভুলে যায়। সব কাজের চাপ পড়ল আমার উপর; বোনকেও কাজে বেরোতে হয। তাকে ভিক্ষুক সাজাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু তার শক্ত-সমর্থ চেহারা দেখে কারও করুণা হত না; বুদ্ধিহীন হলেও তার চোখে সেটা ফুটে উঠত না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে লোকজনের দিকে তাকিয়ে থাকত; যত তাকাত ততই তার দুঃখ বাড়ত। কোন শিশুর জন্ম হলে সেই দুই হাতে মুখ ঢাকত। কেউ বিয়ে করলে সে তো ভয়ংকর হয়ে উঠত; তারা যখন গির্জা থেকে বেরিয়ে আসত তখন তাদের শাসাত। তখন কে জানত যে সে নিজেই একদিন বিয়ে করে বসবে! আর সেটা আমি ঘটিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, আমি। খবরের কাগজে পড়লাম, রাগুসার একটি মেয়ে 'সমুদ্রে স্নান করে পাগল হযে গেছে।' গিসেপ্পি উঠে দাঁড়াল, আর এক সপ্তাহের মধ্যেই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরল।

"দাদা আমাকে কখনও কিছু বলেনি, কিন্তু আমার ধারণা সে সোজা মেয়েটির

বাড়িতে গিয়ে দরজা ভেঙে তাকে তুলে নিয়ে এসেছিল। সে ছিল এক ধনী খনিমালিকের মেয়ে। কাজেই আমাদের বিপদটা তো বুঝতেই পারছেন। একজন নিপুণ উকিলকে সঙ্গে নিয়ে তার বাবা ছুটে এল আমাদের বাড়িতে, কিন্তু আমার চাইতে বেশি কিছুই করতে পারল না। তারা তর্ক করল, ভয় দেখাল, আর শেষ পর্যন্ত ফিরে গেল। আমাদের কিছুই হল না—অর্থাৎ টাকাপয়সা ব্যয় করতে হল না। গিসেপ্পি ও মারিয়াকে নিয়ে গির্জায় গেলাম, তাদের বিয়ে দিয়ে দিলাম। উঃ! সে কী বিয়ে! পুরোহিত আর কোনদিন ঠাট্টা-তামাশা করেনি, আর গির্জা থেকে বের হতেই ছেলেরা ইঁট-পাটকেল ছুঁড়তে লাগল...মেয়েটিকে সুখী করতে আমি মরতেও রাজী ছিলাম; কিন্তু এক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, কারও কিছুই করার ছিল না।"

"তাহলে বিয়ের পরে তারা দু'জনই অসুখী হয়েছিল?"

"তারা পরস্পরকে ভালবাসত, কিন্তু ভালবাসা তো সুখ নয়। ভালবাসা আমরা সকলেই পেতে পারি। ভালবাসা তো তুচ্ছ। তখন দুটো কাজের লোক রাখতে হয়েছিল, কারণ সব ব্যাপারেই যেমন দেবা তেমনি দেবী—কে যে কখন কি বলে তা কেউ জানে না। নিজেদের নৌকোটা বিক্রি করে দিয়ে এখন এই খারাপ বুড়োটার কাছে কাজ করতে হচ্ছে। সবচাইতে খারাপ কি জানেন, সকলেই আমাদের ঘৃণা করতে শুরু করল। প্রথমে ছোট ছেলেমেয়েরা—তাদের দিয়েই তো সব কিছু শুরু হয়—তারপর নারীরা, আর সবশেষে পুরুষরা। কাবণ সব দুর্ভাগ্যেবই কারণ তো—আপনি আবার কাউকে বলে দেবেন না তো?"

আমি কথা দিলাম কাউকে বলব না। সে আবাব বলতে শুরু করল।

"মারিয়ার পেটে সন্তান এল। লোকে বলল, তোমার আদরের ভাইপোটি কতদিনে জন্মাবে? আহা, এমন বাবা-মার কি সন্তানই না হবে!" স্থির গলায় জবাব দিতাম, সন্তান ভালই হবে। কথায় বলে, 'দুঃখ থেকেই তো সুখের জন্ম!' আমার জবাব শুনে তারা ভয় পেল, পুরোহিতদের গিয়ে বলল, আর পুরোহিতরা আরও বেশি ভয় পেল। তারপরই কানাঘুষা শুরু হয়ে গেল যে সন্তানটি হবে খৃস্টবিরোধী। ভযের কোন কারণ নেই: সে কোনদিন জন্মাবে না।

"এক বুড়ি ডাইনি ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগল, কেউ তাকে বাধা দিল না। সে বলল, গিসেপ্পি ও মেয়েটা হল ছোট শয়তান, তারা বেশি কিছু ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু সন্তানটি হবে মহা শয়তান; হাসবে খেলবে, কথা বলবে, এবং শেষ পর্যন্ত সাগরে গিয়ে কুহকিনীকে এনে বাতাসে ছেড়ে দেবে আর সাবা জগৎ তাকে দেখবে, তার গান শুনবে। যেই সে গান গেয়ে উঠবে অমনি সপ্ত ভাণ্ডারের ঢাকনা খুলে যাবে, পোপ মারা যাবেন, মঙ্গিবেলোতে আগুন লাগবে, আর সান্তা আগাতার ঘোমটা পুড়ে যাবে। তারপর সেই ছেলের সঙ্গে কুহকিনীর বিয়ে হবে, আর তারা দু'জনে মিলে চিরকাল ধরে পৃথিবীতে বাজত্ব করবে।

"সারা গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল, হোটেলওয়ালারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল, কারণ যাত্রীদের আসার মরশুম সবে শুরু হতে চলেছে। তারা সকলে একজোট

হয়ে স্থির করল, সন্তান না হওয়া পর্যন্ত গিসেপ্পি ও মেয়েটিকে আরও ভিতরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আর সে জন্য অনেক টাকা চাঁদাও তোলা হল। যেদিন তাদের চলে যাবার কথা তার আগের রাতটা ছিল পূর্ণিমা। আকাশে ভরা চাঁদ, হঠাৎ পুব থেকে ধেয়ে এল বাতাস, সমুদ্র ফেঁপে-ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পৌঁছাল। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। মারিয়া বলল, সে আর একবার দৃশ্যটা দেখবেই।

"আমি বললাম, 'তুমি যেয়ো না। আমি পুরোহিতকে ওদিকে যেতে দেখেছি। সঙ্গে আরও কেউ আছে। হোটেলওয়ালারা চায় না যে তোমাকে কেউ দেখুক। তাদের চটালে আমরা যে না খেয়ে মারা যাব।'

"মেয়েটি জবাব দিল, 'আমি যাব। সমুদ্রে ঝড় উঠেছে; এ দৃশ্য হয় তো আর কোনদিন দেখতে পাব না।'

"গিসেপ্পি বলল, 'ভাই ঠিকই বলেছে। তুমি যেয়ো না। যদি যাওই তো আমরা একজন তোমার সঙ্গে যাব।'

'আমি একলা যাব,' একথা বলে, একলাই সে গেল।

"তাদের মালপত্র একটা কাপড়ে পুঁটুলি বেঁধে দিলাম; কেমন যেন মনে হতে লাগল যে তাদের দু'জনকেই আমি হারাব। দাদার পাশে গিয়ে বসে দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলাম, আর সেও আমার গলা জড়িয়ে ধরল। এক বছরের উপর হয়ে গেল সে আমাকে এভাবে জড়িয়ে ধরেনি। এইভাবে কতক্ষণ যে আমরা বসেছিলাম তা মনে পড়ে না।

"হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। চাঁদের আলো ও বাতাস একসঙ্গে ঘরে ঢুকল। একটি শিশু-কণ্ঠ হাসতে হাসতে বলল, 'তাকে ওরা পাহাড়ের উপর থেকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে।'

ছুটে টানাটার কাছে গেলাম। সেই টানার মধ্যে আমার ছোরা-ছুরিগুলো থাকে।

"বসে থাকব," গিসেপ্পি বলল। "সে মরেছে বলে অন্যকেও মরতে হবে কেন?"

চিৎকার করে বললাম, "একাজ কে করেছে আমি জানি। তাকে আমি খুন করব।"

"ঘর থেকে প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে জাপটে ধরল; দুটো হাত চেপে ধরে কব্জি দুটো মুচড়ে দিল—প্রথমে ডানটা, তারপর বাঁটা। গিসেপ্পি ছাড়া এ কাজের কথা আর কেউ ভাবতেও পারত না। যন্ত্রণায় আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম সে চলে গেছে। আর কোনদিন তাকে দেখিনি।"

কিন্তু গিসেপ্পিকে আমার ভাল লাগল না।

লোকটি বলল, "আপনাকে তো বলেছি সে খারাপ লোক ছিল। সে যে কুহকিনীকে দেখতে পাবে তা কেউ আশা করেনি।"

"সে যে কুহকিনীকে দেখেছিল তা তুমি জানলে কেমন করে?"

"কারণ সে তো তাকে 'মাঝে মাঝেই' দেখেনি, মাত্র একবারই দেখেছে।"

"সে যদি খারাপ লোকই হবে তাহলে তুমি তাকে ভালবাস কেন?"

এই প্রথম সে হেসে উঠল। আর সেটাই তার একমাত্র জবাব।

"এখানেই শেষ?" আমি শুধালাম।

"যে লোক মেয়েটিকে খুন করেছিল আমি তাকে মারিনি, কারণ আমার কব্জি দুটো যখন ভাল হল ততদিনে সে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে; তাছাড়া একজন পুরোহিতকে তো খুন করা যায় না। আর গিসেপ্পির কথা? কুহকিনীকে দেখেছে এমন আর একটি মানুষের খোঁজে সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াল—সে যদি পুরুষ হয় তো হোক, তবে নারী হলেই ভাল হয়, কারণ তাহলে হয়তো একটি সন্তান জন্ম দিতে পারে। শেষ পর্যন্ত সে লিভারপুলে হাজির হল; সেখানে তার কাশি হল আর শেষ পর্যন্ত মারা গেল।"

"এখনও বেঁচে আছে এমন কেউ কুহকিনীকে দেখেছে বলে আমি মনে করি না। সেরকম মানুষ এক প্রজন্মে একজনের বেশি কদাচিৎ থাকে; আমার জীবনকালে আর কোনদিন এমন দুটি নরনারীকে পাব না যাদের মিলনে সেই শিশুর জন্ম হবে, যে সমুদ্রেব বুক থেকে কুহকিনীকে ডেকে আনবে, নৈঃশব্দকে ধ্বংস করবে, আর পৃথিবীকে বাঁচাবে।"

"পৃথিবীকে বাঁচাবে?" আমি চিৎকার করে বললাম। "সেটাই কি ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ কথা ছিল?"

পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। সব নীল-সবুজ প্রতিবিম্বের মধ্যে আমি তাকেই দেখতে পেলাম। শুনতে পেলাম সে বলছে: "নৈঃশব্দ্য ও নির্জনতা চিরদিন থাকতে পারে না। একশ' বছর, হাজার বছর থাকতে পারে, কিন্তু সমুদ্র আরও বেশিদিন থাকবে, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কুহকিনী গান কববে।" তাকে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে গুহাটা অন্ধকার হয়ে গেল, আর তার সংকীর্ণ প্রবেশ মুখে ফিরতি নৌকোটা এসে ভিড়ল।

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

অধরা নারী

A Woman Seldom Found—উইলিয়াম স্যামসন

একদা এক যুবক রোমে বেড়াতে এসেছিল।

সেটাই তার প্রথম রোমদর্শন; সে এসেছিল একটা গ্রামাঞ্চল থেকে কিন্তু এই সুন্দর ও বড় রাজধানী-শহরটি যে অন্য অনেক জায়গার তুলনায় অনেক ভাল ভাল জিনিস তার হাতে তুলে দেবে এমন কথা ভাববার মতো অল্প বয়স বা অতি-সরলতা

তার ছিল না। সে জানত, জীবনটাই মায়া, অনেক আশ্চর্য ঘটনা যেমন ঘটতে পারে, তেমনি তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে অনেক হতাশাও দেখা দিতে পারে ; সে আরও জানত, আবার এমনও হতে পারে যে কিছুই ঘটল না। নিজের কাজে ব্যস্ত একটা বড় শহরে সে রকমটা ঘটা সব সময়ই সম্ভব।

এই সব ভাবতে ভাবতে সে স্পেনীয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সম্মুখে প্রসারিত বিখ্যাত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর দিকে তাকিয়েছিল। সায়ংকালীন যানবাহনের ক্রমবর্ধমান কলরব শুনতে শুনতে তার চোখের সামনে রোমের স্বর্ণ-গোধূলির পশ্চাৎপটে একের পর এক আলোগুলি জ্বলে উঠল। ঝকঝকে মোটরগুলি ফোয়ারার পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে আলোকিত "ভিয়া কন্ডোতি"তে গিয়ে ঢুকল, বাসের হলুদ জানালায় অনেক মুখের ভিড়, সকলের চোখেমুখেই কোথায় যেন যাবার তাড়া ; শহরের প্রতিটি মানুষই সায়ংকালীন কাজে ব্যতিব্যস্ত। শুধু তারই কিছু করবার নেই।

শহরের এই সব কর্মব্যস্ত মানুষের মধ্যে নিজেকে বড়ই একলা মনে হতে লাগল। অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধান থেকে এ বোধ জন্মেনি। এরকম মনোভাব থেকে কোন লাভও হয় না। সুতরাং যুবকটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল, সুন্দর গির্জাটা পেরিয়ে পাহাড়ী পথ বেয়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল। সংকীর্ণ রাস্তাগুলোতে মদের দোকান ও খাবারের দোকানের ঠাসাঠাসি ভিড। ভিত্তরিও ভেনেতো-র প্রশস্ত রাজপথের দু'ধারে বর্ঘিস্ গার্ডেনের ছায়ায় ইওরোপের সেরা কাফেগুলিতে তখন জমায়েত হয়েছে রোমের সেরা সব মানুষ। কিন্তু রাস্তাঘাটগুলি তখনও খুবই নির্জন। তাই যুবকটিও সেইসব নির্জন, পুরনো রাস্তা ধরেই এগিয়ে চলল।

সেইরকমই একটা ফুটপাতবিহীন গলিপথ। দু'ধারে পুরনো হলুদ রংয়ের বাড়ি। নির্জন, গম্ভীর পরিবেশ। যুবকটি একাই পথ চলছে। হঠাৎ তার খেয়াল হল, একটিমাত্র নারীমূর্তি পাহাড় বেয়ে তার দিকেই নেমে আসছে।

নারী আরও কাছে এল। তার আবরণে-আভরণে সুরুচির ছাপ ; চলনে ঝরে পড়ছে গৌরব। মুখখানি অবগুণ্ঠনে ঢাকা, কিন্তু সে সুন্দরী সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। ঘটনাক্রমে এমন সুন্দরী নারীর কাছাকাছি আসতে পেরে যুবকটির একাকিত্বের বোধটা যেন সহসা তাকে পীড়া দিতে লাগল : সৌজন্যের খাতিরে ঘাড় ঘুরিয়ে চোখ দুটি নামিয়ে নেবার আগে চকিতে একটিবার তার দিকে না তাকিয়ে পারল না।

একবার তাকিয়েই সে চমকে থেমে গেল ; তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। না, সে ভুল করেনি। নারী মূর্তিটি হাসছে। তার আচরণও দ্বিধাগ্রস্ত। সঙ্গে সঙ্গে যুবকটির মনে হল : "বারাঙ্গনা ?" কিন্তু না, হাসিটা তো সেরকম নয়। আর কী আশ্চর্য, নারীমূর্তিই কথা বলল, "আমি—আমি জানি আপনাকে একথা বলা উচিত নয়...কিন্তু আজকের সন্ধ্যাটা এত সুন্দর...আর হয়তো আপনিও নিঃসঙ্গ, ঠিক আমার মতোই..."

নারী অপরূপা। যুবক মুখে কিছু বলতে পারল না, কিন্তু অন্তরের উচ্ছ্বসিত আনন্দ

তাকে মৃদু হাসবার শক্তিটুকু যোগাল। নারী আর একবার দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল, "তাই ভাবলাম...হয়তো...আমরা একসঙ্গে একটু হাঁটতে পারি, একপাত্র সুরা..."

এবার যুবক নিজেকে ফিরে পেল।

"তার চাইতে আনন্দের আর কী হতে পারে! আর এক মিনিট উপরে উঠলেই তো ভেনেতো।"

নারীর ঠোঁটে আবার মৃদু হাসি ফুটল।

"আমার বাড়িও ঠিক এখানেই..."

নীরবে তারা কযেক পা নিচে নামল। যুবকটি তো একটু আগে এই মোড় দিয়েই উঠে গিয়েছে। নারী আঙুল তুলে দেখাল। প্রথম সারির ছোট ছোট বাড়িগুলো যেখানে শেষ হয়েছে তারপরেই খানিকটা খোলা জাযগা। তারা সেখানে হেঁটে গেল। খোলা জায়গায় প্রাচীর ঘেরা একটা বাগান, আর তার পিছনেই একটা রুচিসম্পন্ন বড বাড়ি। স্ত্রীলোকটির মুখে একটা বিচিত্র ম্লান দীপ্তি,—স্বচ্ছ সূক্ষ্ম ত্বক, ধূসর অথচ উজ্জ্বল দুটি চোখ, কালো ভুরু, আর উজ্জ্বল কালো চুলের মিশ্র সৌন্দর্য। সে এগিযে গিযে চাবি ঘুরিয়ে বাগানের ফটকটা খুলে ফেলল।

ভেল্‌ভেটের পোশাক-পরা একটি চাকর তাদের অভ্যর্থনা জানাল। প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় ঝাড-লণ্ঠন ঝুলছে; সামনে সবুজ উঠোনে জলের ফোয়ারা। ফেনায়িত সুরা পরিবেশন কবা হল। দু'জনে অনেক কথা হল। রোমের আতপ্ত রাতে বরফ-ঠাণ্ডা সুরা তাদের মনকেও উত্তপ্ত করে তুলল। যুবকটি মাঝে মাঝেই কৌতূহলী চোখে নারীর দিকে তাকাচ্ছে।

নারীও কটাক্ষপাতে এবং দাঁত ও চোখের চাতুরিতে অনেককিছু বোঝাতে চাইছে। যুবকটির মনে হল, তার সাবধান হওয়া উচিত। একসময় ভাবল, এবার মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়াই ভাল—যেটুকু বাধ্যবাধকতা জন্মেছে এখানেই তার ইতি হোক। কিন্তু মেয়েটি তাকে বাধা দিল, প্রথমে মৃদু হাসি দিয়ে, তারপর বিষণ্ন দৃষ্টি দিয়ে। বারবার মিনতি জানাল, যুবকটি যেন কোনরকম বিব্রত বোধ না করে; সে বোঝে যে পরিস্থিতিটা একটু অদ্ভুত, এ অবস্থায যুবকটির মনে কোনরকম দুরভিসন্ধির সন্দেহ জাগতে পারে; কিন্তু আসল সত্য এই যে সে বড একা, আর হয়তো পথের মাঝখানে গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় যুবকটির মধ্যে সে এমন কিছু দেখেছে যার আকর্ষণ তার কাছে দুর্বার হয়ে উঠেছে। তাই সে নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি।

একটি পরিপূর্ণ মিলনের সম্ভাবনা—এমন একটি স্বপ্ন যা বহু অনাগত বৎসরের মোহভঙ্গের পরেও অমর হযে থাকবে—তাকে মনস্থির করতে সাহায্য করল। আনন্দে সেও অধীর হয়ে উঠল। মেয়েটিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করল। তার আমন্ত্রণে দু'জন একসঙ্গে আহার করল। চাকররা নানারকম সুখাদ্য পরিবেশন করল—শুক্তি, পাখির মাংস ও নরম ফল। তারপর দু'জনে গিয়ে ঠাণ্ডা উঠোনের পাশে একটা সোফায় বসল। পানীয় এল। চাকররা বিদায় নিল। বাড়িটা নিশ্চুপ হল। তারা আলিঙ্গনে আবদ্ধ হল।

একটু পরে মুখে কিছু না বলে যুবকটির হাত ধরে নারী তাকে সে ঘর থেকে নিয়ে চলল। কারও মুখে কোন কথা নেই। যুবকটির বুকের ভিতরটা ভিষণভাবে টিপ্ টিপ্ করছে—যেন সে শব্দ নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু সেই উত্তেজনার মুহূর্তে তার মনে জাগল এক নতুন নিশ্চিন্ততা। মনে হল, এমন লগ্নে, এমন মনোরম সন্ধ্যায় কখনও খারাপ কিছু ঘটতে পারে না। সব কথা স্তব্ধ হয়ে গেল। দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

নারীর শয়ন-কক্ষ। মশারির ফ্রেমে আঁটা সেই নারীর রেশমী পোশাকে অর্ধ-আবরিত দেহকে ঘিরে যুবকটির ভালবাসা একেবারে উদ্বেল হয়ে উঠল : সে ভালবাসা চিরকালের, সদা পরিপূর্ণ, তাদের আশ্চর্য সাক্ষাতের মতোই এক রূপকথা যেন।

ধীরে ধীরে নরম গলায় নারীও শোনাল তার ভালবাসার কথা। কোনদিন কোন ভুল বোঝাবুঝি হবে না, কখনও বিচ্ছেদ নেমে আসবে না দু'জনের মধ্যে। আস্তে আস্তে বিছানার চাদর দিয়ে সে যুবকের দেহটাকে ঢেকে দিল।

কিন্তু সহসা—যে মুহূর্তে যুবকটি তার পাশে শুয়ে নিজের ঠোঁটকে চেপে ধরবে তার ঠোঁটের উপর—তার মনে দ্বিধা জাগল।

কোথায় যেন একটা কি ভুল হয়েছে। একটা ত্রুটি যেন রয়ে গেছে। যুবক কান পাতল, বুঝতে চেষ্টা করল—আর তখনই বুঝতে পারল যে দোষটা তারই। বিছানার পাশেই রয়েছে ঢাকা-দেওয়া নরম আলো—কিন্তু সে এতই অসতর্ক যে সিলিংয়ের মাঝখানে বিদ্যুতালোকিত যে উজ্জ্বল ঝাড়-লণ্ঠনটা ঝুলছে সেটা নিভিয়ে দিতেই ভুলে গেছে। মনে পড়ল, সুইচটা আছে দরজার পাশে। মুহূর্তের এক ভগ্নাংশ সময়ের জন্য সে ইতস্তত করল। মেয়েটি চোখের পাতা তুলে দেখল, যুবকটি ঝাড়-লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে আছে; ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

তার চোখে একটা ঝিলিক খেলে গেল। অস্ফুটে বলল :

"প্রিয়তম, চিন্তা করো না—উঠো না..."

নারী তাব হাতটা বাড়িয়ে দিল। হাতটা বড হতে লাগল, বাহুটা ক্রমেই বড় হতে লাগল; মশাবির ফাঁক দিয়ে বের হয়ে, লম্বা কার্পেটটা পার হয়ে, দীর্ঘ মেঝের উপর ছায়া ফেলে, শেষ পর্যন্ত তার অতি দীর্ঘ আঙুলগুলি দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

ক্লিক করে একটা শব্দ তুলে সে সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিল।

অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত

হুংকার

The Shout—রবার্ট গ্রেভস্

তল্পিতল্পা নিয়ে যখন পাগলাগারদ ক্রিকেট মাঠে পৌঁছলাম তখন চিফ মেডিক্যাল অফিসার করমর্দন করতে এগিয়ে এলেন। যে বাড়িতে আমি উঠেছি সেখানে তাঁর সঙ্গে আগেই দেখা হয়েছিল। তাঁকে বললাম, আজ আমি ল্যাম্পটন টিমের হয়ে কেবল রান লিখব (উঁচু-নিচু পিচে উইকেট রক্ষা করতে গিয়ে আগের সপ্তাহে আমার একটা আঙুল ভেঙেছে)। শুনে তিনি বললেন, "ওহো, তাহলে তো আপনি একজন মজার সঙ্গী পাবেন।"

"অপর রান-লিখিয়ে কি?" আমি শুধালাম।

ডাক্তার জবাব দিলেন, "ক্রস্‌লি এই পাগলাগারদের সবচাইতে বুদ্ধিমান মানুষ। লোকটি অনেক পড়াশুনা করেছেন, খুব ভাল দাবা খেলেন, এবং আরও অনেক গুণ আছে। মনে হয়, সারা পৃথিবী ঘুরেছেন। মতিচ্ছন্নতার জন্যই তাঁকে এখানে পাঠানো হয়েছে। তাঁর সবচাইতে গুরুতর মতিচ্ছন্নতা হচ্ছে তিনি নিজেকে একজন খুনী বলে মনে করেন; সকলকে বলে বেড়ান, অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নিতে তিনি দুটি পুরুষ ও নারীকে খুন করেছেন। তাঁর অপর মতিচ্ছন্নতা আরও হাস্যকর; তাঁর ধারণা, তাঁর আত্মা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—কথাটার যে কি অর্থ তা কে জানে। তিনি আমাদের মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন, আমাদের বড়দিনের থিয়েটারে রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করেন, আর এই তো সেদিন খুব মৌলিক কিছু যাদুর খেলাও দেখালেন। আপনার তাঁকে ভাল লাগবে।"

পরিচয় হল। ক্রস্‌লির বয়স চল্লিশ-পঞ্চাশ; বড়সড় মাপের মানুষ, মুখটা অদ্ভুত, কিন্তু অপ্রীতিকর নয়। রান-লিখিয়েদের বক্সে তাঁর ঠিক পাশে বসে আমার কিছুটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল; তাঁর লোমশ হাতটা আমার বড় বেশি কাছে রয়েছে। কোনরকম দৈহিক আক্রমণের ভয় করিনি, শুধুমাত্র মনে হয়েছে যে এমন একটি লোক পাশে বসে আছে যে অসাধারণ শক্তির অধিকারী আর সেটা সম্ভবত কোন অলৌকিক শক্তি।

বড় জানালা থাকা সত্ত্বেও স্কোরিং-বক্সটা বেশ গরম।

মাস্টারি গলায় ক্রস্‌লি বলে উঠলেন, "এ ধরনের ঝড়ো আবহাওয়ায় আমাদের মতো রোগীদের আচরণ আরও বেশি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।"

আমি জানতে চাইলাম, কোন রোগী খেলছে কি না।

"দু'জন খেলছে, প্রথম জুটির এই দু'জন। ঢ্যাঙা ধরনের বি সি ব্রাউন তিন বছর আগে হ্যান্ট দলের হয়ে খেলেছে, আর অপর জন ক্লাবের হয়ে বেশ ভালোই খেলে। প্যাট স্লিংস্‌বি সাধারণত আমাদের হয়েই খেলে—অস্ট্রেলিয়ার সেই ফাস্ট বোলারকে তো আপনি চেনেন— কিন্তু আজ আমরা তাকে বসিয়ে দিয়েছি। এ ধরনের আবহাওয়ায় সে হয় তো ব্যাট্‌স্‌ম্যানের মাথা লক্ষ্য করেই বল ছুঁড়ে বসবে। তাকে ঠিক পাগল বলা যায় না, তবে অসম্ভব রকমের বদমেজাজী। ডাক্তাররা তার কিছুই করতে পারে না।" তারপরেই ক্রস্‌লি ডাক্তারের কথা বলতে শুরু করল। "ডাক্তারের মনটা খুব ভাল, আর মানসিক হাসপাতালের ডাক্তার হিসাবও বেশ ভালই পড়াশুনা করেছেন, আর করেন। বস্তুত বিষণ্ন মনস্তত্ত্ব নিয়েই তিনি পড়াশুনা করেন, আর একেবারে গত পরশু পর্যন্ত সব খবরাখবর রাখেন। তাঁর সঙ্গে আমার খুব মজা হয়। তিনি জার্মান বা ফরাসী পড়েন না; কাজেই মনস্তাত্ত্বিক ফ্যাশানের ব্যাপারে আমি সবসময়ই কিছুটা এগিয়ে থাকি; তাঁকে তো ইংরেজি অনুবাদের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আমিও নতুন নতুন স্বপ্ন তৈরি করে তাঁকে তার ব্যাখ্যা করতে বলি। তাঁর ধারণা, আমার রোগটা আসলে 'anti-paternal fixation'-এর ফল।"

তারপরেই ক্রস্‌লি জানতে চাইল, স্কোর লিখতে লিখতে তার একটা গল্পের দিকে আমি ধ্যান দিতে পারব কি না। বললাম, তা পারব। ক্রিকেট খেলাটা বেশ ঢিমেতালে চলছিল।

সে বলল, "আমার গল্পটা সত্য, এর প্রতিটি কথাই সত্য। অবশ্য গল্পটাকে আমি একটু নতুনভাবে বলছি। গল্পটা একই, কিন্তু মাঝে মাঝে আমি তার চরম পরিণতিটাকে বদলে দেই, এমনকি চরিত্রগুলো পাল্টে ফেলি। এই পরিবর্তনের ফলেই গল্পটা নতুন অতএব সত্য হয়ে ওঠে। সব সময় যদি একই ফর্মুলাকে ব্যবহার করতাম তাহলে তো অচিরেই গল্পটা একঘেয়ে ও মিথ্যা হয়ে যেত। আমি চাই গল্পটাকে বাঁচিয়ে রাখতে; এটা সত্য গল্প, প্রতিটি কথাই সত্য। এ গল্পের লোকটাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তারা সকলেই ল্যাম্পটনের মানুষ।"

স্থির হল, আমি শুধু রান ও অতিরিক্ত রানের হিসাব রাখব, আর ক্রস্‌লি রাখবে বোলিং-এর বিশ্লেষণ, আর প্রতিটি উইকেট পতনের পরেই পরস্পরের লেখা থেকে বাকিটা টুকে নেব। এই ব্যবস্থার ফলেই গল্প বলাটা সম্ভব হল।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই রিচার্ড র‍্যাচেলকে বলল: "কী অস্বাভাবিক একটা স্বপ্ন!"

র‍্যাচেল বলল, "আমাকে বল লক্ষ্মীটি, কিন্তু তাড়াতাড়ি বলবে, কারণ আমার স্বপ্নটাও তোমাকে বলতে চাই।"

রিচার্ড বলল, "খুব বুদ্ধিমান একজন (না কি অনেক জন, কারণ মাঝে মাঝেই তার চেহারাটা বদলে যাচ্ছিল) লোকের সঙ্গে একটা আলোচনা করছিলাম; তার যুক্তিগুলো পরিষ্কার মনে আছে। অথচ এই সর্বপ্রথম স্বপ্নে শোনা কোন যুক্তিকে

আমি স্মরণ করতে পারছি। সাধারণত আমার স্বপ্নগুলি জাগ্রত অবস্থা থেকে এতই আলাদা যে তাকে বর্ণনা করতে হলে আমাকে বলতে হয়: 'আমি যেন বেঁচে আছি আর চিন্তা করছি একটা গাছের মতো, একটা ঘণ্টার মতো, একটা মধ্যবর্তী C-র মতো, অথবা একটা পাঁচ পাউন্ডের নোটের মতো; আমি যেন কোনদিনই মানুষ ছিলাম না।"

র‍্যাচেল বলল, "আরে, আমারও তো সেই একই অবস্থা। মনে হয়, ঘুমের মধ্যে আমি হয় তো একটা পাথর হয়ে যাই, পাথরের পক্ষে স্বাভাবিক সব ক্ষুধা ও প্রত্যয় আমার মধ্যে জেগে ওঠে। প্রবাদবাক্য আছে: 'পাথরের মতো বোধবিহীন, কিন্তু একটি পাথরের মধ্যে অনেক নরনারীর চাইতেই বেশি বোধ, বেশি ইন্দ্রিয়ানুভূতি, বেশি আবেগ থাকতে পারে।'

রবিবারের সকাল। কাজেই সময়ের তোয়াক্কা না করে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তারা বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে; তাদের কোন সন্তান নেই, তাই প্রাতরাশও অপেক্ষা করতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে বলল, স্বপ্নের মধ্যে সেই লোকটি বা লোকগুলির সঙ্গে সে একটা বালিযাড়িতে হাঁটছিল, আর সেই লোকটি বা লোকগুলি তাকে বলল: "এই বালিয়াড়িগুলো না আমাদের সম্মুখস্থ সমুদ্রের অংশ, না আমাদের পিছনকার ঘাসভর্তি মাঠের অংশ এবং তারও দূরবর্তী পাহাড়শ্রেণীর সঙ্গেও সংযুক্ত নয়। তারা নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ; বালিয়াড়ির উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেই যেকোন মানুষ বাতাসের ঘ্রাণ থেকেই সেটা বুঝতে পারে; আর সে যদি না খেয়ে ও না পান করে, না ঘুমিয়ে ও না কথা বলে, ভাবনা-চিন্তা ও কামনা-বাসনা ছাড়াই থাকতে পারে, তাহলে অনন্তকাল ধরে সে অপরিবর্তনীয়ভাবেই সেখানে থাকতে পারে। বালিয়াড়িতে জীবন নেই, মৃত্যুও নেই। সেখানে সবকিছুই ঘটতে পারে।"

র‍্যাচেল বলল, "ওসব বাজে কথা রাখ। যুক্তিটা কি তাই বল। তাড়াতাড়ি।"

রিচার্ড জানাল, যুক্তিটা ছিল আমার গতিবিধি সম্পর্কে, কিন্তু তার তাড়া খেয়ে সেটা মাথা থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। শুধু এইটুকু মনে পড়ছে যে লোকটি প্রথমে ছিল জাপানী, তারপর ইতালীয়, এবং শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল একটা ক্যাঙারু।

স্ত্রীও পাল্টা তার স্বপ্ন-কাহিনী শোনাল। "আমিও বালিযাড়ির উপর দিয়ে হাঁটছিলাম; সেখানে অনেক খরগোসও ছিল। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে সে লোকটি যা বলেছে তার সঙ্গে মিলছে কৈ? দেখলাম, তুমি ও সেই লোকটি হাতে হাত ধরে আমার দিকে হেঁটে আসছ, আর আমি তোমাদের দু'জনের কাছ থেকে দৌড়ে সরে যাচ্ছি; তার মাথায় একটা কালো রুমাল বাঁধা; সেও আমার পিছনে দৌড়তে লাগল, আমার জুতোর বক্‌লস খুলে গেল, কিন্তু সেটা তুলে নেবার জন্য আমি অপেক্ষা করতে পারলাম না। বক্‌লসটা সেখানেই পড়ে রইল, আর সে উপুড় হয়ে সেটা তুলে নিয়ে পকেটে পুরল।"

"সে যে একই লোক তা বুঝলে কেমন করে?" স্বামী শুধাল।

স্ত্রী হেসে বলল, "কারণ তার মুখটা ছিল কালো, আর ক্যাপ্টেন কুকের ছবির মতোই তার পরনে ছিল একটা নীল কোট। তাছাড়া, এটাও তো বালিয়াড়ির ব্যাপার।"

স্বামী স্ত্রীর গলায় চুমো খেয়ে বলল, "দেখছি, আমরা যে কেবল একত্রে বাস করি, একত্রে কথা বলি এবং একত্রে ঘুমোই তাই নয়, আমরা স্বপ্নও দেখি একত্রে।"

এই বলে তারা হাসতে লাগল।

তারপর স্বামী উঠে গিয়ে স্ত্রীর প্রাতরাশ এনে দিল।

সাড়ে এগারোটা নাগাদ স্ত্রী বলল: "লক্ষ্মীটি, এবার বাইরে থেকে একটু ঘুরে এস; ফিরবার সময় এমন কিছু নিয়ে এস যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে পারি: সময়মতো বাড়ি ফিরো, ঠিক একটায় ডিনার।"

মে মাসের মাঝামাঝি; সকালবেলাটা বেশ গরম। জঙ্গল পার হয়ে স্বামী উপকূলের পথ ধরল। সেখান থেকে আধ ঘণ্টা হাঁটলেই ল্যাম্পটন।

("আপনি ল্যাম্পটন ভাল চেনেন কি?" ক্রস্‌লি শুধাল। বললাম, "না। আমি এখানে শুধু ছুটি কাটাতে আসি, আর বন্ধুদের সঙ্গেই থাকি।")

অনেক হেঁটে অনেক পথ ঘুরে সে ল্যাম্পটন ছাড়িয়ে পাহাড়ের নিচে পুরনো গির্জাটায় পৌঁছে গেল। সকাল বেলাকার প্রার্থনা শেষ হয়ে গেছে; নরম ঘাসের উপর দিয়ে সকলে দুয়ে-দুয়ে, তিনে-তিনে গির্জা থেকে বেরিয়ে আসছে। একদল ছেলেমেয়ে খেলা করছে। "এখানেও ছুঁড়ে দাও এল্‌সি। না, আমাকে দাও, এল্‌সি, এল্‌সি!" রেক্টর বেরিয়ে এসে বলটা পকেটে পুরে বলল, সেটা যে রবিবার সেকথাটা তাদের মনে রাখা উচিত ছিল। রেক্টর চলে গেল। ছেলেমেয়েরা তাকে ভেংচি কাটতে লাগল।

ইতিমধ্যে একটি অপরিচিত লোক এসে রিচার্ডের পাশে বসবার অনুমতি চাইল। দু'জনের মধ্যে আলাপ শুরু হল। লোকটি গির্জায় এসেছিল; সেখানে যা শুনে এসেছে তাই নিয়েই কথা বলতে লাগল। আত্মা পরপর দেহকে আশ্রয় করে বাস করে—প্রচারকের এই বাণীকে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। আত্মা তো মস্তিষ্ক নয়, ফুসফুস নয়, পাকস্থলি নয়, হৃৎপিণ্ড নয়, মন নয়, কল্পনা নয়। সে সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র তো? তাহলে দেহের বাইরে না থেকে সে দেহের ভিতরে থাকবে কেন? সে বলল, "তাছাড়া, ঠিক কোন্ মুহূর্তে জন্ম হয় আর মৃত্যু হয় তাও তো আমরা সঠিকভাবে বলতে পারি না। আমি তো জাপানে গিয়েছি; সেখানে তারা জন্মমুহূর্তেই নবজাতকের বয়স গণনা করে এক বছর; সম্প্রতি ইতালিতে একটি মৃত মানুষ—চলুন না, ঐ বালিয়াড়িতে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে আমি অনেক আরাম পাই।"

একথা শুনে রিচার্ড ভয় পেল; লোকটিকে একখানি কালো রেশমী রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে দেখে সে আরো ভয় পেল; বিড়বিড় করে কি যেন বলল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ছেলেমেয়েগুলো হঠাৎ একসঙ্গে তাদের দু'জনের কানের কাছে বিকট চিৎকার করে উঠল; তারপর হো-হো করে হেসে উঠল। নবাগত লোকটি ভীষণ

রেগে গেল; গালাগালি দিতে মুখ খুলল, মাড়ি পর্যন্ত দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তিনটি ছেলে চিৎকার করে পালিয়ে গেল। কিন্তু যাকে তারা এল্‌সি বলে ডাকছিল সে ভয় পেয়ে পড়ে গেল, আর ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ডাক্তার কাছেই ছিল; মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। দু'জনেই শুনতে পেল, মেয়েটি বলছে: "ওর মুখটা শয়তানের মতো।"

আগন্তুক ভাল মানুষের মতো হেসে উঠল: "কিছুদিন আগেও আমি শয়তান ছিলাম না। ব্যাপারটা ঘটে উত্তর অস্ট্রেলিয়াতে; সেখানে কালো মানুষদের সঙ্গে বিশ বছর কাটিয়েছি। সেখানে তারা আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছিল তাকে ইংরেজী ভাষায় তর্জমা করলে "Devil"-এর (শয়তান) কাছাকাছিই দাঁড়ায়। আনুষ্ঠানিক পোশাক হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটিশ নৌ-বাহিনীর একটা ইউনিফর্মও তারা আমাকে দিয়েছিল। চলুন না, বালিয়াড়িতে হাঁটতে-হাঁটতে আপনাকে পুরো গল্পটাই বলব। বালিয়াড়িতে হাঁটতে আমার খুব ভাল লাগে। আর সেজন্যই এ শহরে এসেছি...আমার নাম চার্লস।"

রিচার্ড বলল: "ধন্যবাদ, কিন্তু ডিনারে যোগ দিতে আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।"

চার্লস বলল, "বাজে কথা রাখুন। ডিনার একটু পরে খেলেও চলবে। অথবা, যদি বলেন তো আমিও আপনার সঙ্গে ডিনারে বসতে পারি। ভাল কথা, শুক্রবার থেকে আমি কিছুই খাইনি। পকেটে পয়সা নেই।"

রিচার্ড অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। চার্লসকে সে ভয় পাচ্ছে; স্বপ্ন, বালিয়াড়ি ও রুমালের কথা ভেবে তাকে ডিনারে যোগ দিতে বলার ইচ্ছাও তার নেই; আবার, লোকটি বুদ্ধিমান ও শান্তশিষ্ট, তার পোশাক রুচিসম্মত, শুক্রবার থেকে কিছুই খায়নি; র‍্যাচেল যদি জানতে পারে যে সে তাকে একবেলা খাওয়াতে অস্বীকার করেছে তাহলেই তো হাসি-ঠাট্টা শুরু করে দেবে। র‍্যাচেল তো রেগে গেলেই তাকে ঠাট্টা করে বলে: "ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার।" তাই সে বলল: "বেশ তো আসুন না ডিনারে। কিন্তু আপনার ভয়ে ছোট মেয়েটি এখনও ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওকে একটু সান্ত্বনা দিন না।"

চার্লস ইশারায় মেয়েটিকে কাছে ডাকল; তাকে একটিমাত্র কথা বলল; অস্ট্রেলিয়ার একটি যাদু-শব্দ; অর্থ 'দুধ'। সঙ্গে সঙ্গে এলসি খুশি হয়ে চার্লসের হাঁটুর উপর বসে তার ওয়েস্টকোটের বোতাম নিয়ে খেলা করতে শুরু করল। পরে চার্লস তাকে নামিয়ে দিল।

রিচার্ড বলল, "আপনার তো অদ্ভুত ক্ষমতা দেখছি।"

চার্লস জবাব দিল: "ছেলেমেয়েদের আমি ভালবাসি, কিন্তু ওদের চিৎকার শুনে চমকে উঠেছিলাম; মুহূর্তের জন্য যা করার লোভ হয়েছিল সেটা যে করে ফেলিনি সেজন্য আমি আনন্দিত।"

"সেটা কি?" রিচার্ড শুধাল।

"আমি নিজেও চিৎকার করে উঠতে পারতাম," চার্লস বলল।

রিচার্ড বলল, "আরে সেটাই তো তাদের ভাল লাগত। তারা বেশ একটা খেলা পেয়ে যেত। হয়তো আপনার কাছে তারা সেটাই আশা করেছিল।"

চার্লস বলল, "আমি যদি চিৎকার করে উঠতাম তাহলে তারা হয় সরাসরি মারা যেত, আর না হয় তো পাগল হয়ে যেত। সম্ভবত মারাই যেত, কারণ তারা আমার খুবই কাছে ছিল।"

রিচার্ড বোকার মতো একটু হাসল। চার্লস এমন গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলল যে তার হাসা উচিত কি না সেটাই রিচার্ড ঠিক বুঝে ওঠেনি। বলল: "বটে, সেটা আবার কিরকম চিৎকার? আমাকে একটু শোনান তো।"

চার্লস বলল, "আমার চিৎকারে শুধু যে ছোটরাই আঘাত পায় তা কিন্তু নয়; তা শুনে বড়রাও ঘোর পাগল হয়ে যেতে পারে; অত্যন্ত শক্তিমান মানুষও মাটিতে আছড়ে পড়ে। এটা একটা যাদু চিৎকার; উত্তর দেশের প্রধান শয়তানের কাছ থেকে আমি এটা শিখেছি। আঠারো বছর ধরে এটাকে রপ্ত করেছি, অথচ এই সময়ের মধ্যে মোট পাঁচবারের বেশি এটা ব্যবহার করিনি।"

রিচার্ড তবু বলল, "ব্যাপারটা একটু দেখাবেন?"

চার্লস বলল, "দেখছি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি কি আগে কখনও ভয়-দেখানো হুংকার শোনেননি?"

রিচার্ড একটু ভেবে বলল, "তা মনে করুন, প্রাচীন আইরিশ যোদ্ধারা শুনেছি এমন বীরত্বব্যঞ্জক হুংকার দিত যে তা শুনেই শত্রুপক্ষের সৈন্যরা পিছু হটে যেত; আর ট্রয়ের মহাবীরও তো ভয়ংকর হুংকার ছাড়ত। গ্রীসের জঙ্গলেও হঠাৎ জোর চিৎকার শোনা যেত। বনদেবতা প্যাক নাকি সেই সব চিৎকার করত, আর তা শুনে মানুষ ভয়ে পাগল হয়ে যেত; আসলে এই উপকথা থেকেই ইংরেজী "panic" শব্দটার সৃষ্টি হয়েছে। "মোবিনোজিয়ন" এর লুড ও লাভ্‌লির গল্পেও একটা হুংকারের কথা পড়েছি। প্রতি "মে ইভ"-এ সে হুংকার শোনা যেত; তা শুনে ভয়ে পুরুষদের মুখ শুকিয়ে যেত, তাদের সব শক্তি উবে যেত, স্ত্রীলোকদের সন্তান হারিয়ে যেত, যুবক ও কুমারীদের জ্ঞান লোপ পেত, জীবজন্তু, গাছপালা, ভূমি, নদী হয়ে যেত অনুর্বর, বন্ধ্যা। আর সে হুংকার দিত একটা ড্রাগন।"

চার্লস বলল, "সে নিশ্চয় ড্রাগন জাতীয় কোন বৃটিশ যাদুকর ছিল। আমি ক্যাঙারু জাতির অন্তর্ভুক্ত। হ্যাঁ, মিলে যাচ্ছে।"

একটার সময় তারা বাড়ি ফিরল। র‍্যাচেল দরজায় দাঁড়িয়েছিল। ডিনার তৈরি। রিচার্ড বলল, "র‍্যাচেল, ইনি মিঃ চার্লস, আমি ডিনারে আমন্ত্রণ করেছি। মিঃ চার্লস মস্ত বড় পর্যটক।"

রোদ থেকে আড়াল করার জন্য র‍্যাচেল একটা হাত চোখের উপর রাখল। চার্লস হাতটা ধরে তাতে চুমো খেল; র‍্যাচেল অবাক হয়ে গেল।

(ক্রস্‌লি বলল, "র‍্যাচেলকে আপনার ভাল লাগবে; সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে।")

চার্লস সম্পর্কে কিছু বলা শক্ত: বয়স মাঝারি, লম্বা, চুল পাকা, বড় বড় দুটি উজ্জ্বল চোখ, কখনও হলুদ, কখনও বাদামী, কখনও ধূসর; কথা বলার সময় বিষয়বস্তু অনুসারে গলার স্বর বদলে যায়; হাত দুটি বাদামী, নিচের দিকটি লোমশ; নখ সযত্নরক্ষিত। রিচার্ড সম্পর্কে বলা যায়, সে একজন সঙ্গীতশিল্পী, শক্তিমান নয়, কিন্তু ভাগ্যবান। ভাগ্যই তার শক্তি।

ডিনারের পরে চার্লস ও রিচার্ড একসঙ্গেই বাসনপত্র ধুয়ে ফেলল। একসময় রিচার্ড হঠাৎ চার্লসকে হুংকারটা শোনাতে বলল: কারণ সেটা না শোনা পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

বাসনমোছা ন্যাকড়াটা হাতে নিয়েই চার্লস বলল, "আপনার যেমন ইচ্ছা; কিন্তু এ হুংকার সম্পর্কে আমি তো আগেই আপনাকে সাবধান করে দিয়েছি। হুংকার যদি করতেই হয় তাহলে এমন একটা নির্জন স্থানে করতে চাই যেখানে অন্য কেউ সেটা শুনতে পাবে না। দ্বিতীয় ডিগ্রির হুংকার করব না, কারণ তার ফল নিশ্চিত মৃত্যু; আমি শোনাব প্রথম ডিগ্রির হুংকার, সেটার ফলে কেবল আতংক হয়। যখনই আমাকে থামাতে চাইবেন আপনার দুই হাতে দুই কান চেপে ধরবেন।"

"ঠিক আছে," রিচার্ড বলল।

চার্লস বলল, "নিছক কৌতূহল মেটাবার জন্য কখনও হুংকার দেইনি; কালো বা সাদা যেকোন শত্রুর হাতে জীবন বিপন্ন হলে তবেই হুংকার দিয়েছি। একবার যখন মরুভূমিতে একলা ছিলাম, খাদ্য-পানীয় কিছু ছিল না, তখন বাধ্য হয়ে হুংকার ছেড়েছিলাম খাদ্যের জন্য।"

রিচার্ড ভাবল: "আমি তো ভাগ্যবান মানুষ; এ ব্যাপারেও আমার ভাগ্য অবশ্যই ভাল হবে।"

চার্লসকে বলল, "আমি ভয় পাচ্ছি না।"

চার্লস বলল, "কাল ভোরে অন্য কেউ উঠবার আগেই আমরা বালিয়াড়িতে চলে যাব; তারপর হুংকার ছাড়ব। আপনি তো বলছেনই ভয় পাবেন না।"

রিচার্ড কিন্তু আসলে বেশ ভয় পেয়ে গেল। সে ভয় আরও বেড়ে গেল এই কারণে যে কথাটা সে র‍্যাচেলকে বলতে পারল না। সে জানে কথাটা শুনলে হয় র‍্যাচেল তাকে যেতে দেবে না, আর না হয় তো সে নিজেই সঙ্গে যেতে চাইবে। র‍্যাচেল যদি তাকে যেতে নিষেধ করে, তাহলে এই হুংকারের ভয় ও ভীরুতার বোধ চিরদিন তাকে কষ্ট দেবে; আবার সে যদি সঙ্গে যায়, তাহলে হুংকারটা যদি কিছুই না হয় তো তাকে ঠাট্টা করার একটা নতুন অজুহাত সে পেয়ে যাবে, হুংকারটা যদি কার্যকর হয় তাহলে র‍্যাচেল তো পাগলও হয়ে যেতে পারে। তাই রিচার্ড তাকে কিছুই বলল না।

চার্লসকে রাতটা তাদের কুটিরে কাটাতে বলা হল, এবং অনেক রাত পর্যন্ত দু'জন গল্প করে কাটাল।

র‍্যাচেল সাধারণত মদ খায় না; কিন্তু সেদিন দু' গ্লাস খেল, আর তার ফলে

আজেবাজে বকতে লাগল। বলল, "আরে, তোমাকে তো বলতেই ভুলে গিয়েছি লক্ষ্মীটি। আজ সকালে তুমি চলে গেলে বক্‌লস লাগানো জুতো জোড়া পরতে গিয়ে দেখি একটা বক্‌লস নেই। স্বপ্নের মধ্যেই সেটা আমি প্রথমে জানতে পেরেছিলাম। কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে যে সে বক্‌লসটা মিঃ চার্লসের পকেটেই আছে; আর আমার নিশ্চিত ধারণা যে এই লোকটিকেই আমরা স্বপ্নে দেখেছি। কিন্তু তা নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত নই, মোটেই না।"

রিচার্ড আরও ভয় পেয়ে গেল; তবু কালো রেশমী রুমাল, চার্লসের কাছ থেকে বালিয়াড়িতে হাঁটতে যাবার ডাক—কোন কথাই সে র‍্যাচেলকে সাহস করে বলতে পারল না। মাথাটা ঘুরিয়ে বলল, "কি জান, চার্লস অনেককিছু জানে। তুমি যদি কিছু না মনে কব, কাল ভোরে আমি তাকে নিয়ে একটু বেড়াতে যাব। প্রাতঃভ্রমণ আমার পক্ষে খুব দরকারি।"

"বেশ তো আমিও যাব" র‍্যাচেল বলল।

রিচার্ড আপত্তি করতে পারল না; বুঝতে পারল, বেড়াতে যাবার কথাটা বলাই তার ভুল হয়েছে। বলল, "চার্লস খুব খুশি হবে। তাহলে ভোর ছ'টায়।"

ছ'টায় রিচার্ড ঘুম থেকে উঠল; কিন্তু মদের নেশায় চোখে ঘুমের ঘোর থাকায় র‍্যাচেল তাদের সঙ্গে যেতে পারল না। স্বামীকে চুমো খেয়ে বিদায় দিল। স্বামী চার্লসকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাতটা রিচার্ডের ভাল কাটেনি। আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছে; মনে হয়েছে, সে যেন র‍্যাচেলের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে; হুংকারের আতংক যেন তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। খুব খিদে পেয়েছে; শীতও করছে। পাহাড় থেকে একটা তীব্র হাওয়া বইছে সমুদ্রের দিকে। কয়েক পশলা বৃষ্টিও হয়েছে। চার্লসের মুখে কোন কথা নেই। একটা ঘাস চিবুতে চিবুতে দ্রুত হাঁটছে।

রিচার্ডের মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। চার্লসকে বলল, "এক মিনিট দাঁড়ান। আমার বাঁদিকে একটা সেলাই আছে।" দু'জনই থামল। রিচার্ড ঢোক গিলে বলল, "হুংকারটা কি ধরনের? খুব জোরালো না কর্কশ? কেমন করে করা হয়? লোককে পাগলই বা করে কেমন করে?"

চার্লস চুপ। বোকার মতো হেসে রিচার্ড বলতে লাগল: "অবশ্য শব্দ একটা অদ্ভুত জিনিস। মনে পড়ে, আমি যখন কেম্ব্রিজে ছিলাম তখনও একবার কিংস কলেজের একজনের পালা পড়েছিল সন্ধ্যাকালীন পাঠটা পড়াবার। সে দশটা শব্দও উচ্চারণ করেনি এমন সময় একটা আর্তনাদ শোনা গেল, কট্‌-কট্‌, ক্যাচ্‌-ক্যাচ্ শব্দ উঠল, আর ছাদ থেকে কাঠের টুকরো ও ধুলো-বালি ঝরতে শুরু করল। কাজেই সে পড়া থামিয়ে দিল, না হলে হয়তো ছাদটাই ভেঙে পড়ত। আবার ধরুন বেহালায় একটা সুর বাজিয়ে আপনি একটা মদের গ্লাসকে ভেঙে ফেলতে পারেন।"

চার্লস জবাবে বলল: "আমার হুংকার স্বরক্ষেপণ বা বায়ুর প্রকম্পনের ব্যাপার নয়, কিন্তু এমন একটা কিছু যাকে ঠিক বোঝানো যায় না। এ হুংকার একান্তই

সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায়। তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ, কিন্তু আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না; তুমি যেন একটা কিছুর জন্য অপেক্ষা করে আছ, কিন্তু সেই ভয়ংকর কিছু তোমার বেলায় ঘটল না, ঘটল আমার উপরে। সেটা যে কি তা তোমাকে বলতে পারব না, কিন্তু মনে হল আমার সবগুলি স্নায়ু যেন যন্ত্রণায় একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, একটা তীব্র অশুভ আলোর রেখা যেন আমাকে খান্ খান্ করে কেটে ফেলল; শরীরের ভিতরটা তালগোল পাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। ঘুম ভেঙে গেল; বুকটা এত জোরে ধড়ফড় করছে যে শ্বাস নিতেও কষ্ট হতে লাগল। তোমার কি মনে হয় আমি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম? লোকে বলে তাতেও ঐরকম হয়। তুমি কোথায় ছিলে লক্ষ্মীটি? মিঃ চার্লসই বা কোথায়?"

রিচার্ড বিছানায় বসে হাতটা বাড়িয়ে দিল। বলল, "আমারও একটা খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। চার্লসের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে গিয়েছিলাম; তিনি এগিয়ে গিয়ে সবচাইতে উঁচু বালির ঢিবিটায় উঠতেই আমি মূর্চ্ছিত হয়ে কতকগুলো পাথরের উপর পড়ে গেলাম; যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন দেখি ভয়ে ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে; ছুটতে ছুটতে একাই বাড়ি চলে এলাম। সম্ভবত আধ ঘণ্টা আগে ঘটনাটা ঘটেছে।"

সে র‍্যাচেলকে এর বেশি কিছু বলল না।

র‍্যাচেল বলল, "আমিও তোমার মতোই অসুস্থ।" অথচ তাদের দু'জনের মধ্যে একটা সমঝোতা আছে যে র‍্যাচেল অসুস্থ হলে রিচার্ডকে সুস্থ থাকতেই হবে।

"তুমি অসুস্থ নও," বলেই রিচার্ড আবার মূর্চ্ছা গেল।

র‍্যাচেল কোনরকমে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পোশাক পাল্টে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। কফি ও শূকর-মাংসের গন্ধ নাকে এল। ওই তো চার্লস। উনুন ধরিয়ে ট্রেতে দুটো প্রাতরাশ সাজিয়েছে। প্রাতরাশের ঝঞ্ঝাট এড়াতে পেরে র‍্যাচেল এত খুশি হল, আর এই অভিজ্ঞতার ফলে এত বিচলিত হল যে সে চার্লসকে ধন্যবাদ দিল, তাকে লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করল, আর চার্লসও গম্ভীরভাবে তার হাতে চুমো খেয়ে হাতটা চেপে ধরল। প্রাতরাশটা র‍্যাচেলের পছন্দমতোই তৈরি করা হয়েছে; কফিটা কড়া হয়েছে, আর ডিমটাকে দু'দিকেই ভাজা হয়েছে।

র‍্যাচেল চার্লসের প্রেমে পড়ে গেল। বিয়ের পর থেকে সে অনেকবার প্রেমে পড়েছে; কিন্তু এধরনের ঘটনা ঘটলে সেও রিচার্ডকে তা বলে দেয়, আবার রিচার্ডের জীবনে এধরনের ঘটনা ঘটলেই সে র‍্যাচেলকে তা বলে; তাতে মনের অবরুদ্ধ আবেগও প্রকাশিত হতে পারে, আর কোনরকম ঈর্ষারও সৃষ্টি হয় না; কারণ র‍্যাচেল বলে (আর সেকথা বলার পূর্ণ স্বাধীনতা রিচার্ডেরও আছে): 'হ্যাঁ, আমি অমুকের প্রেমে পড়েছি, কিন্তু আমি ভালবাসি শুধু তোমাকেই।'

অতীতে সেইরকমই হয়েছে কিন্তু এবার ব্যাপারটা অন্যরকম। কারণটা সে জানে না, কিন্তু যেমন করেই হোক চার্লসের প্রেমে পড়ার কথাটা সে বলতে পারল না, কারণ এখন সে আর রিচার্ডকে ভালবাসে না। অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্য রিচার্ডকে

সে ঘৃণা করে; মুখেও বলে, সে অলস, অকর্মণ্য। দুপুর নাগাদ রিচার্ড উঠে বসল, আর্তনাদ করতে করতে শোবার ঘরেই ঘুরে বেড়াল, আর শেষ পর্যন্ত র‍্যাচেল এসে তাকে বিছানায় পাঠিয়ে দিল; গোঙাতে হয় তো সেখানেই গোঙাক।

চার্লস গৃহস্থালির কাজে র‍্যাচেলকে সাহায্য করে, সব রান্না করে দেয়, কিন্তু রিচার্ডকে দেখতে উপরে ওঠে না, কারণ তাকে উপরে উঠতে বলা হয়নি। র‍্যাচেল লজ্জা পেয়েছে, রিচার্ড চার্লসকে ফেলে পালিয়ে এসেছে বলে তার কাছে ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু চার্লস বলেছে, সে এটাকে অপমান বলে মনে করেনি; বরং সেই সকালটা তার যেন কেমন অদ্ভুত লেগেছিল; তারা যখন বালিয়াড়িতে পৌঁছেছিল তখন বাতাসে যেন কি এক অশুভ শক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। র‍্যাচেলও তাকে বলেছে যে ঐ একই রকম অদ্ভুত অনুভূতি তারও হয়েছিল।

পরে সেও শুনল, সারা ল্যাম্পটন ওই একই কথা বলে বেড়াচ্ছে। ডাক্তার বলেছে একটা মৃদু ভূমিকম্প হয়েছিল, কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলছে, শয়তান এই পথে চলে গেছে। শিকার-রক্ষক সলমন জোন্স-এর কালো আত্মাকে নিয়ে যেতেই শয়তান এসেছিল, কারণ সেই সকালেই তাকে বালিয়াড়ির পাশে তার নিজের ঘরেই মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

রিচার্ডের যখন নীচে নেমে একটু-আধটু হাঁটবার মতো অবস্থা হল তখন র‍্যাচেল তাকে মুচির কাছে পাঠাল তার জুতোর জন্য একটা নতুন বক্‌লস আনতে। সে স্বামীর সঙ্গে বাগানের নীচে পর্যন্ত গেল। খাড়া তীর বরাবর রাস্তাটা চলে গেছে। রিচার্ডকে আবার অসুস্থ মনে হল; হাঁটতে হাঁটতে সে একটু গোঙাতে লাগল; কিছুটা রেগে, কিছুটা তামাশা করে র‍্যাচেল স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে তীর থেকে নীচে ফেলে দিল; কাঁটাঝোপ ও পুরনো লোহার মধ্যে সে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। র‍্যাচেল হো-হো করে হেসে উঠে দৌড়ে বাড়িতে ফিরে গেল।

রিচার্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল, কাঁটাঝোপের ভিতর থেকে জুতো খুঁজে বের করল, তারপর তীর বেয়ে উপরে উঠে ফটকটা পেরিয়ে প্রচণ্ড রোদ্দুরে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল।

মুচির বাড়িতে পৌঁছে ধপাস করে বসে পড়ল। তাকে দেখে মুচি বেশ খুশি হল। বলল, "তোমাকে খারাপ দেখাচ্ছে।"

রিচার্ড বলল: "ঠিক। শুক্রবার সকালে মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল; সবে একটু ভাল হয়ে উঠেছি।"

মুচি গলা ছেড়ে বলে উঠল, "আরে, তোমার তো মাথা ঘুরছিল, আর আমার কি হয়েছিল? মনে হয়েছিল, কেউ যেন আমার ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে নিচ্ছে। কেউ যেন আমার আত্মাকে ধরেই লোফালুফি করছে, ঠিক যে-রকম লোকে একটা পাথর নিয়ে করে। তারপরই আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গত শুক্রবারের সকালটা আমি কোনদিন ভুলব না।"

রিচার্ডের মাথায় একটা অদ্ভুত ধারণা ঢুকল: তবে কি সে মুচির আত্মাটাকেই

পাথরের মতো নাড়াচাড়া করেছিল? সে ভাবল: "হয় তো ল্যাম্পটনের প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশুর আত্মাই সেখানে পাথর হয়ে পড়েছিল।" কিন্তু এসব কথা সে মুচিকে বলল না; একটা বক্‌লস নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

বাড়িতেও সুখ নেই। চার্লস বাড়িতে পাকাপাকিভাবে বসে গেছে। কিছুই বলার নেই। চার্লস মৃদুভাষী, কঠোর পরিশ্রমী, আর র‍্যাচেল যখন স্বামীকে গালাগালি করে তখন সে রিচার্ডের পক্ষই নেয়। সেটা আরও দুঃখদায়ক, কারণ র‍্যাচেল তার প্রতিবাদ করে না।

ক্রস্‌লি বলল, "গল্পের বাকি অংশটা হাসির খোরাক: রিচার্ড আবার বালিয়াড়িতে গেল, পাথরের স্তূপটাকে খুঁজে বের করল, ডাক্তার ও রেক্টরের আত্মা দুটিকে চিহ্নিত করল—ডাক্তারের আত্মার গড়ন অনেকটা হুইস্কির বোতলের মতো, আর রেক্টরের আত্মা আদিম পাপের মতোই কালো; আর এইভাবে সে প্রমাণ করল যে তার ধারণাটা কল্পনামাত্র নয়। কিন্তু এসব বিবরণের মধ্যে না গিয়ে সেখানে থেকেই আবার আরম্ভ করছি যেখানে দু' দিন পরে র‍্যাচেল হঠাৎ রিচার্ডকে আবার আগের চাইতে অনেক বেশি করে ভালবাসতে শুরু করল।

তার কারণ চার্লস বাড়ি থেকে চলে গেছে: কোথায় গেছে তা কেউ জানে না। ফলে দু'-একদিনের মধ্যেই রিচার্ড আবার সুস্থ হয়ে উঠল; সব কিছুই আগের মতো চলতে লাগল। কিন্তু একদিন বিকেলে দরজাটা খুলে গেল; দরজায় দাঁড়িয়ে চার্লস।

কোন কথা না বলে সে ঘরে ঢুকল; টুপিটাকে পেরেকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখল। অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে শুধাল: "রাতের খাবার কখন তৈরি হবে?"

ভুরু তুলে রিচার্ড র‍্যাচেলের দিকে তাকাল; কিন্তু ভাব দেখে মনে হল, র‍্যাচেল লোকটাকে দেখেই মজে গেছে।

বলল: "আটটায়"। তারপর ঝুঁকে পড়ে চার্লসের কাদা-মাখা বুটজোড়া খুলে নিয়ে রিচার্ডের একজোড়া চটি এগিয়ে দিল।

চার্লস বলল: "বেশ। এখন সাতটা বাজে। একঘণ্টা পরে রাতের খাবার। নটার সময় ছেলেটা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা নিয়ে হাজির হবে। দশটার সময়— র‍্যাচেল, তুমি আর আমি একসঙ্গে ঘুমোব।"

রিচার্ডের মনে হল, চার্লস নির্ঘাৎ হঠাৎ পাগল হয়ে গেছে। র‍্যাচেল শান্ত গলায় জবাব দিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয় লক্ষ্মীটি!" তারপরেই রিচার্ডের দিকে ঘুরে সজোরে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, "আর তুমি বেঁটে মানুষ, এখান থেকে দূর হয়ে যাও!"

গালে হাত বুলোতে বুলোতে রিচার্ড হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইল। র‍্যাচেল ও চার্লস দু'জনই পাগল হয়ে গেছে এটা যেহেতু বিশ্বাস করা যায় না, তাই নিশ্চয় সে নিজেই পাগল হয়ে গেছে। যাই হোক; রিচার্ড ও র‍্যাচেলের মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে যে, দু'জনের যেকোন একজন যদি কখনও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে চায় তাহলে অপরজন তাতে বাধা দেবে না। অনুষ্ঠানের চাইতে ভালবাসার বন্ধনকেই

তারা জীবনের স্বীকৃতি দিতে চেয়েছে। তাই রিচার্ড যথাসাধ্য শান্ত গলায় বলল, "ঠিক আছে র‍্যাচেল, তোমাদের দু'জনকে একত্র রেখেই আমি চলে যাব।"

চার্লস তার দিকে একপাটি বুট ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এখন থেকে প্রাতরাশের সময় পর্যন্ত যদি এই দরজায় নাক গলাও, তাহলে এক হুংকারে মাথা থেকে তোমার কান দুটোকে আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব।"

রিচার্ড বেরিয়ে গেল; ভয়ে নয়, শান্ত চিত্তে, পরিষ্কার মাথায়। ফটক পার হয়ে গলিপথ ধরে সে মাঠে নামল। সূর্যাস্তের এখনও তিন ঘণ্টা বাকি। স্কুলের মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে। তাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করল। কিন্তু র‍্যাচেলের কথা মনে হতেই চোখে জল এসে গেল। তখনই নিজেকে সান্ত্বনা দিল, "হায়, আমি যে পাগল হয়ে গেছি। আমার কী মন্দ ভাগ্য!"

শেষ পর্যন্ত সে পাথরগুলির কাছে গেল। বলল, "এবার এই পাথরের স্তূপের ভিতর থেকে আমার আত্মাকে খুঁজে বের করে এই হাতুড়ি দিয়ে তাকে একশ' টুকরো করে ফেলব"—বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় কয়লাঘর থেকে সে হাতুড়িটা নিয়ে এসেছিল।

এবার সে নিজের আত্মাকে খুঁজতে লাগল। এখন, অন্য স্ত্রী-পুরুষের আত্মাকে চেনা যায় কিন্তু নিজের আত্মাকে কেউ চিনতে পারে না। রিচার্ডও চিনতে পারল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে র‍্যাচেলের আত্মাকে দেখেই চিনতে পারল (স্ফটিকখচিত একটা সবুজ পাথর)। তার গায়েই লেগে আছে আর একটা পাথর; কুৎসিত গড়নের একটা ফুটকি-ফুটকি বাদামী পাথর। রিচার্ড প্রতিজ্ঞা করল: "এটাকে আমি ধ্বংস করব। এটা নিশ্চয় চার্লসের আত্মা।"

সে র‍্যাচেলের আত্মাকে চুমো খেল; ঠিক যেন তার দুটি ঠোঁটেই চুমো খেল। তারপর চার্লসের আত্মাকে নিয়ে হাতুড়িটা তুলল। "তোকে ভেঙে পঞ্চাশ টুকরো করে ফেলব!"

সে থেমে গেল। তার খটকা লাগল। সে জানে, র‍্যাচেল তার চাইতেও চার্লসকে বেশি ভালবাসে, কাজেই সে ভালবাসাকে স্বীকৃতি দিতে সে বাধ্য। একটা তৃতীয় পাথর (সেটা নিশ্চয় তার নিজের আত্মা) চার্লসের পাথরের পাশেই পড়েছিল; একখণ্ড মসৃণ ধূসর গ্র্যানাইট পাথর, একটা ক্রিকেট বলের মতো বড়। নিজের মনেই বলল: "আমার নিজের আত্মাকেই টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলব; তাহলেই আমার অবসান ঘটবে।" পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল, ঝাপসা হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি, প্রায় মূর্চ্ছিত হবার মতো অবস্থা। কিন্তু সে সামলে নিল, তীব্র চিৎকার করে কয়লা-ভাঙা হাতুড়ি দিয়ে সশব্দে আঘাত করল সেই ধূসর পাথরটার উপর। আবার এক আঘাত।

পাথরটা চার টুকরো হয়ে গেল; বারুদের মতো একটা গন্ধ বের হল। কিন্তু রিচার্ড যখন দেখল যে তথাপি সে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে, তখন সে হো-হো করে হেসে উঠল। হাসির পর হাসি। হায়, সে পাগল হয়ে গেল, একেবারে পাগল। হাতুড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, ক্লান্ত দেহে বসে পড়ল, একসময় ঘুমিয়েও পড়ল।

যখন জাগল তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বাড়ি যেতে যেতে ভাবল : "বড়ই খারাপ স্বপ্ন ; র‍্যাচেল নিশ্চয় এর হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারবে।"

শহরের প্রান্তে পৌঁছে দেখল, ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে একদল লোক উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। একজন বলছে: "আটটা নাগাদ এটা ঘটেছে, তাই না?" আর একজন বলছে: "হ্যাঁ"। তৃতীয়জন বলছে: "আরে, বদ্ধ পাগল। বলে কি না, 'আমাকে ছুঁয়েই দেখ, আমি হুংকার দিয়ে উঠব, আর এক হুংকারে গোটা পুলিশ বাহিনীসহ তোমাকে অজ্ঞান করে ফেলব। আমার হুংকার শুনে তোমরা পাগল হয়ে যাবে।'...আর ইন্সপেক্টর বলল: 'ক্রস্‌লি, এবার তোমার হাত দুটো উপরে তোল, এতদিনে তোমাকে বাগে পেয়েছি।'...তখন সে বলল: 'একটা শেষ সুযোগ। আমাকে রেখে চলে যাও, নইলে এক হুংকারে আমি তোমাদেব মেবে কাঠ বানিয়ে দেব।...

তাদের কথাবার্তা শুনতে রিচার্ড দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বলল, "তারপর ক্রস্‌লির কি হল? সেই নারী কি বলল?"

সেই নারী ইন্সপেক্টরকে বলল, 'খ্রিস্টের দোহাই, আপনি চলে যান, নইলে ও আপনাকে মেরে ফেলবে।'

"আর লোকটি কি হুংকার দিল?"

"না, সে হুংকার দেযনি। মুহূর্তের জন্য মুখটা কুঁচকে শ্বাসটা টানল। হা পরমেশ্বর, জীবনে এবকম বীভৎস মুখ আমি কখনও দেখিনি। পরে আমাকে তিন-চার পেগ ব্র্যান্ডি খেতে হযেছিল। আর ইন্সক্টেরের রিভল্‌বারটা বাগিয়ে ধরে গুলি করল, কিন্তু কারও গায়ে গুলি বিঁধল না। তারপরেই হঠাৎ এই ক্রস্‌লি নামক লোকটিব মধ্যে একটা পবিবর্তন দেখা দিল। দুটি হাত সশব্দে দুই পাশে চেপে ধরে একটু পরেই বুকের উপর রাখল ; মুখটা আবার চকচক করতে লাগল। তারপরেই সে হাসতে শুরু করল, নাচতে শুরু করল, নানারকম অঙ্গভঙ্গি কবতে লাগল। স্ত্রীলোকটি হাঁ করে তাকিয়ে রইল: যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। পুলিশ তাকে নিয়ে চলে গেল। লোকটা যদি পাগলও হয়ে থাকে, তখন কিন্তু একেবারেই শান্তশিষ্ট ও নিরীহ ছিল ; তাকে নিয়ে পুলিশকে কোনরকম ঝামেলাই পোহাতে হয়নি। অ্যাম্বুলেন্সে তুলে তাকে "রাজকীয় পশ্চিমাঞ্চল উন্মাদ আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হযেছে।"

রিচার্ড তো বাড়ি ফিরে গেল ; সব কথা র‍্যাচেলকে বলল, র‍্যাচেলও তাকে সব কথা বলল, যদিও বেশি কিছু বলার ছিল না। স্ত্রী বলল, সে চার্লসের প্রেমে পড়েনি ; রিচার্ডকে বিরক্ত করার জন্যই ওসব কথা সে বলেছিল ; আসলে সে নিজেও কিছু বলেনি, বা চার্লসকেও কিছু বলতে শোনেনি ; সবটাই তার স্বপ্নমাত্র। স্বামীর দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তাকেই সে চিরদিন ভালবেসেছে ; অবশ্য দোষের মধ্যে তার কৃপণতা, বাচালতা, আর অপরিচ্ছন্নতা ; অন্য কোন দোষ তার নেই। চার্লস ও সে চুপচাপ রাতের খাবার খেয়েছিল ; তারপর সে তার সঙ্গে একটু-আধটু খুনসুটিও শুরু করেছিল, তাকে নাচতে ডেকেছিল, আর তখনই দরজায় টোকা পড়ল। ইন্সপেক্টর চিৎকার করে বলল :

'ওয়াল্টার চার্লস ক্রস্‌লি, অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নিতে জর্জ গ্র্যান্ট, হ্যারি গ্র্যান্ট ও আভা কোলম্যানকে খুন করার অভিযোগে রাজার নামে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করছি।" ততক্ষণে চার্লস বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। পকেট থেকে একটা জুতোর বক্‌লস বের করে সেটাকে বলল: "আমার হয়ে এই নারীকে বেঁধে রাখ।" তারপর পুলিশকে চলে যেতে বলল; নইলে সে নাকি হুংকার দিয়েই তাদের মেরে ফেলবে। তারপর তাদের ভয়ংকরভাবে মুখ ভেংচে হঠাৎ একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। "লোকটা কিন্তু খুব ভাল ছিল; তাকে আমার বড় ভাল লেগেছিল; তার জন্য সত্যি আমার দুঃখ হয়।"

"গল্পটা আপনার ভাল লেগেছে?" ক্রস্‌লি শুধালো।

আমি তখন রান লিখতে ব্যস্ত। জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, একটি সেরা মাইলেসীয় গল্প। লুসিয়াস এপুলিয়াস, আপনাকে অভিনন্দন জানাই।"

ক্ষুব্ধ মুখে ক্রস্‌লি আমার দিকে ঘুরে বসলেন; তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটি কাঁপছে। বললেন, "এর প্রতিটি শব্দ সত্যি। ক্রস্‌লির আত্মা চার টুকরো হযে গিয়েছিল, আর আমি পাগল হয়ে গেলাম। আহা, রিচার্ড ও র‍্যাচেলকে আমি দোষ দেই না। তারা তো ভারী সুন্দর এক বোকা দম্পতি; আমি কখনও তাদের কোন ক্ষতি করতে চাইনি; তারা তো প্রায়ই আমাকে দেখতে এখানে আসে। যাই হোক; এখন তো আমার আত্মা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, তাই আমার সব ক্ষমতাও চলে গেছে। শুধু একটা ক্ষমতাই এখনও আছে, আর সেটা ঐ হুংকার।"

রান লিখতে আর গল্প শুনতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে কখন যে সূর্যকে ঢেকে ফে'লে সবকিছু অন্ধকার করে ফেলেছে সেটা খেয়ালই করিনি। গরম বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল; একটা বিদ্যুৎ-চমক আমাদের ঝল্‌সে দিল; কানে এল বজ্রের হুংকার।

মুহূর্তের মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। মুষলধারে বৃষ্টি নামল, খেলোয়াড়রা আশ্রয়েব জন্য ছুটাছুটি করতে লাগল, পাগলরা চিৎকার-চেঁচামেচি করতে করতে লড়াই শুরু করে দিল। যে ঢ্যাঙা যুবক একসময় "হ্যান্ট" দলের হয়ে খেলত সেই বি. সি. ব্রাউন সব পোশাক খুলে ফেলে উলঙ্গ হযে দৌড়তে লাগল। স্কোরিং বক্স-এর বাইরে দাড়িওয়ালা একটি বুড়ো মানুষ বজ্রের কাছে প্রার্থনা শুরু করে দিল: বা! বা! বা!

ক্রস্‌লির চোখ দুটো সগর্বে ঘুরতে লাগল। আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক ঐরকম হুংকার; ফলও দাঁড়ায় ঠিক ঐরকম; কিন্তু আমি ওর চাইতেও ভাল হুংকার দিতে পারি।" তারপরই হঠাৎ তিনি মুখটা নামিয়ে নিলেন; শিশুসুলভ দুঃখ ও বিরক্তি দেখা দিল তাঁর মুখে। বললেন, "হায় ঈশ্বর, সে যে আমাকে লক্ষ্য করে আবার হুংকার দেবে, হ্যাঁ, ক্রস্‌লি হুংকার দেবে। আমার মজ্জা পর্যন্ত জমিয়ে ছাড়বে।"

টিনের ছাদের উপর বৃষ্টির ফোঁটা এত জোরে পড়ছিল যে তাঁর কথা কিছুই শুনতে

পেলাম না। আবার একটা বিদ্যুতের ঝিলিক, আরও জোরে। একটা বজ্রের হুংকার। তিনি আমার কানে কানে বললেন, "এটা তো দ্বিতীয় ডিগ্রির হুংকার; কেবলমাত্র প্রথম ডিগ্রির হুংকারই মানুষকে খুন করতে পারে।"

তিনি আরও বললেন, "আঃ, আপনি বুঝতে পারছেন না?" তিনি বোকার মতো হাসলেন। "এখন তো আমিই রিচার্ড, আর ক্রস্‌লি আমাকে খুন করবে।"

উলঙ্গ লোকটি দুই হাতে দুটো ক্রিকেট স্ট্যাম্প ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে; সে এক কুৎসিত দৃশ্য। বুড়োর ওল্টানো টুপি থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে তার পিঠে, আর সে কেবলই বলছে, "বা! বা! বা!"

আমি বললাম, "সব বাজে কথা! সাহস আনুন, মনে রাখবেন যে আপনি ক্রস্‌লি; এক ডজন রিচার্ডের সঙ্গে আপনি সমানে লড়তে পারেন। একবার খেলায় আপনি হেরেছেন, কারণ রিচার্ডের ভাগ্য ভাল ছিল; কিন্তু হুংকার তো এখনও আপনার আয়ত্তেই আছে।"

আমার নিজেকেই কেমন যেন পাগল-পাগল মনে হচ্ছিল। পাগলাগারদের ডাক্তার ছুটে এসে স্কোরিং বক্সে ঢুকলেন; তাঁর ফ্লানেলের পোশাক থেকে জল ঝরছে; কিন্তু তখনও তাঁর পরনে রয়েছে প্যাড আর ব্যাটিং গ্লাভ্‌স্‌; চশমা কোথায় ছিটকে পড়ে গেছে। আমাদের চেঁচামেচি তাঁর কানে গিয়েছিল; আমার শরীর থেকে ক্রস্‌লির হাত দুটো জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে তিনি হুকুম দিলেন, "ক্রস্‌লি, এক্ষুণি তোমার ডর্মিটরিতে চলে যাও।"

ক্রস্‌লি সগর্বে বললেন, "আমি যাব না। তবে রে সাপ ও আপেলওয়ালা মানুষ!"

ডাক্তার তাঁর কোটটা চেপে ধরে তাঁকে ঠেলে বের করে দিতে চেষ্টা করল।

ক্রস্‌লিই তাঁকে এক ধাক্কায় ফেলে দিলেন, তাঁর চোখ দুটি জ্বলছে। "বেরিয়ে যাও; আমাকে একা থাকতে দাও, নইলে আমি হুংকার দিয়ে উঠব। শুনতে পাচ্ছ? আমি হুংকার দেব। তোমাদের সবাইকে মেরে ফেলব। আমার হুংকারে পাগলাগারদটাই ভেঙে পড়বে। সব ঘাস শুকিয়ে যাবে। আমি হুংকার দেব।" তীব্র ত্রাসে তাঁর মুখটা বেঁকে যেতে লাগল। দুই চোয়ালের উপর একটা করে লাল দাগ ফুটে উঠে ক্রমশ সারা মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে আমি স্কোরিং বক্স থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। হয় তো বিশ গজ মতো ছুটেছি, এমন সময় আগুনের একটা অবর্ণনীয় যন্ত্রণা আমাকে যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলল; বিস্ময়বিমূঢ় অবশ দেহে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কোনরকমে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলাম; সম্ভবত গল্পের রিচার্ডের মতোই আমার ভাগ্যটা ভাল। কিন্তু সেই বিদ্যুতের স্পর্শে ক্রস্‌লি ও ডাক্তার দু'জনই মারা গেলেন।

ক্রস্‌লির শরীরটা একেবারে পাথরের মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল, আর ডাক্তারের শরীরটা এককোণে গুড়ি মেরে পড়েছিল; দুই হাতে তার কান ঢাকা ছিল। ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারল না। কারণ বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল, আর বজ্রের হুংকার শুনে কানে আঙুল দেবার মতো লোক ডাক্তার নন।

এ গল্পের উপসংহারটি কিন্তু মোটেই সন্তোষজনক নয়। যে বন্ধুর বাড়িতে আমি উঠেছিলাম তারাই র‍্যাচেল ও রিচার্ড। ক্রস্‌লি তাদের খুব সঠিক বিবরণই দিয়েছিল। পরে যখন তাদের বললাম যে, তাদের বন্ধু সেই ডাক্তারটি যখন বজ্রাহত হন তখন চার্লস ক্রস্‌লি নামক একটি লোকও একইভাবে বজ্রাহত হয়ে মারা গেছে, তখন কিন্তু ক্রস্‌লির মৃত্যুকে তারা বেশ স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করল। রিচার্ডের দৃষ্টি উদাস; র‍্যাচেল বলল: "ক্রস্‌লি? আমার ধারণা সেই লোকটিই একজন অস্ট্রেলীয় যাদুকর বলে পরিচয় দিয়ে সেদিন চমৎকার কিছু যাদুর খেলা দেখিয়েছিল। একখানা কালো রেশমী রুমাল ছাড়া আর বিশেষ কোন যন্ত্রপাতি তার ছিল না। তার মুখটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। আহা রে! কিন্তু রিচার্ডের তাকে মোটেই ভাল লাগেনি।"

"না, লোকটা সারাক্ষণ যেভাবে তোমার দিকে তাকিয়েছিল সেটা আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারিনি," রিচার্ড বলল।

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

অবিশ্বাস্য ?

To be taken with a grain of salt—চার্লস ডিকেন্স

যে কাহিনী আমি বলতে যাচ্ছি তার ভিতর দিয়ে কোন মতবাদ উপস্থিত করা, তার বিরোধিতা করা অথবা তাকে সমর্থন করার ইচ্ছা আমার নেই। বার্লিনের পুস্তকবিক্রেতার ইতিহাস আমি জানি, স্যার ডেভিড ব্রুস্টার লিখিত জনৈক পরলোকগত রাজজ্যোতিষীর পত্নীর ঘটনাটিও ভালভাবে অনুধাবন করেছি, আর আমার বন্ধুমহলের মধ্যেই ঘটেছে এরকম অনেক ভৌতিক দর্শনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এই সর্বশেষ ঘটনাটি প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার যে এক্ষেত্রে যে মহিলাটি ভুতুড়ে দর্শনের শিকার হয়েছিলেন তিনি কোনদিক থেকেই আমার দূরতম আত্মীয়াও নন।

অনেক বছর আগে ইংলন্ডের একটি হত্যাকাণ্ড সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এরকম কত হত্যাকাণ্ডই তো ঘটে; গুরুত্বের দিক থেকে একটা হত্যাকাণ্ড আগের হত্যাকাণ্ডটিকে ছাড়িয়ে যায়; আর পারলে এই বিশেষ নরপশুটির স্মৃতিকে আমি ভুলেই যেতাম, কারণ তার মৃতদেহ এখন নিউগেট জেলের কবরেই শুয়ে আছে। ইচ্ছা করেই তার কোনরকম ব্যক্তিগত পরিচয় আমি দিচ্ছি না। হত্যাকাণ্ডটি যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয় তখন কিন্তু পরবর্তীকালে এই হত্যার অভিযোগে যে লোকটির

বিচার হয়েছিল তার উপর কোনরকম সন্দেহই পড়েনি। যেহেতু সে সময় সংবাদপত্রে তার উল্লেখমাত্র ছিল না, সেইহেতু তখনকার সংবাদপত্রে তার কোন বিবরণ প্রকাশিত হওয়া সম্ভব ছিল না। এই কথাটা কিন্তু মনে রাখা দরকার।

প্রাতরাশে বসে সকালবেলাকার খবরের কাগজ খুলতেই হত্যাকাণ্ডটির প্রথম বিবরণের উপর নজর পড়েছিল; ঘটনাটি খুবই আকর্ষণীয় হওয়ায় বিশেষ মনোযোগ সহকারে সেটি পড়লাম। তিনবার না হলেও দু'বার পড়েছিলাম। খুনটি আবিষ্কৃত হয় একটি শোবার ঘরে। সবে কাগজখানা নামিয়ে রেখেছি এমন সময় চকিতে—বিদ্যুৎচমকের মতো—বন্যার জলস্রোতের মতো—কি যে বলব বুঝতে পারছি না—সে অবস্থার বিবরণ দেবার উপযুক্ত ভাষাই খুঁজে পাচ্ছি না—যেন দেখতে পেলাম সেই শোবার ঘরটা আমার ঘরের ভিতর দিয়ে চলে গেল, অসম্ভব হলেও ঠিক যেন খরস্রোতা নদীর বুকে আঁকা একখানি ছবির মতো। ছবিটা যত দ্রুতই সরে যাক না কেন, সবকিছুই আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম; এত স্পষ্ট যে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এটাও পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে বিছানার উপর মৃতদেহটা ছিল না।

যেখানে এই অদ্ভুত অনুভূতি আমার হয়েছিল সেটাও এমন কিছু রোম্যান্টিক পরিবেশ নয়—সেন্ট জেম্স্ স্ট্রীটের মোড়ের খুব কাছে পিকাডিলির একটা বাসায়। জায়গাটা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। আমি তখন একটা আরাম-কেদারায় শুয়েছিলাম; অনুভূতিটা আমাকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে কেদারাটাও তার ফলে খানিকটা সরে গিয়েছিল। (এখানে বলা দরকার যে ক্যাস্টর-পালিশ করা মেঝেতে চেয়ার সহজেই সরে যায়।) জানালার কাছে এগিয়ে গেলাম (ঘরটা তিনতলায়, আর তাতে দুটো জানালা ছিল) নিচে পিকাডিলিতে চলমান সবকিছু দেখে চোখ দুটোকে একটু তাজা করে নিতে। হেমন্তকালের উজ্জ্বল সকাল; ঝল্‌মল্‌ রাস্তায় খুশির মেলা। জোর বাতাস বইছে। বাইরে তাকাতেই দেখলাম, একঝলক হাওয়ায় পার্কের ভিতর থেকে কিছু ঝরাপাতা উড়ে এসে একটা ঘোরানো স্তম্ভ হয়ে উঠল। স্তম্ভটা ভেঙে গেল, আর পাতাগুলোও সরে গেল; তখন দেখলাম রাস্তার ওপাশে দুটি লোক পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে চলে যাচ্ছে। একজনের পিছনে আর একজন। সামনের লোকটি মাঝে মাঝেই ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনে তাকাচ্ছে। দ্বিতীয় লোকটি বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ডান হাতটা তুলে প্রায় ত্রিশ পা দূরে থেকে তাকে অনুসরণ করছে। প্রথমতো, এরকম একটা স্থানে এধরনের অদ্ভুত ও বিপজ্জনক ভঙ্গিটাই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল; তারপর, আরও আশ্চর্য ব্যাপার যে সেদিকে কোন লোকেরই নজর পড়ছে না। লোক দুটি অন্য সব যাত্রীদের ভিতর দিয়ে এমন অনায়াসে পথ করে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে যেটা ফুটপাতে হাঁটার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না; যতদূর দেখতে পাচ্ছি, একটি যাত্রীও তাদের পথ ছেড়ে দিচ্ছে না, তাদের স্পর্শ করছে না, বা তাদের দিকে তাকাচ্ছে না। জানালার নিচ দিয়ে যাবার সময় তারা দু'জনই চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। দু'জনের মুখই এত স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে পরে যেকোন জায়গায় দেখলেই আমি তাদের চিনতে

পারব। তাদের মুখে যে উল্লেখযোগ্য কোন লক্ষণ দেখেছিলাম তা কিন্তু নয়; শুধু সামনের লোকটি অস্বাভাবিক রকমের ঝুঁকে চলেছে, আর পিছনের লোকটির মুখের রং ভেজাল মোমের মতো।

আমি অকৃতদার; খানসামা ও তার স্ত্রীকে নিয়েই আমার সংসার। চাকরি কবি একটি শাখা ব্যাংকে, আর বিভাগীয় প্রধান হিসাবে আমার কাজের চাপটা আর একটু হাল্কা হলেই আমি খুশি হতাম। আমার একটু বায়ু-পরিবর্তনে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চাকরির খাতিরে হেমন্তকালটা শহরেই আটকে গিয়েছি। আমার ঠিক কোন রোগ হয়নি, তবে ঠিক সুস্থও ছিলাম না। আমার বিখ্যাত ডাক্তারটির মতে আমি "ঈষৎ পেট-রোগা," তার উপর একঘেয়ে জীবনযাত্রার জন্যই একটা মানসিক অবসন্নতা বোধ করছিলাম। হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা যতই বেশি করে প্রকাশ পাচ্ছিল ততই জনসাধারণের মনোযোগ সেদিকে বেশি করে আকৃষ্ট হচ্ছিল; আমি কিন্তু সেই সার্বিক উত্তেজনার মধ্যেও যতদূর সম্ভব নিজেকে সে ঘটনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু এটা জানতাম যে অভিযুক্ত খুনীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাকৃত নরহত্যার রায় পাওয়া গেছে এবং বিচারের জন্য তাকে নিউগেটে চালান দেওয়া হয়েছে। আরও জানতাম যে সাধারণ অসুবিধা এবং আসামীপক্ষের প্রস্তুতির সময়ের অভাবের জন্য কেন্দ্রীয় ফৌজদারি আদালতে মামলার বিচার এক সেশনের জন্য মুলতুবি রাখা হয়েছে। মুলতুবি মামলার বিচার ঠিক কোন্ সময় নাগাদ শুরু হবে সেটাও হয়তো আমার জানা উচিত ছিল, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি সেটা জানতাম না।

আমার বসার ঘর, শোবার ঘর, সাজ-ঘর—সব একই তলায় অবস্থিত। শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে ছাড়া সাজ-ঘরে যাবার অন্য কোন পথ নেই একথা ঠিক, একসময় এই ঘরের একটা দরজা দিয়ে সিঁড়িতে যাওয়া যেত; কিন্তু বেশ কয়েক বছর হল আমার স্নানঘরে একটা নতুন আসবাব বসানোর জন্য সে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। সেই সময়ে এবং সেই একই ব্যবস্থা অনুসারে দরজাটাকে পেরেক দিয়ে এঁটে তার উপর চট লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একদিন অনেক রাতে শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে চাকরটিকে কিছু কাজের নির্দেশ দিচ্ছিলাম। আমার মুখটা ছিল সাজ-ঘরে যাবার একমাত্র দরজাটার দিকে, আর সেটা তখন বন্ধই ছিল। চাকরের পিঠটা ছিল সেই দরজার দিকে। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দেখলাম দরজাটা খুলে গেল, আর একটি লোক ভিতরে তাকিয়ে সাগ্রহে ও রহস্যজনকভাবে ইঙ্গিতে আমাকে ডাকল। পিকাডিলির রাস্তা ধরে যে দুটি লোক হেঁটে গিয়েছিল, এ তাদেরই দ্বিতীয় লোকটি যার মুখের রং ছিল ভেজাল মোমের মতো। মূর্তিটি আমাকে ইশারায় ডেকেই পিছিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। শোবার ঘরটা পেরিয়ে যেতে যতটুকু সময় লাগে ঠিক ততটুকু পরেই সাজ-ঘরের দরজাটা খুলে ভিতরে তাকালাম। আগে থেকেই আমার হাতে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি ছিল। সাজ-ঘরে কাউকে দেখতে পাব আমার মনে সেরকম কোন প্রত্যাশা ছিল না, আর কাউকে দেখতে পেলামও না।

যখন বুঝতে পারলাম যে চাকরটি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন তার দিকে ঘুরে বললাম, "ডেরিক, তুমি কি বিশ্বাস করবে যে ঠাণ্ডা মাথায় আমি যেন দেখতে পেলাম—" তার বুকের উপর হাতটা রাখতেই সে চমকে উঠে ভীষণভাবে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠল, "হ্যা প্রভু, হ্যাঁ স্যার! একটি মরা মানুষ আপনাকে ইশারায় ডাকল!"

এই জন ডেরিক বিশ বছরেরও বেশি দিন ধরে আমার কাছে চাকরি করছে; সে অত্যন্ত বিশ্বাসী ও আমার প্রতি অনুরক্ত; আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে আমি তাকে না ছোঁয়া পর্যন্ত এই মূর্তিটিকে দেখার কোন অনুভূতি তার মনে জেগেছিল; আমি ছোঁয়ামাত্রই সে এমনভাবে চমকে উঠল যে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আমি ছোঁয়ামাত্রই কোন অলৌকিকভাবে এই অনুভূতি তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

জন ডেরিককে ব্র্যাণ্ডিটা আনতে বললাম; তাকে এক ড্রাম দিলাম, নিজেও এক ড্রাম খেলাম। সেরাতের ঘটনার আগে কি ঘটেছিল সে কথা ঘুণাক্ষরেও তাকে কিছু বললাম না; ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসে আমার নিশ্চিত ধারণা হল যে পিকাডিলিতে একবার ছাড়া সে মুখ আমি আগে কখনও দেখিনি। দরজা থেকে ইশারায় আমাকে ডাকার সময় তার মুখের চেহারার সঙ্গে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় আমার দিকে তাকানোর সময়কার মুখের চেহারার সঙ্গে তুলনা করে আমার মনে হল যে প্রথম দর্শনেই সে আমার স্মৃতির উপর দাগ কেটেছে, আর দ্বিতীয়বার দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে যাতে তাকে মনে পড়ে যায় সে ব্যবস্থাও সে পাকা করে ফেলেছে।

কেন জানি না আমার বিশ্বাস হয়েছিল, মূর্তিটা আর ফিরে আসবে না, তবু রাতটা অস্বস্তিতেই কাটল। দিনের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই আমি গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম; সে ঘুম ভাঙাল জন ডেরিক নিজে এসে; তার হাতে একখানা কাগজ।

মনে হল, সেই কাগজখানা নিয়ে দরজার কাছে পত্রবাহক ও আমার চাকরের মধ্যে কিছুটা বাদানুবাদ হয়েছে। ওল্ড বেইলিতে কেন্দ্রীয় ফৌজদারি আদালতে আসন্ন অধিবেশনে আমি যাতে জুরি হিসাবে উপস্থিত থাকি, কাগজখানা তারই সমন। আগে কখনও জুরি হবার ডাক আমি পাইনি, আর জন ডেরিক সেটা ভালই জানে। কারণেই হোক আর অকারণেই হোক, তার বিশ্বাস এধরনের জুরিতে সাধারণত যাদের ডাকা হয় তারা গুণের দিক থেকে আমার চাইতে নিম্নশ্রেণীর মানুষ, তাই প্রথমে সে সমনটা নিতে অস্বীকার করেছিল। যে লোক সমন জারি করতে এসেছিল, সে ব্যাপারটাকে শান্তভাবেই নিয়েছিল। বলেছিল, আমার জুরিতে উপস্থিত থাকা বা না থাকায় তার কিছু যায় আসে না; সমনটা রইল; সেটা নিয়ে আমি কি করব সে ঝুঁকি আমার, তার নয়।

সে ডাকে সাড়া দেব না অগ্রাহ্য করব, দু'-একদিন সেটা স্থির করতে পারলাম না। এ নিয়ে আমার মনে বিশেষ কোন আকর্ষণ-বিকর্ষণ ছিল না। যাই হোক, জীবনযাত্রার একঘেয়েমি ভাবটা কাটাবার জন্যই শেষ পর্যন্ত জুরিতে যাওয়াই স্থির করলাম।

নির্দিষ্ট সকালবেলাটা নভেম্বর মাসের একটা অতি বাজে সকাল; পিকাডিলি জুড়ে

ঘন বাদামী কুয়াশা নেমেছে; টেম্পল বারের পুবদিকটা ঘন কালো হয়ে চেপে বসেছে। আদালত-গৃহের বারান্দা ও সিঁড়ি গ্যাসের আলোয় স্বল্পালোকিত; আদালত-কক্ষেরও সেই একই অবস্থা। আমার ধারণা, অফিসাররা যখন আমাকে নিয়ে ওল্ড কোর্টে পৌঁছে দিল এবং সেখানকার ভিড়টা নিজের চোখে দেখলাম, তার আগে আমি জানতামই না যে সেই দিনই খুনীর বিচার হবে। যথেষ্ট কষ্ট করে আমাকে যখন ওল্ড কোর্টে নিয়ে হাজির করা হল তার আগে আমি জানতাম না আমার হাতের সামনে দুটো আদালতের কোনটাতে আমাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার এই কথাগুলিকে একেবারে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া ঠিক হবে না, কারণ এ ব্যাপারে আমি নিজেই খুব নিশ্চিত নই। অপেক্ষমাণ জুরিদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় আসন গ্রহণ করলাম এবং কুয়াশার মেঘ ও ভারী বাতাসের ভিতর দিয়ে যতটা ভালভাবে সম্ভব আদালতের চারদিকটা তাকিয়ে দেখলাম। বড় বড় জানালার বাইরে কালো বাষ্প অন্ধকার পর্দার মতো ঝুলছে; রাজপথে ছড়ানো খড ও কাঠের টুকরোর উপর দিয়ে চাকার চাপা শব্দ ভেসে আসছে; সমবেত লোকের গুঞ্জন-ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে তার বুক চিরে ভেসে আসছে একটা তীক্ষ্ণ শিস বা উচ্চকণ্ঠ ডাকাডাকির শব্দ। কিছুক্ষণ পরে দু'জন জজ এসে তাদের আসনে বসলেন। আদালতের গুনগুনানি হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল। খুনীকে কাঠগডায় নিয়ে আসার হুকুম হল। সে হাজির হল। আর ঠিক সেইমুহূর্তেই আমি তাকে চিনতে পারলাম...যে দুটি লোক পিকাডিলির রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়েছিল তাদেরই প্রথম জন।

তখনই যদি আমার নামটা ডাকা হত, তাহলে আমার জবাবটা শোনা যেত কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু আমায় ডাকা হল তালিকার ষষ্ঠ বা অষ্টম জুরি হিসাবে, আর ততক্ষণে আমি কোনরকমে জবাব দিতে পারলাম, "এখানে!" তারপর শুনুন। আমি কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে যেতেই বন্দী হঠাৎ খুব উত্তেজিত হয়ে ইশারায় তার এটর্নিকে ডাকল: আমার কাজে বাধা দিতে বন্দীর ইচ্ছাটা এতই স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পেল যে কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ থাকল; সেই সময়টা এটর্নি কাঠগড়ায় হাত রেখে তার মক্কেলের সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলতে বলতে মাথা নাড়তে লাগল। পরে সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকেই জেনেছিলাম, বন্দী প্রথমেই সভয়ে তাকে বলেছিল, 'যেকোন ঝুঁকি নিয়ে এই লোকটিকে বাধা দিন!' কিন্তু যেহেতু তার বক্তব্যের সপক্ষে সে কোন যুক্তি দেখায়নি, এবং নিজেই স্বীকার করেছে যে আমার নাম শোনার আগে সে কোনদিন আমার নামটাও জানত না, তাই তার কথামতো কাজ করা হয়নি।

আমাকেই জুরির মুখপাত্র নির্বাচিত করা হল। বিচারের দ্বিতীয় দিন দু'ঘণ্টা ধরে সাক্ষ্য গ্রহণের পরে (গির্জার ঘড়ির শব্দ আমি শুনেছিলাম) সহযোগী জুরিদের দিকে চোখ পড়তেই তাদের সংখ্যা গুণতে গিয়ে আমি একটা দুর্বোধ্য অসুবিধায় পড়ে গেলাম। পরপর কয়েকবার গুণলাম, কিন্তু একই অসুবিধা দেখা দিতে লাগল। এককথায়, প্রত্যেকবারই একজন বেশি হয়ে যাচ্ছে।

আমার ঠিক পাশে যে জুরিটি বসেছিলেন তাঁকে ছুঁয়ে কানে কানে বললাম, "আমরা ক'জন আছি দয়া করে গুণে দেখুন না।" আমার অনুরোধ শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন, কিন্তু মাথা ঘুরিয়ে গুণতে লাগলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "কেন আমরা তো তেরো—কিন্তু না, তা তো হতে পারে না। আমরা বারোজন।" সেদিন আমার গণনা অনুসারেও একজন একজন করে ঠিকই গুণেছি, কিন্তু একসঙ্গে গুণতে গেলেই একজন বেশি হতে লাগল। অথচ তার কোন হিসাব বা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে এমন একটি মূর্তি ক্রমে গড়ে উঠেছে যে সেটা প্রতিবারেই এসে হাজির হতে লাগল।

জুরিদের বাসা দেওয়া হয়েছিল লন্ডন ট্যাভার্নে। একটা বড় ঘরে আলাদা আলাদা টেবিলে আমরা সকলেই ঘুমিয়েছি; আমাদের নিরাপদে রাখার জন্য একজন অফিসার সব সময় আমাদের উপর নজর রাখতেন। অফিসারটির আসল নাম চেপে বাখার কোন কারণ আমি দেখি না। তিনি বুদ্ধিমান, অত্যন্ত বিনয়ী, সেবাপরায়ণ, এবং (শুনে খুশি হয়েছি) শহরের একজন শ্রদ্ধেয় মানুষ। তাঁর উপস্থিতি সব সময়ই স্বাগত, সুন্দর দুটি চোখ, ঈর্ষা করার মতো কালো গোঁফ, আর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। নাম মিঃ হার্কার।

রাত হলে আমরা যখন বারোটায় বিছানায় শুতে গেলাম, তখন মিঃ হার্কারের বিছানাটা পাতা হল দরজা বরাবর। দ্বিতীয় দিন রাতে শুতে যাবার ইচ্ছা না হওয়ায় এবং মিঃ হার্কারকে তাঁর বিছানায় বসে থাকতে দেখে আমি গিয়ে তাঁর পাশে বসলাম, নস্যের ডিবেটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। আমার ডিবে থেকে এক টিপ নস্য নেবাব সময় মিঃ হার্কারের হাতটা আমার হাতকে স্পর্শ করল; ঠিক তখনই তিনি যেন একটু শিউরে উঠলেন; বললেন, "ও কে?"

মিঃ হার্কারের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে ঘরের মধ্যে তাকাতেই আবার সেই প্রত্যাশিত মূর্তিটাকে দেখতে পেলাম—পিকাডিলির রাস্তা ধরে যারা হেঁটে গিয়েছিল তাদেবই দ্বিতীয়জন। উঠে কয়েক পা এগিয়ে গেলাম; তারপর থেমে মিঃ হার্কারের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। তিনি কিন্তু সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে হাসতে হাসতে বললেন, "মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল যে বিছানা না থাকলেও একজন ত্রয়োদশ জুরি এখানে ছিলেন; কিন্তু এখন দেখছি সেটা চাঁদের আলো।"

মিঃ হার্কারকে কোন কথা না বলে তাঁকে আমার সঙ্গে ঘরের শেষপ্রান্তে হেঁটে যেতে অনুরোধ করলাম; মূর্তিটি কি করে দেখার ইচ্ছা হল। আমার এগারোজন সহযোগী জুরির বিছানার পাশে বালিশটাকে ঘেঁষে সে কয়েক মিনিট করে দাঁড়াল। প্রতিবারই বিছানার ডানদিক ধরে গেল এবং পরবর্তী বিছানাটার পায়ের দিক দিয়ে সেটাকে পার হতে লাগল। মাথার ভঙ্গি দেখে মনে হল, প্রতিটি শায়িত মূর্তির দিকে সে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আমার বিছানাটা ছিল মিঃ হার্কারের বিছানার সবচাইতে কাছে: সে কিন্তু আমার দিকে বা আমার বিছানার দিকে দৃষ্টিই দিল না। একটা

উঁচু জানালা দিয়ে যেখানে চাঁদের আলো এসে পড়েছে সেখান দিয়ে সে বেরিয়ে গেল ; মনে হল যেন বাতাসের সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের সময় মনে হল, আমি ও মিঃ হার্কার ছাড়া উপস্থিত অন্য সকলেই গত রাতে নিহত লোকটিকেই স্বপ্নে দেখেছে।

এখন আমারও দৃঢ় ধারণা হল যে পিকাডিলি ধরে যাওয়া দ্বিতীয় লোকটিই খুন হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘটনাও একদিন ঘটল, আর এমনভাবে ঘটল যার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

বিচারের পঞ্চম দিনে সরকার পক্ষেব সওয়াল শেষ হবার মুখে নিহত লোকটির একটি ছোট 'ছবি' প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা হল। খুনের খবর জানার পর লোকটি তার শোবার ঘর থেকে উধাও হয়ে যায় এবং খুনীকে যেখানে মাটি খুঁড়তে দেখা যায় সেখানকার একটা গুপ্ত স্থানে মৃতদেহ পাওয়া যায়। সাক্ষী ছবিটাকে সনাক্ত করার পরে সেটাকে আদালতের হাতে তুলে দেওযা হল এবং সেখান থেকে জুরিদের কাছে পাঠিয়ে দেওযা হল। কালো গাউন-পরা অফিসারটি যখন সেটিকে নিয়ে আমার দিকে আসছিল তখন পিকাডিলির রাস্তার দ্বিতীয লোকটির মূর্তিটি ভিড়ের ভিতর থেকে উঠে এসে অফিসারের হাত থেকে ছবিটা তুলে নিয়ে নিজের হাতে সেটা আমার হাতে দিল, আব সেই সঙ্গে নিচু ফাঁকা গলায় বলল,—ছবিটা তখনও আমি দেখিনি, কারণ সেটা ছিল একটা লকেটের মধ্যে—'তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম, আমার মুখটা তখন এত রক্তশূন্য ছিল না।' আমার পরবর্তী যে জুরিকে আমার ছবিটা দেবাব কথা, মূর্তিটি তখন আমার ও তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর সেই জুরি ও পরবর্তী জুড়ির মাঝখানে গেল ; এইভাবে সে ছবিটা আমাদের সকলের হাত ঘুরিযে আবার আমাকে এনে দিল। অবশ্য তারা কেউই এই ব্যাপারটা ধরতে পারল না।

টেবিলে ফিরে এসে, এবং সাধারণত আমরা সকলে যখন বন্ধ ঘরে মিঃ হার্কারের হেপাজতে এসে জমায়েত হতাম, তখন প্রথম থেকেই মামলার দৈনন্দিন বিবরণ নিয়ে প্রচুর আলোচনা করতাম। পঞ্চম দিনে সরকার পক্ষের সওয়াল শেষ হয়ে যাওয়ায় ঘটনার একটা মোটামুটি চেহারা আমাদের সামনে পরিষ্কার হযে উঠল এবং আমাদের আলোচনা বেশ উত্তেজনাপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। আমাদের মধ্যে একজন গির্জার লোক ছিলেন—তাঁর মতো আকাট বোকা আমি আর দেখিনি, অতি পরিষ্কার সব প্রমাণ সম্পর্কেও তিনি অদ্ভুত সব আপত্তি তুলতেন, তাঁর সমর্থক ছিলেন আরও দু'জন সাকরেদ পাদরী ; একই জেলা থেকে আহূত এই তিন মূর্তি সারাক্ষণ এমন হৈ-চৈ করতেন যে পাঁচশ খুনের দায়ে তাঁদের বিচার হওয়া উচিত। এই তিন অপদার্থ নির্বোধ যখন মাঝরাত নাগাদ গলা একেবারে সপ্তমে চড়ালেন, এবং আমাদের কেউ কেউ বিছানা পাততে শুরু করলেন, তখন আবার আমি সেই নিহত লোকটিকে দেখতে পেলাম। কঠোর মুখে তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে সে আমাকে ইশারায় ডাকল। তাদের কাছে গিয়ে আলোচনায় যোগ দিতেই সে সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন থেকেই সেই লম্বা ঘরটায় বার বার তার আবির্ভাব ঘটতে লাগল। সহযোগী জুরিরা যখনই তাদের মাথাগুলি একত্র করে আলোচনায় মেতে ওঠে তখনই তাদের মাঝখানে আমি দেখতে পাই নিহত লোকটির মাথা।.যখনই তাদের মতামত তার বিপক্ষে যায়, তখনই সে গম্ভীরভাবে আমাকে ইশারায় ডাকে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে বিচারের পঞ্চম দিনে ছোট ছবিটা হাজির করার আগে পর্যন্ত সেই মূর্তিটিকে কখনও আদালতে দেখতে পাইনি। আসামীপক্ষের সওয়াল আরম্ভ হতেই তিনটি পরিবর্তন দেখা দিল। প্রথমে তার দুটিকে একসঙ্গে উল্লেখ করব। মূর্তিটি এখন অনবরত আদালতেই দেখা দিচ্ছে, আর সেখানে আমাকে কিছু না বলে যখন যিনি সওয়াল করেন তাঁকে লক্ষ্য করেই কথা বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ: নিহত লোকটির গলাটা সরাসরি কেটে ফেলা হয়েছিল। বক্তৃতার গোড়াতেই বলা হল যে নিহত লোকটি নিজেই তার গলাটা কেটে থাকতে পারে। সেই মুহূর্তেই মূর্তিটি সেইরকম গলা-কাটা (এটা সে আগে লুকিয়ে রেখেছিল) বক্তার হাতের কাছে দাঁড়িয়ে একবার ডান হাতে, একবার বাঁ হাতে শ্বাসনালীটার এ-পাশ ও-পাশ দেখিয়ে বক্তাকেই বোঝাতে চেষ্টা করল যে এরকম একটা ক্ষত কোন হাত দিয়েই নিজে নিজে সৃষ্টি করা অসম্ভব। আরও একটা দৃষ্টান্ত: জনৈকা সাক্ষী যখন বলল যে বন্দীর মতো ভাল মানুষ হয় না, তখন মূর্তিটি সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে একটা হাত ও একটা আঙুল বাড়িয়ে বন্দীর কুৎসিত মুখটাকে দেখিয়ে দিল।

তৃতীয় পরিবর্তনটিই আমার কাছে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। আমি কোন মতবাদ তৈরি করতে চাই না; শুধু সঠিক বিবরণ দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি। যদিও মূর্তিটা যাদের লক্ষ্য করে ইঙ্গিতে কিছু বলে তারা কেউই তাকে দেখতে পায় না, তবু সে যখন তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় তখন তাদের মধ্যে একটা বিচলিতভাব ও ত্রাস দেখা দেয়। আমার মনে হয়, আমার অজ্ঞাত কোন নিয়মের বশেই মূর্তিটি অপরের কাছে পুরোপুরি আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, অথচ স্বয়ং অদৃশ্য থেকে সে নীরবে তাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আসামীপক্ষের সুদক্ষ কৌঁসুলি যখন আত্মহত্যার সম্ভাবনার কথা তুললেন এবং মূর্তিটি বিজ্ঞ ভদ্রলোকের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভয়ংকরভাবে করাত চালানোর ভঙ্গিতে নিজের কাটা গলাটা দেখাল, একথা অস্বীকার করা যাবে না যে তখন কৌঁসুলি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন, কয়েক সেকেন্ডের জন্য সুকৌশল আলোচনার সূত্র হারিয়ে ফেললেন, রুমাল দিয়ে কপাল মুছলেন, এবং অত্যন্ত বিবর্ণ হয়ে গেলেন। আরও দুটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে, বিচারের অষ্টম দিনে দুপুরের পরে কয়েক মিনিট বিশ্রাম ও জলযোগের বিরতির পরে জজদের আসার একটু আগেই অন্য জুরিদের নিয়ে আমি আদালতে ফিরে এলাম। চারদিকে তাকিয়ে মনে হল মূর্তিটি সেখানে নেই; কিন্তু গ্যালারির দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম একটি সুদর্শনা নারীর গায়ে ভর দিয়ে সে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সে নিশ্চিত জানতে চাইছে জজরা তাঁদের আসন গ্রহণ করেছেন কি

না। সঙ্গে সঙ্গেই মহিলাটি আর্তনাদ করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন; তাঁকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। যে শ্রদ্ধেয়, প্রাজ্ঞ ও ধৈর্যশীল জজসাহেব বিচার পরিচালনা করছিলেন তাঁর বেলায়ও তাই ঘটল। বিচার শেষ হয়ে গেলে তিনি কাগজপত্র নিয়ে স্থির হয়ে বসেছেন এমন সময় নিহত লোকটি জজের দরজা দিয়ে ঢুকে লর্ডশিপের ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল, সামনের কাগজে তিনি কি লিখছেন সেটা দেখার জন্য সাগ্রহে তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকাল। লর্ডশিপের মুখটা কেমন যেন বদলে গেল; তার হাত থেমে গেল; একটা অদ্ভুত শিহরন খেলে গেল তাঁর দেহে; সে শিহরন আমি ভাল করেই চিনি; কাঁপা গলায় তিনি বললেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, কয়েক মুহূর্তের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। এখানকার দূষিত বাতাসে আমার কষ্ট হচ্ছে।" এক গ্লাস জল না খাওয়া পর্যন্ত তিনি সুস্থ হলেন না।

সেই অন্তহীন দশদিনের ছ'টি দিনের একঘেয়েমির মধ্যে—আদালতে সেই একই বিচারক ও অন্য লোকজন, কাঠগড়ায় সেই একই খুনী, টেবিলে সেই একই উকিলের দল, আদালতের ছাদ-ফাটানো সেই একই প্রশ্নোত্তর, জজদের কলমের সেই একই খস্ খস্ আওয়াজ, একই লোকজনের আসা-যাওয়া, দিনের আলো থাকা সত্ত্বেও একই সময়ে সেই একই আলো জ্বালানো, কুয়াশা পড়লে বড় বড় জানালার বাইরে সেই একই কুয়াশার পর্দা, বৃষ্টি হলে সেই একই ঝিরঝির শব্দ, একই করাতের গুঁড়োর উপর দিনের পর দিন সেই একই তালা খোলার লোক ও বন্দীর পায়ের দাগ, একই ভারী দরজায় সেই একই চাবি লাগানো ও খোলা—সেই ক্লান্তিকর একঘেয়েমির মধ্যে আমার মনে হতে লাগল আমি যেন অনেককাল ধরে জুরিদের মুখপাত্র হয়ে আছি, পিকাডিলি যেন ব্যাবিলনের সমসাময়িক হয়ে জেগে উঠেছে, আমার চোখে নিহত লোকটির স্পষ্টতা এতটুকু কমেনি বা কোন সময়ই তাকে অন্য সকলের চাইতে কম স্পষ্ট মনে হয়নি। বস্তুত একটা কথা না বললে চলে না: যে মূর্তিটিকে আমি নিহত লোক বলছি সে কিন্তু একটি বারও খুনীর দিকে তাকাচ্ছে না। বারবার অবাক হয়ে ভেবেছি "কেন সে তাকাচ্ছে না?" কিন্তু কখনও সে তাকায়নি।

ছোট ছবিটি উপস্থাপিত হবার পর থেকে বিচার শেষ হবার শেষ কয়েকটি মিনিট আগে পর্যন্ত সে কিন্তু আমার দিকেও তাকায়নি। রাত দশটা বাজতে সাত মিনিট আগে আলোচনা করার জন্য আমরা সকলে একত্রে বসলাম। কিন্তু গির্জার সেই বোকা লোকটি ও তাঁর দুই সমগোত্রীয় অনুরাগী এমন অসুবিধার সৃষ্টি করতে লাগলেন যে জজসাহেবের মন্তব্য নতুন করে পড়িয়ে শোনাবার জন্য দু'বার আমাদের আদালতে যেতে হল। আমাদের মধ্যে ন'জনের সে মন্তব্য সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না; আমার বিশ্বাস, আদালতের কারও ছিল না; কিন্তু সেই মাথা মোটা ত্রিমূর্তির বাধা দেওয়া ছাড়া অন্য কাজ না থাকায় অকারণেই বারবার আপত্তি তুলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের মতই বজায় রইল, এবং বারোটা বেজে দশ মিনিটের সময় জুরি আদালতে ফিরে গেল।

নিহত লোকটি তখন আদালতের অন্যদিকে জুরিদের আসনের ঠিক বিপরীতে

দাঁড়িয়েছিল। আমি আসনে বসলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তাকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হল; এই প্রথম সে হাতের উপরে একখানি বড় মাপের ধূসর অবগুণ্ঠন নিয়ে এসেছিল; ধীরে ধীরে সেটা দিয়ে সে নিজের মাথা ও সারা শরীর ঢেকে দিল। আমি যখন রায় ঘোষণা করে বললাম, "দোষী" তখন সেই অবগুণ্ঠনটা খসে পড়ল; সব উধাও; তার জায়গাটা ফাঁকা।

প্রথা অনুসারে জজসাহেব যখন খুনীকে জিজ্ঞাসা করলেন মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে তার কিছু বলার আছে কি না, তখন সে বিড়বিড় করে যা বলল, পরদিন প্রধান সংবাদপত্রগুলিতে তার বর্ণনা দিয়ে বলা হল কয়েকটি কাটাকাটা অসংলগ্ন প্রায় অস্পষ্ট শব্দ যাতে সে অভিযোগ করেছে যে তার প্রতি সুবিচার করা হয়নি কারণ জুরিদের মুখপাত্রটি আগে থেকেই তার প্রতি বিরূপ ছিলেন। যে উল্লেখযোগ্য কথাগুলি সে বলেছিল আসলে সেটা এই:

মাই লর্ড, জুরিদের মুখপাত্র মহাশয় যখন তাঁর আসনে বসলেন আমি তখনই জানতাম আমার মৃত্যু অনিবার্য। মাই লর্ড, আমি জানতাম তিনি আমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না, কারণ আমাকে বন্দী করার আগেই তিনি যেভাবেই হোক রাতে আমার বিছানার পাশে এসে আমার ঘুম ভাঙিয়েছিলেন এবং আমার গলায় একটা দড়ি পরিয়ে দিয়েছিলেন।

অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত

তিন বোন

The three Sisters—উইলিয়াম ওয়াইমার্ক জ্যাকবস্

ত্রিশ বছর আগে হেমন্তের এক স্যাঁৎসেঁতে সন্ধ্যায় "ম্যালেটস্ লজ"-এর বাসিন্দারা বড় বোন উর্সুলা ম্যালো-র মৃত্যুশয্যার পাশে জড়ো হয়েছিল। বাড়িটাতে তিন বোনই বাস করত। সেকেলে কাঠের পালংকের পোকায় কাটা মশারিটা তোলা ছিল; ধূমায়মান তেলের বাতির আলো পড়েছিল মৃত্যুপথযাত্রিনীর আশাহীন মুখের উপর। দুটি বোবা চোখ মেলে সে বোনদের দিকে তাকাল। ঘরটা নিস্তব্ধ; মাঝে মাঝে ছোট বোন ইউনিচের ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাইরে বিস্তীর্ণ জলাভূমির উপর অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে।

"কিছুই যেন বদলানো না হয় তবিথা," উর্সুলা হাঁপাতে হাঁপাতে অপর বোনটিকে বলল। মুখের ভাব নিরাসক্ত ও কঠিন হলেও সে-বোনের সঙ্গে বড় বোনের খুব মিল। "এই ঘরটা যেন তালাবন্ধ করে রাখা হয়; কখনও খোলা না হয়।"

"খুব ভাল কথা," তবিথা শক্ত গলায় বলল: "যদিও তাতে তোমার যে কি যায় আসে তা তো বুঝতে পারছি না।"

বিস্ময়কর জোরের সঙ্গে তার দিদি বলে উঠল, "সত্যি যায়-আসে! আমি যে মাঝে মাঝে এখানে আসব না তা তুমি কি করে জানলে? এই বাড়িতে আমি এত বেশিদিন বাস করেছি যে আমি এ বাড়ি আবার দেখতে আসবই। আমি অবশ্য ফিরে আসব। ফিরে আসব তোমাদের দু'জনকে দেখতে—যাতে তোমাদের কোন ক্ষতি না হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে।"

তার ভালর জন্য দিদির এই আগ্রহ দেখে কোনরকম বিচলিত না হয়ে তবিথা বলল, "তুমি অসংযত কথা বলছ। তোমার মন যেন কোথায় ভেসে বেড়াচ্ছে; তুমি তো জানো ওসবে আমার বিশ্বাস নেই।"

উর্সুলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল; ইউনিচ নীরবে খাটের পাশে বসে কাঁদছিল; ইশারায় তাকে কাছে ডেকে দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে বোনকে চুমো খেল।

দুর্বল গলায় বলল, "কেঁদো না লক্ষ্মীটি, হয় তো এ ভালই হল। নিঃসঙ্গ নারীর বেঁচে থেকে কি লাভ! আমাদের কোন আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই; অন্য নারীদের থাকে স্বামী-সন্তানের সুখের সংসার; কিন্তু এই ভুলে-যাওয়া বাড়িতে আমরা তিনজন বড় হয়েছি। আমি আগে চললাম; তোমরাও অচিরেই আসবে।"

নিজের চল্লিশ বছর বয়স ও লৌহকঠিন দেহের কথা স্মরণ করে তবিথা কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বিকৃত হাসি হাসল।

উর্সুলার চোখের ভারী পাতা দুটি ধীরে ধীরে বুঁজে এল; নতুন এক বিচিত্র স্বরে সে আবার বলল, "আমি চললাম প্রথম; কিন্তু তোমাদের জীবনের মেয়াদ যখন ফুরিয়ে যাবে তখন পর পর তোমাদের দু'জনের জন্যই আমি আবার আসব। সেই মুহূর্তে আমি তোমাদের সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব যেখানে আমি চলে যাচ্ছি।"

তার কথার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত দীপশিখাটি হঠাৎ এমনভাবে নিভে গেল যেন কেউ দ্রুতহাতে সেটাকে নিভিয়ে দিল; ঘরটা অন্ধকারে ভরে গেল। বিছানা থেকে একটা অদ্ভুত দম-বন্ধকরা শব্দ এল; দুই বোন যখন কাঁপতে কাঁপতে বাতিটা আবার জ্বালাল তখন উর্সুলা ম্যালোর দেহ কবরে যাবার জন্যই প্রস্তুত।

সে রাতে দুই জীবিত বোন একসঙ্গেই কাটাল। যে ছায়াচ্ছন্ন সীমান্তদেশ জীবিত ও মৃতের মধ্যে একটা অপবিত্র সংযোগ রক্ষা করে বলে অনেকের ধারণা, মৃত নারীটি ছিল সে দেশের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী; এমনকি মূর্খ তবিথা গত রাতের ঘটনায় যৎসামান্য বিচলিত হলেও এধরনের একটা আশংকা থেকে সেও সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না যে তাদের দিদির বিশ্বাসই হয় তো ঠিক।

ভোরের উজ্জ্বল আলোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সব ভয় দূর হয়ে গেল। সূর্য জানালা

দিয়ে লুকিয়ে ঘরে ঢুকল ; বালিশের উপর অসহায় জীর্ণ মুখখানিকে দেখে এমনভাবে তাকে স্পর্শ করল, উদ্ভাসিত করে তুলল যে সেদিকে তাকিয়ে দুই বোনই অবাক হয়ে গেল যে এমন একখানি শান্তশিষ্ট মুখ দেখে কেমন করে তারা ভয় পেয়েছিল। দুই-একদিন কেটে গেল। গ্রাম্য ছুতোরের কারখানা থেকে তৈরি করা সবচাইতে সূক্ষ্ম নক্সা-কাটা একটা শক্ত শবাধারে তার দেহটাকে স্থানান্তরিত করা হল। তারপর চারজন বাহকসহ একটি ধীর, বিষণ্ণ শোকযাত্রা গম্ভীরভাবে জলাভূমি পার হয়ে শবাধারটিকে নিয়ে পুরনো ধূসর গির্জার পারিবারিক ভূগর্ভ-কক্ষে গিয়ে হাজির হল, এবং প্রায় ত্রিশ বছর আগে ঐ একই পথ ধরে এসে তার বাবা ও মা যেখানে শেষ শয্যা পেতেছিল, তার পাশেই উর্সুলার মরদেহকেও শুইয়ে দেওয়া হল।

ধীর পদক্ষেপে বাড়ি ফেরার পথে ইউনিচের কাছে দিনটা কেমন যেন অদ্ভুত ছুটি-ছুটি মনে হতে লাগল ; বিস্তীর্ণ জলাভূমিটাকে মনে হল আরও বন্য ও পরিত্যক্ত ; সমুদ্রের গর্জন যেন আরও বেশি বিষাদময়। তবিথার কিন্তু সেরকম কিছুই মনে হল না। মৃতা নারীর সম্পত্তির বেশির ভাগ সে দিয়ে গেছে ইউনিচকে ; তাই তার লোভী মন অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে ; মৃতার জন্য বোনের উপযুক্ত শোকের অনুভূতি তার মনে জাগেনি।

চুপচাপ চা খেতে খেতে সে শুধাল, "এত টাকা দিয়ে তুমি কি করবে ইউনিচ ?"

ইউনিচ ধীরে ধীরে বলল, "যেমন আছে তেমনই থাকবে। আমাদের দু'জনেরই তো বেঁচে থাকবার মতো যথেষ্ট সংস্থান আছে ; তাই কোন শিশু হাসপাতালে কয়েকটা শয্যা চালাবার জন্য এই সম্পত্তির আয়টা দিয়ে দেব।"

তবিথা গম্ভীর গলায় বলল, "টাকাটা হাসপাতালে দেবার ইচ্ছা যদি উর্সুলার থাকত তাহলে তো সে নিজেই দিয়ে যেত ; তুমি তার ইচ্ছামতো কাজ করছ না দেখে আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

"তাহলে টাকাটা দিয়ে আমি আর কি করতে পারি ?" ইউনিচ শুধাল।

চকচকে চোখে অন্য দিদি বলল, "জমাও, টাকাটা জমাও।"

ইউনিচ মাথা নাড়ল।

বলল, "না, অসুস্থ ছেলেমেয়েদের জন্যই ওটা ব্যয় হবে ; তবে মূল টাকাটায় আমি হাত দেব না, আর আমি যদি তোমার আগে মরি তো সে টাকাটা তুমিই পাবে, যেমন ইচ্ছা খরচ করতেও পারবে।"

অনেক চেষ্টায় রাগ দমন করে তবিথা বলল, "খুব ভাল ; টাকাটা তুমি এমনভাবে খরচ করবে সেটা উর্সুলার ইচ্ছা ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি না ; আর যে টাকা এত সযত্নে সঞ্চয় করেছিল সেটা তুমি এভাবে উড়িয়ে দিলে সে যে কবরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকবে তাও আমি বিশ্বাস করি না।"

ম্লান ঠোঁট খুলে ইউনিচ বলল, "তুমি কি বলতে চাও ? তুমি আমাকে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছ ; আমার ধারণা ছিল তুমি এসব জিনিসে বিশ্বাস করো না।"

তবিথা জবাব দিল না ; বোনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে এড়াবার জন্য চেয়ারটাকে অগ্নিকুণ্ডের কাছে টেনে নিল ; দুই হাত ভাঁজ করে একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য তৈরি হল।

পুরনো বাড়িটার জীবনযাত্রা কিছুদিন বেশ শান্তভাবেই চলতে লাগল। মৃতার ইচ্ছানুসারে তার ঘরটা বেশ ভাল করে তালাবন্ধ করে রাখা হল ; অন্য সব পরিচ্ছন্ন জানালাগুলোর পাশে এ ঘরের নোংরা জানালাগুলো বড়ই বিসদৃশ দেখতে হল। তবিথা কোনদিন বেশি কথা বলত না ; এখন যেন আরও স্বল্পবাক হয়ে পড়ল ; গোটা বাড়ি ও অবহেলিত বাগানটার মধ্যে সে অশান্ত আত্মার মতো ঘুরে বেড়ায় ; কপালের গভীর রেখাগুলো দেখে মনে হয় অনেক চিন্তার ঝড় বইছে তার মনে। অন্ধকার দীর্ঘ সন্ধ্যা নিয়ে শীত এল ; পুরনো বাড়িটা আগের চাইতেও নির্জন হয়ে উঠল ; রহস্য ও আতংকের একটা হাওয়া যেন বাড়িটার উপরে ছড়িয়ে আছে ; তার শূন্য ঘর ও অন্ধকার বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সব বিচিত্র শব্দে বাড়িটার গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে যাকে বাতাস বা ইঁদুর দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না ; অনেক দূরের রান্নাঘরে বসে মার্থা বুড়ি সিঁড়িতে নানারকম অদ্ভুত শব্দ শুনতে পায় ; একদিন তো শব্দ শুনে ছুটে গিয়ে তার মনে হল একটা কালো মূর্তি সিঁড়ির উপর বসে আছে ; অবশ্য পরে মোমবাতি ও চশমা নিয়ে গিয়ে সে কিছুই দেখতে পায়নি। ইউনিচ হৃদ্‌যন্ত্রের রোগে ভোগে ; শরীরও দুর্বল ; সেও কয়েকটা অস্পষ্ট ঘটনার সাক্ষী ; এমনকি তবিথাও বাড়িটার এই বিচিত্র পরিবেশের কথা স্বীকার করে ; যদিও অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় এদিকে বিশেষ নজরই দেয় না।

দিদির মৃত্যুর পর থেকে তার চলাফেরার উপর কোনরকম বিধি-নিষেধই নেই। লোভের বশীভূত হয়ে সে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-কানুন মেনে চলে। তার ও ইউনিচের সাংসারিক খরচ কঠোরভাবে আলাদা করা হয়েছে ; সে অত্যন্ত সাধারণ খাবার খায়, আর পোশাকের ব্যাপারেও বাড়ির বুড়ো চাকরটি তার তুলনায় সুসজ্জিত। শোবার ঘরে একলা বসে এই কুৎসিত, কঠিন দর্শন জীবটি নিজের টাকাপয়সার মধ্যেই ডুবে থাকে ; একটা পোড়া মোমবাতিও জ্বালায় না। এই অর্থগৃধ্নুতা তাকে এতই বদলে ফেলেছে যে ইউনিচ ও মার্থা দু'জনই তাকে ভয় করে ; রাতের পর রাত বিছানায় জেগে থেকে তার টাকা গোণার টুং-টাং শব্দ শুনে ভয়ে কাঁপে।

একদিন ইউনিচ সাহস করে কথাটা তুলল। বলল, "তোমার টাকাটা ব্যাংকে রাখছ না কেন তবিথা ? এরকম একটা নির্জন বাড়িতে এত বেশি টাকা রাখা তো মোটেই নিরাপদ নয়।"

তবিথা বিরক্ত হয়ে বলল, "এত বেশি টাকা! কী বাজে কথা বলছ ? তুমি তো ভালই জান যে কোনরকমে বেঁচে থাকার মতো টাকাও আমার নেই।"

বোন বলল, "এতে চোরদেরই লোভ বাড়ানো হয়। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস গত রাতে কেউ বাড়িতে এসেছিল।"

"সত্যি ?" ঢোক গিলে তবিথা বলল : তার চোখের দৃষ্টি ভয়ংকর হয়ে উঠল।

"আমার তাই ধারণা। মনে হল কারা যেন উর্সুলার ঘরে ঢুকল। বিছানা ছেড়ে উঠে আমি সিঁড়িতে গিয়ে কান পাতলাম।"

"তারপর?" ইউনিচ অস্পষ্ট স্বরে বলল।

তবিথা ধীরে ধীরে বলল, "সেখানে কেউ ছিল। আমি শপথ করে বলছি, কারণ তার দরজার চাতালে দাঁড়িয়ে আমি কান পেতেছিলাম; ভিতরে কে যেন ঘরময় হাতড়ে বেড়াচ্ছিল। প্রথমে ভাবলাম বিড়াল, কিন্তু আজ সকালে গিয়ে দেখি দরজাটা তালাবন্ধই আছে, আর বিড়ালটা ছিল রান্নাঘরে।"

"ওঃ, চল আমরা এই ভয়ংকর বাড়িটা ছেড়ে চলে যাই," ইউনিচ আর্তকণ্ঠে বলল।

তার দিদির কণ্ঠস্বর কঠিন: "কী, উর্সুলার ভয়ে? তাকে ভয় পাবে কেন? সে তো তোমার নিজের দিদি; শিশুকাল থেকে তোমাকে লালন-পালন করেছে; হয় তো সে এখনও এখানে আসে, ঘুমের মধ্যে তোমাকে দেখা দেয়।"

ইউনিচ বলে উঠল, "ওঃ! তাকে দেখলে আমি মরেই যাব। সে তো বলেছিল আসবে; মনে হচ্ছে আমার জন্যই সে এসেছিল। হা ঈশ্বর! আমাকে দয়া কর, আমি মরতে বসেছি।"

কথা বলতে বলতেই তার শরীরটা পাক খেতে লাগল; তবিথা ধরে ফেলার আগেই সে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

মার্থা বুড়ি সিঁড়ি বেয়ে ছুটে এল। তবিথা চেঁচিয়ে বলল, "জল নিয়ে এস। ইউনিচ মূর্চ্ছা গেছে।"

ভীরু চোখে তাকে একবার দেখেই বুড়ি চলে গেল; ফিরে এল জল নিয়ে; তার জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করতে লাগল। জ্ঞান ফিরে আসতেই তবিথা তার ঘরে চলে গেল; তার বোন ও মার্থা সেই ছোট ঘরটায় বসে সভয়ে আগুনের দিকে চোখ রেখে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলতে লাগল।

বুড়ি দাসীটি পরিষ্কার বুঝতে পারল যে এ অবস্থা বেশিদিন চলতে পারে না; এই নির্জন রহস্যময় বাড়িটা ছেড়ে চলে যেতে মনিবকে বারবার মিনতি জানাল। দিদির তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও ইউনিচ শেষ পর্যন্ত তার কথায় রাজী হওয়ায় মার্থা বুড়ি খুব খুশি হল। আর বাড়িটা ছেড়ে যাবে এই চিন্তায়ই ইউনিচের স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থার অনেক উন্নতি দেখা দিল। মোরভিল-এ একটা ছোট কিন্তু আরামদায়ক বাড়ি ভাড়া করা হল; তাড়াতাড়ি সেখানে চলে যাবার ব্যবস্থাও হল।

পুরনো বাড়িতে সেটাই শেষ রাত। জলাভূমি, বাতাস ও সমুদ্রের উন্মত্ত আত্মা যেন একযোগে অশান্ত হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি থামছে, আর তখনই দূরের সৈকতভূমি থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের আর্তনাদ, আর তরঙ্গ তাড়িত বয়ার ঘণ্টার বিপদ-সংকেত এক বিচিত্র সুরে তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তখনই আবার বাতাস উঠে আসছে, ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপটায় সমুদ্রের গর্জন ডুবে যাচ্ছে; খোলা জলাভূমিতে কোনরকম বাধা না পেয়ে ঝড়ো হাওয়া পূর্ণ বেগে আছড়ে পড়ছে বাড়িটার উপর।

চিমনিগুলোর মুখে বাতাসের একটা বিচিত্র আর্তস্বর শোনা যাচ্ছে, জানালাগুলো খট্‌খট্ করছে, দরজাগুলো সজোরে আছড়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে পর্দাগুলোও বুঝি জীবন্ত হয়ে দুলছে।

ইউনিচ বিছানায় জেগেই ছিল। তেলের প্রদীপে একটা ছোট্ট নৈশ বাতির আবছা আলো ছড়িয়ে পড়েছে পোকা-খাওয়া পুরনো আসবাবপত্রের উপরে; ফলে অতি সাধারণ জিনিসগুলিও একটা বিকৃত ভৌতিক রূপ ধারণ করেছে। হঠাৎ আরও প্রচণ্ড একটা ঝাপটা এসে সেই আবছা আলোটাকেও নিভিয়ে ফেলার উপক্রম করল। সভয়ে সেই সব ক্যাচ্-ক্যাচ্ এবং সিঁড়িতে আরও সব শব্দ শুনে ইউনিচের মনে হল, মার্থাকে তার সঙ্গে শুতে না বলে সে খুব ভুল করেছে। কিন্তু সে ব্যবস্থাটা তো এখনও করা যেতে পারে। তাড়াতাড়ি মেঝেয় নেমে পোশাকের বড় আলমারিটার কাছে গিয়ে সবে ড্রেসিং-গাউনটা তুলে নেবে এমন সময় সিঁড়িতে একটা অভ্রান্ত পদশব্দ শোনা গেল। তার কাঁপা আঙুল থেকে পোশাকটা পড়ে গেল, বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠল, সে আবার বিছানায় ফিরে গেল।

সব শব্দ থেমে গেল: গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল; অনেক চেষ্টা করেও ইউনিচ সে নিস্তব্ধতা ভাঙতে পারল না। বাতাসের একটা প্রবল ঝাপটায় জানালাগুলো কেঁপে উঠল, বাতিটাও প্রায় নিভে যাবার উপক্রম হল; আগুনের শিখাটা যখন আবার স্থির হয়ে জ্বলে উঠল তখন সে দেখল, দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে, আর একটা হাতের বড় ছায়া পড়েছে দেওয়াল-কাগজের উপর। তবু তার জিভে একটা শব্দও উচ্চারিত হল না। দরজাটা সশব্দে খুলে গেল, জোব্বা-ঢাকা একটা মূর্তি ঘরে ঢুকল, অবর্ণনীয় আতংকের সঙ্গে ইউনিচ দেখল—মৃতা উর্সুলার তোয়ালে-জড়ানো মুখটা তার দিকে তাকিয়ে ভয়ংকরভাবে হাসছে। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে উদ্ধারের আশায় সে তার ম্লান চোখ দুটি মেলে উপরের দিকে তাকাল: মূর্তিটা নিঃশব্দে এগিয়ে এসে তার ভুরুর উপরে ঠাণ্ডা হাতটা রাখল; আর ইউনিচ ম্যালোর আত্মা একটা উন্মাদ চিৎকার করে দেহটা ছেড়ে চলে গেল অনন্তের পথে।

চিৎকার শুনে মার্থার ঘুম ভেঙে গেল, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে দরজার দিকে ছুটে গেল, তার আতংকিত দৃষ্টি পড়ল বিছানার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটার উপর। তার চোখের সামনেই মূর্তিটা ধীরে ধীরে মাথার টুপি ও তোয়ালেটা খুলে ফেলল, বেরিয়ে পড়ল তবিথার পুরো মুখটা, ভয় ও জয়ের মিশ্র অনুভূতিতে তার মুখটা এত বেশি বিকৃত হয়ে উঠেছে যে মার্থা চিনতেই পারল না।

বুড়ির ছায়াটা দেওয়ালের উপর দেখতে পেয়ে তবিথা ভয়ংকর গলায় চিৎকার করে বলল, "কে ওখানে?"

মার্থা ভিতরে ঢুকে বলল, "মনে হল যেন একটা চিৎকার শুনতে পেলাম। কেউ কি ডেকেছে?"

তার উপর ভালভাবে চোখ রেখে তবিথা বলল, "হ্যাঁ, ইউনিচ। আমিও চিৎকার শুনেই ছুটে এসেছি। ওকে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে কেন? ও কি মূর্চ্ছা গেছে?"

বিছানার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বুড়ি বলল, "হ্যাঁ, মৃত্যুর মূর্চ্ছা। আহা, সোনা আমার, শেষ পর্যন্ত তোমার এই দশা হল, ও তো আতংকেই মারা গেছে," ইউনিচের চোখ দুটো দেখিয়ে বুড়ি বলল ; "দুটি চোখে তখনও আতংক লেখা রয়েছে। নিশ্চয় ভয়ংকর কিছু দেখেছে।"

তবিথা চোখ নামিয়ে নিল। তো-তো করে বলল, "ওব তো হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখ ছিলই ; রাতটাই ওকে ভয় দেখিয়েছে ; আমিও ভয় পেয়েছিলাম।"

মার্থা মৃতার মুখের উপর একটা চাদর টেনে দিল। তবিথা খাটের পায়ের কাছে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বলল, "প্রথমে উর্সুলা, তারপরে ইউনিচ। আমিও এখানে থাকতে পারব না। পোশাক পরে ভোরের অপেক্ষায় থাকব।"

কথা বলতে বলতেই সে মাথাটা নিচু করে ঘর থেকে চলে গেল। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রইল মার্থা। খোলা চোখ দুটিকে আস্তে বন্ধ করে দিয়ে নতজানু হয়ে অনেকক্ষণ ধরে মৃতের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করল। শোকে ও আতংকে অভিভূত অবস্থায় সে মাথা নিচু করে অনেক সময় কাটাল। হঠাৎ তবিথার আর্ত চিৎকার কানে আসতেই সে উঠে দাঁড়াল।

দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, "কি হল ?"

"তুমি কোথায় ?" তার গলা শুনে কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে তবিথা চেঁচিয়ে বলল।

"মিস ইউনিচের শোবার ঘরে। আপনার কি কিছু চাই ?"

"এক্ষুণি নেমে এস। তাড়াতাড়ি। আমি অসুস্থ।"

তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন আর্তনাদের মতো শোনাল। "তাড়াতাড়ি ! ঈশ্বরের দোহাই ! তাড়াতাড়ি এস, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব। বাড়িতে একটি অদ্ভুত নারীর আবির্ভাব ঘটেছে।"

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে বুড়ি কোনক্রমে নিচে নেমে গেল। ঘরে ঢুকে বলল, "ব্যাপার কি ? কে এসেছে ? কি বলছেন আপনি ?"

তার কাঁধে হাত রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে তবিথা বলল, "আমি নিজে দেখেছি। তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় দেখলাম একটি নারীমূর্তি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। সে কি---উর্সুলা কি এসেছে ইউনিচের আত্মাকে নিয়ে যেতে ? সে তো বলেছিল আসবে।"

"নাকি আপনার আত্মাকে নিতে ?" মার্থা বলে উঠল ; কথাগুলি কেমন অদ্ভুতভাবে তার মুখে এসে গেল ; সে কিন্তু বলতে চায়নি।

তবিথার চোখে ফুটে উঠল একটা বীভৎস দৃষ্টি ; কাঁপা হাতে নিজের পোশাক আঁকড়ে ধরে কাঁপতে কাঁপতে সেখানেই বসে পড়ল। পাগলের মতো চিৎকার করে বলতে লাগল, "বাতিটা জ্বালাও। আগুন জ্বালাও, একটা শব্দ কর ; ওঃ কী ভয়ংকর অন্ধকার ! আর কি দিন হবে না !"

তাকে শান্ত করার চেষ্টায় কিছুক্ষণ আগেকার বিদ্বেষকে ভুলে গিয়ে মার্থা বলল, "এখনই, এখনই। দিনের আলো দেখা দিলে এসব ভয়ের কথা ভেবে আপনারই হাসি পাবে।"

তবিথা অসহায়ভাবে চিৎকার করে বলল, "আমি ওকে খুন করেছি। আমিই ভয় দেখিয়ে ওকে মেরে ফেলেছি। কেন ও টাকা আমাকে দেয়নি? ওর তো কোন কাজেই লাগছিল না। ওঃ। ওই দেখ!"

তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে মার্থা সভয়ে দরজার দিকে তাকাল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না।

দাঁতে দাঁত চেপে তবিথা বলে উঠল, "ঐ তো উর্সুলা। ওকে দূরে রাখ, দূরে সরিয়ে রাখ।"

কোন অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘরের মধ্যে একটি তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি অনুভব করে বুড়ি এক পা এগিয়ে তবিথার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আর সেইটুকু সময়ের মধ্যেই যেন কারও হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় নিজের দুই হাত দোলাতে দোলাতে তবিথা বিনা বাক্যব্যয়ে তার সামনেই মেঝেতে পড়ে মরে গেল।

বুড়ির সব সাহস এবার ফুরিয়ে গেল; এই মৃত্যু ও রহস্যের পুরী থেকে পালাবার চেষ্টায় প্রচণ্ড চিৎকার করে সে ছুটে ঘব থেকে বেরিয়ে গেল। এতদিন আটকা থাকায় বড দরজার হুড়কোগুলো শক্ত হয়ে গেছে; সেগুলো খুলতে সে পাগলের মতো চেষ্টা করতে লাগল; বিচিত্র সব শব্দ বাজতে লাগল তার কানে। মাথাটা ঘুরতে লাগল। মনে হল, যার যার ঘর থেকে মৃতারা তাকে ডাকছে; একটা শয়তান বুঝি বাইরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাসছে আর দরজাটা চেপে ধরে আছে। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায সে দরজাটা খুলে ফেলল; নিজের গায়ের নৈশ-পোশাকের কথা ভুলে গিয়ে গভীর রাতেই বাইরে বেরিয়ে গেল। জলাভূমির পাশের রাস্তাটা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে, তবু সেটাকে খুঁজে পেল। খালের উপরকার তক্তাগুলো পিছল ও সংকীর্ণ, কিন্তু সে নিরাপদেই তার উপর দিয়ে পার হয়ে গেল; শেষ পর্যন্ত রক্তাক্ত পায়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে গ্রামে পৌঁছে একটা কুটিরের দরজায় সে যখন এলিয়ে পড়ল তখন সে জীবিত কি মৃত তাই বোঝা ভাব।

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

ফটক তালাবন্ধ ছিল

The Gates were Locked—মোরাগ গ্রীয়ার

প্রিয় এলেন ও রব্‌বি,

তোমাদের প্রাচীন দুর্গে একটা ছুটি কাটাতে যেতে পারলে আমি খুশিই হব। তোমরা এমন চমৎকার একটা চাকরি পেয়েছ বলে আমি যে তোমাদের কত ঈর্ষা করছি তা তোমরা ধারণাও করতে পারবে না। একটা সত্যিকারের দুর্গে বাস করা—তার সেই সব ভৌতিক ও পৈশাচিক পরিবেশ, আর সেখানে রাত্রে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের মধ্যে বাস করা—সে তো একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা; অবশ্য তোমরা দু'জন তো কোনদিনই সেসবে বিশ্বাস কর না।

রাত নামবার আগেই আমি পৌঁছতে চেষ্টা কবব, যাতে পিশাচরা আমাকে পাকড়াও করতে না পারে। (আরও গদ্য করে বললে, যাতে আমি পথ চিনে যেতে পারি। তোমাদের মানচিত্র দেখে তো পথটা বেশ গোলমেলেই মনে হচ্ছে।) যেহেতু ফ্রেজার পরিবার ২৯ তারিখ সকালে চলে যাচ্ছেন, আমি ঐদিনই বিকেলের দিকে তোমাদের দরজায় করাঘাত করব।

পুনরায় ধন্যবাদ,

ভালবাসা,

জ্যানেট।

উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত পাহাড়ি অঞ্চলের বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমির উদ্দেশ্যে গ্ল্যাস্‌গো ছাড়ার এক সপ্তাহ আগে এই চিঠিটা ডাকে দেওয়া হয়েছিল। আর রব্‌বি ম্যাক্‌কিননের মানচিত্রকে সযত্নে অনুসরণ করা সত্ত্বেও আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। রাত নেমে এল, একমুখী পথটা ঘন গাছপালায় ঢাকা, আমার গাড়ির হেডল্যাম্পটাও সেই ঘন অন্ধকারকে ভেদ করতে পারল না। তাছাড়া, আমার দৃষ্টিশক্তিও ত্রুটিপূর্ণ; সাঁঝের বেলায় একশ' গজের মধ্যে যা কিছু সবই কেমন যেন অস্পষ্ট ও ঝাপ্‌সা দেখায়। আবার অন্ধকার পুরোপুরি নেমে এলে সব ঠিক হয়ে যায়, কিন্তু গোধূলির আলোতে তা হয় না। কাজেই পথ হারিয়ে ফেলায় সতর্ক চালক হিসাবে আমি পথের পাশে গাড়িটা থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আর তখনই গাছপালার ফাঁক দিয়ে সেটাকে দেখতে পেলাম। একটা ঝকঝকে রুপোলি উপসাগর থেকে অনেক অনেক উঁচুতে তার বুরুজ ও ছাদের খাড়া চূড়োগুলো

অস্তসূর্যের রক্ত-আলোর পটভূমিকায় মসীকৃষ্ণ কালো রঙের একটা রেখাচিত্র বলে মনে হল। দুর্গ নির্মাণের কাজ যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেখান থেকেই একটা খাড়া পাহাড় উঠে যাওয়ায় দুর্গের উচ্চতাটা অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলটা দাঁড়িয়েছে দর্শকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা ছোটখাট শিহরন বয়ে গেল। এতকাল কল্পনায় একটা দুর্গের যে ছবি এঁকেছি এটা যেন ঠিক তাই—একটা সত্যিকারের রূপকথাসুলভ পুরী। এখন আর যা দরকার তা হল একটা বাদুড়ের মতো জীব কোন একটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসে দুর্গের বুরুজগুলোর উপর দিয়ে পাখা ঝাপ্‌টে উড়ে বেড়াক।

তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দেখলাম, অনেক উঁচু একটা বুরুজের ভিতর থেকে একটা ম্লান কমলালেবু রংয়ের আলো বেরিয়ে এল। মনে মনে বললাম, "নিশ্চয়ই এলেন ও রব্‌বির বাসা। ঠিক যেখানে লতাগুলো উঠে গেছে।" একটা মূর্তি জানালার পাশ দিয়ে চলে গেল, ফিরে এল, একমুহূর্ত দাঁড়াল, তারপর মূর্তি ও আলো দুই-ই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি হেঁকে বললাম, "হেই। এখনই শুতে যেয়ো না!"

পুনরায় গাড়ি চালিয়ে আঁকাবাঁকা ছোট পথটা ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম; মনে ভরসা হল, ঠিক পথেই চলেছি।

"শেষ পর্যন্ত!" সামনেই ফটক; দেখে আরও খুশি হলাম যে ফটকটা খোলা। সেটা নিজেকেই সরাতে হবে এটা আমি নিশ্চয়ই চাইনি; ফটকটা পনেরো ফুট উঁচু, বারো ফুট চওড়া; ভারী বাঁকানো লোহার তৈরি; গ্র্যানিট পাথরের প্রকাণ্ড চাঁইয়ের সঙ্গে বড় বড় হুক দিয়ে আটকানো। আমার হেডলাইটের আলো পড়ে ফটকটা চিকচিক করছে। গাড়ি চালিয়ে ফটকটা পার হয়ে জোরে হাঁক দিলাম।

কোন জবাব এল না। আলো জ্বলল না, কেউ সাদর অভ্যর্থনা জানাল না, কোন হাসিমুখ বেরিয়ে এল না। কিছু না। মোটে দশটা বাজে; শুয়ে পড়ার সময় তো এখনও হয়নি। আবার হাঁক দিলাম; আরও জোরে একটানা। ধুত্তোর! কোথাও কিছু নেই। এরই মধ্যে সব শুয়ে পড়েছে! বিরক্ত হয়ে গাড়ি থেকে নামলাম; বৈদ্যুতিক আলোটা নিয়ে এদিক-ওদিক ফেললাম। যেমনটি ভেবেছিলাম, বড় বড় দরজা সবগুলিই যথারীতি বন্ধ; কিন্তু রব্‌বি তার চিঠিতে স্টাফ-কোয়ার্টারে যাবার যে ছোট দরজাটার কথা লিখেছিল সেটাও যে বন্ধ। কাঁকর বিছানো উঠোনের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম; জানালায় আলো ফেললাম; হাঁকডাক করলাম। হঠাৎ এক সারিতে সাতটা লম্বা জানালার উপর আলো পড়তেই ভিতরে যেন কাউকে চলতে দেখলাম; কিন্তু আলোটা এক জায়গায় স্থিরভাবে ফেলতেই দেখতে পেলাম, শ্বেত পাথরের একটি লাজুক কুমারী মূর্তি আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

ঠিক সেইমুহূর্তে একটা গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ একেবারে আমার কানের কাছে শুনতে পেলাম। হঠাৎ ঘুরতে গিয়ে হাতের টর্চটা পড়ে গিয়ে নিভে গেল। সেটাকে হাতড়াতে শুরু করতেই গাড়িটা থেমে গেল, তার হেডলাইটের আলো বাঁকানো লোহার ফটকের ভিতর দিয়ে সোজা আমার উপর এসে পড়ল। গাড়ি থেকে একটি

পুরুষ মানুষ বেরিয়ে এল, বড় তালাটা খুলল, ফটকটাকে সপাটে খুলে ফেলল, এবং গাড়ির দিকে পা বাড়াতেই একটি নারীকণ্ঠ বলে উঠল, "রব্‌বি! উঠোনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে!"

গাড়িটা ভিতরে ঢুকল, দরজাগুলো খোলা হল, রব্‌বি ও এলেন ম্যাক্‌কিনন গাড়ি থেকে নামল।

এলেন চেঁচিয়ে বলল, "জ্যানেট! তুমি এখানে কি করছ?"

"আচ্ছা! অভ্যর্থনাটা পাহাড়ি দেশের উপযুক্তই বটে!"

"ওঃ, আমি সেভাবে কথাটা বলিনি, আর তা তুমি ভালই জান। তোমাকে দেখলে আমরা সব সময়ই খুশি হই। কিন্তু আমরা কোথায় আছি সে খবর তুমি পেলে কোথায়? তোমাকে চিঠি লেখার কথা আমরা ভাবছিলাম বটে, কিন্তু এত ব্যস্ত ছিলাম যে আজকের আগে কিছুতেই সময় করে উঠতে পারি নি..."

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "তাহলে অন্য কেউ লিখেছে। আর চিঠিতে স্বাক্ষর করেছে, 'এলেন ও রব্‌বি'।"

"কি বললে?" রব্‌বি কথা বলল।

আমি তিক্ত স্বরে বললাম, "তোমাদের চিঠির কথা। যে চিঠিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ফ্রেজাররা চলে গেলে একটা মাস তোমাদের সঙ্গে কাটিয়ে যেতে।"

এলেন স্বীকার করল, "হ্যাঁ, তোমাকে আমরা একটা চিঠি লিখেছি জ্যানেট, কিন্তু এই তো সবে আজই লিখেছি। আজ রাতেই গ্রামে গিয়ে সেটা ডাকে ফেলেছি। যাই হোক, তুমি যে এসে গেছ তাতেই আমি খুশি। কিন্তু আমাদের মনিবের নাম, বা তিনি যে চলে গেছেন তা তুমি জানলে কেমন করে?"

রব্‌বি বলে উঠল, "আলোচনাটা ভিতরে গিয়ে করলে হত না? এখানে যে জমে যাচ্ছি, আর ক্ষিধেও পেয়েছে। এলেন, তুমি গিয়ে কফিটা বানাও, আমি গাড়িটা তুলে দিয়ে ফটকে আবার তালাটা লাগিয়ে দিচ্ছি। এক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।" আমার লাল রংয়েব মিনিটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে থেমে গেল। "কিন্তু তুমি ভিতরে ঢুকলে কেমন করে জ্যানেট?"

"গাড়িটা চালিয়ে; আবার কেমন করে? ফটকটা খোলাই ছিল, আমি শুধু..."

পরস্পরে চোখাচোখি হল; একমুহূর্ত আমরা তিনজনই হতচকিত হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। শেষ পর্যন্ত এলেন বলল, "ফটক তো তালাবন্ধ ছিল।"

আমি বিড়বিড় করে বললাম, "ঠিক। আমিই তো তোমাদের ফটক খুলতে দেখলাম। আমি তাহলে অন্য কোন ফটক দিয়ে ঢুকেছি।"

"একমাত্র এই ফটক দিয়েই একটা গাড়ি ঢুকতে পারে; এমনকি যে লাল রংয়ের কর্সেট গাড়িটা তুমি চালিয়ে এসেছ সে গাড়িও।"

রব্‌বি বলল, "দেখ, থার্মোমিটারের পারা নামছেই; এ অবস্থায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো এ সমস্যার সমাধান হবে না। কফি চাই গো মেয়ে! একলাফে চলে যাও!"

এলেন ও আমি চওড়া বারান্দা ধরে হাঁটতে লাগলাম। দেওয়ালে নানা তৈলচিত্র এবং শুয়োর ও হরিণের পোকায়-খাওয়া মাথা ঝোলানো। আমি বললাম, "এ বাড়ির অন্য সব লোকই হয় হদ্দ কালা, আর না হয় তো রাতে দরজার কাছে আসতেই ভয় পায়। মরা মানুষকে জাগাবার মতো করে হর্ন বাজিয়েছি, হাঁক দিতে দিতে গলা চিড়ে ফেলেছি।"

"খুব করেছ," এলেন মুচকি হেসে বলল। "আমরা ছাড়া আর কেউ এখানে নেই। ফ্রেজারদের সঙ্গে অন্য সকলেই রোমের বাড়িতে চলে গেছে।"

"তাহলে বুরুজের আলোটা কে জ্বালাল ?"

"আলো ? বুরুজের ? তোমাকে দেখছি কল্পনায় পেয়েছে। তোমাকে তো স্কুল থেকেই চিনি। অন্ধকারে ভয় পাবার মতো কিছু না থাকলেও তুমি কল্পনায় একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে। এদিকে এস।"

সে একটা দরজা খুলল, সুইচে হাত দিল। একটা ঝকঝকে গরম রান্নাঘর ; প্রকাণ্ড ইলেকট্রিক স্টোভটার উপর একটা পরিষ্কার বড় কেটলিতে আস্তে আস্তে জল ফুটছে।

হাত বাড়িয়ে পেয়ালা ও চামচের টুং-টাং শব্দ তুলে এলেন বলল, "বাইরে যাবার আগে আমরা সব সময়ই কেটলিটা চাপিয়ে রেখে যাই। পরে অনেকটা সময় বাঁচে। তুমি তো জান কফির জন্য রব্‌বি কেমন উতলা হয়ে ওঠে; দু' মিনিটের মধ্যেই কফি চাই। রান্নাঘরটা যেমন সুন্দর, তেমনই বড়, তাই না ? একটু নড়াচড়ার মতো জায়গা আমার চাই। সাদা ?"

"অ্যাঁ ?" আমি চমকে উঠলাম। সবুজ-হলুদ রংয়ের রান্নাঘরের চারদিকে তাকালাম, সাদার তিলমাত্র চিহ্নও চোখে পড়ল না। জিজ্ঞাসু চোখ তুলে বললাম, "কি বললে ?"

"কফির কথা বলছি। কালো, না সাদা ?" হঠাৎ হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে কথা বলা এলেনের অনেক দিনের স্বভাব।

"ও। সাদাই দাও।" কোটটা খুলতে খুলতে আবার বললাম, "কিন্তু ঘরে তো একটা আলো ছিল। আর তোমাদের একটা চিঠিও আমি পেয়েছি। নইলে এখানে এলাম কেমন করে ?"

এলেন খুশির মেজাজে বলল, "বুঝতে পারছি না। তবে আজকের আগে কোন চিঠি লিখিনি। চিঠি ? দেখ, আমি ঠিক জানি যে আমি লিখিনি। তুমিও তো লেখনি, কি বল রব্‌বি ?"

তার স্বামী সবে ঘরে ঢুকেছে; তার মুখ এখন গরম কফিতে ভর্তি। সে সবেগে মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়তে লাগল। সে যে কি বলতে চাইল, "না, আমি লিখিনি," "হ্যাঁ, আমি লিখেছি" অথবা "পিটারের দোহাই, আমার মুখ এখন পুড়ে যাচ্ছে !" তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এলেনই কথা বলল, "না, আমি জানি আমাকে না জানিয়ে তুমি চিঠি লিখবে না। ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময় ঠেকছে জ্যানেট।"

বললাম, "চিঠি পেয়েই সেইদিনই আমি জবাব দিয়েছি।"

"সে চিঠি মোটেই এখানে পৌঁছেনি।"

অত্যন্ত হতাশ হলাম; মনে মনে স্থির করলাম পরদিনই গাড়ি চালিয়ে গ্ল্যাস্‌গো ফিরে যাব। কিন্তু তাকে যখন আমার জন্য রাতের মতো একটা থাকার ব্যবস্থা করে দিতে বললাম তখন তো এলেন চটে লাল।

"রাতের মতো! যখন এসে পড়েছ, তখন থেকেই যাবে। তোমাকে কাছে পেতেই আমরা চাই। আসলে আজ রাতে যে চিঠিটা ডাকে দিয়েছি তাতে তোমাকে আসতেই লেখা হয়েছে।"

রব্‌বি বলল, "আচ্ছা জ্যানেট, সেই চিঠিটা তোমার কাছে আছে?"

"হ্যাঁ, আছে। তুমি যে মানচিত্রটা এঁকে পাঠিয়েছ সেটাও আছে।" আমার থলি থেকে কাগজপত্রগুলো বের করে রব্‌বির পেয়ালার পাশে টেবিলের উপর রাখলাম, বন্ধুরা দু'খানা হাল্কা নীল রংয়ের চিঠির কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ল; তাব একটাতে বিনা স্কেলে আঁকা একটা রাস্তার চিত্র, আর একটা রব্‌বি ম্যাক্‌কিননের মাকড়শার ঠ্যাংয়ের মতো হাতের লেখায় ঠাসা, তার নিচে এলেনের বাঁ হাতে লেখা কয়েকটা শব্দ।

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না," এলেন বিচলিত গলায় বলল। "আমরা তো ঠিক এই চিঠিই লিখেছি, কিন্তু আমরা তো লিখেছি সবে আজ। আর ঐ মানচিত্রটাও তো রব্‌বিরই আঁকা। এত খারাপ আঁকতে আর কেউ পারত না।"

আমি শুধালাম, "তোমরা যে এখানে এসেছ সেকথা আর কেউ জানে? মানে, আমাদের দলের আর কেউ যে আমাদের নিয়ে একটু রসিকতা করতে পারে?"

"না; মাত্র পাঁচ সপ্তাহ আগে আমরা চাকরিটা পেয়েছি, আর খুব অল্প দিনের নোটিসে আমাদের পেইস্‌লি ছাড়তে হয়েছিল। কাউকে ফোন করবারও সুযোগ আমরা পাইনি। এখানে এসেও পা রাখবার সময় পাইনি, কারণ ফ্রেজাররা তখন চলে যাবার কাজে ব্যস্ত, আর আমাদেরও বাড়ির কোথায় কি আছে এবং তাদের অনুপস্থিতিতে কি কি করতে হবে সে সবই জেনে নিতে হচ্ছিল। আজই দলের সকলকে চিঠি লিখেছি, অবশ্য সকলকেই যে এখানে আসতে বলেছি তা নয়।"

"খামটা তোমার সঙ্গে আছে?" রব্‌বি শুধাল।

খামটা সঙ্গে করেই এনেছিলাম। তার হতে দিলাম।

"জ্যানেট, তুমি ডাকঘরের ছাপটা লক্ষ্য করেছিলে? বা চিঠির উপরকার তাবিখটা?"

"না। কেন বল তো?"

"দেখ।" চিঠিটা আমার হতে ফেরৎ দিল। "তারিখটা ২৯শে—মানে আজ। আর খামের উপর ডাকঘরের তারিখ ৩০শে—আগামীকাল।"

"এটা তো রসিকতা!" আমি বাধা দিলাম, কিন্তু তার কথাই ঠিক।

"আরও দেখ!" এলেন বলে উঠল। "সেই একই খাম। কারণ ডাকঘরের ছাপটা পড়েছে ভুল কোণে। তোমার মনে পড়ে রব্‌বি, আজ বিকেলেই কথাটা বলেছিলাম।

চিঠির তাড়ার মধ্যে এই খামটা উল্টো কবে রাখা ছিল, আব আমিও ভাল করে না দেখেই টিকিটগুলো লাগিয়েছিলাম। পরে সেটা খেয়াল হয়েছিল।"

আমি বললাম, "আরে, ভালই হয়েছে। এ ধরনের জায়গাতে কিছু রহস্য তো থাকবেই। কিছু ভুতুড়ে ব্যাখ্যাব অতীত ঘটনা না হলে এটা তো সত্যিকারের দুর্গই হত না।"

এলেন আপত্তি জানাল। "কিন্তু এ বাড়িতে সেরকম কিছুই নেই। এখানে নোংরা কিছুই নেই। আসার পরে সে ধবনেব কিছু আশাও করেছিলাম—আসলে ভূতপ্রেত বা ও ধবনের কোন কিছুতে বিশ্বাস না করলেও খুঁৎখুঁৎ আমারও ছিল,—কিন্তু এসে দেখছি অদ্ভুত বা ভয় পাবার মতো কিছুই এখানে নেই। সেবকম কিছু যদি আশা কবে থাক, তাহলে কিন্তু তোমাকে হতাশ হতে হবে। আসলে এটা খুবই শান্তিপূর্ণ, সুখের জায়গা। এমনকি ছবিগুলও যেন সুখী; পুবনো প্রতিকৃতিতে সাধাবণত যে ধবনেব লম্বা, বিষণ্ন মুখ থাকে সেবকম একখানিও নেই। তোমাব মালপত্র কোথায়?"

"ওহো, সেটা তো গাড়িতেই বয়ে গেছে।"

"আমি নিয়ে আসছি," বর্ব্বি বলল; আমিও আপত্তি কবলাম না। দীর্ঘ পথ গাড়ি চালিয়ে এসে বেশ ক্লান্ত লাগছে; বিছানায় এলিয়ে পড়া ছাড়া আব কিছু এখন চাই না।

এলেনকে সেকথা বলতেই সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

"দোতলায় চল। বাড়তি ঘবটা সাজানোই আছে, শুধু একটা নতুন বালিশেব ওয়াড় লাগালেই হয়ে যাবে, তারপরই সোজা ঢুকে যেতে পারবে। স্নান করবে কি, না সকালে করবে? সত্যি, তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। জলেব বোতল, গবম জলেব বোতলগুলো যে কোথায় বাখলাম? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কাপড়ের কাবার্ডেব মধ্যে আছে। জ্যানেট, এই হল স্নান ঘব, আব এটা তোমার ঘর। ঠিক নিজেব ঘর বলে মনে করো। আমি যাই, বোতলগুলো ভরে নিয়ে আসি।"

কিছুটা ক্লান্তিতে, কিছুটা বিভ্রান্তিতে, কিছুটা বা এলেনের বক্‌বকানিতে আমার মাথাটা ঘুরছে। এলেনেব কথার সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ি বেয়ে কারও উঠে আসার শব্দ শুনতে পেলাম। "তোমার মালপত্র নিয়ে বব্‌বি আসছে। আবে এত তাড়াতাড়ি! দরজা বন্ধ করাব শব্দও তো শুনতে পেলাম না।" সে ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে গেল। বলল, "ওগুলো আমি নিচ্ছি রব্‌বি। জ্যানেট পোশাক ছাড়ছে।" সে দাঁড়িয়ে পড়ল! "আশ্চর্য! এখানে তো কেউ নেই।"

সেই সময় বাইরের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। রব্‌বির পায়ের শব্দ শোনা গেল। সে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছে।

এলেন বলে উঠল, "হা ঈশ্বর, আমিও যেন কি সব শুনতে পাচ্ছি। জ্যানেট কারমাইকেল, তোমার, সেই সব অদ্ভুত ঘটনাই বোধ হয় ঘটছে। তোমার রোগ দেখছি আমাকেও ধরেছে।"

সে আমার মালপত্র এনে দিল, বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এল দুটো গরম জলের বোতল নিয়ে, বিছানার চাদরটা পাল্টে দিল, নরম বালিশের নতুন গোলাপী ওয়াড় পরাল। আমি ততক্ষণে ব্রা ও প্যান্ট পরে ফেলেছি।

"আচ্ছা, তোমাকে শান্তিতে রেখে যাচ্ছি। এটা বেড-লাইটের সুইচ। কাল সকালে খুব তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে ওঠার কোন দরকার নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা শুয়ে থেকো। শুভ রাত্রি।" সিঁড়িতে খট্‌খট্ শব্দ তুলে সে নিচে নেমে গেল।

ক্লান্ত দেহে কোনরকমে পাজামায় পা দুটো ঢুকিয়ে পাশের স্নান ঘরে ঢুকলাম, একটা ভেজা তোয়ালে দিয়ে মুখটা শুধু মুছে নিলাম, তারপর টলতে টলতে এসে নরম বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলাম। নিশ্চয় আলো না নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; কারণ কিছুক্ষণ পরেই ঈষৎ জাগরণের মধ্যে দেখলাম এলেনের মুখটা আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে; আমার বরফ-ঠাণ্ডা হাতটাকে কম্বলের নিচে গুঁজে দিয়ে সে আলোটা নিভিয়ে দিল।

উজ্জ্বল শিশির-ঝরা সকালে সাড়ে ন'টায় যখন আমার ঘুম ভাঙল, সূর্যের আলো পড়ে টালির ছাদ তখন প্রায় ফাটতে বসেছে। বাইরে নানান পাখিদের কলকাকলি; আমার জানালার গোবরাটে বসে একটা চড়ুই পাখি মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়তে নাড়তে একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কম্বল সরিয়ে ফেলে একলাফে বিছানা থেকে নামলাম; অবশ্য গ্ল্যাস্‌গোতে আমি কখনও এরকম করি না। যা হোক, বেশ খানিকটা বরফ-ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢেলে তারপর অনেকক্ষণ ধরে গরম জলে স্নান করায় শরীরটা আশ্চর্য রকমের তাজা হয়ে উঠল, আর মনটাও বেশ খুশি হল। আঁটসাট লিলাক কর্ডের ট্রাউজার পরে, পলো-কলারের সাদা নরম সোয়েটার গায়ে দিয়ে, চুলে তার সঙ্গে ম্যাচ-করা লিলাক রংয়ের ফিতে বেঁধে সটান রান্নাঘরে হাজির হলাম।

এলেন তখন নানারকম ভাজা-ভাজিতে ব্যস্ত। একাজে সে যেমন দক্ষ, তেমনই উৎসাহী। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিন টুকরো শূকর-মাংস, দুটো কাবাব ও দুটো ডিম কড়াইতে ভাজা হল। গ্রীলের নিচে টোস্ট ধীরে ধীরে গরম হচ্ছে, আর আমার ঠিক পাশেই একপাত্র চা ফুটছে।

"এতসব আমি খেতে পারব না," আমি আপত্তি জানালাম।

"নিশ্চয় পারবে। এখন তো গ্রামে এসেছ। বেশ তো, যদি নাই পার তো রব্‌বি আছে। এখানে আসার আগে তার ক্ষিধেই হত না,.এখন তো একেবারে ঘোড়ার ক্ষিধে। কিন্তু তোমার ভাল ঘুম হয়েছিল তো? এই গ্রীল নিয়ে এক যন্ত্রণা! আচ্ছা, টোস্টটা একদিকে একটু কাল্‌চে হলে আপত্তি আছে কি? এখন কিন্তু প্রচুর দুধ খাবে।"

কোন কথাই বললাম না। একে তো কর্নফ্লেকে আমার মুখ ভর্তি, তার উপর আমি তো জানি কথা বলে কোন লাভ নেই। আর সেও কথাটা মিথ্যা বলেনি; সত্যি সে যা দিল সব আমি খেয়ে শেষ করলাম। ঘোড়ার ক্ষিধেই বটে! শেষ পর্যন্ত

চতুর্থ কাপ চা শেষ করে সিংক-এ গিয়ে পেয়ালা-পিরিচগুলো ধুয়ে এনে বললাম, "আমি একটু সাহায্য করতে পারি কি?" হেসে আমাকে দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে সে বলল, "সোজা বেরিয়ে যাও, একটু ঘুরে এস। আমি তো জানি, তোমার মন সেটাই চাইছে। যে দরজাগুলো তালাবদ্ধ সেগুলি ফ্রেজারদের ঘর; বাকি যেকোন ঘরেই তুমি ঢুকতে পার।"

"ও. কে.। একটু পরেই ফিরব। ওঃ, ভাল কথা, কাল রাতে কম্বলটা টেনে দেওয়া আর আলোটা নিভিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ।"

"কম্বল টেনে দেওয়া? কী বলছ তুমি? রব্‌বি ও আমি যখন উপরে উঠে এলাম, তখন তো আলো নেভানোই ছিল; আর এত জোরে·তোমার নাক ডাকছিল যে গোটা গ্রামেবই ঘুম ভাঙার যোগাড়—অবশ্য সে গ্রাম এখান থেকে দু'মাইল দূরে।"

"কিন্তু—কাল রাতে আমি একবার জেগেছিলাম, কখন তা জানি না, তখন তুমি আমার উপব ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলে। হাতটাকে বাতিব দিকে বাড়িয়েই আমি ঘুমিযে পডেছিলাম, কারণ হাতটা জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল, আর তুমি আমাকে ভাল কবে ঢেকে দিযে আলোটা নিভিয়ে দিযেছিলে।"

"আমি ওসব কিছুই করিনি। তুমি স্বপ্ন দেখেছ। এখন যাও তো এখান থেকে। লাঞ্চ তৈরি হলেই তোমাকে ডাকব।"

এরপব আব কোন কথা নয়। বাসাবাড়িটা ছাড়িয়ে কার্পেট-মোড়া বাবান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। দেওযালে নানারকমের সব প্রাকৃতিক তৈলচিত্র। বাঁদিকে মোড ঘুবতেই একটা লম্বা-চওড়া হলঘর; একদিকে সাতটা লম্বা জানালা দিয়ে আলো এসে ভিতরে পড়েছে, অপরদিকে একগাদা শ্বেত পাথরের মূর্তি। সব মিলিয়ে প্রায যাটটা হবে। তার মধ্যে গত রাতে দেখা সেই লাজুক উলঙ্গ সুন্দরীকে চিনতে আমার ভুল হল না। তবে এখন নতুন করে লক্ষ্য করলাম যে সব জিনিস ফেলে সে একটা ব্যাঙকে বুকের কাছে ধরে আছে। আর দেখলাম একজন গ্রীক ক্রীডাবিদের একটা আশ্চর্য মূর্তি। পায়ে স্যান্ডেল; একটা চাক্‌তি ছোঁড়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। বিপরীত দিকে জানালাগুলো তৈলচিত্রে বোঝাই। মনে হল, এ দুর্গের বুঝি এটাই বৈশিষ্ট্য।

এই মূর্তি বোঝাই ঘরটাতে অনেকগুলো দরজা থাকায় কোন্ দিকে যাব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। এককোণে নজর পডতে দেখলাম একজোড়া ভারী দরজা রয়েছে। দুটোই বন্ধ। মনে মনে "টস্" করে বাঁ-হাতি দরজাটাই বেছে নিলাম। পাল্লা দুটো খুলতেই একটা লম্বা লাইব্রেরি পেয়ে গেলাম। সাহিত্য-জগতের হেন কেউ-কেটা নেই যার আসন সেখানে নেই; আর সকলেই আসীন একরকমভাবে বাঁধাইকরা গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে: স্কট, স্টিভেন্সন, গ্যেটে, ভল্‌তেয়ার, দুমা, স্তাঁদাল ইত্যাদি ইত্যাদি; সে জগতের কোন শেষ নেই। কিন্তু এ দুর্গের এটাই একমাত্র ঘর যেখানে কোন তৈলচিত্র দেখলাম না। অবশ্য নানারকম খোদাই করা মূর্তি অনেক আছে। এমনকি সিলিং থেকে এমন গুচ্ছ গুচ্ছ আপেল, কমলালেবু, বা অন্য সব খোদাই করে

ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যে পাছে মাথা ঠুকে যায় এই ভয়ে যেকোন দর্শকই চলতে চলতে মাথা নিচু করতে বাধ্য হবে।

জ্ঞান-সমুদ্রে আরও কিছুক্ষণ ডুবে থাকব, না বাড়িটার অন্য অংশগুলো দেখব—এই কথা ভাবতে গিয়ে শেষের পথটাই বেছে নিলাম। তখনই মৃদু বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, যে দরজাগুলো আমি খোলা রেখে এসেছিলাম সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। দরজার কাছে গিয়ে দেখলাম, শুধু যে পাল্লাগুলি বন্ধ হয়েছে তাই নয়, তালাও আটকে গেছে। এতে আমার বিস্ময় বেড়ে গেল। কোনরকম শব্দ করে দরজা বন্ধ হলে আমি অবশ্যই শুনতে পেতাম। দু'একবার পরীক্ষা করেও দেখলাম; দরজা খুলে তারপর ঠেলে দিয়ে ঘরের বিভিন্ন কোণে গিয়ে পিছন ফিরে কান পাতলাম। প্রত্যেক বারেই দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলাম। যাই হোক, সারাজীবন আমি এটাই তো চেয়েছিলাম। এলেনও তো বলেছে, ভয় পাবার মতো কিছু না থাকলে আমি একটা কিছু বানিয়ে নেই, কিন্তু এখানে বানাবার কোন দরকারই নেই।

দ্বিতীয় দরজা দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় ঢুকলাম। দেওয়ালে হাল্কা লাল কাগজ-মোড়া; ছোট ছোট বিন্দুর মতো সুন্দর সব চেয়ার ও টেবিল এখানে-ওখানে পাতা; সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে ভয় হয়, হাত দিয়ে ছুঁলেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সাহসে ভর করে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। চেয়ারটা ছোট ছোট কাঁচের টুকরো দিয়ে তৈরি। অমনি প্রতিটি দেওয়াল থেকে দীর্ঘদেহ, সুন্দরী মহিলারা আমার দিকে নাক উঁচিয়ে তাকাল; তাদের কারও হাতে শুকনো গোলাপ, কারও হাতে মাকড়শা-জালের পাখা নড়ছে।

"আমার দিকে ওভাবে পাখা নাড়বেন না ম্যাডাম।" আমি হঠাৎ বলে উঠলাম। তার হাতের পাখা আবার নড়ে উঠল। ভাল করে তাকালাম। সব স্থির। ছবি কি কখনও পাখা নাড়তে পারে? নিজেকেই শুধালাম। অবশ্যই না। কিন্তু উনি তো নাড়লেন; আমি ঠিক দেখেছি। এটা হয়তো আলোর কারসাজি। আবার চেয়ারে বসলাম। আবার নড়াচড়ার শব্দ; কারা যেন ঘরময় ঘুরছে। দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু নড়াচড়ার কোন আভাসই পেলাম না। যাই হোক, এ বৈঠকখানায় আর নয়। ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করতেই নিশ্চিত মনে হল, ভিতর থেকে স্বস্তির একটা অস্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস যেন শুনতে পেলাম।

আবার সেই মূর্তি-ভর্তি হলঘর। তার একেবারে শেষ প্রান্তে একটা চওড়া সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। খানিকটা উঠে একটা অর্ধবৃত্তাকার চাতাল। সেখানকার একমাত্র জানালাটা একেবারেই অকেজো, কারণ নানা গাঢ় রংয়ের রঙিন কাঁচের নীতিকথামূলক মূর্তি দিয়ে সেটা তৈরি; তাই আলোর পরিবর্তে সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে নানা বিকৃত ছায়া। সিঁড়ির থাম্বাদার রেলগুলি গাঢ় আখরোট কাঠের তৈরি; তাতে নিপুণ হাতে ফুললতাপাতা খোদাই করা। একটা নক্সাকে ভাল করে দেখতে উপুড় হতেই একটা প্রকাণ্ড গোলাপের মাঝখানে যক্ষমূর্তির চোখে দুষ্ট কটাক্ষ দেখে চমকে উঠলাম।

পিছনে সরে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে হাতটা বাড়িয়েই আবার টেনে নিলাম; আঙুলের ডগায় ধারালো দাঁতের কামড় লাগল যেন। আর একটি যক্ষমূর্তির মুখের যেখানটায় আমার হাত লেগেছিল সেখানকার কাঠ খানিকটা ভেঙে গিয়ে ধারালো দাঁতের মতো হয়ে গেছে। এই ভীরুতার জন্য নিজেকেই তিরস্কার করে উপরে উঠতে লাগলাম। তেরোটা ধাপ উঠবার পরেই মনে হল, আমার দুই কাঁধের উপর দিয়ে কে যেন তাকিয়ে আছে। মুখ ফেরাতেই সত্রাসে দেখলাম, শীর্ণ, বিশুষ্ক মুখে দুটি রক্তমাখা হাত বাড়িয়ে লেডি ম্যাকবেথ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ঈষৎ আর্তনাদ করে উঠে পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম, একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের জীবন্ত মর্মর মূর্তির উপর জানালার রঙিন কাঁচের বিচিত্র আলো-ছায়ার ফলেই মূর্তির গতিময়তায় মায়াজাল সৃষ্টি হয়েছে। আবার উঠতে শুরু করলাম। আরও ছাব্বিশটা ধাপের মাথায় সিঁড়িটা শেষ হয়েছে। তারপরেই একটা নাচ-ঘরের ঝকঝকে মেঝে উজ্জ্বল দিনের আলোয় ঝলমল করছে। নাচের ফলে ক্লান্ত জুটিদের বিশ্রামের জন্য দেওয়াল বরাবর অনেক সোফা ও চেয়ার পাতা রয়েছে। ঝলমলে কাঁচের ঝাড়লণ্ঠনে সিলিংটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে।

"লাঞ্চ!"

ভয়ে আমি কাঠ হয়ে গেলাম; হাঁপাতে লাগলাম: বুকের ভিতর ঢিপ্‌ঢিপ্ শব্দ হতে লাগল; হাতটা ভিজে উঠল।

"লাঞ্চ তৈরি জ্যানেট। দেরি করো না।"

মুখ ফেরাতেই যেন দেখতে পেলাম, নাচ-ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে কে যেন দ্রুত পা ফেলে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। নাড়ির দ্রুতগতিকে কিছুটা শান্ত করে তার পিছু নিতেই এলেনের সঙ্গে দেখা; সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে।

"এই যে জ্যানেট। লাঞ্চ তৈরি।"

"আমি জানি। তোমার প্রথম ডাকও শুনতে পেয়েছি।"

"প্রথম ডাক! কী বলছ তুমি? আমি তো একবারই ডেকেছি।"

"তুমি দু'বার ডেকেছ। তাই তো আমি এদিকে আসছিলাম। বড় সিঁড়ি দিয়ে না নেমে তোমাকেই অনুসরণ করছিলাম।"

"জ্যানেট, তুমি আবার গুল্ মারতে শুরু করেছ। তুমি আমাকে অনুসরণ করতেই পার না, কারণ আমি তো এইমাত্র এখানে এসেছি। কিন্তু এখন আমাকে অনুসরণ করতে পার। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, রব্বি এতক্ষণ শুরু করে দিয়েছে। বাব্বা! একটা লোক এতও খেতে পারে!" যে পথে এসেছিল, এলেন বক্‌বক্ করতে করতে সেই পথেই ফিরে চলল। "ভাল কথা, সিঁড়িতে লেডি ম্যাকবেথের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে কি? ছবিটা খুব সুন্দর, তাই না?"

ঝল্‌সানো হরিণ-মাংস আর বাগানের টাটকা সব্জি দিয়ে তৈরি লাঞ্চ খুবই উপাদেয় লাগল। যে টেবিলে বসে আমরা খেলাম তার অন্যদিকে ডাঁই করা রয়েছে নতুন রুটি, জইয়ের পিঠে, ফল দেওয়া পাউরুটি, বিস্কুট, ডাণ্ডি কেক, আরও কত কি।

"এত অল্প সময়ে তুমি এতসব রান্না করলে কেমন করে?" আমি শুধালাম।

এলেন জবাব দিল, "আমার তো তিনটে উনুন আছে। দুটোতে রান্না চড়িয়ে দিয়ে আর একটার আয়োজন সেরে ফেলি। তোমাকে আর কি দেব?"

"কি বললে?"

"হরিণ-মাংস একটুখানি নাও; প্রচুর আছে ফ্রিজ-ভর্তি; তাছাড়া শিক-কাবাব, ছাগ-মাংস, শূকর-মাংস তো আছেই। ফ্রিজ-ভর্তি। ফ্রেজাররা মাংস কেনে একেবারে তাল-তাল।"

"তা বটে," আমি বললাম।

আমার জন্য আরও এক পেয়ালা চা ঢেলে দিয়ে এলেন বলল, "এটা খেয়ে চল একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি। তোমার একটু খোলা হাওয়া দরকার।"

ঠাণ্ডার জন্য ভাল করে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে কিছুক্ষণ বাগানে পায়চারি করে আমরা পাহাড় কেটে তৈরি অনেকগুলো পিছল সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম। সেখানে তিনটে হ্রদের মতো তৈরি হয়েছে; প্রায় একশ' ফুট উঁচু থেকে একটা সরু ঝর্ণা যেন হঠাৎ লাফ দিয়ে পাহাড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা একটা খাঁজ কাটা ত্রিকোণ পাথরের জিভের উপর আছড়ে পড়ছে, আর তার ফলে ঝর্ণার ধারাটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুটো চমৎকার ফোয়ারার সৃষ্টি করেছে।

মুগ্ধ চোখে বেশ কিছুক্ষণ সেই দৃশ্যটাই দেখলাম। একসময় বললাম, "আচ্ছা, এই পাথরের জিভটা কি প্রাকৃতিক, না কি কেউ ওখানে বসিয়ে দিয়েছে?"

কোন জবাব পেলাম না। মুখ ফিরিয়ে দেখি, এলেন ওপাশে নেই। হঠাৎ কেমন যেন ভয় পেলাম। "এলেন।" হাঁক দিলাম। "এলেন, তুমি কোথায়?" জবাব দিল শুধুই ঝর্ণার কলধ্বনি। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল। মনে হল কেউ যেন আমার পিছনে এসে দাড়িয়েছে, ঠিক যেরকম লেডি ম্যাকবেথ এসে দাঁড়িয়েছিল। আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে কোনরকমে মাথাটা ঘোরালাম; কিন্তু পাহাড়ের মুখ, গাছপালা ও নৃত্যরতা ঝর্ণাধারা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। ভাঙা-ভাঙা গলায় ডাকলাম, "এলেন।"

"এই যে!"

"হা ভগবান!" চকিতে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখলাম, একথোকা নলখাগড়া হাতে নিয়ে এলেন একটা ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে।

সকৌতুকে আমার দিকে তাকিয়ে সে আবার বলল, "এই তো আমি।"

"এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?"

"ওঃ! ফুলদানির জন্য এই নলখাগড়া নেবার কথা হঠাৎ মনে এল। তাই একটু ঝোপের ভিতর ঢুকেছিলাম। কিন্তু তুমি 'এতক্ষণ' বলছ কেন?"

"তোমাকে কতক্ষণ ধরে ডাকছি। অন্তত তিনবার ডেকেছি। কোন সাড়া পাইনি। দেখতেও পাইনি। কোথায় গেলে তাও বুঝতে পারিনি।"

"কোন ডাক তো আমি শুনিনি। হয়তো ঝর্ণার শব্দে চাপা পড়েছিল।"

"কিন্তু এখন তো তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ; অথচ আমরা তো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি; আর এখন আমি মোটেই চিৎকার করে কথা বলছি না।"

"ঠিক আছে; ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। হয় তো উপুড় হবার জন্য আমার কান দুটো ঝর্ণার খুব কাছে চলে গিয়েছিল। তা তুমি আমাকে ডাকছিলে কেন?"

"এমনি।"

"এবার কি ফিরে যাবে? আমার ঠাণ্ডা লাগছে, তাছাড়া ডিনারের ব্যবস্থাও তো করতে হবে। না কি, তুমি একটু থাকবে?"

"না। আমিও তোমার সঙ্গেই যাব।"

সে গম্ভীর হয়ে আমার দিকে তাকাল। "কী ভয়-কাতুরে মেয়ে।"

আমার সব কথাকেই সে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে দেখে হঠাৎ রেগে গিয়ে আমি বলে উঠলাম, "আমি যা দেখেছি সে সব দেখলে তুমিও ভয় পেতে।"

"ঠিক আছে জ্যানেট। এ নিয়ে মাথা গরম করার কিছু নেই।" হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে সে সিঁড় বেয়ে উঠতে লাগল। বাসাবাড়িব দরজায় পৌঁছনো পর্যন্ত দু'জনই নিঃশব্দে হাঁটলাম। দরজার কাছে এসে একটু থেমে বললাম, "আমি দুঃখিত এলেন, ওভাবে কথাটা বলতে আমি চাইনি। আসলে কি জান...আমি এমন সব অদ্ভুত কিছু শুনছি ও দেখছি যা তুমি একেবারেই বিশ্বাস করছ না।"

"আমি বিশ্বাস করি, তুমি অনেক কিছুই শুনছ ও দেখছ বলে ভাবছ, এমনকি সেই শোনা ও দেখার ব্যাপারে তুমি খুবই নিশ্চিত, কিন্তু তোমার কল্পনার বাইরে সে সবের কোন অস্তিত্ব আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আর তোমার কল্পনা যে নিরংকুশ সেকথা তুমিও জান, আমিও জানি।"

আবার পাল্টা জবাবে আমি কিছু না বুঝেই বলে উঠলাম, "তুমি কি তাহলে মনে কর যে এসবই আমি বানিয়ে বলছি? না কি আমাকে কোন ওঝা দেখাতে হবে?"

"আঃ, চল, চা খাবে চল।"

"চা! ওতে বুঝি সব রোগ সারে—এমন কি তরুণ পাগলামী পর্যন্ত!"

ভুরু তুলে একবার তাকিয়ে এলেন, রান্নাঘরে ঢুকল। একপাত্র কড়া চা বানিয়ে একটা পেয়ালা আমার সামনে রেখে টানা থেকে দুটো কালো-সবুজ ক্যাপসুল বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

"ও দুটো কি?" আমি শুধালাম।

"ঘুমের ওষুধ।"

"আমার ঘুমের ওষুধের দরকার নেই। ধন্যবাদ।"

"জ্যানেট, তোমার মনটা বেহালার তারেব মতো টান টান হয়ে আছে। এতে মন একটু শান্ত হবে, আর কোন ক্ষতিও করবে না। দোহাই তোমার।"

"ঠিক আছে। তুমি যদি খুশি হও তো নিচ্ছি।"

বাকি দিনটা চুপচাপ কাটালাম। তার মানে, এলেন ও রব্‌বির সঙ্গে সারাক্ষণ থাকলাম, পেট ভরে খেলাম, দূরদর্শন দেখলাম, আর আড্ডা দিলাম। ভিতরে ভিতরে মনটা কিন্তু টান-টান হয়ে কাঁপতেই থাকল।

সেই রাতে বেশ খেয়াল করে বাতিটা নেভালাম, হাতটা কম্বলের নিচে ঢুকিয়ে নিলাম, কিন্তু পুনরায় জেগে দেখলাম, এলেন ঝুঁকে পড়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল, আর আমার হাতটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল।

পরদিন প্রাতরাশের পরে সে সম্পর্কে কোনরকম উচ্চবাচ্য না করে দুর্গটার বাকি অংশগুলি দেখতে উপরে উঠে গেলাম।

কেমন যেন ভয়-ভয় করছে। অথচ যেরকম একটা অদ্ভুত দুর্গ দেখা আমার সারা জীবনের শখ এটা তো ঠিক সেই রকম দুর্গ। অথচ এখানে এসে কেবলই ভয় পাচ্ছি, কিছুই ঠিক উপভোগ করতে পারছি না। আসলে মুস্কিলটা হচ্ছে ; প্রথম দিন সন্ধ্যায় এলেন যখন ভেবেছিল যে রব্‌বি আমার মালপত্র নিয়ে উপরে উঠে আসছে তখন তার পায়ের শব্দ শোনা ছাড়া আর কোন কিছুই আমি ছাড়া অপর কেউ দেখছেও না, শুনছেও না। তাহলে কি আমারই কোন গোলমাল ?

তখনই মনে পড়ে গেল ফটকের কথা। সে ঘটনার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে এলেন ও রব্‌বি ব্যাপারটাকে মন থেকে মুছে ফেলেছে, কিন্তু আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। এলেনের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে পরে আমিও লক্ষ্য করেছি, মাত্র একটা ফটক দিয়েই গাড়ি ঢুকতে পারে, বাকি কোন ফটকই দুই ফুটের বেশি চওড়া নয়। তাহলে, আমি ভিতরে ঢুকেছিলাম কেমন করে ?

অনেক পায়ের দৌড়ে যাবার শব্দে আমার দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল। চমকে দেখলাম, একটা আবছা মূর্তি আমার পাশ দিয়ে চলে গেল, তারপর আর একটা ; দু'জনের মুখেই ছেলেমানুষি খিল্ খিল্ হাসি। বারান্দা বরাবর একটা দরজা খুলে আবার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল ; গভীর নৈঃশব্দ আবার আমাকে ঘিরে ধরল।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি দেওয়ালের পাশ দিয়ে এগোতে লাগলাম ; পিঠটাকে সব সময়ই দেওয়ালের গায়ে সেঁটে রেখে চললাম যাতে একটা কিছু সব সময়ই আমার পিছনে থাকে। একটা দরজা পেয়ে পাগলের মতো হাতলটা ঘোরাতেই সেটা সবেগে খুলে গেল, আর আমি সটান বেরিয়ে যেতেই আবার সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমি ভুল দরজা খুলেছি। আলোকিত বারান্দার বদলে একটা সরু ঘোরানো সিঁড়িব মাথায় পৌঁছে গেছি। পাথরের দেওয়ালের গায়ে একটি মাত্র ফোকর দিয়ে যেটুকু আলো আসছে সেটাও মাঝখানের স্তম্ভটায় ঢাকা পড়ায় পাঁচ পায়ের বেশি নজরই চলছে না। সভয়ে পিছু হটে গেলাম, কিন্তু দরজাটা খুলল না। সেটা সম্পূর্ণ নিশ্চল।

ভয়ে মুখ দিয়ে চিৎকারও বের হল না ; গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ; দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ায় ঠোঁট দুটো চেপে বসেছে। বুকের ভিতরটা ধ্বক্-ধ্বক্ করছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিন্তু পাথরের দেওয়ালের ঠাণ্ডায় বুঝি একসময় আমার ভয়ও কেটে গেল ; বুঝলাম যেমন করে হোক এখান থেকে আমাকে বের হতেই হবে।

দরজা খুলছে না ; অগত্যা যেখানেই নিয়ে যাক এই সিঁড়িটাই নির্গমনের একমাত্র পথ। বুকে সাহস এনে সেই অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলাম। চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তার মধ্যেই ধাপের পর ধাপ পার হয়ে চললাম।

শেষ পর্যন্ত আর একটা দরজা পেলাম, কিন্তু সেটা খুলতেই ইচ্ছা করল না। উপরে একটা বন্ধ দরজা, আর এই ঘোরানো সিঁড়িব শেষ প্রান্তে এক অজ্ঞাত জগৎ —এই দুইয়ের মাঝখানে আমি ফাঁদে আটকা পড়েছি।

হঠাৎ মনস্থির হয়ে গেল। উপর থেকে তালা খোলার ক্লিক ও কব্জাব ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ ভেসে এল। সামনের দরজার দিকে ছুটে গিয়ে হাত ঘুরিয়ে একটা বড পাথরের ঘবে ঢুকে পডলাম, আর শুনতে পেলাম এইমাত্র যে সিঁড়িটা আমি ছেডে এলাম কে যেন সেই সিঁডি বেযে নিচে নামছে। আমিও সেখান থেকে বের হতে ছুটাছুটি শুরু করলাম। একপ্রান্তে একজোড়া ভারী দরজা চোখে পড়ল, কিন্তু দুটোই আগা-গোড়া ভাবী হুড়কো দিযে আটকানো। এককোণে আর একট' ছোট দরজা চোখে পড়ল ; সেখানে ছুটে গেলাম, টানলাম, ধাক্কা দিলাম, লাথি মারলাম। সেটাও তালাবন্ধ।

ঘোরানো সিঁড়ির নিচে একটা ছোট দরজা দেখতে পেলাম। শব্দটা প্রায় সেখানে পৌঁছে গেছে। একটা পা দেখতে পেয়েই মুখের মধ্যে হাতটা পুবে দিযে চিৎকার করে উঠলাম।

"ঈশ্ববের দোহাই জ্যানেট, আমি!" অন্ধকার থেকে বেবিযে এল এলেন। "দরজায় তোমার ধাক্কার শব্দ শুনেই আমি তোমাকে বের করে দিতে এসেছি। এই দবজাটা সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক করে দেওযার কথাটা আমার মনে ছিল না। তালাটা ভাঙা। অনেক সময়ই ঠিক মতো কাজ কবে, আবার প্রায়ই জ্যাম হযে যায। বর্বাি বলেছে একটা নতুন তালা এনে লাগিয়ে দেবে। তুমি ঠিক আছ তো?"

"হ্যাঁ, এখন ঠিক আছি," জবাব দিলাম। "কিন্তু উপর থেকে তো তুমি আমার দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ শুনতে পার না, কারণ তখন আমি ধাক্কা মারিনি। এতক্ষণ আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। এই দরজাটায় লাথি মেরেছি ঠিকই, কিন্তু তখন তো তুমি নিচেই নেমে আসছিলে।"

"দেখ, দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দটা আমি নিশ্চয় শুনেছি। লাঞ্চের সময় যখন তোমার খোঁজ করেছিলাম তখনও শুনেছিলাম। এই হলঘরটার ভিতর দিয়েই তো মূল প্রবেশ-পথ। ঘরটাও চমৎকার। মূর্তিগুলোর গায়ের বর্ম-চর্ম আলোয় ঝিকমিক করে। আলো জ্বললেই সেটা দেখতে পাবে। সবকিছুই ঝল্‌মল্‌ করে ওঠে। ছবিগুলো সব জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু না, এসব কথা বলা বোধ হয় ঠিক হল না।"

কাঁপা গলায় বললাম, "না বললেই ভাল করতে। কিন্তু আমরা কোন্‌ পথে বের হব?"

"যে পথে এসেছি। আমিই তো ধাক্কা মেরে দরজাটা খুলেছি।"

"ওই পথেই যেতে হবে?"

"ওটাই তো একমাত্র পথ—অবশ্য তুমি যদি এখানে অপেক্ষা করতে চাও তো আমি উপরে উঠে, বারান্দা পেরিয়ে, নাচ-ঘরের ভিতর দিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে ঐ দরজাটা খুলে দিতে পারি।" এতক্ষণ যে দরজাটা খুলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম সেটাই সে হাত বাড়িয়ে দেখাল। "এই সিঁড়িটা দিয়ে বাসাবাড়ি ও নীল রংয়ের বৈঠকখানার মধ্যবর্তী বারান্দায় পৌঁছনো যায়।"

সাহস সঞ্চয় করে বললাম, "আমি...আমি তোমার সঙ্গেই যাব। কিন্তু আমরা তিনজন হলে ভাল হত।"

"কেন?"

"তাহলে আমি মাঝখানে থাকতে পারতাম।" হাল্কাভাবে হাসতে চেষ্টা করলেও গলাটা কেঁপে উঠল। "তুমি আগে যাও।"

এলেন পা বাড়াল, আর আমিও মাঝখানেই রইলাম। আবার পিছনে পা ফেলার শব্দ দু'জনই শুনতে পাচ্ছিলাম। এলেন যথারীতি সেটাকে আমাদের পায়ের শব্দ-বিভ্রম বলেই উড়িয়ে দিল, কিন্তু আমি ভাল করেই জানি যে একজন কেউ আমার ঠিক পিছনেই আসছে; তাতে আমার অস্বস্তির সীমা নেই, কিন্তু পাছে পুনরায় এলেন দৃষ্টির বাইরে চলে যায় সেই ভয়ে পিছন ফিরে তাকাতেও পারছি না।

তারপর থেকে কয়েকটা দিন আমি এলেনের পায়ে পায়েই কাটাতে লাগলাম। একবার তার সঙ্গে সঙ্গে স্নানঘরেই ঢুকে পড়েছিলাম। তাতে এলেন হাসবে কি ভুরু কুঁচকাবে তাই বুঝতে পারল না। শেষ পর্যন্ত সে আমাকে বাগানে বেড়াতে পাঠিয়ে নিজের কাজকর্মে মন দিল। আমিও বেরিয়ে গেলাম।

মূল ফটক থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে গাড়ি চলার পথের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলাম। বাতাসে আমার চুল উড়ছে; বিরাট ডগলাস ফার গাছগুলো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের বুকে উঁচু মাস্তুলের মতো প্রবল বেগে আন্দোলিত হচ্ছে। এমন সময় দুর্গের দিক থেকে একটা অস্পষ্ট চিৎকার ভেসে এল। চিৎকারটা ভাঙা-ভাঙা, কথাবিহীন, যেন বাতাসের চাবুক বক্তার মুখ থেকে কথাগুলি গড়ে ওঠার আগেই তাকে সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। মুখ ফিরিয়ে দুটো হেমলক গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, একটি মূর্তি দুর্গের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিটা পাগলের মতো হাত ছুঁড়ছে, আর আমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমানে লাফাচ্ছে। পরক্ষণেই চিনতে পারলাম।

বাতাসে ভেসে-আসা সে চিৎকার এলেনের।

"জ্যানেট...শিগ্‌গির...রব্‌বি...পা...ভেঙেছে...জ্যানেট...তাড়াতাড়ি এস..."

ছুটতে ছুটতে ফটকে পৌঁছে হাঁপাতে লাগলাম; এলেনও সবেগে উঠোন পেরিয়ে আমার দিকে ছুটে এল।

"কি হয়েছে এলেন? রব্‌বি আঘাত পেয়েছে?"

"কি বলছ জ্যানেট?"

পরস্পরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দু'জনেই থেমে গেলাম।

বললাম, "তুমি তো ছাদ থেকে আমাকে ডাকলে।"

এলেন পাল্টা বলল, "আমি তো উপরের জানালা থেকে তোমাকে দেখলাম; শুনলাম, তুমি আমাকে ডাকছ।"

"আমি তো ডাকিনি," অস্বীকার করলাম।

"আমিও ডাকিনি।"

কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্ত আমরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এলেনের বাদামী চোখে যেন অনিশ্চয়তার ঈষৎ ঝিলিক দেখতে পেলাম। সে কি যেন বলতে যাবে এমন সময় রব্‌বি সব্জি-বাগানের কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল।

চিৎকার করে বলল, "ব্যাপারটা কি? কি হয়েছে?"

দু'জনেরই দৃষ্টি রব্‌বির দিকে ঘুরে গেল।

"আচ্ছা, কি হয়েছে? তুমি ভাল আছ তো এলেন? ঈশ্বরের দোহাই, যে কেউ আমার কথার জবাব দাও। দু'জনই এমনভাবে চেঁচাচ্ছিলে কেন?"

"আমরা মোটেই চেঁচাইনি," এলেন ফিস্‌ফিস্ করে বলল।

"আঃ, বাজে কথা রাখ। আমি নিজের কানে শুনেছি। তুমি চেঁচাচ্ছ ছাদের উপর থেকে, আর জ্যানেট চেঁচাচ্ছে পথের উপর থেকে। তারপর দু'জনই আমাকে ডাকতে লাগলে। তাই তো আমি এলাম। কি হয়েছে?"

"কিচ্ছু হয়নি রব্‌বি..."

"তাহলে আমাকে ডাকলে কেন?"

আমি বললাম, "আমরা তোমাকে ডাকিনি। দু'জনই একে অপরকে ডাকতে শুনে ছুটে এসেছি। এখানে দেখা হতেই জানতে চেয়েছি ব্যাপার কি। কিন্তু আমরা কাউকে ডাকিনি; না তোমাকে, না অন্য কাউকে।"

"এমন তাজ্জব কথা জীবনে শুনিনি!" রব্‌বি বলে উঠল। "দেখ জ্যানেট, আমরা জানতাম তুমি এ বাড়িতে এসে অনেক কিছু শুনবে, অনেক কিছু দেখবে; এখন দেখছি সে রোগ আমাদেরও ধরেছে। আমাদের একটু কিছু গলায় ঢালা দরকার।" আমাদের দু'জনের গলায় দুই হাত রেখে সে আমাদের নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। আমাদের দু'জনকে বসিয়ে এক বোতল হুইস্কি বের করে তিনটে বড় গ্লাসে ঢালল।

সকলেই নিশ্চুপ। একসময় আমি বললাম, "আমার বোধহয় এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।"

রব্‌বি ও এলেন সমস্বরে বলে উঠল, "পাগলামী করো না জ্যানেট।" আর তাতেই নিস্তব্ধতা কেটে গেল। নানারকম বিষয় নিয়ে আমরা খোশমেজাজে গল্প শুরু করে দিলাম। এলেন একপাত্র সর্বরোগহর চা তৈরি করল, আমরা কেক ও বিস্কুট চিবিয়ে লাঞ্চের ক্ষিধের বারোটা বাজিয়ে দিলাম, রব্‌বি তার কাজে ফিরে গেল।

প্রায় দশ মিনিট ধরে আমি ও এলেন গ্লাস্‌গোর পুরনো বন্ধুদের কথা বললাম। তারপরেই একসময় কথা ফুরিয়ে গেল। এটা-সেটা বলবার পরে একসময় এলেন

মাথা তুলে গম্ভীর গলায বলল, "আচ্ছা জ্যানেট, ভূত প্রেত সম্বন্ধে তুমি কি জান ? আজেবাজে গাল-গল্প নয়, সে সম্পর্কে তোমাব সত্যিকাবেব ধারণাটা কি ?"

"কিচ্ছু না। সত্যি কিচ্ছু না। এ বিষযে অনেক পডাশুনা করেছি বটে, কিন্তু সত্যিকারের কোন অভিজ্ঞতা কখনও হযনি। ববং বলতে পারি, এই প্রথম বুঝি সে ধরনের কিছু অভিজ্ঞতা হল। তোমাকে সত্যি কথাই বলব : প্রতিটি মুহূর্তকে উপভোগ করাব আশা নিযেই এখানে এসেছিলাম, কিন্তু তার বদলে এখন দেখছি আমি ভীষণ ভয পেযে গেছি। এতকাল দুর্গ সম্পর্কে যে সব স্বপ্ন দেখেছি এ বাড়িটা ঠিক সেইবকম, তবু কল্পনাব সেই বহস্য-বোমাঞ্চেব অনুভূতি যেন খুঁজে পাচ্ছি না। শুধুই রক্ত-জমানো ভয। আর তোমাদের এই পাহাড়ি বাড়িটাকে যত ভাল লাগবে বলে ভেবেছিলাম মোটেই সেরকম লাগছে না।"

"তাই বলে তুমি এখান থেকে চলে যাবাব কথা ভাবছ না তো ?" এলেনেব কথা শুনে আমি চমকে তাকালাম ; তার চোখে মুখে ভয়ের একটা স্পষ্ট ছাপ। তাডাতাড় বললাম, "না, না, আমি তো থাকছি। দুধ ও কাগজ তো এক মাসেব জন্য বন্ধ কবে দিযে এসেছি। কাজেই এখনই ফিবে যাওযাব প্রশ্নই ওঠে না।"

পরেব সপ্তাহটা আমবা দু'জন সব সময পাশাপাশি থেকে কাটালাম ; শুধু শোবার সময যে যার ঘবে চলে যাই। কিন্তু সে যে এখনও বোজ বাতে আমার ঘরে আসে, আমাব হাতটা কম্বলেব নিচে ঢুকিযে দেয, ঘবেব আলো নিভিযে দিযে চলে যায -এসব কথা কিছু তাকে বলি না। দু'জনে মিলে ঘবদোব পবিষ্কার করি, বিছানাপত্তর বোদ্দুবে দেই, চীনামাটির বাসনগুলি ধুই, রুপোর বাসনগুলি পালিশ কবি ; এককথায, যতটা সম্ভব কাজকর্মেব মধ্যে ডুবে থাকি।

এখানে আসাব দ্বিতীয বৃহস্পতিবাব এলেন কাজেব মাঝখানে বলল, "দেখ জ্যানেট, তুমি তো এখানে কেবল থালাবাসন ধুযে সময কাটাতে আসনি, এসেছ ছুটি ভোগ করতে, এখন তো আব ভয়ের কিছুই নেই, কোনবকম আজেবাজে আওযাজও আব শোনা যাচ্ছে না, কাজেই তুমি একবার ছাদে উঠে গ্রামেব চারিদিকের দৃশ্যটা দেখে এস। তোমার খুব ভাল লাগবে।"

তার কথামতো প্রাতরাশের পবেই ছাদে উঠে গেলাম। হাটতে হাঁটতে হঠাৎ শেওলা-ঢাকা একটা পাথর চোখে পড়ল। ভাল করে নজর করতেই মনে হল, তাব উপর যেন কিছু লেখা আছে। হাঁটু ভেঙে বসে নখ দিযে শেওলা ও ময়লা সবিযে দিতেই দেখতে পেলাম, সেখানে লেখা আছে -অ্যাডাম ম্যাক্‌ভাইকার, তারিখ ১৮০৯। এখানে হঠাৎ অ্যাডাম ম্যাক্‌ভাইকাবেব নাম খোদাই কবা কেন ? সে কি এই দুর্গেরই কোন সাধারণ কর্মচারী যে ফ্রেজাব-পবিবাবের কোন মেয়েব প্রেমে পড়ে খুন হয়েছিল ? হঠাৎ মনে পডল, এলেন বলেছিল যে ১৮০৯ সালে এই দুর্গের নির্মাণকার্য শেষ হযেছিল। তাহলে কি অ্যাডাম ম্যাক্‌ভাইকার একজন রাজমিস্ত্রি ? পাথরে নিজের নাম খোদাই করে চিরস্মরণীয হয়ে থাকার বাসনা কি জেগেছিল তার মনে ? হায়বে দুরাশা !

বসে বসে এই সব ভাবছি, এমন সময় ছাদের অদূরে একজোড়া পাযেব শব্দে

চমকে উঠলাম। হেঁটে চলার শব্দ। একজন হাঁটছে ধীব, দীর্ঘ পদক্ষেপে, আর একজন হাঁটছে অস্পষ্ট পদক্ষেপে, ঈষৎ খস্‌খস্‌ শব্দ করে।

পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিযে আসছে। কানে আসছে অস্পষ্ট গুঞ্জন। তার কিছু কিছু অর্থও বুঝতে পারলাম। নরনারীর ভীরু প্রেমালাপ। একটি চুম্বনের শব্দও কানে এল। ঈষৎ আপত্তি, খুশির নিঃশ্বাস। পদশব্দ সরে যেতে লাগল।

এতক্ষণে সাহসে ভব করে উঠে দাঁড়ালাম। জুতোর গোড়ালিতে ঘসা লেগে একটা শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ভারী পায়ের শব্দ আমার দিকে এগিয়ে এল।

সরোষে বলে উঠল, "কে ওখানে? বেরিয়ে এস! মুখটা দেখাও। আমার উপর এভাবে নজর রাখা আমি বরদাস্ত করব না। বেরিয়ে এস।"

ভযে কাঁপতে কাঁপতে আমি আবও গুঁড়ি মেরে মুখটা লুকিয়ে ফেললাম। পাযের শব্দ আমার পাশে এসে থামল।

কণ্ঠস্বব আবার বলে উঠল, "কে তুমি?...কী আশ্চর্য, এইমাত্র একটা শব্দ কানে এল। অথচ কেউ কোথাও নেই! ধুত্তোর!"

পাযেব শব্দ ছাদেব বুকে মিলিযে গেল। ভযে টলতে টলতে কোনরকমে ছাদ থেকে নেমে বান্নাঘবেব বাবান্দায় পৌঁছেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিবে এলে দেখলাম, এলেন আমার উপব ঝুঁকে বসে আছে, আমার মুখে আস্তে আস্তে চাপড় মাবছে, ভযে তার মুখ সাদা হযে গেছে।

"কি হর্যেছিল জ্যানেট?"

থেমে থেমে তাকে ছাদের সব ঘটনাটাই বললাম। শুনে এলেন অসহায়ের মতো কেঁদে উঠল। চোখেব জলে তাব দুই গাল ভেসে যেতে লাগল; উলের গোলাপী জামাটা ভিজে গেল। তখন আমিই কোনরকমে উঠে বসে তাকেই পাল্টা সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। অনেক কষ্টে তার কান্না থামালাম। ভেজা রুমালটা দিয়ে বারবার মুখ মুছতে মুছতে সেও এবাব আমাকে শোনাল আর এক বিস্ময়কব কাহিনী।

"তুমি তো ছাদে উঠে গেলে। আমি ময়দাটা মাখতে বসেছি এমন সময় দরজাটা শব্দ কবে খুলে গেল। মুখ ফিবিযে দেখি, কেউ কোথাও নেই, দরজাটা বন্ধ। ভয পেলাম। বুকটা কেঁপে উঠল। তখনই শুনতে পেলাম, একটা পায়ের শব্দ টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি সবে গেলাম। একটা কিছু বাখার শব্দ হল, ডিসের ঠুক্‌ঠাক্‌ আওযাজ, মেঝের উপব চেয়ার টানার শব্দ, কে যেন চেযাবে বসল। ক্যা-চ্‌ করে একটা শব্দও হল। বান্নাঘরে আমি একা,—না, সঙ্গে এমন একজন যাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

"কিছুক্ষণ চুপচাপ। ভাবলাম, যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে যা কবছিলাম তাই করে যাওযাই ভাল। তাই আবাব ময়দাটা মাখতে বসলাম, আর তখনই হঠাৎ...হায ঈশ্বর! কি ভয়ংকর! ওঃ জ্যানেট! এখানে এসব কী ঘটছে?"

"হঠাৎ কি দেখলে? কি ঘটল?"

এলেন ঢোক গিলে বলল, "আরও কিছুটা ময়দা নেবার জন্য হাত তুলতেই

দেখি...দেখি...আরও...আরও একজোড়া হাত ময়দাটা মাখতে শুরু করেছে। আমি স্পষ্ট দেখলাম। মানে, কোন মানুষ দেখতে পেলাম না, কিন্তু ময়দার তালের উপর আঙুলের ছাপ দেখলাম, তালটাকে সুকৌশলে ওঠানো নামানো করতে দেখলাম। সে যাই হোক, কাজটা খুব ভালই জানে। আরও বুঝতে পারলাম, সে যেই হোক না কেন, দাঁড়িয়ে আছে ঠিক যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আর কালবিলম্ব না করে আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম ছাদের দিকে তোমাকে খুঁজতে। বেরিয়েই দেখি তুমি এখানে সটান মেঝেতে পড়ে আছ। জ্যানেট, আমি ভয় পেয়েছি, ভয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছি।"

বললাম, "চল, দু'জনে রব্বিকে খুঁজে দেখি। সে এলে আমরা দু'জনই অনেকটা স্বস্তি পাব।" এলেনকে ধরে তুলে দিলাম। দু'জনে চুল ও পোশাক ঠিক করছি এমন সময় এক ধাক্কায় ও-পাশের দরজাটা খুলে রব্বি এসে হাজির। তাকে দেখেই দু'জন একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলাম ; বোবার মতো হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"হচ্ছেটা কি?" সে সদর্পে বলল। আমরা তো নিশ্চুপ। সে বলল, "উনুনে কি পুড়ছে?"

"পুড়ছে?" আমি বললাম।

"হ্যাঁ, পুড়ছে। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে গল্‌গল্‌ করে ধোয়া বেরুচ্ছে। আমি বাগান থেকে দেখেছি। ব্যাপার কি?"

এলেন ও আমার মুখে তখনও কথা ফুটল না। দাত-মুখ খিঁচিয়ে রব্বি আমাদের দু'জনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। দরজাটা খুলতেই একটু মিষ্টি-মিষ্টি পোড়া দম বন্ধ করা ধোঁয়া এসে আমাদের নাকে লাগল।

"আমার পুডিং।" চেঁচিয়ে বলে উঠল এলেন। দু'জনই ছুটে গেলাম।

রব্বি সবগুলি জানালা কপাট খুলে দিল। আমরা দু'জন তোয়ালে নেড়ে ঘন ধোঁয়া বের করে দিতে লাগলাম। টেবিলটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সভয়ে আর্তনাদ করে উঠে এলেন আমাকে জড়িয়ে ধরল। মাখানো ময়দাটা সুন্দর করে টেবিলের একপাশে সাজানো রয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, টেবিলটা কেউ পরিষ্কার করে রেখেছে, ময়দা-মাখার বড় পাত্রটাকে ধুয়ে-মুছে রেখেছে। এলেন ও আমি ভূত-দেখার মতো সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম। রব্বি অবশ্য অবাক হবার মতো কিছুই দেখতে পেল না।

"উনুনে কি চাপানো আছে?" সে শুধ'ল। যাই থাকুক সেটা এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সপাটে দরজাটা খুলে সে উনুনের উপর থেকে ট্রে-ভর্তি পুডিংগুলো নামিয়ে আনল। ততক্ষণে সব পুড়ে আংরা হয়ে গেছে।

"তুমি এখনও ইলেক্‌ট্রিক কুকার ব্যবহার করতেই শেখনি?" রেগুলেটারে ৬৫০ ডিগ্রি দেখিয়ে সে হাসতে হাসতে বলল।

তাড়াতাড়ি রেগুলেটারের সুইচটা ঘুরিয়ে দিয়ে এলেন বিড়বিড় করে বলল, "আমি তো কুকার জ্বালাইনি। নিশ্চয় সে জ্বালিয়েছে।"

"কে ? জ্যানেট ?" রব্‌বি মুচকে হাসল। "জ্যানেট কারমাইকেলকে পুডিং বানাতে দেওয়া তোমার উচিত হয়নি।"

"না। জ্যানেট নয়; ও তো তখন ছাদে ছিল। আমি বলছি যে ময়দা মাখতে বসেছিল তার কথা।" বলেই এলেন আবার কাঁদতে শুরু করে দিল।

স্বামী এলেনকে শান্ত করতে লাগল। সেই ফাঁকে এলেন আমাকে যা যা বলেছিল, আর আমি নিজে যা কিছু শুনেছি সব তাকে বললাম।

সে কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটেই হাল্কাভাবে নিল না। বলে উঠল, "ব্যাপারটা ক্রমে হাসি-ঠাট্টার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমি জানতে চাই, এসব রহস্যময় ঘটনার জন্য কে দায়ী ?" রব্‌বি আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, "শোন রব্‌বি, আমি নিজেই ভয় পেযে গেছি। একটু-আধটু ঠাট্টা-তামাশা আমি পছন্দ করি তা ঠিক, কিন্তু তাই বলে এরকমটা কখনও করি না। আমি তো বুঝতেই পারছি না এসব কেন হচ্ছে আব আমি এখানে আসার পর থেকেই বা কেন হচ্ছে। আমি তো এখান থেকে চলে যেতেই চেযেছিলাম; তোমরা যদি চাও..."

বিষন্নভাবে ঘাড নেডে রব্‌বি বলল, "না, না, তুমি এখান থেকে চলে যাও সেটা আমি চাই না জ্যানেট। শুধু আগাগোডা ব্যাপারটাই কিছু বুঝতে পারছি না; কেবলই মনে হচ্ছে এসব কিছুর নাটের গুরু একজন কেউ আছে। কে সে ? আমি...আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না জ্যানেট, তুমিও যে কতখানি ভয় পেযেছ তা তো আমি দেখেছি!"

অন্য সব রাতের মতোই সেদিন রাতেও এলেন আমার ঘরে এল, আমার উপর ঝুঁকে পড়ে আলো নিভিয়ে দিল, আমার ঠাণ্ডা হাতটা ঢেকে দিল। যথারীতি সকালে সে বিষয়ে আমি কোন কথাই বললাম না। কিন্তু সেদিন এলেনকে যেন একটু মেজাজে দেখতে পেলাম। রব্‌বি বেরিযে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমাকে শুধাল, তাদেব শোবার ঘরে আমি কেন গিয়েছিলাম, আর ঘরের আলোটাই বা জ্বালানো ছিল কেন ? আমি নীরবে তার দিকে তাকালাম।

অবশেষে বললাম, "এ কথা রব্‌বি জানে ?"

"না; তাকে বলিনি; এ নিযে তাকে আর বিরক্ত করতে চাইনি। কিন্তু ব্যাপারটা কি ? তুমি কি ঘুমের মধ্যে হাঁটছিলে, না কি কোন কিছু দেখে ভয় পেয়েছিলে ? আমার তখন এত ঘুম পেয়েছিল যে তোমাকে কোনরকম সাহায্যই করতে পারিনি; সেজন্য দুঃখিত। এখন সব ঠিক আছে তো ?"

"আছে। সব ঠিক আছে, শুধু কাল রাতে তোমাদের ঘরে আমি যাইনি।"

"নিশ্চয় গিয়েছিলে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম তুমি আমার উপর ঝুঁকে আছ, তারপর বাতিটা নিভিয়ে দিলে।"

"ঠিক যেরকম এখানে আসার পর থেকে প্রত্যেকটি রাতে তুমি আমার উপর ঝুঁকে পড়ে বাতিটা নিভিয়ে দাও। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, প্রথম দিন সকালেই

কথাটা তোমাকে বলেছিলাম? তারপর থেকে প্রতিটি রাতেই কিন্তু সেটা ঘটেছে। এসব কথা তোমাকে বলিনি তার কারণ প্রথমতো তুমি বা বর্ব্রি কেউই আমার কথা বিশ্বাস করতে না, আর দ্বিতীয়ত তুমিও যখন এই সব শুনতে আরম্ভ করলে তখন তোমার ভয়কে আরও বাড়াতে আমি চাইনি। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে কাল রাতে তোমাদের ঘরে আমি যাইনি।"

তারপর দু'জনে চুপচাপ প্রাতরাশের বাসনগুলি ধুলাম; এলেন যথারীতি রান্নার কাজে মন দিল, আর আমিও উপরে উঠে গেলাম। আমার ঘরটা পরিষ্কার করে খানকয়েক চিঠি লিখতে বসলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে শেষ চিঠির খামটা জিভ দিয়ে ভিজিয়ে আটতে আটতে নিচে নেমে রান্নাঘরে গেলাম এলেনকে দেখতে। এ কি! এলেন মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, ময়দা, ডিম সব চারদিকে ছড়ানো। তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে তার মুখ ও গলা মুছে দিলাম। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল। চোখের পাতা খুলল, কিন্তু আমাকে চিনতে পারল না। বরং আরও জোরে কাঁদতে লাগল, আর সভয়ে আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আর্তকণ্ঠে বর্ব্রিকে ডাকতে লাগল। তাকে শান্ত করতে তার গালে চাপড় দিলাম, শেষ পর্যন্ত আর্তনাদ থামিয়ে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, আর হিক্কা তুলতে তুলতে দুর্বল গলায় ডাকতে লাগল, "বর্ব্রি, বর্ব্রি, আমাকে বাড়ি নিয়ে চল। ও বর্ব্রি ... বাড়ি নিয়ে চল।"

"কি হয়েছে এলেন? কি হয়েছে?"

"আমাকে বাড়ি নিয়ে চল বর্ব্রি, দোহাই তোমার, আমি বাড়ি যেতে চাই।" এর বেশি কিছু তার থেকে বের করা গেল না। তার ভেঙে পড়া দেহটাকে কোনরকমে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রেখে বর্ব্রির খোজে বেরিয়ে গেলাম। অনেক খুঁজলাম, অনেক ডাকাডাকি করলাম, কোথাও তার দেখা পেলাম না। ওদিকে এলেনকে একা রেখে এসেছি। কি করব বুঝতে না পেরে বাগানের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় একটা ঘন ঝোপের আড়াল থেকে ফোপানির আওয়াজ কানে এল। ভয় পেলাম। ব্যাপারটা অলৌকিক কিছু নয়, মানুষের কণ্ঠস্বর, ঝোপের আড়ালে কে যেন কাঁদছে।

কান্নার শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম। ঝোপটার গোলক ধাঁধা পেরিয়ে হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখলাম, ভয়ার্ত শিশুর মতো কাঁদতে কাঁদতে বর্ব্রি অন্ধের মতো ঝোপটাকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তার মুখটা লাল, চোখ দুটো ফুলে উঠেছে। নাম ধরে ডাকতেই সে ধীরে [illegible] মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখেই কর্কশ, তারস্বরে চিৎকার করে উঠেই অজ্ঞান [illegible] পড়ে গেল।

[illegible] হতভম্ব। কি করি এখন? কয়েক মিনিট বর্ব্রির জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে [illegible]; কোন ফল হল না। তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। [illegible] ফিরে গিয়ে গ্রামের ডাক্তারকে টেলিফোন করলাম।

[illegible] এসে পৌঁছবার আগেই শিকাররক্ষক জিম কের এর সাহায্যে তাকে

কোনরকমে রান্নাঘরে নিয়ে গেলাম। এলেন তখনও সেই একইভাবে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে, আর বারবার বাড়িতে নিয়ে যেতে বলছে। দু'জনেরই আকস্মিক আতংকের দরুন প্রাথমিক চিকিৎসা করে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। তারপর ডাক্তার আমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাইলেন।

"বলুন তো মিস্..."

"কারমাইকেল।"

"...মিস্ কারমাইকেল, ওদের কি হয়েছিল সে বিষয়ে কিছু কি জানতে পেরেছেন?"

"না ডাক্তার। আপনি এসে যেরকম দেখেছেন, আমিও সেইভাবেই পেয়েছি।"

"আপনার কি ধারণা?"

"একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারছি। আসলে, যা ঘটেছে সেটাই আপনাকে বলতে পারি, যদিও সেটা যে ঠিক কি তা আমিও জানি না।"

"দয়া করে সব কথা খুলে বলুন মিস্ কারমাইকেল।"

গত কয়েকদিনের অদ্ভুত ঘটনাগুলি তাঁকে পরপর বলে গেলাম। শুনতে শুনতে তিনি থুতনিতে হাত বুলোতে বুলোতে গম্ভীর মুখে কি যেন ভাবলেন।

বললেন, "অদ্ভুত কথা তো মিস কারমাইকেল, সত্যি খুব অদ্ভুত। এ দুর্গে তো আগে কখনও কোন অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যায়নি। কখনও না। বাড়িটা বহু প্রাচীন হলেও একে ঘিরে কোন গল্প কখনও প্রচারিত হয়নি। দুর্গ প্রায় দুই শতাব্দীর পুরনো—মানে মূল দুর্গ, আধুনিক পরবর্তীকালে নির্মিত অংশগুলিও বেশ প্রাচীন। কিন্তু ভয় পাবার মতো কোন কিছুই কখনও এখানে দেখাও যায়নি, শোনাও যায়নি। আপনিও তো দেখছেন, এখানকার অধিকাংশ কাজের লোকই স্থানীয় বাসিন্দা, আগাগোড়াই তাই ছিল। সত্যিই কোন ভৌতিক ব্যাপার থাকলে নিশ্চয় তারা এখানে কাজ করতে রাজী হত না।"

"কিন্তু ডাক্তার, এখানে যে অদ্ভুত কিছু আছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"হুম। তাহলে আপনি বলতে চান যে একটা কিছু...মানে একটা অলৌকিক কিছু দেখেই এরা দু'জন আলাদা আলাদাভাবে ভয় পেয়েছেন?"

"তাছাড়া অন্য কিছু আমি ভাবতেই পারি না।"

"আচ্ছা মিস কারমাইকেল, তাহলে কি জানতে পারি যে আপনি নিজে অলৌকিকে বিশ্বাস করেন?"

"অন্তত এখানে আসার পর থেকে নিশ্চয় বিশ্বাস করি।"

"মিঃ ও মিসেস ম্যাক্নিনও কি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত?"

"গোড়ায় একমত ছিল না। আসলে, আমার কথা শুনে ওরা হাসত, বলত এসবই আমার কল্পনা। কিন্তু পরে, যখন তারা নিজেরা এই সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে লাগল তখন নিশ্চয় তারাও ধরে নিয়েছে যে ঐরকম একটা কিছু এখানে আছে।"

"হুম। এরা ভাল হয়ে না ওঠা পর্যন্ত কিছুই সঠিক জানা যাবে না—হয় তো

তখনও জানা যাবে না। যাই হোক, খুব জরুরি না হলে আমি এদের হাসপাতালে পাঠাতে চাই না; এ অবস্থায় দীর্ঘ পথযাত্রায় এদের ক্ষতিই হবে। এদের পাঠাতে হবে ইন্‌ভার্নেস-এ; আপনি তো জানেন, সেটা ১৫০ মাইলেরও বেশি দূরের পথ। গ্রাম থেকে একটি নার্স পাঠিয়ে দিচ্ছি; সেই এদের দেখাশুনা করবে। আর সকালে উঠেই আমি আবার এসে এদের দেখে যাব।"

সকালের দিকে এলেন অনেকটা সেরে উঠল, কিন্তু রব্‌বির অবস্থা আরও সংকটের দিকে মোড় নিল। ঘুমের ওষুধের ঘোরটা কেটে যেতেই সে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগল: ডাঃ স্ট্র্যাদার্ন, নার্স ম্যাক্‌ফি ও আমি। তার চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে, কম্বলের নিচে গুড়িসুড়ি মেরে অবিরাম গর্জন করছে। আমাদের কোন কথাতেই কোন কাজ হল না; আতঙ্কগ্রস্ত শিশুর মতো সে অবিরাম কাঁদছে, কাঁদছে, আর ছোট শিশুর মতোই দুর্বল হাতের ঘুষি পাকিয়ে সকলকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে।

রব্‌বিকে ভাল করে পরীক্ষা করে ডাক্তার স্ট্র্যাদার্ন বললেন, "এর অবস্থা আমার সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। এবার একে হাসপাতালে পাঠাতেই হবে। ফিরে গিয়েই সব ব্যবস্থা করছি মিস্ কারমাইকেল। আপনি বরং যতটা পারেন মিসেস ম্যাক্‌কিননের কাছ থেকে ব্যাপারটা জেনে নিতে চেষ্টা করুন। কিন্তু স্বামীর অবস্থার কথা ওঁকে কিছুই বলবেন না; শুধু বলবেন, তিনিও একটা 'শক' পেয়েছেন, এবং তাঁকে এখনও ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। মিসেস ম্যাক্‌কিননকে আরও বলবেন, তিনি যেন বিছানাতেই শুয়ে থাকেন: ডাক্তারের হুকুম।"

এলেনকে ভালভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললাম, "সব কথা আমাকে খুলে বল এলেন। দেখবে, কথাগুলো বলতে শুরু করলেই তুমি অনেক ভাল বোধ করবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এলেন বলল, "ঠিক আছে, সবই তোমাকে বলব। তোমার নিশ্চযই মনে আছে, আমাকে রান্নাঘরে রেখে তুমি বেরিয়ে গেলে। তুমি ছাদে চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই উনুনের ভিতর থেকে একটা ট্রে বের করতে যেই উপুড় হয়েছি অমনি পিছনে ঢোক গেলার শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকালাম। একটি স্ত্রীলোক হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বলে উঠল, "এই তো একটা ভূত!" ক্রমে আরও অনেকে দেখা দিল; মনে হল, তারা যেন কুয়াশার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। মোট চারটি স্ত্রীলোক, দু'জন বয়স্কা, একজনের বযস বিশ বছর, অন্যজন নেহাৎ বালিকা, বয়স বছর পনেরো। বয়স্কা দু'জন ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে; ছোট মেয়েটির তো বিকারের অবস্থা; কিন্তু অপর মেয়েটি অকুতোভয়। আমার দিকে সোজা তাকিযে সে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন মাকাইভার ঠাকরুণ, এটা একটা ভূত।'

"ঠিক তখনই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল তিনটি পুরুষ। সকলেরই পরনে গাঢ় সবুজ রংয়ের পোশাক, তাতে সোনালী কুঁচি দেওয়া। আমাকে দেখে তারা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতেই

হঠাৎ পিছিয়ে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'এ তো ভূত!' আমি? একটা ভূত! আসলে তো ওই লোকটা এবং অন্য সকলেই ভূত!

"তখনও আমি ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। কি যে করব ঠিক বুঝতে পারছি না। দরজার দিকে যেতে হলে ওদের ভিতর দিয়েই যেতে হবে। সেটা সাহসে কুলোল না। সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আর 'ভূত-ভূত' করে চেঁচাচ্ছে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। সব সংযম হারিয়ে ফেললাম। ডিমের বাক্সটা টেনে নিয়ে একটার পর একটা তাদের মাথা লক্ষ্য করে ছুড়তে লাগলাম। আমার লক্ষ্য নির্ভুল কিন্তু সবগুলি ডিমই যেন তাদের শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। ডিম শেষ হলে পেয়ালা-পিরিচ, হাঁড়ি-কুড়ি যা হাতের কাছে পেলাম তাই ছুড়তে লাগলাম। তাও ফুরিয়ে গেল, তারা একে একে আমাকে ঘিরে ফেলল। সকলেই আঙুল বাড়িয়ে আমাকে খোঁচা দিতে লাগল, আমি হাসতে হাসতে কেঁদে ফেললাম। আর্তনাদ করতে লাগলাম।...ওঃ, জ্যানেট, সে এক অসহ্য ভয়ংকর অবস্থা। মনে হল, আমি বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছি। আর তারপরেই আমি জ্ঞান হারালাম।

"জ্যানেট, এ অবস্থা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এখন আমি আর কিছু চাই না, শুধু গ্ল্যাস্‌গোতে ফিরে যেতে চাই। কোথায় যাব তা জানি না, কিন্তু এখানে আর একমুহূর্তও নয়।"

সব কথা শুনে ডাঃ স্ট্র্যাদার্ন বললেন, "হুম। কি জানেন মিস্‌ কারমাইকেল, প্রেততত্ত্ব নিয়ে আমি অনেক পড়াশুনা করেছি। ভূতের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি। আমি মনে করি, ভূতরা সব অতৃপ্ত আত্মা: যে যেখানে মারা যায়, কোন না কোন সূত্রে তারা সেখানেই বাঁধা পড়ে, আর সেই বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আশায় ছটফট করে।"

এলেন বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু ডাঃ স্ট্র্যাদার্ন, তাহলে এত দীর্ঘদিন তাদের এ দুর্গের কোথাও দেখা যায়নি কেন? আর কেনই বা জ্যানেট এখানে আসার পর থেকেই তাদের আনাগোনা এভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে?"

"মিসেস ম্যাক্‌কিনন, আমার ধারণা, নতুন করে তাদের এই আবির্ভাবের কারণ হয়তো এ দুর্গের পরিবেশের এমন কোন পরিবর্তন হয়েছে, এমন কিছু ঘটেছে যার হদিস আমরা রাখি না, এবং যার ফলে তারা নতুন করে আত্মপ্রকাশের শক্তি ফিরে পেয়েছে।"

তবু আমি প্রশ্ন করলাম, "কিন্তু এর মধ্যে কি এমন ঘটেছে যার ফলে..."

আমাকে বাধা দিয়ে ডাঃ স্ট্র্যাদার্ন বলে উঠলেন, "বলেছি তো মিস্‌ কারমাইকেল, সেটা আমরা কেউ জানি না। তবে আমি যতটুকু জানি, অনেক প্রেতাত্মা দীর্ঘকাল ধরে যেখানে আটকা পড়ে আছে, কোনক্রমে কোন নতুন প্রেত-শক্তি যদি সেখানে আবির্ভূত হয় তাহলে তারা নতুন উৎসাহে, নতুন শক্তিতে নিজেদের মুক্তিলাভের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। হয় তো..."

আমি লক্ষ্য করলাম, এলেনের চোখে-মুখে ক্রোধ ও তাচ্ছিল্য যেন মুহূর্তের জন্য ঝিলিক দিয়ে উঠল। আর ঠিক তখনই ডাক-পিয়ন একগাদা চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকল।

লোকটি চলে গেলে এলেন চিঠিগুলোর উপর চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ একটা খাম খুলে পড়তে শুরু করে দিল। তার চোখেমুখে ফুটে উঠল বিস্ময় ও আতঙ্ক। পরক্ষণেই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে হাঁ করে আমার দিকে তাকাল। তার কম্পিত আঙুলের ফাঁক দিয়ে চিঠিটা মেঝেতে পড়ে গেল। আমি তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে আর্তকণ্ঠে একটা চিৎকার করেই জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

ডাঃ স্ট্র্যাদার্ন চিঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে লাগলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "হা ঈশ্বর! এ যে দেখছি যা ভেবেছি ঠিক তাই!" তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর মুখখানা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে গেছে। পকেট থেকে একটা বড় সোনার ক্রুশ বের করে সেটাকে ডান হাতে বুকের উপর চেপে ধরে বাঁ হাতে তিনি চিঠিটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর দুটি হাতই থর্‌থর্ করে কাঁপছে।

হাতের লেখাটা খুবই পরিচিত হলেও প্রথমে আমি ঠিক ধরতে পারিনি।

"প্রিয় এলেন ও রব্‌বি।

জ্যানেট যে তোমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারেনি তার কারণ তোমাদের জানাতে এত বিলম্ব হল বলে আমি দুঃখিত।"

চিঠি পড়ে আমি তো অবাক। থেমে গেলাম। আমি পৌঁছতে পারিনি? অকস্মাৎ বুঝতে পারলাম হাতের লেখাটা আমার মার। ডাক্তারের দিকে একবার তাকিয়ে আবার পড়তে লাগলাম।

"...কারণ সে তো আগেই তোমাদের লিখে জানিয়েছিল যে সানন্দেই সে তোমাদের কাছে যাবে। তোমাদের সঙ্গে একটা ছুটি কাটাবার সাধ তার অনেকদিনের।"

"তোমরা তো জান, ঠিক গোধূলির সময় জ্যানেটের দৃষ্টিশক্তি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। আমি তাকে অনেকবার সাবধান করে দিয়েছি যেন অন্ধকারে গাড়ি না চালায়, কিন্তু সে আমার কথা কানেই তুলত না; যাই হোক, সে নির্ঘাৎ পথ হারিয়ে ফেলেছিল এবং গাড়ি চালাতে চালাতেই অন্ধকার হয়ে এসেছিল, আর পথ ভুল করে ইন্‌ভার্নেস এর প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে একটা পাহাড়ি খাদের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল! পরদিন গাড়ির চাকার দাগ অনুসরণ করে পুলিশ দুর্ঘটনা-স্থলে পৌঁছে যায়। তবে ঘাড়টা ভেঙে গিয়েছিল, আর মাথার পিছনটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

"জানি আরও আগেই চিঠিটা লেখা আমার উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা পারিনি। তোমরা যদি তার অন্য বন্ধুবান্ধবীদের খবরটা জানিয়ে দাও তো আমি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করব। আমার চাইতে তোমরাই তাদের বেশি পরিচিত; তাছাড়া, তাদের যে কি লিখব তাও আমি বুঝতে পারছি না। ভালবাসা নিও।

জিন কারমাইকেল।"

ডাঃ স্ট্র্যাদার্ন তখনও বিড়বিড় করে বলছেন; "স্বর্গীয় পিতা, পুত্র ও পবিত্র প্রেতাত্মার নামে..."

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

মিঃ কেম্পি

Mr. Kempe—ওয়াল্টার ডি. লা. মেয়াব

সন্ধ্যাটা ছিল ঈষৎ ঠাণ্ডা। বীয়ার-ঘরের ঠেলা দরজাটা হাট করে খোলা। কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো পিতলের তেলের বাতিটা তখনও জ্বালানো হয়নি। গলির শেষ প্রান্তে গাছের সারি আর চুনকাম করা দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে কুয়াশার মতো ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টির ছাট বয়ে চলেছে। কাউন্টারের পাশে টুলের উপর বসে বাইরে ঝোলানো 'নীল শুয়োর'-এর সাদা বন্য চোখ দুটোর দিকে তাকিয়েছিলাম।

হেমন্তকালের নানা সুবাস, দিনশেষের পরিবেশ, অবিরাম ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টি—এ অবস্থায় স্বভাবতই মানুষের চোখে ঘুমের আবেশ নেমে আসে। চারদিকটা প্রথমে অস্পষ্ট হয়ে ক্রমে মুছে যায়; আর তারপরেই-ধীরে ধীরে নেমে আসে স্বপ্নের বিচিত্র পরিবেশ। সে অভিজ্ঞতা ক্ষণস্থায়ী তা মানি। ফুটলাইট, হেডলাইট, স্কাইলাইট— সব আলো আবার জ্বলে ওঠে। স্বপ্নের দেশ দূরে মিলিয়ে যায়।

গৃহস্বামিনী তার ঘরের পিছনকার আধা অন্ধকার আবাস থেকে মাঝে মাঝে বাইরে আসে; তাকে ছাড়া বীয়ার-ঘরে আমরা মাত্র তিনটি প্রাণী; আমি, একটি ছোটখাটো মানুষ (তার কপালটা অস্বাভাবিক রকমের উঁচু, মুখের আদল অনেকটা বাঁদরের মতো), আর পিপের আকৃতি একটি মোটা সোটা মানুষ (গায়ে পুরনো শুটিং জ্যাকেট ও পায়ে চামড়ার পট্টি; লাল নাকের দু'পাশে দুটি ছোট ছোট চোখ)।

আমি ঘরে ঢুকেছি সকলের শেষে; অবশ্য তাতে আলোচনায় কোনরকম ভাটা পড়েনি। এরকম আবহাওয়ায় তা হয় না। বরং দু'জনে যেখানে জমে না, তিনজন হলে তবু আড্ডাটা ভাল হয়।

কথায় কথায় কথা জমে উঠল। ক্রমে কার জীবনে কবে, কখন, কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে সেই আলোচনা শুরু হল। বাঁদরমুখো লোকটি বিচিত্র হাসি হেসে বলল, "তাহলে আমার কথাই শুনুন। একসময় আমি স্কুল-শিক্ষক ছিলাম। সকলের প্রশ্নের জবাব দেওয়াই তো আমার কাজের অঙ্গ ছিল। আমি একটা অদ্ভুত জায়গার কথা বলছি। জায়গাটা যে কোনকালে সপ্তাহান্তিক যাত্রী ও শৌখিন ভ্রমণকারীদের মনের মতো জায়গা হয়ে উঠবে সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষত যে সময়ের কথা আমি বলছি—আজ থেকে বিশ বছর বা তারও আগেকার কথা—সেসময় তো সেখানে ছোটখাট একটা সরাইখানাও ছিল না। ছিল শুধু এই ঘরের অর্ধেক

মাপের একটা বিয়ারের দোকান, আর যৎসামান্য কিছু বাসিন্দা—পাহাড়ের নিচে পরপর কয়েকটা জেলেদের বাড়িঘর।

"অপরিচিত জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে হাতে মানচিত্র থাকা সত্ত্বেও পথ ভুল হয়ে গেল। আমার লক্ষ্য ছিল সমুদ্রের তীর বরাবর একটা সমান্তরাল পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া; কিন্তু চৌমাথায় গিয়ে একটা ভুল পথ ধরেছিলাম। একবার পথ হারালে যা হয়, সেই ভুল পথ ধরেই চলতে লাগলাম।

"আমার অনুরোধে একটা বাড়ির জনৈকা বৃদ্ধা আমাকে চা খাওয়াতে রাজী হল। তাকেই পথের হদিস জিজ্ঞাসা করলাম। বৃদ্ধা প্রথমে আমাকে ফিরে যেতেই বলল; আমার পক্ষে সেটাই ভাল হবে। আরও কিছু প্রশ্ন করায় শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের আরও নিচে একটা পথের কথা সে জানাল। টেবিল ঢাকনার উপর বাতগ্রস্ত তর্জনীটা টেনে টেনে সে আমাকে পথের হদিসটা বুঝিয়ে দিল। সেই পথ ধরে গেলেই আমি নাকি সঠিক পথটা পেয়ে যাব।

"অবশ্য সে পথ ধরে এগিয়ে যাবার কথা সে বলল না। মোটেই না। সাত মাইলেরও বেশি দূরে সেই পথ। গ্রামের লোকরা তো দূরের কথা, আমার মতো হঠাৎ চলে আসা কোন যাত্রীও কোনদিন সে পথ মাড়ায় না।"

"কেন বলুন তো?" পায়ে পট্টি বাঁধা মোটাসোটা লোকটি প্রশ্ন করেই সবজান্তার মতো একটু কাশল।

স্কুল-শিক্ষকটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "সেই কথাতেই যাচ্ছি। কি জানেন, শেষ খবরটি দেবার সময় বৃদ্ধার চোখে একটা বিচিত্র হাসির ঝিলিক আমার চোখে পড়েছিল। মনে হল, সে আমাকে সঠিক কথা বলেনি। স্বভাবতই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে পথের দোষটা কি; তাছাড়া, সে পথের পাশে অথবা পথের শেষে এমন আকর্ষণীয় কিছু আছে কি না যাতে এত কষ্ট করে সে পথে চলাটা পুষিয়ে যেতে পারে। বৃদ্ধা পুনরায় অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখল; তারপর বলল, 'আমার তো মনে হয় আপনার হাতে মানচিত্রেও একটা পুরনো সেকেলে বাড়ি দেখানো রয়েছে।'

"তা অবশ্য ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দীর্ঘদিনের ব্যবহারের ফলে আমার হাতের মানচিত্রটার দু'একটা অস্পষ্ট ইংরেজী অক্ষর ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না; শুধু তাই নয়, আধ বর্গ মাইল জায়গাই সম্পূর্ণ মুছে গেছে।

"বৃদ্ধার কাছ থেকে আসল সত্যটা জেনে নেওয়া খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। সে বাড়িটা দেখাশুনা করার কোন লোক সেখানে থাকে কি না জানতে চাইলে প্রথমে তো বৃদ্ধা মুখই খুলল না; অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর শেষ পর্যন্ত বলল, 'দেখুন স্যার, অতটা পুরনো না হলেও পাশেই আরও একটা বাড়ি আছে, আর সেখানে মিঃ কেম্‌পি নামক একজন ভদ্রলোক বাস করেন।'

"মিঃ কেম্‌পির কথা ওঠার পরে ব্যাপারটা অনেক সহজ হল। একমাত্র ভজনালয়টি ছাড়া তীরভূমিসহ গোটা অঞ্চলটাই অতি প্রাচীনকাল থেকে তাদেরই পরিবারের সম্পত্তি।

মিঃ কেম্‌পি এককালে গির্জারই লোক ছিলেন; কিন্তু তার ছিল পথ চলার বাতিক। যাই হোক, অনেককাল আগে পঙ্গু স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একদিন বাড়ি ফিরলেন।

"মিসেস কেম্‌পি মারা গেছেন; তাঁদের কোন সন্তানও ছিল না। মিঃ কেম্‌পিও কিছুদিন অসুখ-বিসুখে ভুগলেন, এবং—আমাকে যে খবর দিয়েছে তার মতে—একদিন হয়তো তিনিও মারা গেলেন। বৃদ্ধার নিষ্প্রভ চোখে আবার যেন একটা রহস্যের ঝিলিক খেলে গেল—মনে হল বৃদ্ধা যেন বিশ্বাস করে যে মিঃ কেম্‌পি মৃত্যুকে জয় করার কোন পথ আবিষ্কার করেছেন। যাই হোক, আর কিছুই বৃদ্ধাটি জানে না; সে পথে এখন কেউ চলাফেরা পর্যন্ত করে না। আরও উপরে একটা নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে সাধারণের যাতায়াতের জন্য। তাছাড়া, আর একটা কথা জানা গেল। মিঃ কেম্‌পি নির্জন নিঃসঙ্গ জীবনের অবসানের সংবাদে গ্রামবাসীদের মনের উপর কোনরকম শোকের ছায়া পড়েনি।

"পড়ন্ত বিকেল নেমে এল; সেই বাতাসহীন গ্রীষ্মের আবহাওয়ায় পথ চলাটা মোটেই সুখকর ব্যাপার নয়। ক্লান্ত হয়েও পড়েছিলাম। আমি চাইলেই সেই বৃদ্ধার সমুদ্রের দিকে মুখ-করা একখানি দোতলার ঘর দু'এক রাতের জন্য পেতে পারি। তবু সরু সিঁড়িটা বেয়ে তার সঙ্গে উপরে উঠতে-উঠতে স্থির করলাম, মিঃ কেম্‌পির খোঁজে আমাকে যেতেই হবে। দরকার হলে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসব।...ঘর ভাড়া বাবদ পাঁচ শিলিং তার হাতে দিলাম; বৃদ্ধা ম্যান্টেলপিসের উপরকার একটা অলংকারের নিচে সেটা রেখে দিল। আমি যতদূর জানি, সে পাঁচ শিলিং এখনও সেখানে আছে। আর কোনদিন আমি সেটা দাবি করিনি।"

পায়ে পট্টি বাধা লোকটি আবার স্কুল-শিক্ষকের দিকে মুখটা ফেরাল, কিন্তু এবার কোন মন্তব্য করল না।

"মিঃ কেম্‌পির দেখা পেয়েছিলেন?" আমি শুধালাম।

স্কুল শিক্ষকটি হাসল; তাকে যেন আগের চাইতেও একটি মানবপ্রেমিক বাঁদরের মতো দেখাল।

"সঙ্গে সঙ্গে পথে নেমে এলাম; বৃদ্ধা ফটকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল; হাত নেড়ে বিদায়-সম্ভাষণ জানালাম। পথের বাঁকে মোড় ঘুরতেই বৃদ্ধা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। কাঁটা ঝোপ ও এঁদো ডোবার পাশ দিয়ে গেলেও রাস্তাটা চিনতে আমার ভুল হয়নি।

"কয়েক শ' গজ যাবার পরেই রাস্তাটা সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে; মাইলখানেকের মতো সমুদ্রের সম-উচ্চতায় চলতে চলতে রাস্তাটা ঢুকে গেছে একটা সংকীর্ণ বালুকাময় গুহার মধ্যে—গ্রীষ্মকালেও সমুদ্রের ঢেউয়ে যত রাজ্যের আজেবাজে জিনিস সেখানে এসে জমা হয়েছে; শীতকালে যখন ঝড় ওঠে তখন যে এ গুহা কিরকম মূর্তিমান ধ্বংসের রূপ নেয় সেটা সহজেই কল্পনা করা যায়। গুহাটার মুখের কাছে গিয়ে সংকীর্ণ পথের উপর থেকে চাকার দাগগুলি সহসা মিলিয়ে গেছে, আর রাস্তাটা একটা পাহাড়ি নালার পাশ দিয়ে ও কয়েকটা অ্যাশ গাছের নিচ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে

মাপের একটা বিয়ারের দোকান, আর যৎসামান্য কিছু বাসিন্দা—পাহাড়ের নিচে পরপর কয়েকটা জেলেদের বাড়িঘর।

"অপরিচিত জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে হাতে মানচিত্র থাকা সত্ত্বেও পথ ভুল হয়ে গেল। আমার লক্ষ্য ছিল সমুদ্রের তীর বরাবর একটা সমান্তরাল পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া; কিন্তু চৌমাথায় গিয়ে একটা ভুল পথ ধরেছিলাম। একবার পথ হারালে যা হয়, সেই ভুল পথ ধরেই চলতে লাগলাম।

"আমার অনুরোধে একটা বাড়ির জনৈকা বৃদ্ধা আমাকে চা খাওয়াতে রাজী হল। তাকেই পথের হদিস জিজ্ঞাসা করলাম। বৃদ্ধা প্রথমে আমাকে ফিরে যেতেই বলল; আমার পক্ষে সেটাই ভাল হবে। আরও কিছু প্রশ্ন করায় শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের আরও নিচে একটা পথের কথা সে জানাল। টেবিল ঢাকনার উপর বাতগ্রস্ত তর্জনীটা টেনে টেনে সে আমাকে পথের হদিসটা বুঝিয়ে দিল। সেই পথ ধরে গেলেই আমি নাকি সঠিক পথটা পেয়ে যাব।

"অবশ্য সে পথ ধরে এগিয়ে যাবার কথা সে বলল না। মোটেই না। সাত মাইলেরও বেশি দূরে সেই পথ। গ্রামের লোকরা তো দূরের কথা, আমার মতো হঠাৎ চলে আসা কোন যাত্রীও কোনদিন সে পথ মাড়ায় না।"

"কেন বলুন তো?" পায়ে পট্টি-বাধা মোটাসোটা লোকটি প্রশ্ন করেই সবজান্তার মতো একটু কাশল।

স্কুল শিক্ষকটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "সেই কথাতেই যাচ্ছি। কি জানেন, শেষ খবরটি দেবার সময় বৃদ্ধার চোখে একটা বিচিত্র হাসির ঝিলিক আমার চোখে পড়েছিল। মনে হল, সে আমাকে সঠিক কথা বলেনি। স্বভাবতই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে পথের দোষটা কি; তাছাড়া, সে পথের পাশে অথবা পথের শেষে এমন আকর্ষণীয় কিছু আছে কি না যাতে এত কষ্ট করে সে পথে চলাটা পুষিয়ে যেতে পারে। বৃদ্ধা পুনরায় অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখল; তারপর বলল, 'আমার তো মনে হয় আপনার হাতে মানচিত্রেও একটা পুরনো সেকেলে বাড়ি দেখানো রয়েছে।'

"তা অবশ্য ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দীর্ঘদিনের ব্যবহারের ফলে আমার হাতের মানচিত্রটার দু'একটা অস্পষ্ট ইংরেজী অক্ষর ছাড়া আর কিছুই বোঝা যাচ্ছে না; শুধু তাই নয়, আধ বর্গ মাইল জায়গাই সম্পূর্ণ মুছে গেছে।

"বৃদ্ধার কাছ থেকে আসল সত্যটা জেনে নেওয়া খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। সে বাড়িটা দেখাশুনা করার কোন লোক সেখানে থাকে কি না জানতে চাইলে প্রথমে তো বৃদ্ধা মুখই খুলল না; অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর শেষ পর্যন্ত বলল, 'দেখুন স্যার, অতটা পুরনো না হলেও পাশেই আরও একটা বাড়ি আছে, আর সেখানে মিঃ কেম্পি নামক একজন ভদ্রলোক বাস করেন।'

"মিঃ কেম্পির কথা ওঠার পরে ব্যাপারটা অনেক সহজ হল। একমাত্র ভজনালয়টি ছাড়া তীরভূমিসহ গোটা অঞ্চলটাই অতি প্রাচীনকাল থেকে তাদেরই পরিবারের সম্পত্তি

মিঃ কেম্‌পি এককালে গির্জারই লোক ছিলেন; কিন্তু তাঁর ছিল পথ চলাব বাতিক। যাই হোক, অনেককাল আগে পঙ্গু স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একদিন বাড়ি ফিরলেন।

“মিসেস কেম্‌পি মারা গেছেন; তাঁদের কোন সন্তানও ছিল না। মিঃ কেম্‌পিও কিছুদিন অসুখ-বিসুখে ভুগলেন, এবং —আমাকে যে খবর দিয়েছে তাব মতে --একদিন হয়তো তিনিও মারা গেলেন। বৃদ্ধার নিষ্প্রভ চোখে আবার যেন একটা রহস্যের ঝিলিক খেলে গেল—মনে হল বৃদ্ধা যেন বিশ্বাস করে যে মিঃ কেম্‌পি মৃত্যুকে জয় করার কোন পথ আবিষ্কার করেছেন। যাই হোক, আর কিছুই বৃদ্ধাটি জানে না; সে পথে এখন কেউ চলাফেবা পর্যন্ত করে না। আরও উপরে একটা নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে সাধারণের যাতায়াতের জন্য। তাছাড়া, আর একটা কথা জানা গেল। মিঃ কেম্‌পি নির্জন নিঃসঙ্গ জীবনের অবসানের সংবাদে গ্রামবাসীদের মনের উপর কোনরকম শোকের ছায়া পড়েনি।

“পড়ন্ত বিকেল নেমে এল; সেই বাতাসহীন গ্রীষ্মের আবহাওয়ায় পথ চলাটা মোটেই সুখকর ব্যাপার নয়। ক্লান্ত হযেও পর্ডেছিলাম। আমি চাইলেই সেই বৃদ্ধার সমুদ্রের দিকে মুখ-করা একখানি দোতলার ঘর দু’এক রাতের জন্য পেতে পারি। তবু সরু সিঁড়িটা বেযে তার সঙ্গে উপরে উঠতে-উঠতে স্থির করলাম, মিঃ কেম্‌পির খোঁজে আমাকে যেতেই হবে। দরকার হলে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসব।...ঘর ভাড়া বাবদ পাচ শিলিং তার হাতে দিলাম; বৃদ্ধা ম্যান্টেলপিসের উপরকার একটা অলংকারেব নিচে সেটা বেখে দিল। আমি যতদূর জানি, সে পাঁচ শিলিং এখনও সেখানে আছে। আব কোনদিন আমি সেটা দাবি করিনি।”

পাযে পট্টি-বাধা লোকটি আবার স্কুল-শিক্ষকেব দিকে মুখটা ফেরাল, কিন্তু এবার কোন মন্তব্য করল না।

“মিঃ কেম্‌পির দেখা পেযেছিলেন?” আমি শুধালাম।

স্কুল-শিক্ষকটি হাসল; তাকে যেন আগের চাইতেও একটি মানবপ্রেমিক বাঁদরের মতো দেখাল।

“সঙ্গে সঙ্গে পথে নেমে এলাম; বৃদ্ধা ফটকে দাঁড়িযে আমাব দিকে তাকিযে রইল; হাত নেড়ে বিদায়-সম্ভাষণ জানালাম। পথের বাঁকে মোড় ঘুবতেই বৃদ্ধা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। কাঁটা ঝোপ ও এদো ডোবার পাশ দিযে গেলেও রাস্তাটা চিনতে আমাব ভুল হযনি।

“কযেক শ’ গজ যাবার পরেই রাস্তাটা সমুদ্রের দিকে নেমে গেছে; মাইলখানেকের মতো সমুদ্রের সম উচ্চতায় চলতে চলতে রাস্তাটা ঢুকে গেছে একটা সংকীর্ণ বালুকাময় গুহার মধ্যে- গ্রীষ্মকালেও সমুদ্রের ঢেউয়ে যত বাজ্যের আজেবাজে জিনিস সেখানে এসে জমা হযেছে; শীতকালে যখন ঝড় ওঠে তখন যে এ গুহা কিরকম মূর্তিমান ধ্বংসেব রূপ নেয সেটা সহজেই কল্পনা করা যায়। গুহাটাব মুখের কাছে গিযে সংকীর্ণ পথেব উপব থেকে চাকার দাগগুলি সহসা মিলিযে গেছে, আর রাস্তাটা একটা পাহাড় নালার পাশ দিয়ে ও কয়েকটা অ্যাশ গাছের নিচ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে

হঠাৎই ডান দিকে বাঁক নিয়ে সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। সেখানে "ওরিয়ন" নামক আলকাত্‌রা-মাখানো একটা পরিত্যক্ত নৌকো পাথরে ভর্তি হয়ে পড়ে আছে। ওই পরিবেশে সেটাই সভ্যজগতের সঙ্গে আমার শেষ যোগসূত্র।

"শান্ত সন্ধ্যাবেলা। গাছের সবুজ পাতা ও ঘাস নিঃশব্দে চিকচিক করছে, ফুলগুলি বোঁটার উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীল আকাশের নিচে; যেন মোমের ভিতর থেকে খোদাই করে তোলা হয়েছে। মিষ্টি বাতাস বইছে; তাতে সমুদ্রের স্পর্শ লেগে আছে। সেখানে বসে ঘাসের শিস চিবুতে চিবুতে একটু বিশ্রাম নিলাম; সম্মুখে সমুদ্র যেন বন্ধুর মতো কোল পেতে আছে। তারপর আবার চলতে শুরু করলাম।

"প্রায় এক ঘণ্টা একটানা হাঁটার পরে রাস্তাটা আবার উঁচুতে উঠতে লাগল। যদিও চোখে দেখতে পাচ্ছি না এবং জোয়ারের শব্দও কানে আসছে না, তবু পথটা সমুদ্রতীরের দিকেই চলেছে। দু'দিকে পরিত্যক্ত ঘন জঙ্গল। বাতাসে একটা পাখি বা কীটপতঙ্গের শব্দও ভেসে আসছে না। আমি যেন চলেছি এক কুমারী অরণ্য অঞ্চলকে আবিষ্কার করতে।

"এগিয়ে চলেছি। আমার ঠিক কতটা উপরে উপত্যকাটা আছে, আর সমুদ্রই বা রয়েছে কতটা নিচে, কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারছি না —যদিও মাঝে মাঝেই সমুদ্রের রূপোলি বিস্তার ও সুদূর দিগন্তটা চোখে পড়ছে। যে রাস্তা ধরে চলেছি সেটাকে পথ বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয়। যত উপরে উঠছি রাস্তাটা ততই প্রস্তরাকীর্ণ ও পা ফেলার অনুপযুক্ত হয়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে ঠিক উপরকার কয়েকটা খাড়া জায়গার মোড় ঘুরে যেতেই আমার পিছনে দেখা দিল সাগর সৈকতের এক অপূর্ব দৃশ্য, যদিও আমার সামনেটা তখনও অরণ্যের অন্ধকারে অস্পষ্ট।

"ছোট গ্রামটা ইতিমধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে। যে খাড়া পাহাড়টার শেষ প্রান্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি তার প্রায় দেড়শ' ফুট নিচে কিছু কাঁটা-ঝোপ ও কয়েকটা বেঁটে ওক গাছের ভিতর দিয়ে জোয়ারের জল পাহাড়ের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে।

"হাতের মানচিত্রখানাতে আর একবার চোখ বুলিয়ে একটা লম্বা শ্বাস টেনে আবার হাঁটতে লাগলাম। ধীরে ধীরে উপরে উঠছি: এবার ভিতরের দিকে; প্রায় উত্তর-পশ্চিমে। দুই ধারে আবার ঘন গাছপালার জঙ্গল; বাতাসে ক্লোরোফর্মের মতো একটা চাপা সুগন্ধ। নিশ্চয় সাম্প্রতিককালে এখানে একটা শীতকালীন ঝড় অথবা বিষুবরেখা-অঞ্চলীয় ঘূর্ণিবার্তা বয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই আমাকে ঝড়ে-পড়া বড় বড় গাছ পার হয়ে পথ চলতে হচ্ছে; সে সব গাছের শাখায় ফুটে আছে "মরণোত্তর" বিবর্ণ সবুজ পুষ্প কোরক। এ যেন এ জগৎ ও পরবর্তী জগতের মধ্যবর্তী এক সীমান্ত অঞ্চল।

"সামুদ্রিক ঝড়ের এই সব চিহ্ন ছাড়াও যে সব পাখি এখানে চোখে পড়ছিল সে সবই শিকারী-পাখি: প্রধানত বাজপাখির দল; তারা যেন মহাশূন্যের বুকে এক-একটা সুতোয় ঝুলছে; কম্পমান দুটি পাখার মাঝখানে দেখা যাচ্ছে তাদের উদ্যতচঞ্চু তীক্ষ্ণ মুখ। একবার যেন একটা কাকের কণ্ঠস্বরও কানে এল। মিনিট কুড়ি

পরেই উঁচু পাড়ের উপর থেকে দ্বিতীয়বার সমুদ্রকে দেখতে পেলাম। সেদিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ালাম।

"সেখানে যে সত্যিকারের কোন বিপদ বা বিপদের ঝুঁকি ছিল তা অবশ্য ঠিক নয়। যেকোন শৌখিন পর্বতারোহীর পক্ষেও এ অভিযান ছেলেখেলারই সামিল। পাহাড়ের একেবারে শেষ প্রান্ত দিয়ে চলা এই পথে অগ্রসর হতে হলে উপরে বা নিচে না তাকিয়ে নড়বড়ে পাথরগুলোর উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে ঠিকমতো পা ফেলতে পারলেই হল। যেকোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই কাজটা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব। তবু হঠাৎই আমার মনে পড়ে গেল, এসব অঞ্চলে যারা বেড়াতে আসে তার উপরে উঠতে হলে অন্য একটা পথ ধরেই অগ্রসর হয়ে থাকে। অতি উত্তেজনাটা সুখের ব্যঞ্জনে মশলার বাড়াবাড়িও তো ঘটাতে পারে।"

পায়ে পট্টি-বাধা লোকটি প্রশ্ন করল, "খুবই খাড়া বুঝি?"

স্কুল শিক্ষক জবাব দিল, "হ্যাঁ, খাড়া; অবশ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে দোষ ধরবার মতো কিছু নয়। নীল সবুজের ছোপ লাগা একখণ্ড সীমাহীন পাতের মতো লীগের পর লীগ সমুদ্র অস্পষ্ট দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। একটা গাঢ় রক্তিমাভা ছড়িয়ে পড়েছে পূবের আকাশে।

"বারে বারেই সেই অসীম অনন্তের দিকে তাকিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি, আর ভাবছি ফিরে যাই। কিন্তু যে রহস্যময় কুটিরটির কথা অনেকের মুখে শুনেছি, তাকে দেখবার কৌতূহল এবং নিজেকে আর একটি অক্ষম পর্যটক প্রমাণ করার লজ্জাই যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। আবার নির্জনতারও একটা অদৃশ্য আকর্ষণ আছে; সেও মানুষকে টানে। পায়ের চাপে যখনই একটা আল্‌গা পাথর খসে গিয়ে নিচের সীমাহীন গহ্বরের মধ্যে ছিটকে পড়ছে তখনই তার তলা থেকে কাঁটার মতো লেজওয়ালা একটা বিশেষ ধরনের পতঙ্গ উড়তে উড়তে বেরিয়ে আসছে। সেগুলিকে বাদ দিলে সেই নির্জন অঞ্চলে আমিই একমাত্র জীবিত প্রাণী। সতর্ক পদক্ষেপে আবার এগিয়ে চললাম। কিন্তু ভরসা পেলাম না, সন্ধ্যায় গভীর নৈঃশব্দ্য আমার মনে জাগিয়ে তুলল একটা অবাস্তবতা ও নিঃসঙ্গতার অনুভূতি। আমার জগৎটা যেন একটা ছবিতে পরিণত হল আর সে ছবিতে আমি একান্তই অবাস্তব। মনে হল আমি বুঝি কোন ভুল জায়গায় এসে পড়েছি, আর সকলেই আমাকে ভুলে গেছে।

"চলতে চলতে একসময় পাহাড়ের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা সংকীর্ণ পথে গিয়ে পৌঁছলাম। একপাশে পায়ের দু' তিনশো ফুট নিচে সমুদ্র; অপর পাশে একেবারে কনুই ঘেঁষে উঠে গেছে অমসৃণ পাথরের দেওয়াল প্রায় শ'খানেক ফুট উপরে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি এক নিঃসঙ্গ পথিক। উপরে ও নিচে ঝড়ো-হাওয়ায় ক্ষয়ে-যাওয়া পাথরের বুকে অ্যাশ্‌ ও বার্চ গাছের ঝোপ, জঙ্গলের বাতাস ও ঢেউয়ের কানাকানি। আমি অসহায়।

"বিমূঢ়ভাবে মনটাকে হাসি খুশি রাখতে চেষ্টা করলাম- এমনকি একবার শিস্‌ দিতেও চাইলাম। কিন্তু আমার ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে; নিঃশ্বাস নিতে পারলাম

না; সব সাহস হারিয়ে ফেললাম। তবু সে সংকীর্ণ গিরি-পথে আরও গজ বিশেক এগোতেই হঠাৎ যেন নিজের সমূহ বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলাম। এখন আর ফিরে যাওয়া অসম্ভব, আর এই সংকীর্ণ পথের ওপাশে কি আছে তাও অজানা। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন আমার অস্থি মজ্জা ও স্নায়ু বিদ্রোহ করে উঠল; তারা যেন আর তিলমাত্র অগ্রসর হতেও নারাজ। কোনরকম দুই হাতে পাহাড়টাকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"কিন্তু হেমন্তকালের মাছির মতো এভাবে তো দীর্ঘকাল পাহাড়ের গায়ে লেপ্টে থাকা চলে না। গাঢ় অন্ধকারে মাত্র এক ঘণ্টা সময়; একঝলক ঝড়ো হাওয়া আমাকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে কে জানে। রাতের অন্ধকার নামতে এখনও কয়েক ঘণ্টা বাকি; সন্ধ্যাবেলাটা মৃত্যুর মতো শান্ত স্তব্ধ; আমার কপাল ভাল যে আকাশের জ্বলন্ত সূর্যটা আমাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে না। ভাগ্যকে সেজন্য ধন্যবাদ দিলাম--কিন্তু কাল রাতে আবার যখন ঐ দূর আকাশের তারারা দেখা দেবে তখন সারাদিনের রোদে জ্বলে-পুড়ে আমার এই দেহ-খাঁচাটা কোথায় থাকবে? মুহূর্তের মধ্যে এই সব চিন্তা আমার মনের মধ্যে রয়ে গেল। এখন আমার একমাত্র প্রয়োজন আত্মসংযম। সেটা বুঝতে কষ্ট হল না। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এল; শরীর বেয়ে ঘাম ঝরতে লাগল; আতঙ্কে ভেঙে পড়ল মন। দৃঢ় প্রত্যয় জাগল--চারদিকের এই জনহীনতার মধ্যেও একটা স্থির দৃষ্টি যেন আমার উপর দৃঢ়নিবদ্ধ— কেউ যেন আমার উপর নজর রেখেছে।"

পুনরায় আমাদের বন্ধুটি তার আসনে নড়েচড়ে বসল।

স্কুল শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আমিও স্বীকার করি যে কথাটা অবাস্তব শোনাচ্ছে। কারণ কিছু সাগর পাখি ও মেঘ ছাড়া সেখানে তখন আমিই একমাত্র চলমান বস্তু! তবু আমার সে প্রত্যয় যে মিথ্যা নয় অচিরেই তার প্রমাণ পেলাম। সত্যি কেউ আমাকে সারাক্ষণই দেখছিল; আর সেরকম এক জোড়া তীক্ষ্ণ, অমানুষিক চোখ আমি কখনও কোন মানুষের মুখে দেখিনি।

"অসীম সতর্কতার সঙ্গে আবার পা চালিয়ে দিলাম। পথটা ক্রমেই সহজতর হয়ে এল; ন্যাড়া পাহাড়ের বদলে দেখা দিল মাটি; একটু পরেই পথের ঘাস ও শ্যাওলার উপর মানুষের পায়ে চলার চিহ্ন দেখতে পেলাম; দেখতে পেলাম জুতোর কাঁটার দাগ।

"তাহলে তো এই নিঃসঙ্গ পথের শেষেই আছে সঙ্গী। ভিজে মাটিতে কাঁটা মারা জুতোর দাগ দেখেই বুঝতে পারলাম, এই জুতোর মালিক সাম্প্রতিককালেই অন্তত তিনবার এই পথ ধরে যাতায়াত করেছে। তাহলে আর ভয় কিসের? তবু কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। সেই একান্ত নির্জন পথের বুকে দাঁড়িয়েও ওই পদচিহ্নের মালিকের সঙ্গে সাক্ষাতের তিলমাত্র বাসনাও আমার মনের মধ্যে খুঁজে পেলাম না।

"যাই হোক, আরও প্রায় আধ ঘণ্টা পথ চলার পরেই আমাকে থামতে হল। সামনেই 'একটা অতি প্রাচীন জীর্ণ' বাড়ি: ঠিক যেরকম আমার মানচিত্রে দেখানো

ছিল। দৃশ্যটা মোটেই আশাপ্রদ নয়। খানিকটা খোলা জায়গার পরেই বাড়িটার কালো দেওয়াল উঠে গেছে। বাড়িটার আকৃতি গোল; একসময় নিশ্চয় পথের পাশে কোন আশ্রম বা আশ্রয়স্থল ছিল। বাড়িটা পাথরেব তৈরি, ভারী পাথরের চাঁই দিয়ে গড়া...ছাদ। ছাদের দক্ষিণ দিকে একটা ছোট ঘণ্টা ঘর, আর পূর্ব দিকে পাথরের একটা বেঁটে ক্রুশ-চিহ্ন; তাব একটা হাত ভাঙা।

"খিলানওয়ালা গোল দরজাটা কিছুতেই খুলল না। চাবির গর্তটা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। ছোট্ট জানালাটাও আমার নাগালের বাইরে। বাড়িটা যে কতদিনের পুরনো তাও বুঝতে পারলাম না। মাঝে মাঝেই ভেঙে পড়েছে, আর কোন রকমে জোড়াতালি দিযে কিছুটা মেরামতও করা হয়েছে।

"দেওয়ালেব দক্ষিণ দিকে একটা পরিত্যক্ত কবরখানা। কবরের সংখ্যা খুবই অল্প; ঢাকনার পাথরগুলোতে একটিমাত্র নাম কোনরকমে পড়া যায়। পুরো বাড়িটাকে একনজরে ভাল কবে দেখবার জন্য কিছুটা পিছিযে এসে দাঁড়াতেই মিঃ কেম্‌পির উপস্থিতিটা জানতে পারলাম। কয়েক পা দূরেই তিনি দাঁড়িযে আছেন; দৃষ্টিটা আমাব দিকে। 'ম্যাকবেথ' নাটকের ব্যাংকোর ভূতের মতোই একটি অপ্রত্যাশিত প্রেতমূর্তি যেন। এত নিঃশব্দে তার আবির্ভাব ঘটেছে যে একটা ববিন পাখিও সেবকম নিঃশব্দে এসে হাজির হতে পাবত না। গাছের একটা ডাল ভাঙেনি, একটা পাতার খস্‌খস্‌ শব্দও হযনি।

"লোকটির বয়স বছর ষাট; পুরনো একটা কাল্‌চে-সবুজ পাদরীব পোশাক পরনে; মস্ত বড় বুটের উপব ঢিলে ট্রাউজাবটা ঝুলে পড়েছে; মাথায একটা অত্যন্ত সেকেলে খড়ের কালো টুপি। পাকা চুলেব গোছা বিবর্ণ মুখেব দু'পাশে ঝুলে পড়েছে; একমুখ জট-বাঁধা দাড়ি। চোখ দুটি জলেব মতো স্বচ্ছ - পাতা দুটি অস্বাভাবিক রকমের খোলা; সে চোখেব দৃষ্টি যে কোন্‌দিকে কার উপব নিবদ্ধ সেটাও বোঝা দুষ্কর। তবে তিনি যে আমাকেই দেখছিলেন সেটা বুঝতে কষ্ট হয না, কাবণ তাঁর মুখটা আমার দিকেই ফেরানো। একাগ্র দৃষ্টিতে দু'জনকে দেখতে লাগলাম; শুধু কযেক মুহূর্তের জন্য নয়, মনে হল যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

"আমিই সে নিস্তব্ধতা ভাঙলাম; আবহাওয়া ও চারদিকের ধ্বংসস্তূপ সম্পর্কে কিছু কথা বললাম। প্রত্যুত্তবে যে কণ্ঠস্বব কানে এল সেটা স্বযং মিঃ কেম্‌পির চাইতেও বিস্ময়কর। মনে হল বুঝি অব্যবহাবেব ফলে তার গলায় মরচে ধরেছে; পাতলা কাঁচে চিড় ধরার মতো একটা কাঁপা আওয়াজ। প্রথমে তার কথা বুঝতেই পারলাম না। তার কণ্ঠস্বর শুনে আমাব মনে পড়ে গেল আলেকজান্ডার সেল্‌কার্কের সেই সময়কার অবস্থার কথা যখন তার উদ্ধারকাবীরা জুয়ান ফার্নান্ডেজ দ্বীপে তাকে খুঁজে পেয়েছিল। আপনাদের নিশ্চযই মনে আছে যে তাঁরা বলেছিল, আলেকজান্ডার সেলকার্ক তখন তার কথাগুলি অর্ধেক অর্ধেক মাত্র উচ্চাবণ করেছিল। মিঃ কেম্‌পিও তাই করলেন। এক অজ্ঞাত সন্ন্যাসীর যে ভজনালয়ের পাশে আমাদের দেখা হয়েছে, ঠিক

তারই মতো প্রাচীন একটি চিহ্নর ভগ্নস্তূপ থেকেই যেন তার কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছিল।

"তথাপি আমি যেন বিড়ালের মতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। লোকটির বিস্ফারিত বিবর্ণ চোখ, অঙ্গভঙ্গি, অতি উচ্চ কণ্ঠস্বর— সবকিছু যত অদ্ভুতই হোক তার মধ্যে কোন বিদ্বেষ ছিল না, অসৌজন্যের প্রকাশ ছিল না, অনধিকার প্রবেশকারী রূপেও তিনি আমাকে কোন তিরস্কার করেননি; বরং যেভাবে তিনি শূন্যে আঙুল নাড়তে লাগলেন তাতে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে তিনি ইশারায় আমাকে ডাকছেন। অবশ্য তার সঙ্গে যাবার কোন ইচ্ছা আমার হয়নি। তখনও আমি তাকে দেখেই সময়টা কাটিয়ে দিতে লাগলাম। সময় কাটাবার জন্য আর একবার ভজনালয়টির বয়স ও স্থাপত্য সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করলাম— শেষ পর্যন্ত সরাসরি জানতে চাইলাম, ভিতরটা একবার দেখা যেতে পারে কি না।

"তিনি আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না, বরং পাল্টা জানতে চাইলেন, কেমন করে আমি এই নির্জন অঞ্চলে এসেছি। বুঝলাম, তিনি আমার সঙ্গে চাতুরি করছেন, কারণ কিভাবে আমি এখানে এসেছি সেটা তো তার কাছে অজানা থাকবার কথা নয়; তার চোখ তো আগাগোড়াই আমার উপরে ছিল।

"তবু তাকে জানালাম যে আমার পথটা 'গোলাপে ঢাকা ছিল না,' রাত নেমে আসার আগেই আমি ফিরে যেতে চাই, আর এই আশ্চর্য ধ্বংসস্তূপটা ভাল করে দেখার বাসনা ছাড়া আমার এখানে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্যই নেই। তার দৃষ্টি একবার পাথরের আশ্রমটির দিকে ঘুরেই আবার ফিরে এসে আমার হাতের উপরে পড়ল। এ ছাড়া তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন সম্পূর্ণ নিশ্চুপ।

"বাতাস ফুল-পাতার গন্ধে আমোদিত; এমন যাদুকরী অন্ধকারেও চারদিক এত পরিষ্কার যে মনে হল এ বুঝি এক স্বপ্নপুরী। তবু আমার পাশে দাঁড়ানো লোকটির উপর সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাকে ঘিরে এমন একটা আলোর ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে যাকে ঠিক বর্ণনা করা যায় না। মনে হয়, লোকটি বুঝি তার দেহকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে—জানি, এ সবই উদ্ভট কথা। কথায় বলে না—তিনি যেন ঠিক এখানে নেই। আবার আমাদের চোখাচোখি হল; পরমুহূর্তেই আমার মনে হল, কখনও কোন মানুষের মুখে এরকম তীব্র ক্ষুধার প্রকাশ আমি দেখিনি। কিন্তু কিসের ক্ষুধা? সে কথা বলা অসম্ভব।

"তিনি আমাকে বার বার তাকে অনুসরণ করতে বললেন। 'চাবি' কথাটাও একবার কানে এল; সঙ্গে সঙ্গে তিনি এগিয়ে গেলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার পিছন ফিরে তাকালাম—পাথরের প্রাচীন একটা গুহা; বনস্পতি পাইনের সারি; সবুজ ঘাসে-ঢাকা কিছু স্তূপ— তারপর তার পথেই পা ফেললাম। তিনিও পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে উৎসাহের হাসি হাসলেন।

"পাশ-কপালিওয়ালা যে বাড়িটার দিকে তিনি আমাকে নিয়ে চললেন তাতে দেওয়ালের চাইতে জানালার সংখ্যাই বেশি; নিচু গম্বুজ ও ধোঁয়াহীন চিমনিগুলোর

উপর অস্তসূর্যের শেষ আলো এসে পড়েছে। তার পিছনেই খাড়া হয়ে উঠে গেছে পাহাড়ের প্রাচীর; আর একটুখানি সবুজের মাঝখানে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে প্রেতাত্মা পরিত্যক্ত একটা মমির মতো।

"পাথর বাঁধানো উঠোনটা পার হলাম। আমার আগে আগে মিঃ কেম্প্‌পি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠে নিচু ছাদের একটা ঘরে ঢুকলেন। ঘরটাতে আইভি-লতায় ঢাকা একটিমাত্র জানালা, আর মেঝেটা পাথরের। দেওয়ালে কোন তরুণীর একটিমাত্র অস্পষ্ট প্রতিকৃতি ঝুলছে; তাছাড়া বাকি সবটাই বইয়ের তাকে ঠাসা। চারদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে শুধু বই আর বই; টেবিলে, চেয়ারে, মেঝেতে, সর্বত্র বই-বাঁধার চামড়ার গন্ধ।

"ইশারায় আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে অপর একটা চেয়ারের উপর থেকে বইপত্র সরিয়ে গৃহস্বামী নিজে বসলেন। ঘরটা নিশ্চয় দুপুরবেলাতেও অন্ধকার হয়ে থাকে; গোটা বাড়িটাই তো অন্ধকার। আমরা ঘরে ঢোকার পরেও দরজাটা খোলাই রইল, তার ওপাশেই নিস্তব্ধ সিঁড়িটা!"

এতক্ষণে স্কুল শিক্ষকটি থামল। "নীল-শুয়োর" এর মালকিন আর একবার তার ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে এল; আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনজনই তিনটে গ্লাস কাউন্টারের উপর ঠেলে দিলাম।

"তারপর কি হল?" আমি শুধালাম।

পায়ে পটিওয়ালা লোকটি তার কচ্ছপের মতো মাথাটা আমার দিকে একটুখানি ঘোরাল মাত্র।

স্কুল শিক্ষকটি মালকিনের অপসৃয়মান শরীরটার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আবার বলতে শুরু করল। "মিঃ কেম্প্‌পি কথা বলতে লাগলেন। প্রথমে অতিদ্রুত এবং প্রায় অসংলগ্ন, কিন্তু ক্রমেই তার কথার গতি কমে এল এবং কথাগুলিও মোটামুটি বোধগম্য হয়ে উঠল। বললেন, তিনি একজন নিঃসঙ্গ সংসার-বিবাগী; ভজনালয়টি জনসাধারণের সাধন-ভজনের স্থান নয়; তার কাছে লোকজন বড় একটা কেউ আসে না; তিনি একজন বিদ্যার্থী; কাজেই পুঁথিপত্র ছাড়া অন্য কোন সঙ্গীর কোন প্রয়োজনও তাঁর নেই। লম্বা হাতটা বাড়িয়ে তিনি তাঁর অবসরক্ষণের সঙ্গীদের দেখালেন। তারপরই হঠাৎ কথার স্রোত থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে কেউ সেখানে পাঠিয়েছে কি না। আমি জোরের সঙ্গেই তাকে বললাম যে আমি স্বেচ্ছায় সেখানে এসেছি এবং ভজনালয়ে ফিরে যাবার আগে তিনি আমাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন কি না। তিনি ইতস্তত করতে লাগলেন।

বার বার বললেন, "জল? ওঃ, জল?" তারপরই অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে ঘরটা পার হয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। টমটমের উপর ছড়ির শব্দের মতো সিঁড়িতে তাঁর বুটের শব্দটা কেমন যেন ফাকা শোনাল। দরজায় ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল; মুহূর্তকাল পরে তিনি ঘরে ঢুকলেন; হাতে নীল বর্ডার টানা,

হাতলওয়ালা একটা পেয়ালা। মাথার উপরকার ছবিটার দিকে একবার তাকিয়ে একচুমুকে বরফ-ঠাণ্ডা জলটা খেয়ে পেয়ালাটাকে দুটো বইয়ের মাঝখানে রেখে দিলাম।

"আমি উপরের রাস্তাটায় ফিরে যেতে চাই," চেঁচিয়ে বললাম।

মনে হল তিনি যেন আশ্বস্ত হলেন। মুখ বন্ধ করে বসে বসে আমাকে দেখতে লাগলেন। "ওঃ, উপরের রাস্তাটা।"

"কিন্তু কেন?" যেন আমি অনেক দূরে বসে আছি এমনিভাবে হঠাৎ তিনি গলা চড়িয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন। ভাঁজ-করা দুই হাঁটুর উপর হাত দুটো চেপে রেখে তিনি সোজা হয়ে বসলেন।

"কেন কি?"

"কেন তুমি এখানে এসেছ? এখানে গোয়েন্দাগিরি করার কি আছে? এটা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তুমি কি কর - মানে খাওয়া জোটে কি করে? এসব করে লাভটা কি?"

আচরণটা অস্বাভাবিক বিশেষ করে দু'জন অপরিচিত লোকের মধ্যে। তবু ব্যাপারটা মেনেই নিলাম। বয়সে তিনি আমার চাইতে অনেক বড়। বললাম, "আমি একজন স্কুল শিক্ষক, এখন ছুটিতে আছি। নেহাৎ ঘুরতে ঘুরতেই এখানে এসে পড়েছি।"

"ঘুরতে ঘুরতে! আর আপনি একজন শিক্ষক!" চোয়াল শক্ত করে তিনি চিৎকার করে উঠলেন। "কি শেখান আপনি? ভুরি ভুরি মিথ্যে কথা বোধ হয়, না কি যতসব বাজে ঘটনা।" লম্বা, বিবর্ণ মুখের উপর থেকে হাতটা নামালেন। আমার চোখ দরজার দিকে। তিনি বলতে লাগলেন, "মানুষ যদি যন্ত্রমাত্র হত তো বেশ হত। কিন্তু ওগো আমার যুবক বন্ধু, মানুষ তো যন্ত্রমাত্র নয়। তাদের দেহে যদি আত্মা বলে কিছু থাকে, তাহলে? ধর, তোমার দেহে একটি আত্মা আছে: তাহলে? আহা, তার প্রমাণ! প্রমাণ!"

স্কুল শিক্ষকের বাঁকা ঠোঁটে স্মিত হাসি ফুটে উঠল। বলতে লাগল, "সে সন্ধ্যায় আমাদের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার হুবহু বিবরণ আমি দেব না। শুধু সারাংশটাই বলছি। তার জীবনে ছিল শুধু একটি লক্ষ্য, চিন্তা ও কামনা। অবসর জীবনের সবগুলি বছর তিনি কাটিয়েছেন একটিমাত্র অনুসন্ধানে—মানুষের যে একটি আত্মা আছে সেটি প্রমাণ করতে। আরও কিছু সময় পরে আমার মনেও কিছু কিছু সন্দেহের উদয় হয়েছিল, কিন্তু প্রথম থেকেই একটা কথা আমি পরিষ্কার বুঝেছিলাম যে এই অনুসন্ধানের কাজে তিনি কাউকে রেহাই দেননি—না নিজেকে, না মৃতা স্ত্রীকে। আরও বুঝতে পেরেছিলাম যে উন্নততর মস্তিষ্কের অধিকারী হলে এরকম একটা বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালানো যায় তা তার ছিল না।

"টেবিলের উপর রাখা ফুলস্কেপ কাগজে লেখা পাণ্ডুলিপির কয়েকটি অধ্যায় তিনি আমার হাতে গুঁজে দিলেন—পাণ্ডুলিপির স্তূপটা অন্তত আঠারো ইঞ্চি উঁচু তো হবেই। পাঠ্যবস্তুই বটে। পৃষ্ঠার উপরের দিকের কালি ঝাপসা হয়ে গেছে; চায়ের দাগ লেগেছে।

পুঁথিব সংক্ষিপ্ত নাম 'আত্মা'—অবশ্য পবে যেসব শিবোনাম বসানো হযেছে সেগুলি কোন 'শাবীববিদ্যা'ব লেখকেব অনুপযুক্ত হত না।

"সেই উদ্ভট হস্তাক্ষবেব দু' একটি পংক্তিব বেশি আমি একসঙ্গে পডতে পাবিনি। প্রতিটি পৃষ্ঠায বড বেশি কাটাকুটি কবা হযেছে, পাববর্ধন ও পবিবর্জন কবা হযেছে; শুধু যে পেন্সিলে তাও নয, বেগুনি আব লাল কালিও ব্যবহাব কবা হযেছে। বেশিব ভাগই লেখা হযেছে লাতিন, হিব্রু ও অন্য কিছু অপ্রচলিত ভাষায। এলোমেলোভাবে কযেকটা পাতা ওল্টাতেই পৃষ্ঠা-শিবোনাম হিসাবে 'ধ্যান', 'স্বপ্ন', 'আত্ম নিগ্রহ', 'মৃতদেহ,' 'শৈশব', ইত্যাদি শব্দগুলি চোখে পডল। যদিও পাণ্ডুলিপি দেখেই কোন গ্রন্থেব গুণাগুণ বিচাব কবা উচিত নয, তবু আমি পাণ্ডুলিপিব পাতাগুলিকে সাবধানে টেবিলেব উপব বেখে দিলাম।

"তিনি মনেব সুখে সব কথা বলতে লাগলেন। এই সাধনাব পথে তিনি নিজে যে কষ্ট সযেছেন তাব চাইতেও জীবনেব শেষ কটি বছব মিসেস কেম্‌পিব অবস্থাব কথা ভেবেই আমি মন দিযে তাব কথাগুলি শুনতে লাগলাম। মহিলাটি নিশ্চয ধীবে ধীবে মৃত্যুব পথে এগিযে গিযেছিলেন। যতদূব বুঝতে পাবলাম, ছোট বাগানটিব পবিচর্যা কবতে এবং অতি সাধাবণ আহার্য প্রস্তুত কবতে যেটুকু সময লাগত, তাছাডা বাকি সময়টা তিনি কখনও মিসেস কেম্‌পিকে ছেডে যেতেন না। বেচাবিব দেহটা ধীবে ধীবে ক্ষয হযে যাচ্ছে, আব দিনেব পব দিন মিঃ কেম্‌পিব প্রাত্যহিক প্রশ্নাবলী, প্রাত্যহিক পবীক্ষা জববী ও বেপবোযা হযে উঠেছে।

"তাই বলে এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট বৃদ্ধ লোকটি যে তাব স্ত্রীকে ভালবাসতেন সে বিষযেও কিন্তু কোন সন্দেহ নেই। স্ত্রীব মৃত্যুশয্যায তাদেব দু'জনেব মধ্যে যে কথোপকথন হযেছিল তাব বিববণ দিতে গিযে বৃদ্ধেব দু'টি শূন্য চোখেব দৃষ্টি যেবকম আবেশে নবম হযে এসেছিল তাতেই আমি পেযেছিলাম তাদেব ভালবাসাব প্রমাণ।

"মিসেস কেম্‌পিব শেষ সমযকাব দু' একখানি ফটোও তিনি আমাকে দেখালেন ফটোগুলি তাব সেকেলে ক্যামেবায তোলা এবং হয তো এই ঘবেই 'ডেভেলপ' কবা। আত্মাই বটে! আব কিছুই তখন অবশিষ্ট ছিল না। ফটোব আবছা মুখখানিতে ফুটে উঠেছে একটা অদ্ভুত সুন্দবেব হাসি। ফাকা দৃষ্টি পডেছে যন্ত্রটাব চামডাব টুপিটাব দিকে। বিবর্ণ কাগজেব উপব অস্পষ্ট হযে আসা মুখেব নাক ও চোখ এমনভাবে বসে গেছে যে সেটা যেকোনো ভূতেব প্রতিকৃতিও হতে পাবত।

"হঠাৎ তিনি চিৎকাব কবে বলে উঠলেন, 'তুমি বুঝতে পাববে না—তোমবা যাবা বাইবেব জগতে বাস কব তাবা কেউ বুঝতেও পাববে না—যে চবম প্রশ্ন আমাকে ছুটিযে নিযে চলেছে তাব একটা হ্যাঁ কি না জবাবেব সঙ্গে তুলনায এ পৃথিবীব কোন কিছুবই তিলমাত্র গুরুত্ব নেই। আমবা যদি মবণশীল জন্তু জানোযাবেব চাইতে বেশি কিছু না হই তো আমাদেব মৃত্যুই ভাল। স্বর্গ থেকে একটা আগুন নেমে এসে আমাদেব পুডিয়ে ছাই কবে উডিযে নিযে যাক। কোন কিছুকেই আমি আব ভয কবি না। সববকম বিপদকে আমি পাব হয়ে এসেছি। কোনবকম নাস্তিকতাব

কথা আমি বলছি না। কাউকে চ্যালেঞ্জও জানাচ্ছি না; কোন কিছু অস্বীকার করছি না— আমি এক দীন সত্যপথযাত্রী মাত্র। কিন্তু না। কিছু নয়। কিছু নয়। একটি কথাও নয়।' চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে দরজা খুলে তিনি বাইরে তাকালেন, আবার ফিরে এলেন।

"আঙুলগুলো আমার দিকে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'এ ধরনের নজর রাখা, গুপ্তচরের মতো উঁকি ঝুঁকি মারা আমি অপছন্দ করি— একেবারেই অপছন্দ করি। মানুষ হিসাবে বুড়ো আদমের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে যেসব প্রাকৃতিক রহস্যকে পেয়েছি তার উপর তোমাদের এই হীন হস্তক্ষেপ —এসব বন্ধ কর। আমি বলছি এখানে আমি একজন অতিথিমাত্র। আমি বলছি' নিজের শুকনো কংকালসার দেহটার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে তিনি বলতে লাগলেন— 'এটা একটা ভাড়াটে বাড়ি মাত্র। আমি চাই একটি প্রমাণ। জানি, যেসব হীন নাস্তিক তাদের তথাকথিত বিজ্ঞানের জন্য জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়, আমার সে প্রমাণ তাদের ধমনীর গতিকে মুহূর্তের জন্যও থামিয়ে দিতে পারবে না।'

"তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'আমি তো একজন দার্শনিকও নই। আমি এখানে একা, একটি মূর্খ পথিক। এই পরম রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমি একা! আমারও তো সাহায্যের দরকার!" তার কণ্ঠস্বর থেমে গেল, দুই হাত বাড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

"এইভাবেই চলতে লাগল। এই চেয়ার ছেড়ে উঠছেন, বইয়ের এ তাক থেকে ও তাকে ঘুরছেন, পাতার পর পাতা উপ শিরোনামগুলি দেখে পুঁথির পর পুঁথি আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন প্রমাণ হিসাবে, আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে এমন সব ভাঙা ভাঙা মন্তব্য করছেন যা বোঝা আমার অসাধ্য। আমার চারদিকে বইয়ের ঢেউ বইতে লাগল।

"তারপর আবার চেয়ারে এসে বসছেন, অনভ্যস্ত ভাঙা গলায় সমানে বক্তৃতা করে চলেছেন, আর সে কণ্ঠস্বর চড়তে চড়তে আর্তনাদে পরিণত হচ্ছে।"

"আমার দিকে তাকিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তুমি ওখানে বসে আছ, বেঁচে আছ, শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছ, তুমি একটি মানুষ, আর এই জঘন্য মুখোশধারীদের একমাত্র প্রমাণ এখনও অনিশ্চিতই রয়ে গেছে।' তিনি আকাশের দিকে হাত ছুড়তে লাগলেন। মহাশূন্যকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বললেন, 'আমার সঙ্গে এই পৃথিবীকে সমানভাগে ভোগ করবার কী অধিকার তার আছে!'

"আবার তিনি ফিরে গেলেন নীরবতার রাজ্যে, আত্মসংযমের মধ্যে আবার সেই সর্বগ্রাসী একাগ্র দৃষ্টি। মনে হল, এখানে আমার উপস্থিতিটা একান্তই অবাস্তব। মিঃ কেম্পি দেখছেন, কথা বলছেন তার নিজেরই ছায়ার সঙ্গে।

"আরও একবার সেই একই হুংকারের পরে তিনি যেন ক্লান্ত হয়ে মুহূর্তের জন্য চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিলেন। সেই সময়ে তার হাত থেকে আরও কয়েকখানি জীর্ণ ফটোগ্রাফ কার্পেটের উপর ছড়িয়ে পড়ল। আমি তো সারাক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে

তার দিকেই তাকিয়েছিলাম। দু'-এক সেকেন্ড পার হতে না হতেই একলাফে আমি সেগুলো কুড়িয়ে নিতে গেলাম। কিন্তু মিঃ কেম্পি ততোধিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উপুড় হয়ে হাত বাড়াতেই আমাদের দু'জনের মাথার খুলিতে এত জোরে একটা ঠোকাঠুকি হল যে মুহূর্তের জন্য আমি বুঝি সবকিছু ভুলে গেলাম।

"কিন্তু চোখের গতিও মনের গতির সঙ্গে তাল রেখেই চলে। ঠোকাঠুকিটা যত তাড়াতাড়িই ঘটুক না কেন তার ফাঁকেই মেঝেতে পড়ে থাকা দু'-একটা ফটোর উপর আমার চোখ পড়ে গেল; সে ফটো এই বিপত্নীক বৃদ্ধেরও নয়, তার স্ত্রীরও নয়। বিদ্যুৎ-চমকের মতো এই ছবিটা আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গেল। সত্রাসে খানিকটা পিছিয়ে গেলাম। তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার প্রমাণগুলো কুড়িয়ে নিতে লাগলেন, আর সেই ফাঁকে আমি দরজার দিকে ছুটে গেলাম। তাব মস্ত বড় মুঠোর মধ্যে ফটোগুলো সহজেই বন্দী হল। ভালুক যেভাবে মৌচাককে থাবার মধ্যে আটকে ধরে, ঠিক তেমনিভাবে তিনি ফটোগুলোকে দুমড়ে-মুচড়ে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখলেন। তারপর ধীরে ধীরে এলোমেলো পাকা চুলে ভর্তি মাথাটা তুলে আমার দিকে তাকালেন।

"আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর যথাসম্ভব নরম গলায় প্রশ্ন করলাম, 'মাঝে মাঝে কোন আগন্তুক কি আপনার কাছে আসে ?'

'যুবক, কোন্ আগন্তুকের কথা তুমি বলছ তা জানতে পারি কি ?' মিঃ কেম্পির কণ্ঠস্বরে একটা অসাধারণ পরিবর্তন দেখা দিল; কেমন যেন ফাঁকা আওয়াজের মতো শোনাল। কিছুক্ষণ তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম।

"তারপর একসময় জবাব দিলাম, 'এই আমার মতো। যারা এখানে আসে শুধু—মানে, কৌতূহলের টানে। এখানে আসাব তো আরও একটা পথ আছে, তাই না ?'

"তখন আমার একমাত্র বাসনা মিঃ কেম্পির চিন্তাকে যুক্তিগ্রাহ্যতাব মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। তাকে একটা রাক্ষস বানিযে তুলে আমারই মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তবুও এখন তাকে সেই হঠাৎ দেখা ফটোগ্রাফগুলোর মাধ্যমেই দেখতে লাগলাম। কিন্তু কি দেখলাম ? অনেক উপর থেকে একটা মানুষের পতন দেখাটা সুখকর অভিজ্ঞতা নয়। ফটো তো আরও অনেক আছে; আর সেগুলো তার নিজের ফটো নয়। মিঃ কেম্পিকে তখন এত বৃদ্ধ ও অসহায় দেখাচ্ছে—যেন ঈশ্বরপ্রেরিত কোন প্রবৃত্তির শেকলে বাঁধা একটি জন্তু। সে কী ভয়ংকর হতাশা !

"তারপর ? যে কোনদিন সকালে সংবাদপত্রের পাতা খুললেই সংবাদের পৃষ্ঠায় কি দেখতে পাবেন : গোলাপী পেটিকোট-পরিহিতা একটি নির্দোষ মহিলার ছবি, অথবা সন্ন্যাসীর আলখাল্লায় ঢাকা একটি হাস্যকব বৃদ্ধের ছবি ?"

পায়ে পট্টিবাঁধা কচ্ছপাকৃতি লোকটি আব একবার নড়েচড়ে বসল। এবার তার ক্ষুদে চোখ দুটি আমার দিকেই ঘোরানো।

স্কুল-শিক্ষকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, "শেষ পর্যন্ত আপনি সেখান থেকে ছাড়া পেলেন কেমন করে ?

সে জবাব দিল, "দেখুন, আমি যেরকম সারাক্ষণ মিঃ কেম্পির উপর নজর রেখেছিলাম, ঠিক তেমনই তিনিও আমার উপর নজর রেখেছিলেন, কিন্তু মনে হয়, আমি যে তার কাছ থেকে কতটা দূরে দাঁড়িয়েছিলাম সেটা তিনি ঠিকমতো বুঝতে পারেননি। আর একবার তার কণ্ঠস্বর ও গতিবিধি পাল্টে গেল। তিনি আত্মস্থ হবার ভান করলেন। আমাকে একজন বিদেশী রাজপুত্রের উপযোগী অভ্যর্থনা জানাতে জনৈক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ পণ্ডিতের মতো তিনি বললেন, 'আজকের দিনটা কী আশ্চর্য; আমার একমাত্র দুর্ভাগ্য যে এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না, তোমাকে উপযুক্ত আতিথেয়তার সঙ্গে স্বাগত জানাবার সঙ্গতি আমার নেই। পথে আসতে তোমার নিশ্চয় খুব কষ্ট হয়েছে। দেখ না, নিজের কাজের ধান্ধায় তোমাকে হাত মুখ ধুয়ে নেবার কথাটা বলতেও ভুলে গেছি।'

"আপনা থেকেই আমার চোখ পড়ল তার দু'খানি হাতের উপর। যেন ম্যাকবেথের হাত। তার হাতে আমি যেন বরিবারের স্কুলের একটি অক্ষম শিশুমাত্র। তাছাড়া, আমি জানতাম, তার ভেঙে পড়া পর্যবেক্ষণ বুরুজ থেকেই হোক, আর জঙ্গলের মধ্যে কোন গুপ্তস্থান থেকেই হোক, আমার পথচলার উপর কারও একাগ্র দৃষ্টি অবশ্যই ছিল। তার দৃষ্টিকে এড়িয়ে দুই হাত পকেটে ঢোকালাম।

"ভারী গলায় তিনি আবার বললেন, 'এক মিনিট অপেক্ষা কর, ভজনালয়ের চাবিটা নিয়ে আমি এখনই আসছি। এরকম ভজনালয় তুমি দুটি খুঁজে পাবে না। প্রাচীনকালে সেখানে একটি কুয়োও ছিল, এমনকি প্রত্নতাত্ত্বিকরাও সেটার কাল সম্পর্কে একমত নয়। আগে তো তারা দলে দলে সেটা দেখতে আসত, কত তর্ক বিতর্ক হত। আরে, আমিই তো প্রমাণ করে দিতে পারি কুয়োটার অন্তত একটা অংশ নবম শতাব্দীর পরবর্তীকালের নয়। আর ভিতরবার অংশটা...কিন্তু না, দেখ বাবা, এখনই অন্ধকার হয়ে যাবে, আরে না, না, আজ রাতে এ বাড়ি থেকে চলে যাবার কথাই ভেবো না। আমার একজন সঙ্গী দরকার, সত্য দরকার।' আর একবার চকিতে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"তার সান্নিধ্যে থাকায় তখন আমার প্রচণ্ড অনীহা, তাই তাকে পথ করে দিতে একটু সরে দাড়ালাম। পাকা চুলে ভর্তি মাথাটা একটুও কাৎ না করে তিনি আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু জানালা দিয়ে আসা ম্লান আলোয় দেখলাম, দূরবিস্তার সমুদ্রের মতো তার দুটি চোখের দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ মহাশূন্যের দুটি প্রাণহীন গ্রহ যেন।

"নিজেকে তিনি যে কত বড় মূর্খ প্রমাণ করতে চলেছেন তার পূর্বাভাস হয়তো একটি যুবকের মনেও দেখা দিল। অবশ্য পূর্বাভাস তিনি পেলেন অনেক দেরিতে। তিনি ঘর থেকে বেরিয়েই দরজাটা টেনে দিলেন। চাবি ঘোরাবার শব্দ শুনবার জন্য আমি অপেক্ষা করে রইলাম। হাতলটা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টাও করলাম না। যত দ্রুত সম্ভব জানালার দিকে স্তূপীকৃত বইয়ের উপর আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। কাঁচের পাল্লাটা নোংরা; ছিটকিনিটাও ভাঙা। গোবরাটের ঠিক নিচে নেমে যাওয়াটা বিছানায়

শুয়ে পড়ার মতোই সহজ। মাত্র দশ ফুট নিচে লতাপাতার একটা জঙ্গল; কিন্তু জানালার কব্জাগুলোতে মর্‌চে পড়েছে; ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাঠও কখনও শুকিয়েছে কখনও ফুলেছে।

"দরজায় তালা লাগাবার পরে আর কোন শব্দই কানে আসেনি। মিঃ কেম্‌পি যদি পায়ের বুট খুলে না থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই বুদ্ধিতে শান দিচ্ছেন। আবার পা টিপে টিপে দরজার কাছে ফিরে গেলাম। চিৎকার করে বললাম, 'দয়া করে আমার জন্য কষ্ট ভোগ করবেন না। আমি না হয় অন্য সময় আবার আসব।'

"পরমুহূর্তেই আবার জানালার কাছে ফিরে গিয়ে কান পাতলাম। শেষ পর্যন্ত সশব্দে জবাব এল উপরের কোন ঘর থেকে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না—কতকগুলি অর্থহীন হ জ-ব-র-ল যেন উচ্চারিত হল। আর ইতস্তত করা কোনমতেই উচিত নয়। একটা কুশন তুলে নিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে জানালার জীর্ণ ফ্রেমের উপর সেটাকে সজোরে চেপে ধরলাম। বিস্ফোরণের মতো একটা শব্দ করে জানালাটা খুলে গেল। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। একমুহূর্ত দাঁড়ালাম। তারপরই ত্বরিতে সেই গবেষণাগার, ইতস্তত ছড়ানো পুঁথিপত্র, কাগজের জঞ্জাল, কালো সিলিং, ভাঙা বাতি, আর দেওয়ালে ঝোলানো একটি মহিলার প্রায় মুছে-যাওয়া অস্পষ্ট প্রতিকৃতির দিকে শেষবারের মতো তাকিয়ে নিঃশব্দে জানালার গোব্‌রাটে উঠে গেলাম। তারপর একটা লাফ। নিচের লতাপাতা সম্পূর্ণ পচে গিয়েছিল; একটা ডাল ভাঙার শব্দও হল না।

"মাটিতে পা দিয়েই এই লজ্জাকর পলায়নের জন্য অনুতাপ হল। আমি একটি যুবক—বয়সে মিঃ কেম্‌পির চাইতে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের ছোট—আমার আত্মা থাক আর নাই থাক, একটা সক্ষম দেহ তো আছে। নিশ্চয় আমি সাহসে ভর করে রুখে দাঁড়াতে পারতাম!—জীবনের রহস্য তো একটিমাত্র নয়। কিন্তু সে চিন্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। যে বাড়িটা থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছি তার দিকে একবার তাকালাম; তার ঝোলানো পাশকপালি, ছিট-ছিট কালো দেওয়ালে নিয়ে অন্ধকার আকাশের নিচে দণ্ডায়মান বাড়িটাকে তার অধিবাসীর মতোই দুঃখজনক ও অস্বস্তিকর বলে মনে হল।

"যত তাড়াতাড়ি ও নিঃশব্দে সমস্ত বাড়িটার চৌহদ্দি পেরিয়ে একটা নিচু দেওয়াল পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকলাম। ভাগ্যক্রমে চিমনিগুলোর মাথার উপরে একটা "বায়ু-লাঙল" ছিল: সেটা দেখেই বুঝতে পারলাম কোন্‌দিকটা উত্তর। নিস্তব্ধ গাছপালার নিচ দিয়ে পশ্চিম মুখে উপরের দিকে উঠতে উঠতে এক জায়গায় থামতে হল।

"বাড়িটা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে; তার মালিককে ফেলে এসেছি তার নিজের জায়গায়, তার গবেষণার কাজের মধ্যে। পাথরের ছোট ভজনালয়টির অভ্যন্তর ভাগ, অথবা আশপাশের মাটিতে যারা চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে আছে তাদের চিরস্মরণীয় করে রাখবার জন্য কয়েকখানা পাথরের উপর যা লিখে রাখা হয়েছে—সেসব ভাল করে দেখবার কোন বাসনাই মনে জাগল না।

"সম্ভবত আমিই একমাত্র আগন্তুক নই যাকে এভাবে বিনা অনুষ্ঠানে এই উপত্যকার একমাত্র আশ্রয়স্থল থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। অরণ্যের নিস্তব্ধতাকে বিঘ্নিত করে যে উন্মাদ কান্নার ধ্বনি তখনও দূর থেকে ভেসে আসছে তার ডাকে আবার সেখানে ফিরে যাবার মতো লোক যে কেউ থাকতে পারে সেটা আমি কল্পনাও করতে পারি না।"

পায়ে পট্টি-বাঁধা বন্ধুটি শুধাল, "আপনি কি বলতে চান যে বুড়ো মানুষটি কাঁদছিল ?"

সরাইখানার বাইরে তখন দিনের আলো নিভে এসেছে ; বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। লোকটি আবাব সেই একই প্রশ্ন করল।

ঈষৎ তিক্ত স্বরে স্কুল-শিক্ষকটি বলল, "যা বলেছি ঠিকই বলেছি। আমি তো পর্যটক নই, তাহলে আপনাকে বলতে পারতাম যে কুমীরের প্রিয়-সম্ভাষণের সঙ্গে সে শব্দের কোথায় যেন একটা মিল আছে।"

"হা ঈশ্বর!" বলে লোকটি বিদ্রূপেব কাশি কাশল। তারপর মনস্থির করে আসন ছেড়ে উঠে দাড়াল। সরাইখানার মাল্‌কিনকে একটা "শুভ রাত্রি" পর্যন্ত না জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বৃষ্টির শব্দ ছাডা চারদিকে পবিপূর্ণ নীববতা।

আমি সাহস করে শুধালাম, "আপনি আর কোনদিন সেখানে যাননি? অথবা---অথবা এ বিষযে কোন কথা বলেননি ?"

স্কুল শিক্ষকটি বলল, "কি জানেন, আমি বোকার মতো কাজই করেছি। মিঃ কেম্‌পিকে সরলভাবে গ্রহণ করাই আমার উচিত ছিল। অভিযোগ করাব মতো কিছু তো ঘটেনি। তিনি তো আমাকে আমন্ত্রণ করে সেখানে নিয়ে যাননি। কোন আকস্মিক পর্যটক যদি এবকম একটা বিপদসংকুল পথ পার হতে না পেরে থাকে সেটা তো আব দোষ হতে পাবে না। তিনি তো মানব জাতির সেই সব হবু কল্যাণকর্মীদের একজন মাত্র যারা ভুল পথে যায়, পথ হারিয়ে ফেলে, এবং ভুল পথে বাঁক নিয়ে ঘুরে মরে।" কাউন্টারের উপর আঙুল ঘসতে ঘসতে বলল, "শৌখিন অভিয আপনিই বলুন তিনি কি ব্যতিক্রম ?" আমাকে নয়, সে প্রশ্ন করল নিজেকেই।

মাথা নাড়লাম। "কিন্তু আপনার নিজের কি ধারণা---তিনি কি ঠিক জানতেন---মি কেম্‌পি!"

"আত্মাব কথা ?"

আমি তার কথারই প্রতিধ্বনি করলাম। "হ্যাঁ, আত্মার কথা।"

কথাটা চুপি চুপি বললেও আমাদের কণ্ঠস্বর সরাইখানার মাল্‌কিনের কানে গেল। আর, হায় রে, সে তখনই দোকানের আলোটা জ্বেলে দিল।

স্কুল-শিক্ষকের মুখের উপর নেমে এল মানুষের আদিমতম পূর্বপুরুষের গাম্ভীর্য। বলল, "ঠিক বলতে পারি না। হঠাৎ কোন ভ্রমণার্থী সেখানে হাজির হলে সেই উপত্যকাটি তার কাছে কতটা ঘনবসতিপূর্ণ বলে মনে হতে পারে সেটাও তিনি জানতেন কিনা সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত নই। তাছাড়া, তার কণ্ঠস্বর শুনে বিচার করলে

বলতে হয় তিনি একটিমাত্র মানুষ নন। সেদিন সন্ধ্যায় অন্তত তিনজন মিঃ কেম্‌পি সেখানে হাজির ছিলেন। আর তাদের যেকোন একজনের সঙ্গে আবার আমার দেখা হোক—সেটা আমি কখনও চাই না।"

"তারপর? ফেরবার পথটা কি অপেক্ষাকৃত সহজ মনে হয়েছিল পাহাড়ের উপরকার নতুন পথটা?"

"অপেক্ষাকৃত বটে," স্কুল-শিক্ষক বলল। "যদিও সময় লেগেছিল বেশি। কিন্তু মে মাসের রাত তো খুব ছোট, এমনকি সে জায়গার মতো জঙ্গলভরা দেশেও।"

কোন কথা না বলে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম; আমার ঠোঁটে আরও একটি অনুচ্চারিত প্রশ্ন।

তার বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি দেখে মনে হল সেও সেটা বুঝতে পেরেছে। কোন কথা না বলে সে আসন থেকে নামল, শূন্য গ্লাসটার দিকে একবার তাকাল। এই প্রথম আমার নজরে পড়ল যে তার দুটি নীলাভ হাতই পুরো দস্তানায় ঢাকা। বলল, "অনেক রাত হয়েছে।" অস্বীকার করার উপায় নেই। আর "নীল শুয়োর"-এর ভিতরটা যে বাইরের বর্ষণমুখর রাতের চাইতে বেশি অতিথিপরায়ণ তাও তো নয়!

মানুষ কী বিস্ময়কর! কিন্তু স্কুল-শিক্ষককে সে কথা বললাম না। এক বিষণ্ন চিন্তার মধ্যে সে যেন ডুবে গেছে; তার মুখে অনেক বলীরেখার গোলকধাধা। তাকে ছাড়িয়ে—ভাঙা আয়নাটার মধ্যে— টুলে উপবিষ্ট তার ছায়াটা দেখতে পেলাম। মনে হল, যে কারণেই হোক আমি যেন তাকে ভীষণভাবে হতাশ করেছি। বেরিয়ে যাবার আগে দরজার হাতলে হাত রেখে তার দিকে আর একবার তাকালাম...

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

বুটিদার পর্দা-ঢাকা ঘরটি

The Tapestried Chamber—স্যার ওয়াল্টার স্কট

লেখক নিজের কানে যেরকমটি শুনেছে, কলমের মুখে ঠিক সেইভাবেই নিম্নলিখিত বিবরণটি পেশ করা হচ্ছে, অবশ্য তার স্মৃতিশক্তিতে যতটা কুলিয়েছে। তাছাড়া, এই কাহিনী সরলতাকে ক্ষুন্ন করতে পারে এরকম কোন অলংকরণকেও সযত্নে পরিহার করা হয়েছে। একটি অলৌকিক ত্রাসের গল্পকে আমি যেরকম শুনেছি এখানে তারই একটা মহলা দিচ্ছি মাত্র।

আমেরিকার যুদ্ধ তখন শেষ হবার মুখে; লর্ড কর্নওয়ালিসের বাহিনী ইয়র্ক টাউনে

আত্মসমর্পণ করেছে ; সেই বাহিনীর অফিসারসহ আর যারা বন্দী হয়েছিল সকলেই দেশে ফিরে এসে ক্লান্তি অপনোদন করছে, আর নিজেদের বীরত্বের কাহিনী বলে বেড়াচ্ছে। সম্ভবত কোন কাহিনীতে একজন নামহীন নায়ককে উপস্থিত করার অসুবিধাকে এড়াবার জন্যই মিস এস, তাদের একজন জেনারেল অফিসারের নাম দিয়েছিলেন ব্রাউন। তিনি একাধারে ছিলেন একজন যোগ্য অফিসার এবং উঁচুদরের ভদ্রলোক।

কোন বিশেষ কাজে পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণের সময় জেনারেল ব্রাউন একদিন হাজির হলেন একটি মফঃস্বল শহরে। শহরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অসাধারণ সুন্দর ; যে কোন বিলেতি শহরের বৈশিষ্ট্য সেখানে অবশ্য লক্ষণীয়।

শহরটি ছোট। সুউচ্চ প্রাচীন গির্জা দীর্ঘ অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে। চারদিকে ছোট ছোট গোচারণ ও শস্যভূমি। বিরাট সব বনস্পতি শহরের সীমান্ত রক্ষীর মতো বিরাজমান। কিছু কিছু আধুনিকতার ছাপও চোখে পড়ে। শহরটির পরিবেশে একদিকে যেমন ধ্বংসের নির্জনতা নেই, অপরদিকে তেমনি নেই নতুনত্বের হটগোল ; বাড়িগুলো পুরনো, কিন্তু মেরামতির দ্বারা সুরক্ষিত। সুন্দর ছোট নদীটি শহরের বাঁ দিক দিয়ে কুলু কুলু শব্দে বয়ে চলেছে ; তার বুকের উপর নেই কোন বাঁধের বন্ধন, বা তার পাশ দিয়ে নেই কোন চলাচলের পথ।

শহরের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে একটা উঁচু জায়গায় প্রাচীন ওক গাছের সারি ও ঝোপজঙ্গলের ফাঁক দিয়ে যে দুর্গের গম্বুজগুলো চোখে পড়ে সেটা ইয়র্ক ও ল্যাংকাস্টার যুদ্ধের সমকালীন হলেও তাতে এলিজাবেথ ও তার পরবর্তীকালের পরিবর্তন ও সংযোজনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। প্রাচীন সামন্ত যুগের দুর্গটি সেকালের রীতি অনুসারে চারদিকে পরিখা দিয়ে ঘেরা। ঘন গাছপালার ফাঁক দিয়ে দুর্গটির কিছু অংশ দেখেই আমাদের সামরিক পর্যটকটির মন আনন্দে নেচে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থির করলেন, আরও কাছে থেকে বাড়িটাকে ভাল করে দেখতে হবে ; খোঁজ নিতে হবে সেখানে পারিবারিক চিত্রশালা এবং আকর্ষণীয় পুরাবস্তুর সংগ্রহশালা আছে কিনা। তারপর হাঁটতে হাঁটতে একটা ভাল সরাইখানার দরজায় গিয়ে থামলেন।

যাত্রাপথের জন্য নতুন ঘোড়ার ব্যবস্থা করার আগে জেনারেল ব্রাউন ঐ দুর্গাঞ্চলের মালিকের খোঁজখবর করে জানতে পারলেন এবং জেনে বিস্মিত ও পুলকিত হলেন যে মালিকের নাম—আমরা তাকে লর্ড উড্‌ভিল বলেই উল্লেখ করব। কী সৌভাগ্য ! ব্রাউনের স্কুল ও কলেজ জীবনের অনেক স্মৃতিই যুবক উড্‌ভিলের নামের সঙ্গে জড়িত ; আর কিছুটা জিজ্ঞাসাবাদ করেই তিনি নিশ্চিত হলেন সেই উড্‌ভিল আর এই দুর্গাধিপতি লর্ড্‌ভিল একই লোক। কয়েকমাস আগে পিতার মৃত্যুতে তিনিই এখন লর্ড উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন এবং শোক-দিবসের অবসানে এই হেমন্তকালেই পৈত্রিক্ সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, আর সেই উপলক্ষে দুর্গে কিছু নির্বাচিত বন্ধুবান্ধবের সমাগম ঘটেছে।

আমাদের পর্যটকের কাছে খবরটি খুবই সুখকর। ইটন-এ ফ্রাংকউড-ভিল ছিল রিচার্ড ব্রাউনের "ফ্যান", আর ক্রাইস্ট চার্চ-এ ছিল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ; তাদের ছিল

একই আনন্দ, একই কর্তব্য। প্রথম জীবনের বন্ধুটিকে এমন একটা বাসভবন ও সম্পত্তির মালিকরূপে দেখতে পেয়ে সৎ সৈনিকটার মন আনন্দে ভরে উঠল। তিনি স্থির করলেন, অন্য সব কাজ মুলতুবি রেখেই তিনি অচিরে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবেন।

সুতরাং নতুন করে সংগৃহীত ঘোড়াগুলিই তার ভ্রাম্যমাণ গাড়িটাকে টেনে নিয়ে গেল উড্‌ভিল দুর্গে। দারোয়ান তাকে নিয়ে গেল একটি আধুনিক গথিক আবাসে; দুর্গেব স্থাপত্যের সঙ্গে মিল রেখেই সেটাকে তৈরি করা হয়েছে। দারোয়ান ঘণ্টা বাজিয়ে অতিথির আগমন-বার্তা জানিয়ে দিল। জেনারেল ব্রাউন গাড়ি থেকে নামতেই যুবক লর্ড হলের ফটকে এসে দাঁড়ালেন। মুহূর্তকাল অপরিচিতের মতোই বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন। যুদ্ধের ক্লান্তি ও ক্ষতচিহ্ন সে মুখের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু অতিথির কথা শুনেই সে পরিবর্তনের আবরণ উড়ে গেল; দুই বন্ধুর সাদর সম্ভাষণ বিনিময়ের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠল শৈশব ও প্রথম যৌবনের অনেক আনন্দঘন দিনের স্মৃতি।

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "প্রিয ব্রাউন, আজকের দিনে যদি আমাব কিছু চাইবার থাকে তো সেটা হবে আমাদেব মাঝে তোমার উপস্থিতি। যতদিন তুমি আমাদের কাছ থেকে দূরে ছিলে ততদিন আমি তোমার খোঁজ রাখিনি একথা মনেও এনো না। তোমার বিপদ, তোমার বিজয, তোমার দুর্ভাগ্য—সবকিছুব ভিতর দিয়েই তোমার খবর আমি রেখেছি, আব এই দেখে খুশি হয়েছি যে কি জয়ে কি পরাজয়ে, আমার পুরনো বন্ধুর নামটি সব সমযেই প্রশংসার সঙ্গে উচ্চারিত হযেছে।"

জেনারেলও যথোচিত উত্তর দিলেন; বন্ধুর নতুন মর্যাদা ও সম্পত্তি লাভের জন্য তাকে অভিনন্দন জানালেন।

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "আরে এখনও তো তুমি এ বাড়ির কিছুই দেখনি; আশা করি বাড়িটাব সঙ্গে ভালভাবে পবিচিত না হয়ে তুমি এখান থেকে চলে যাবে না। অবশ্য এ কথা সত্য যে এখন বাড়িতে বেশ একটা বড়সড় দলই জমায়েত হয়েছে, আব এই পুরনো বাড়িটাকে বাইরে থেকে দেখতে বেশ বড় মনে হলেও আসলে খুব বেশি লোকের থাকবার মতো ব্যবস্থা নেই। তবু তোমাকে একটা আবামদাযক সেকেলে ঘর আমি দিতে পাবব; আশা করি, নানা যুদ্ধাভিযানে যোগদানের ফলে অপেক্ষাকৃত খারাপ বাড়তে থাকাব শিক্ষা তুমি পেয়েছ।"

জেনারেল দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, "আমার তো ধারণা, একবার একটা হাল্কা বাহিনী নিয়ে যখন শত্রুর অপেক্ষায় আত্মগোপন করেছিলাম, তখন যে পুরনো তামাকের বাক্সের মধ্যে আমাকে রাত কাটাতে হযেছিল, তোমার এই দুর্গ-নিবাসের খারাপ ঘরটাও তার তুলনায় অনেক——অনেক ভাল।"

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "আরে, তাহলে তো কোন কথাই নেই। বাসস্থানের ভয় যখন তোমার নেই তখন অন্তত এক সপ্তাহ তোমাকে আমার কাছে থাকতেই হবে। বন্দুক, শিকারী কুকুর, ছিপ, টোপ এবং নানা ধরনের খেলাধূলার সরঞ্জাম আমাদেব প্রচুব আছে এবং কিছু বাড়তিও আছে। তবে তুমি যদি বন্দুকটাই পছন্দ

কর, তো আমিও তোমার সঙ্গে আছি। নিজের চোখেই দেখতে চাই, কালো আদমিদের দেশে কিছুকাল কাটিয়ে আসার ফলে তোমার শিকারের হাত আরও ভাল হয়েছে কি না।"

জেনারেল সানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে মহানন্দে সারাটা দিন কেটে গেল। খেলাধুলা, গান-বাজনা, পান ভোজন কোন কিছুরই অভাব ছিল না। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে হবে বলে এগারোটার পরেই অতিথিরা যার যার ঘরে শুতে চলে গেল।

যুবক লর্ড নিজেই বন্ধু জেনারেল ব্রাউনকে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গেলেন। লর্ড ঠিকই বলেছিলেন, ঘরটি আরামদায়ক কিন্তু সেকেলে ধরনের। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ব্যবহৃত একটা অত্যন্ত ভারী পালংক, সিল্কের বিবর্ণ মশারি, তাতে জরির ভারী কুঁচি বসানো। কিন্তু বিছানার চাদর, বালিশ, কম্বল সবই মনোরম। দরজা জানালায় ঝোলানো পুরনো বিবর্ণ পর্দাগুলিতে কেমন যেন একটা বিষণ্নতার আমেজ। জানালা দিয়ে আসা হেমন্তের বাতাসে পর্দাগুলি দুলছে।

লর্ড বললেন, "দেখ জেনারেল, শয়ন কক্ষটি খুবই সেকেলে; তবে আশা করি তোমার সেই তামাকের বাক্সের চাইতে এটা খারাপ লাগবে না।"

জেনারেল উত্তরে বললেন, "থাকার জায়গা নিয়ে আমার কোনরকম মাথা ব্যথা নেই; তবু যদি পছন্দ অপছন্দের কথাই তোল তো বলি, তোমাদের ঐ পারিবারিক অট্টালিকার আধুনিক সব ঘরের তুলনায় এই ঘরটাই আমার বেশি পছন্দ। বিশ্বাস কর, যখনই এই ঘরের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক আরামদায়ক ব্যবস্থাকে যুক্ত করি, যখনই মনে করি যে এ সবই 'ইয়োর লর্ডশিপ' এর সম্পত্তি, তখনই মনে হয় লন্ডনের যে কোন সেরা হোটেলের চাইতেও এখানে আমি ভাল আছি।"

"প্রিয় জেনারেল, আমিও বিশ্বাস করি— আমি নিঃসন্দেহ যে তুমি এখানে আমার মতো আশানুরূপ আরামেই থাকবে," এই কথাগুলি বলে সম্ভ্রান্ত যুবকটি আর একবার অতিথিকে শুভরাত্রি জানিয়ে করমর্দন করে বিদায় নিলেন।

জেনারেল আর একবার চারদিকে তাকালেন; তারপর পোশাক ছেড়ে আরামদায়ক রাত্রি যাপনের জন্য প্রস্তুত হলেন।

এখানে, এ ধরনের কাহিনীর প্রথা ভঙ্গ করে, জেনারেলকে পরদিন সকাল পর্যন্ত তার ঘরে রেখে আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

বেশ সকালেই সকলে প্রাতরাশে এসে হাজির হল, কিন্তু সেখানে জেনারেল ব্রাউনের দর্শন পাওয়া গেল না। এতে বারকয়েক বিস্ময় প্রকাশ করে লর্ড উর্ড্‌ভিল শেষ পর্যন্ত একজন চাকরকে পাঠালেন তার খোঁজে। লোকটি ফিরে এসে জানাল, কুয়াশা ঢাকা অস্বস্তিকর আবহাওয়াকে অগ্রাহ্য করে জেনারেল ব্রাউন খুব ভোরেই বাইরে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

সম্ভ্রান্ত যুবকটি বন্ধুদের বললেন, "সৈনিকের অভ্যাস আর কি; অনেকেরই এই

অভ্যাসটি গড়ে ওঠে; কর্তব্যের ডাকে সকালে প্রস্তুত হতে হতে তারা আর ভোরের পরে ঘুমতেই পারে না।"

তথাপি এই ব্যাখ্যা লর্ড উড্‌ভিলের নিজেরই মনঃপূত হল না; অন্যমনস্কভাবে নিঃশব্দে তিনি জেনারেলের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রাতরাশের ঘণ্টা বাজবার প্রায় এক ঘণ্টা পরে জেনারেল ফিরে এলেন। তাকে বেশ ক্লান্ত ও অসুস্থ মনে হল। মাথার চুল এলোমেলো, পোশাক পরিচ্ছদ এতই অবিন্যস্ত যে একজন সামরিক লোকের বেলায় সেটা সহজেই চোখে পড়ে; তার চোখের দৃষ্টিও কেমন যেন বিকৃত ও অদ্ভুত।

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "প্রিয় জেনারেল, আজ সকালে দেখছি তুমি আমাদের সকলের উপর টেক্কা দিয়েছ; না কি তোমার শোবার ব্যবস্থাটা আশানুরূপ ও মনোমতো হয়নি। রাতটা কেমন কাটল ?"

"ওঃ, খুব ভাল—অত্যন্ত চমৎকার—সারা জীবনে কখনও এত ভালভাবে আমার রাত কাটেনি," জেনারেল ব্রাউন তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন; অথচ তার কথা বলার মধ্যে এমন একটা বিব্রত ভাব ছিল যেটা তার বন্ধুর চোখে ধরা পড়ল। তারপরই এক পেয়ালা চা গলায় ঢেলে অন্য কোন খাবার স্পর্শ না করেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

গৃহস্বামী বন্ধুটি বললেন, "জেনারেল, আজ বন্দুক নিয়ে বের হচ্ছ তো ?" পরপর দু'বার একই প্রশ্ন করার পরে হঠাৎ জবাব এল, "না, আমি দুঃখিত যে আর একটি দিনও 'ইয়োর লর্ডশিপের' সঙ্গে কাটাবার সৌভাগ্য আমার হবে না; আমার ডাক-ঘোড়া আনতে বলে দিয়েছি, এখনি তারা এসে পড়বে।"

উপস্থিত সকলেই বিস্মিত; লর্ড উড্‌ভিল সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "ডাক ঘোড়ার কথা কি বলছ হে বন্ধু! তা দিয়ে কি করবে ? তুমি তো আমাকে কথা দিয়েছ অন্তত একটি সপ্তাহ আমার সঙ্গে কাটাবে ?"

স্বভাবতই বেশ বিব্রতভাবে জেনারেল বললেন, "তোমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের আনন্দে হয় তো এখানে কয়েকদিন থাকবার কথা বলেছিলাম; কিন্তু এখন দেখছি সেটা একেবারেই অসম্ভব।"

সম্ভ্রান্ত যুবকটি বললেন, "খুবই আশ্চর্যের কথা। কালই মনে হয়েছিল তোমার হাতে কোন জরুরি কাজ নেই, আর আজই তো যাবার ডাক আসতে পারে না, কারণ শহর থেকে আমাদের ডাকই তো এখনও আসেনি, আর তাই এর মধ্যেই কোন চিঠি তুমি পেতে পার না।"

আর কোন কৈফিয়ৎ না দিয়ে জেনারেল ব্রাউন শুধু এইটুকুই জানালেন যে তার একটা অনিবার্য কাজ আছে, কাজেই তাকে অতি অবশ্য চলে যেতেই হবে। অগত্যা গৃহস্বামী চুপ করে গেলেন; বুঝলেন যে বন্ধুটি চলে যেতে দৃঢ়সংকল্প, কাজেই কোনরকম অনুরোধ করাই বৃথা।

তবু তিনি বললেন, "প্রিয় ব্রাউন, তুমি যখন একান্তই চলে যাবে, তখন আমাকে অনুমতি দাও—এ বাড়ির ছাদ থেকে চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যটা তোমাকে একবার দেখাই; যেভাবে কুয়াশা উঠছে তাতে অচিরেই দৃশ্যটা ঢেকে যাবে।"

কথা বলতে বলতেই বড় জানালাটা খুলে তিনি ছাদে পা বাড়ালেন। জেনারেল যন্ত্রের মতো তাকে অনুসরণ করলেন। লর্ডটি চারদিকে আঙুল বাড়িয়ে অনেককিছু দ্রষ্টব্য বস্তু দেখাতে লাগলেন, কিন্তু দেখবার মতো কিছুই জেনারেলের চোখে পড়ল না। এইভাবে এগোতে এগোতে লর্ড উর্ড্‌ভিল অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে অন্য সকলের কাছ থেকে বেশ কিছু দূরে সরে গিয়ে হঠাৎ বন্ধুর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন:

"রিচার্ড ব্রাউন, তুমি আমার অনেক দিনের পুরনো বন্ধু; এখন এখানে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। তাই বন্ধুর কাছে, একজন সৈনিকের কাছে আমার একান্ত মিনতি, আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দাও। কাল রাতটা সত্যি তোমার কিভাবে কেটেছে?"

গম্ভীর মুখে জেনারেল জবাব দিলেন, "অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে; সে অভিজ্ঞতা এতই মারাত্মক যে এই প্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত সব জমির বিনিময়ে তো নয়ই, এমনকি এখানে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বিনিময়েও আমি দ্বিতীয় রাত সে ঘরে কাটাতে রাজী হব না।"

যেন নিজেকে সম্বোধন করেই লর্ড বললেন, "খুবই আশ্চর্যের কথা; তাহলে তো দেখছি ঐ ঘরটি সম্পর্কে যা শুনেছি তার মধ্যে কিছু সত্য আছে।" পুনরায় জেনারেলের দিকে ঘুরে তিনি বললেন, "প্রিয় বন্ধু, ঈশ্বরের দোহাই, মন খুলে আমাকে সব কথা সবিস্তারে বল।"

তার মিনতিভরা কথা শুনে জেনারেল দুঃখ পেলেন; একমুহূর্ত থেমে বলতে লাগলেন, "প্রিয় লর্ড, গত রাত্রে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেটা এতই অদ্ভুত ও অপ্রীতিকর যে সেকথা তোমাকে বলতে আমি কুণ্ঠিত বোধ করছি। অন্য কেউ এ কথা শুনলে ভাববে যে আমি একটা দুর্বলচিত্ত, কুসংস্কারে বদ্ধ বোকা লোক; নিজের কল্পনাই আমাকে বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু তুমি তো আমাকে ছেলেবেলায় ও যৌবনেও দেখেছ। তাই প্রথম জীবনে যে চারিত্রিক দুর্বলতা ও বিচ্যুতি থেকে আমি মুক্ত ছিলাম, প্রাপ্ত বয়সে আমি তারই শিকার হব এ সন্দেহটা তুমি অন্তত করবে না।"

জেনারেল থামলেন। তার বন্ধু উত্তরে বললেন:

"তোমার বক্তব্য যত অদ্ভুতই হোক তার সত্যতাকে আমি যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করব সে বিষয়ে কোনরকম সন্দেহ তোমার মনে রেখো না। তোমার মনের দৃঢ়তার সঙ্গে আমি এত বেশি পরিচিত যে তুমি কখনও অবাস্তব কল্পনার শিকার হতে পার সে সন্দেহ কখনও আমার মনে জাগবে না। আমি এও জানি, তোমার সম্মানবোধ ও বন্ধুত্বের খাতিরেই তুমি যা কিছু দেখেছ তার কোন অতিরঞ্জিত বিবরণ আমাকে শোনাবে না।"

জেনারেল বললেন, "ঠিক আছে; তোমার বিশ্বাসের উপর ভরসা রেখেই সব কথা তোমাকে বলছি। তবু এও বলে রাখি, গত রাত্রের দিকে নতুন করে মনে করার চাইতে আমি বরং একটা গোলা-বারুদের আক্রমণের মুখোমুখি হওয়াটাকেও শ্রেয়তর বলে মনে করি।"

তিনি দ্বিতীয়বার থামলেন; লর্ড উড্‌ভিলের চোখে নীরব আগ্রহ লক্ষ্য কবে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বুটিদার পর্দায় ঢাকা ঘরটিতে তার নৈশ অভিজ্ঞতার ইতিহাস বলতে শুরু করলেন।

"কাল রাতে তুমি চলে যাবার পরেই আমি পোশাক ছেড়ে শুতে গেলাম। বিছানার সামনেই চিমনির আগুন ঝল্‌মল্‌ করে জ্বলছে! তোমার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের ফলে শৈশব ও যৌবনের অনেক মন-মাতানো স্মৃতি এসে ভিড করল। তাই সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম এল না।

"সুখের স্মৃতিতে মন আচ্ছন্ন। ধীরে ধীবে ঘুম নেমে এল চোখে। হঠাৎ রেশমী গাউনেব খস্‌খস্‌ শব্দে ও উঁচু-গোড়ালি জুতোর ঠুকঠুক শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল কোন নারী ঘরের মধ্যে হাঁটছে। মশারি সরিযে ব্যাপারটা দেখবার আগেই একটি ছোটখাট নাবীমূর্তি বিছানা ও অগ্নিকুণ্ডের মাঝখান দিযে চলে গেল। মূর্তিটি আমার দিকে পিছন ফিরে ছিল: তার ঘাড ও গলা দেখেই বুঝতে পারলাম, একটি বৃদ্ধা নাবী সেকেলে গাউন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে; ঢিলে গাউনটা মাটিতে লুটিয়ে পডেছে।

"একটি বৃদ্ধার এই উপস্থিতি যথেষ্ট অদ্ভুত মনে হলেও মুহূর্তের জন্য এ কথা আমার মনে আসেনি যে এই নারীমূর্তি এ বাড়িব জনৈকা কাজের লোক ছাড়া অন্য কিছু হতে পাবে। ঠাকুরমার আমলের পোশাক পরা হয় তো তার একটা শখ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পডল, তুমি ঘরের টানাটানির কথা বলেছিলে। তাই ভাবলাম, আমার শোবাব ব্যবস্থা কবে দিতেই তুমি হয তো এই বৃদ্ধার ঘরটিই আমাকে দিয়েছ, আব সেও সব কথা ভুলে গিযে রাত বারোটার সময তার পুরনো ঘরেই ফিরে এসেছে। তাই তাকে আমাব উপস্থিতিব কথাটা জানাবার জন্য বিছানায় নডেচডে একটু কাশলাম। ধীরে ধীরে সে ঘুরে দাডাল, কিন্তু হা ঈশ্বর!--সে কি মুখ আমি দেখলাম! সে যে কে অথবা সে যে কোন জীবিত প্রাণী নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহই আর রইল না। মৃত মানুষের একখানি মুখের উপর কে যেন এঁকে দিযেছে তার জীবিতকালের নিচতম ও জঘন্যতম সব পাপের ছাপ! এক ভয়ংকর অপরাধিনীর দেহ যেন কবর থেকে উঠে এসেছে, আর তাতে বাসা বেঁধেছে নরকের অগ্নিকুণ্ড থেকে ছাডা পাওযা একটি আত্মা, যে ছিল তার অপকর্মের সঙ্গী। চমকে উঠে খাডা হয়ে বসলাম; দুই হাতের উপর ভর দিয়ে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সেই ভয়ংকর ছায়ামূর্তির দিকে। বীভৎস নারীমূর্তিটি দ্রুত পদক্ষেপে আমার বিছানার কাছে এগিয়ে এল, আমার পাশেই বসে পডল, তার ভয়ংকর মুখটা এগিয়ে এল আমার মুখের এক হাতের মধ্যে, তার মুখের কুটিল হাসিতে ফুটে উঠল মূর্তিমতী এক শয়তানীর ঈর্ষা ও ক্রূরতা।"

জেনারেল ব্রাউন এখানে থামলেন। গতরাতের ভয়ংকর দৃশ্যকে মনে করতে গিয়ে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে; হাত দিয়ে মুছে ফেললেন।

"মাই লর্ড, আমি ভীরু নই। আমার পেশাগত সবরকম প্রাণঘাতী বিপদের মুখোমুখি আমি হয়েছি। কোন মানুষ কখনও বলতে পারবে না যে রিচার্ড ব্রাউন তার তরবারির অমর্যাদা করেছে। কিন্তু সেই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে একটি মূর্তিমতী শয়তানীর একেবারে চোখের নিচে, এমনকি তার একেবারে মুঠোর মধ্যে বসে আমার মনের সব দৃঢ়তা হারিয়ে ফেললাম, আগুনের ভিতর মোমের মতো আমার সব পৌরুষ গলে গেল, আমার প্রতিটি চুল খাড়া হয়ে উঠল। জীবনদায়ী রক্তের স্রোত থেমে গেল, ভয়ে ও ত্রাসে দশ বছরের একটি গ্রাম্য বালিকার মতো মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম। সেভাবে কতক্ষণ পড়েছিলাম তা জানি না।

"দুর্গের ঘড়িতে একটা বাজার শব্দে মূর্ছা ভাঙল; শব্দটা এত জোরে হয়েছিল যে মনে হল বুঝি ঘরের মধ্যেই বাজল। পাছে সেই ভয়ংকর দৃশ্য আবার দেখতে হয় সেই ভয়ে চোখ খুলতে বেশ কিছু সময় লাগল। যাই হোক, সাহস সঞ্চয় করে যখন চোখ মেলে তাকালাম তখন আর তাকে দেখতে পেলাম না। প্রথমেই মনে হল ঘণ্টাটা টানি, চাকরদের জাগিয়ে তুলি, তারপর কোন চিলেকোঠায় বা খড়ের গাদায় চলে যাই যাতে দ্বিতীয়বার তার সঙ্গে দেখা না হয়। না, আমি সত্যকেই স্বীকার করব, আমার সে সিদ্ধান্ত বদলে ফেললাম; নিজের লজ্জাকে ঢাকবার জন্য নয়, বরং এই ভয়ে যে চিমনির পাশে ঝোলানো ঘণ্টার দড়িতে হাত দিতে সেখানে যেতে গিয়ে হয় তো আবার সেই কুৎসিত শয়তানীর সামনে পড়ে যাব; আমার মনে হল সে হয় তো তখনও ঘরের কোণে কোথাও লুকিয়ে আছে।

"একটা জ্বর-বিকারের মধ্যে বাকি রাতটা কেটে গেল। শরীর কখনও গরম, কখনও ঠাণ্ডা; মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যায়, জেগে বসে থাকি; হাজার রকমের সব ভয়ংকর দৃশ্য চোখের সামনে আসা যাওয়া করতে লাগল।

"অবশেষে দিনের আলো দেখা দিল। অসুস্থ দেহে ও লজ্জাহত মনে বিছানা থেকে উঠলাম। মানুষ হিসাবে, একজন সৈনিক হিসাবে নিজের জন্য বড়ই লজ্জা হল; তার চাইতে বেশি লজ্জা পেলাম এই ভূতে-পাওয়া ঘর থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত বাসনার জন্য। কোনরকমে পোশাক পরে তোমার এই প্রাসাদ থেকে পালিয়ে গেলাম। অন্য জগতের সেই আগন্তুকের সঙ্গে এক ভয়াবহ সাক্ষাৎকারের ফলে আমার স্নায়ুতন্তুগুলো তখন একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে; খোলা হাওয়ায় সেগুলিকে কিছুটা চাঙ্গা করার জন্য ভোরেই বেরিয়ে পড়লাম। আমার অসুবিধার কথা, তোমার আতিথেয়তাপূর্ণ প্রাসাদ থেকে হঠাৎ চলে যাবার কারণের কথা সবই তোমাকে বললাম ইয়োর লর্ডশিপ। আশা করি অন্য কোন স্থানে আবার আমাদের দেখা হবে; কিন্তু ঐ ছাদের নিচে আর একটা রাতও কাটানোর হাত থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন!"

জেনারেলের কাহিনীটি খুবই অদ্ভুত; কিন্তু যেরকম দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি সেটা বললেন তাতে এ সম্পর্কে কোনকিছু বলার আর অবকাশ রইল না। লর্ড উডভিল

একবারও জানতে চাইলেন না যে সে স্বপ্নে কোন প্রেত-মূর্তি দেখেছে কি না, অথবা এ সবই তার অতি-কল্পনা বা দর্শনেন্দ্রিয়ের ফাঁকির ফল কি না। বরং মনে হল তিনি যা কিছু শুনলেন তার সত্যতা ও বাস্তবতাকে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাসই করছেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আন্তরিকভাবেই জানালেন যে তারই বাড়িতে এসে তার প্রথম জীবনের বন্ধুটির এই দুর্গতির জন্য তিনি খুবই দুঃখিত।

"প্রিয় ব্রাউন, তোমার এই কষ্টের জন্য আমি আরও বেশি দুঃখিত এই জন্য যে এটা আমারই একটা পরীক্ষার দুঃখজনক অথচ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ফল। তোমার জানা দরকার যে অন্তত পক্ষে আমার বাবা ও ঠাকুর্দার আমল থেকেই ঐ ঘরটা সবসময়ই বন্ধ করে রাখা হত, কারণ জনশ্রুতি ছিল যে ঐ ঘরটাতে নাকি অলৌকিক সব দৃশ্য দেখা যায়, নানারকম ভৌতিক শব্দ শোনা যায়। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে যখন এই সম্পত্তির দখল পেয়ে এখানে এলাম, তখনই কেন জানি আমার মনে হল যে আমার যেসব বন্ধুবান্ধব এই উপলক্ষে এখানে আসবে তাদের যথোপযুক্ত স্থান-ব্যবস্থা করার মতো এত বেশি ঘর এ বাড়িটাতে নেই যাতে এরকম একটা আরামদায়ক শয়নকক্ষকে অদৃশ্য লোকের অধিবাসীদের জন্য ছেড়ে দেওয়া চলে। সুতবং ঐ বুটিদার পর্দা-ঢাকা ঘরটাকে, ঐ নামেই ঘরটাকে উল্লেখ করা হত, লোকজন দিযে খুলে ফেললাম, এবং তার প্রাচীনত্বকে কোনরকম ক্ষুণ্ন না করে আধুনিক জীবনযাত্রার উপযুক্ত কিছু নতুন আসবাব ও জিনিসপত্র দিযে ঘরটাকে সাজিয়ে-গুছিযে দিলাম। তবু যেহেতু ঘরটা যে ভুতুড়ে সে কথাটা বাড়ির লোকজনরা ভাল করেই জানত, আশপাশের লোকজন এবং আমার কিছু কিছু বন্ধুরও সেটা অজানা ছিল না, তাই আমার আশংকা ছিল যে ঐ বুটিদার পর্দা-ঢাকা ঘরে যে লোক প্রথম রাত কাটাবে, পূর্বস্রাত ভুতুড়ে সংস্কারবশত সে হয়তো সেই জনশ্রুতিটাকেই নতুন করে জাগিয়ে তুলবে, আর ঐ ঘরটাকে কাজে লাগাবার যে ব্যবস্থা আমি নিয়েছি তাকেও পণ্ড করে দেবে। প্রিয় ব্রাউন, আমি অসংকোচেই স্বীকার করছি, গতকাল তোমাকে দেখেই আমাব খুশি হবার অন্য অনেক কারণের মধ্যে এটাও একটা যে ঐ ঘরের দুর্নাম ঘোচাবার একটা চমৎকার সুযোগ আমার হাতে এসে গেল, কাবণ তোমার সাহসিকতা সন্দেহের অতীত, আর এসব ব্যাপাবে তোমার মন সবরকম সংস্কারমুক্ত। সুতরাং আমার পরীক্ষাটা চালাবার পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত কোন লোকের কথা আমি ভাবতেই পারিনি।"

জেনারেল ব্রাউন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "ইয়োর লর্ডশিপের অপার করুণা - আপনার কাছে আমার ঋণের শেষ নেই। তুমি যাকে বলছ একটা পরীক্ষা, তার ফলটা আমি কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত ভুলতে পারব না।"

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "আহা, তুমি আমার প্রতি অবিচার করছ বন্ধু। বিশ্বাস কর, যে কষ্ট তুমি ভোগ করেছ তার সম্ভাবনাটা আমি মোটেই পবিমাপ করতে পারিনি। কাল সকাল পর্যন্তও অলৌকিক আবির্ভাবের ব্যাপারে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। উপরন্তু, আমার তো স্থির বিশ্বাস যে ঐ ঘর সম্পর্কে সব কথা তোমাকে জানালে

তুমি নিজে থেকেই ঐ ঘরটিকে তোমার বাসস্থান হিসাবে বেছে নিতে। তুমি যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে কষ্ট পেয়েছ সেটা আমার দুর্ভাগ্য, হয় তো আমার ভুল, কিন্তু সেটাকে আমার অপরাধ বলতে পার না।"

"সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার!" জেনারেলের মেজাজ আবার খুশি হয়ে উঠল; "নিজেকে আমি দৃঢ়চরিত্র ও সাহসী বলেই জানতাম, আর তুমিও আমাকে সেইরকম ভেবেছ বলে তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবার কোন অধিকার আমার নেই। ঐ যে আমার ডাক-ঘোড়াগুলো এসে পড়েছে; সুতরাং তোমাকে আর আমি আটকে রাখব না।"

লর্ড উড্‌ভিল বললেন, "না বন্ধু, তুমি যখন আর একটা দিনও আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না, আর সেজন্য কোনরকম পীড়াপীড়িও আমি করতে পারছি না, তাই বলছি আরও অন্তত আধঘণ্টা সময় আমাকে দাও। একসময় তুমি তো ছবি ভালবাসতে। এখানে আমার একটা প্রতিকৃতির চিত্রশালা আছে; অনেকগুলো ভ্যানডাইকের আঁকা; একদা এই সম্পত্তি ও দুর্গ-প্রাসাদ যাদের অধিকারে ছিল তাদেরই বংশধরদের সব প্রতিকৃতি। আমার ধারণা, তার অনেকগুলি তোমার ভাল লাগবে।"

কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গেই জেনারেল ব্রাউন আমন্ত্রণটা গ্রহণ করলেন। বন্ধুর আমন্ত্রণ তো প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

সুতরাং লর্ড উড্‌ভিলের সঙ্গে কয়েকটা ঘর পার হয়ে জেনারেল একটা লম্বা চিত্রশালায় ঢুকলেন। অনেক ছবি ঝোলানো রয়েছে। লর্ড পরপর সেগুলি তার অতিথিকে দেখালেন, তাদের নাম বললেন, কিছু কিছু ব্যক্তিগত বিবরণও দিলেন। জেনারেল ব্রাউনের সে সব বিবরণের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সচরাচর যেকোন পারিবারিক চিত্রশালায় যেরকম সব ছবি থাকে ঠিক তাই। এই হয় তো কোন নাইট যিনি জমিদারিকে প্রায় নষ্ট করেই ফেলেছিলেন; আবার এই জনৈকা সুন্দরী মহিলা যিনি ধনবান কোন "রাউন্ডহেড"-কে বিয়ে করে সম্পত্তিকে নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন। ওখানে ঝোলানো রয়েছে জনৈক বীরের ছবি যিনি সেন্ট জার্মেন-এ নির্বাসিত রাজ-দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ফলে বিপন্ন হয়েছিলেন; আবার এখানে এমন একজনের ছবি যিনি বিপ্লবের সময় উইলিয়ামের সপক্ষে অস্ত্র ধরেছিলেন; ওই তো একজন যিনি কখনও হুইগদের আবার কখনও টোরিদের দলের পাল্লা ভারী করেছিলেন।

লর্ড উড্‌ভিল এই সব বুলি আওড়াতে আওড়াতে চিত্রশালার মাঝামাঝি পৌঁছতেই তিনি দেখতে পেলেন, জেনারেল ব্রাউন হঠাৎ চমকে উঠলেন, তার চোখে-মুখে তীব্র বিস্ময় ও আতঙ্ক ফুটে উঠল; একদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে প্রচলিত শৌখিন পোশাক পরিহিতা একটি বৃদ্ধা মহিলার প্রতিকৃতির দিকে।

"ঐ তো সে!" জেনারেল চিৎকার করে উঠলেন—"ঠিক সেই আকৃতি, সেই চোখ-মুখ-নাক শুধু কাল রাতে যে অভিশপ্ত কুৎসিতদর্শনা আমার ঘরে হাজির হয়েছিল তার মুখের মতো পৈশাচিক ভাব এ মুখে নেই।"

সম্ভ্রান্ত যুবকটি বললেন, "তাই যদি হয় তাহলে যে তোমার ছায়ামূর্তি দর্শনের ভয়ংকর বাস্তবতা সম্পর্কে কোনরকম সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না। ঐ ছবিটা

আমারই এক হতভাগিনী পূর্ব প্রজন্মের ; আমাদের পারিবারিক ইতিহাস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার জঘন্য ও ভয়ংকর পাপের একটা তালিকা আমার সিন্দুকেই তালাবন্দী হয়ে আছে। সেসব কাহিনী বলাও ভয়ংকর, শোনাও ভয়ংকর। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে ঐ মারাত্মক ঘরে ব্যভিচার ও নরহত্যার ঘটনা ঘটেছিল। তাই স্থির করেছি, আমার পূর্বপুরুষরা উচিত বিবেচনা করে ঐ ঘরটাকে যেভাবে তালাবন্ধ করে পরিত্যক্ত অবস্থায় রেখেছিলেন, আমিও তাই করব ; যে অলৌকিক আতংক তোমার মতো মানুষের সাহসকেও হার মানাতে পারে, আর কেউ যাতে তার শিকার না হয় তার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা আমি করব।”

এইভাবে যে বন্ধুদ্বয় অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তারাই পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন দুঃখের ভিতর দিয়ে—লর্ড উড্‌ভিল হুকুম দিলেন বুটিদার পর্দা-ঢাকা ঘরটার সব জিনিসপত্র সরিয়ে দরজাটা গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হোক ; আর জেনারেল ব্রাউন উড্‌ভিল দুর্গ-প্রাসাদের সেই বেদনাদায়ক রাতের স্মৃতিকে ভুলতে অন্য কোন গ্রামাঞ্চলে কোন অপেক্ষাকৃত অল্প মর্যাদাসম্পন্ন বন্ধুর বাড়ির খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত

মেরি বার্নেট

Mary Burnet—জেমস হগ

নিম্নবর্ণিত ঘটনাগুলি সেন্ট মেরি হ্রদের একশ’ মাইলের মধ্যে একটি মেষপালকের বাড়িতে ঘটেছিল বলে বলা হয়ে থাকে ; কিন্তু যেহেতু সেই পরিবারেব কিছু বংশধর আজও কাছাকাছি অঞ্চলে বাস করে, তাই আমি এমন সব নাম এখানে ব্যবহার করছি যাতে তাদের চিনতে না পারা যায় ; অবশ্য গল্পটা যারা আগে থেকেই জানে তাদের কথা স্বতন্ত্র।

ইন্‌ভার্লন-এর চাষীর ছেলে অ্যালানসন ছিল সুদর্শন, বাউণ্ডুলে ও বেপরোয়া চরিত্রের এক যুবক ; সে ছিল উৎসাহী, প্রেমপ্রবণ ও অ্যাড্‌ভেঞ্চারপ্রিয় ; পুরুষ, নারী অথবা প্রেতাত্মা কাউকে সে ভয় করত না। আরও অনেকেব সঙ্গে প্রেমাভিসার ছাড়াও সে প্রেমে পড়ল কার্কস্টাইলের মেরি বার্নেটের সঙ্গে ; মেয়েটি সুন্দরী ও নিষ্পাপ ; গ্রাম্য সরলতার মধ্যেই বড় হয়ে উঠেছে। মেয়েটি ছেলেটিকে ভালবাসত, আবার

ভয়ও করত; অন্য সকলের সঙ্গে ছেলেটির সঙ্গে দেখা করতে তার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও কখনও সে একাকি নির্জনে ছেলেটির সঙ্গে দেখা করত না। একদিন "আওয়ার লেডি"-র ভজনালয়ে প্রার্থনার পরে যুবকটি সুযোগ বুঝে অনেক ভালবাসার কথা বলে, অনেক শপথ করে এমনভাবে মেয়েটিকে তার সঙ্গে একান্তে দেখা করতে অনুনয়-বিনয় করল যে শেষ পর্যন্ত মেয়েটি কথা দিল, হয় তো সে এসে তার সঙ্গে দেখা করবে।

হ্রদেব একেবারে তীরে একটি নির্জন সবুজ জায়গা মিলনের জন্য নির্দিষ্ট করা হল: যারা মাছ ধরতে ভালবাসে তাদের কাছে জায়গাটা খুবই পরিচিত, আর এই প্রাচীন কাহিনীর লেখকের কাছেও কিছু কম পরিচিত নয়। মিলনের সময় স্থিব হল কিংস এল্‌ওয়ান্ড (এখন নাকি বোকার মতো তাকেই বলা হয় কালপুরুষ নক্ষত্র) যখন পাহাড়ের উপর প্রথম ছড়িয়ে দেবে তার সোনালী আলো। অ্যালানসন অনেক আগেই এসে হাজির হল; এতই আগ্রহ ও অনুরাগের সঙ্গে সে আকাশের দিকে তাকাতে লাগল যে দক্ষিণ-পূর্ব আকাশের প্রতিটি ছোট তারাকেই সে কিংস এল্‌ওয়ান্ডেব প্রথম প্রকাশ বলে মনে করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এল্‌ওযান্ড সগৌরবে আবির্ভূত হল, আর যুবকটি আবেগকম্পিত বুকে সেই উঁচু প্রান্তরেব দিকেই তাকিয়ে রইল যে পথ ধরে সুন্দরী মেরী বার্নেট নেমে আসবে। কিন্তু মেরি বার্নেট এল না; কিংস এল্‌ওযান্ডের পূর্ণ রূপটি আকাশপটে আঁকা পড়ল, কিন্তু মেরি বার্নেটেব দেখা মিলল না।

যুবক অ্যালানসন তীব্র হতাশায ভেঙে পড়ল; আর গল্পে যেবকম বলা হয়ে থাকে, মনে মনে একটা অশুভ কামনা উচ্চারণ করল-- সে চাইল কোন ডাইনি বা পরী মেরীকে এমনভাবে প্রভাবিত করুক যাতে কুমাবী মনের সব সংকোচ কাটিয়ে মেবি এসে তার সঙ্গে দেখা করে। হতাশ প্রেমেব আবেগে এই বাসনা সে তিনবার উচ্চারণ করল। মাত্র তিনবারই সেটা উচ্চারিত হল, তার বেশি নয, আর তখনই---কী আশ্চর্য! দূরে দেখা গেল দ্রুত পা ফেলে মেরি এগিয়ে আসছে নির্দিষ্ট জায়গাটার দিকে। সে উত্তেজনা বুঝি অ্যালানসনেরও সহ্যের অতীত; আনন্দে সে যেন উন্মাদপ্রায হযে উঠল; পরবর্তীকালে সে নিজেই স্বীকার করেছে, প্রথম মিলনেব কোন কথাই তার মনে নেই; শুধু মনে আছে, মেরি ছিল সম্পূর্ণ নির্বাক, ভাল-মন্দ কোন কথাই সে বলেনি। কিছুক্ষণ পরেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, কোন সান্ত্বনা মানল না, মর্মভেদী স্বরে হাহাকার করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আর তারপরেই আশ্চর্য দ্রুতগতিতে ছুটে চলে গেল।

আগেই বলেছি, হ্রদের এই দিকটা অনেকেরই চেনা; এখানে তীরের ঠিক উপরে একটা খাড়া পাহাড় ঝুলে আছে; আকারে বেশি বড় না হলেও উপর থেকে বা নিচ থেকে কোন পথেই সেখানে যাওয়া যায় না। খুব শুকনোর সময ছাড়া অন্য সব সময়ই সমুদ্রের জল সেই পাহাড়ের নিচে কয়েক গজের মধ্যেই থাকে, আর বাকি জায়গাটা থাকে উপর থেকে ভেঙে-পড়া পাথরের স্তূপে আকীর্ণ। সেই সংকীর্ণ

বন্ধুর পথে মৎস-শিকারীরাও দুপুর বেলায় চলতে পারে না, আর মেরি কিনা রাতের অন্ধকারে হরিণের মতো দ্রুতগতিতে সেখান দিয়েই ছুটে চলল। প্রেমিক সর্বশক্তি দিয়ে তার পিছনে ছুটতে ছুটতে ডাকতে লাগল, "মেরি! মেরি! প্রিয় মেরি, থাম, আমার সঙ্গে কথা বল। আমি তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব, অথবা যেখানে যেতে চাও সেখানেই পৌঁছে দেব, কিন্তু এভাবে ছুটে যেয়ো না। থাম, প্রিয়তমা মেরি --থাম!"

মেরি থামল না। দৌড়তে লাগল। একসময় হ্রদের উপর বেরিয়ে আসা এমন একটা ছোট পাহাড়ের উপর পৌঁছে গেল যার ওপারে আর পথ নেই। এবার প্রেমিক এসে তাকে ধরে ফেলবে একথা বুঝতে পেরে আর একবার আর্তনাদ করে উঠেই সে হ্রদের জলে ঝাঁপ দিল। হ্রদের শান্ত জলে তার পতনের শব্দ যুবকটির কানে বাজল মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনির মতো; এতক্ষণ সে ছিল প্রেমে পাগল, এবার সে হয়ে উঠল হতাশায় পাগল। দেখল, মেয়েটি ভাসতে ভাসতে ক্রমেই তীর থেকে হ্রদের গভীর জলের দিকে চলে যাচ্ছে; কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবতে শুরু করল, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল; একটু নড়ল না, একটিশব্দও চিৎকার করল না। এ ঘটনার আগেই অ্যাল্যানসন খুলে ফেলেছিল তার টুপি, জুতো ও কোট। সেও জলে ঝাঁপ দিল। মেরি যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সাঁতরে সেখানে গেল; কিন্তু সেখানে জলে একটা বুড়বুড়িও কাটছে না; এমনকি তার প্রিয়তমা যেখানে ডুবে গেছে সেখানে শেষ নিশ্বাসের একটা শব্দও রেখে যায়নি। সেই সংকট মুহূর্তে যুবকটির মনে হল, যদি বাঁচতে হয় তো প্রিয়তমার সঙ্গে বাঁচবে, আর না হয় তো তার বাহুবন্ধনের মধ্যেই মরবে। সেও ডুব দিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও না পারল হ্রদের তলদেশে পৌঁছতে, না বুঝতে পারল তলদেশ থেকে কতটা দূরে সে আছে। অবশেষে ক্লান্ত দেহে, ভগ্ন হৃদয়ে আবার সে তীরের পথই ধরল, আপাদমস্তক ভেজা অবস্থায় অর্ধনগ্ন দেহে সে ছুটল মেয়েটির বাবার বাড়িতে দুঃসংবাদ জানাতে। সব নিশ্চুপ। বুড়ো চাষী পরিবারটির কনিষ্ঠ ও একমাত্র কন্যা মেরি; তারা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে আছে। এই দুঃসংবাদ জানাতে তাদের ঘুম ভাঙাতে হবে- -এ কথা ভাবতেই প্রেমিকের চোখ জলে ভরে উঠল; কিন্তু জানাতে তো হবেই; দুঃসংবাদ হলেও তো তা জানাতেই হবে।

চাষীর জানালার কাছে গিয়ে কাতর স্বরে সে ডাকল, "অ্যান্ড্রু। অ্যান্ড্রু বার্নেট তুমি কি জেগে আছ?"

"এত রাতে আবার অ্যান্ড্রু বার্নেটকে কিসের দরকার পড়ল?"

"খুব খারাপ খবর অ্যান্ড্রু বার্নেট।"

"খবর যে খারাপ সে তো তোমার গলা শুনেই বুঝতে পারছি। কিন্তু খবরটা কি?"

"তোমাদের আদরের মেয়ে---তোমাদের একমাত্র মেয়ে মেরি—"

বুড়ো চমকে উঠল; বলল, "মেরির কি হয়েছে?" মেরির মাও ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "কি হয়েছে মেরির?" তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বালালো।

প্রতিবেশী যুবকটির অর্ধনগ্ন দেহ থেকে তখনও জল ঝরছে; তার দৃষ্টিতে উন্মাদ

হতাশা ফুটে উঠছে। সে দৃশ্য দেখে বুড়ো-বুড়ির বুকের ভিতরটা শিরশির্ করে উঠল: একটা কথাও তারা বলতে পারল না। একসময় যুবকটিই বলল, "মেরি চলে গেছে; তোমাদের ও আমার ভালবাসার মেয়েটি হারিয়ে গেছে, ঘুমিয়ে পড়েছে জলের নিচে, আর আমিই তাকে মেরে ফেলেছি।"

"তুমি পাগল হয়েছ জন অ্যালানসন," বুড়ো তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, "বদ্ধ পাগল; হ্যাঁ, তোমার চোখ-মুখই বলছে তুমি পাগল হয়েছ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তুমি পাগল হয়েছ; কিন্তু তুমি তো আবার ভাল হয়ে উঠবে, আবার আমাদের জ্বালাবে।" হঠাৎ কি মনে পড়ায় সুর পাল্টে বলল, "কিন্তু কি সব বলছি? এখনই তো চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যায়। বৌ, মেয়ের বিছানার কাছে চল তো দেখি?"

দুঃখে ও আতংকে কম্পিত বুকে জিন লিন্টন আলো নিয়ে মেরির ঘরের দিকে চলল, আর পুরুষ মানুষ দুটি চলল তার পিছু পিছু। ছোট লম্বা কুটিরটির একেবারে শেষপ্রান্তে মেরির ঘর। সে ঘরে ঢুকে তারা দেখল, মাথার উপর চাদর টেনে দিয়ে কে যেন বিছানায় শুযে আছে। বিছানার পাশে মেবির ছোট বাক্সটার উপর তাব পোশাকগুলি সুন্দরভাবে পাট করে রাখা আছে; সবসময যেমন থাকে। এ দৃশ্য দেখে বুড়ো-বুড়ির মুখে ফুটল আশার আলো, কিন্তু প্রেমিকের হৃদয ডুবে গেল গভীর হতাশার মধ্যে। বাবা নাম ধবে ডাকল, কিন্তু বিছানা থেকে কোন সাড়া এল না; তবে একটা কান্নার শব্দ সকলেই শুনতে পেল। বুড়ো সাহস করে মুখের উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দিল, আর কী আশ্চর্য, বিছানায় শুযে আছে মেরি বার্নেট; মুখখানি চোখের জলে ভিজে গেছে, কিন্তু ত্রিমূর্তির ভযার্ত মুখ দেখে সে মোটেই বিস্মিত হয়নি। অ্যালানসন ঢোক গিলল, এখনও সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মেরির পোশাকে হাত দিল; সব শুকনো, খটখটে, হ্রদের জলে ডুবে যাওয়ার চিহ্নমাত্র নেই।

অ্যালানসন বিস্ময়বিমূঢ়। তবু মেরি বেচে আছে - তাতেই তার আনন্দ অপরিসীম। মেরির বিছানার পাশে নতজানু হযে সে অনুমতি চাইল একবার তার হাতে চুমো খেতে। মেরি কিন্তু ঘৃণায় তাকে সরিয়ে দিল: জোব গলায বলল: "তুমি দুষ্ট লোক জন অ্যালানসন, মিনতি করছি, আমাব চোখের সামনে থেকে তুমি দূর হযে যাও। আজ রাতে যে কষ্ট আমি সযেছি তা রক্ত মাংসের মানুষের সহ্যের অতীত; আর সে কষ্ট আমাকে দিয়েছে তোমারই কোন দুষ্ট লোক। তাই যাঁর বিধান তুমি লঙ্ঘন করেছ তার নামে তোমাকে মিনতি করছি, তুমি আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাও।"

পরস্পরবিরোধী ঘটনার চাপে বিভ্রান্ত যুবকটি দুই হাত তুলে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। মুখটা মরার মতো সাদা হয়ে গেছে। তা দেখে বুড়ো-বুড়ির করুণা হল। মেয়ের ঘর থেকে বাইরে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তার শরীরটাকে গরম করল; তারপর তীব্র কৌতূহলে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগল। কিন্তু তার মুখ থেকে বোধগম্য কোন কথাই বের করতে পারল না। থেকে থেকে সে শুধু কয়েকটি অসংলগ্ন উক্তিই করতে লাগল—যেমন "হে ঈশ্বর, এ সবের অর্থ কি?" অথবা "এ সবই শয়তানের ভেল্কি; অশুভ শক্তি আমার উপর ভর করেছে।"

তার কাছ থেকে কোন কথা বের করতে না পেরে বুড়ো-বুড়ি নিজেরাই নানারকম জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিল। জন লিন্টন বলল, "নিশ্চয় হ্রদের ভিতর থেকে কোন জলপরী উঠে এসেছিল মেরির বেশ ধরে ছেলেটাকে নষ্ট করতে।" তা শুনে অ্যান্ড্রু বার্নেট উপদেশের ছলে বলল, "এবারের মতো খুব বেঁচে গেছ জন অ্যালানসন; কিন্তু বুড়ো মানুষের একটা পরামর্শ শোন—আর কখনও কোন ভাল মানুষের মেয়েকে ভুলিয়ে নিতে কখনও রাতবিরেতে বেরিয়ো না—বেরুলে তোমার কপালে অনেক কষ্ট আছে।"

অ্যালানসন তখনও থরথর করে কাঁপছে দেখে জিন লিন্টন দৌড়ে ঘরের ভিতর ঢুকে দুই শিশু ভর্তি কড়া সুরা এনে তাকে খাইয়ে দিল; আর অ্যান্ড্রু তার কব্জিতে সুতো বেঁধে দিয়ে একটা শক্ত লাঠি তার হাতে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল; যাবার আগে সেই সাবধান বাণীটা আর একবার শুনিয়ে দিল।

পরদিন সকালে মেরি অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশি সাজগোজ করল, কিন্তু তার সুন্দর মুখের উপর একটা গভীর বেদনার ছায়া স্পষ্ট হয়ে ছড়িয়ে পড়ল; মাঝে মাঝেই দুটি চোখ অবারণ অশ্রুধারা যেন টলমল করতে লাগল। সারা সকাল ভাল-মন্দ একটা কথাও বলল না, শুধু দুই একবার গভীর বিষণ্ন দৃষ্টিতে মার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল। বেলা নটা নাগাদ একটা খড়ের পাকানো দড়ি কাঁধে ফেলে সে হ্রদের পূর্বপ্রান্তের মাঠে চলে গেল বাবার খড়ের কিছু অংশ বেঁধে নেবে বলে; আগে থেকেই কথা ছিল, তার বাবা ও দাদা দুপুরবেলা ভেড়ার খোয়াড় থেকে সেখানে এলে মেরি গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে।

বুড়ো অ্যান্ড্রু বাড়িতে ফিরে এলে তার ও স্ত্রীর মধ্যে গত রাতের ঘটনা নিয়েই কথাবার্তা চলতে লাগল। কথাপ্রসঙ্গে অ্যান্ড্রু বলল, "ভাল কথা জন, গত রাতে আমাদের মেয়ে যুবক জন অ্যালানসনকে কিন্তু একটা খুব খারাপ কথা বলেছে।"

"কী আবার খারাপ কথা ও বলেছে; একটি ভাল খ্রিস্টান মেয়ের মতোই তো কথা বলেছে, বেশ করেছে।"

"আমি কিন্তু তা মনে করি না জিন। ও যে ছেলেটিকে হটিয়ে দিল সেটা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে না শয়তানের নামে তা কিন্তু সঠিক বোঝা গেল না।"

"আহা অ্যান্ড্রু, তুমি এ-কথা বলছ কেন? সে যে ঈশ্বরের নামেই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাতে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন?"

"আরে, মেয়ে তো স্পষ্ট করেই ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করতে পারত; তাহলে তো আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকত না; তার পরিবর্তে সে কি বলল, না-- 'যাঁর বিধান তুমি লঙ্ঘন করেছ তাঁর নামে তোমাকে মিনতি করছি, তুমি আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাও।' সে কার কথা বলেছে—ঈশ্বরের না শয়তানের? তাছাড়া, সে তো আরও বলেছে, 'তার কষ্ট রক্ত-মাংসের মানুষের সহ্যের অতীত।' তা থেকে কি এটাই বোঝায় না যে সে রক্ত মাংসের জীবের চাইতে অন্য কিছু? জিন লিন্টন, জিন লিন্টন! হায়, যদি এটাই ঘটে থাকে যে আমাদের মেয়ে জলে ডুবে গেছে,

আর তার রূপ ধরে আমাদের বাড়িতে ফিরে এসেছে একটা পরী, তাহলে তুমি কি বলবে?”

“চুপ কর অ্যান্ড্রু বার্নেট, চুপ কর; আমার বুকটা যে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। আমরা তো চিরদিন প্রভুর উপব ভরসা রেখেছি, তিনিও কোনদিন আমাদের পরিত্যাগ করেননি; তিনি কখনও শয়তানকে আমাদের উপর বা আমাদের সন্তানের উপর ভর করতে দেবেন না।”

“তুমি ঠিক বলেছ জিন; সেই আশাকেই আমরা আঁকড়ে ধরে থাকব।” এই কথা বলে বুড়ো অ্যান্ড্রু ছেলে আলেকজান্ডারকে নিযে মাঠের দিকে চলে গেল আদবেব মেরির কাজে সাহায্য করতে।

মাঠে পৌঁছে তারা তো অবাক। তিন ঘণ্টা হযে গেল মেরি বাড়ি থেকে বেরিযেছে, প্রতি ঘণ্টায় তার অন্ততপক্ষে একডজন খড়ের আঁটি বাঁধা উচিত ছিল, কিন্তু সে বেঁধেছে মোট সাত আঁটি, আর একটা অসমাপ্ত হযে পড়ে আছে। তাছাড়া, মেবিরও দেখা নেই। মজা কবার জন্য মেরি কোথাও লুকিযে আছে মনে করে তাব দাদা খড়ের গাদাব আনাচে-কানাচে অনেক খুঁজল, কিন্তু কোথাও তাকে পাওযা গেল না। যুবকটি গোযালেই রাত কাটাত বলে গত বাতে তাদেব বাড়িতে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার কিছুই সে জানত না; তাই তার বাবা এতে খুব শংকিত হযে পড়লেও সে নিজে ততটা ভয পেল না। বাবা কিছুতেই কাজে মন বসাতে পাবল না; মেবির জন্য অপেক্ষা করে একসময কোটটা গাযে দিযে বাড়ির পথ ধরল – সব দুঃখেব কথা স্ত্রীব কাছে বলত। যাবার আগে ছেলেকে বলে গেল, সে যেন আশপাশেব সব খামারে ও বাড়িতে খোঁজ নেয কেউ মেরিকে দেখেছে কি না।

বাড়িতে পৌঁছে অ্যান্ড্রু যখন স্ত্রীকে খবরটা দিল যে তাদের আদরের মেযেটি হাবিযে গেছে, তখন বৃদ্ধ দম্পতিটির শোকের আর শেষ বইল না। দু'জনে বসে বসে কাঁদতে লাগল। বুড়োর সব রাগ গিয়ে পড়ল জন অ্যালানসনের উপব। বলল, “হতচ্ছাড়াটা যদি ক্ষুব্ধ বাবা-মার মিনতি না শোনে তাহলে এই দুটি হাতের ধকল তাকে সইতেই হবে।”

যুবক অ্যালানসনকে বাড়িতে পাওয়ার তিলমাত্র আশা নেই জেনেও অ্যান্ড্রু সোজা চলে গেল ইন্‌ভার্লনে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে সে সবিস্ময়ে দেখল, অ্যালানসন প্রচণ্ড জ্বরে একেবাবে শয্যাশায়ী; বিকারের ঘোরে অনবরত ডাইনী, ভূত ও মেরি বার্নেটেব কথা বলছে। তার বিকার এতই তীব্র আকার ধারণ করেছে যে তিনজন লোক তাকে জোর কবে বিছানায শুইযে রেখেছে। তার বাবা-মা খোলাখুলিই বলল যে তাদের ছেলেকে হয ডাইনীতে ধরেছে, না হয় তো কোন অপদেবতা তার উপর ভর করেছে; ফলে গোটা পরিবারের দুঃখের কথা বলে আর কি হবে—এই কথা ভেবে বুড়ো মেষপালক নিঃশব্দে নিজের শোকসন্তপ্ত বাড়িতেই ফিরে গেল।

ব্যর্থ খোঁজাখুঁজির পরে তার ছেলেও বাড়ি ফিরল। কেউ তার বোনকে দেখেনি। তবে অক্সক্রুশ নামক জায়গায় একটা পাগলি বুড়ি বলেছে, একটা মস্তবড় রথে চড়ে

যুবক জন অ্যালানসনের সঙ্গে মেরিকে বার্কহিলের পথ ধরে যেতে দেখেছে; এতক্ষণ তারা ডাস্‌গ্রি চৌরাস্তায় পৌঁছে গেছে। শুনে বুড়ো-বুড়ি ভাবল, অত বড় কোন রথ তো এ অঞ্চলে নেই, আর সেরকম রথ চলবার মতো রাস্তাও এখানে নেই; কাজেই পাগলি বুড়ির কথাগুলোকে তারা বুড়ো বয়সের ভীমরতি বলেই ধরে নিল। তবু অনেক চেষ্টা করেও যখন মেরির কোন খোঁজই পাওয়া গেল না তখন বুড়ো অ্যান্ড্রু আর একবার সেই পাগলি বুড়ির কাছেই গেল। কিন্তু এবার সে কোন কিছুই স্মরণ করতে পারল না; এমন সব উপকথা আওড়াতে লাগল যার মাথামুণ্ডু কিছুই সে বুঝতে পারল না।

সুন্দরী মেরি বার্নেট হারিয়ে গেল। ১৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার সকাল নটায় সে তার বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়; পরনে ছিল সাদা গাউন ও সবুজ ওড়না, কাঁধে ছিল খড়ের দড়ি; সেই বেশেই তাকে গ্রামের মধ্যে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল। এইভাবে কার্কস্টাইলের মেরি বার্নেট হারিয়ে গেল। এই রহস্যজনক ঘটনায় সারা দেশে হৈ-চৈ পড়ে গেল। এই দুঃখজনক ঘটনা নিয়ে একসময় একটা দীর্ঘ পল্লী-গাথাও রচিত হয়েছিল; সর্বত্র গাওযাও হত। আমি শুধু তার কথাই শুনেছি, তার গান বা আবৃত্তি কখনও শুনিনি। তার অনেকগুলি শ্লোকই এইভাবে শেষ হত:

"কিন্তু সুন্দরী মেরি বার্নেট।
তোমাকে তো আর কোন দিন দেখতে পাব না।"

গল্পটা ক্রমেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল (এবং সেটা যে অত্যন্ত অতিরঞ্জিতভাবেই হল সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই), আর যে যুবকটি বেঁচে রইল তার প্রতি কটূক্তি বর্ষণেরও যেন কোন মাত্রা রইল না; অবশ্য কটূক্তি তার কিছুটা প্রাপ্যই ছিল, কারণ তার পর থেকেই সে আগের চাইতে দশগুণ খারাপ হয়ে উঠল। একটা ব্যাপারে কিন্তু সারা দেশ একমত হল: আসল মেরি বার্নেট হ্রদের জলে ডুবে মরেছে, আর যে জীবটি বিছানায় শুয়ে কেঁদেছিল ও পরদিন উধাও হল সে হয় কোন পরী, আর না হয় তো কোন পেত্নি; কারণ মাত্র একবার একটি রহস্যজনক উক্তি করা ছাড়া আর কোন কথাই সে বলেনি, এবং পরিবারের কারও সঙ্গে বসে কোনরকম খাবারও খায়নি। বাবা-মা এ নিয়ে কোন কথাও বলে না, কোনরকম চিন্তা ভাবনাও করে না, এই ক্লান্ত পৃথিবীর পথে তারা যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে দিনগুলো কাটাতে লাগল। মেরি বার্নেটের সব জিনিসই তারা পবিত্র স্মৃতি হিসাবে বাড়িতে রেখে দিল; সেগুলিকে ঘিরে মায়ের চোখে অনেক জল ঝরল।

বুড়ো অ্যান্ড্রু মাঝে মাঝেই হ্রদের তীব বরাবর হাঁটতে থাকে; মেয়ের কোন স্মৃতি-চিহ্ন যদি খুঁজে পাওয়া যায় এই তাব মনের আশা। অনেক ছোট ছোট হাড় সে সংগ্রহ করল; কোনটা ভেড়ার, কোনটা বা অন্য জন্তুর, আবার কোনটা হয় তো মাছের; বুড়োর ধারণা ওগুলো তার মেয়ের হাত-পায়ের আঙুলের হাড়। সেই সব হাড় সে তার ছোট থলিটাতে লুকিয়ে রাখে।

যুবক অ্যালানসনের জ্বর-বিকার ভাল হয়ে গেল; কিন্তু অন্য সকলের মতো ধীরে

ধীরে নয়, হঠাৎ একদিন সে সুস্থ হয়ে উঠল। তাকে দেখে মনে হত মেরি বার্নেটেব কথা তাব মনেই নেই। সে আগের চাইতে দশগুণ বেশি খারাপ হয়ে গেছে। অসংকোচে সবরকম অন্যায় কাজ করে। সকলেই তাকে ঘৃণা করে।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। মেবি বার্নেট হাবিয়ে যাবার পরের বছর। এক শুক্রবার সকালে জন অ্যালানসন গেল অ্যানান্‌ডেল-এব অন্তর্গত মোফাট গ্রামের মস্ত বড ভাডাটে মেলায বাড়ির কাজের জন্য একটি দাসী ভাড়া করতে। তার চরিত্রের কুখ্যাতি তখন এতই ছড়িযে পডেছে যে আশেপাশেব কোন যুবতীই তার বাবার বাড়িতে কাজ করতে বাজী হয় না। তাই সে মোফাট-এব মেলায গেল একটি সুন্দরী মেযেকে ভাড়া করে আনতে; মনের ইচ্ছা, বাড়িতে এনেই তাকে নষ্ট করবে। এটা কোন অনুমানমাত্র নয, কারণ মেলায তাব সহযাত্রী কার্বিফেবান গ্রামেব মিঃ ডেভিড ওযেলচ্‌কে সে তার মনের কথাটি বেশ গর্বভবেই বলেছিল। কিন্তু অ্যানান্‌ডেল-এর কুমারী মেযেদেব একটি অভিভাবক-পবী যে সেদিন মেলায উপস্থিত ছিল সে কথা তারা কেউই জানত না।

ভাডাটে বাজারে ঘুরতে ঘুরতে একটি মেযে অ্যালানসনের নজরে পড়ে গেল: না পড়ে আব যাবে কোথায, তাব মতো সুন্দরী, মনোরমা মেলায আব একটিও ছিল না। মিঃ ওযেলচ্ চুপচাপ দাড়িযে অ্যালানসনকে দেখতে লাগল। অ্যালানসন সুন্দবীকে একপাশে ডেকে নিযে গেল। তাব পবনে সবুজ পোশাক, যেন সদ্যফোটা গোলাপটি।

"তুমি কি ভাড়া যাবে সুন্দরী?"

"আজ্ঞে হ্যা।"

"আমার সঙ্গে ভাড়া যাবে?"

"আপত্তি নেই। তবে অনেক দিনেব জন্য ভাড়া করতে হবে।"

"অবশ্য। যত বেশি দিনেব জন্য হয ততই ভাল। কত মাইনে চাও?"

"কি জানেন, আমি যদি ভাড়া যাই তো ইন্‌ভার্লনে প্রথম যে জীবিত প্রাণীটিকে দেখব তাকেই আমাব চাই।"

তাহলে সে তো আমিই হব। কিন্তু ইন্‌ভার্লন সম্পর্কে তুমি কি জান?"

"আমার তো ধাবণা সবকিছুই আমাব জানা উচিত।"

"কী আশ্চর্য! এ মুখ যে আমার কাছে নিজেব মুখেব মতোই চেনা, বুঝি বা তার চাইতেও বেশি চেনা। কিন্তু নামটা ঠিক মনে কবতে পাবছি না। তোমাব নামটা জিজ্ঞাসা কবতে পাবি কি?"

হাত তুলে মেয়েটি গম্ভীর গলায় বলল, "চুপ! চুপ! চুপ! ও কথা এখন থাক।"

যুবক চেঁচিযে বলল, "আমি যে হতভম্ব হযে গেছি। এ কথার অর্থ কি? দোহাই তোমার, তোমাব নামটা বল।"

মেয়েটি ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "আমার নাম মেরি বার্নেট।" বলেই সে সবুজ ওড়নাটা মুখের উপর টেনে দিল।

সেই মুহূর্তে যদি অ্যালানসনের মৃত্যুর পরোয়ানা জারি করা হত তাহলেও হয় তো তার বুদ্ধিশুদ্ধি এতখানি লোপ পেত না। মুখটা মরার মতো সাদা হয়ে গেল, চোয়াল ঝুলে পড়ল, চোখ দুটি চকচক করতে লাগল। মিঃ ওয়েলচ্ সারাক্ষণ তার উপরে নজর রেখেছিল। সহযাত্রীর সংকটজনক অবস্থা বুঝতে পেরেই সে এগিয়ে গেল। বলল, "অ্যালানসন? মিঃ অ্যালানসন? কি হল তোমার? মেয়ে যে তোমাকে যাদু করেছে—একেবারে পাথরের মূর্তি বানিয়ে ফেলেছে!"

অ্যালানসনের গলার মধ্যে একটা শব্দ হল; যেন কিছু বলতে চাইল, কিন্তু জিভে কোন শব্দ উচ্চারিত হল না; কেবল বিড়বিড় করতে লাগল। তার বিকার দেখা দিয়েছে, এখনই মূর্ছা যাবে —এটা বুঝতে পেরে মিঃ ওয়েলচ্ তাকে ধরে নিয়ে "জনস্টন আর্মস্" সরাইখানাতে ঢুকল। কিন্তু অনেক প্রশ্ন করেও তার মুখ থেকে কোন কথা বের করতে পারল না। ওয়েলচের কিন্তু ঐ সবুজবসনা সুন্দরীকে আর একবার দেখার খুব ইচ্ছা হল। তাই অ্যালানসনকে বেশ কিছুটা মদ খাইয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে গোটা মেলা তন্ন তন্ন করে খুঁজল, কিন্তু সবুজবসনা সুন্দরী উধাও— কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। নিজের নামটা বলেই সে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। অ্যালানসন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। আবার সে ফিরে গেল বাজারের মাঝখানে।

অচিরেই আগেরটির চাইতেও সুন্দরী একটি মেয়েকে দেখতে পেল। সে যেন একটি ক্ষীণকটি পরী; পরনে বরফ সাদা পোশাক, তাতে সবুজ ফিতে বাধা। ওয়েলচ্ বলল, এমন সুন্দরী সে জীবনে দেখেনি। অ্যালানসন তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে যথারীতি প্রশ্ন করল: "তুমি কি ভাড়া যাবে সুন্দরী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আমার সঙ্গে ভাড়া যাবে?"

"আপত্তি নেই।"

"তাহলে কত মাইনে চাও? আরে -খোলাখুলি বল। তবে ভেবেচিন্তে বল। অল্পসল্পের জন্য তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে যাব না।"

"আমার মাইনে হবে বিনিময়ে; অন্য কোন শর্তে আমি কাজ করব না। বলুন তো ইনভার্লনের সব ভাল মানুষরা কেমন আছে?"

অ্যালানসনের দম বন্ধ হয়ে এল; শরীরের ভিতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বইতে লাগল; কোনরকমে বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ - সকলেই মোটামুটি ভাল আছে।"

মেয়েটি আবার শুধাল, "আর আপনার প্রতিবেশী বৃদ্ধ দম্পতি! তারা কি এখনও বেঁচে আছে -ভাল আছে?"

অ্যালানসন হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল, "আমি—আমি---আমি জানি তারা ভালই আছে। কিন্তু আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না কে তুমি যে এত সব খবর রাখ?"

"সে কি?" মেয়েটি বলল, "কার্কস্টাইলের মেরি বার্নেটকে তুমি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে!"

অ্যালানসন এমনভাবে চমকে উঠল যেন একটা বুলেট তার বুকে বিঁধেছে। সুন্দরী পরী-মূর্তি ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল, আর হতভম্ব যুবকটি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। মিঃ ওয়েল্‌চের ডাকে চমক ভাঙতেই আর একটি সুন্দরীকে দেখতে পেযে তাকেও ভাড়া করতে চাইল এবং একই জবাব পেল। একই নাম শুনল। আসলে, প্রথম যখন আমি গল্পটা শুনি তখন এই রকম সাতটি সুন্দরীর কথা আমাকে বলা হয়েছিল, আর তারা সকলেই ছিল কার্কস্টাইলের মেরি বার্নেট। কিন্তু আমার ধারণা, অতগুলি সুন্দবীকে পবীক্ষা করার আগেই সে নিশ্চয বুঝতে পেরেছিল যে তাব উপর কোন অপদেবতাব ভর হযেছে। যাই হোক, যখন কিছুতেই কিছু হল না, তখন সে বসে বসে বেশ খানিকটা কড়া মদ পেটে ঢালতে লাগল। আর তখনই মেলায এমন একটি অপরূপা সুন্দবীর আবির্ভাব ঘটল যে সকলেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাব উপরে। সোনালি কাজ কবা বথে চড়ে মেলায এসেছে এক সুন্দরী; সোনালি সবুজ উর্দিপবা দুটি পবিচাবক তার রথের সামনে, দুটি পিছনে; মোফাট এব মেলায এমন চমৎকাব উল্কা এব আগে কেউ কখনও দেখেনি। সঙ্গে সঙ্গে গোটা মেলায খবব ছড়িযে পড়ল যে এই সুন্দরী আর্ল অব মর্টনেব জ্যেষ্ঠা কন্যা লেডি এলিজাবেথ ডগ্‌লাস; সম্প্রতি তিনি মোফাটেব নিকটবর্তী অচিনক্যাসলে বেড়াতে এসেছেন। স্কটল্যান্ডে তখন তাব রূপেব খুব খ্যাতি; আব পরবর্তীকালে তিনিই হয়েছিলেন লেডি কীথ। এই কাহিনীতে তাব নামটি উল্লেখিত হওয়াতেই জানা যায় যে সময়টা ছিল চতুর্থ জেম্‌সের রাজত্বকাল। আব সেই সমযেই স্কটল্যান্ডে ভূত-প্রেত-ডাইনীতে মানুষেব বিশ্বাস ছিল সর্বাধিক।

মেলার সকলেবই বিশ্বাস যে এই সুন্দবী আর্ল অব মর্টনের কন্যা। তিনি যখন "জনস্টন আর্মস" সবাইখানায এলেন তখন সবুজ পোশাক পবা একটি ভদ্রলোক খালি মাথায় এসে তাকে গাড়ি থেকে নামিযে নিল। সকলেই একদৃষ্টিতে এই অপরূপা সুন্দবীকে দেখল, কিন্তু অ্যালানসনের মতো এত বিহ্বল কেউ হল না। স্বর্গে, মর্ত্যে, বা পবীদের দেশে এর অর্ধেক মনোরমা কাউকে দেখার কথা সে কোনদিন ভাবতেই পারেনি। প্রশংসায বিমূঢ় হযে সে যখন দাঁড়িযেছিল তখন তাকে আরও বিস্মিত কবে দিযে সেই অতুলনীয়া সুন্দবী তাকে ইশারায কাছে ডাকলেন। নিজেব চোখকে সে বিশ্বাস কবতে পারল না, আব কেউ ব্যাপারটা লক্ষ্য কবেছে কি না বুঝবার জন্য এদিক ওদিক তাকাতে লাগল; কিন্তু সুন্দবী তাকে দ্বিতীযবাব কাছে ডাকলেন; এবাব তাব মুখে বিজযিনীব মধুব হাসি। সঙ্গে সঙ্গে অ্যালানসন মাথায় বীভারটুপিটা খুলে দ্রুত পাযে তাব দিকে এগিযে গেল; আর সুন্দরী হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে দু'জনে সরাইখানায ঢুকে গেলেন।

অ্যালানসন ভাবল, দেশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী লেডি এলিজাবেথ ডগলাস এইভাবে তাকে কৃতার্থ করেছে; মেলার অন্য সকলেও তাই ভাবল।

মহিলাটি প্রথমেই অ্যালানসনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। অ্যালানসন যথাসম্ভব বিনীতভাবে মহিলাকে ধন্যবাদ জানাল। তারপরেই সুন্দরী অ্যালানসনের

বাবা ও মার কথা জানতে চাইলেন। ওহো! যুবকটি নিজের মনেই বলে উঠল, তাহলে, তাহলে তো এই সুন্দরী তার প্রেমে পড়েছে! একান্ত বিনয়ে তার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যুবকটি সুন্দরীর বাবা ও যুবক লর্ড উইলিয়ামের কথা বলতে শুরু করতেই মহিলাটি তাকে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন, যুবক তাকে চিনতে পেরেছে কি না।

হ্যা, নিশ্চয! মাননীয়া মহিলাকে সে অবশ্যই চেনে, মনে হচ্ছে আগে তাকে সে অনেকবার দেখেছে, কিন্তু কবে, কোথায তাদের দেখা হযেছিল এই মুহূর্তে সেটা কিছুতেই স্মরণ করতে পারছে না।

তারপরেই সুন্দরী কার্কস্টাইলের প্রতিবেশীদের কথা জানতে চাইলেন ; তারা এখনও বেঁচে আছে কি না, ভাল আছে কি না!

অ্যালানসনের মনে হল তার হৃৎপিণ্ডটা বুঝি জমাট বরফ হযে গেছে। সারা দেহে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল ; ধপ্ করে একটা আসনে বসে নিশ্চল হযে রইল ; কিন্তু সুন্দরী মহিলা মধুর বচনে তাকে সান্ত্বনা দিলেন ; তখন সে আবার কথা বলার মতো সাহস ফিরে পেল।

যুবক বলল, "সে কী! তাহলে আপনিই কি সারাটা দিন আমাকে নিয়ে খেলা করেছেন ?"

সুন্দরী বললেন, "মিঃ অ্যালানসন, প্রথম প্রেম তো এত সহজে চলে যায না। আমাকে দেখেই তুমি বুঝতে পারছ যে আজ আমি ভাগ্যবতী ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার প্রতি আমার প্রথম প্রেম আজও অটুট ও অপরিবর্তিত আছে ; তাই তোমার ভালবাসাকে পরীক্ষা করতে, আমাকে দেখলে তোমার মনে কি ভাব জাগে সেটা বুঝতে তোমার সঙ্গে যদি একটু লুকোচুরি খেলে থাকি তো সেজন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

যুবক বলল, "আজ সারাটা দিন আমি যে বারে বারে তোমার মুখই দেখেছি সেটাই আমার পরম ভাগ্য। কিন্তু একবার যখন দু'জনের দেখা হযেছে তখন আর সহজে আমরা আলাদা হযে যাব না। তোমার সেবাতেই জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটিযে দেব, শুধু বল তুমি কোথায থাক।"

"খুবই কাছে ; এখান থেকে সামান্য দূরে ; তোমার পক্ষে যদি সুবিধা হয় তো আজ রাতে সেখানে তোমাকে কাছে পেলে আমি খুব— খুব খুশি হব। কিন্তু বর্তমানে আমার স্বামী যে বাড়িতে নেই, অনেক দূর দেশে চলে গেছে।"

যুবক বলল, "তাতে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটায কোন বাধা হবে বলে তো আমি মনে করি না।"

বাইরে অনিচ্ছা দেখালেও শেষ পর্যন্ত সুন্দরী যুবকটিকে তার বাড়িতে যাবার অনুমতি দিলেন ; তাকে পথ দেখিযে নিয়ে যাবার জন্য একজন বিশ্বাসী লোককে রেখে যেতে চাইলেন ; কিন্তু যুবকটি তাতে আপত্তি জানিযে বলল সে একাই যেতে পারবে ;

অগত্যা তাকে নিজের প্রাসাদের পথটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে সুন্দরী তার রথে চেপে চলে গেলেন।

অ্যালানসন তখন পার্থিব সবকিছুর উপরে উঠে গেছে। বন্ধু ডেভিড ওয়েলচ্‌কে খুঁজে বের করে তার অসাধারণ সৌভাগ্যের কথা জানাল, কিন্তু সেই সুন্দরী যে লেডি এলিজাবেথ ডগলাস নয় সেকথাটা তাকে বলল না। ওয়েল্‌চ জোর করেই তার সঙ্গ নিল, এবং মহিলাটির মস্তবড় প্রাসাদের রাস্তা পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গেই গেল; সেখানেই একা দাঁড়িয়ে থেকে সে দেখল, অ্যালানসন প্রাসাদের ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। আকাশের তারার মতোই অসংখ্য আলোয় প্রাসাদটা ঝল্‌মল্‌ করছে।

অ্যালানসন বাবা-মাকে কথা দিয়ে গিয়েছিল, মেলা ভাঙবার পরদিন সকালে প্রাতরাশে তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু সেদিন তো সে এলই না, তৃতীয় দিনে বুড়ো মানুষটা সাদা ঘোড়ায় চেপে মোফাটের পথে যাত্রা করল ছেলের খোঁজে। পথে কারিফেরান এ মিঃ ওয়েলচ্‌ এর সঙ্গে দেখা করল। যুবকটি বাড়ি ফেরেনি শুনে সে তো খুবই অবাক হয়ে গেল। তবু বুড়োকে বলল, তার ছেলে নিরাপদেই আছে, কাজেই বুড়ো এখান থেকেই বাড়ি ফিরে যাক। তারপর বুড়োর পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানাল যে তার ছেলে আর্ল অব মর্টনের সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়েছে, সেই সুন্দরীর ইচ্ছানুসারেই তার প্রাসাদে গেছে, ডেভিড ওয়েলচ নিজে ফটক পর্যন্ত তার সঙ্গে গেছে, তাকে প্রাসাদে ঢুকতে দেখেছে, সে যখন এতদিন সেখানেই রয়ে গেছে তাতেই বোঝা যাচ্ছে সেখানে তার আদর আপ্যায়ন বেশ ভালই হয়েছে।

বুড়োকে খুব ভেঙে পড়তে দেখে মিঃ ওয়েলচ্‌ অগত্যা তার সঙ্গেই চলল। মোফাটে পৌঁছে তারা দেখল তার ঘোড়াটা সরাইখানার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু লেডি এলিজাবেথ ডগলাসের বাড়ি যাবার পর থেকে ঘোড়ার মালিকের দেখা পাওয়া যায়নি। মিঃ ডেভিড ওয়েলচ্‌কে সঙ্গে নিয়ে বুড়ো অচিনক্যাসলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল; কিন্তু সেখানে পৌঁছবার অনেক আগেই মিঃ ওয়েলচ্‌ তাকে বলল যে তার ছেলেকে সেখানে মোটেই পাওয়া যাবে না, কারণ মেলার দিন সন্ধ্যার পরে এ পথের ঠিক বিপরীত দিকের একটা পথে তারা গিয়েছিল। যাই হোক, তারা দুর্গ প্রাসাদে গিয়ে হাজির হল। আর্লের সঙ্গে দেখা করল। বুড়োর কথা শুনে তিনি মেয়ে এলিজাবেথকে ডেকে পাঠালেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে মেয়ের মেলায় দেখা হওয়া এবং গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তাকে এই বাড়িতে আমন্ত্রণ করে আনা প্রভৃতি বিষয়ে নানারকম প্রশ্ন করে শেষ পর্যন্ত আর্ল বললেন যে তাকে নিশ্চয় প্রাসাদের কোথাও নিরাপদে লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

বাবার মুখে এই সব কথা শুনে এবং বুড়ো মানুষটির গম্ভীর বিপর্যস্ত দৃষ্টি দেখে মহিলাটি যে কি করবেন, কি বলবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু মিঃ ওয়েলচ্‌ই তাকে সে সংকট থেকে উদ্ধার করল। সে বেশ জোর দিয়েই বুড়ো অ্যালানসনকে বলল যে তার ছেলে যে মহিলাটির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তিনি এই মহিলা

নন; তাকে সে খুব ভাল করে দেখেছে, এবং হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যেও তাকে আবার চিনতে পারবে; তাছাড়া, সেদিন যে প্রাসাদের কাছে সে বুড়োর ছেলের সঙ্গে এসেছিল সেটাও এই প্রাসাদ নয়; সে প্রাসাদটা মোটেই এই ধরনেরই নয়। তারপর বলল, "বরং তুমি আমার সঙ্গে চল, এ অঞ্চলে নবাগত হলেও তোমাকে আমি ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারব।'

আবার তারা যাত্রা করল। মিঃ ওয়েলচ্ যুবক অ্যালানসনের সঙ্গে মোফাট থেকে যে পথে গিয়েছিল সেই পথ ধরে কয়েক মাইল যাবার পরে তারা একটা চৌমাথায় পৌঁছে গেল। তখন ওয়েলচ্ বলল, "আমরা ঠিক পথেই এসেছি। আর একটু এগিয়েই আমরা ঐ গাছটার কাছে পৌঁছে যাব; সেখান থেকে একটু দূরেই আমি অ্যালানসনকে মস্তবড় ফটকটা দিয়ে ঢুকতে দেখেছিলাম। তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা সেই প্রাসাদে পৌঁছে যাব।"

তারা গাছটার কাছে গেল; আরও একটু এগোল; তারপরেই মিঃ ওয়েলচের মুখে আর কোন কথা নেই: সেখানে না আছে প্রাসাদ, না আছে ফটক; আছে শুধু পঞ্চাশ ফ্যাদম গভীর একটা প্রচণ্ড খাদ, আর তার নিচ দিয়ে ফেনিল তরঙ্গ তুলে বয়ে চলেছে একটা কালো স্রোত।

বুড়ো অ্যালানসন বলে উঠল, "এটা কি হল? এখানে তো না আছে প্রাসাদ, না আছে জন-বসতির কোন চিহ্ন।"

ওয়েলচের মুখে অনেকক্ষণ একটি কথাও ফুটল না; পাথরের মূর্তির মতো সে হা করে এই পরিবর্তিত ভয়ংকর দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একসময় বলল, "যিনি মানুষের আত্মা সৃষ্টি করেছেন, যে সব আত্মা মাটিতে ও বাতাসে ঘুরে বেড়ায় তাদের সৃষ্টি করেছেন, একমাত্র তিনিই বলতে পারেন এটা কি? আমরা এক যাদুর রাজ্যে এসে পড়েছি, মানুষের ধরা ছোয়ার বাইরের কোন শক্তি আমাদের উপর ভর করেছে। ঠিক এইখান থেকে আমি তোমার ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, আর ওদিকে - ওই খাদের প্রান্তে অথবা তার ঠিক উপরেই ছিল সেই অপূর্ব প্রাসাদের মস্ত বড় ফটক। মানুষের বুদ্ধি বিবেচনায় এসব ব্যাপার কেমন করে ধরা পড়বে?"

তারা খাদের একেবারে সীমানার কাছে এগিয়ে গেল। মিঃ ওয়েলচ্ই আগে আগে গেল ঠিক যেখানে ফটকটা খুলে গিয়েছিল। সেখানে লাফিয়ে ওঠা ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ তারা দেখতে পেল; কিন্তু দেখে মনে হল যে ঘোড়াটা কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়েছিল, কিন্তু নিচে-- অনেক নিচে পড়ে আছে জন অ্যালানসনের তালগোল-পাকানো মৃতদেহ; আর এইভাবে এক অদৃষ্টপূর্ব রহস্যের ভিতর দিয়ে একটি দুষ্ট পাপাসক্ত যুবকের জীবনের অবসান ঘটল। এই রূপকথা থেকে কী সুন্দর একটি নীতিবাক্যই না বের করা যায়!

আপনারা হয়তো বলবেন এই গল্পের অনেক আঁকাবাঁকা পথের কোথাও মেরি বার্নেটের পরে কি হল তা বলা হয়নি; কারণ মোফাটে তাকে যখন সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল তখন সে তো একটা অশরীরী মূর্তি বা ছায়ামাত্র! প্রিয় পাঠক পাঠিকা,

সেই কুমারীর কি হল তার একটি বিবরণ আমি আপনাদের দিতে পারি। এই প্রাচীন রূপকথায় যাই বলা হোক না কেন, আমার তো মনে হয় সেই মেয়েটির ভাগ্য আরও দশগুণ বেশি রহস্যের জালে আবৃত।

যেদিনটিতে মেরি হারিয়ে গিয়েছিল, প্রতি বছর সেই দিনটিকে মেরির সান্ত্বনাবিহীন বৃদ্ধ বাবা-মা শোক, উপবাস ও প্রায়শ্চিত্তেব দিন হিসাবে পালন করে। সাত-সাতটা বছর এল ও চলে গেল; উপবাস ও প্রার্থনার সপ্তম বার্ষিকী দিবস সমাগত। আগের দিন সন্ধ্যায় বুড়ো অ্যান্ডু আদরের মেরিব স্মৃতি চিহ্নের খোঁজে যথারীতি হ্রদের বালির উপর দিয়ে হাঁটছিল। এমন সময় সে দেখল, উস্কোখুস্কো চেহারার একটি ছোটখাট বুড়ো মানুষ তার দিকেই দ্রুত এগিযে আসছে। লোকটির উচ্চতা পাঁচেব বেশি নয়; মুখটা মোটেই মানুষের মতো দেখতে নয়; তবু তার আচরণ ভদ্র, কথাবার্তা শোভন। অ্যান্ডুকে শুভসন্ধ্যা জানিযে শুধাল, সে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে। অ্যান্ডু জবাব দিল, যা কোনদিন পাওযা যাবে না তাই সে খুঁজছে।

নবাগত বলল, "প্রবীণ মেষপালক, দযা করে আপনার নামটা বলুন; মনে হচ্ছে আপনার দরকারী কিছু কথা আমাব জানা উচিত; হয তো আপনাকে একটা খবর আমি দিতে পারব।"

অ্যান্ডু বলল, "হাযবে! আমার নাম জেনে আপনার কি হবে? আমার নামে এখন কারও কোন দরকার নেই।"

নবাগত শুধাল, "আপনার কি কোন সুন্দরী কন্যা ছিল যার নাম মেরি?"

"এ বড় হৃদয-বিদারক প্রশ্ন।" অ্যান্ডু বলল; "তবে হ্যাঁ, একসময মেরি নামে আমাব একটি আদরিণী কন্যা ছিল।"

"তারপর তার কি হল?" নবাগত শুধাল।

অ্যান্ডু মাথাটা নেড়ে মুখ ঘুরিযে হাঁটতে লাগল; এ বিষয়েব কোন আলোচনা সে সইতে পারে না। হ্রদের বালুকাময তীর ধবে সে চলতে লাগল। তার ন্যুব্জ দেহ, তাব চলন, চোখের দৃষ্টি, মুখের ভাব- -সবকিছুতেই ফুটে উঠেছে গভীর হতাশা। বেটে লোকটি তবু তার পিছনেই চলতে লাগল। একসময বলল: "দেখুন, দেখে মনে হচ্ছে কোন সত্যিকারেব অথবা কল্পিত দুঃখে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু আপনি যা করছেন সেটা যুক্তিসম্মতও নয়, ধর্মসম্মতও নয়। সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে যা ঘটেছে তা নিযে প্রশ্ন তোলার কী অধিকার মানুষের আছে?"

উপদেশদাতার দিকে অবাক হযে তাকিযে অ্যান্ডু বলল, "নিজেকে সমর্থন আমি করছি না; কিন্তু এমনকিছু ভাব যাকে যুক্তি বা ধর্ম দিয়ে চাপা দেওয়া যায না; আবার এমন ভাবও আছে যাকে মনেব মধ্যে লালন করলে বাবা-মাব কোন পাপ হয না।"

নবাগত বলল, "আমি কিন্তু তা স্বীকার করি না। সর্বময অধিকর্তার নির্দেশকে শান্ত হৃদযে গ্রহণ না করাটাই অধর্ম। কিন্তু এসব তর্ক থাক; আবার আপনাকে প্রশ্ন করছি, আপনার মেয়ের কি হল?"

অ্যান্ড্রু গম্ভীর মুখে জবাব দিল, "যিনি তার আত্মার পিতা, তার দেহের সৃষ্টিকর্তা তাকে জিজ্ঞাসা করুন; জিজ্ঞাসা করুন তাঁকে যাঁর হাতে শিশুকাল থেকেই তাকে সঁপে দিয়েছিলাম। আমার সেই মেয়ের কি হয়েছে তা জানেন শুধু তিনি, আমি জানি না।"

"কতদিন আগে তাকে হারিয়েছেন?"

"কাল সাত বছর পূর্ণ হবে।"

"আচ্ছা, আপনার দেখছি সময়টা খুব ভালই মনে আছে। এত বছর ধরে তার জন্য শোক করছেন?"

"হ্যাঁ, আর আমার সব স্নেহের আধার সেই একমাত্র কন্যার জন্য শোক করতে করতেই মরে চলে যাব। হে অপার্থিব পরামর্শদাতা, আমার আদরের মেয়ের কোন খবর কি আপনি রাখেন? যদি রাখেন তাহলে আপনি নিশ্চয় জানেন যে সে অন্য মেয়েদের মতো ছিল না, যে সরলতা ও পবিত্রতা আমার মেয়ে মেবিকে ঘিরে ছিল তা মানুষের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়।"

"আপনি কি আবার তাকে দেখতে চান?" বামন জিজ্ঞাসা করল।

অ্যান্ড্রু ঘুরে দাঁড়াল, তার সারা শরীর কাঁপছে, বেঁটে বামনটির দিকে তাকিয়ে সে তীব্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, "আবার তাকে দেখতে পাব? আপনি বলছেন, তাকে দেখতে চাই কি না!"

বামন বলল, "হ্যাঁ, তাই তো বলছি, আরও বলছি, এই স্মারকটি চেনেন কি? ভাল করে দেখুন, চিনতে পারেন কি না!"

অ্যান্ড্রু স্মারকটি হাতে নিল; একবার সেটার দিকে, তারপর নবাগতের দিকে, আবার স্মারকটির দিকে তাকাল, দুই চোখ জলে ভরে গেল; সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। সে কান্না সুখের কান্না, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে হাসির উচ্ছ্বাস। স্মারকটিকে চুমো খেতে খেতে সে ভগ্নকণ্ঠে বলতে লাগল: "হ্যাগো বুড়ো, আমি এটিকে চিনি!— আমি চিনি! আমি চিনি! এ তো সেই এডোয়ার্ড মার্কা মোহর, এতে তিনটে ছিদ্র আছে; অষ্টাদশ জন্মদিনে মেবিকে এটা উপহার দিয়ে বলেছিলাম, সে যেন এক প্রস্থ পোশাক কিনে নেয়। কিন্তু স্মারকটি হাতে পেয়ে সে বলেছিল, 'আহা, এটা এত সুন্দর! দাতার কথা স্মরণ করে আমি এটা রেখেই দেব, খরচ করব না।' আহা, সোনা আমার! কিন্তু আগে আপনি বলুন। সে কেমন আছে? কোথায় আছে? সে কি বেঁচে আছে, না মারা গেছে?"

বামন জবাব দিল, "সে বেঁচে আছে, সুস্থ দেহে আছে, বরং আগের চাইতে ভাল আছে; আরও সাহসী হয়েছে, আরও সুখে আছে, আরও সুন্দর হয়েছে। কিন্তু আপনি যদি তাড়াতাড়ি তৈরি হতে পারেন, তাহলে কাল বিকেলে মোফাটে তাকে সপরিবারে দেখতে পাবেন। দূর দেশে ভ্রমণের পথে তারা সেখান দিয়েই যাবেন; কিন্তু যাত্রাটা খুব জরুরী; তাই আমাকে এই স্মারকটি দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন

যাতে সব কথা জেনে মরবার আগে আদরিণী কন্যাকে আর একবার দেখবার ও আলিঙ্গন করবার সুযোগ আপনি পান।”

“মোফাটে আমার মেরির সঙ্গে দেখা হবে? তাহলে আসুন ছোট মানুষটি, আসুন স্বর্গের দূত, এই বুড়ো মেষপালকের ঘরের সেবা আনন্দের পেয়ালায় একটু চুমুক দেবেন আসুন। তারপরই আমি আপনার পায়ে পা মিলিয়ে পথে নামব, আমার বুড়িও আমাদের সঙ্গে পা মেলাবে। তাই আপনাকে মিনতি করছি আমার সঙ্গে আসুন।”

লোকটি বলল, “আপনার বাড়িতে যাবার অথবা সেখানে পেয়ালায় চুমুক দেবার মতো সময় আমার নেই। আপনার সংসার আরও বাড়-বাড়ন্ত হোক, আপনাদের অন্তর সুখে ভরে উঠুক! কিন্তু আমার পথ তো এদেশে আপনার দেওয়া মাংসের স্বাদ গ্রহণ বা পেয়ালায় চুমুক দেবার দিকে নয়, আমাকে দ্রুত ফিরে যেতে হবে তার কাছে যিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনি যান, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আসুন, কারণ নষ্ট করবার মতো সময় আপনার হাতে নেই।”

অ্যান্ড্রু শুধাল, “ঠিক কখন সে ওখানে হাজির হবে?”

বামন চেঁচিয়ে জবাব দিল, “পবিত্র ক্রুশের ছায়া যখন পূর্ব দিকে হেলবে ঠিক তখন।” বলেই সে মুখ ঘুরিয়ে পা চালিয়ে দিল।

বুড়ি জিন লিন্টন স্বামীকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে ফটকের বাইরে এসে উদ্বেগের সঙ্গে শুধাল, “কি হয়েছে অ্যান্ড্রু বার্নেট?”

“আমার পথ থেকে সরে দাড়াও বৌ, কি জান, আমার খুব তাড়া আছে।”

“সে তো দেখতেই পাচ্ছ গো ভালমানুষ; কিন্তু একটু স্থির হয়ে দাড়াও, আমাকে বল কিসের এত তাড়া। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে এরকম করছ?”

“না, না, জিন লিন্টন, আমার মাথা খারাপ হয়নি আমাকে এক্ষুণি মোফাট পর্যন্ত ছুটে যেতে হবে।”

“হা ঈশ্বর! বুড়োর কথা শোন! মোফাটে আবার তোমার কি কাজ পড়ল? তোমার কি মনে নেই যে রাত পোহালেই আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করতে হবে?”

“আরে বুড়ি, আমার পথ থেকে সরে দাড়াও। ওসব অনুষ্ঠানের কথা এখন থাক। অনুষ্ঠান হবে মোফাটে, সকাল বেলা। আরে বৌ, তুমিও তো মোফাটে যাবে। কি ভাবছ বৌ? হু হু! আমার কেরামতি যে কতখানি তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।”

“অ্যান্ড্রু- অ্যান্ড্রু বার্নেট!”

“হাঁ করে দেখছ কি গো? তাড়াতাড়ি কর, আমার গরমের পোশাকটা বের করে দাও। আরে জিন লিন্টন, শুনতে পাচ্ছ, তুমিও বিয়ের গাউন আর রেশমী ওড়নাটা পরে নাও; কারণ সকালে তোমাকেও যে মোফাটে পৌঁছতে হবে। অবাক হচ্ছ তো? হু হু, তা তো হবেই। এখনও তো তোমাকে বলিনি যে আমাদের মেরি আমাদের সঙ্গে দেখা করবে কাল সকালে—মোফাটে।”

“আঃ অ্যান্ড! দুঃখী মায়ের মন নিয়ে তামাশা করো না!”

"ঈশ্বরের দোহাই বৌ, তোমার মন নিয়ে আমি যেন কোন দিন তামাশা না করি!" অ্যান্ড্রু কেঁদে ফেলল। "আমি যা বলছি সব সত্যি। কাল সকালে মোফাটে আমাদের আদরের মেয়ে দুই হাতে দুই ছেলেকে ধরে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে; মরবার আগে অন্তত একটিবার তাকে আমরা বুকে জড়িয়ে ধরতে পারব, চুমো খেতে পারব, আশীর্বাদ করতে পারব।"

এবার বুড়ির চোখে জলের ধারা নামল; তার দুঃখদীর্ণ গাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় মাটিতে ঝরে পড়তে লাগল। তারপর স্বামীর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে প্রাণ খুলে পরম পিতাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল। তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে জ্ঞানহারার মতো মোফাটের পথে ছুটে গেল। অ্যান্ড্রু তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল; দু'জনই যাত্রার জন্য তৈরি হতে লাগল।

কার্কস্টাইল থেকে মোফাট বিশ মাইলের পথ; তাই তারা ১৬ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বিকেলেই রওনা হল; পথে টার্নবেরি শিল এ রাতের মতো বিশ্রাম নিল; মোফাটে পৌঁছল পরদিন দুপুরে। বুড়ো-বুড়ির বাকি দিনটা যেন আর কাটতে চায় না; দু'জন কেবলই ভাবতে লাগল, কোন পথে তাদের মেয়েটি আসবে? কেমন লোকজন সঙ্গে নিয়ে আসবে?

তারা দক্ষিণের পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে গেল; যদি সেই পথে মেরি আসে সেই আশায়; আবার ফিরে এল পবিত্র ক্রুশের ছায়াটা দেখতে; সেটা যখন পুবদিকে পড়ল তখন যেন তাদের আর কিছুই করার রইল না; পথের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা চারদিকই দেখতে লাগল। অবশেষে ড্রামফিস্ রোডের উপর প্রায় আধ মাইল দূরে দেখা গেল দুটি শিশুকে নিয়ে একটি ভিখারিণী এগিয়ে আসছে; তাদের থেকে বেশ কিছুটা পেছনে আসছে একটি ভিখারী। বুড়ো বুড়ি একদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল; অ্যান্ড্রুর মনে হল, পিছনের লোকটি সেই বামন ছাড়া আর কেউ নয়; এই মুহূর্তে তাদের কাছে এই ক'টি ভিখারী ছাড়া আর সবকিছুই অর্থহীন। ঠিক সেই মুহূর্তে সোনালি কারুকার্য করা একখানি রথ পূর্ব দিক থেকে গ্রামে প্রবেশ করল; সবুজ সোনালি উর্দি পরা দুটি লোক রথের সামনে, আর দু'জন পিছনে; রথটা পূর্ণ গতিতে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। "ওহ্ হো, পার্থিব ঐশ্বর্যের কী অহংকার!" অ্যান্ড্রু চেঁচিয়ে উঠল; রথটা গর্জন করে তার পাশ দিয়ে চলে গেল; কিন্তু তার বা তার স্ত্রীর দৃষ্টি তখন আর রথের দিকে নেই; তাদের সব মনোযোগ তখন ভিখারী দলের উপর নিবদ্ধ। অ্যান্ড্রু বলে উঠল, "আরে, ঐ তো আমাদের মেয়ে, ঠিক সে; যত গরীবই হোক, তার চলার ভঙ্গি আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। হোক তারা দীন-দরিদ্র, তবু যতদিন আমার ঘরবাড়ি আছে ততদিন ওরা দু'জন আর ওদের সন্তানরা আমাদের অগ্নিকুণ্ডের পাশেই আশ্রয় পাবে।"

বুড়ো-বুড়ির চোখ জলে ভরে উঠল; স্নেহ ও করুণায় গলে গেল তাদের অন্তর; আর তখনই অ্যান্ড্রুর মনে হল কে যেন তার দুই হাঁটুকে জড়িয়ে ধরেছে, চোখ নামিয়ে দেখল, রূপে ও ঐশ্বর্যে সদ্য-ফোটা ফুলের মতো মেরি তাদের পায়ের নিচে

নতজানু হয়ে আছে। আনন্দে চিৎকাব কবে অ্যান্ডু মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধবল। জিন লিন্টন কিন্তু দুই হাত বাড়িযে দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল, এতবড ঐশ্বর্যময়ীকে বুকেব মধ্যে জড়িযে ধবাব সাহস তাব হল না, তখন মেযেই এগিযে এসে মাকে আলিঙ্গন কবল, আব তখনই তাকে বুকে জড়িযে ধবে মা হাউ হাউ কবে কেঁদে উঠল।

এ এক আশ্চর্য ঘটনা—তুলনাবিহীন এক পুনর্মিলন। সত্যি সত্যি আদবেব মোবিকে তাবা ফিবে পেযেছে, তাকে আলিঙ্গনে বেঁধেছে, তাকে চিনতে পেবেছে, খুশি হযেছে। কি বললাম খুশি ? এত সুখ বুঝি মানুষেব কপালে জোটে না। এইমাত্র মোব বথ থেকে নেমে এসেছে, বুড়ো বাবা মাকে দাঁড়িযে থাকতে দেখে ছুটে এসে তাদেব পাযে পড়েছে। এবাব তাবা সবাইখানায ফিবে গেল, বাবা মাব সঙ্গে দুই ছেলেব পবিচয কবিযে দিল। নানাবকম আমোদ আহ্লাদেব ভিতব দিযে সন্ধ্যাটা কেটে গেল। বুড়ো বুড়িকে মোবি অনেক দামী দামী উপহাব দিল, মধ্যবাত পর্যন্ত তাদেব চোখে চোখে বাখল, তাবপব তাবা সুখেব ঘুমে ঘুমিযে পড়ল। মোবি তখন পুনবায বথে চেপে চলে গেল।

তাকে যদি আব কখনও স্কটল্যান্ডে দেখা গিযে থাকেও আমি কিন্তু সেকথা কখনও শুনিনি, কিন্তু তাব বাবা মা মৃত্যুব দিন পর্যন্ত এই আনন্দ নিযেই বেঁচে বইল যে তাদেব মেযে বড সুখে আছে।

অনুবাদ মণীন্দ্র দত্ত

পদধ্বনি

Footsteps— সিলভিযা শোব

সিঙ্গাপুবে একটি চীনা মেয়েব সঙ্গে আমাব পবিচয হযেছিল। বললাম বটে মেযে, তাব সঙ্গে যখন আমাব পবিচয হয তখন তাব বযস ত্রিশ বছব, কিন্তু সে দেখতে এতই ছোটখাট ছিল আব তাব গাযেব চামড়া ছিল এতই মসৃণ যে তাকে খুবই অল্পবযসী মেযে বলে মনে হত।

কি কবে তাব সঙ্গে আমাব পবিচয হযেছিল সেটা বড কথা নয। তাব নাম কোযান আন। বেশ সম্পন্ন পবিবাবেব মেয়ে, তাব মা ছিলেন সে সময়কাব বিখ্যাত সুন্দবী ও কবি। কোযান আন ও দুটি বুড়ো চাকবকে নিযে তিনি তখন বাস কবতেন শহবেব তাংলিন অঞ্চলে ছাযাঘেবা শান্ত বাজপথেব উপবে একটি সেকেলে মস্তবড

কাঠের বাড়িতে। বাড়ির কাঠের কারুকার্যমণ্ডিত হলঘরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; সামনের ফটক দিয়ে ঢুকেই হলঘরের একদিকে ছিল পারিবারিক উপাসনা-বেদী; আর ছিল কাঠের প্যানেলের উপর চীনা ভাষায় সোনালি রং-এ খচিত নানা বাণী।

উপাসনা-বেদীর দু'পাশ দিয়ে দুই ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে। কোয়ান আনের বসবার ঘরটি ছিল দোতলায় খোলা বারান্দায়, ঠিক বাগানের উপরে। সেখানে যেতে আমরা সবসময় বাঁ-হাতি সিঁড়িটাই ব্যবহার করতাম। মনে পড়ে, একদিন আমি ডান-হাতি সিঁড়িটার দিকে এগিয়ে যেতেই সে আমাকে শান্তভাবে বলেছিল যে ও সিঁড়িটা এখন আর তারা ব্যবহার করে না। সে সময় কথাটাকে কোনরকম গুরুত্ব দেইনি, কিন্তু পরবর্তীকালে কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

কোয়ান আনের মা মিসেস লীর সঙ্গে আমার কখনও-সখনও দেখা হত; তিনি তাঁর ঘরেই থাকতেন, নয়তো রান্নাঘরে বুড়ি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন; কথাও বলতেন কম।

একদা সন্ধ্যায়—বাদুড়ের ডানায় ভর করে যখন গোধূলি নেমে আসে—কোয়ান আনের ঘরে বসে আমরা কি নিয়ে যেন কথা বলছিলাম—সম্ভবত সাহিত্য নিয়ে, কারণ তাতেই ছিল তার বেশি আগ্রহ। চারদিক শান্ত, ঝিঁঝি পোকা ডাকছে, ফ্রাঙ্গিপানি ফুল গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর তখনই আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম সিঁড়িতে একটা ক্যাচক্যাচ আওয়াজ হল; যেন কেউ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে।

চেয়ারেই একটু পাশ ফিরলাম; ভাবলাম, কোয়ান আনের মা আসছেন আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে। পায়ের শব্দ সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে গেল; দরজাটা খোলার অপেক্ষায় রইলাম, কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। তখন বুঝতে পারলাম, যে সিঁড়িটা আমরা ব্যবহার করে থাকি তার পরিবর্তে পায়ের শব্দ হচ্ছে হলঘরের অন্য দিকের সিঁড়িতে, অথচ সেদিক থেকে বসার ঘরে ঢুকবার কোন দরজাই নেই।

আমাকে বিস্মিত হতে দেখে কোয়ান আন বলল, "ও আমার দাদা।"

"তোমার দাদা? কিন্তু আমি তো জানতাম না— কখনও তার সঙ্গে দেখাও হয়নি।"

কিন্তু সে দাদাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল না।

"ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। সে এখানে আসবে না।"

"কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হলে আমি খুশি হতাম..."

কোয়ান আন ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল।

"সে ছিল খুবই চালাক-চতুর। তার জীবনটা ছিল বড়ই দুঃখের; বিয়েটাই ছিল তার দুঃখের কারণ।"

তার কথায় অতীত কালের ব্যবহার শুনে সেই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়ও আমার শরীরটা শিউরে উঠল।

"তার মৃত্যুর পরে—তখন আমার বয়স ছিল মাত্র বারো বছর—প্রায়ই ওই সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতাম, ভাবতাম সে বুঝি ঘরে ঢুকবে। কিন্তু ঢুকত না। তাকে

সুখী করতে সাধ্যমতো সবকিছুই আমরা করেছি, কিন্তু কিছু লোক মৃত্যুর পরেও তাদের দুর্ভাগ্যকেই বয়ে বেড়ায়।"

সে হাসল। "চমকে উঠো না। গল্পটা খুবই সাধারণ। দুঃখেরও বটে।" গল্প বলার জন্য তৈরি হয়ে সে ভালভাবে বসল।

দাদা আমার চাইতে আট বছরের বড় ছিল, আমি তাকে ভালবাসতাম, তাকে নিয়ে গর্ব করতাম। কি জান, সে খুবই ভাল ছাত্র ছিল, আইন পড়ছিল। আমাদের আশা ছিল, সে একদিন বিখ্যাত সফল লোক হবে।

স্কুল থেকে ফিরে সন্ধ্যায় এখানে বসে স্কুলের পড়া করতাম আর সিঁড়িতে দাদার পায়ের শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম। কখন সে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে বলে উঠবে, "কেমন আছ গো ছোট বোনটি আমার? আজ রাতে সিনেমা দেখব কি হবে?" মনে পড়ে একদল বন্ধুবান্ধব নিয়ে সে বাড়ি ফিরত, ওই লনে ব্যাডমিন্টন খেলত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গল্প করত, আমিও তাদের সঙ্গে থাকতাম। আমাকে নিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যেত, তারপর যখন তার গাড়ি হল তখন প্রতি রবিবার আমাকে নিয়ে সাগর সৈকতে পিকনিক করতে যেত।

তারপর সে প্রেমে পড়ল। সেকথা মাকে জানাল না। কি জান, মেয়েটি মোটেই তার যোগ্য ছিল না, সে জানত, তাদের বিয়ে করতে দেওয়া হবে না। কেবল আমাকেই সে সব কথা বলত। মেয়েটির নাম ছিল মিংলী, একটা বারে কাজ করত, মদ পরিবেশন করত। কি করে তাদের বিয়ে হবে? শহরের দরিদ্র অঞ্চলে একটা ছোট ঘর নিয়ে আরও দুটি মেয়ের সঙ্গে সে থাকত। দাদাই আমাকে বলেছে, মায়ের নিষ্ঠুর ব্যবহারে আতঙ্ক হয়ে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে মেয়েটি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। আমি ঠিক জানি না। তবে আমার ধারণা, সে ধরনের জীবন চালানার হয় তো অন্য কারণও ছিল। তবু ব্যাপারটা আমার কাছে খুব রোমান্টিক মনে হত আর সে সুন্দরীও ছিল।

কোন কোন সন্ধ্যায় দাদা আমাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে যেত। সেখানে বেড়াতে বেড়াতে সেই মেয়েটি ও তার বান্ধবীদের সঙ্গে আমার দেখা হত, সকলে একসঙ্গে বেড়াতাম। দাদা ও মেয়েটি হাত ধরাধরি করে হাঁটত। বেশি কথা বলত না। আমার কেমন ঈর্ষা হত, দাদার অন্য হাতটা শক্ত করে চেপে ধরতাম।

মনে হয়, মার মনে সন্দেহ জেগেছিল। আমি ঠিক জানি না। মিংলীর কথা মাকে না বললেও দাদার হাবভাবে মা বোধহয় কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। দু' একবার দাদা মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি থেকে বেরোতে যেতেই মাও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত।

তারপর একদিন ভয়ংকর ধাক্কা খেলাম। ভোরে উঠে নিচে নামলাম। বাড়িটা তখনও বন্ধ, গরম, অন্ধকার, আর চুপচাপ। কাগজওয়ালা সকালবেলাকার খবরের কাগজটা কাঠের বড় দরজাটার নিচ দিয়ে ঢুকিয়ে রেখে গেছে। কাগজটা তুলে নিতেই আধো অন্ধকারে দেখলাম, তার মুখখানা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি

জানালার কাছে গিয়ে পাল্লা খুলে দিতেই শিরোনামটা চোখে পড়ল : "বার-গার্লের আত্মহত্যা : ব্যর্থ প্রেম।" মেয়েটি মারা গেছে। নিজের ঘরে একাকি হাতের কব্জিটা কেটে ফেলার ফলে রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে। বান্ধবীরাই তার একটা চিরকুট পেয়েছে :

"আমি ভালবেসেছি, আর সেও আমাকে ভালবাসে, কিন্তু এ ভালবাসা আশাহীন ও দুঃখময়, কারণ আমাদের বিয়ে হবে না। এভাবে বেচে থাকা যায় না। আমাকে দোষ দিও না। বিদায়।"

কাগজটা পড়তে পড়তে আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। দাদা যাতে দেখতে না পায় সেজন্য খবরের কাগজটা লুকিয়ে ফেলতে চাইলাম। কিন্তু সে তো জানতে পারবেই। তাই কাগজটাকে মেঝের উপর ফেলে রেখেই লুকিয়ে বিছানায় চলে গেলাম। তাদের দু'জনের জন্য অনেক কাঁদলাম।

সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। বাড়িটা চুপচাপ। তারপর দাদা ও মার গলা শুনতে পেলাম — তারা চিৎকার করছে। কান্নার শব্দ। দুই হাতে কান ঢেকে ছুটে বাগানে গেলাম।

দরজার ঘন্টাটা বেজে উঠল। পরিচিত গলা শুনতে পেলাম আমার কাকা। ছুটে গেলাম। সদয় হাসি হেসে আস্তে আমাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে কাকা বলল, "তোমার সঙ্গে পরে কথা বলব সোনা, এখন তোমার মার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।" কাকা উপরে উঠে গেল।

পরদিন পুলিশ এল একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার। সঙ্গে কাকা। হলঘরে তারা মা ও দাদার সঙ্গে কথা বলল। সিঁড়ির রেলিং এ ঝুঁকে আমি তাদের কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই কানে এল না। পরে দাদা আমার পাশ দিয়েই উপরে উঠে গেল অথচ আমাকে যেন দেখতেই পেল না। তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে, চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ করছে।

মনে পড়ে, তারপরেই দাদা হংকং চলে গেল। সেটা কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে সেখানে এক আত্মীয়ের কাছে থেকে দাদা ব্যবসা শিখবে। তার সঙ্গে সকলেই বিমান বন্দরে গেলাম আমি, মা ও ঠাকুমা। বিমানের অপেক্ষায় বসে থেকে আমরা কেক খেলাম। দাদার মুখে কথা নেই। যেন সেই হাসখুশি দাদাই নয়। যাবার সময় আমাকে বলল, "ঠাকুমাকে দেখিস লক্ষ্মীটি।"

"দেখব আর মাকে ?" আমি বললাম।

"ওঃ, মা নিজেকে সামলাতে পারবে।"

সেকথা শুনে মা উদাস চোখে তার দিকে তাকাল।

গাড়িতে ফিরবার সময় ঠাকুমা বলল, "তুমি সব কিছুতেই বড় বেশি নাক গলাও। গাছ গাছড়াকে নিজের মতো বাড়তে দিতে হয়।"

মা বলল, "আপনার আদরের গাছটাকে আগাছায় ছেয়ে ফেলুক তাই কি আপনি চান ?"

তখন এসব কথার অর্থ বুঝতে পারিনি। এখন বুঝি।

কিন্তু দাদা অল্পদিন পরেই বাড়ি ফিরে এল। হংকং-এ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল; বাড়ি ফিরল বেশ রুগ্ন ও কুঁজো হয়ে। ছোকরা-চাকরটা তাকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে তুলছে দেখে আমি কেঁদে ফেললাম।

তার পাশে বসে গল্প করতাম। অনেক সময়ই সে বিকারের ঘোরে থাকত; কখনও বা একদৃষ্টিতে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকত।

জ্বলন্ত চোখ মেলে একদিন সে আমাকে বলল, "সে আমার জীবনটা নষ্ট করেছে। সে আমাকে খুন করেছে। দেখ যেন তোমাকে ও খুন করতে না পারে।"

"দাদা কি বলছে?" মাকে শুধালাম।

"মদের দোকানের যে মেয়েটা ওকে ফাঁদে ফেলেছিল, তার কথাই ও বলছে," এই কথা বলে মা ঠোঁটে কুলুপ এঁটে দিল।

"কিন্তু সে আমাকে খুন করবে কেমন করে?" আমি প্রতিবাদ জানালাম। মা কোন জবাব দিল না।

মা ডাক্তার ডাকল -প্রথমে ইউরোপীয় ডাক্তার, হাসপাতাল থেকে, হংকং থেকে, লন্ডন থেকে বিশেষজ্ঞরা এল। তারপর চীনা ডাক্তার এল, তার শরীরে ছোট ছোট পিন ফোটাল, বিশেষ ধরনের ওষুধ দিল। এমনকি একজন মালয় "বোমো" কেও ডাকা হল। লোকটা যাদু জানত; নারকেল মালার তেলে ভাসমান সল্‌তে জ্বালিয়ে সে দাদার বিছানার চারধারে রেখে দিল। ঘরময় ঘুরে ঘুরে অদ্ভুত শব্দ করতে লাগল। দেওয়ালে ও সিলিং-এ তার ছায়া নড়তে লাগল। কিন্তু কিছুই হল না। শেষ পর্যন্ত সে বলল, "মেয়েটির আত্মা কবর থেকে তোমার ছেলেকে ডাকছে। তোমার ছেলে সে ডাক ফেরাতে পারছে না। সে তার কাছেই যাবে।"

তারপর থেকে মা কখনও দাদার ঘরে যেত না। নিচের হলে বসে ক্রুদ্ধ মুখে দাদার মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েকদিন পরেই দাদা মরা গেল; মাকে একবার দেখতেও চাইল না।

দাদার জন্য ঠাকুমা ও আমি অনেক চোখের জল ফেললাম। আমার শরীরের অবস্থা ভাল ছিল না: তবু ঠাকুমার পীড়াপীড়িতে তাকে নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিলাম।

ধীরে ধীরে মৃত্যুর শোক কমে এল। বাড়িটা আর আগের মতো ফাঁকা লাগে না। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যায়ই এখানে এসে বসলে দাদার কথা মনে পড়ে: বাড়ি ফিরেই সে উপরে উঠে আসত, আমার সঙ্গে কথা বলত, হৈ চৈ করত।

তারপর একদিন সন্ধ্যায় সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম; হাল্কা পায়ে অতি দ্রুত সে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সে ঘরে ঢুকল না। সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুললাম। কেউ কোথাও নেই। মা ও ঠাকুমাকে কথাটা বলতে ছুটে নিচে নেমে গেলাম। তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

"ভাল কথা নয়," ঠাকুমা বলল।

"কোন অনুষ্ঠান কি আমরা বাকি রেখেছি?" মা শুধাল।

প্রতি সন্ধ্যায় পদধ্বনি শোনা যেতে লাগল। টান-টান ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় আমি অপেক্ষা করে থাকি। বাড়ির বাইরে যেতে বা এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে পারি না। ঘরেই থাকতাম, আবার ভয়ও করত; আমি জানতাম, একদিন না একদিন সে ঘরে আসবেই। আমি চাইতাম সে আসুক, আবার ভয়ও পেতাম। ক্রমে আমার খাওয়া বন্ধ হল, শুকিয়ে যেতে লাগলাম, ফ্যাকাসে ও চঞ্চল হয়ে উঠলাম। তারপর একদিন স্বপ্ন দেখলাম। দাদা যেন আমার বিছানার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলছে, "মিংলী আমার কাছেই আছে। আমরা এখনও পরস্পরকে ভালবাসি। বিয়ে করতে চাই। মাকে এ বিয়ের ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিতে হবে। মাকে বলো কোযান আন।"

ঘুম ভাঙতেই ছুটে গেলাম মার কাছে। কাঁপতে কাঁপতে তাকে সব কথা বললাম। মার মুখটা শক্ত হয়ে উঠল। "বটে! সেই জিতল- সবকিছু জিতে নিল!"

মা উঠে দাঁড়াল। আমার ঘর থেকেই শুনতে পেলাম, মা সারা রাত ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছে।

পরদিন কাকাকে ডাকা হল। তিনজনে অনেক পরামর্শ হল। কাকা বলল, "দেখ বৌদি, ওর আত্মার শান্তি যদি চাও তো এটা করতেই হবে। এখন আমাদের সব অহংকার ও ঘৃণা ভুলে যেতে হবে।"

পরদিন মা কেন যে আমাকে সঙ্গে নিল জানি না। প্রাতরাশের পরে গাড়িটা আনা হল। আমরা শহরের একটা দরিদ্র অঞ্চলে পৌঁছে গেলাম। মার পিছন পিছন দোকানের উপরকার একটা অন্ধকার ছোট ঘরে গিয়ে উঠলাম। সেখানে একটি পুরুষ ও একটি নারী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। পুরুষটি শীর্ণকায়, মাথার চুল পাকা, নারীটি স্থূলকায়, কিন্তু মুখ বলীরেখায় ভর্তি। তাদের পরনে জীর্ণবাস, ঘরে আসবাবপত্র কিছু নেই বললেই চলে, প্রার্থনা বেদীর উপর মিংলীর একখানা ফটো ঝোলানো রয়েছে। মা তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল। মাকে খুব ক্রুদ্ধ মনে হল। সবকিছু বুঝতে পারলাম না, কিন্তু এটা বুঝলাম যে এরাই দাদার প্রেমিকার বাবা-মা, আর মা চেষ্টা করছে তাদের মৃত কন্যার সঙ্গে আমার মৃত দাদার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতে।

পুরুষটি বলল, "ওরা যখন বেঁচেছিল তখন তো আপনি এটা চাননি। তাহলে আজ তাদের বিয়ে দিতে চাইছেন কেন?"

"কারণ আমার ছেলের জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তোমার মেয়ে তাকে কবরেও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। সেই আমার ছেলেকে মেরেছে।"

"না। তাকে মেরেছেন আপনি। ঠিক যেমন আপনি আমার মেয়েকেও মেরেছেন।"

এসব দেখে শুনে আমি তো হতভম্ব! ভেবেছিলাম মা খুব রেগে যাবে, চেচামেচি করবে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাথা নিচু করে মা চুপচাপ বসে রইল। তারপর ঘৃণাভরা চোখ তুলে বুড়োর দিকে তাকাল।

"তারা এ বিয়ে চায়। আমিও তাতে রাজী হয়েছি।"

"নিশ্চয় যথাবিহিত অনু করা হবে। সেই তো হবে প্রথমা স্ত্রী?'

মা মাথা নাড়ল।

"কন্যা-পণ দেবেন?"

মা আবার মাথা নাড়ল। "একজন পুরোহিত ও ঘটক পাঠিয়ে দেব। তাদের তোমার মেয়ের করবে নিয়ে যেও।"

বাড়ি ফিরবার পথে মা একটা কথাও বলল না।

ক'দিন পরেই মিংলীর সঙ্গে দাদার বিয়ে হয়ে গেল। পুরোহিত ও ঘটক ফুলে সাজানো বড় গাড়িতে করে মিংলীর আত্মাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এল। গাড়ির বনেটের সামনে একটা কনে পুতুল বাধা ছিল। পুরো ব্যাপারই মার না-পছন্দ ছিল: তবু যথাবিহিতভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য মা কাকাকে ছাড়া আরও অনেক বন্ধুবান্ধবকে আমন্ত্রণ করে আনল।

পুরোহিত ও ঘটক যখন বাড়িতে এল তখন আমি হলঘরেই ছিলাম। মা, ঠাকুমা ও কাকা বসল এক দেওয়াল জুড়ে, আর অতিথিরা বসল অন্য দেওয়াল বরাবর, দুই আত্মার মধ্যে পরিণয়-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল, মাঝখানে পারিবারিক প্রার্থনা বেদীর সামনে। পরে অদৃশ্য দম্পতি যখন পূর্বপুরুষের স্মৃতি ফলক ও পারিবারিক দেবতাদের সামনে প্রণাম নিবেদন করল তখন আমরা নীরবে তা দেখলাম। আত্মীয়রা মুখ তুলে দেখল, অদৃশ্য কনেটি মা ও ঠাকুমাকে চা খেতে দিল। তারপর কাগজ ও ভৌতিক টাকায় তৈরি দামী দামী সব উপহার পোড়ানো হল যাতে অন্য জগতে গিয়ে দম্পতি সেটা ব্যবহার করতে পারে। অতিথিদের সামনে পরিবেশন করা হল চমৎকার বৈবাহিক ভোজ।

মা পাথরের মতো কঠিন মুখে বসে রইল, একটা কথাও বলল না। মদ পরিবেশনের পর অতিথিরা ক্রমে ভুলেই গেল যে তারা এসেছে ভূতের বিয়েতে। কাকা আগেই নিঃশব্দে চলে গিয়েছিল।

তারপর থেকে আর কোন স্বপ্ন দেখিনি। সিঁড়িতে কোন পায়ের শব্দ শুনিনি। স্কুলে যেতে লাগলাম। শনিবার সকালে বন্ধুদের সঙ্গে শহরে গিয়ে আইসক্রিম খেতাম, পিকনিকে যেতাম, খেলাধূলা করতাম। একবার মা আমাকে নিয়ে হংকং গেল আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে। মাঝে মাঝে মা কোন পাহাড়েও যেত ছুটি কাটাতে। ঠাকুমা মারা গেল। শেষের দিকে সে প্রার্থনা বেদীর পাশে তার চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকত। একদিন মাকে বলল, "অচিরেই আমি তোমার ছেলে ও তার স্ত্রীকে দেখতে পাব। তাদের জন্য কোন খবর পাঠাবে কি?"

মা কখনও দাদার কথা বলত না। ঠোঁট শক্ত করে বলল, "এ বিয়ে করে আমাদের অমর্যাদা করা তার উচিত হয়নি। তাকে বলার আমার কিছুই নেই।"

ঠাকুমার অন্ত্যেষ্টিও খুব বড় মাপের হয়েছিল। সিঙ্গাপুর ও মালয়ের প্রবীণ চীনাদের মধ্যে তার অনেক বন্ধু ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত বাড়িটা লোকজনে ভর্তি ছিল।

মা বলল, "আমি মনে করি, আমাদের একবার ইওরোপ ভ্রমণে যাওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার আগে সে দেশটা তোমার দেখা উচিত।"

এইভাবে আমার সতেরো বছর বয়সে আমরা ইওরোপে গেলাম। ইতালি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, এমনকি স্পেন ঘুরে বেড়ালাম। কোন কোন স্থানে মার বন্ধু বা আত্মীয়রা ছিল, তারাই সব ঘুরিয়ে দেখাল। লন্ডনে আমার এক কাকা ছিল। কেন্টের একটা ছোট গ্রামে ছিল আর এক কাকা ও কাকিমা। হ্রদ অঞ্চল, এডিনবরা ও স্ট্র্যাটফোর্ডেও গেলাম। দিনগুলি চমৎকারভাবে কেটে গেল। তবু সিঙ্গাপুরে ফিরে বিমান থেকে নামতেই খুবই ভাল লাগল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে আমি সাহিত্য পড়লাম, কারণ মার মতো আমারও সাহিত্যেই আগ্রহ আর অনেক বছর ধরেই লেখালেখি করেছি।

প্রথম বার্ষিক পরীক্ষার ঠিক আগে। মনে হয়, উদ্বেগবশত বড় বেশি পড়াশুনাই করছিলাম। স্নায় বিকারের ফলে আমার একটু জ্বর জ্বর ভাবও হয়েছিল। মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। আমার মন মরা বিষণ্ণ ভাবটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। কেন যে এরকম হল বুঝতে পারলাম না। তারপর একদিন সন্ধ্যায় ঠিক এইখানে বসেছিলাম মন মেজাজ খারাপ করে, আর ঠিক তখনই আবার সেটা শুনতে পেলাম সিঁড়িতে সেই পদধ্বনি, এবার আরও ভারী, আরও ধীরগতি। জানতাম দাদা এসেছে। আরও জানতাম, এ ঘরে সে ঢুকবে না। দরজার কাছে এসে পদধ্বনি থেমে গেল।

মাকে কিছুই বললাম না। অকারণে তার দুশ্চিন্তা বাড়াতে চাইলাম না। একবার মনে হল, ভুল শুনেছি। যা শুনেছি সেটা আমার অসুস্থ মনের কল্পনামাত্র। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যাতেই সে পদধ্বনি শুনতে পেতাম। বুঝলাম, আমার দাদাই ফিরে এসেছে।

একদিন রাতে সে স্বপ্নে এসে দেখা দিল, দাঁড়াল আমার বিছানার পায়ের কাছে। "অন্য জগতে আমি বড় কষ্টে আছি। বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। আমরা আলাদা হয়ে গেছি। তাকে বিয়ে করা উচিত হয়নি। তার আর আমার পথ এক নয়। আমি বাড়িতে ফিরে যেতে চাই। মাকে বলো।"

মাকে বললাম। তার চোখে খুশির ঝলক দেখা দিল। একটু মৃদু হাসিও। "আমি জানতাম সে ভুল করেছে। অকারণ অর্থব্যয় তাও একটা বাজে গার্লের জন্য! আমার কথাই ঠিক হল।" একটু থেমে বলল, "তাকে তো এ বাড়ি থেকে ফেরাতে পারব না। সে বরং তার পুরনো ঘরটাতে থাকুক। কিন্তু সে তো এখন বড় হয়েছে, কাজেই ঘরটাকে বেশ কিছু অদল বদল করে দেওয়া দরকার।"

ছুতোর মিস্ত্রিকে ডাকা হল। ওখানকার দরজাটাকে তক্তা মেরে বন্ধ করে দেওয়া হল, ফলে যে সিঁড়িটা দিয়ে এখানে এবং তার ঘরে যাওয়া যেত সেটা দিয়ে এখন শুধু তার ঘরে যাওয়া যায়। মার ও আমার আসা যাওয়ার জন্য অন্য দিকে আর একটা সিঁড়ি বানানো হল ছেলের অভ্যর্থনা উপলক্ষে আত্মীয় বন্ধুদের একটা মজলিসের ব্যবস্থা করা হল। তার ঘরটা পরিষ্কার করা হল। দরকার মতো সব জিনিসপত্র এনে

রাখা হল। এইভাবে আবার আমরা একত্রে বাস করছি। প্রতি রাত্রে আমি শুনতে পাই, দাদা তার ঘরে ফিরে আসছে।

কোয়ান আনের কথা বন্ধ হল। অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঝিঝি পোকার ডাক ছাপিয়ে একটা টিকটিকি ডেকে উঠল, চি-চক্ চক্।

কোয়ান আন উঠে গিয়ে আলোটা জ্বালিয়ে দিল। হলুদ আলোয় ঘরটা ভরে গেল; আর সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেল তার গল্পের রহস্যময়তা।

তার শান্ত মুখের উপর আলো পড়ে চিকচিক করছে। আমার দিকে তাকিয়ে সে মৃদু হেসে বলল, প্রিয়জনের মৃত্যুর উপরে একটা প্রাচীন কবিতা আছে: "রেশমী আস্তিনের কোন খসখস শব্দ নেই। নেই মেঝের উপরে কোন পদধ্বনি।" সেদিক থেকে আমার ভাগ্য ভাল। প্রতি রাতে আমি দাদার ফিরে আসার পায়ের শব্দ শুনতে পাই। চৌকাঠে ভেজা পাতা লেগে থাকে।

স্বীকার করতে বাধা নেই, দাদার প্রেতাত্মা সম্পর্কে যে যাই বলুক বাকি সময়টা আমার খুব অস্বস্তিতে কাটল; দোতলার ঘরটা ছেড়ে নিচের হলঘরের স্বাভাবিক বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

সাদা কুর্তা ও কালো ট্রাউজার পরে বুড়ি কাঠের মেঝেতে চপ্পলের শব্দ করে ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল। আমার দিকে তাকিয়ে সোনা বাঁধানো দাঁত বের করে হাসল। "আপনি কি এখন বাইরে যাবেন তুয়ান?" বলে সামনের দরজাটা খুলে দিয়ে ফটকের আলো জ্বেলে দিল। বাগানের তাজা বাতাস আর দূরের বড় রাস্তার যানবাহনের শব্দ ঘরটাকে ভরে দিল।

কোয়ান আন কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমার আগ্রহের কথা জানে বলেই দেওয়ালের চীনা ভাষার সোনালি লেখাগুলোর দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

"এগুলোর কথা তোমাকে কখনও বলেছি মনে হয় না। এতে আমাদের পরিবারের কাম্য সব রকম শুভেচ্ছার উল্লেখ রয়েছে— যেমন স্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, আনন্দ, দীর্ঘায়ু, সহিষ্ণুতা, আত্মার শান্তি, বংশবৃদ্ধি..."

জানতে চাইলাম, "এসব শুভেচ্ছাই কি তোমাদের পরিবারে ফলবতী হয়েছে?"

সে জবাব দিল না। মনে হল, আমার প্রশ্নটা সে শুনতেই পায়নি। তার মুখখানি তখনও প্রশান্তিতে ভরা, হাসিটি গম্ভীর, মাথাটা ঈষৎ হেলানো, একটা হাত প্রত্যাশায় উপরে তোলা। অপর সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে সে কান পেতে আছে দাদার পদধ্বনি শোনার আশায়।

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

অবাঞ্ছিত আবাস

Undesirable Residence লান্স শালওয়ে

আমি মনে করি না যে বাড়িটাকে আমি কোনদিন পছন্দ করেছি। আর আজ যখন বাড়িটার কথা ভাবি, তখনও মনে হয় না আন কোনদিন বাড়িটাকে পছন্দ করত। আসলে বাড়িটা কিন্তু মোটামুটি ভালই, তবু প্রথম দিনেই আমরা দু'জনই সেখানে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেছি। অবশ্য যা সব কাণ্ড কারখানা ঘটে গেল তাতে সহজেই বলা যায় যে আমরাই ভুল করেছিলাম। কিন্তু আমার ধারণা, প্রথম দিন অপরাহ্ণেই জায়গাটাতে আমরা কিছুটা অস্বস্তিবোধ করেছি।

মনে পড়ে, সেটা ছিল আগস্ট মাসের একটি উজ্জ্বল দিন। আগের সপ্তাহে আমরা অন্তত কুড়িটা বাড়ি দেখেছি। তখন আমরা একটা সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে থাকতাম, আর নিজস্ব একটা আলাদা বাড়ির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরেছিলাম। অনেক টাকা খরচ করার সামর্থ্য আমাদের ছিল না। বাড়িটা দেখেই মনে হল, এজেন্ট ভদ্রলোক বাড়িটার দাম বলতে গিয়ে নিশ্চয় ভুল করেছে। অন্তত বাইরেটা দেখলে মনে হয় যে টাকা চাওয়া হয়েছে বাড়িটার দাম তার চাইতে বেশি হওয়াই উচিত।

বললাম, "বাড়িটা তো বেশ ভালই, তবে ছাদটা যেন কেমন দেখতে।"

আন সন্দিগ্ধ গলায় বলল, "আমি ঠিক বুঝি না। দেখতে তো ভালই লাগছে। তবে বাড়টা এত 'সাধারণ' না হলেই ভাল হত।"

বাড়িটা সত্যিই সাধারণ। ২৬ নম্বর ব্রাযার্বফিল্ড অ্যাভেনিউ এর এই বাড়িটা শহরতলীর অন্য সব বাড়ির মতোই, সামনে টিউডর আমলের নকল পাশকপালি লাগানো আর ঢালাই লোহার একটা বিশ্রী ফটক। একটা গ্যারেজও নেই। অবশ্য এটুকু ছাড়া বাড়িটার বিরুদ্ধে আর কিছু বলার নেই।

আন বলল, "পাশের বাড়িটা কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর। ঠিক আমার মনের মতো।"

বিচলিত বোধ করলাম। ২৬ নম্বর বাড়ির অন্য অংশটাই ২৪ নম্বর। দুটো বাড়ি মোটামুটি একই রকমের।

আন বলল, "না না, ওটা নয়। ও পাশের বাড়িটা।"

ও পাশের বাড়িটা এখানকার সাদামাঠা পরিবেশের তুলনায় সত্যি অনেক আকর্ষণীয়। ভিক্টোরীয় ছাদের গঠন, লম্বা জানালা, গম্বুজ। বাগানের গাছগুলি অযত্নে বেড়ে উঠেছে। দেখলেই বোঝা যায় বাড়িটা অনেক দিন খালি পড়ে আছে।

"হ্যাঁ, খুব সুন্দর। তবে বড্ড বড়। মেরামত করতে অনেক টাকা ঢালতে হবে।"

আন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "তুমি হয়তো ঠিকই বলছ। তুমি তো সবসময় ঠিকই বল।" আন গাড়ি থেকে নামল। "বেশ তো, ২৬ নম্বর বাড়িটাই দেখা যাক। বেলা অনেক হয়েছে।"

যে লোকটি ফটক খুলে দিল সে আমার সমবয়সী; বিবর্ণ মুখ, চোখে চশমা, গায়ে সবুজ কার্ডিগান। মনে হল আমার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা সে দেখতেই পায়নি, অথবা দেখতে চায়নি। বলল, "আমার নাম ট্যাপ্‌লো। আর আপনি নিশ্চয়ই—"

"ডেভিড টার্নার। ইনি আমার স্ত্রী।"

"ঠিক আছে। ভিতরে আসুন।"

হল-এ ঢুকলাম। আন আবহাওয়া সম্পর্কে কি যেন বলল, কিন্তু ট্যাপ্‌লো তার দিকে ফিরেও তাকাল না। হঠাৎ বলে বসল, "বাড়িটা ভাল। মনে হয়, আপনাদের পছন্দ হবে। এটা বৈঠকখানা।"

একজোড়া মেষের মতো ট্যাপ্‌লোর সঙ্গে বাড়িটা ঘুরে দেখলাম। ভিতরটা বাইরের মতোই নিতান্ত সাধারণ। খুব সম্প্রতি কিছুটা সাজানো হয়েছে। ট্যাপ্‌লোই বলল ওয়্যারিংটা নতুন। আসবাবপত্র ও কার্পেটও নতুন বলে মনে হল। আনের মুখ দেখেই আমি বলে দিতে পারতাম যে বাড়িটা দেখে সে মোটেই খুশি হয়নি, কিন্তু আমার কাছে তো বেশ ভালই মনে হল, আর দামের তুলনায় বেশ সস্তাও বটে। দামটা যদি ঠিক ঠিক বলা হয়ে থাকে, আর বাড়িটার যদি গোপন ত্রুটি না থাকে, তাহলে কথাটা পাকা করে ফেলাই ভাল। দরকার হলে পরে তো আমরা এটা বিক্রি করে দিয়ে একটা আধুনিক প্যাটার্নের বাড়ি কিনতেই পারব।

রান্নাঘরে পৌঁছে আমাদের যাত্রা শেষ হল। ট্যাপ্‌লো আমার দিকে ঘুরে বলল, "দামটাও ন্যায্য বলেই আমার ধারণা। আপনাকে খোলাখুলিই বলছি, বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটা আমি তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলতে চাই।" আমার চোখে মুখে নিশ্চয়ই একটা সন্দেহ ঝিলিক দিয়েছিল, কারণ সে তখনই বলে উঠল, "বাড়িটার যে কোন দোষ আছে তা কিন্তু নয়। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমরা –আমি মাত্র ছ'মাস এ বাড়িতে বাস করেছি, আর বাড়িটা তৈরি করাও হয়েছে একটা ঘণ্টার মতোই শক্তপোক্ত করে। প্রতিবেশীরাও শান্তশিষ্ট। রাস্তাটাও ভাল। বাড়িটা আদর্শ। সম্পূর্ণ আদর্শ।"

বুঝলাম, আনের আগ্রহ বেড়েছে। বাড়িটা তাকে খুশি না করুক, ট্যাপ্‌লো করেছে। তার স্বভাবই ঐরকম; কোন বস্তুর চাইতে মানুষের প্রতি তার টান বেশি।

ট্যাপ্‌লো তার সহানুভূতিটা ধরতে পারল। একটু কেশে বলল, "কয়েক সপ্তাহ আগে আমার স্ত্রী মারা গেছেন। স্মৃতি বড়ই বেদনাদায়ক...কাজেই, বুঝতেই পারছেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই।"

আন বলল, "বটেই তো, বটেই তো। আমি দুঃখিত।"

ট্যাপ্‌লো কিছুটা সুস্থির হল। "ঠিক আছে। তাহলে ঐ কথাই হল। ভাল কথা, ঐ দামের মধ্যেই কার্পেটগুলো পাচ্ছেন। আর রাতে ব্যবহারের জন্য হিটারগুলোও।"

আমি পরিষ্কার বলে দিতে পারি, ট্যাপ্‌লোর স্ত্রীর কথা জানবার জন্য আনের মন তখন নিশপিশ করছে। সংকোচের সঙ্গেই সে প্রশ্ন করল, "অনেক— অনেকদিনের অসুখ বুঝি?"

"কি বললেন? না, না, মোটেই তা নয়। খুবই আকস্মিক— অপ্রত্যাশিত।" এই প্রথম তার মুখে হাসি দেখলাম। ঠোঁট ফোটা হাসি, তবু হাসি তো বটে। "তিনি এ বাড়িতেও মারা যাননি, আপনারা সে ভয় করবেন না। বাড়িটা ভুতুড়েও নয়।" সে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। "এটা ভুতুড়ে বাড়ি নয়।"

এবার আনের বিচলিত হবার পালা। কোনরকমে একটু হেসে সে জানালার কাছে গেল। বলল, "আরে, দেখ, বাগানটা দেখ। বাগানের কথা তো আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।"

ট্যাপ্‌লো বলল, "বোকামিটা আমারই। সেজন্য ক্ষমা চাইছি..." পিছনের দরজাটা খোলা হল। তার পিছন-পিছন আমরাও বাইরে গেলাম।

বাগানটা লম্বা ও সরু; আর বাড়িটার মতোই সাধারণ। লনটার দিকে এখনই নজর দেওয়া দরকার; একেবারে শেষ প্রান্তের তরকারি বাগানটার অবস্থাও তথৈবচ। আনের খুব বাগানের শখ। তাই আমি ট্যাপ্‌লোকে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম, আর সে বাগানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটা ওষধি গাছের সারিকে সে খুব ভাল করে দেখতে লাগল।

ট্যাপ্‌লো বলল, "এখানে একটা ভাল বাগান করার পরিকল্পনা আমাদের ছিল, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।"

"সেটা বেশ ভালই হত," এসব ব্যাপারে আমার অনাগ্রহকে চাপতে চেষ্টা করলাম।

"খোলা হাওয়ায় খাদ্যের স্বাদই বেড়ে যায়," ট্যাপ্‌লো মন্তব্য করল।

আমাদের কথা আর বেশি এগোল না। আনের দিকে তাকালাম। সে বাগানের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের গম্বুজওয়ালা ভিক্টোরীয় বাড়িটার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। তার দীর্ঘ চুলের রাশি সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।

বললাম, "ঐ বাড়িটা আমার স্ত্রীর খুব চোখে লেগেছে। ঐ পুরনো বাড়িটা তো খালি, তাই না?"

ট্যাপ্‌লো প্রথমে জবাব দিল না। সে তাকিয়ে আছে আনের দিকে। তার মুখে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি।

আবার শুধালাম, "ওই বাড়িটা। ওটা কি খালি?"

ট্যাপ্‌লো আমার দিকে মুখ ফেরাল। "ওই বাড়িটা? হ্যাঁ, ওটা খালি।" একটু বেশ তাড়াতাড়ি বলল, "আপনার স্ত্রীর ভিতরে আসা উচিত। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে..." সে থামল। মৃদু হাসল। অগাস্টের রৌদ্রস্নাত দিনে মোটেই ঠাণ্ডা ছিল না। সে আবার বলল, "আমি দুঃখিত। আপনি যেন কি বলছেন? ও, হ্যাঁ, বাড়িটার কথা। আমি জানি, ওটা চক্ষুশূল, কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন, দেওয়ালটা খুবই উঁচু; তাছাড়া বাড়িটা শিগ্‌গিরই ভেঙে ফেলা হবে; নতুন করে বাড়ি বানানো হবে।"

"ওঃ! তাহলে এই দোষের কথাই কি আমি এতক্ষণ সন্দেহ করছিলাম?"

ট্যাপ্‌লো বলতে লাগল, "অবশ্য তাতে কোন ক্ষতি হবে না। আধ ডজন আধুনিক ধরনের বাড়ি তৈরি হবে বা ঐরকমই একটা কিছু। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়েই সব কিছু করা হবে। ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।" তার মুখটা আগের মতোই নির্বিকার।

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। আন তখনও পাশের বাড়িটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টিকে অনুসরণ করলাম। মনে হল, দোতলার একটা জানালার দিকে সে তাকিয়ে আছে। জানালাটা খুব বড়; রঙিন কাঁচের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে অদ্ভুত একটা বর্ডার টানা হয়েছে। উল্লেখ করার মতো কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না।

ডাকলাম, "আন! এবার আমাদের ফিরতে হবে।"

একটু নীরবতা। তারপর আন প্রথমে ধীর পায়ে, তারপর দ্রুত পায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। তাকে বিচলিত দেখাচ্ছে। সে এলে বললাম, "এবার আমাদের যেতে হবে। এমনিতেই মিঃ ট্যাপ্‌লোর অনেক সময় নষ্ট করেছি।"

"মোটেই না," ট্যাপ্‌লো বলল। সে একদৃষ্টিতে আনের দিকে তাকিয়ে আছে।

আন শুধাল, "পাশের বাড়িটাতে কেউ থাকে কি? আমি জানি ওটা খালি, কিন্তু"

"কিন্তু কি?" ট্যাপ্‌লো বলল।

আন হাসল। "জানালায় কাকে যেন দেখলাম। কে যেন জানালায় দাঁড়িয়েছিল আর সেই নারী"

"নারী?" ট্যাপ্‌লো বলল। "আপনি বলছেন না?"

আন তার দিকে তাকাল। "না, অবশ্য এটা আমার কল্পনাও হতে পারে। বাড়িটা তো খালি। একতলার জানালাগুলো কাঠ মেরে আটকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাহলেও"

আমি বললাম, "হয় তো কোন ভবঘুরে হবে। অথবা কোন অনধিকার প্রবেশকারী, ওরকম খালি বাড়িতে লোকজন তো ঢুকে পড়বেই।"

ট্যাপ্‌লো বললো, "না। দরজাগুলো তক্তা দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে। কেউ ঢুকতেই পারবে না।"

আন বলল, "তাহলে তো মিটেই গেল। ওটা আমার নিছক কল্পনা। আলোর ভেল্কি।"

"ঠিক তাই।" বলেই ট্যাপ্‌লো হঠাৎ মুখ ঘোরাল। আমরাও তাকে অনুসরণ করে বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। হল থেকেই আমরা বিদায় নিলাম। বলে এলাম, বাড়ির ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই আমরা এজেন্টকে জানিয়ে দেব। গাড়িতে ওঠার আগে আন একটি কথাও বলল না।

তারপর বেশ জোর দিয়েই বলল, 'কিন্তু একটা কিছু আমি নিশ্চয় দেখেছি। জানালায় যে হোক কেউ ছিল।"

আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। "বেশ তো, তুমি না হয় জানালায় কাউকে দেখেছ। তাতে কি হল? বাড়িতে কেউ ছিল, ব্যস মিটে গেল।"

আন আবার বলল, "একটি মেয়েকে দেখেছি। সে আমার দিকে তাকিয়েছিল।"

আমি তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। "আচ্ছা, এটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন?"

আন ভুরু কুঁচকে বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু—না, ওটা কিছু না। তুমি ঠিকই বলেছ। এটা মোটেই গুরুতর কিছু নয়।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "তা কেন বলছ? তুমি নিশ্চয়ই এটাকে গুরুতর মনে করছ। তা না হলে কথাটা বলতেই না।"

"দেখ, ওসব ভুলে যাওয়াই ভাল। কি বল? এখন বাড়ি চল।"

আমি কঠিন কণ্ঠে বললাম, "তুমি যতক্ষণ এ ব্যাপারে---জানালার এই মেয়েটির ব্যাপারে সব কথা না বলছ, ততক্ষণ আমি যাব না।"

"আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না।"

"আগে তো বল। তারপরে দেখা যাবে।"

আন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। "বেশ, তাহলে শোন। মেয়েটি দেখতে অতি সাধারণ। লম্বা চুল। কিন্তু মুখটা..." আন শিউরে উঠল। "বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?"

তার হাতে হাত রাখলাম। "মোটেই ঠাণ্ডা পড়েনি। কথা পাল্টিও না। তার মুখের কথা কি বলছিলে?"

"মুখ--মুখটা বিবর্ণ, সন্ত্রস্ত। তার চোখ...সে যেন আমাকে কিছু বলতে চাইছিল। মনে হল দেখ, আমি হলফ্ করে বলতে পারি, সে আমার কাছে সাহায্য চাইছিল। সাহায্যের জন্য মিনতি জানাচ্ছিল। কোন কিছু থেকে তাকে উদ্ধার করতে বলছিল।" আন মাথা নাড়তে লাগল। "হয়তো এসবই আমার কল্পনা। কিন্তু তাকে এমন বেপরোয়া মনে হচ্ছিল..."

কি বলব বুঝতে পারছি না। আন তো সেরকম কল্পনাপ্রবণ মেয়ে নয়। আমার বিশ্বাস সে জানালায় কাউকে দেখেছে, কিন্তু বাকিটা... ট্যাপ্‌লো বলেছে বাড়িটা খালি, আর দরজা ভেঙে কেউ বাড়িটাতে ঢুকতে পারে না। কিন্তু বাগানে তার ব্যবহারও তো কিছুটা অদ্ভুতই ছিল।

হাল্কাভাবে বললাম, "রোদে ভিরমি লেগেছে।"

ঠাট্টাটা কাজে লাগল না। আন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল।

"আমি জানতাম তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না। কাজেই একথা ভুলে যাওয়াই ভাল। এরকম কোন ঘটনাই ঘটেনি। ঠিক আছে?"

"তুমি যা বলবে," আমি অস্বস্তির সঙ্গে বললাম।

আন বলল, "বেশ। একথা আমরা ভুলেই যাব। এবার বাড়ি চল। আমার একটু কিছু চুমুক দেওয়া দরকার।"

দরকার আমারও ছিল। গাড়ির চাবি ঘুরিয়ে বললাম, "আর বাড়িটা সম্পর্কে কি বল?"

সে হেসে উঠল। "ওহো, সেটা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। সেকথা পরে হবে। আগে বাড়ি চল।"

বাড়ি ফিরে বাড়িটা সম্পর্কে অনেক কথা হল। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, বাড়িটা কেনা হবে। যদিও বাড়িটা আমাদের কারোরই খুব পছন্দসই নয়, তবু দাওটা হাতছাড়া করার মতো নয়। দরকার হলে পরে আর একটা ভাল বাড়ি কিনলেই হবে।

নতুন বাড়িতে প্রথম কয়েকটা সপ্তাহ কোন অঘটন ঘটল না। বাড়িতে নতুন করে কিছু করারও ছিল না। কেবল ঘরের যে রংয়ের পরিকল্পনা ট্যাপ্‌লো করেছিল সেটা আমাদের পছন্দ হয়নি; দু'একটা ঘর নতুন করে সাজানোও হল। এটুকু ছাড়া আর কোন অদল-বদলই করা হল না। "মৃতা নারীর পরিত্যক্ত জুতো," ঠাট্টাটা করেই সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুশোচনা হল।

বাড়িতে আসার কয়েক সপ্তাহ পরে ২৪ নম্বরের পাশের বাড়ির দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হতেই ঠাট্টাটার কথা মনে পড়ল। তার আগে পর্যন্ত তারা আমাদের এড়িয়েই গেছে। দুটো বাগানের মাঝখানের বেড়ার দু' দিক থেকে মাঝে মধ্যে কিছু কথা হয়েছে মাত্র; কিন্তু কোন না কোন ছুতোয় তারা বাড়িতে ঢুকে গেছে। মধ্যবয়সী দম্পতি— তাদের নামটাও জানা হয়নি—শীঘ্রই অবসর গ্রহণে উন্মুখ। একদিন নানা কথায় ভুলিয়ে সেই নাম-না জানা মিসেসের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলাম এবং কথাপ্রসঙ্গে ট্যাপ্‌লোদের কথাটাও তুললাম।

নামটা শুনেই মিসেসের মুখ কঠিন হয়ে উঠল; কিন্তু একটু পরেই অনেকটা সহজভাবেই তাদের সম্পর্কে দু'একটা কথা বলল। অবশ্য নতুন তথ্য বিশেষ কিছু ছিল না: ট্যাপ্‌লো দম্পতি খুবই সুবিবেচক প্রতিবেশী ছিল; শান্তশিষ্ট, ভদ্র। কিন্তু কিছুদিন পরেই মিসেসের ব্যবহার কেমন যেন হাস্যকর মনে হত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাগানে দাঁড়িয়ে থাকত, বিড়বিড় করত, কাঁদত। আর কিছুদিন পরেই...নাম-না-জানা মিসেস আর কিছু বলতে চাইল না। স্টোভে রান্না চাপিয়ে এসেছে, তক্ষুণি সেটা নামাতে হবে। কিন্তু রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতেই সে বলে গেল, কী লজ্জার কথা; মিসেস ট্যাপ্‌লো এমন সুন্দরী মেয়ে, লাল চুল,....

এই বাক্যালাপের কথা আনকে জানালাম না। বলা দরকারও মনে হয়নি। জানালায় দেখা সেই মুখের প্রসঙ্গ যত না ওঠে ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। ওটাকে আমরা দু'জনেই ভুলে যেতে চাই।

নাম না জানা মিসেসের সঙ্গে কথাবার্তার কয়েকদিন পরে কাজ থেকে বাড়ি ফিরে আনকে বাগানেই পেয়ে গেলাম। পুরনো বাড়িটা'র জানালার দিকে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কাছে গিয়ে তার দুই চোখে ভয় ও হতাশা লক্ষ্য করে আমি চমকে উঠলাম। তাকে নিয়ে বাড়িতে ঢুকলাম। সে একটি কথাও বলল না। দু'জনের জন্য পানীয় ঢাললাম। আনের শরীর তখন কাঁপছে।

একটু পরে বললাম, "তুমি আবার তাকে দেখেছ, তাই না ?"

"হ্যাঁ।" সে অস্ফুট গলায় জবাব দিল।

"সেই একই মুখ ? একই মেয়ে ?"

"হ্যাঁ।"

নাম না জানা মিসেসের দেওয়া বিবরণ মনে পড়ে গেল। বললাম, "মাথায় লাল চুল, তাই না ?"

"হ্যাঁ। দেখ, আমি খুবই দুঃখিত। আমি জানি কথাগুলি বোকার মতোই বলছি ।"

আমি জোর গলায় বললাম, "না, না, বোকার মতো কেন হবে ? এ বাড়িতে নিশ্চয় কেউ বাস করে।"

"তা কি করে হবে ? বাড়ি তো তালাবন্ধ।" আনের আর্তস্বর "সে আমার সাহায্য চায়। আমাকে তার দরকার।"

"বাজে কথা। তোমাকে তার দরকার হবে কেন ?"

আন কাঁধ ঝাঁকুনি দিল। "আমি জানি, সে আমাকে চাইছে।"

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে বললাম, "বেশ তো, তাহলে চল, গিয়ে দেখেই আসি ব্যাপারটা কি। চল, লাল মাথা মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করেই আসি ।"

আন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। বলল, "এটা হয় তো আমার কল্পনা। হ্যাঁ, নিশ্চয় কল্পনা।"

"বেশ তো, চল না। ওখানে গিয়েই সন্দেহভঞ্জন করে আসি।" বলে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। আমার হাতটা ধরে সে গম্ভীরভাবে আমার দিকে তাকাল। "আমার আচরণ তোমার কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে না তো ? এই সব যা তা দেখা। ভ্রান্তদর্শন।"

বললাম, "না, আমি মোটেই তা মনে করি না। জানালায় তুমি কাউকে দেখেছ। তার মানে ওখানে কেউ থাকে। আর কোনরকম সাহায্যের দরকার যদি তার থাকেই তাহলে তো সাহায্য করাই কর্তব্য। চল।"

বাড়িটার নাম, "দি লরেল্‌স।" ফটক থেকে সামনের সিঁড়ি পর্যন্ত রাস্তাটা ভাঙাচোরা ও আগাছায় ভর্তি, ফটকটাও খুব নিরাপদ মনে হয় না। পৌঁছে দেখলাম, সামনের দরজাটা তালাবন্ধ, আর বাইরে কাচের পাল্লার উপর তক্তা মেরে দেওয়া হয়েছে। জানালায় দেখা নারী যে এই দরজা দিয়ে ঢোকেনি সেটা সহজেই বোঝা যায়। বাড়িটা ঘুরে দেখলাম। বাগানটা ঝোপ জঙ্গলে ভর্তি, এখানে ওখানে আবর্জনার স্তূপ, পরিত্যক্ত বাড়িতে যেরকম হয়ে থাকে। একতলার জানালাগুলো পোক্ত করে বন্ধ করা হয়েছে। পিছনের দরজাটাও সামনের দরজার মতোই বন্ধ।

আবার সামনের দরজায় ঘুরে এসে আনের দিকে ফিরে বললাম, "দেখ, তোমার সেই রহস্যময়ী বান্ধবীটি একতলা দিয়ে ঢুকেছে বলে তো মনে হয় না। হয় তো জলের পাইপ বেয়ে উঠে দোতলার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে।"

আন চটে গেল। "ঠাট্টা করছ ? তুমি তো আগাগোড়াই আমাকে অবিশ্বাস করছ।

বেশ তো, তাহলে সবটাই আমার কল্পনা। না হয় আমি মিথ্যা বলেছি। তোমার যা খুশি তাই মনে করতে পার।" সে মুখ ঘুরিয়ে রাস্তায় চলে গেল।

তাড়াতাড়ি তার পিছু নিলাম। "আমি কি ভাবব বলে তুমি আশা কর? তোমাকে অবশ্যই বিশ্বাস করি। তুমি জানালায় কাউকে দেখেছ। কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখলে বাড়িটা বন্ধ। তাহলে সে ঢুকল কোথা দিয়ে?"

ততক্ষণে আমরা আমাদের নিজের ফটকে পৌঁছে গেছি। অ্যান ফটক খুলে কোন কথা না বলেই দরজা দিয়ে ঢুকে গেল। তাকে অনুসরণ করে হলে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। ধীরে ধীরে বললাম, "তোমার বিশ্বাস জানালায় কাউকে দেখেছ। কিন্তু ও বাড়িতে যে কেউ আছে সেটা আমি বিশ্বাস করি না।"

অ্যান তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, "তাহলে ব্যাপারটা কি দাড়াল? আমি একটা হাঁদা?"

"আমি জানি না। আমি জানি না।" বৈঠকখানায় ঢুকে একটা গ্লাস নিয়ে বসলাম। অ্যান দোতলায় উঠে গেল। সে সন্ধ্যায় আর নিচে নামল না।

অবশ্য রাতে নেমে এল। সকাল তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙতে দেখি অ্যান বিছানায় নেই। স্নান ঘরে নেই, একতলায়ও নেই। গোটা বাড়িটাতেই তাকে খুঁজে পেলাম না। ভয় পেয়ে গেলাম। হঠাৎ বুঝতে পারলাম সে কোথায় গেছে। পিছনের শোবার ঘরে গিয়ে জানালা দিয়ে বাগানে চোখ ফেললাম। সেখানে চাঁদের আলোয় অ্যান দাঁড়িয়ে আছে, একদৃষ্টিতে পাশের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে।

সেই থেকেই অ্যান কেমন যেন বদলে গেল। হাসিখুশি চটপটে মেয়েটি ধীরে ধীরে কেমন চুপচাপ, চাপা স্বভাবের মানুষ হয়ে গেল। আমি তাকালেই মুখ ফিরিয়ে নেয়, হাত বাড়ালে সরে যায়। এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই হয়নি, যেন জানালায় দেখা নারীর কথা সে ভুলেই গেছে, কিন্তু আমি তো জানি প্রতিদিন সকালে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই সে সোজা বাগানে চলে যায়। সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসি তখন সে রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মুখের ক্লান্তি দেখেই আমি বুঝতে পারি সেই নারীকে সে আবার দেখতে পেয়েছে। রাতে বিছানায় সে আমার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে অন্ধকারে জেগে থাকে। যখনই জাগি তখনই দেখি সে নেই। সে যে কোথায় গেছে তা নিয়ে এখন আমি ভাবি না। আমি জানি।

ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে বাধ্য মেয়ের মতোই সে আমার সঙ্গে গেল। কিন্তু ডাক্তার যে বড়ি খেতে দিল তাতে কোনই পরিবর্তন হল না। হয় তো সে বড়ি সে খায়ইনি। বললাম, চল এখান থেকে চলে যাই, আর বাড়িটা বিক্রি করে দেই, কিন্তু তার তীব্র আপত্তিতে চুপ করে গেলাম। অ্যান বাগানে গিয়ে কি দেখে সেটা জানবার জন্য দু'একবার বাগানে গিয়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়েও থেকেছি। সেই নারীকেও দেখতে চেয়েছি। কিন্তু ধূলিমলিন কাচের উপর আলো ও গাছপালার ছায়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনি। কি যে করব বুঝতে পারছি না। আমার এত ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী স্ত্রী যেন ক্রমেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

তারপর, একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখি ঘর খালি। পিছনের দরজা দিয়ে বাগানে গেলাম। কিন্তু বাগানও জনশূন্য। সে কোথায় গেছে তার কোন সূত্র যদি পাওয়া যায় এই আশায় বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কোথাও কিছু পেলাম না। টেলিফোনটা বেজে উঠল। ছুটে নিচে গেলাম, নিশ্চয় আন কোন বান্ধবীর বাড়ি থেকে ফোন করছে, হয়তো সেখানেই ডিনারের জন্য বান্ধবী আটকে দিয়েছে; অথবা শহরে গিয়ে ফিরতে দেরি হয়েছে। কিন্তু টেলিফোন করেছে অন্য লোকে—আমার ভাই; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা শেষ করলাম।

ঘণ্টা বেজেই চলল। আকাশ অন্ধকার হয়ে এল। আবার বাগানে গিয়ে "দি লরেল্স্"-এর দিকে তাকালাম। হঠাৎ মনে হল, আন সেখানেই গেছে। ছুটে রান্নাঘরে গেলাম; সেখান থেকে হল-এ; সশব্দে দরজা ও ফটক বন্ধ করে আমাদের বাড়ি ও "দি লরেল্স্"-এর মাঝখানের কয়েক গজ জায়গা ছুটে পার হয়ে গেলাম। অন্ধকার জানালাগুলি অন্ধের চোখের মতো আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাঙা সিঁড়ি ও কাঠ লাগানো দরজায় যাবার পথে বারকয়েক হোঁচট খেলাম। কেন যাচ্ছি, কিসের আশায় যাচ্ছি তাও জানি না। শুধু এইটুকু নিশ্চিত জানি যে সে ঐ বাড়িতে আছে, আর তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

সামনের দরজাটা খোলা দেখে আমার অবাক হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আমি অবাক হইনি। দরজাটা কেন খোলা আছে, আর কে বা খুলেছে সে কথা একবারও না ভেবে ওপাশের অন্ধকার, ধুলোভর্তি হলঘরে ঢুকে পড়লাম। সিঁড়ির উপরকার স্কাই-লাইট দিয়ে আসা একটা আবছা আলো হলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘরের দুই পাশের বন্ধ দরজাগুলোর দিকে কোনরকম নজর না দিয়েই আমি চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। একবার কান পাতলাম। কিছুই শুনতে পেলাম না। নিস্তব্ধতার একটা শ্বাসরোধকারী কালো কম্বল যেন আমাকে ঘিরে ধরেছে; আমার পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ কোথাও নেই! দোতলার চাতালে পৌঁছে একবার থামলাম। তবু কোন শব্দ নেই। আমার ডান দিকে একটা বারান্দা চলে গেছে; সেটা ধরেই এগিয়ে গেলাম।

শেষ প্রান্তে একটা দরজা; তার ফাঁক দিয়ে একটা রূপোলি আলোর রেখা বারান্দায় এসে পড়েছে। থামলাম, আমি জানতাম, আন সেই দরজার অপর দিকে, আর এই প্রথম আমি তাকে ডাকলাম, "আন! আন, তুমি কোথায়?" কোন উত্তর এল না। একটা শব্দ পর্যন্ত নেই। ধীরে ধীরে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। ইচ্ছা হল, ছুটে যাই, একধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেলি, আনকে ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে আসি। কিন্তু তার সঙ্গে আর কে আছে তা তো আমি জানি না। দরজার কাছে পৌঁছে আবার থামলাম। আস্তে একটু ধাক্কা দিলাম। দরজাটাও আস্তে ভিতরের দিকে খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু—একটা মাকড়সার জাল অথবা হাওয়া—এসে আমার গালে লাগল। ঘরের মধ্যে তাকালাম। আমার মুখোমুখি একটা জানালা। রঙিন কাঁচের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে তৈরি বিচিত্র পাড় বসানো একটা মস্ত বড় জানালা।

ঘরের মধ্যে আন একা। আর কেউ নেই, কোন লাল চুল মেয়ে নয়, কিছু নয়। শুধু আন। ধূলোভর্তি মেঝেতে সে তালগোল পাকিয়ে শুয়ে আছে। লম্বা চুলের রাশি তার মুখের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সে চুল একপাশে সরাতেই দেখলাম সে হাসিমুখেই মারা গেছে।

একটি যুবক দম্পতি আজ বাড়িটা দেখতে এসেছে। আমারই বয়সী, বরং একটু বেশি লাজুক। বাড়িটা দেখে তারা বেশি কিছু বলল না, তবে মনে হল যে, বাড়ি তাদের পছন্দ হয়েছে। পছন্দ হবারই কথা। বাড়িটা ভাল, পরিবেশটাও ভাল। আর কোনরকম অযৌক্তিক দামও আমি চাইনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িটা বিক্রি করে দিতেই আমি চাই, তাদের শুধু বললাম, এ দামে যদি তারা এর চাইতে ভাল বাড়ি পান তবে তাদের ভাগ্য ভাল বলতেই হবে।

অবশ্য বাগানে দাঁড়িয়ে মেয়েটির আচরণ কেমন যেন অদ্ভুত মনে হল। পাশের পুরনো বাড়িটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে আমার কাছে জানতে চাইল, ও বাড়িতে কে থাকে। আমি যখন বললাম যে বাড়িটা খালি পড়ে আছে তখন সে ভুরু কুঁচকে বলল, সে শপথ করে বলতে পারে যে দোতলার একটা জানালায় সে কাউকে দেখেছে। মেয়েটার মাথায় লম্বা চুলের রাশি।

অনুবাদ মণীন্দ্র দত্ত

বাসের সেই ছেলেটি

The Boy on the bus মার্গারেট পটার

নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত আন্ড্রু স্টার্লিং ভূতে বিশ্বাস করত না। তখন তার বয়স তের বছর, কিন্তু পাঁচ বছর আগের একটা ঘটনা না ঘটলে সে তো ভূতকে ভূত বলেই চিনতে পারত না।

সাড়ে সাত বছর বয়সে যে ছিল একেবারেই ছেলেমানুষ, সম্প্রতি বেশ বাড়তে শুরু করেছে। সপ্তম জন্মদিনে যে টেরিলিন শার্ট তার হাঁটু ছুঁত, এখন সেটা পরলে তার উরু বেরিয়ে পড়ে। একদিন তার বাবা মা গাড়ি করে তাকে নিয়ে গেলেন হাই হিথ প্রিপারেটরি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার জন্য। প্রধান শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন স্কুলের বাড়ি ও খেলার মাঠ ঘুরিয়ে দেখাতে। আন্ড্রুকে তুলে দেওয়া হল সেকেন্ড মাস্টারের হাতে। লোকটি বয়স্ক, নাকের উপরে সোনালী ফ্রেমের চশমা, মুখে মিষ্টি হাসি।

দু'জনে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটা খুব ছোট অন্ধকার ঘরে ঢুকল। ঘরটার সবগুলি দেওয়াল মেঝে থেকে শিলিং পর্যন্ত বইয়ের তাকে ঠাসা। মাঝখানে একটা কাঠের টেবিলেও স্তূপীকৃত বই। তার চারিদিকে চারটে চেয়ার।

"স্কুলের শেষ বছরে সবচাইতে সেরা ছেলেরাই এই ঘরে পড়তে আসে," ঈষৎ বিদেশী উচ্চারণে সেকেন্ড মাস্টার কথাগুলি বললেন।

আন্ডু মাথা নেড়ে বোঝাতে চাইল সে মন দিয়ে শুনছে, কিন্তু আসলে নিজের আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে সে তখন এতই চিন্তিত যে অন্য কিছু ভাববার সময় তার ছিল না।

শিক্ষক বললেন, "এখানে বস। প্রথমে সহজ প্রশ্ন দিয়েই শুরু করি। একটা ছোট গল্প লেখ দেখি কেমন পার।"

লিখতে বসে আন্ডুর বুক কাঁপতে লাগল। সে মোটেই গল্প বানাতে পারে না। কিন্তু বাবাকে কথা দিয়েছে, সাধ্যমতো চেষ্টা করবে। পেন্সিলটা হাতে নিয়ে কোন্ বিষয়ে গল্প লিখতে হবে সেটা শুনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

শিক্ষক বললেন, "দীর্ঘ গল্প লিখতে হবে না। ততটা সময় আমাদের হাতে নেই। তোমাকে একটা ছবি দেখাচ্ছি। সেটা দেখে তাকে ভিত্তি করেই গল্পটা লিখবে। এই দেখ।"

সাদা-কালোয় আঁকা একটা সাধারণ ছবি; যেরকম ছবি সাধারণত আঁকার বইতে থাকে। একটা একতলা বাসে একটি ড্রাইভার স্টিয়ারিং-হুইলে বসে হাঁ করে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। পিছনের সিটে দু'জন যাত্রী বসে আছে; পুরুষটির মাথায় মোটর-সাইকেল চালকের শিরস্ত্রাণ, আর স্ত্রীলোকটির হাতে একটা পেট-মোটা বাজারের থলে। একজন ফুটবল-অনুরাগী যুবক সবেমাত্র বাসে পা দিয়েছে; তার মাথায় ডোরাকাটা পশমী টুপি, আর জার্সিতে একটা ছোট গোলাপ ফুলের ছবি পিন দিয়ে আঁটা। একটি বয়স্ক ভদ্রলোক হাত তুলে বাসটা থামাতে বলে ছুটে আসছে। বাতাসে তার স্কার্ফটা উড়ছে। খুবই সাধারণ একটা দৃশ্য। ছবিটাতে কিছু নেই যাতে বোঝা যেতে পারে কেন বাসটার পিছন থেকে বিষাক্ত গ্যাসের মতো একটা ভয়ংকর ঘন কালো ধোঁয়ার সারি আন্ডুকে ঢেকে ফেলতে চাইছে, তার গলা আটকে দিতে চাইছে, তার দম বন্ধ করে দিতে চাইছে।

আন্ডু উঠে দাঁড়াল। তার চেয়ারটা সশব্দে একপাশে উল্টে গেল, তার পেন্সিলটা ঠুক করে মেঝেতে পড়ল; কিন্তু সে কিছুই শুনতে পেল না। ছবিটার কাছ থেকে এই মুহূর্তেই পালিয়ে যেতে হবে—এছাড়া আর কোন চিন্তাই তার মাথায় এল না। ঘরটা খুবই ছোট। এক পা পিছিয়ে গেলেই দেওয়ালে ধাক্কা খেতে হবে। তার মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল; হৃৎপিণ্ডের গতি থেমে গেল; বরং মনে হল হৃৎপিণ্ডটা যেন শরীরের মধ্যে বেলুনের মতো ফুলে উঠছে! মাথার চারিদিকে একটা গর্জনের শব্দ হচ্ছে, কিন্তু মাঝখানে দেখা যাচ্ছে ত্রাসের একটা ছোট সাদা বৃত্ত। পিছু হটে

বইয়ের তাকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল; কোন কিছু ধরবার জন্য হাত দুটোকে দু'দিকে বাড়িয়ে দিল; মনে হল, সে বুঝি পড়ে যাবে।

কিসে যেন তাকে সজোরে আঘাত করল, প্রথমে ডান গালে, তারপর বাঁ গালে। একটা হাত গলা চেপে ধরে এমনভাবে তাকে নুইয়ে দিল যে তার মাথাটা হাঁটু স্পর্শ করল। একমুহূর্ত পরে সে শিউরে উঠল; মাথার ভিতরকার গর্জনটা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হল; কানে এল শিক্ষকের কণ্ঠস্বর।

"তোমাকে আঘাত দেবার জন্য ওটা করা হয়নি আন্ডু, তোমার মাথায় রক্তটা ফিরিয়ে আনতেই ওরকম করা হয়েছে। একটু কিছু পান করবে কি?"

জবাব দিতে আন্ডুর একমুহূর্ত বিলম্ব হল। সে কিছুতেই বুঝতে পারল না, ভয়ের কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও কেন সে ভয় পেল। কিন্তু একটা জবাব তো দিতে হবে।

"না; ধন্যবাদ স্যার।" বাবা তাকে শিখিয়ে দিয়েছে, যতবার সম্ভব সে যেন "স্যার" কথাটা ব্যবহার করে।

শিক্ষক বললেন, "মনে হচ্ছে এই ছোট্ট পরীক্ষার জন্য তুমি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছ। *'হাই স্কুল'*-এ আসাটা কি তোমার পক্ষে একান্তই দরকার?"

প্রশ্নটা মোটেই সহজ নয়। জুনিয়র স্কুলে আন্ডু বেশ সুখেই ছিল। কেন যে বাবা-মা তাকে অন্য স্কুলে দিতে চায় তাও সে জানে না; কিন্তু সে এটা জানে যে তার সাহায্য ছাড়া তাদের এ পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে না। কাজেই কারণ যাই হোক না কেন, এ ব্যাপারে তার যে একটা দায়িত্ব আছে তা সে বোঝে।

মনে হল, তাকে চুপ করে থাকতে দেখেই শিক্ষক সঠিক জবাবটা পেয়ে গেলেন।

বললেন, "তোমার বাবা হয় তো এটা চান, কি বল?" আন্ডু মাথা নাড়ল। "কিন্তু কেন চান সেকথা কি তোমাকে কেউ বলেননি?"

শিক্ষক একমুহূর্ত থেমে দরজাটা খুলে দিলেন।

"আবার আমার সঙ্গে এস।" সিঁড়ি বেয়ে উঠে তারা একটা বড় ঘরে ঢুকল। মনে হল, ঘরটা একাধারে সভা-কক্ষ ও ব্যায়ামাগার। দুটো টানা দেওয়ালে মই বসানো। প্ল্যাটফর্মের পিছনে একেবারে শেষ প্রান্তে কৃতী ছাত্রদের নামের তালিকাসম্বলিত একটা বোর্ড চোখে পড়ল। বোর্ডটা ভর্তি করে সোনালী অক্ষরে অনেক নাম লেখা রয়েছে।

শিক্ষক বললেন, "এটা ভাল ছেলেদের স্কুল। কম-বেশি সকলেই ভাল, কেউ বোকা নয়। কোন ধনী ব্যক্তি যদি তার বোকা ছেলেকে নিয়ে আসেন, আমরা তাকে দুঃখের সঙ্গে ফিরিয়ে দেই।"

আন্ডু শুধাল, "এখানে ভর্তি হবার আগেই কি করে আপনারা বোঝেন তারা ভাল ছেলে?"

শিক্ষক বললেন, "যেসব ছেলে এখানে আসতে চায় তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি একটি ঘণ্টা কাটাই। সেই এক ঘণ্টার পরেই আমি বুঝতে পারি তার বুদ্ধিশুদ্ধি

কতটা আছে।" শিক্ষক প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে গেলেন। বোর্ডটা দেখিয়ে বললেন, "কেউ তার ভাল ছেলেটিকে আমাদের এখানে দিলে বিনিময়ে আমরা তাকে এইটি দিতে চেষ্টা করি। পাব্লিক স্কুলে যাবার জন্য একটা বৃত্তি।"

আন্ডু বলল, "আপনারা দেখছি বহু ছেলে পান স্যার।" গত বছরের তারিখ দিয়ে যে নামগুলি সোনালী অক্ষরে লেখা হয়েছে সেগুলিকে সে গুণতে লাগল।

শিক্ষক ঘাড় নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, অনেক ছেলে। এই জন্যই তোমার বাবার মতো সকলেই তাদের ছেলেকে 'হাই হিথ'-এ পাঠাতে চান। তেরো বছরের ভাল ছেলেরা বৃত্তি পায়, আর তাতেই স্কুলের সুনাম হয়। ফলে সাত-আট বছরের ভাল ছেলেদেব এখানে পাঠানো হয় যাতে তারাও একদিন বৃত্তি পেতে পারে। তোমার বাবা মনে করেন তুমিও একটি ভাল ছেলে। কিন্তু বাবারা তো তাদের ছেলেকে ভাল ভাববেনই। তিনি ঠিক ভেবেছেন কি না সেটা প্রমাণ করতে হবে তোমাকে। স্কুলে কি পড়তে তোমার সব চাইতে ভাল লাগে আন্ডু?"

"অংক স্যার।"

"তাহলে তো আমাদের সেই ছোট ঘরটায় ফিরে গিয়ে কিছু অংকই কষতে হবে।"

তারা এত দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামল যে স্পষ্টই বোঝা গেল যথেষ্ট সময় এরই মধ্যে নষ্ট হয়েছে।

"এখানে আমার ঠিক পাশে বস। দেখ, এই ছোট বইটাতে একশটা প্রশ্নের অংক আছে। অবশ্য সবগুলো অংক কষতে তোমাকে বলব না। অনেকগুলো অংকই তোমার চাইতে তিন চার বছরের বড ছেলেদের জন্য। প্রথমে আমরা তাডাতাডি লাফিয়ে যাব, যাতে আমি বুঝতে পারি কোথায় তোমাব শক্ত লাগছে।"

আন্ডু ঘাড নেডে জানাল, সে বুঝেছে। সে সোজা হয়ে বসল। এ পরীক্ষাটাতে তাকে ভাল ফল করতেই হবে।

"প্রথম অংকটা একেবারে বাচ্চাদের জন্য। উত্তর বল।"

সহজ গুণ অংকটা মনে মনে কষেই আন্ডু সঠিক জবাবটি দিল।

"সোজা চলে যাও দশ নম্বরে। মনে হয়, এটাও তোমার পক্ষে সোজাই হবে।"

অংকটা এই রকম: একটি ছেলে কিছু মার্বেল জিতল, কিছু হারল, কিছু ভাগাভাগি করল; কিন্তু কথাগুলি বলা হল খুব ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। এ অংকটাও আন্ডু মনে মনেই কষে ফেলল।

"তাহলে চলে যাও বিশ নম্বরে। কাগজ-পেন্সিলের দরকার হলে চেয়ে নিও।"

এ অংকটা একটি পরিবারের ছেলেমেয়েদের বয়সের হিসাব। আন্ডু অংকটা ঠিক ঠিক কষে ফেলল।

শিক্ষক বললেন, "এবার তোমাকে একটা শক্ত অংক দিতে হবে। ত্রিশ।"

ত্রিশ নম্বব অংকটার চারটে অংশ। প্রত্যেক অংশে পর পর কতকগুলি করে সংখ্যা। প্রতিটি অংশে আর একটা সংখ্যা যোগ করতে হবে সংখ্যাগুলির ক্রম-নিয়ম অনুসরণ করে। আন্ডু খুব তাড়াতাড়ি প্রশ্নটা বুঝে নিয়ে সঠিক জবাবই দিল।

ত্রিশ নম্বরের পরে আর লাফিয়ে যাওয়া নেই। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে সে ধীরে ধীরে একের পর এক অংক কষে যেতে লাগল। সাঁইত্রিশ ভুল হল ; আটত্রিশ আরম্ভই করতে পারল না। সভয়ে শিক্ষকের দিকে তাকাল।

শিক্ষক বললেন, "তুমি তো ভালই করছ। এবার তোমাকে একটা ছোট্ট পড়া দেব। মন দিয়ে শোন ; দেখ ঠিক বুঝতে পার কি না।"

পড়াটা গড় -বিষয়ক ; কথাটা আল্ডু আগে কখনও শোনেনি। শিক্ষক বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে চুপ করলেন। আল্ডু বুঝতেই পারল না তাকে কি করতে হবে।

"তুমি কি আটত্রিশটা আর একবার দেখবে ?"

এবার অংকটার দিকে তাকিয়েই আল্ডু বুঝতে পারল, সে ঠিক কষতে পারবে। খুশির হাসি হেসে উত্তরটা লিখে দিল।

বলল, "কিন্তু এটা কি ঠিক হল স্যার ? মানে, আপনি তো আমাকে সাহায্য করলেন।"

"তোমার উত্তরগুলো দেখে আমাকেই তো বলতে হবে 'হ্যাঁ', আমরা একে নেব অথবা, নেব না। আর আমিই শুধু জানব তুমি কতটা সাহায্য পেয়েছ। তোমাকে যা বলা হল সেটা তুমি ঠিক ঠিক বুঝতে পার কি না—সেটাও এক ধরনের পরীক্ষা। এবার এই বইটা থেকে আমাকে কিছু পড়ে শোনাও।"

খুব বেশি না থেমেই আল্ডু একটা অনুচ্ছেদ পড়ল। তাকে অনেকগুলি ছবি দেওয়া হল। এক রকমের দুটো ছবি, বা এক ধরনের ছবি নয় এ রকম ছবি সে সহজেই বেছে বের করে দিল। শিক্ষক সারাক্ষণই সম্মতিসূচকভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর ছবিগুলি ফিরিয়ে নিলেন।

"এবার লিখতে পারবে তো ?"

অকারণেই এবারও আগের মতোই একটা ভয় তাকে পেয়ে বসল। এক মিনিট কোন কথাই বলতে পারল না ; শুধু মাথা নাড়ল।

তারপর যেন কথা বলার ক্ষমতা ফিরে পেল। বলল, "না ; না, আমি পারব না।"

"কেন পারবে না ?"

কেন পারবে না তো আল্ডু জানে না। শুধু বুঝল, এখানে আসা তার উচিত হয়নি। এখানে তার জন্য কোন অকল্যাণ অপেক্ষা করে আছে। সে এখান থেকে চলে যেতে চায়, এই বুড়ো মানুষটির কাছ থেকে পালাতে চায় ; ইনি যে তার মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পান, সেখানে যা কিছু আছে সব পরিষ্কার করে দিতে চান। তাছাড়া, এই বাস ও তার সারিবদ্ধ যাত্রীদের দৃষ্টির বাইরে সে চলে যেতে চায়।

একটা যুক্তি খোজার আপ্রাণ চেষ্টায় সে বলে উঠল, "আমি বানান করতে পারি না।" কথাটা সত্যি। জুনিয়র স্কুলের কোন শিক্ষকই বানান শেখার উপর গুরুত্ব দেননি। তারা বলতেন, তাড়াতাড়ি লিখতে পারলেই হল, আর মনের কথা বোঝার জন্য

তুমি আমার সঙ্গে কাজ করবে, শক্ত শক্ত অংক কষবে, আর ঐ বোর্ডে তোমার নাম আমি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়ে দেব। তুমি কি আমার কথা মতো এখানে থাকবে? গল্পটা লিখে ফেলবে?"

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। স্কুল পাল্টাবার কোন কারণ আন্ডুর নিজের নেই, আর সেই বাসের ছবিটা প্রথম দেখার পর থেকেই বাবার ইচ্ছা ও গুরুত্বও তার কাছে কমে গেছে। কিন্তু যে কারণেই হোক এই বুড়ো মানুষটি তার বন্ধু হয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে যে বন্ধন গড়ে উঠেছে, আন্ডু সেটাকে ভাঙতে অক্ষম। সে ঘাড় নাড়ল।

তখন কিন্তু সে গল্পটা লিখতে শুরু করতে পারল না। ছবিটার দিকে যতবার তাকায় ততবারই সে ভযটা তাকে পেয়ে বসে; আর সেই ভয়কে জয় করতে গিযে আর কোন দিকেই মন দিতে পারে না।

শিক্ষক শান্ত গলায় বললেন, "এই লোকগুলিব বরং একটা করে নাম দেওয়া যাক। একটা মুখকে নিয়ে গল্প লেখাটা শক্ত। কিন্তু তাকে যখন একটা নাম দেওয়া যায় তখন সে একটা মানুষ হযে ওঠে, আব তার জীবনে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। এবার লেখ।"

পেন্সিলটা আঙুলে চেপে ধবে আন্ডু বাসেব জন্য ছুটন্ত বুড়ো লোকটিব দিকে তাকাল। জড়ানো হরফে লিখতে শুরু কবল।

"মিঃ স্মিট্‌ "

শিক্ষক মুচকি হাসলেন।

"তুমি দেখছি আমাকে নিয়েই লিখছ, কি বল?"

আন্ডু চমকে চোখ তুলে তাকাল।

"আপনি মিঃ স্মিথ?"

"ইংলন্ডে আমি মিঃ স্মিথ। আমাব বয়স যখন তোমার মতো ছিল তখন আমাব নামের বানানটা তুমি যেমন লিখেছ প্রায সেইবকমই ছিল। তুমি ইংবেজি বানানটাই রপ্ত করো, কেমন?"

আন্ডু সভযে নামটা কেটে ফেলতে গিযে পেন্সিলটাতে এত জোবে চাপ দিল যে কাগজে একটা ফুটো হযে গেল।

শিক্ষক ঈষৎ হেসে বললেন, "তোমার ভুলটা শুধরে দেওযা আমাব উচিত হয়নি। আমি বাইরে চলে যাব কি?"

"হ্যাঁ স্যার, তাই করুন।"

"একটু পরেই আমি ফিবে আসব। দযা কবে তোমাব গল্প থেকে আমাকে বাদ দিও না। আবাব মিঃ স্মিথ সম্পর্কেই লেখ।"

ছবিটার উপবে ঝুঁকে শিক্ষক ছুটন্ত বুড়ো লোকটির নাকের উপর একজোড়া চশমা এঁকে দিলেন। তাবপর ঘব থেকে বেবিয়ে গেলেন।

ছবিটায যা কিছু অশুভ শক্তি সব যেন তাব সঙ্গেই চলে গেল। লেখার ব্যাপারে আন্ডু কোনদিনই পোক্ত নয়, কিন্তু এবার কথাগুলি যেন কাগজে লিখবার আগেই

তাব মাথা থেকে বেবিযে আসতে লাগল। তাব সর্বশেষ স্কুল বিপোর্টে বলা হযেছে, তাব মধ্যে কল্পনা শক্তিব অভাব আছে; কিন্তু ছবিটাব দিকে তাকিযে তাব কোন কিছু কল্পনা কবাব দবকাবই হল না। বাসটা সম্পর্কে সব কথাই যেন তাব জানা। কোন কিছু বানিযে লেখাব দবকাবই হল না, শুধু সে যা জানে তাই লিখে গেল।

মিঃ স্মিথেব প্রত্যাশাব অনেক আগেই তাব লেখা শেষ হযে গেল। কিন্তু ছোট্ট ঘবটাতে একলা বসে থাকতে ভাল না লাগায সে নিজেই দবজাটা খুলে দিল। সিঁড়ি বেযে উপবে উঠতেই সে শুনতে পেল স্কুল পবিদর্শনান্তে তাব বাবা মাকে প্রধান শিক্ষকেব পড়াব ঘবে অপেক্ষা কবতে বলা হচ্ছে। একটা দবজা বন্ধ হযে গেল, বাইবেব বাবান্দায প্রধান শিক্ষক কাকে যেন কিছু বললেন।

"আমি ভিতবে ঢুকবাব আগেই ছেলেটি সম্পর্কে আপনাব মতামত বলুন।"

আন্ড্রু চুপচাপ দাঁড়িযে পড়ল। কোনবকম বিঘ্ন সৃষ্টি কববাব সাহস হল না, আবাব ছোট ঘবটাতে ফিবে যেতে গিযে কোনবকম শব্দ কবতেও চাইল না। সে বুঝল, এভাবে ওদেব কথাবার্তা শোনা তাব উচিত নয, কিন্তু এতক্ষণে মিঃ স্মিথেব মতামত তাব কাছে গুরুত্বপূর্ণ হযে উঠেছে।

মিঃ স্মিথেব গলা শোনা গেল। "সে এখনও শেষ কবেনি। তাকে একটা গল্প লিখতে দিযে এসেছি। কিন্তু আপনাকে বলছি স্যাব, যদিও সে একটা শব্দেব পব আব একটা শব্দ বসাতে পাবে না, তবু তাকে এখানে আনতে হবে। তাকে আমাব চাই।"

"একটি ভবিষ্যৎ গণিতজ্ঞ বুঝি।"

মিঃ স্মিথ বললেন, "সে প্রতিভা [illegible]। এব মধ্যেই অংকেব যেসব কথা সে বুঝতে পাবে তাব চাইতে চাব বছব বড় অনেক ছেলেব পক্ষেও তা বোঝা বেশ শক্ত। তাকে কিছুই শেখানো হযনি, কিচ্ছু না। এটা একটা অপবাধ। কিন্তু কোন সাহায্য ছাড়াই সে সংখ্যাতত্ত্ব বুঝেছে। কি জানেন স্যাব, এখানে পাঁচিশ বছব ধবে আমি এমন একটি ছেলেই খোঁজ কবছি যে উইনচেস্টাব এব প্রথম বৃত্তি জয কবে আনবে।"

প্রধান শিক্ষক বললেন, "উইনচেস্টাব পবীক্ষার্থীদেব নিযে আপনাবা তো আগাগোড়াই ভাল ফল দেখিযেছেন। গত বছবই তো তৃতীয স্থান পেযেছে, আব তাব কিছু আগেই পঞ্চম স্থান।"

"কিন্তু প্রথম স্থান তো পাযনি। সেকথা থাক। এতদিনে সেই ছেলেটিকে আমি পেযেছি।"

"সাত বছব বযসেই সে বিষযে আপনি নিশ্চিত হতে পাবেন না।"

মিঃ স্মিথ বললেন, "ইতিমধ্যেই আমাদেব মধ্যে একটা বোঝাপড়া হযেছে। একটা অনভাত। আমবা পবস্পবকে কথা দিযেছি। সে নিজেকে আমাব হাতে সঁপে দেবে, আব আমি তাকে দেব উইনচেস্টাব বৃত্তি। তালিকাব একেবাবে শীর্ষস্থানটি।"

"বলেন কি মশাই!" প্রধান শিক্ষকেব কণ্ঠস্ববেব বিবক্তিতে আন্ড্রু অস্বস্তি বোধ

কবল। কিন্তু এখন তার পক্ষে সেখান থেকে সরে যাওয়া অসম্ভব। "আপনি নিশ্চয় ছেলেটিকে এসব কথা বলেননি ? আর তাকে যদি কথা দিয়েও থাকেন তাহলেও সে কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করবেন না। এ ধরনের কথা আপনি আমাকে দিতে পারেন।"

"ঠিকই বলেছেন স্যার।"

জানালা দিয়ে একঝলক বাতাস এসে নিচের ঘরের দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিল। মুহূর্তের জন্য অ্যান্ড্রু চমকে উঠল, তারপরই যেন এইমাত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছে এমনিভাবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। তাকে দেখে মিঃ স্মিথ একটুও অবাক হলেন না।

"শেষ করেছ ? এস আমার সঙ্গে।" মিঃ স্মিথ তাকে নিয়ে প্রধান শিক্ষকের পড়ার ঘরে ঢুকলেন। মিঃ ও মিসেস স্টার্লিং সেখানেই বসেছিলেন। শিক্ষক বললেন, "অ্যান্ড্রুকে তার গল্পটা জোরে জোরে পড়ে শোনাতে বলব কি ? তাহলে বানানে ভুল থাকলেও সেটা কেউ জানতে পারবে না।"

এই বদান্যতার জন্য অ্যান্ড্রু খুব কৃতজ্ঞ বোধ করল। বড়রা যাতে তার গল্পের বিষয়বস্তুটা বুঝতে পারে, সেজন্য ছবিটা সকলকে দেখানো হল। তারপরই অ্যান্ড্রু পরিষ্কার জোর গলায় পড়তে শুরু করল।

"বাসের ড্রাইভার যাত্রা শুরু করতে প্রস্তুত। তার নাম জ্যাক। স্ত্রী অসুস্থ থাকায় সে খুব চিন্তিত। পিছনের আসনে দু'জন বসে আছে। মিঃ জোন্স মোটর বাইকের দোকানে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানে বাইকটা খারাপ হওয়ায় তাকে বাসে চেপে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে। মিসেস হল বাজার করতে বেরিয়েছে। গরমে তার খুব কষ্ট হচ্ছে, কারণ মহিলাটি খুব মোটা। বাসের মধ্যে আরও একজন কেউ আছে, কিন্তু অন্যদিকে বসার জন্য তাকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে না। মিঃ পার্কিন্স সবে বাসে উঠতে যাচ্ছে। সে ফুটবল খেলতে গিয়েছিল। সেখানে লড়াই বেধেছিল। এখন বাড়ি যেতে পেরে সে খুব খুশি। মিঃ স্মিথ বাসটা ধরার জন্য ছুটছেন। তিনি খুব বৃদ্ধ, তাই জোরে ছুটতে পারেন না। সকলে বসতেই ড্রাইভার বাসটা ছেড়ে দিল। বাসে একটা দুর্ঘটনা ঘটবে, কিন্তু সেটা এখনও কেউ জানে না। যাত্রার শেষে বাসের সব লোকই মারা গেল।"

নিজের লেখাটি নিয়ে সে বেশ খুশি, কিন্তু সকলকে চুপ করে থাকতে দেখে কেমন যেন ঘাবড়ে গেল, মনে হল সে বুঝি অন্যায় কিছু করে বসেছে। মা ও বাবা চিন্তিতভাবে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, প্রধান শিক্ষক অবাক দৃষ্টিতে মিঃ স্মিথের দিকে তাকালেন।

বললেন, "আপনি বলেছিলেন যে ছেলেটির লেখার কোন ক্ষমতা নেই।"

"অ্যান্ড্রু নিজে আমাকে যা বলেছে, আমি আপনাকে তাই বলেছি। এ লেখাটা তো তখন দেখিনি।"

প্রধান শিক্ষক তবু মাথা নাড়তে লাগলেন। তারপর উজ্জ্বল চোখে আন্ডুর বাবা-মার দিকে তাকালেন।

"মিঃ স্টার্লিং, মিসেস স্টার্লিং লেখাটা বেশ ভাল হয়েছে। বেশ আনন্দের সঙ্গেই আমরা সেপ্টেম্বর মাসে আপনাদের ছেলেকে এখানে নিয়ে নেব। এখনও যদি কোন পাবলিক স্কুলে তার নাম না লিখিয়ে থাকেন তাহলে অচিরেই সেটা করে ফেলুন।"

মিঃ স্মিথ বললেন, "আপনাদের যেখানে খুশি তার নামটা লিখিয়ে রাখুন। কিন্তু তেরো বছর বয়স হলে আমি তাকে উইনচেস্টারেই পাঠাব।"

মুহূর্তের জন্য প্রধান শিক্ষককে বিরক্ত মনে হল।

"দেখুন মিঃ স্মিথ, আপনার কথাটা যেন স্মরণ থাকে।"

প্রধান শিক্ষককে জবাবটা দিলেও মিঃ স্মিথ আন্ডুর দিকে তাকিয়েই স্মিত হাসি হাসলেন।

বললেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয় স্যার। আমি সব সময়ই কথা রাখি।"

আন্ডু যেদিন প্রথম "হাই হিথ"-এ ঢুকেছিল নবাগত ছাত্র হিসাবে, তার পাঁচ বছর পরে খ্রিস্টমাস টার্মের শেষ দিনে বিদায়ী ছাত্রদের সম্মানে প্রধান শিক্ষক একটি ভোজসভার আয়োজন করেছেন। ডিসেম্বর মাসেই পাবলিক স্কুলগুলি তাদের অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের প্রার্থীদের বিদায় সম্ভাষণ জানায়, আর তার ফলে জানুয়ারি মাসেই প্রারম্ভিক বিদ্যালয় থেকে আগত নতুন ছাত্রদের তারা ভর্তি করতে পারে।

এ বছর যে তেরোটি ছাত্র "হাই হিথ" ছেড়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে ন'জন বিভিন্ন স্কুলের বৃত্তি বা সম্মান পদক লাভ করেছে, কিন্তু আন্ডুই হয়েছে সেরা বীর। আগেকার মে মাসে উইনচেস্টার নির্বাচনে বৃত্তিপ্রাপ্ত ছেলেদের তালিকায় সেই শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। প্রধান শিক্ষক তার সঙ্গে করমর্দন করেছেন, ঠিক হিসাব করেছেন বৃত্তির দরুন কত টাকা পাওয়া যাবে; তাকে একটা নতুন বাইসাইকেলও কিনে দিয়েছেন; আর মিঃ স্মিথ আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে তার দুই গালে চুমো খেয়েছেন।

আন্ডু অবশ্য চোখের জল বা চুম্বন কোনটাতেই বিব্রত বোধ করেনি; অবশ্য অন্য কেউ একাজ করলে সে খুবই বিব্রত হত। মিঃ স্মিথের সঙ্গে তার সম্পর্কটাই অন্য রকম। পরীক্ষার আগের বছর থেকেই ছোট লাইব্রেরি ঘরটাতে বসে দু'জনে লেখাপড়া করেছে। সেই সময় আন্ডু যেন অনুভব করত, শিক্ষকের সব জ্ঞান আপনা থেকে তার মাথায় ঢুকে যাচ্ছে, তাকে কোনরকম চেষ্টাই করতে হচ্ছে না। ততদিন সে আরও বুঝে নিয়েছে যে উইনচেস্টারকে কেন্দ্র করে যে স্বপ্ন মিঃ স্মিথ এতকাল দেখে এসেছেন, তাকে পূর্ণ করার শেষ সুযোগটি এনে দিয়েছে সে নিজে। সেকেন্ড মাস্টারটি ইতিমধ্যেই অবসর গ্রহণের বয়স পার হয়ে গেছেন। লোকে বলে, তাঁর বয়স প্রায় সত্তর বছর; কাজেই এটা নিশ্চিত যে সেপ্টেম্বরের পরে তিনি আর এ স্কুলে ফিরছেন না। জুলাই মাসের পুরস্কার বিতরণী সভায় তাকে একটা জটিল দেওয়াল ঘড়ি উপহার দেওয়া হয়েছে। ঘড়িটার যন্ত্রপাতি সব দেখা যায়। পঁচিশ বছর ধরে যেসব ছাত্রদের তিনি পড়িয়েছেন তারাও এসে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে গেছে।

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মিঃ স্মিথ এমনিতেই সেপ্টেম্বরে আর "হাই হিথ"-এ ফিরে আসতে পারতেন না। আগস্ট মাসে তার একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে: নভেম্বর মাসের শেষে আর একটা বিদায়ী ছাত্রদের ভোজসভায় প্রধান শিক্ষক তো বলেই ফেললেন যে এক ঘণ্টা আগে হাসপাতাল থেকে খবর এসেছে মিঃ স্মিথের "অবস্থা খারাপ"। আন্ডু কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না, তবু স্থির করল যে বড়দিনের ছুটিতে প্রাক্তন শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

ভোজসভার জন্য স্কুল থেকে বের হতে আন্ডুর কিছুটা দেরি হয়ে গেল। চৌমাথার মোড়ে পৌঁছেই দেখতে পেল, একটা বাস "স্টপ" থেকে ছেড়ে চলে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মা বলেছিল, গাড়ি নিয়ে এসে তার সঙ্গে দেখা করবে। মা তো জানতই, স্কুলের শেষ দিনে আন্ডু অনেক জতো, বই ও বড়দিনের পুরস্কার পাবে। কিন্তু ভোজসভা ঠিক কখন শেষ হবে জানত না বলে সে মার প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিয়েছিল। এখন তার মনে হল, প্রস্তাবটা গ্রহণ করলেই ভাল করত।

বাস চলে আধঘণ্টা পর পর। এদিকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপার চাইতে সে রুটের টার্মিনাস পর্যন্ত সামান্য দরত্বটুকু হেঁটে গিয়ে পরের বাসটাতে বসে পড়ল। দেখা যাক, কতক্ষণে বাসটা ছাড়ে।

আটটা নাগাদ ড্রাইভার একটা কাফে থেকে বেরিয়ে এল। একটা টেলিফোন করতে সেখানে গিয়েছিল। এসেই সে সঙ্গে সঙ্গে বাসটা ছেড়ে দিল। বাসটা যেন আগের তুলনায় একটু বেশি ঝাকুনি দিচ্ছে।

ড্রাইভার আন্ডুকে ভাল করেই চেনে। শুধু প্রতি টার্মের প্রথম সপ্তাহে অথবা বাসে ইন্সপেক্টর উঠলে তবেই সে আন্ডুর সিজন টিকিটটা একবার দেখতে চায়। কিন্তু আন্ডু বাসে ঢোকবার পরেই যে দটি যাত্রী উঠেছে তাদের টিকিট কাটতেও সে বাসের পিছন দিকে গেল না দেখে আন্ডু অবাক হয়ে গেল। যাত্রীদের দু'জনের মধ্যে মোটা স্ত্রীলোকটির সঙ্গে বড়দিনের কেনাকাটার বোঝা, আর যুবকটির পরনে কালো চামড়ার সুট, মাথায় হলুদ শিরস্ত্রাণ। যাই হোক, সেটা আন্ডুর কোন ব্যাপারই নয়।

বোঝা গেল, আজ ড্রাইভারের খুব তাড়া আছে। প্রতিটি বাধ্যতামূলক বাস স্টপে গাড়ির গতি মন্থর করলেও নিয়মমাফিক একেবারে থামাচ্ছে না। সে যেন ধরেই নিয়েছে, কোন যাত্রী যখন নামবার জন্য অপেক্ষা করে নেই তখন কেউই সে স্টপে নামছে না, তাতে আন্ডুরই ভাল। সেও চায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। কিন্তু এ অবস্থায় একটি যাত্রীকে লাফিয়ে বাসে উঠতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। আঠারো বছর বয়সের একটি যুবক; মাথায় পশমের টুপি, পরনে স্থানীয় ফুটবল ক্লাবের জার্সিতে একটা ছোট গোলাপের ছবি আটা। যুবকটি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। সে টিকিট চাইল না, ড্রাইভারও তার দিকে নজর দিল না। ধীরে ধীরে হেঁটে সে বাসের পিছন দিকে চলে গেল।

তাকে দেখে আন্তু কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। লোকটিকে পরিচিত মনে হচ্ছে, কিন্তু কোথায় পরিচয় হয়েছে প্রথমে সেটা বুঝতেই পারল না।

তারপরেই মনে পড়ে গেল। হঠাৎ তার শিরায় শিরায় রক্ত বুঝি জমাট বেঁধে গেল। আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সে ঘুরে বাসের পিছন দিকে তাকাল। তিনটি যাত্রী সামনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাশাপাশি বসে আছে, কেউ কিছুই বলছে না: স্ত্রীলোকটির হাতে বাজারের ঝাড়, যুবকটিকে ঘিরে যুঁইবনের গন্ধ, পুরুষটির মাথায় শিরস্ত্রাণ।

যে আয়নাটার মধ্যে যাত্রীদের দেখা যায় সেদিকে চোখ রেখে ড্রাইভার বলল, "বসে পড়। তোমার স্টপ এখনও আসেনি।"

কিন্তু আন্তু নড়তেই পারছে না। ভর্তি পরীক্ষার পর থেকে বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে বাসের সেই ছবিটা এবং এই ছবিটা দেখে তার ভয়ের কথা সে সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিল। সেই ভয়টা আবার ফিরে এসেছে — আগের চাইতেও তীব্রতর হয়ে, কারণ আগে তো ভয়ের কারণটা সে জানত না। আজ জেনেছে। এই বাসটিতেই দুর্ঘটনা ঘটবে।

এই পূর্বাভাস ছাড়াও কম বিপদের সম্ভাবনাটা সে হয়তো অনুমান করতে পারত। ড্রাইভার অত্যন্ত দ্রুত বাস চালাচ্ছিল, যে কোন মোড়ে পৌঁছে বাসটাকে যেন ঝড়ের বেগে ঘুরিয়ে নাচ্ছিল, ব্রেক না কষেই সামনের গাড়ির পিছনে পৌঁছে যাচ্ছিল। আন্তুর গলা শুকিয়ে আসছে, তবু সে নিজেকে সংযত করে রাখল। বাসের ছবিটাতে তার বয়সের কোন ছেলে ছিল না। আর সেখানে ছিল একটি বুড়ো মানুষ। যতক্ষণ না বুড়ো লোকটি এসে তার জায়গায় দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ কোন বিপদ ঘটতে পারে না। এখনও আসন্ন বিপদ থেকে পালাবার সময় আছে। এক পা এগিয়ে আন্তু বলল, "আমি এখানেই নেমে যাব।" সামনেই একটা অনুরোধের বাস স্টপ, কিন্তু ড্রাইভার এত জোরে বাসটা চালাচ্ছে যে সেখানে থামাতেই পারল না, আর সে চেষ্টাও করল না।

মুখে বলল, "যেখানে সাধারণত নেমে থাক সে স্টপটা কি দোষ করল? আমরা তো প্রায় সেখানে এসে পড়েছি।"

সামনেই একটা বড় চৌমাথা। সেখানে পৌঁছতেই ট্র্যাফিকের লাল আলো জ্বলে উঠল। কি যেন বিড়বিড় করে ড্রাইভার বাসটা থামিয়ে দিল। এই মোড়টা তাদের বাড়ি থেকে বাস স্টপের তুলনায় কাছে হলেও অত্যধিক ভিড়ের জন্য আন্তুকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে — সে যেন কখনও এখানে বাস থেকে না নামে। মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ থাকা সত্ত্বেও গুরুজনের কথা মেনে চলার অভ্যাসবশত সে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। কিন্তু তখনি সহসা তার মনে হল যে এই চৌমাথায়ই দুর্ঘটনাটা ঘটবে। এমনিতেই তো ড্রাইভারটিকে অস্বাভাবিক রকমের অধৈর্য মনে হচ্ছে, হলুদ আলো দেখা মাত্রই সে বাস ছেড়ে দেবে, আর অন্য রাস্তা ধরে আসতে

আসছে অন্য কোন গাড়ি হয়তো ভাববে যে লাল আলোটা থাকতে থাকতেই চৌমাথাটা পার হয়ে যেতে পারবে।

সামনে একটু ঝুঁকে আন্ডু ভাল করে দেখে নিতে চাইল বাঁ দিক থেকে কোন গাড়ি আসছে কি না। কিন্তু সেটা করবার আগেই তার চোখটা এক জায়গায় আটকে গেল। চৌমাথার ও পার থেকে একটি বুড়ো মানুষ বাসস্টপের দিকে ছুটে আসছে, বুড়োর স্কার্ফটা উড়ছে, নাকের উপর সোনালী ফ্রেমের চশমা, হাত নেড়ে বাসটাকে থামাতে বলছে। লোকটি মিঃ স্মিথ।

এই দুর্ঘটনার একমাত্র সাক্ষী আগাগোড়াই বলল যে বাসের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছেলেটি চিৎকার করে উঠেছিল, কিন্তু মুহূর্ত পরেই সে বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, আর ঠিক সেইক্ষণেই একটা ট্যাক্সি এসে তাকে চাপা দিল, কিন্তু কেন যে এরকমটা ঘটল তা কেউ বলতে পারল না। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আন্ডুর মৃত্যু ঘটেনি, সেই মুহূর্তে নিজের মাথার মধ্যে একটু গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দই সে শুনতে পারেনি। শুধু আবছাভাবে তার মনে পড়ে, ট্যাক্সি ড্রাইভার সভয়ে তার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল, আর বাস ড্রাইভারটি ওর দু হাতের ড্রাইভিং হুইলের উপরেই মারা গিয়েছিল। তারপরেই পিছনের সিট থেকে উঠে তিনটি যাত্রী সার বেঁধে নীরবে বাস থেকে বেরিয়ে এসে অর্ধচন্দ্রাকারে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। অন্য দিক থেকে ছুটে এসে মিঃ স্মিথ তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তার মুখটা চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।

তিনি বললেন, "এ বোর্ডে তোমার নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। আমি কথা দিলাম।"

আন্ডু কথাগুলি শুনল। দুই গালে দুটি চুম্বনের স্পর্শও অনুভব করল। তারপরই মিঃ স্মিথ তাকে তুলে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন।

অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত

চোখের আড়াল তো জীবনের আড়াল

Out of Sight, Out of Life — রোজ মেরি টিমপার্লি

ঘটনাটি কি? আসলে ব্যাপারটাই বা কি? ওটা কি বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে এমন একটি ছোট মেয়ের আকস্মিক যোগাযোগ যে বড় বড় গল্প ফাঁদার লোভ সামলাতে পারেনি— না কি অন্য কিছু—একটা ব্যাখ্যাতীত, রহস্যময় এবং বিচিত্র হতেও বিচিত্রতর কিছু?

কিন্তু সে যাই হোক, এখন আর তাতে কিছু যায় আসে না। এত বছর পরেও এখন আর আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। কেবল ব্যাপারটাকে ভুলতে পারি না। মাথার উপর অনবরত এরোপ্লেন উড়তে থাকলে ভুলতে পারিই বা কেমন করে? যতবার ঐ গর্জন কানে আসে ততবারই সে আতংকের কথা মনে পড়ে যায়, আর সারা শরীর ঘামে ভিজে ওঠে। মনের কানে সে গর্জন প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে তারপর থেমে যায়— আর তারপরই সেই সর্বধ্বংসী আঘাত ইট, পাথর ও কাচ ভেঙে পড়েছে, অনেক কণ্ঠের আর্তনাদ হচ্ছে, আর সে আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি শুধু আমি, মনের কোন রহস্যময় কানে।

অথচ পুরো ব্যাপারটাই আরম্ভ হয়েছিল কেমন একটা তুচ্ছ ও অর্থহীনভাবে, নেহাৎই একটা পেরাম্বুলেটারকে কেন্দ্র করে।

একদিন জেনি ও আমি দোকান থেকে ফিরছিলাম। হঠাৎ সে আমার হাতটা চেপে ধরে আঙুল বাড়িয়ে রাস্তার ওপারটা দেখাল।

"মামি, ওই প্রামটাকে দেখ।"

তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের প্রতিবেশী মিসেস বার্নেস বাচ্চাসহ তার পেরাম্বুলেটারটা ঠেলতে ঠেলতে বাজারের দিকেই যাচ্ছে।

বললাম, "দেখবার কি আছে? মিসেস বার্নেসের প্রামটা তুমি তো আগেও দেখেছ।"

"কিন্তু মিসেস বার্নেস সেটাকে ঠেলছেন না, এরকম অবস্থায় তো কখনও দেখিনি," জেনি বলল।

অপসৃয়মাণ মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে বললাম, "কি বলছ তুমি?" ঐ তো মিসেস বার্নেস, তার ঘোড়ার লেজের চুলের গুচ্ছ বাতাসে উড়ছে, ট্রাউজার পরা পা দুটি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

জেনি বলল, "দেখতে পাচ্ছ না? মিসেস বার্নেস তো নেই। প্রামটা আপনা থেকেই চলেছে।"

"বোকার মতো কথা বলো না জেনি।" মনের বিরক্তিটাকে কোনরকমে চেপে গেলাম। আসলে জেনির মন মেজাজ ভাল নেই। ও আমাদের একমাত্র সন্তান, পাড়ায় বন্ধুবান্ধবও নেই, ফলে ওর ছুটির দিনগুলো বড্ড একঘেয়ে লাগে। সকালে তাকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে যাই, কাফেতে নিয়ে আইসক্রিম খাওয়াই, হাতে সময় থাকলে পার্কে তার সঙ্গে খেলাধুলাও করি, কিন্তু সেটা তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। জেনি অত্যন্ত চাপা ও কল্পনাপ্রবণ। ওরকম শান্তশিষ্ট জীবন তার ভাল লাগে না। মাঝে মাঝেই ভ্রান্তিকর ও বিরক্তিকর কথাবার্তা বলে।

সেদিন সকালেই তার বাবার শার্টের ব্যাপার নিয়ে আমাকে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়েছে। "কাজে যাবার সময় বাপি কেন একটা সবুজ শার্ট পরে গেল?"

"সবুজ শার্ট তো পরেনি। যথারীতি সাদা শার্ট পরেই তো গেছে।"

"না তো, বাপি সবুজ শার্ট পরে গেছে।"

"তার সবুজ শার্টই নেই।"

"নিশ্চয আছে, না থাকলে পরল কেমন করে? কেন সে সবুজ শার্ট পরল?"

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই চলল। এখন আবার এই প্রাম নিয়ে পড়েছে।

বলল, "মোটেই বোকার মতো কথা বলছি না। প্রামটা আপনা থেকেই চলছিল। তা না হলে তোমাকে দেখতে বলব কেন?"

"আমাকে বোকা বানাবার জন্য, বাঁদর কোথাকার।"

"সত্যি বলছি মামি। কেউ ওটাকে ঠেলছিল না।"

"রোজকাব মতোই মিসেস বার্নেসই ওটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন।"

"মোটেই না। হয তো প্রামটাতে মোটর লাগানো আছে। তাহলেও স্টিযারিং কে ধবল? বাচ্চাটা? বুঝেছি—ওটা নিশ্চয কম্পিউটার-চালিত প্রাম। বাচ্চাটাকে দোকানে নিযে যাবার মতো নির্দেশ দিযে দাও, ব্যস, প্রামটা চালাতে শুরু করে দেয।"

তার এই বকবকানি চলতেই লাগল। শেয পর্যন্ত আমি বললাম: "খুব হযেছে জেনি, এবার একটু থাম। তুমি ভাল করেই জান যে মিসেস বার্নেস ওখানেই ছিলেন।"

সতর্ক চোখ তুলে জেনি আমার দিকে তাকাল। "তুমি নিজের কথাই বলে যাচ্ছ মামি, তাই না? যেহেতু সকালে আমি ভেবেছিলাম যে বাপির শার্টেব ব্যাপারে তুমি ধোঁকা দিয়েছিলে, তাই এখন তুমি ভাবছ যে আমি তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছি। ও. কে- -সন্ধি। আমি মেনে নিচ্ছি যে সকালে আমি তোমাকে ধোকা দিযেছিলাম। বাপি সবুজ শার্ট পরেনি। এবার তুমি তাহলে মেনে নিচ্ছ যে মিসেস বার্নেস প্রামের সঙ্গে ছিলেন না।"

"মিসেস বার্নেস অবশ্যই ছিলেন।"

জেনি তবু বলল, "প্রামটা আপনা থেকেই যাচ্ছিল। বেশ তো, আমি জানালায বসে থাকছি, ওটা যখন ফিরে যাবে তখন ভাল করে দেখব। এখানে এলেই তোমাকে ডাকব।" জেনি জানালার গোবরাটে উঠে বসল, আমিও লাঞ্চ তৈরি কবতে রান্নাঘবে চলে গেলাম। কাজের চাপে একসময জেনি ও তার স্বযংচালিত প্রামের কথা ভুলেই গেলাম।

বেলা একটায লাঞ্চ প্রস্তুত। জেনি তখনও গোবরাটে বসে আছে। ডেকে বললাম, "এস, খেযে নাও।"

কাছে এসে জেনি বলল, "এখনও তো ফিবল না!"

"কে ফিরল না?"

"প্রামটা। ওটা বোধ হয় পথ হাবিযে ফেলেছে?"

"তাহলে তো মিসেস বার্নেস ওটাকে খুঁজতে বেরিযেছেন।" আমাব গলায ঠাট্টার সুর।

"না তো।" জেনি বলল। "আমি তাদের দরজায়ও নজর রেখেছিলাম। তিনি বাড়ি থেকেই বের হননি। তাহলে লাঞ্চের সময়ও ওটা ফিরল না কেন তা তো বুঝতে পারছি না।"

"আমার তো মনে হয় তিনি বাচ্চাকে নিয়ে কোন বন্ধুর বাড়িতে লাঞ্চ খেতে গেছেন।"

"আমার কথা তুমি এখনও বিশ্বাস করছ না! না কি বিশ্বাস না করার ভান করছ? এটা কিন্তু খুব খারাপ। আমি তো শার্টের ব্যাপারটা মেনে নিয়েছি।"

"আচ্ছা, এটা নিয়ে তুমি একটা গল্প লেখ না কেন?—যে প্রাম নিজে নিজে চলে।"

"গল্প লিখব না কারণ এটা গল্প নয়! এটা সত্যি!"

সেদিন সন্ধ্যা। জেনি শুয়ে পড়েছে। আমার স্বামী হ্যারল্ড বলল: "জেনির সামনে কথাটা বলিনি, কিন্তু একটা খুব খারাপ খবর আছে। রাস্তার ওপারের সেই সুন্দরী তরুণী মিসেস বার্নেসকে তো তুমি চেন?"

"তা আর চিনি না! এই একদিনে তার কথা কতবার যে শুনলাম।"

"কি জান, আজ সকালে হাই স্ট্রীটে তিনি গাড়ি চাপা পড়েছেন। শুনলাম রাস্তাটা পার হয়ে সবে প্রামটাকে ওদিকের ফুটপাতে তুলবেন এমন সময় সেটা যেন কিসে আটকে যায়, আর ভদ্রমহিলা তখনও রাস্তায়ই দাঁড়িয়ে। একটা মোটর ছুটে আসছিল; ঠিক সময় গাড়িটা থামাতে পারেনি, আর বেচারি সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়—প্রায় মারা যাবার দাখিল। অ্যাম্বুলেন্স যখন এল তখন তিনি মৃত।"

আমার তো জমে যাবার অবস্থা। "তাহলে এই জন্যই তিনি দোকান থেকে ফিরে আসেননি। জেনি সারাক্ষণ পথের দিকে তাকিয়েছিল। ওঃ, কী ভয়ংকর ঘটনা! আর বাচ্চাটার কি হল?"

"সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। একটা আঁচড়ও লাগেনি। তুমি বললে না জেনি তার জন্য পথের দিকে তাকিয়েছিল? কেন বল তো?"

প্রামঘটিত জেনির কাহিনীটা তাকে বললাম; তারপর বললাম, "আমার মনে হয়, মৃত্যু-সংবাদটা ওকে জানানো দরকার। তুমি কি মনে কর ও খুব ভেঙে পড়বে?"

"ভবিষ্যতে মানুষকে নিয়ে বাজে ঠাট্টা না করার শিক্ষাটা হয় তো এর থেকে সে পাবে।" হ্যারল্ড বলল।

"এটা ঠিক হল না। ও কেমন করে জানবে? না, ওকে বলে কাজ নেই।"

পরদিনও তাকে খবরটা জানাতে দেরি করলাম। হয়তো এটা বোকামি, তবু তো লোকে নিজের সন্তানকে কঠোর বাস্তবের হাত থেকে দূরেই রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু কথাটা বেশিক্ষণ চেপে রাখা গেল না। দোকান থেকে ফিরবার পথে জেনি বলল, "কাল প্রামটা নিরাপদে ফিরেছে কি না কে জানে?" অগত্যা তাকে খবরটা বললাম।

"তোমার মনে আছে সোনা, কাল মিসেস বার্নেসকে বাজারে যেতে দেখেছিলাম? না—বাধা দিও না—ব্যাপারটা গুরুতর। হাই স্ট্রীটে তিনি একটা মোটর দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। বাচ্চাটা নিরাপদেই আছে, কিন্তু মিসেস বার্নেস মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন!"

"হ্যাঁ জেনি। খবরটা খুবই দুঃখের, কিন্তু সত্যি।"

"ঠিক কি ঘটেছিল?"

দুর্ঘটনার যে বিবরণ হ্যারল্ড আমাকে শুনিয়েছিল সেটাই বললাম। গভীর আগ্রহে জেনি সব শুনল। তারপর শান্ত গলায় বলল, "নিশ্চয় তিনি আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাই স্ট্রীটে ট্রামটার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিছুতেই তিনি ট্রামটা নিয়ে বের হননি।"

আমি আর কিছু বললাম না। প্রতিবেশিনীর মৃত্যু সংবাদে সে যে বড় একটা ভেঙে পড়ল না তাতেই আমি স্বস্তি বোধ করলাম। তারপর বেশ কিছুদিন জেনিও আর মিসেস বার্নেস বা ট্রামটার কথা উল্লেখই করল না।

কয়েক সপ্তাহ পরেই সে স্কুলে ফিরে গেল, আর টার্মের মাঝামাঝি সময়ে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসল। নেহাৎই ছেলেমানুষী দুষ্টুমি: একজন শিক্ষিকার মাকড়শাকে খুব ভয়, জেনি তার ডেস্কের মধ্যেই একটা মাকড়শা রেখে দিয়েছিল, আর তিনিও হেডকে রিপোর্ট করে দিলেন। লাঞ্চে বাড়িতে এসে জেনি বলল, "প্রধান শিক্ষিকা মিস পেট্রেল চারটের সময় আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। কাজেই বাড়ি ফিরতে আমার দেরি হবে মামি। জানি না কতক্ষণ তিনি আমাকে আটক রাখবেন। সাধারণত বিশ মিনিটের মতো হয়, তবে বেশিও হতে পারে।"

যাই হোক, বিকেলে স্কুল থেকে ফিরতে বেশি বিলম্ব হল না। বললাম, "মিস পেট্রেল তো তোমাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখেননি।"

জেনি বলে উঠল, "আঃ কী সৌভাগ্য! তিনি ছিলেনই না। চারটের সময় তার ঘরে গেলাম। পা কাঁপছে। দরজায় টোকা দিলাম। মনে হল তার গলা শুনলাম, 'ভিতরে এস', কিন্তু গলাটা তার হতেই পারে না, কারণ ঢুকে দেখলাম ঘরটা খালি। নিশ্চয় আমার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন। কী ভাগ্য বল?"

"তোমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল। তিনি হয়তো কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন।"

"না, তা তিনি করবেন না। কাউকে ধোলাই দেবার সুযোগ তিনি কখনও ছাড়েন না। ধোলাই দিতে খুব ভালবাসেন। আমারই ভাগ্য ভাল বলতে হবে।"

মিস পেট্রেলের ভাগ্যটা কিন্তু খারাপ। পরদিন স্কুলের সেক্রেটারি মিসেস লোনিং এর সঙ্গে দেখা হল। তাকে খুব উস্কোখুস্কো ও বিচলিত দেখাচ্ছিল। ব্যাপার কি জানতে চাইলাম।

মিসেস লোনিং বললেন, "ব্যাপার একটা আছে। খবরটা এখনও জানাজানি হয়নি। কিন্তু কাল রাতে মিস পেট্রেল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। যে মেয়েটি ঘরদোর পরিষ্কার করে, সে আজ সকালে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় বিছানায় দেখতে পায়। আসলে আমি ছাড়া আপনার মেয়ে জেনিই শেষ লোক যে তাকে জীবিত দেখেছে।"

"চারটের সময় জেনির তার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল, কিন্তু —"

"ঠিক কথা", মিসেস লেনিং বললেন, "কিন্তু সে ভয়েই পালিয়ে গেছে, তাই না? আমি তখন আপিসেই ছিলাম, আমার ঘরের দরজাটাও খোলা ছিল। আমি দেখেছি, সে মিস পেট্রেলের দরজায় টোকা দিল। হেড-এর গলাও শুনলাম, 'ভেতরে এস'; জেনি ভিতরে ঢুকল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে ছুটে চলে গেল! আমি মিস পেট্রেলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম; তিনি বললেন, জেনি তাঁর দিকে একবার তাকিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেছে। বেচারি মিস পেট্রেল—তিনি বললেন: 'আমি কি একটা ড্রাগন যে আমাকে দেখেই বাচ্চারা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যায়?' "

"ওঃ, তাহলে এই ব্যাপার", আমি বললাম।

মিসেস লেনিং বলতে লাগলেন: "তিনি বলেছিলেন খুব ক্লান্ত বোধ করছেন, আর জেনিকে আটকে রেখে বকাঝকা করতে হয়নি বলে তিনি স্বস্তিই পেয়েছেন। সত্যি, তাঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, কিন্তু তিনি যে অসুস্থ সেটা আমি বুঝতে পারিনি। কি জানেন, বকুনি দেবার জন্য ছেলেমেয়েদের নামে তাঁর কাছে রিপোর্ট করা হোক এটা তিনি পছন্দ করতেন না। ছোটখাট দুষ্টুমির ব্যাপারগুলো নিজেরা ফয়সালা না করে শিক্ষিকারা অনেক সময়ই তা নিয়ে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করেন। হায়রে, এই করেই তো আমরা তাঁকে হারালাম।"

তাঁর দুই চোখ জলে ভরে এল; কাঁপা গলায় শুধালেন, "জেনি কি তাহলে এ ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেছে?"

"বলেছে যে মিস পেট্রেল ঘরে ছিলেন না।"

মিসেস লেনিং মাথা নেড়ে বললেন, "দুষ্টু মেয়ে। হেডমিস্ট্রেস অবশ্যই ঘরে ছিলেন। খবরটা শুনে জেনি খুব আঘাত পাবে। সব মেয়েরাই দুঃখ পাবে। আজ বিকেলেই একটা বিশেষ সভায় সিনিয়র মিস্ট্রেস খবরটা ঘোষণা করবেন।"

সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে জেনির মুখে কেবল প্রধানা শিক্ষিকার আকস্মিক মৃত্যুর কথাই শোনা গেল। বলল, "তাহলে এই জন্যই তিনি কাল চারটে পর্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করেননি। নিশ্চয় অসুস্থ বোধ করার আগেই বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।"

"জেনি, লক্ষ্মীটি, দয়া করে মিথ্যা কথা বলো না। কি লাভ তাতে?"

"মিথ্যা? কোন্‌টা মিথ্যা?"

"মিস পেট্রেল তোমার জন্য ঘরেই অপেক্ষা করেছিলেন। আমি জানি।"

"মামি, তিনি ঘরে ছিলেন না। তোমার তো জানবার কথাও নয়। তুমি সেখানে ছিলে না।"

"আজ সকালে মিসেস লেনিং-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি আমাকে সব কথাই বলেছেন।"

"কি বলেছেন তিনি?"

"বলেছেন, তুমি মিস পেট্রেলের ঘরে ঢুকেছিলে, আর একবার তাঁর দিকে তাকিয়েই

পালিয়ে গিয়েছিলে। অবশ্য তোমাদের হেড তাতে স্বস্তিই পেয়েছিলেন। কাউকে ধোলাই দেওয়াটা তিনি মোটেই ভালবাসেন না।"

"মামি, আমি শপথ করে বলছি, আমি যখন সে ঘরে ঢুকলাম তখন ঘরটা একেবারেই ফাঁকা ছিল।"

"ওঃ, তোমাকে নিয়ে আমি যে কি করি?"

"আমি যা বলি সেটা বিশ্বাস করতে শুরু কর! মিসেস বার্নেসের বেলাতেও এই হয়েছিল। সেদিনও তুমি আমার কথা বিশ্বাস করোনি; কিন্তু আমি মিথ্যা বলিনি।"

আর তখনই সর্বপ্রথম বুঝতে পারলাম যে একটা অদ্ভুতুড়ে ব্যাপার চলছে। যে দু'জনকে অন্য সকলে দেখলেও জেনি দেখতে পায়নি, তারা দু'জনই কিছুক্ষণ পরেই মারা গেছে। হয়তো আমার মনের ভাবটা বুঝতে পেরেই জেনি ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকাল।

ফিস্ ফিস্ করে বলল, "ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত, তাই না?"

সত্যি অদ্ভুত। হ্যারল্ডকে একলা পেয়ে তার সঙ্গেও এ নিয়ে কথা বললাম। সে বলল, "এটা ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র। মিসেস বার্নেসের দুর্ঘটনা আর মিস্ পেট্রেলের হৃদরোগের সঙ্গে জেনির রূপকথার সত্যিকারের যোগসূত্র কি থাকতে পারে?"

এদিক থেকে দেখলে তো সত্যি মনে হয় যে আকস্মিকতার উইয়ের ঢিপি থেকে আমরা মানসিক পাহাড় গড়ে তুলছি। আর সেই সপ্তাহের শেষের দিকেই যদি আরও কিছু ঘটনা না ঘটত তাহলে হয় তো আমার সব আশংকাকেই অসম্ভব ভেবে উড়িয়ে দিতে পারতাম। ও'ব্রায়েন নামক একজন খুবই সাদামাঠা বেস্তওয়ালা আইরিশ গোয়ালাকে কেন্দ্র করেই ঘটনাটা ঘটল।

সাধারণ ব্যবস্থামতোই প্রতি শনিবার সকালে আমি তার টাকা পয়সা মিটিয়ে দেই এবং তাকে এক কাপ কফি খাওয়াই। সে সময়টা জেনি তার ঘরেই থাকে, সাপ্তাহিক বাড়ির কাজগুলো করে অথবা করার ভান করে। যত সময় পড়াশুনা করে ঠিক ততটা সময়ই স্বপ্ন দেখে কাটায়। জেনি কোনদিনই কঠোর পরিশ্রম করতে পারে না।

সেদিন সকালে ও'ব্রায়েন আমাকে বলল যে শীঘ্রই তার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে আর সেই উপলক্ষে সন্ধ্যায় সে একটা ভোজের আয়োজন করেছে। বলল, "এক ফোটা দুধও মিলছে ন; খুবই মুস্কিলে পড়েছি।"

সে চলে গেলে জেনি রান্নাঘরে ঢুকে বলল, "এখানে দুধ এল কেমন করে?"

"গোয়ালাই দিয়ে গেল।"

"কিন্তু সে তো এখানে আসেনি। এলে জানালা থেকে আমি তাকে দেখতে পেতাম।"

"তাহলে তোমার দৃষ্টি এড়িয়েই সে এসেছিল।"

"আমার চোখকে এড়াতে তো সে পারে না; যখনই সে এপথে আসে তখনই তার সাদা কোটটা সশব্দে পৎপৎ করে উড়তে থাকে।"

"তাহলে দুধটা কেমন করে এখানে এল বলে তোমার ধারণা? তুমি তো পড়া নিয়েই ব্যস্ত ছিলে।"

জেনি বলল, "আসলে আমি মোটেই পড়ায় ডুবে ছিলাম না। ইতিহাসের পড়ায় কখনও আমার মন বসে না। খুব বিরক্তিকর মনে হয়। যত সব মরা মানুষের কথা। সে সব শিখে কি লাভ? আমি তো বুঝি না। তারা তো সব শূন্যে মিলিয়ে গেছে। হতে পারে মিঃ ও'ব্রায়েন সামনের পথ দিয়ে না এসে বাড়ির পাশ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছে।"

আমি জানি ও'ব্রায়েন সেসব কিছুই করেনি, তবু এ নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করলাম না। জেনির সঙ্গে বাজে বক্‌বক্‌ করা ক্লান্তিকর।

পরদিন রবিবার। দুপুরের আগে দুধ এল না। যে যুবকটি দুধ নিয়ে এসেছিল সে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করে বলল: "দুধের ডিপোতে একেবারে নয়-ছয় ব্যাপার। কাল রাতে বেচারি বুড়ো ও'ব্রায়েন মদের দোকানে একটা ঘুষোঘুষিতে জড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে একটা ভোজসভা চলছিল।"

"মেয়ের বিয়ের পাকা কথা উপলক্ষে। সে আমাকে বলেছিল। কিন্তু হয়েছিল কি?"

"কে একজন ফোড়ন কেটেছিল যে ব্যাপারটা একটু তড়িঘড়ি সেরে ফেলা হচ্ছে, কারণ মেয়েটি নাকি বরফের মতো সাদা চরিত্রের নয়। তাতেই ও'ব্রায়েনের আইরিশ রক্ত টগবগিয়ে ওঠে; সে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু সে তখন আধা মাতাল, তাই সুবিধা করতে পারল না। অপর লোকটি একখানা ঘুষি ঝেড়ে দিল, আর সেও ছিটকে পড়ে মাথায় আঘাত পেল একটা টেবিলের কোণায় লেগে। ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। সে আর নেই।"

"তুমি বলছ—মিঃ ও'ব্রায়েন মারা গেছে?" ঘরটা যেন ঘুরতে লাগল। অনেক দূর থেকে যেন যুবকটির গলা ভেসে এল: "ভাল করে তাকান, শুনছেন—ওঃ, আমি খুবই দুঃখিত। এমন হুট করে কথাটা বলাই আমার উচিত হয়নি। এক মিনিট চুপ করে বসুন। এখন সুস্থ বোধ করছেন কি?" চোখের সামনে থেকে কুয়াশাটা কেটে গেল; আমার দেহটা অসার, ঘর্মাক্ত, ঠাণ্ডা।

"হ্যাঁ, এখন ভাল আছি। আমি দুঃখিত।"

জেনি ঘরে ঢুকল। "হেলো, মিঃ ও'ব্রায়েন কোথায়?"

নতুন লোকটি বলল, "সে কথা তোমার মাই বলবেন। আপাতত তার একটু যত্ন নাও। তার মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল।" লোকটি তাড়াতাড়ি কেটে পড়ল।

"কি হয়েছে মামি? তুমি কি অসুস্থ?"

"মদের দোকানে মারামারি করতে গিয়ে মিঃ ও'ব্রায়েন কাল রাতে মারা গেছে।"

জেনির মুখটা সাদা হয়ে গেল। "তাই তাকে আমি দেখতে পাইনি।"

"না সোনা। কাল সকালে সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। ঘটনাটা ঘটেছে সন্ধ্যায়।"

জেনি বলল, "কিন্তু সেই কারণেই আমি তাকে সকালে দেখতে পাইনি। মিস পেট্রেল ও মিসেস বার্নেসের বেলায়ও তাই ঘটেছিল। ও মামি, ব্যাপারটা তো ভারি অদ্ভুত।" ভয়ে তার গলা চড়তে লাগল। "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কেন এমনটা ঘটে?"

তাকে ভয় পেতে দেখে আমার ভয়টা আমি চেপে দিলাম। হেসে বললাম, "সবই তোমার কল্পনা মামণি—শুধুই কল্পনা—আমি বলছি, আসলে তার কিছুই ঘটে না।"

কিন্তু হ্যারল্ডের কাছে আমার সংস্কারাচ্ছন্ন আতংককে লুকোতে পারলাম না। সর্বশেষ ঘটনাটা তাকে বললাম। সে বিষণ্ন হাসি হেসে বলল, "আমাদের জেনি দেখছি সকলের মনোযোগের মধ্যমণি হতে চাইছে। সে চায়, সব আলো তার উপরে পড়ুক। সে বলতে চায়, তার উপরে কোন কিছুর ভর হয়। তার মনটাই আফিমের ফুল। এখন একমাত্র পথ, এ ধারণাটা তার মাথা থেকে হেসে উড়িয়ে দাও। খেয়াল রেখো, এই সব বড় বড় কথা নিয়ে সে যেন আমার কাছে না আসে।"

হ্যারল্ডের মা প্রায় পঙ্গু। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা তাঁকে দেখতে যাব এ-রকম কথা ছিল। যে বয়স্কা বান্ধবীটির সঙ্গে তিনি থাকেন, সেই খবর পাঠিয়েছে "আজ বৃদ্ধার অবস্থা খুব ভাল নয়।" জেনি ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "মামি, ধর আমি যদি তাঁকে দেখতে না পাই। তার যে কি অর্থ তা তো তুমি বোঝ।" তখনই মনে হল, হ্যারল্ডের কথাই ঠিক। জেনির মনে নাটক করার বাসনা জন্মেছে। সে চায় সব দৃশ্যেরই তারকা হতে। কিন্তু এ তো আগুন নিয়ে খেলা। ধরা যাক, তার ঠাকুমাকে দেখতে গেলে সে যদি বলে তিনি সেখানে নেই...

অবশ্য সেটা ঘটল না।

দেখাশুনার পাট ভালভাবেই চুকে গেল। বাড়ি ফিরবার পথে জেনি বলল, "ঠাকুমাকে নিয়ে কোনরকম দুশ্চিন্তা করো না বাপি। তার মরতে দেরি আছে।"

"তোমাকে কে বলেছে যে তিনি এখনই মরতে যাচ্ছেন?" হ্যারল্ড বলে উঠল। "মনে রেখো, আমরা সবাই তোমার মতামত শুনবার জন্য হাঁ করে বসে নেই।"

জেনি মুচ্‌কি হাসল। বাবার সঙ্গে তার ব্যবহার খুবই স্বাভাবিক ও শিশুসুলভ। তার যত অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ও মারাত্মক ফিস্‌ফিসানি সে আমার জন্য জমিয়ে রাখল।

আমার ভয় কিন্তু গেল না। একটা আসন্ন বিপদের আতংক যেন আমাকে পেয়ে বসল। হ্যারল্ডের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলে কোন লাভ নেই। সবকিছুই সে হেসে উড়িযে দেবে। তাই আমাদের বন্ধু যুবক জি. পি.-র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনটি ঘটনার কথাই তাকে বললাম। সব শুনে তিনি মুচকি হেসে বললেন:

"আপনার জেনি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে, কিন্তু এখন তার যা বয়স সেটাই একটা গোলকধাঁধা। যৌবন-সন্ধির ঠিক প্রাক্কালে এমন একটা সময় আসে যখন মেয়েদের মাথায় একধরনের পাগলামি দেখা দেয়। তারা তখন শৈশব ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে যায়। তখন তারা এই পৃথিবীর জীব হয়েও যেন পৃথিবীর কেউ নয়। যৌবনের

গদ্যময় বাস্তবতাই মানুষকে জীবনের মাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তার আগে পর্যন্ত তারা যেন আমাদের সঙ্গে থেকেও আমাদের কেউ নয়। এমনিতে সে বেশ সুস্থ তো ?"

"দৈহিক দিক থেকে তো সুস্থই।"

"তার এখন যা বয়স তাতে অস্বাভাবিক হওয়াটাই তো স্বাভাবিক, সে কথা মনে রাখলে বলা যায় সে মানসিক দিক থেকেও সুস্থ। হয়তো এই সব আসন্ন মৃত্যুর এক ধরনের অতীন্দ্রিয় চেতনা তার মধ্যে দেখা দেয়—সে কথা কে বলতে পারে ? আর তার ফলেই সে বলে যে সংশ্লিষ্ট লোকগুলিকে সে দেখতেই পায় না। এ নিয়ে খুব একটা হৈ চৈ করবার কিছু নেই। সহজভাবেই এগুলিকে মেনে নিন। তার এই সব কথাবার্তার সঙ্গে বেশি সুর মেলাবেন না, তাহলে ঐদিকে তার ঝোঁক আরও বেড়ে যেতে পারে, আর সেটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সত্যি বলছি, আমি এর মধ্যে খুব চিন্তিত হবার মতো কিছু দেখছি না। তারপর বলুন, এখন কেমন আছেন ? আপনাকে একটু বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ভাল ঘুম হচ্ছে তো ?"

"না। সত্যি না। এই ব্যাপারটা মনের উপর চেপে বসে আছে।"

"হুম। প্রাণুষার ক্ষণিক মুহূর্তগুলতেই অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে থাকে। কি বলেন ?"

"ঠিক কথা ডাক্তার, আপনার কথাই ঠিক।"

ঘুমের বড়ির একটা প্রেস্ক্রিপশন হাতে নিয়ে ডাক্তারের সার্জারি থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন নজরে পড়ল আমার কেস কার্ডে তিনি কি লিখলেন, অনুমান করলাম, "অতিচিন্তাগ্রস্ত মা : ঘুম হচ্ছে না এই রকম কিছু লিখলেন।

কয়েক সপ্তাহ আর বিশেষ কিছু ঘটল না। জেনির মাথায় তখন আসন্ন পরীক্ষার দুশ্চিন্তা। পরীক্ষার ব্যাপারে সে খুবই কাঁচা। এই সময়টাতেই অবহেলিত লেখাপড়ার চাপটা বড় বেশি করে তার মাথায় নামে, তাতে প্রশ্নপত্র পেয়ে হয়তো কিছু লিখতে পারবে না, এই আতংক তাকে পেয়ে বসে।

প্রথম পরীক্ষার দিন সে প্রাতরাশের জন্য নিচেই নামল না। বারকয়েক ডেকেও সাড়া পেলাম না। শেষ পর্যন্ত তার ঘরেই গেলাম। আতংকিত বিস্ফারিত চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে সে বিছানায় বসে আছে।

"লক্ষ্মীটি, এবার উঠে পড়, নইলে দেরি হয়ে যাবে।"

সে বলল, "আজ স্কুলে যাব না। এখানেই থাকব।"

"তোমার কি অসুখ করেছে ?"

"হ্যাঁ মামি। আমি ভয়ংকর অসুস্থ। এত অসুস্থ যে স্কুলে যেতেই পারব না।"

"তাহলে তো ডাক্তারকে খবর দিতে হয়—"

"না। তিনি তো এসে বলবেন, আমার কিছুই হয়নি।"

"সত্যি কি কিছু হয়েছে ? দেখ জেন, তোমাকে স্কুলে যেতেই হবে। না যাওয়াটা তো ভীরুতা ! পরীক্ষা তোমাকে দিতেই হবে। ওঠ, ওঠ লক্ষ্মী সোনা। আরে, পরীক্ষা

তো তুমি আগেও দিয়েছ। এ পরীক্ষাটা যদি খারাপই হয়, তাতে পৃথিবী রসাতলে যাবে না। আর শুধু যে তোমার পরীক্ষাই খারাপ হবে তাও তো নয়।"

"পরীক্ষার কথা নয় মামি! পরীক্ষা নিয়ে আমার থোরাই মাথাব্যথা। এটা হল—এটা—ওঃ, মামি, আমি মরতে চাই না।"

"মরবে? তুমি কেন মরতে যাবে? এসব আজে-বাজে কী বলছ?"

"আমি বাড়িতেই নিরাপদে থাকতে চাই—আমাকে থাকতেই হবে—থাকবই—বাইরে গেলেই আমার ভয়ংকর বিপদ—"

"কিসের বিপদ?"

"যেকোন বিপদ হতে পারে—একটা গাড়ি আমাকে চাপা দিতে পারে—আগুন ধরে যেতে পারে—কেউ আক্রমণ করতে পারে—বোমা ফাটতে পারে—যাহোক একটা কিছু ঘটবেই!"

"কাল রাতে কি কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছ?"

"হ্যাঁ, দেখেছি—ভয়ংকর সব স্বপ্ন—কিন্তু স্বপ্নের কথা হচ্ছে না—খারাপ স্বপ্ন তো প্রায়ই দেখি। ওঃ মামি, আমাকে বাইরে যেতে বলো না।" সে কাঁদতে লাগল।

তাকে আদর করলাম, সান্ত্বনা দিলাম। ব্যাপার যাই হোক, এ অবস্থায় তাকে কিছুতেই স্কুলে পাঠাতে পারি না। কিন্তু তার কিসের ভয় সেটা তো আমাকে জানতে হবে। তাই বললাম, "কেন তুমি এত ভয় পাচ্ছ সেটা বললে তোমাকে বাড়িতেই থাকতে দেব। নিশ্চয় পরীক্ষার ব্যাপারে—"

"পরীক্ষা তো তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু আসল কথা বললে তো তুমি বিশ্বাসই করবে না।"

"বলেই দেখ।"

"ঠিক আছে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আয়নায় মুখ দেখলাম।"

তার ছোট্ট মুখখানির দিকে তাকালাম। অশ্রুসিক্ত, বিপর্যস্ত, ফ্যাকাসে মুখ। অস্ফুট গলায় বললাম, "সকালে উঠেই কি সকলের মুখ সৌন্দর্যে ভরে ওঠে?"

আমার ঠাট্টায় সে কান দিল না। "আমার ড্রেসিং টেবিল থেকে আয়নাটা নিয়ে এস।" আয়নাটা এনে তার হাতে দিলাম। "এবার আমার পিছনে এসে দাঁড়াও," তাই করলাম। সে আয়নাটা সামনে মেলে ধরল; ফলে তার মুখ এবং পিছন থেকে আমার মুখও আয়নায় দেখা গেল।

ঠাট্টা করে বললাম, "আহা, কি সুদর্শনা যুগল!"

"যুগল? তুমি কি দেখছ?"

"তোমাকে ও আমাকে।"

সে আয়নাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, "আমি দেখছি শুধু তোমাকে। নিজেকে পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। এর কি অর্থ তা তো তুমি জান!"

বাচ্চাদের সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)। কথাটা হঠাৎই মনে এল। বইতে

পড়েছি, বেতারেও শুনেছি। এখন ঘরের মধ্যেই দেখছি। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মেয়ে সত্য কথাই বলছে।

খুশির ভাব দেখিয়ে বললাম, "আর, তোমার তো ভাগ্য ভাল, কি বল? পরীক্ষার সময় অসুখ করায় তোমার তো ভালই হল। অন্যরা যখন পরীক্ষা দিয়ে মরবে, তুমি তো তখন আরাম করে বিছানায় শুয়ে কাটাবে। শুয়ে পড় সোনা। চাদরটা ভাল করে গুঁজে দিচ্ছি, নিরাপদে আরাম কর। কোন কিছু নিয়ে দুর্ভাবনা করো না।"

"ওঃ, ধন্যবাদ ম্যাম!" জেনি শুয়ে পড়ল, তার গাল বেয়ে তখনও চোখের জল ঝরছে।

নিচে নেমে হ্যারল্ডকে বললাম, কফিতে চুমুক দিতে গিয়েও সে থমকে গেল। "আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না? তোমাকে আচ্ছা ধোঁকা দিয়েছে তো!"

বললাম, "ও ঠিক কথাই বলেছে। ভয়ে একেবারে আধমরা হয়ে গেছে। আয়নায় তাকিয়ে নিজের মুখটা দেখতে পাচ্ছে না। হয় তো ভ্রান্তদর্শনের দৃষ্টান্ত কিন্তু ভাব তো অবস্থাটা কী ভয়াবহ।"

"ও তো সব কিছুই কল্পনা করছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, পরীক্ষার দিন যা ঘটেছে, স্কুলের উৎসবের দিন সেটা ঘটত না। বুঝলে!"

"আমি ওকে বিশ্বাস করি। ডাক্তারকে রিং করতে যাচ্ছি।"

"এ ব্যাপারে আমাকে ডাকাডাকি করো না," বলে হ্যারল্ড কাজে বেরিয়ে গেল। তাকে আমি ভালবাসি, আবার অনেক সময় ঘৃণাও করি।

ডাক্তার এলেন। জেনি কেঁপে কেঁপে উঠে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে সব কথা বলল। ডাক্তার মন দিয়ে শুনলেন, মাঝে মাঝে "হুঁ" ও "হ্যাঁ" বললেন, তারপর আমার দিকে মুখ ফেরালেন।

"বাকি দিনটা ওকে বিছানায় শুইয়ে রাখুন। আশা করি কাল অনেকটা ভাল বোধ করবে।" দু'জনে বাইরে এলে তিনি একটা প্রেস্ক্রিপশন লিখলেন। বললেন, "একটা মৃদু ঘুমের বড়ি। পরীক্ষার সময় যেসব ছেলেমেয়ের স্নায়ু বিপর্যস্ত হয় তাদের অনেককে এটা খাইয়ে ভাল ফল পেয়েছি। কোন ওষুধের দোকান থেকে এখনই ওষুধটা নিয়ে আসুন, লাঞ্চে একটা দিন, তারপর চায়ের সঙ্গে একটা, শোবার সময় একটা, কাল ব্রেকফাস্টের সময় একটা, দেখবেন অনেক শান্ত মনে ও পরীক্ষায় বসতে পারবে।"

"তাহলে আপনার ধারণা এটা স্নায়বিক গোলমাল ছাড়া আর কিছু নয়।"

"মনে তো তাই। মেয়ে এত বেশি পরিশ্রম করেছে যে হিস্টিরিয়া বাধিয়ে বসেছে। সন্ধ্যার দিকেই অনেকটা ভাল হয়ে যাবে। ভয় পাবেন না। তবে লক্ষ্য রাখবেন, বড়িগুলো যেন ঠিকমতো খায়। কাল যদি অবস্থার উন্নতি না হয় তো আমাকে রিং করবেন। কিন্তু আমার ধারণা, ভাল হয়ে যাবে।"

ডাক্তার চলে গেলেন। আমি উপরে উঠে জেনিকে বললাম, "ওষুধের দোকানে যাচ্ছি। আধ ঘণ্টা সময় একলা থাকতে পারবে তো সোনা?"

"খুব পারব মামি। বিছানায় তো আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ, তাই না?"

জেনি দুই হাত বাড়িয়ে দিল। হাত দু'খানা সরু মনে হল। গাঢ় আলিঙ্গনে আমাকে জড়িয়ে ধরল। এখনও সেটা স্পষ্ট মনে পড়ছে। সেই উৎকণ্ঠিত আবেগভরা আলিঙ্গন আমাদের সাধারণ আদর ও চুম্বনের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। ওষুধ আনতে বেরিয়ে গেলাম। যাতে বেশিক্ষণ মেয়েকে একলা থাকতে না হয় তাই প্রায় ছুটতে ছুটতে গেলাম।

ফিরবার সময় নিজের চিন্তায় এতই ডুবে ছিলাম যে প্রথমে খেয়ালই করিনি মাথার উপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে। একটু পরেই তার প্রচণ্ড শব্দ কানে এল। চোখ তুলে দেখলাম, এরোপ্লেনটা খুব নিচু দিয়ে যাচ্ছে —এ অঞ্চলটার পক্ষে একটু বেশি নিচু দিয়েই যাচ্ছে, কারণ এখানে অনেক নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। ইঞ্জিনটা একবার বন্ধ হচ্ছে, আবার চলছে, আবার বন্ধ হচ্ছে, আবার চলছে; ফলে ভয়ংকর শব্দটাও কখনও বাড়ছে কখনও কমছে।

হঠাৎ ইঞ্জিনটা সম্পূর্ণ থেমে গেল। অসহ্য নীরবতা। তারপরই ইঞ্জিনটা সোজা নেমে এসে যে রাস্তাটা ধরে আমি হাঁটছিলাম তার উপরকার বাড়িগুলোর পিছন দিকে প্রচণ্ড শব্দ করে ভেঙে পড়ল বাড়িগুলোর পিছন দিকে ঐ বাড়িগুলোর পিছন দিকেই তো আমাদের রাস্তা আমাদের বাড়ি। আর ঠিক তখনই একটা আর্তনাদ শুনতে পেলাম।

ছুটতে লাগলাম। এত দ্রুত জীবনে কখনও ছুটিনি। যখন আমাদের বাড়িতে পৌঁছলাম তখন সেটা একটা ধ্বংসস্তূপমাত্র। আগুনের শিখা লক্‌লক্ করছে, ভাঙা এরোপ্লেনটা ইট, চুন সুরকি ও কাঁচের সঙ্গে মিলে মিশে পড়ে আছে আর বিমানচালকের রক্ত মাংস হাড় আর আছে একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে। মেয়ে। আমার মেয়ে জেনি।

এই হল ঘটনা। অনেককাল আগের ঘটনা। এ রহস্যের কোন সমাধান আমি খুঁজে পাইনি। এখন আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন কেন এরোপ্লেনের শব্দ শুনলে আমি এত ভয় পাই, আর সে শব্দ যত বাড়তে থাকে ততই একটা অপার্থিব আর্তনাদ কেন আমার কানে আসে যা আমি ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় না।

অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত

মৃত্যুর মুহূর্তে

In at the Death   ডোনাল্ড ই. ওয়েস্টলেক

নিজেই ভূত হয়ে গেলে তখন আর ভূতে বিশ্বাস করাটা শক্ত ব্যাপার নয়। একটা হঠকারী মুহূর্তে আমি ফাঁসতে ঝুলেছিলাম, আর কাণ্ডটা ভালভাবে শুরু করার আগেই মনস্তাপও হয়েছিল। চেয়ারটাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া মাত্রই আবার সেটাকে পায়ের নিচে ফিরে পেতে চাইলাম, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ততক্ষণে কাজ শুরু করে দিয়েছে, চেয়ারটা মেঝেতে যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে রইল, আর আমার তেরো স্টোন এগারো ইন্দরের দেহটা ক্রমেই নিচে নামতে লাগল, গলার দড়িটা ক্রমেই এঁটে বসতে লাগল।

গলার মাঝখানটায় ভীষণ ব্যথা করতে লাগল, কিন্তু আমার গাল দুটো এমনভাবে ফুলে উঠল যে সেটাই তাজ্জব ব্যাপার বলে মনে হল। গালের দুটো উঁচু ঢিবির উপর দিয়ে ভাল করে তাকাতেও পারছি না, যদিও তখন আমি প্রাণপণে দরজার দিকে তাকাতে চাইছিলাম যদি তখন কেউ এসে আমাকে উদ্ধার করে এই আশায়। কিন্তু আমি ভাল করেই জানি যে বাড়িতে আর কেউ নেই, আর থাকলেও দরজাটা তো ভিতর থেকে ভাল করে বন্ধ করেই দিয়েছি। পা দুটো ছেতরে ফেলে আমি অনবরত ঘুরছি, ফলে কখনও দরজার দিকে কখনও জানালাটার দিকে মুখটা ঘুরে যাচ্ছে, কাঁপা হাতে দড়িটা ধরে যতই টানাটানি করছি ততই সেটা আরও শক্ত হয়ে মাংসের মধ্যে বসে যাচ্ছে।

আমার নামটি হচ্ছে ছিল এডোয়ার্ড থর্নবার্ন, সময় ১৮৩৮ – ১৮৭৭। চল্লিশতম জন্মদিনের ঠিক একমাস আগে আমি আত্মহত্যা করি। আমি জানি, সেজন্য দায়ী আমার পুরুষত্বহীনতা। আমি যদি সন্তানের পিতা হতে পারতাম তাহলে আমাদের বিবাহবন্ধন শক্ত থাকত, তাহলে এমা আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হত না, আর আমিও ক্ষণিকের দুর্বলতায় নিজের জীবন নষ্ট করতাম না।

ঘটনাস্থল কনেক্টিকাট এর বার্নস্টেপল্ এ আমাদের বাড়ির অতিথি কক্ষ, সময় সন্ধ্যা সাতটার ঠিক পরে, বৎসরের এই সময়টাতে তখন গাঢ় গোধূলি নেমে আসে। অফিস থেকে ফিরেছি ছ'টার একটু আগে। আমি কাপড়ের দালালি করি, কাজটা কনেক্টিকাট শহরে বেশ লাভজনক, যদিও ইদানীং আমার আয় উপার্জন বেশ কমে এসেছিল। বাড়ি ফিরেই দেখলাম রান্নাঘরের টেবিলে একটুকরো চিঠি: "গ্রেগের সঙ্গে

প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ দেখতে যাচ্ছি। তোমার রাতের খাবার ব্যবস্থাটা তোমাকেই করে নিতে হবে। দুঃখিত। ভালবাসা, এর্মিলি।”

এই গ্রেগ লোকটা এর্মিলির প্রেমিক। নিউইয়র্ক যাবার বড় রাস্তার উপর তার একটা পুরাবস্তুর দোকান আছে, অল্প মাইনের সহকারিণী হিসাবে এর্মিলি দিনের বেশির ভাগ সময়টা সেখানেই কাটায়। মধ্য সপ্তাহের দীর্ঘ অপরাহ্ণগুলিতে যখন দোকানে কোন ভ্রমণকারী থাকে না, কোন পুরাবস্তুসংগ্রহকারী থাকে না, তখন তারা দু'জন একত্রে দোকানের পিছনে গিয়ে কি করে তাও আমি জানি। তিন বছরের অধিক কাল ধরে ব্যাপারটা আমার জানা থাকলেও তা নিয়ে কি যে করব ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। আসলে ব্যাপার হল, দোষটা তো আমারই, তাই পাছে এই কুৎসিত ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ে সেই ভয়েই আমি কিছু বলতেও পারিনি।

তাই মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও আমি চুপ করেই ছিলাম। অসন্তোষ, দুঃখ, প্রতিবাদ সবই মনের মধ্যেই চেপে রেখেছিলাম।

আগেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছি। প্রথমে মোটরগাড়ি নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসা কোন ট্রাকের দিকে এগিয়ে গিয়েছি। কিন্তু চতুর্দিকের হর্নের শব্দে শেষ মুহূর্তে নিজের গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছি), কখনও বা একটা পাহাড়ের উপর থেকে কনেক্টিকাট নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেছি (একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে ব্রেকটা টেনেছি এবং আধ ঘণ্টা ধরে ঘর্মাক্ত দেহে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে তবে সুস্থ হয়ে উঠেছি), শেষ পর্যন্ত এ অঞ্চলের যে কোন একটা লেভেল ক্রসিং এ গাড়িটাকে আড়াআড়িভাবে দাড় করিয়ে রেখেছি, কিন্তু বিশ মিনিটের মধ্যেও কোন ট্রেন না আসায় মনের বেপরোয়া ভাবটা কেটে গেছে, আর আমিও গাড়ি নিয়ে ফিরে এসেছি।

পরে কব্জিটা কেটে ফেলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোন ধারালো যন্ত্র নিজের শরীরে ঢাকিয়ে উঠতে পারিনি। অসম্ভব। পরের কোন সুযোগের জন্য অপেক্ষা করেছি।

শেষ পর্যন্ত দড়ির সাহায্য নিলাম, আর তাতেই সফল হলাম। সম্পূর্ণ সফল হলাম। পুরোপুরি সফল। পা দুটো হাওয়ায় ছুড়তে লাগলাম, আঙুল দিয়ে নিজের গলাই চেপে ধরলাম, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এল, জিভটা শুকিয়ে উঠল, সারা দেহটা লেভিরি মাথায় লাটিমের মতো ঘুরতে লাগল, তীব্র, তীক্ষ্ণ, অসহ্য যন্ত্রণা।

ক্রমে পা দুটো দুর্বল হয়ে এল, হাত দুটো ঝুলে পড়ল, আঙুলগুলো বৃথাই ট্রাউজারের পা আকড়ে ধরতে চেষ্টা করল, ফাঁসির দড়ি থেকে মাথাটা কাত হয়ে ঝুলতে লাগল।

দেখতে পেলাম, আমার বিস্ফারিত চোখ দুটি দ্যুতিহীন, সাদা হয়ে উঠেছে, চোখের কোণে এক ফোঁটা জল নেই, পাথরের মতো শুকনো। তবু নিজের চোখ দুটোকে দেখতে পাচ্ছি, আরও ভাল করে তাকিয়ে গোটা শরীরটাই দেখতে পেলাম ঝুলছে, ঘুরছে, কিন্তু এখন আর তাতে কোনরকম খিঁচুনিই নেই। সভয়ে বুঝতে পারলাম যে আমি মরে গেছি।

কিন্তু আছি। মরে গেছি, তবু আছি, গলায় এখনও ফাঁসের ব্যথা, মাথার মধ্যে কেমন একটা ঠেলে ওঠা চাপ। আছি, কিন্তু সেই মাটির শরীরে নেই, নেই সেই

ঝুলন্ত মাংসপিণ্ডের মধ্যে; অদৃশ্য আলোর মতো ছড়িয়ে আছি সারা ঘরে, নিরালম্ব হয়ে ফিরছি সর্বত্র। এবার কি হবে? ভয়, বিস্ময় ও ব্যথা একসঙ্গে আমাকে ভর করল; ঝুলন্ত কুয়াশার মতো পরবর্তী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু কিছুই ঘটল না। অপেক্ষা করেই আছি: শরীরটা একেবারেই স্থির হয়ে গেছে; দেওয়ালের দুটো ছায়া এতটুকু নড়ছে না; বিছানার পাশের বাতিগুলো জ্বলছে, দরজা বন্ধ; জানালার পর্দা নামানো; কিছুই ঘটল না।

এবার? চিৎকার করে প্রশ্ন করতে চাইলাম, পারলাম না। গলাটা ব্যথা করে উঠল, কিন্তু আমার তো তখন কোন গলা ছিল না। মুখটা যেন জ্বলে গেল, কিন্তু আমার তো মুখও নেই। শরীরের প্রতিটি চেষ্টা ও উদ্যম মনের উপর ছাপ এঁকে দিচ্ছে, কিন্তু আমার তো শরীর নেই, মস্তিষ্ক নেই, আত্মা নেই, কিছুই নেই। কথা বলার মতো ক্ষমতা নেই, নড়াচড়ার শক্তি নেই, এই ঘর ছেড়ে, এই ঝুলন্ত শবদেহ থেকে দূরে যাবার ক্ষমতাও নেই। আমি পারি শুধু এখানে অপেক্ষা করতে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে অপেক্ষা করে থাকতে।

বিছানার মুখোমুখি ড্রেসিং টেবিলে একটা সংখ্যা বসানো ঘড়ি ছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই দেখলাম ৭-২১—সম্ভবত পা দিয়ে চেয়ারটা ঠেলে দেবার পরে বিশ মিনিট পার হয়ে গেছে, আর আমি মরে যাবার পরে পনেরো মিনিট কেটে গেছে। এখনও কি কিছু ঘটবে না? কোন পরিবর্তন দেখা দেবে না?

ঘড়িতে যখন ৯-১১ তখন বাড়ির পিছনে এর্মিলির ভক্সওয়াগেন-এর শব্দ শুনতে পেলাম। আমি কোন চিরকুট লিখে রাখিনি; লিখবার তো কিছু ছিল না; আমার মৃতদেহটাই তো সবকিছু বলবে। কিন্তু এমিলি যখন আমাকে দেখবে তখনও আমি যে এখানেই থাকব এটা ভাবতে পারিনি। এখন অনুশোচনা হলেও আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। আমি জানি আমি ঠিক কাজই করেছি, কিন্তু এর্মিলি যখন দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকবে তখন তার মুখটা দেখতে আমি চাইনি। সে আমার প্রতি অন্যায় করেছে, সেই তো সব কিছুর কারণ, সেও আমার মতোই সেকথাটা বুঝুক, কিন্তু তার মুখ দেখতে আমি চাইনি। চাইনি।

ব্যথাটা আবার বাড়ল; যা ছিল আমার গলায়, আমার মাথায়, সেখানে ব্যথা। অনেক দূরে একতলায় দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। মতো ঘরের মধ্যেই আমি কেঁপে উঠলাম। কিন্তু ঘর ছেড়ে গেলাম না, যেতে পারলাম না।

"এড? এড? আমি ডাকছি মিষ্টি!"

আমি জানি তুমি ডাকছ। এখনই আমাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে, এখানে থাকতে আমি পারি না। ঈশ্বর কি আছে? এই ভ্রাম্যমাণ উপস্থিতিই কি আমার আত্মা? এর চাইতে নরকও ভাল; আমাকে নরকে নিয়ে যাও, যেখানে খুশি নিয়ে যাও, শুধু এখানে ফেলে যেয়ো না।

ডাকতে ডাকতে এর্মিলি উপরে উঠে এল; অতিথি-কক্ষের বন্ধ দরজার পাশ দিয়ে চলে গেল। আমাদের শোবার ঘরে ঢুকল, আমার নাম ধরে ডাকল; কণ্ঠস্বরে

যেন একটা ভযেব আভাস। সে আবাব চলে গেল হল পেবিযে নিচে নেমে গেল। সব চুপচাপ।

সে কি কবছে? হয তো আমাব কোন চিবকুট, কোন সংবাদেব খোঁজ কবছে। জানালা দিযে তাকাল, আমাব শেভ্রলেট গাডিটা দেখে বুঝল আমি বাড়িতেই আছি। এ-ঘব থেকে ও ঘবে গেল। বাডিটা খুব পুবনো। প্রায় দুশো বছব আগেকাব। দ্বিতীয মহাযুদ্ধেব সময আগেকাব মালিক কিছু অদলবদল কবেছিলেন। আমি কিনেছি বাবো বছব আগে, সেকেলে আসবাবপত্র ও পুবাবস্তু দিয়ে বাডিটাকে সাজিযেছে এর্মিলি ও গ্রেগ। নডবডে আসবাব, ঔপনিবেশিক যুগেব জিনিসপত্র, পাইন কাঠেব হলুদে পুবনো টেবিল। বাডটা কিনেছি আমি, কিন্তু কোনদিন বাডিটাকে ভালবাসতে পাবিনি। কিনেছি এর্মিলিব জন্য, তাব জন্যই সব কবেছি, কাবণ আমি জানি এর্মিলি যা চায সেই জিনিসটি কোনদিন তাকে দিতে পাবব না। দিতে পাবব না একটি সন্তান।

অবশ্য এ নিযে এর্মিলি কখনও গোলমাল কবেনি। এর্মিলি খুব ভাল। কখনও আমি তাকে দোষ দেইনি, নিজেব পবিবর্তে তাকে কখনও দোষী কবিনি। বিযেব প্রথম দিকে সে সাগ্রহে দু' একবাব কথাটা তুলেছে, কিন্তু আমাব প্রতিক্রিযা লক্ষ্য কবে দীর্ঘকাল আব কিছুই বলেনি। কিন্তু আমি জানতে পেবেছি।

যে কডি কাঠ থেকে আমি ঝুলেছি, সেটা পুবনো বাডিবই একটা অংশ এগাবো বর্গ ইঞ্চি হাতে চেবা একখণ্ড পুবনো কাঠ। কডি কাঠটা বেশ শক্ত। আমি চিবকাল ঝুলে থাকলেও ওটাব কিছু হবে না। সকলেব চোখে পডবাব পবে তাবা যখন আমাকে নামিযে নেবে তখনও ওটা আমাব ভাব সইতে পাববে।

ঘডিতে ৯ ২৩। এর্মিলি আবাব উপবে উঠে এসেছে। কাঠেব সিডিতে তাব পাযেব শব্দ দ্রুততব হল। ডাকল, "এড?"

দবজাব হাতলটা ঘোবাল।

দবজা তালাবন্ধ। চাবিটা ভিতবে। দবজা ভাঙতে হবে। সেজন্য অন্য কাউকে ডাকতে হবে। এর্মিলি একা পাববে না।

"এড? তুমি কি ভিতবে আছ?" এর্মিলি দবজায ধাক্কা দিল, হাতলটা খট্ খট্ কবল, বাবকযেক আমাব নাম ধবে ডাকল, তাবপব হঠাৎই নিচে নেমে গেল, তাব অস্পষ্ট কণ্ঠস্বব শুনতে পেলাম। টেলিফোনে কাকে ডাকছে।

মনে হল গ্রেগকে। গল্পেব ব্যাপাবটা আবাব বাডল। মন বলছে, এবাব শেষ হবে। আমি চাই, আমাকে বাইবে নিযে যাওযা হোক, জীবন্ত আত্মা ও মৃতদেহটাকে বাইবে নিয়ে যাওযা হোক। সব শেষ হয়ে যাক।

[illegible] এর্মিলি অপেক্ষা কবছে গ্রেগেব জন্য, আব উপবে আমি অপেক্ষা কবছি [illegible] জন্য। হযতো সে বুঝতে পেবেছে উপবে এসে কি দেখতে পাবে,

[illegible] তাতে আমাব কোন আপত্তি নেই, আমাব আপত্তি এর্মিলিব

ঘড়িতে যখন ৯-৪৪ তখন বাড়ির পাশের পাথরের নুড়ির উপর গাড়ির চাকার শব্দ শুনতে পেলাম। গ্রেগ বাড়িতে ঢুকল, নিচে তাদের কথাবার্তা শুনলাম ; গাঢ় কণ্ঠস্বর, ধীর স্থির আশ্বাসপূর্ণ, আর হাল্কা নারী-কণ্ঠস্বব দ্রুত ও ভয়ার্ত! দু'জনে একসঙ্গে উঠে এল। কারও মুখে কথা নেই। দরজার হাতলটা ঘুরল, খট্‌খট্‌ শব্দ হল, গ্রেগের গলা শোনা গেল, "এড ?"

ক্ষণেক নীরবতার পরে এমিলি বলল, "না। না। সে কিছুতেই একাজ করতে পারে না।"

"একাজ ?" গ্রেগের গলায় সচকিত সন্দেহ। "তুমি কি বলতে চাইছ ? একাজ মানে ?"

"ইদানীং সে এত মন-মরা হয়ে থাকত—এড ?" দরজা ধরে নাড়া দিল।

"ওরকম করো না এমিলি। ব্যাপারটাকে সহজভাবে নাও।"

এমিলি বলল, "তোমাকে ডাকা আমার ঠিক হয়নি। এড ? দোহাই তোমার!"

"কেন ঠিক হয়নি ? ঈশ্বরের দোহাই, বল এমিলি—"

"এড, দয়া করে বেরিয়ে এস। এভাবে আমাকে ভয় পাইয়ে দিও না।"

"কেন আমাকে ডাকা তোমার ঠিক হয়নি এমিলি ?"

"এড তো বোকা নয় গ্রেগ। সে তো—"

আবার নীরবতা। ওরা ভাবছে, আমি ভিতবে এখনও বেঁচে আছি। ওরা চায় না আমি শুনে ফেলি। এমিলি বলছে, "সে তো জানে গ্রেগ, আমাদের সব কথা জানে।"

একটু পরে গ্রেগ বলল, "এটা কিরকম ইয়ার্কি হচ্ছে এড ? বেরিয়ে এস। খোলাখুলি সব কথা হোক।" আবার দরজায় খট্‌খট্‌ শব্দ। "আমাদের ঢুকতেই হবে। আর একটা চাবি আছে কি ?"

"আমার মনে হয় এ বাড়ির সবগুলি তালাই এক। এক মিনিট অপেক্ষা কর।"

সত্যি তাই। যেকোন চাবিতেই এ বাড়ির ভিতরের দরজাগুলো খোলা যায়। কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বুঝলাম, এমিলি আর একটা চাবি আনতে গেছে, এখনই তারা ফিরে আসবে। এমিলি ঘরে ঢুকবে ভেবে আমি এত ভয় পেয়ে গেলাম যে বিকৃত আয়নার প্রতিবিম্বের মতো ঘরের মধ্যেই আমি যেন ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠলাম। আহা, আমি যদি কোনরকমে দেখতে পারাটা বন্ধ করতে পারতাম! যখন বেঁচেছিলাম তখন আমার চোখ ছিল, এবং চোখের পাতাও ছিল, যা অসহ্য তাকে দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পারতাম, কিন্তু এখন তো আমি একটা উপস্থিতি মাত্র, আমার চেতনাকে তো আমি থামিয়ে দিতে পারি না।

তালায় চাবি ঘোরানোর খস্‌খস্‌ শব্দ যেন আমার গলায় উখোর মতো ঘসা হতে লাগল। আবার তীব্র যন্ত্রণা। তার মধ্যেই শুনতে পেলাম এমিলি বলছে, হল কি ? আর গ্রেগ জবাব দিল, চাবিটা ভিতরেই রয়েছে, ওপাশ থেকে।

"হা ঈশ্বর। হায় গ্রেগ, না জানি সে কি করে বসেছে।"

গ্রেগ তাকে বলল, "দরজার কব্জা খুলে ফেলতে হবে। টনিকে ডাক। ওর যন্ত্রপাতির বাক্সটা নিয়ে আসুক।"

"তুমি কি চাবিটা ঢোকাতে পারছ না?"

"নিশ্চয়ই পারব," তবু গ্রেগ গম্ভীর গলায় বলল, "যা বলছি তাই কর এমিলি।"

আর তখনই বুঝলাম যে দরজা প্রথম খোলার সময় এমিলি সেখানে থাকে এটা সে চাইছে না; তাই তাকে সরিয়ে দিল। ভাল, খুব ভাল।

"ঠিক আছে," বলে এমিলি চলে গেল টনিকে ফোন করতে। টনি যুবক, ঘন ভুরু, একরাশ কালো চুল, গায়ের রং অলিভ পাতার মতো; সে গ্রেগের বাড়িতেই থাকে, তার সব কাজকর্ম করে।

তালায় নতুন করে খস্‌খস্‌ শব্দ হতে লাগল। এমিলি ফিরে আসার আগেই গ্রেগ দরজাটা খুলতে চেষ্টা করছে। আমি যেন একটা আরামের স্বাদ অনুভব করলাম, গ্রেগকেও ভাল লাগছে। সে তো লোক মন্দ নয়; আমার স্ত্রীর ব্যাপারে একটা সুযোগ নিলেও আসলে সে লোক খারাপ নয়। সে কি এখন এমিলিকে বিয়ে করবে? তারা তো এই বাড়িতেই বাস করতে পারবে; এ বাড়ি সাজানো গোছানোর ব্যাপারে তার অবদান তো আমার চাইতেও বেশি। নাকি এ ঘরটা এমিলির কাছে বড় বেশি দুঃখজনক স্মৃতি হয়ে থাকবে? এমিলি কি এ বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে অন্যত্র বাস করবে? কিন্তু তাকে তো অনেক অল্প দামে বাড়টা বিক্রি করতে হবে। বাড়ির দালাল হিসাবে আমি তো জানি, যে বাড়িতে কোন আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে সেটা বিক্রি করা কত ঝামেলার ব্যাপার। অতি প্রাকৃতিক ঘটনার ভীতি মানুষের মন থেকে যায় না। অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করে বসবে যে বাড়িটা ভূতে পাওয়া।

আর ঠিক তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে এ ঘরটাও তো ভূতে পাওয়া। এখানে তো আমি রয়েছি! আমিই তো ভূত।

কী ভয়ানক কথা! আমি এখানে ভেসে বেড়াচ্ছি, - হাড় নেই, মাংস নেই, একটা বেদনাদীর্ণ উপস্থিতি মাত্র: ঠিক যেন একটা এককোষী ছত্রাক; কত লোক যাবে আসবে, আর নিরবধিকাল দিন ও রাত্রি একাকি দুঃখদীর্ণ অন্তরে আমি তাদের নীরব দর্শকমাত্র হয়ে থাকব। না, এমিলি বাড়িটা বিক্রি করেই দেবে - তাকে বিক্রি করতেই হবে। আর সেটাই হবে আমার যোগ্য শাস্তি---আত্মহত্যার শাস্তি, যে মানুষ নিজের জীবনকে হনন করে তার নির্জন নরকবাস। সব ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ থাকবে, অথচ তার বেশি কিছু থাকবে না; মাধ্যাকর্ষণের চাইতেও শক্তিমান কোন শক্তি আমাকে বেঁধে রাখবে আমারই আত্মহননের ঘটনাস্থলে।

তালার এদিককার চাবির একটা আকস্মিক শব্দে চমকে সেদিকে তাকাতেই দেখলাম একটা জীবন্ত প্রাণীর মতো একেবেঁকে চাবিটা যেন লাফ দিয়ে নিচে নামতে গিয়ে ঝকঝক শব্দে মেঝেতে ছিটকে পড়ল। একমুহূর্ত পরেই দরজাটা খুলে গ্রেগ আমার রক্তিম মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল, আর পরক্ষণেই বিস্ময়ে ও আতংকে---না

কি ঘৃণায় ?- পিছিয়ে গিয়ে দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিল। তালার মধ্যে চাবিটা আর একবার ঘুরল ; শুনতে পেলাম, দ্রুত পায়ে সে নিচে নেমে গেল।

ঘড়িতে ৯-৫৮ বাজে। এতক্ষণে গ্রেগ সব কথা এর্মিলিকে বলছে, তাকে শান্ত করতে কিছু পানীয় দিচ্ছে। এবার সে পুলিশকে টেলিফোন করছে। এবার এর্মিলিকে জিজ্ঞাসা করছে, পুলিশকে ব্যাপারটা জানাবে কি না। জানি না, তারা কি স্থির করবে।

"না- আ আ আ—আ আ আ!"

ঘড়িতে ১০ ০৭ বাজে। এত সময় লাগছে কেন ? গ্রেগ কি এখনও পুলিশকে ডাকেনি ?

এর্মাজ সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে আসছে, হোচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, তবু আবার দৌড়চ্ছে, চিৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি ঘরের এক কোণে কুকড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দরজার উপর তার ঘুষির শব্দ শুনতে পেলাম। সে ঢুকতে পারছে না। হে ঈশ্বর, ওকে ঢুকতে দিও না। ও যা খুশি তাই করুক, আমার যায় আসে না, শুধু ও যেন আমাকে দেখতে না পায়! ওকে আমাকে দেখতে দিও না!

গ্রেগ এল। এর্মিলি চেঁচামেচি করল, মিনতি করল, রাগ করল, তর্ক করল, দাবি করল, কিন্তু গ্রেগ শুনল না। "চাবিটা দাও। আমাকে চাবিটা দাও।"

গ্রেগ চাবিটা এর্মিলিকে দিল।

না। এটা অসহ্য। এটাই সবচাইতে ভয়ংকর। এর্মিলি ঢুকল, হেঁটে ঘরের মাঝখানে এল, তার পায়ের শব্দ চিরকাল আমার মনে থাকবে। সে কাঁদছে, কিন্তু সে যেন মানুষের কান্না নয়, যে-কোন জীবের হতাশাভরা কান্না, এতক্ষণে বুঝলাম, হতাশা কাকে বলে।

গ্রেগ তাকে সংযত করতে চেষ্টা করল, ঘাড়ে হাত রেখে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু এর্মিলি তার হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে এল...না আমার দিকে নয়। যন্ত্রণায় ও বিষাদে আমি তো তখন ঘরের সব জায়গায় আছি। এর্মিলি এগিয়ে এল আমার শবদেহের দিকে। গভীর মমতায় সেটার দিকে তাকাল, হাত বাড়িয়ে তুলে ওটাকে স্পর্শ করল, অস্ফুটে বলল, "হায় এড!"

গ্রেগ এগিয়ে এল। আবার তার কাঁধে হাত রাখল, নাম ধরে ডাকল। এবার এর্মিলি ডুকরে কেঁদে উঠে মৃতদেহের পা দুটি জড়িয়ে ধরল, কাঁদতে কাঁদতে অত্যন্ত দ্রুত এমন সব কথা বলতে লাগল যে তার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না। আহা, সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

আর বোকা গ্রেগটা এর্মিলিকে ধরে জোর করে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল, দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিল। মৃতদেহটা কিছুক্ষণ দুলতে দুলতে একসময় আবার স্থির হয়ে গেল। সে বড় শোচনীয় অবস্থা। এর চাইতে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত এখানে এইভাবে কাটাতে হবে! কিন্তু এর চাইতেও শোচনীয় পরিস্থিতি তো আছে। এর্মিলি বেঁচে থাকবে, বাড়িটা বেচে দেবে, ধীরে ধীরে সব

ভুলে যাবে। (আমিও তো একসময় ভুলে যাব।) সে গ্রেগকে বিয়ে করবে। তার তো মোটে ছত্রিশ বছর বয়স; সে এখনও মা হতে পারবে।

বাকি রাতটা বাড়ির অন্য কোন ঘর থেকে তার বিলাপ শুনতে পেলাম। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এল; মর্গ থেকে এল সাদা কোট-পরা দুটি মূর্তি। আমাকে—ওটাকে—কেটে নামিয়ে নিতে তারা ঘরে ঢুকল। একটা ভাঙা খেলনার মতো মৃতদেহটাকে পুঁটুলির মতো জড়িয়ে স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে গেল।

ভেবেছিলাম, আমাকে মৃতদেহের সঙ্গেই থাকতে হবে; ভয় পেয়েছিলাম আমাকেও হয় তো ওটার সঙ্গেই কবর দেওয়া হবে, একটা বাক্সের কালো অন্ধকারের মধ্যে অনন্তকাল কাটাতে হবে চিন্তাশীল একটা মহাশূন্য হয়ে। কিন্তু মৃতদেহটা ঘর থেকে চলে গেল, আর আমি থেকেই গেলাম।

একজন ডাক্তারকে ডাকা হল। মৃতদেহ সরিয়ে নেবার পরে দরজাটা খোলাই ছিল। নিচের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। ডাক্তার এমিলিকে একটা ঘুমের ওষুধ দিতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তার বিলাপ কিছুতেই থামছে না। বার বারই বলেছে, "আমিই একাজ করেছি! সব দোষ আমার!"

হ্যাঁ। এই প্রতিক্রিয়াই আমি চেয়েছিলাম, আশা করেছিলাম। জীবনের শেষ মুহূর্তে যা কিছু কামনা করেছিলাম সবই পেয়ে গেলাম; তবু এ যে ভয়াবহ। আমি তো মরতে চাইনি! চাইনি এমিলিকে এত কষ্ট দিতে আর সবচাইতে বড কথা, এখানে থেকে এসব দেখতে ও শুনতে আমি চাইনি।

শেষ পর্যন্ত এমিলি চুপ করল। গ্রেগকে সঙ্গে নিয়ে নীল পোশাক-পরা একজন পুলিশ ঘরে ঢুকল। গ্রেগ ঘটনার একটা বিবরণ দিল।

পুলিশ শুধাল, "আপনি কি ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু?"

"বলতে পারেন ওর স্ত্রীর সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা বেশি। সে আমার দোকানে কাজ করে। নিউইয়র্ক রোডের উপর আমাব একটা পুরাবস্তুর দোকান আছে।"

পুলিশ বলল, "উনি কেন একাজ করেছেন বলে আপনার মনে হয়?"

"আমার মনে হয়, উনি সন্দেহ করতেন যে ওর স্ত্রীর সঙ্গে আমার একটা প্রণয়ঘটিত ব্যাপার আছে।"

পুলিশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি সত্যি এ ব্যাপারে জড়িত ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"মহিলাটি কি বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করছিলেন?"

"না। সে আমাকে ভালবাসে না; ভালবাসে তার স্বামীকে।"

"তাহলে তিনি যেখানে-সেখানে রাত কাটান কেন?"

এ কথায় গ্রেগ অসন্তুষ্ট হল। বলল, "যেখানে-সেখানে তো রাত কাটায় না। মাঝে মাঝে, তাও ঘন ঘন নয়, আমার সঙ্গে রাত কাটায়।"

"কেন?"

"একটু স্বস্তির জন্য। এডের সঙ্গে চলাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। সে বড়ই মেজাজী মানুষ। ইদানীং ক্রমেই অবস্থা খারাপ হয়ে উঠছিল।"

"জীবনে সুখী লোকেরা আত্মহত্যা করে না।" পুলিশটি বলল।

"ঠিক কথা। এড প্রায়ই মন-মরা হয়ে থাকত, মাঝে মাঝেই চাপা ক্রোধে কষ্টও পেত। ফলে তার ব্যবসা খারাপ হচ্ছিল, খদ্দেররা বিগড়ে যাচ্ছিল। এমিলির জীবনও শোচনীয় হয়ে উঠছিল, কিন্তু তবু সে এডকে ছাড়তে রাজী নয়, সে স্বামীকে ভালবাসে। জানি না এখন সে কি করবে।"

"আপনারা দু'জনে বিয়ে করতে পারেন না?"

"না, না," গ্রেগ বিষন্ন হাসি হাসল। "আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন আমাদের বিয়ে করতে সুবিধা হবে বলেই আমরা ওকে খুন করে আত্মহত্যা বলে চালাতে চেষ্টা করছি?"

"মোটেই না," পুলিশটি বলল। "কিন্তু আপনাদের সমস্যাটি কি? আপনি কি বিবাহিত?"

"তা ঠিক নয়। তবে কারণ একটা আছে। তাছাড়া, আগেই তো বলেছি, এমিলি আমাকে ভালবাসে না, ভালবাসে তার স্বামীকে।"

"অথচ "

গ্রেগ তাকে বাধা দিয়ে বলল, "এমিলিকে আমি ভালবাসি, তার জন্য আমার দুঃখ হয়, এডের সঙ্গে তার জীবনটা তো খুব সুখের ছিল না। কিন্তু আপনাকে তো আগেই বলেছি তার সঙ্গে আমার দেহসংসর্গ হয়েছে কালেভদ্রে। আর তাতেও সে যে খুব খুশি হয়েছে তাও নয়।"

হায় এমিলি! বেচারি এমিলি!

পুলিশ বলল, "ঠিক আছে। বাইরে চলুন।"

তারা চলে গেল। দরজাটা খোলাই রইল; সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তারা কথা বলতে লাগল।

পুলিশটি শুধাল, "রাতে থাকার মতো কেউ আছে কি? মিসেস থর্নবার্গের একলা থাকাটা ঠিক নয়।"

"গ্রেট বারিংটনে ওর আত্মীয় স্বজনরা আছেন। আগেই তাদের টেলিফোন করেছি। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই কেউ না কেউ এসে পড়বেন।"

"ততক্ষণ আপনি থাকছেন তো? ডাক্তার বলেছেন, হয়তো উনি ঘুমিয়ে থাকবেন, তবু ধরুন যদি —"

"বেশ তো, আমি থাকব।"

ঐ পর্যন্তই। একটু পরেই নিচের কথাবার্তা থেমে গেল। গাড়ি চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম।

নর-নারীর সম্পর্ক কত জটিল। সাধারণ কাজও কত অর্থহীন। কাউকে কোনদিন বুঝতে পারিনি, নিজেকে তো মোটেই না।

পুলিশ চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই গ্রেগ পুনরায় ঘরে ঢুকল। তাকে খুব অপরাধী ও অনুতপ্ত মনে হল। চেয়ারটাকে পায়ার উপর দাঁড় করিয়ে তার উপর উঠে দাঁড়াল ; অনেক কষ্টে বাকি দড়িটা খুলে ফেলল। সেটাকে পকেটে ভরে চেয়ারটাকে ঘরের এক কোণে যথাস্থানে রেখে মেঝে থেকে চাবিটা কুড়িয়ে নিল। সেটাকে তালার মধ্যে পরিয়ে বিছানার দুটো বাতিই নিভিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

এবার আমি অন্ধকারে একা। দরজার ফাঁক দিয়ে ঈষৎ আলো আসছে, আর আছে ঘড়ির জ্বলজ্বলে সংখ্যাগুলোর স্তিমিত আলো। একটা মিনিট কী দীর্ঘ! ঐ ঘড়িটাই আমার শত্রু। ওটার টিক্‌টিক্ করে চলাটাই আমি সহ্য করতে পারছি না। এক ঘণ্টায় ষাটবার টিক্‌টিক্ ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সারাটা রাত। একটা রাতই সহ্য করতে পারছি না ; তাহলে কেমন করে সহ্য করব অনন্তকাল ?

সারাটা রাত আমাকে ভাবতে হবে, এই যন্ত্রণা সইতে হবে, কিসের জন্য অপেক্ষা করছি অথবা কখন এ অপেক্ষার শেষ হবে তা না জেনেই অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এমিলির দিদি ও ভগ্নিপতির আসার আওয়াজ পেলাম। টনি ও গ্রেগ চলে গেল। তার অল্পক্ষণ পরেই অতিথি কক্ষের দরজাটা খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। কেউ ঘরে ঢুকল না। একটু পরেই হলের আলোও নিভে গেল। এখন ঘড়ির আলোই অন্ধকারের একমাত্র ব্যতিক্রম।

এমিলির সঙ্গে আবার কখন আমার দেখা হবে ? সে কি আবার এঘরে আসবে ?

একটু একটু করে ভোরের আলো ফুটতে লাগল। বাইরে সূর্যহীন মেঘলা দিন। খুবই অনুজ্জ্বল। ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দের সঙ্গে একটা একঘেয়ে দিন এগিয়ে চলল। কখনও পাছে কেউ ঘরে ঢোকে সেই ভয়, আবার কখনও মনে মনে প্রার্থনা জানাই, যেমন করে হোক, এমনকি এমিলির উপস্থিতির দ্বারাও যদিও হয় তবু এই সীমাহীন নির্জনতার শেষ হোক। কিন্তু দিন একইভাবে চলতে লাগল—কোন ঘটনা নয়, শব্দ নয়, কর্মচাঞ্চল্য নয়। এমিলিকে হয়তো এখনও ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত গোধূলি লগ্নে—ঘড়িতে যখন ৬-৫২ বাজে—দরজাটা আর একবার খুলে গেল। একজন কেউ ঘরে ঢুকল।

প্রথমে তাকে চিনতে পারিনি। একটি রাগীমতো লোক দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত ঘরে ঢুকল, শয্যাপার্শ্বের দুটো বাতি জ্বালিয়ে দিল, তারপর অপ্রয়োজনে জোরে ধাক্কা মেরে দরজাটা বন্ধ করে চাবিটা ঘুরিয়ে দিল। সে দরজার থেকে মুখটা ফেরাতেই অবাক হয়ে দেখলাম যে সে তো স্বয়ং আমি। আমি! আমি মরিনি, বেঁচে আছি! কিন্তু তা কেমন করে হবে ?

কিন্তু তার হাতে কি ? ঘরের কোণ থেকে চেয়ারটা টেনে এনে মাঝখানে রেখে চেয়ারের উপর সে উঠে দাঁড়াল—

না! না!

দড়িটাকে কড়ি-কাঠের সঙ্গে বাঁধল। অপর দিকে ফাঁসটা বানানোই ছিল, সেটাকে মাথার উপর দিয়ে গলিয়ে দিতেই গলার উপর চেপে বসল।

হা ঈশ্বর! একাজ করো না!

লাথি মেরে চেয়ারটা সরিয়ে দিল।

চেয়ারটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেবার পরমুহূর্তেই সেটার দিকে ফিরে চাইলাম, কিন্তু চেয়ারটা যেখানে ছিটকে পড়েছিল সেখান থেকে ফিরে এল না, আর আমার তেরো স্টোন এগারো হন্দর ওজনের ভারী দেহটাও গলার শক্ত দড়িটা থেকে ক্রমেই নিচের দিকে নামতে লাগল।

গলায় ব্যথা লাগছিল, ভয়ংকর ব্যথা; কিন্তু তার চাইতেও বিস্ময়করভাবে আমার গাল দুটো ফুলে উঠল। যন্ত্রণাদীর্ণ চোখে অনেক কষ্টে দরজার দিকে তাকালাম, মনে আশা, এখনও যদি কেউ এসে আমাকে রক্ষা করে, যদিও আমি জানি যে বাড়িতে আর কেউ নেই, আর দরজাটা বেশ ভালভাবেই তালাবন্ধ করা হয়েছে। পা দুটো ছোঁড়ার ফলে শরীরটা দুলতে দুলতে ঘুরপাক খাচ্ছে; ফলে কখনও দরজার দিকে, কখনও জানালার দিকে আমার মুখটা ঘুরে যাচ্ছে। গলায় এঁটে বসে যাওয়া ফাঁসটা ঢিলে করবার জন্য কাঁপা হাতে বৃথাই অনেক চেষ্টা করলাম; কোন ফল হল না।

ক্রমে দেহটা স্থির হয়ে এল। মনে হল, এবার আমার মৃত্যু হল। এই তো মৃত্যু।

অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

ওক-কাহিনী

Sport of the Oak —কেনেথ হাবকাব

অনেক বছর যত্ন করে রাখার পরে শেষ পর্যন্ত আজ রাতেই ওক গাছের বীচিটা পুড়িয়ে ফেললাম। ভাবলাম, এর ফলে হয়তো দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি পাব। বীচিটাকে কয়লার আগুনের মধ্যে ফেলে দিলাম, সেটা ফট্‌ফট্‌ শব্দ করল। তারপরেই জ্বলে উঠল। বীচিটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল; আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

অনেকদিন পর্যন্ত দুঃস্বপ্নগুলো দেখিনি, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ আগে তারা আবার দেখা দিতে শুরু করল। সেই একই দুঃস্বপ্ন। আমি যেন শুনতে পাই, করাত দিয়ে গাছ কাটা হচ্ছে; আমি জানি ওটা ওক গাছ। পতনোন্মুখ হয়ে গাছটা আর্তনাদ

করে ওঠে, এখনই হুড়মুড় করে আমার শরীরের উপর ভেঙে পড়বে—ঘুম ভেঙে যায়; অন্ধকারে সারা শরীর ঘামে ভেজা।

আর ঘুম আসে না; সেই নিদ্রাহীন প্রহরগুলিতে শিক-বসানো জানালার দিকে তাকিয়ে লেস্‌লি ডিয়েকনকে মনে পড়ে, মনে পড়ে তার সেই কাহিনী বিশ বছর আগে এই ঘরে বসে যা সে আমাকে শুনিয়েছিল। সে ছিল একটি হাসি-খুশি, বেপরোয়া, কলেজে-পড়া যুবক; আর সেই কিনা হয়ে উঠেছিল ভয়ের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি—শেষ পর্যন্ত বুঝিবা তার চাইতেও শোচনীয় কিছু।

ডিয়েকনের একহারা চেহারা; মাথায় বালি রং চুল। চটপটে স্বভাব; হাসি-ঠাট্টায় ভরপুর। দু'জন একসঙ্গে কলেজে গেলাম রসায়নশাস্ত্র পড়তে; যদিও সে গিয়ে পড়ল ভাষা-শিক্ষার ছাত্রী পিঙ্গলাঙ্গী সুন্দরী ওয়েন্ডি ট্রায়ান-এর খপ্পরে—মানব-সম্পর্কের রসায়ন-চর্চাযই তার বেশি সময় কাটতে লাগল। ক্রমেই তার দেখা পাওয়া ভার হয়ে উঠতে লাগল; পড়াশুনায়ও ঢিলে পড়ল।

মনে পড়ে, সেদিন রাতে আমার ঘরেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি মারগ্রেভকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করছিলাম; এমন সময় ডিয়েকন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। কলেজ-গাউনটাকে একপাশে ঝুলিয়ে রাখল; সারা সন্ধ্যাটা ওয়েন্ডির সঙ্গে কাটানোর আনন্দে তার মুখখানি জ্বলজ্বল করছে। টোস্টিংফর্কটা হাতে নিয়ে আগুনের পাশে উবু হয়ে বসে নিজের জন্য একটুকরো রুটি টোস্ট করতে শুরু করল।

"সরে বস তো লেস্" বলে বন্ধুর মতোই তাকে আস্তে একটু ঠেলে দিলাম, "ঘরে এমনিতে যথেষ্ট হাওয়া আসছে, তোমাকে আর আগুনটা উস্কে দিতে হবে না।"

সে আপত্তির সুরে বলল, "থাম তো নরম্যান। যখনই ঘরে ঢুকি তখনই তুমি হাওয়ার জন্য হাহাকার কর।"

"হয়তো কখনও কখনও করি। আমার ঘরটা যেন একটা গুদাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি ভাবছিলাম মারগ্রেভের কথা—ইতিহাসের ছাত্র রাগী মারগ্রেভের কথা। সে রাতে কেন তাকে নৈশভোজে ডেকেছিলাম সেটা মনে পড়ছে না। এককালে সে সেনাবাহিনীতে ছিল; যুদ্ধে পঙ্গু হয়ে ফিরেছে। ভাল পোশাক পরে, মাথায় ফুলেল তেল মাখে; তার বেশি তার সম্পর্কে কিছু জানি না।

টোস্টে মাখন মাখিয়ে ডিয়েকন টি-পটের ঢাকনাটা খুলল। "এ যে একেবারে মরুভূমি। একফোঁটাও নেই।" যা হোক দু'এক ফোঁটা যা ছিল তাই গলায় ঢেলে ডিয়েকন মেজাজটা ফিরে পেল। হেসে বলল, "দেখ নরম্যান, হাওয়া-হাওয়া করে চেঁচিয়ে কোন লাভ নেই; এসব সেকেলে পুরনো বাড়ির অবস্থা এইরকমই হয়।"

"আরে তুমি তো সে কথা বলবেই। তোমাকে তো আর এখানে রাত কাটাতে হয় না। তুমি তো ফুর্তি কর ওয়েন্ডির বাড়িতে।"

[illegible] বেড়ে চলল। ডিয়েকন অনেক প্রাচীন বাড়ি-ঘরের নজির

উপস্থিত করল। আর আমিও সুযোগ বুঝে আলোচনার মোড় ঘোরাবার জন্য একটা প্রাচীন বাড়ির প্রসঙ্গই তুললাম।

"আরে বাবা, অনেক প্রাচীন জমিদার বাড়ির ইতিহাসই যখন তোমার জানা, তখন এই বাড়িটির কথাই শোনাও না।"

"শুনবে? ঠিক আছে।" হাতল চেয়ারে হেলান দিয়ে ডিয়েকন একটু মুখ টিপে হাসল। "আচ্ছা, ওক গাছের কথাই ধর।"

"ওক গাছ? এখানে তো কোন ওক গাছ নেই।"

"এখন নেই। চারশ' বছর আগে এখানে ছিল ওক গাছের জঙ্গল। এই জানালার পাশেই যেসব দৈত্যের মতো গাছ জন্মাত তাদের কথা কখনও শোনোনি বোধহয়?"

কথার ফাঁকে ফাঁকে সে জ্যাম মাখানো টোস্ট চিবুতে লাগল।

"গাঁয়ের এক গোয়ার গোবিন্দ আর তার মনের মানুষ সেই গাছের নিচে ঘুমত। অসংখ্য ডালপালার মনোরম ছায়া, প্রেম করবার পক্ষে মোক্ষম জায়গা...তুমি কি জান, একসময় এই ঘরগুলি জমিদার বাড়িরই অংশ ছিল? একদিন জমিদারবাবু স্থির করল, সব ওক গাছ কেটে ফেলবে। দূরের গাছগুলি একটার পর একটা কাটা হতে লাগল; বড় গাছটার গায়ে তখনও হাত পড়েনি, জমিদারবাবুর মনে আশা, ভাবগতিক দেখে প্রেমিক যুগল অবস্থা বুঝে সেখান থেকে সরে যাবে। কিন্তু বৃথা আশা। তারা এটাকে নিজেদের সম্পত্তি বলেই ধরে নিল। একধরনের জবর দখল অধিকার আর কি। বড় গাছটার পালা যখন এল তখনও তারা গাছটার নিচেই শুয়ে রইল।

জমিদারবাবুর তখনও টনক নড়ে না। ভাবল, সময় হলে তারা ঠিক সরে যাবে। কিন্তু তারা সেখানেই শুয়ে থাকল। শেষ পর্যন্ত করাত কুড়ুল নিয়ে কাঠুরেরা এল, গাছে করাত বসাল...দৈত্যাকার প্রাচীন গাছ। কাটতে সময় লাগল অনেক। কিন্তু গাছটা যখন মড়্ মড়্ শব্দ করে দুলতে শুরু করল, তখন জমিদারবাবু চিৎকার করে শেষবারের মতো সাবধান করে দিল। আর "

ডিয়েকন হাতটা তুলল। হাসতে হাসতে হাতলের উপর রাখা টোস্টকে এক আঘাতে গুঁড়ো করে ফেলল। আমি চমকে উঠলাম। কিন্তু মারপ্রেভের কোনরকম ভাবান্তর দেখলাম না।

"একজন গেঁয়ে গোয়ার গোবিন্দ বিদায় হল," বলে ডিয়েকন মাখন মাখাবার ছুরিটা দিয়ে তার হাতের তালু থেকে জ্যামটা চেঁচে ফেলতে লাগল।

নিস্তব্ধতা ভেঙে আমিই কথা বললাম: "তার প্রণয়িনীর কি হল?"

"একটা ভাঙা পা নিয়ে সে বেঁচে গেল।" বাঁকা চোখে টোস্টের অবশিষ্ট টুকরো গুলোর দিকে তাকিয়ে ডিয়েকন সেগুলোকে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"এর মধ্যে প্রাচীনতার ঐতিহ্যের কি আছে?"

"ঐতিহ্য? সে আর এক ইতিহাস। মনে হচ্ছে, তুমি সেটাই শুনতে চেয়েছিলে, তাই না?"

খাবারের প্লেটগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে বললাম, "তোমাকে তো আমি চিনি ; তুমি যা বলবে তা আমি বিশ্বাস করি না।"

"কেন কর না ? তোমার বন্ধু মারগ্রেভকে জিজ্ঞাসা কর। সে তো একজন ইতিহাসের ছাত্র।"

এইবার মারগ্রেভ প্রথম কথা বলল, "এই সব বাজে কথা শোনাতে চাও শোনাও, কিন্তু তার জন্য এধরনের সবজান্তা ভাব দেখিও না।"

কথা-কাটাকাটি থেকে দু'জনের মধ্যে মন-কষাকষি দেখা দিল। অনেক কষ্টে আমি দু'জনকেই থামিয়ে দিলাম।

"আচ্ছা, শুভরাত্রি", বলে মারগ্রেভ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আর তখনই আমার প্রথম খেয়াল হল যে আমার ঘরের দুটো দরজা খুলে সে বেরিয়ে গেল। ডিয়েকন ঘরে ঢোকার সময় বাইরের ওক কাঠের দরজাটাও বন্ধ করে দিয়েছিল দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। শুধালাম, "ব্যাপার কি ডিয়েকন ? ওকের দরজাটা বন্ধ করেছিলে কেন ?"

"বন্ধ করেছিলাম না কি ? কি জানি, খেয়াল করিনি। হয়তো তোমার ঠাণ্ডা হাওয়ার বাতিক আমাকেও পেয়ে বসেছে। যাক গে সেকথা। আমি ঘুমতে চললাম।"

ডিয়েকন চলে গেল, ব্যাপারটা ওখানেই চাপা পড়ল। কিন্তু আমার ওকের দরজাটা সে কেন বন্ধ করল সেকথা জানবার কৌতূহলটা মন থেকে তাড়াতে পারলাম না। যতদূর মনে পড়ে, এই প্রথম তাকে একাজটা করতে দেখলাম।

তারপর থেকে বেশ কয়েকদিন আর ডিয়েকনের টিকিটিও দেখতে পেলাম না। সপ্তাহ দুই পরে যখন তার সঙ্গে দেখা হল তখন তার চোখে-মুখে একটা বিপর্যস্তভাব আমার নজর এড়াল না। জিজ্ঞাসা করলাম, "লেস্, কোন গোলমাল দেখা দিয়েছে কি ?"

তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। "গোলমাল ? না তো—গোলমাল দেখা দেবে কেন ?"

আমি আর চাপাচাপি করলাম না ; কিন্তু যেরকম অকারণ জোর দিয়ে সে আপত্তিটা জানাল তাতেই মনে হল তার কথা সত্যি নয়।

হয়তো তার ও ওয়েন্ডির ব্যাপারটায় ভাঁটা পড়েছে। তবু...কিছুই বলা যায় না ; হতেও তো পারে।

ইদানীং প্রায়ই লক্ষ্য করি, প্রায় সময়ই ডিয়েকনের ঘরের ওকের দরজাটা বন্ধ থাকে না। তবে তো ওয়েন্ডির সঙ্গে ব্যাপার-স্যাপারটাই ভেস্তে গেছে। কিন্তু আকস্মিকভাবেই আমি নিজেই একদিন সে ধারণাটাও বাতিল করতে বাধ্য হলাম।

আমার রসায়নের নোট-খাতাটা ডিয়েকন নিয়েছিল। সেটা আনতেই তার ঘরে গিয়েছিলাম। বাইরের ওকের দরজাটা বন্ধ না থাকায় একটু ঠেলতেই ভিতরের দরজাটা খুলে গেল। ভিতরে ঢুকে গেলাম।

উঁচু হাতল চেয়ারের পিঠটা ছিল আমার দিকে, অগ্নিকুণ্ডের একপাশে। চেয়ারটা প্রায় পেরিয়ে যেতেই খস্‌খস্‌ শব্দ কানে এল। ওয়েন্ডির আলিঙ্গন থেকে ডিয়েকন তার হাত পা গুটিয়ে নিচ্ছে, মেয়েটিও তাড়াতাড়ি স্কার্টটা টেনে নামিয়ে দিচ্ছে।

তো তো করে বললাম, "আমি দুঃখিত। তোমাদের দেখতে পাইনি।" কোনরকমে টেবিল থেকে নোট-খাতাটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম।

সন্ধ্যার গোড়াতেই ডিয়েকন আমার ঘরে এল। হেসে বললাম, "খুব খেল দেখালে বটে। একটা আলোও জ্বেলে রাখনি। আমার তো ধারণা ছিল, ওয়েন্ডি ঘরে থাকলে তুমি ওকের দরজাটা বন্ধ করেই রাখ।"

"ভুলে গিয়েছিলাম ভাই।" ডিয়েকন মুচকি হাসল বটে, কিন্তু আমার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ দেখা দিল। তক্কে তক্কে রইলাম। দেখলাম, ওয়েন্ডি ঘরে ঢুকলেও সে ওকের দরজাটা বন্ধ করে না। অথচ আগে তো দেখেছি, পড়াশুনা করার সময়ও সে ঐ দরজাটা বন্ধ করেই রাখত।

একদিন বিকেলে আমার ঘরে পেয়ে ওকে চেপে ধরলাম।

"ঠিক ঠিক বল তো লেস্‌, ব্যাপারটা কি?"

কেমন যেন অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ডিয়েকন বলল, "তুমি ঠিক ধরেছ নরম্যান। সত্যি, এর একটা গভীর কারণ আছে—আর সেটা নারকীয়।"

উত্তেজনায় সে উঠে দাড়াল। হাতের পেন্সিলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। চাপা অনুচ্চকণ্ঠে বলল, "আসল কথা, যখনই ওকের দরজাটা বন্ধ করি আর ওয়েন্ডি আমার কাছে থাকে, তখনই একটা আওয়াজ শুনতে পাই।"

"আওয়াজ? কিরকম আওয়াজ?"

ডিয়েকন ঘুরে দাড়াল। জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিল। "আমার ধারণা, সত্যিকারের কোন আওয়াজ নয়। প্রথমে, ভাল করে ধরতেও পারিনি। কিন্তু ইদানীং আওয়াজটা বেশ জোরে হচ্ছে—অনেকটা করাতের শব্দের মতো।"

দেখলাম, তার গালের মাংসপেশী কুঞ্চিত হচ্ছে, চোখের পাতা কাঁপছে।

"ওয়েন্ডি সে শব্দ শুনতে পায়?"

"না। অন্তত আমি তাকে জিজ্ঞাসাই করিনি। কিন্তু শুনতে পেলে সে নিশ্চয় আমাকে বলত।"

"আর শব্দটা হয় যখন ওয়েন্ডি ঘরে থাকে, আর ওকের দরজাটা বন্ধ থাকে?" একটু ইতস্তত করে আবার শুধালাম: "আচ্ছা সেদিন রাতে ওক গাছের গল্পটা বলার পর থেকেই কি শব্দটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে?"

"তা—সেইরকমই তো মনে হয়।...কিন্তু তুমি যদি মনে কর যে এর পেছনে ঐ মারগ্রেভের হাত আছে, আমি কিন্তু তা মনে করি না।.. এ ব্যাপারে তার করবার কি আছে?...বরং আমার তো ধারণা, এটা এই পুরনো বাড়িটারই কোন কারসাজি। নানা ফাঁক-ফোকড় দিয়ে শনশন করে হাওয়া তো আসেই।"

সে হ্যা হ্যা করে হাসতে লাগল। আমি উঠে জানালা দিয়ে নিচে তাকালাম। ডিয়েকনের এ অবস্থার জন্য অংশত আমিই দায়ী। তাকে সাহায্য করতেই চাই, কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি? মারগ্রেভকে কথাটা জানানো তো আরও বোকামি হবে।

স্থির করলাম ওয়েন্ডির সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব। পরদিন সকালে কফি বারে তাকে একা পেয়ে গেলাম। প্রথমেই সেদিন ডিয়েকনের ঘরে আচমকা ঢুকে পড়ার জন্য ক্ষমা চাইলাম, তা শুনে সে তো হেসেই খুন, তার পিঙ্গল চোখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

"ওকের দরজাটা খোলা রেখে লেস্‌লিই তো কাণ্ডটা ঘটাল।"

"যা বলেছ। আচ্ছা, সে যে বলে দরজাটা বন্ধ করলেই একটা শব্দ শুনতে পায়, সেটা কি ব্যাপার?"

"আমি জানি না। কথাটা সেও আমাকে বলেছে, কিন্তু আমি কখনও কিছু শুনিনি।" তার মুখের হাসি নিভে গেল। "কিন্তু লেস্‌লি যে এখনও শুনতে পায় সেটা ভাল করেই জানি। কিন্তু আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। এটা তার একধরনের পাগলামি। যতসব গোলমেলে ব্যাপার।"

ওয়েন্ডি স্প্যানিশ ভাষার ক্লাস করতে চলে গেল। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম। ওয়েন্ডিকে আমি পছন্দ করি। এ নিয়ে তার ও ডিয়েকনের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হোক তা আমি চাই না। কিন্তু আমিই বা কি করতে পারি?

একসময় ওক গাছ কাটার গল্পটা মনে পড়ে গেল। কফি বার থেকে বেরিয়ে কলেজের মাঠের দিকে তাকালাম। রৌদ্রতপ্ত বাতাস বেশ মিষ্টি লাগছে, নতুন ঘাস কাটার গন্ধে ভরপুর। হঠাৎ চোখে পড়ল

ঐ তো একটা গাছ ছিল অথবা গাছের গুঁড়ি আমার জানালা থেকে খুব দূরেও নয়। গাছটি এমনভাবে কাটা হয়েছে যে একটা বৃত্তাকার আসন গড়ে উঠেছে। একদল ছাত্র সেখানে বসে গুলতানি করছে। তাহলে কি ডিয়েকনের গল্পের সত্যি কোন ভিত্তি আছে?

কি মনে করে লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকলাম। কয়েকখানা জরাজীর্ণ প্রাচীন বই খুঁজে বের করলাম। এই তো লেখা আছে: একসময় এই অঞ্চলে প্রচুর পুরনো ওক গাছ ছিল। একখানা পুরনো মানচিত্রে অনেক ওক গাছ দেখানোও হয়েছে। তারপর সেকেলে ইংরেজি ভাষায় লেখা আছে হুবহু ডিয়েকনের সেই একই গল্প।

জমিদার বাড়ির পাশেই ছিল একটা ওক গাছ, সেটা কাটা হল, একটি ছেলে মারা গেল, মেয়েটি পঙ্গু হয়ে গেল। একেবারে এক গল্প। শুধু একটা বিবরণ আগে শুনিনি ওড়্‌হার্প নামের সেই জমিদারবাবু পঙ্গু মেয়েটিকে তুলে নিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিল, এবং এক বছর পার না হতেই তাকে বিয়ে করল। আরও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, কেটে ফেলা ওক গাছটাকে চিরে তক্তা বানিয়ে তা দিয়ে জমিদার বাড়ির ঘরের বাইরের দরজাগুলি তৈরি করা হয়েছিল।

আরও অনেকগুলি প্রাচীন বই খুলে বসলাম: ওডহার্পের বংশধরদের কোন হদিস

যদি মেলে।...পাতা ওল্টাতেই স্থানীয় ভদ্রলোকদের কিছু কালির আঁকা প্রতিকৃতি চোখে পড়ল—আমার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হল। জীর্ণ হলুদ পাতায় আঁকা যে তীক্ষ্ণ গভীর চোখগুলি আমার দিকে তাকিয়ে আছে তার উপর ঝুঁকে পড়লাম। এমনকি ছবির নিচেকার পরিচয়-লিপি পড়বার আগেই বুঝতে পারলাম যে এটা ওড্‌থর্পেরই প্রতিকৃতি। কারণ সে মুখে মারগ্রেভের মুখটাই যেন কেটে বসানো।

ছবি ও তার চিন্তার মধ্যে এতই ডুবে গিয়েছিলাম যে সহকারীটি এসে লাইব্রেরি বন্ধ হবার সময় হয়েছে জানাতে আমি চমকে উঠলাম। বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটা বাতাস উঠেছে। কাটা ঘাসগুলো বাতাসে উড়ছে। সবুজ মাঠের একপ্রান্তে বসে ওয়েন্ডি ও মারগ্রেভ গভীর আলোচনায় রত।

দৃশ্যটিতে দোষের কিছু নেই: তবু কেমন যেন দৃষ্টিকটু লাগল। বাতাসে ওয়েন্ডির চুল উড়ছে, আর মারগ্রেভের গাউনটা উড়ছে বাদুড়ের কালো ডানার মতো।

তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলাম বৃত্তাকার গুঁড়িটার পাশ দিয়ে। আসনটার মাপ দেখেই বোঝা যায় যে গাছটার বেড় ছিল প্রায় চার ফুটের মতো...

জমিদার-বাড়িতে ফিরে গেলাম। ডিয়েকন চিন্তিত মুখে অন্ধকার বারান্দায় পায়চারি করছে। মুখোমুখি হতেই সে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। উঁচু জানালা দিয়ে আসা ম্লান আলোয় তার মুখটাকে হতশ্রী দেখাচ্ছে।

"কোন অঘটন ঘটেছে কি?" শুধালাম।

"হ্যাঁ। আমি—" তার এক হাতে নোট-খাতার একটা ছেঁড়া পাতা থর্‌থর্ করে কাঁপছে। "এখন ওয়েন্ডি ঘরে নেই, অথচ সেই শব্দটা এখনও শুনতে পাচ্ছি।"

সে পিছন ফিরে তাকাল। ওকের দরজাটা খোলা; ঘরের চৌকাঠ থেকে দিনের আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

"লেস্, গাছের গল্পটা কি সত্যি তুমি বানিয়ে বলেছিলে?" আমি থামলে সে অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল। "তাহলে ঐ শব্দটা সত্যি হয় কেমন করে? আর তা শুনে তুমি পালিয়েছই বা কেন?"

তাকে তার ঘরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু নিজেকে সে ছাড়িয়ে নিল।

"না।" দেওয়ালে-দেওয়ালে তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হল। "ওক কাঠের দরজাটা বন্ধ করে...পড়তে চেষ্টা করলাম...করাত চলতে আরম্ভ করল...পিছনে—সামনে।" সে মুঠোর ভিতরকার দলা-পাকানো কাগজখানার দিকে তাকাল। "তারপর কোন রকমে এইটুকু লিখেছি—তারপরই শুরু হল ডালপালা কাটার শব্দ।"

একটু শান্ত করার জন্য তাকে আমার ঘরে নিয়ে গেলাম।

"ওয়েন্ডির সঙ্গে তোমার আবার কখন দেখা হবে?"

"আজ রাতে তার আসার কথা আছে।" ডিয়েকন মাথার পেরেকের মতো খাড়া চুলে হাত বুলাতে লাগল। হঠাৎ সে পাগলের মতো প্রশ্ন করল: "সে তো বলছে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে; তোমার কি ধারণা সে ঠিক কথাই বলেছে? আমরা যেন পরস্পরকে এখন আর ঠিক-ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"লেস, আমার কথা শোন। অবস্থার মোকাবিলা করতে চেষ্টা কর, নইলে এ সবের পিছনে কি আছে তা কোনদিন বুঝতে পারবে না। আজ কি একটু শক্তির পরিচয় দিতে পারবে না—ওকের দরজাটা বন্ধ করতে পারবে না? হয় তো তাতে শব্দটা এত জোর হবে যে ওয়েন্ডিও শুনতে পাবে। তাকে অন্তত এটা বোঝাতে পারবে যে দু'জন একত্র হলে তোমরা সবকিছুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পার। এইভাবেই এ ভয় তোমাকে জয় করতে হবে।"

তখনকার মতো প্রস্তাবটা বেশ ভালই মনে হল। কিন্তু সেটা যে এতখানি কার্যকর প্রমাণিত হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি।

তার ঠোঁট দুটো কুঁচকে যেতে লাগল। "কিন্তু, কি জান—মারগ্রেভ—"

"মারগ্রেভের আবার কি হল?"

ডিয়েকন ইতস্তত করল। "কিছু না।" মুখটা মুছল। চোখে যেন ভয়ের ঝিলিক।

আমি সরল বিশ্বাসে বললাম, "যদি প্রয়োজন মনে কর, যখন ওকের দরজাটা বন্ধ করবে তখন আমি বাইরে থেকে নজর রাখতে পারি।"

সে ঘাড় নেড়ে বলল, "ঠিক আছে। চেষ্টা করব।"

সে-রাতে ডিনার খেতে গেলাম না। ডিয়েকনকে না জানিয়ে ওয়েন্ডির কলেজে গিয়ে তার সঙ্গে দু' একটি কথা বললাম। আমি যে জানতে পেরেছি যে ডিয়েকনের গল্পটা সত্যি সেকথাও সংক্ষেপে বললাম।

"ওয়েন্ডি, তুমি যদি চাও সে এ ভয়টা কাটিয়ে উঠুক, তাহলে তোমাকেই সাহায্য করতে হবে। আজ রাতে সে ওকের দরজাটা বন্ধ রাখতে রাজী হয়েছে—যদিও শব্দটা আরও বেড়েছে! কাজেই সে যাতে দরজাটা বন্ধ রাখে সেটা অবশ্যই দেখবে।"

স্কার্ফটা নাড়তে নাড়তে ওয়েন্ডি বলল, "আর সে যদি আবার শব্দটা শুনতে পায়—তাহলে? তখন আমি কি করব?"

"শুধু শুনে যাবে। মনে রেখো, এটা তোমার কাছে সাধারণ ব্যাপার হলেও তার পক্ষে মারাত্মক বকমের গুরুতর।"

"কিন্তু আমি যদি তখনও কিছু শুনতে না পাই? আমি কি তবু শোনার ভান করব? না কি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করব যে শব্দ টব্দ কিছু সেখানে নেই?"

"সেটা তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে; শুধু তাকে একটু সহানুভূতি দেখাবে। এ ব্যাপারটা বেচারাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে!"

সেই মুহূর্তে আমাব মনে হল, তাব আচরণ যেন একটু অন্যরকম; যেন আমার কৌতূহল দেখে সে সন্তুষ্ট নয়। মারগ্রেভের কথা মন থেকে মুছে ফেললেও হঠাৎ আমার মনে একটা সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে উঠল। বললাম, "তুমি তো এখনও লেস্লিকে চাও, তাই না?"

"তাকে চাই কি না?" ওয়েন্ডির মুখে বিষণ্নতার ছায়া। "চাইতাম কিন্তু—নরম্যান, তোমাকে খোলাখুলি বলাই ভাল। আজ রাতে আমি—আমি তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই।"

অবিশ্বাসেব ভঙ্গিতে তাব দিকে তাকালাম। "কিন্তু কেন, কাবণটা কি—।"

"জ্যাক মাবগ্রেভ।" ওযেন্ডি বিচলিত বোধ কবল ; হযতো কিছুটা ভযও পেল। তারপব চোখ তুলে আমাব দিকে তাকাল। "কাজেই আজ বাতে যখন লেস্‌লিব ঘবে যাব তখন সত্যি আমি চাইব না যে সে ওকেব দবজাটা বন্ধ করুক। কিন্তু তুমি যদি মনে কব তাতে তাব ভাল হবে—তাহলে সে যাতে ওকেব দবজাটা বন্ধ কবে সেই কাজই আমি কবব।"

এ কথাব জবাব দেওয়া শক্ত। "ভাল। ধন্যবাদ ওযেন্ডি। কিন্তু খুব সাবধান।" এই সতর্ক-বাণী শুনিযেই ক্ষুব্ধ অন্তবে সেখান থেকে চলে এলাম।

ওযেন্ডি ও মাবগ্রেভ...এ যে কল্পনাব অতীত এক রূপকথা। আমি মন থেকে সন্দেহটা বাতিল কবতে চাইলাম, কিন্তু পাবলাম না।

মাথাব উপব সীসেব কফিনেব মতো ধূসব ও ভাবী মেঘেব দল উড়ে চলেছে। কলেজে ফিবে দেখলাম, বাতাসেব দিকে মাথা নুইযে ডিযেকন এগিযে আসছে- আসছে ওযেন্ডিকে নিযে যেতে। তাকে এড়াবাব জন্য একটা গলিতে ঢুকে পড়লাম। নিজেকে বাববাব প্রশ্ন কবতে লাগলাম, কাজটা ভাল কবলাম কি? ভাবী আকাশেব মতো সংকটটাও ভাবী হযে আমাব উপব চেপে বসল।

জমিদাব বাড়িব ভিতবে পাথবেব বাবান্দায় বাতাসেব দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছে। থামলাম। বাবান্দাব শেষ প্রান্তে ডিযেকনেব দুটো দবজাই সপাটে খোলা ; একটা সুবাস আমাব নাকে এল। সিঁড়িতে একটা পাযেব শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। মুখ ফিবিযে দেখি, মাবগ্রেভ আমাব পিছনে দাঁড়িযে আছে, আমাকে পাশ কাটিযে যেতে চায়।

ডিযেকনেব ঘব থেকে যে মৃদু আলো আসছিল তাতেই দেখলাম তাব মুখটা ছাইযেব মতো সাদা, চোখেব কোণে কালি। সবে দাড়ালাম, আব সেও নিঃশব্দে মৃদু হেসে সিঁড়ি বেযে তাব দোতলাব ঘবে উঠে গেল। লাইব্রেবিতে দেখা প্রতিকৃতিব সঙ্গে তাব মুখেব মিলটা লক্ষ্য কবাব মতো। সেই ভূতুড়ে প্রভাবটা মন থেকে তাড়াতে ডিযেকনেব দবজাটাকে ভাল কবে দেখাব জন্য সেইদিকে এগিযে গেলাম।

অসাধাবণ কিছুই চোখে পড়ল না। জমিদাব বাড়িব অন্য সব ঘবেব মতোই ভিতবেব ও বাইবেব দবজাব মাঝখানে ফুট চাবেকেব মতো ফাকা জাযগা বযেছে একটা ছোটখাটো অলিন্দেব মতো। বাইবেব ওকেব দবজাটা মজবুত। মুহূর্তেব জন্য সেটাকে বন্ধ কবলাম, লোহাব মোটা হুড়কোটা পবীক্ষা কবে দেখলাম। ঘবে অগ্নিকুণ্ডটা জ্বলছে ; তাবই টানে দবজাব নিচ দিযে একঝলক হাওযা ঘবে ঢুকল।

অলিন্দটাব একপাশে একটা কাবার্ড বসানো। দু' একটা ঘবে মোছাব বাসন ছাড়া কাবার্ডটা খালি পড়ে আছে। হঠাৎই কথাটা মনে এল এখানে লুকিযে থাকলে কেমন হয।

গোযেন্দাগিবি। না, আমি তো কথা দিযেছি, ডিযেকনের ঘবেব উপব নজব বাখব।

তাড়াতাড়ি সেখানে লুকিয়ে পড়লাম। অচিরেই পায়ের শব্দ ও তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

তারা অলিন্দে পা রাখল। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে ডিয়েকন ওকের দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে হুড়কোটা তুলে দিল। "খুশি হয়েছ?" সাহস দেখিয়ে ডিয়েকন কথাটা বলল ওয়েন্ডিকে। তারা ঘরে ঢুকে ভিতরের দরজাটাও বন্ধ করে দিল।

আলো আসার সব পথ বন্ধ হয়ে গেল। কাবার্ডের ভিতরটা কয়লাকালো। নড়তে-চড়তেও পারছি না, পাছে ঘর মোছার বাসনপত্রের শব্দে ডিয়েকন ও ওয়েন্ডি ভয় পায়। অগ্নিকুণ্ডের কয়লার মধ্যে লোহার শিক নাড়াচাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। আগুন যতই জোরদার হচ্ছে ততই দরজার ফাঁকফোকড় দিয়ে বেশি করে বাতাস ভিতরে টানছে।

তাদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে এল।

ওয়েন্ডি বলল, "জ্যাক মারগ্রেভ সম্পর্কে যা বললাম সেটা বুঝতে পারছ?"

আচ্ছা—তাহলে এর মধ্যেই কথাটা বলা হয়ে গেছে।

"না!" ডিয়েকনের উচ্চ কণ্ঠস্বরে অসন্তুষ্টির আভাস। "ওই লোকটার মধ্যে তুমি যে কি দেখেছ আমি বুঝি না। ও তো একটা কীট মাত্র...আজ রাতে এখানে আসাই আমাদের উচিত হয়নি। কোন অর্থ হয় না।"

"চূড়ান্ত আলোচনার পক্ষে এটাই উপযুক্ত স্থান।...আর কিছু না হোক, স্থানটার একটা ঐতিহ্য আছে। তাছাড়া এভাবে এখানে আসা এটা আমাদের অনেক দিনের অভ্যাস।"

মনে মনে বললাম, অভ্যাসই বটে।...এই ঘর যেখানে তারা পরস্পরকে ভালবেসেছে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছে, আজ রাতে সেখানেই তারা এসেছে কোন অশুভ শক্তির টানে। না বলা কারণটা তো তারা দু'জনেই জানে; তারাই লেস্‌লিকে টেনে এনেছে এই গোলকধাঁধার পথে।

ওয়েন্ডি ভাঙা গলায় বলল, "লেস্‌লি, আমার কথা শোন। দরজার কাছ থেকে এদিকে এস।"

ডিয়েকনের পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আবার থামল। তার পরের প্রশ্নে ফুটে উঠল বিকারের বিকৃত স্বর। "তুমি কি কখনও মারগ্রেভকে বলেছ- মানে এখানে যা ঘটে সে কথা?"

কোন জবাব শুনতে পেলাম না। তারা চুপচাপ থাকায় মনে হল দু'জনই বাতাসে কান পেতে আছে। অন্ধকারে চোখ ও কান দুইই খাড়া করলাম। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে।

"ওয়েন্ডি, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শব্দটাকে যদি তাড়িয়ে দিতে পারি...তবু কি কোন আশা থাকবে না?...আমি বলতে চাই, তবু কি ভাঙা কাচ জোড়া লাগবে না...?" ডিয়েকনের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল।

ওয়েন্ডির অস্ফুট স্বর কোনক্রমে কানে এল। "আমি জানি না। সত্যি বলছি,

আমি জানি না।" দরজার ফাঁক দিয়ে আসা একটা অপার্থিব আর্তনাদে সে কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল। তার পরেই—"লেস্‌লি, ঐ শোন..."

আমিও শুনতে পেলাম—বাতাসের আর্তনাদে একটা বিচিত্র ছন্দ বাজছে। চাপা নিশ্বাসের মতো ছলনাময়ী।

"লেস্‌লি ?"

ওয়েন্ডির আর্ত কণ্ঠস্বর। আমার মনেও কোন সন্দেহ রইল না। বুঝলাম ডিয়েকন চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; আবার ওয়েন্ডির চাইতেও স্পষ্টতর করে সে শুনেছে...করাতে কর্কশ ঘস্‌-ঘস্‌ শব্দ।

বাতাসের ঝাপটা এল। কাবার্ডের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। চমকে উঠলাম। ঠেলে খুলতে গেলাম, কিন্তু ছিট্‌কিনিটা পড়ে যাওয়াতে আমি ভিতরে আটকা পড়ে গেছি। হাত বেয়ে ঝরতে লাগল কপালের ঘাম। ঘস্‌ঘস্‌ শব্দটা যেন আমার মাথাটাকেই চিরে ফেলছে। সব শক্তি হারিয়ে ফেললাম।...গাছের গুঁড়িটায় করাতটা কেটে বসে যাচ্ছে।

আবার শুনতে পেলাম ওয়েন্ডির চিৎকার—অনেক দূর থেকে। বহু শতাব্দীর চার দেওয়ালের মধ্যে আমি বন্দী, একটা ওক গাছের ভিতরে সমাহিত, একপাটি নিষ্ঠুর দাঁত এগিয়ে আসছে আমার দিকে; চোখ দুটোকে উপরে তুলে দরজার উপর চাপ দিয়ে হাঁপাতে লাগলাম। দরজার কাঠ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। শব্দায়মান ধাতুর মতো কানে বাজছে আমারই রক্তের স্রোত। চোখের মণিতে ফুল্‌কিগুলো নাচছে করাতের সাদা গুঁড়োর মতো—ধারালো করাতের উপর সূর্যরশ্মির মতো।

অনেক দূর থেকে বাতাসে ভেসে এল সুরার মদির গন্ধ। কানে এল ঘুষির শব্দ, দূরাগত চিৎকার। আমি সম্পূর্ণ বিহ্বল, কিন্তু মনে হল সেটা মারগ্রেভের কণ্ঠস্বর। পাগলের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লাফ দিলাম। হঠাৎই কাবার্ডের ছিট্‌কিনিটা ভেঙে পড়ে গেল। বেরিয়ে এলাম অন্ধকার অলিন্দে। ঝড়ের আর্তনাদ রূপান্তরিত হল গাছ কাটার শব্দে; একটা শক্তিশালী কিছুকে যেন বিদীর্ণ করা হচ্ছে।

ওকের দরজাটা সশব্দে দেওয়ালের উপর আছড়ে পড়ল। আমার কাঁধে ভয়ংকরভাবে আঘাত করল; ঘুরে দাঁড়াতেই মারগ্রেভের মুখোমুখি। বারান্দার অস্পষ্ট আলোছায়ায় কালো রেখাচিত্রের মতো টলতে টলতে সে এগিয়ে আসছে।

কাঁধে ভীষণ যন্ত্রণা; কোন কিছুই ভালভাবে বুঝতে পারছি না। কান রয়েছে ওয়েন্ডির চিৎকারের দিকে। সে চিৎকার ডিয়েকনের ঘর থেকে আসছে না, আসছে চারশ' বছরের সময় সমুদ্রের ওপার থেকে।

মারগ্রেভের সাহায্যে ভিতরের দরজাটাও খুলে ফেললাম।

মুহূর্তের জন্য অতীতের ছায়া ঘরটাকে ঢেকে দিল, কিছুই চিনতে পারছি না। সদ্যকাটা করাতের গুঁড়ো, ডালপালা ও ঘামের গন্ধে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। বাতাসের হাহাকার কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে অবস্থাটাও কমে গেল। দেখলাম, বুককেসে হেলান দিয়ে ওয়েন্ডি কাঁদছে। মারগ্রেভ ততক্ষণে তার কাছে গিয়ে গলা

জড়িয়ে ধরে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। মুখ ফেরাতেই মেঝেতে চোখ পড়ল—সন্ধ্যার আবছা আলোয় দেখলাম রক্তের স্রোতে ভাসছে লেস্‌লি ডিয়েকনের বিচূর্ণিত দেহ—যেন প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে কেউ তাকে মেরে ফেলেছে।

মারগ্রেভ ওয়েন্ডিকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্পষ্ট দেখলাম, ওয়েন্ডি খুঁড়িয়ে হাঁটছে...।

আর তখনই ডিয়েকনের রক্তাক্ত হাতের কাছে চেয়ারের নিচে পেলাম সেই একটিমাত্র ওকের বীচি যেটাকে আমি বিশ বছর ধরে আমার কাছে রেখে দিয়েছি।

আমি বিশ্বাস করি না যে বীচিটা তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে সেখানে গিয়ে পড়েছে। অশুভ শক্তিকে দূরে রাখার জন্য কোন স্মারক সঙ্গে রাখার মতো ছেলে সে নয়।

তবু অতীতের কথা ভাবতে বসলেই মনে পড়ে, আমি স্পষ্ট শুনেছিলাম মারগ্রেভ ওয়েন্ডিকে ডেকেছিল। কিন্তু সে-কথা সে অস্বীকার করেছে। দু'জনের কাউকেই আর কোন দিন আমি দেখতে পাইনি। ডিয়েকনের মৃত্যুর ছ'মাস পরেই তাদেব বিয়ে হয়েছিল। ওয়েন্ডির দৈহিক কোন ক্ষতি হয়নি, তবে যতদূর জানি সে এখনও খুঁড়িয়েই হাঁটে।...সে রাতে সেই ঘরের মধ্যে আসলে কি ঘটেছিল—কোন তদন্তেই তা প্রকাশ পায়নি। ওয়েন্ডির কথাও সকলে বেমালুম ভুলে গেছে।

নিজেকে সব সময়ই বোঝাই—আমার তো কোন দোষ ছিল না। কিন্তু হয় তো একটা অপরাধবোধ থেকেই আবার দুঃস্বপ্নটা ফিরে এসেছে। রসায়নশাস্ত্রের লেক্‌চারার হয়েই আমি এখানে ফিরে এসেছি। আর ভাগ্যেব কী নিষ্ঠুব খেলা—ডিয়েকনের সেই পুরনো ঘরটাতেই আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। ঘরটা এখনও সেইরকম অসংস্কৃত সেকেলে অবস্থাতেই আছে।

সেই বীচিটাকে রাখার আর কোন মানে হয় না। সেটাকে পুড়িয়ে নষ্ট করে দিলে হয় তো এই ভৌতিক দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তির একটা সুযোগ পেতে পারি।

কিন্তু সে বিষয়েও আমি খুব নিশ্চিন্ত নই...আগুনের শিখার মধ্যে বীচিটা পুড়ছে। বাইরের দরজায় হুড়কোটা এঁটে দিয়ে এই কাহিনী লিখছি। করাত চলার মৃদু ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ যেন শুনতে পাচ্ছি।

অনুবাদ : মণীন্দ্র দত্ত

কে জানে ?

Who knows—মপাসাঁ

হা ঈশ্বর, হা ঈশ্বর! শেষ পর্যন্ত সেই কাহিনী আমাকেই লিখতে হবে? কিন্তু আমি কি তা পারব? লিখতে সাহস করব? এত অদ্ভুত, এত দুর্বোধ্য, এত জটিল যে তাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করাই যে কষ্টকর।

আমি যা দেখেছি তা যে ভুল নয়, আমার চিন্তার মধ্যে যে কোন ভ্রান্তি নেই, ঘটনাবলীর সূক্ষ্ম আব নির্মম পর্যালোচনার ভেতরে আমার যে কোন ফাঁক নেই—এ বিষয়ে যদি আমি নিশ্চিত না হতাম তাহলে আমি ভাবতাম যে আমি যা দেখেছি তা অবাস্তব...সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি বৈক্লব্য—মরীচিকা। অথবা, তাই যে নয়, সে কথা কে-ই বা বলতে পারে?

আজ আমি বেসরকারী একটি উন্মাদ আশ্রমে। ভীতির কবলে পড়ে আমি যে স্বেচ্ছায় এখানে এসেছি সেটা আমার বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। একটি মাত্র জীবন্ত মানুষই আমার এই কাহিনী জানেন; তিনি হচ্ছেন এখানকার ডাক্তার। সেই কাহিনীই এখানে আমি লিখছি। কেন লিখছি তা আমি জানিনে। বুকের মধ্যে এ-কাহিনী গুমরে-গুমরে ওঠে; দুঃস্বপ্ন দেখার মতো আঁতকে উঠি আমি। এই কাহিনী প্রকাশ করে দিলে ভেতরটা হালকা হয়ে যাবে। সেইজন্যই এই কাহিনী আমি লিখতে বসেছি।

চিরকালই আমি লৌকিক সমাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি; মনটা আমার সর্বত্যাগী দার্শনিকের মতো। মানুষ বা ভগবান...কারও বিরুদ্ধেই আমার কোন অভিযোগ নেই; চিরকাল অল্পেতেই আমি খুশি। চিরকালই আমি নিঃসঙ্গ। মানুষের সংস্পর্শ আমার ভাল লাগে না—কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করি আমি, কেন করি, তা আমি জানিনে; বলতেও তা আমি পারব না। লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে আমার কোন আপত্তি নেই; তাদের সঙ্গে আমি গল্পও করি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হোটেলে বসে খাওয়া-দাওয়াও করি। কিন্তু ওই পর্যন্ত—বেশিক্ষণ কারও কাছে বসে থাকলেই আমার গা ঘিন-ঘিন করে; এমনকি যারা আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ তাদেরও যেন বেশিক্ষণ সহ্য করা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাদের তাড়াতাড়ি বিদায় দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠি, নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে চাই নিজেকে।

এই আকাঙ্ক্ষাটা নিছক আকাঙ্ক্ষা নয়—এটা ছিল অপ্রতিরোধ্য একটি প্রয়োজনীয়তা। যদি তাদের কাছ থেকে সরে আসতে না পারতাম, যদি আমাকে

বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে বেশিক্ষণ থাকতে হোত তাহলে মনে হোত এখনই একটা দুর্ঘটনা ঘটবে আমার। কী রকম দুর্ঘটনা ? কে জানে ? হয়ত আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ব, হ্যাঁ। হয়ত বা।

নির্জনতার ওপরে আমার এমন একটা টান ছিল যে আমার ঘরে শুয়ে কেউ ঘুমোচ্ছে এটা ভাবতেই আমার অস্বস্তি লাগত। প্যারিসে আমি থাকতে পারিনে, কারণ সেখানে থাকতে আমার অবর্ণনীয় কষ্ট হয়। মনে হয় আমার আত্মিক মৃত্যু হয়েছে। মানুষের ভিড়ে সারা শহরটাই গম গম করতে থাকে। সে শব্দের যেন বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। শহরটা যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখনও যেন সেই শব্দ বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে। জীবন্ত মানুষের আলাপের চেয়ে ঘুমন্ত মানুষের নির্বাক অস্তিত্ব আমার কাছে অনেক বেশি উপাদেয়। কেন আমাকে বিধাতা এমন করে সৃষ্টি করলেন ? কে জানে ? এর কারণটা সম্ভবত সহজ। নিজের বাইরে অন্য কারও অস্তিত্ব আমি সহ্য করতে পারতাম না।

পৃথিবীতে দ্'জাতের মান্ষ রয়েছে। একদল নির্জনতাকে আদৌ সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, নির্জনতা তাদেব বুকে পাষাণের মতো চেপে বসে— তুষার প্রবাহের মতো বিরাট একটা স্তূপ ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপরে। নির্জনতা শ্বাসরুদ্ধ করে দেয় তাদের। আর একদল রযেছে যারা নির্জনতায ফিরে পায় নিজেদের, স্বস্তিব, মুক্তিব নিশ্বাস ফেলে বাচে। আসল কথাটা হচ্ছে —এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা বাইবেব জগতে বাস করতে ভালবাসে ; আর একদল বয়েছে যারা ভালবাসে নিজেদের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে। আমি সেই দ্বিতীয জাতের।

ফলে জীবন্ত প্রাণীর চেয়ে জড়দেরই আমার ভাল লাগত বেশি। আর সেই জন্যই আমার বাড়িটাই হয়ে উঠেছিল আমার জগৎ ; আমার ঘরের আসবাবপত্র, ছোট্ট খাট অসংখ্য জিনিসের সাহচর্য আমাব কাছে বেশি কাম্য ছিল ; তারাই নির্বাক সাহচর্যে আমার নিঃসঙ্গ দিনগুলিকে ভরাট করে বেখেছিল। বাইরে থেকে দেখতে না পাওয়া যায এইভাবে ঘরেব উঠোনে একটা সুন্দর বাগান তৈরি করেছিলাম আমি। শহর থেকে কাছেই ছিল আমার বাড়ি। প্রযোজনমতো সহজেই শহরে যেতে পারতাম আমি। আমার ঘরেব চৌহদ্দী ছাড়িয়ে দবে কিচেন গার্ডেনের পাশে একটা ছোট বাড়ি ছিল। আমার চাকব বাকররা রাত্রে সেখানেই ঘুমতো। বাগানের বিরাট বিবাট গাছেব ছায়ার নিচে রাত্রির অন্ধকারেব গভীর সুপ্তিতে আমার বাড়িটা আচ্ছন্ন হয়ে আসত। অনেকক্ষণ ধরে সেই সুপ্ত উপলব্ধি করতে-করতে আমি বেশ দেরি করেই ঘুমোতে যেতাম।

সেই বিশেষ দিনটিব কথা বলছি। স্থানীয একটি থিযেটারে সে রাত্রিতে "সিগার্ড" অভিনীত হল। এত সুন্দব সঙ্গীতমুখর নাটক জীবনে আর আমি শুনিনি। মন আব প্রাণ আমার ভরে উঠেছিল একেবারে। মাথার মধ্যে সুরের সেই ঝঙ্কার নিয়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরছিলাম আমি। চোখে তখন আমার স্বপ্নের মাদকতা ; অন্ধকার ! অন্ধকার। চারপাশে অন্ধকার নেমে এসেছে আলকাতরার মতো, এত অন্ধকার যে বড রাস্তাটাও চিনতে পারা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। ফলে বারবার আমি পথ থেকে

নেমে খানার মধ্যে গিয়ে পড়ছিলাম। টোল-গেট থেকে আমার বাড়ি এক মাইলের কিছু কমই হবে; হাঁটা-পথে মিনিট কুড়ির মতো; তাও ধীরে-ধীরে হাঁটলে। রাত্রি তখন হবে একটা কি দেড়টা। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদের স্তিমিত আলো প্রহেলিকার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল চারপাশে। সেই আলোতে দূর থেকে আমার বাড়িটা দেখতে পেলাম আমি। যতই বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম, ততই কি জানি কেন—কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল আমার। চলার গতি কমিয়ে দিলাম আমি। সেই প্রাচীন অসংখ্য গাছপালার মধ্যে মনে হল আমার বাড়িটা কবরের মধ্যে চুপ করে শুয়ে রয়েছে।

গেটের দরজা খুলে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেলাম। দু'পাশে বড় বড় সাইকামোর গাছের সারি। সেগুলি পেরিয়ে গেলেই আমার বাড়ি; তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য ছায়া, ফুল আর গাছের খিলান। বাড়ির মুখে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। বিরাট একটা অস্বস্তি নেমে এল আমার উপরে। কোথাও কোন শব্দ নেই, নড়ছে না গাছের কোন পাতা। মনে মনে ভাবলাম—কী হল আমার। গত দশটি বছর ধরে এই একই ভাবে রাত্রির অন্ধকারে, বৃক্ষ-পল্লবের অন্তরাল দিয়েই তো বাড়ি ফিরেছি আমি। আমি কোনদিনই, কখনও কোন অন্ধকারে ভয় পাইনি। কোন লোক অসৎ উদ্দেশ্যে সামনে দাড়িয়ে থাকলে বিদ্যুতের বেগে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতাম না আমি। তাছাড়া, আমার হাতে রিভলবার ছিল। কিন্তু রিভলবার ছুঁলাম না আমি। মনের মধ্যে যে আতঙ্ক উঁকি দিয়ে আমাকে গ্রাস করার জন্যে এগিয়ে আসছিল তার সঙ্গে একটা মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাড়ালাম।

কিন্তু এটা কী? স্বপ্ন, মায়া, না মতিভ্রম? কী এটা? মনের মধ্যে অজানা একটা আতঙ্ক এইভাবে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে কেন? এই সেই রহস্যজনক রাত্রির প্রভাব যা ধীরে ধীরে মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে মানুষকে গ্রাস করে ফেলে। একে তো অগ্রাহ্য করা যায় না—বুদ্ধি দিয়েও বিচার করা যায় না যাকে- এইরকম উৎকট অনিবার্য একটা অনুভূতির উচ্ছ্বাস। হয়ত তাই হবে! কে জানে?

এক পা এক পা করে এগোই; আর আমার গায়ের রোঁয়াগুলি খাড়া হয়ে ওঠে। সেই বিরাট বাড়ির দেওয়ালের পাশে একটু দাঁড়ালাম। এর দরজা জানালা সব বন্ধ। দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার আগে একটু অপেক্ষা করলাম। আমার ড্রয়িংরুমের পাশে একটা জানালা। তারই পাশে বাগান। সেখানে লম্বা একটা বেঞ্চ। সেই বেঞ্চের উপরে আমি একটু বসলাম। গাছের ছায়ার দিকে তাকিয়ে দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম একটু। অস্বাভাবিক কোন কিছু প্রথম দিকে নজরে পড়েনি আমার। কানের ভেতরে কেবল ভোঁ ভোঁ করে একটা শব্দ হচ্ছিল। কিন্তু এ রকম শব্দ আমার কানে প্রায়ই হয়। মাঝে-মাঝে মনে হয় ট্রেন চলার শব্দ হচ্ছে, মনে হয় ঘড়িতে সময় জ্ঞাপক শব্দ হচ্ছে---মাঝে-মাঝে মনে হয় অনেক মানুষের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। তারপরেই সেই ভোঁ ভোঁ শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার ভুল হয়েছিল। ওই শব্দটা আমার বুক ধড়ফড়ানির শব্দ নয়; ওই শব্দটা আসছিল আমারই ঘরের ভেতর থেকে—অদ্ভুত ঘণ্ড-ঘণ্ডে জড়ানো-জড়ানো শব্দ—ঠিক কিসের শব্দ তা আমি

বুঝতে পারলাম না। ঠিক শব্দ না বলে তাকে আলোড়ন বলাই উচিৎ—অনেক জিনিস একসঙ্গে টানার শব্দ—মনে হল, কে বা কারা যেন আমার চেয়ার-টেবিল-আলমারিগুলি ধরে টানাটানি করছে।

অনেকক্ষণ ধরে নিজের কানকেই আমি যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। কিন্তু জানালার শার্সির উপরে কানটা চেপে ধরতেই বুঝলাম ঘরের ভেতরে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে। ভয় পেয়েছিলাম সত্যি কথা ; কিন্তু তার চেয়েও অবাক হয়েছিলাম অনেক বেশি। প্রয়োজন হবে না মনে করেই আমি রিভলবারটা বার করলাম না। অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোন একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারলাম না। তারপর হঠাৎ মরিয়া হয়ে দরজার তালার মধ্যে একটা চাবি ঢুকিয়ে ঘোরালাম। জোরে ধাক্কা দিলাম কপাটে।

কপাট খোলার শব্দটা শুনে মনে হল কেউ পিস্তল ছুঁড়ছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড, যেন তারই উত্তরের প্রতিবাদে দোতলা, একতলা, বাড়ির সর্বত্র তুমুল একটা হটগোল শুরু হল। সেই শব্দ এত আকস্মিক, এত ভয়ঙ্কর, এত তীব্র যে ভয় পেয়ে আমি কয়েক পা পিছু হটে গেলাম ; এবং যদিও এখনও মনে করি যে কোন প্রয়োজন ছিল না তবু সেই সময় কোমর থেকে রিভলবারটা খুলে হাতে নিয়েছিলাম।

অপেক্ষা করতেই লাগলাম আমি। কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। এতক্ষণে একটা অদ্ভুত শব্দ আমার কানে এসে লাগল —একটা অদ্ভুত ট্যাপ-ট্যাপ শব্দ সিঁড়ির উপরে হতে লাগল ; সে শব্দ জুতো বা চটি পায়ে দিয়ে চলাফেরা করার শব্দ নয় ; মনে হল, কাঠের ক্রাচ নিয়ে কে বা কারা যেন হেঁটে-হেঁটে বেড়াচ্ছে। তারপরে হঠাৎ দেখলাম আমার দরজার সামনে একটা আর্ম চেয়ার, ওই বড় চেয়ারটার উপরে বসে আমি পড়াশুনা করতাম, হেলতে-দুলতে এগিয়ে এল। তারপর বেরিয়ে গেল সোজা বাগানের দিকে। তাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে গেল আমার বসার ঘরের চেয়ারগুলি ; তারপর এগিয়ে এল কুমীরের মতো ছোট ছোট পায়ে ভর দিয়ে আমার নিচু কোচগুলি। তারপরে ছাগলের মতো লাফাতে লাফাতে এল আমার ঘরের অন্যান্য চেয়ার ; তাদের অনুসরণ করল শশকের গতিতে আমার বাড়ির টুলগুলি।

আমার মনের অবস্থাটা কী একবার ভেবে দেখুন। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে রয়েছি আমি ; আর আমার চোখের উপর দিয়ে কদম কদম এগিয়ে চলেছে আমার ঘরের আসবাবপত্রগুলি। পর-পর চলেছে- -চেহারার অনুপাতে কেউ ছুটছে, কেউ বা আবার মন্থরগতিতে। আমার বিরাট পিয়ানোটা পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে বেরিয়ে গেল ; যাওয়ার সময় সুরের আমেজ ছড়িয়ে গেল চারপাশে। ছোট ছোট জিনিসগুলো পিঁপড়ের মতো গড়িয়ে-গড়িয়ে চলতে লাগল। ঘরের পর্দাগুলি অকটোপাসের মতো শুঁড় বিস্তার করে ছুটলো। তারপরে চোখ পড়ল আমার লেখার টেবিলে। বেশ দামী, তার চেয়েও বড় কথা, আজকালকার দিনে ওরকম টেবিল একরকম দুষ্প্রাপ্য। ওর

ভেতরে আমার অনেক গোপন চিঠি রয়েছে—রযেছে আমার একান্ত গোপনীয় অনেক কাহিনী, অনেক ফটোগ্রাফও।

আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ল। চোরকে মানুষ যেমন আঁকড়ে ধরে, আমিও সেইরকম তাকে আঁকড়ে ধরলাম। সে আমাকে মাটির উপর দিয়ে ঘষড়াতে-ঘষড়াতে টেনে নিয়ে চলল। তার গতিরোধ করতে না পেরে একসময় মাটির উপরে পড়ে গেলাম আমি। তার পেছনে অন্যান্য আসাবাবপত্র যেগুলি আসছিল তারা আমার দেহের উপর দিয়ে নির্বিবাদে এগিয়ে গেল। মনে হল পরাজিত কোন সৈনিকের বুকের উপর দিয়ে বিজয়ী সেনানীরা যেন মাড়িযে মাড়িয়ে চলেছে; ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। তারপরে আবার ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, আমার চোখের উপর দিয়ে আমাব বাড়িব সমস্ত আসবাবপত্র নির্বিবাদে বাইরে বেরিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

তারপরে সেই শূন্য ঘরের মধ্যে আব একরকম শব্দ হল—বাড়ির প্রতিটি ঘরের দেওয়ালে সেই বীভৎস শব্দগুলি প্রতিধ্বনিত হল। সেই শব্দ হচ্ছে জানালা-দরজা বন্ধ কবার শব্দ। প্রচণ্ড শব্দে কে বা কারা যেন বাড়ির অজস্র জানালা-দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। সব শেষে বন্ধ হল সেই দবজাটা যেটা আমি বোকার মতো প্রথম খুলে দিয়েছিলাম।

ভয় পেয়ে শহবের দিকে দৌড় দিলাম আমি; একেবারে বড রাস্তার উপরে এসে একটা পরিচিত হোটেলে গিয়ে বেল বাজালাম আমি। হাত দিয়ে গায়ের ধূলো ঝেড়ে নিলাম; তারপরে হোটেলের মালিককে বললাম আমার ঘরের চাবিটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। তারা শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিল আমার। আমি চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে-শুয়ে সকাল হওযার অপেক্ষা করছিলাম আমি। আমার নির্দেশ ছিল সকাল হলেই যেন আমার চাকরদের জানানো হয়।

সকাল সাতটা নাগাদ আমার দরজায় টোকা পড়ল। চাকরটির মুখ তখন উত্তেজনায় কাপছে।

সে বলল—কাল রাত্রিতে ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে স্যার। বাড়ির সব আসবাবপত্র চুরি হযে গিয়েছে। একরত্তি জিনিস বলতে আর কিছু নেই।

সংবাদটা শুনে আমি খুশি হলাম। কেন? কে জানে? মুখে আমি কিন্তু কিছু প্রকাশ করলাম না; কেবল বললাম—ওই লোকগুলিই তাহলে আমার চাবি চুরি করেছিল। এখনই পুলিশে সংবাদ দেওয়া উচিত। চল, আমিও যাচ্ছি।

পাঁচ মাস ধরে পুলিশের তদন্ত চলল। চোর বা জিনিসপত্র—কোন কিছুরই হদিস হল না। হা ঈশ্বর! আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি তা যদি তাদের বলতাম তাহলে ডাকাতদের বাদ দিয়ে আমাকেই তারা গারদের মধ্যে আটকে রাখতো।

আমি চুপ করেই রইলাম। বাড়িতে আর আসবাবপত্র ঢোকাইনি আমি। কী দরকার। আবার তারা ওইভাবে একদিন পালিয়ে যাবে। ওমুখোও আর আমি হইনি।

প্যারিসের একটা হোটেলে আস্তানা নিলাম আমি। ডাক্তারকে সব খুলে বললাম। ডাক্তার আমাকে বিদেশ ভ্রমণ করার উপদেশ দিলেন। আমি বিদেশ ভ্রমণে বেরোলাম।

২

শুরু করলাম ইতালি দিয়ে। সেখানকার সূর্য আমার উপকারই করল। জেনোয়া থেকে ভেনিস, ভেনিস থেকে ফ্লোরেন্স, সেখান থেকে রোম, রোম থেকে নেপল্‌স্‌—ছ'টি মাস ধরে কেবল ঘুরতে লাগলাম আমি। তারপরে গেলাম সিসিলিতে। দেশটা গ্রীক আর নরম্যান-বিজয়ের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের প্রতীকে বোঝাই। তারপর গেলাম আফ্রিকাতে।

মার্সেলিস দিয়ে ফিরে এলাম ফ্রান্সে, দক্ষিণ ফ্রান্সের উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও মেঘলা আকাশ আমাকে যেন বিষণ্ন করে তুলেছিল। মনে হল আমার অসুখ একেবারে সারেনি। ফিরে এলাম প্যারিসে। মাসখানেকের মধ্যেই কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলাম আমি। তখন শরৎকাল, ঠিক করলাম, শীত আসার আগে আমি নরম্যান্ডির দিকে যাব। শুরু করলাম রাওয়েন দিয়ে। দেশটির চারপাশে গোথিক কীর্তিগুলি বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। সপ্তাহখানেক তাদেরই মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম আমি।

একদিন বিকাল প্রায় চারটে নাগাদ আমি একটি অদ্ভুত রাস্তার ওপরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই রাস্তার পাশ দিয়ে কালির মতো কালো জলের একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। ওখানকার বাসিন্দাবা স্রোতটির নাম দিয়েছিল "রোবেক ওয়াটাব"। তার চারপাশে পুরনো-পুরনো বাড়ি ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানেই অজস্র পুরনো আসবাবপত্র বিক্রির দোকান পর-পর সাজানো। সেগুলির দিকে হঠাৎ নজর পড়ল আমার। চারপাশে ভাঙা-চোরা টিনের দোকান, টালির ছাদ, ভাঙা ছাদ-- তাদের একপাশে গলির মধ্যে কী অপূর্ব জায়গাই না খুঁজে বার করেছে ওরা। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন দোকানগুলির মধ্যে নানান জাতীয় জিনিসপত্র, মাটি-পাথরেব মূর্তি, গির্জার অলঙ্কার, মন্দির সারি সারি সাজানো রয়েছে। কী আশ্চর্য নয়! সেই সব পরিত্যক্ত আবর্জনা---সংসারে যাদেব প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছে-- সেই সব জিনিস দিয়ে দোকানগুলি সাজানো।

এই পুরনো জিনিসের ওপরে আমার ঝোঁক চিরকালের। সেই ঝোঁকটাই হঠাৎ আমাকে ভেতরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই পচা তক্তার ওপর দিয়ে আমি স্টলের পর স্টল ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু একী! সেই পুরনো আসবাবপত্রের কবরখানার ওপরে কী দেখলাম? দেখলাম, আমার সবচেয়ে সুন্দর একটি "ওয়ার্ডরোব" চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ভয়ে হাত-পা আমার এতই কাঁপতে লাগল যে তার গায়ে যে হাত দেব সে সাহসটুকু পর্যন্ত আমি হারিয়ে ফেললাম। না; এটি আমারই। তৃতীয় লুই-এর আমলের একটি অনবদ্য বস্তু। একবার যে দেখেছে সে-ই একে চিনতে পারবে। বিস্মিত নয়নে এদিকে-ওদিকে চাইলাম। ওই...ওই যে আমার আর্ম চেয়ারগুলি; তাদের পেছনে দ্বিতীয় হেনরীর আমলের

আমার দুটি টেবিল মিট মিট করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এগুলিকে দেখার জন্যে প্যারিস থেকে মানুষ আমার বাড়িতে ছুটে আসত।

তখন আমার মনের অবস্থাটা কী একবার ভেবে দেখুন।

অন্ধকার যুগের নাইটরা যেমন বীরের মতো মায়ার রাজত্বে প্রবেশ করতেন, আমিও তেমনি বীরের মতো আসবাবপত্রের অরণ্যের মধ্যে প্রচণ্ড মানসিক বিভ্রান্তি নিয়ে ঢুকে গেলাম। হরি হরি! যত ভেতরে ঢুকে যাই ততই আমার বাড়ির পলায়মান আসবাবপত্রগুলি আমার চোখে পড়ে। আমার সব আসবাব এইখানে এসে জমেছে।

আমি সেই প্রায়ান্ধকার গ্যালারির ওপরে উঠতে লাগলাম। হ্যাঁ, সবই এখানে রয়েছে, একমাত্র আমার সেই লেখার টেবিলটা ছাড়া। তারই ভেতরে আমার চিঠিপত্র ছিল। সেটিকে আমি দেখতে পেলাম না। তাকিয়ে দেখলাম, আমি একা। কেউ কোথাও নেই। আমি চিৎকার করে ডাকলাম। কেউ সাড়া দিল না। সেই বিরাট চৌহদ্দীর মধ্যে আমি একেবারে একা।

অন্ধকার নেমে এল। আমারই একটা চেয়ারের ওপরে আমি বসে রইলাম। ঠিক করলাম ওখান থেকে নড়ব না। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ডাকি — কে হে? কে আছ?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মনে হল আমি যেন কার পায়ের শব্দ শুনলাম — খুব আস্তে আস্তে কে যেন চলাফেরা করছে। কোন দিকে তা আমি বলতে পারব না। একবার মনে হল পালিয়ে যাই। তারপরে সাহস করে আর একবার হাঁক দিলাম আমি। দেখলাম পাশের দোকানে আলো জ্বলছে।

কে যেন জিজ্ঞাসা করল — কে ওখানে?

বললাম — একজন খরিদ্দার।

এইভাবে এত দেরিতে দোকানে!

আমি একঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।

আগামী কাল আসতে পারতেন।

আগামী কাল এখান থেকে আমি চলে যাব।

আমিও এগিয়ে যেতে সাহস করলাম না, সেও সাহস করল না এগিয়ে আসতে।

বললাম — আপনি আসছেন?

আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

তার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ঘরের মাঝখানে একটা ক্ষুদে রোগা, বীতাকচ্ছার চেহারার লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। লম্বা হলদে দাড়ি, মাথায় একগাছিও চুল নেই; একটা বাতি নিয়ে আমার দিকে তাকাল। সেই আলোতে দেখলাম — তার মুখ কুঁচকে গিয়েছে, ফোলা ফোলা; তার চোখ দুটো বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না তিনটে চেয়ারের জন্যে।

ওইগুলি আমারই; দর কষাকষি করে সেইখানেই তাকে অনেকগুলি টাকা দিলাম।

নাম বললাম না; শুধু বললাম আমাব হোটেলেব ঘবেব নম্ববটি। ঠিক হল পরেব দিন সকাল ন'টাব মধ্যে সেগুলি আমাব হোটেলে সে পৌঁছে দেবে।

আমি বেবিযে এলাম। সে বেশ নম্রভাবেই দবজা পর্যন্ত আমাব সঙ্গে এগিযে এল।

বেবিযে এসে আমি সোজা পুলিশ ফাঁড়িতে গিযে সব কথা বললাম। পুলিশেব কর্তা তৎক্ষণাৎ যে বিভাগ চুবিব তদাবক কবে সে বিভাগে ব্যাপাবটা অনুসন্ধান কবাব জন্যে টেলিগ্রাম কবলেন। উত্তবেব জন্যে আমাকে একটু অপেক্ষা কবতে বললেন। ঘণ্টাখানেক পবে যে উত্তব এল তাতে আমি সন্তুষ্ট হলাম। উত্তবটি হচ্ছে—আমি এখনই লোকটাকে গ্রেপ্তাব কবিযে জিজ্ঞাসাবাদ কবতাম। কিন্তু সম্ভবত, লোকটা কোনবকম সন্দেহ কবে জিনিসপত্রগুলি নিযে কেটে পড়েছে। ঘণ্টা দুই পবে আপনি যদি নৈশ ভোজ সেবে আমাব সঙ্গে দেখা কবেন তাহলে আমি তাকে গ্রেপ্তাব কবিযে এনে আপনাব সামনেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ কবব।

নিশ্চয, নিশ্চয...ধন্যবাদ।

হোটেলে খাওযা দাওযা সেবে আমি তাব সঙ্গে যথাস্থানে হাজিব হলাম।

চীফ ইনস্‌পেক্টব আমাব জন্যে অপেক্ষা কবছিলেন। তিনি বললেন আমাব লোকবা তাকে এখনও ধবতে পাবেনি।

বলেন কী! আমাব মূর্ছা যাওযাব অবস্থা। কিন্তু তাব বাড়িটা নিশ্চয তাবা খুঁজে পেযেছে?

পেযেছে। সে যতক্ষণ না ফিবে আসে ততক্ষণ বাড়িটাব উপবে আমবা লক্ষ্য বাখব। কিন্তু লোকটা যেন উবে গিযেছে বলে মনে হচ্ছে।

উবে গিযেছে?

উবে গিযেছে। লোকটা একজন কাঠেব কাববাবী। সাধাবণত সন্ধ্যেব দিকে সে পাশেব দোকানে গল্প গুজব কবে। পাশেব দোকানদাবেব নাম উইডো বদোইন। এই বেটিও ফার্নিচাবেব ব্যবসাদাব, বেটি ভীষণ কঞ্জুস। বুড়িটা সন্ধ্যে থেকে তাকে দেখেনি সেই জন্যে তাব কোন সংবাদ সে জানে না। আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা কবতে হবে আমাদেব।

সেদিন বাত্রিতে আদৌ ঘুম হযনি আমাব। মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে আতঙ্কে উঠেছি। কিন্তু বাইবে আমাব অস্থিবতা প্রকাশ কবতে আমি চাইনি। তাব পবেব দিন সকাল দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা কবে আমি ইনসপেক্টবেব সঙ্গে দেখা কবলাম। ইনস্‌পেক্টব বললেন— সমস্ত প্রযোজনীয ব্যবস্থাই আমবা গ্রহণ কবেছি। চলুন, আমবা দু'জনে দোকানে যাই। সেখানে আপনাব জিনিস আপনি সনাক্ত কববেন।

তথাস্তু।

পুলিশ আব কামাব সঙ্গে নিযে আমবা দোকানে হাজিব হলাম। দোকান খোলা হল। কিন্তু একি, গত বাত্রিতে এইখানে আমাব আসবাবপত্রেব ভিড়ে এক পাও চলতে পাবিনি। আজ তাব একটাও নেই।

ইনস্‌পেক্টরও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। আমি বললাম—হা ঈশ্বর! লোকটার সঙ্গে জিনিসগুলিও সব উধাও হয়ে গিয়েছে।

তিনি হেসে বললেন— সত্যি কথা। গতকাল টাকা দিয়ে আপনি ভুল করেছেন। লোকটা সাবধান হয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম: গত রাত্রিতে যে সব জায়গায় আমার জিনিসগুলি ছিল আজ দেখছি সেই সব জায়গায় অন্য ফার্নিচার বোঝাই হয়ে রয়েছে। কেমন করে এ জিনিস ঘটতে পারে তা আমার মাথায় ঢুকছে না।

তিনি বললেন - এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সারা রাত ধরেই লোকটা জিনিস সরিয়েছে। যাই হোক, আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। যা করার তা আমরা তাড়াতাড়িই করছি। আমরা তার ফিরে আসার পথ বন্ধ করেছি। বদমাশটাকে ধরতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না।

হায় অশান্ত হৃদয় আমার।

আরও দিন পনের আমি রাওয়েন এ ছিলাম। লোকটা আর ফেরেনি। জীবন্ত কোন মানুষ কি তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে? ষোল দিনের দিন আমার বাগানের মালির কাছ থেকে আমি এই চিঠিটা পেলাম—

স্যার, গত রাত্রিতে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। আমাদের কথা দূরে থাক—পুলিশও পর্যন্ত হকচকিয়ে গিয়েছে। আপনার বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র ফিরে এসেছে। চুরির রাত্রিতে যেসব জিনিস ছিল তাদের সব কটি মায় ক্ষুদে জিনিসগুলি পর্যন্ত, এটা হয়েছে শুক্র শনিবার রাত্রিতে। রাস্তার মাটির উপরে দাগ দেখে মনে হয় কেউ তাদের প্রধান ফটক থেকে ঘষড়ে ঘষড়ে ভেতরে নিয়ে এসেছে আপনার ফিরে আসার দিনে। আমরা অপেক্ষা করে রয়েছি।

ইতি

ভবদীয়

ফিলিপ

না না না! আর ও বাড়িতে আমি কোনদিনই ফিরে যাব না।

চিঠি দেখে পুলিশ ইনস্‌পেক্টর বললেন— লোকটা ধূর্ত, সন্দেহ নেই। আমাদের আর কিছু করণীয় নেই এইটুকু বাইরে আমরা দেখাব। লোকটাকে শীগগিরই আমরা ধরে ফেলব।

না, লোকটাকে আজও তারা ধরতে পারেনি। আমার ভয় হচ্ছে একটা শিকারী জন্তুর মতো সে অলক্ষে আমার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

খুঁজে পাওয়া গেল না। আর তাকে পাওয়া যাবে না। আর সে তার বাড়ি ফিরে যাবে না। তাতে তার যায় আসে কি? একমাত্র আমি তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি। কিন্তু আমি তা দাঁড়াব না। না না কিছুতেই না।

যদি সে ফিরে আসে তাতেই বা কী? কেউ কি প্রমাণ করতে পারবে যে আমার ফার্নিচার তার দোকানে কোনদিন ছিল? তার বিরুদ্ধে সাক্ষী একমাত্র আমিই: আমার

কথা যে পুলিশেও বিশ্বাস করেনি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। না, না —এ জীবন আর সহ্য করা যায় না। আমি যা দেখেছি তার গোপন রহস্য আর আমি বুকের মধ্যে চেপে রাখতে পারছিনে।

একজন বেসরকারী ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমি সব খুলে বললাম। অনেকক্ষণ ধরে প্রশ্ন করে তিনি বললেন কিছুদিন আপনি এখানে থাকতে চান?

খুব চাই।

সে সামর্থ্য আপনার রয়েছে?

রয়েছে।

আলাদা ঘর আপনার দরকার?

হ্যা।

বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে চান?

মোটেই না। ওই রাওয়েনের লোকটা সেই সুযোগে প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য আমার ঘরে ঢুকে পড়তে পারে।

মাস তিনেক আমি এখানে শান্তিতে রয়েছি। আমার কেবল একটিমাত্র ভয় রয়েছে। সেটি হচ্ছে সেই পুরনো আসবাবপত্রের ব্যবসাদারটি পাগল হয়ে এইখানে আশ্রয় নেয়...কারাগারও আজকাল নিরাপদ নয়।

অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

ছায়াময়ী

An apparition মপাসাঁ

কোন একটা মামলায় সম্পত্তি পৃথকীকরণের সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করছিলাম। রু দ্য গ্রেনেল এর পুরনো বাড়িতে সন্ধ্যার সময় কয়েকজন বন্ধু মিলে জটলা করছিলাম আমরা। কথা ছিল আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই একটা সত্যি কাহিনী বলবে। তারপরে বিরাশি বছর বয়স্ক মার্কুই দে লা টুর স্যামুয়েল দাঁড়িয়ে উঠে কম্পিত স্বরে নিম্নলিখিত কাহিনীটি বললেন

আমিও কিছু আশ্চর্য কাহিনীর কথা জানি। কাহিনীগুলি এমন অদ্ভুত যে সারা জীবন ধরে তারা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ছাপ্পান্ন বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, তবু এমন একটা মাসও যায়নি যে মাসে সেই কাহিনী নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখিনি। সেদিন যে ভয়টা আমি পেয়েছিলাম সেই ভয়টা আজও আমার মন থেকে অপসৃত

হয়নি। পুরো দশটি মিনিট ধরে সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার সামনে আমি বসেছিলাম। সেই স্মৃতিটা আজও আমার মন থেকে মুছে যায়নি। হঠাৎ কোন গোলমাল শুনলেই আমার অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে, রাত্রির অন্ধকারে আবছা কিছু দেখলেই ভয়ে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠি। মোট কথা, রাত্রিতে আমি ভয় পাই।

ঘটনাটি আমাকে এতই ভয়বিহ্বল আর বিপর্যস্ত করে তুলেছিল যার কোন কারণ আমি খুঁজে পাইনি, খুঁজে পাইনি বলেই সেকথা কাউকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারব না। ঠিক যেভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল সেভাবে আমি তোমাদের কাছে বলব না, এর কোন কৈফিয়তও আমি তোমাদের দেব না। সে সময় আমি যদি উন্মাদ হয়ে না যেতাম তাহলে হয়ত ঘটনাটিকে আমি ব্যাখ্যা করতে পারতাম। কিন্তু আমি প্রমাণ করব যে আমি উন্মাদ হইনি। তোমাদের যা হচ্ছে হয় মনে করতে পার। ঘটনাটা হচ্ছে এই

১৮২। সাল মাসটা হচ্ছে জুলাই। তখন আমি রাওয়েনে চাকরি করছি। একদিন সমুদ্রের পারে বেড়াচ্ছিলাম এমন সময় একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হল। মনে হল, তাকে আমি চিনি, কিন্তু কবে আর কোথায় যে আমাদের পরিচয় হয়েছিল তা আমি মনে করতে পারলাম না। স্বাভাবিকভাবেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনিও তা লক্ষ্য করলেন, তারপরে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে।

ভদ্রলোকটি আমার যৌবনের বন্ধু। তাকে একসময় আমি খুবই ভালবাসতাম। পাঁচটা বছর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। মনে হল, এই ক'বছরের মধ্যে তিনি পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। চুল সাদা, জীর্ণের মতো তিনি কুঁজো হয়ে হাঁটছিলেন। আমাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিনি তার জীবনের কাহিনী বললেন। একটি দুর্ভাগ্য তাকে একেবারে ধরাশায়ী করেছে। একটি যুবতীর প্রেমে পড়ে তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন। বছরখানেক উন্মাদের মতো ভালবেসেছিলেন তাকে, সুখের সাগরে ভেসে দিন কাটিয়েছিলেন। তারপরে হঠাৎ হৃদরোগে যুবতীটি মারা যায় খুব সম্ভবত প্রেমের ব্যগ্রতাই সেই মৃত্যুর জন্যে কিছুটা দায়ী ছিল। স্ত্রীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেদিন শেষ হল সেইদিনই তিনি তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন, এবং রাওয়েনে তার যে নিজের বাড়ি রয়েছে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে শোকে মহ্যমান হয়ে তিনি নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন। মাঝে মাঝে শোকের উচ্ছ্বাসটা তার এত বেড়ে ওঠে যে আত্মহত্যার কথা চিন্তা না করে তিনি পারেন না।

তিনি বলে গেলেন তোমার সঙ্গে আবার যখন দেখা হয়ে গেল, তখন তুমি একটা কাজ করে দাও। কাজটা খুব জরুরী। তুমি আমার পুরনো বাসায় যাও, সেখানে আমার অর্থাৎ আমাদের শোয়ার ঘরের ডেস্ক এ আমার কয়েকটা দরকারী কাগজ পড়ে রয়েছে। সেগুলি নিয়ে এস। জিনিসটাকে গোপন রাখার প্রয়োজন রয়েছে বলেই আমিই কোন উকিল বা চাকরকে সেখানে পাঠাতে চাইনে। আমার কথা যদি বল তাহলে বলব বিশ্বের কোন কিছুর লোভেই আর আমি সেখানে যাব না। তোমাকে আমি ঘরের চাবিটা দিচ্ছি। চলে আসার সময় নিজেই আমি ঘরে তালা দিয়ে এসেছিলাম।

সেই সঙ্গে দিচ্ছি ডেস্ক এর চাবি— মালিকেও একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি। সে-ই তোমাকে দরজা খুলে দেবে। কিন্তু কাল এস, আমার সঙ্গে প্রভাতী চা খাবে। পরের ব্যবস্থাটা আমরা তখনই করে ফেলব।

এইটুকু সাহায্য আমি করব——এই বলে তাঁকে আমি আশ্বাস দিলাম। একটু বেড়িয়ে আসা ছাড়া অন্য কোন কঠিন ব্যাপার নয়। বাওয়েন থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে তাঁর পূর্বতন বাড়ি। ঘোড়ায় চড়ে সেখানে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক সময় লেগেছিল মাত্র।

পরের দিন সকাল দশটায় ব্রেকফাস্টের জন্যে আমি বন্ধুর বাসায় হাজির হলাম ; দু'জনে বসে একসঙ্গেই খেলাম, কিন্তু তিনি বিশেষ কোন কথা বললেন না। তিনি কথা না বলার জন্যে আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন——বললেন ও বাড়ির কথা মনে হতেই আমি শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়েছি। পুরনো শোকটা আবার আমার উথলে উঠেছে।

তাঁকে দেখে বেশ উত্তেজিত মনে হল। মনে হল তিনি কী যেন ভাবছেন। যেন তাঁর মনের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষ চলছে।

অবশেষে কী আমাকে করতে হবে সে সম্বন্ধে আমাকে সব বুঝিয়ে বললেন। কাজটা খুব সহজ। ডেস্ক এর ডান দিকের প্রথম ড্রয়ারে দুটো চিঠির প্যাকেট রয়েছে আর রয়েছে এক বাণ্ডিল কাগজ। সেই ড্রয়ারের চাবিটা আমাকে তিনি দিলেন। তিনি বললেন চিঠিগুলির উপরে ইচ্ছে করলে তুমি চোখ বুলাতে পার।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেলা একটার সময় আমি কাজে বেরিয়ে গেলাম।

আবহাওয়াটি বড় চমৎকার ছিল। ভরতপাখির গান শুনতে শুনতে বুটের উপর তরোয়ালের ঝংকার তুলে মাঠের উপর দিয়ে মহা আনন্দে ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগোতে লাগলাম। তারপরে আমি বনের মধ্যে ঢুকলাম ঘোড়াটিকে হাটিয়ে নিয়ে গেলাম। তাঁর পল্লীনিবাসে পৌঁছিয়ে মালির জন্যে যে চিঠিটা পকেটে ছিল সেটিকে আমি বার করলাম। অবাক হয়ে দেখলাম সেটার মুখ গলা দিয়ে জোড়া। শুধু চটিইনা, বিরক্ত হয়ে আমি ভেবেছিলাম ফিরে আসি, কিন্তু তারপরেই মনে হল এইভাবে ফিরে গেলে নিজের ভাবাবেগকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। আমার বন্ধুটি তার বর্তমান মানসিক বিপর্যয়ের জন্যই হয়ত অন্যমনস্কভাবে চাপটা এটে দিয়েছেন, আর আমি তা লক্ষ করিনি।

দেখে মনে হল, প্রায় বছর কুড়ি বাড়ীটি পরিত্যক্ত হয়েছে। গেট খোলা, এতটা ভাঙা যে ওই অবস্থায় ওটা যে কেমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা ভেবেই আমি আশ্চর্য হলাম। ভেতরে ঢোকার রাস্তাটা বড় বড় ঘাসে বোঝাই হয়ে গিয়েছে। ফুলগাছগুলিকে উঠোনের ঘাসে আর চেনা যায় না।

জানালায় জোরে ঝাকান দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাশের দরজা দিয়ে একটি বুড়ো লোক বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। চিঠিটা পেয়ে সে পড়ল, একবার নয়, বার বার, তারপরে সেটি পকেটে ঢুকিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল : কী চাই আপনার ?

আমি ছোট করে বললাম : তোমার তা জানা উচিত কারণ মনিবের নির্দেশে তুমি পড়েছ। আমি ঘরে ঢুকতে চাই।

কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেল লোকটি মানে আপনি...মেয়েটির ঘরে ঢুকবেন...

ধৈর্যচ্যুতি ঘটার যোগাড় হল আমার —এই...শোন...তুমি কি আমাকে পরীক্ষা করতে চাও ?

বিভ্রান্ত হয়ে সে আমতা-আমতা করতে লাগল— না, তা নয় স্যার। সেই থেকে, তার মৃত্যুর পর থেকে ও ঘরটা আর খোলা হয়নি।...আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন...আমি দেখে আসি...

আমি চটে উঠে থামিয়ে দিলাম তাকে, বললাম : কী বলতে চাইছ তুমি ? চাবি আমার কাছে। তুমি ঘরে ঢুকবে কী করে ?

তা হলে, স্যার, আসুন।...এছাড়া আর কিছুই বলার ছিল না তার।

বললাম : আমাকে সিঁড়িটা দেখিয়ে দিয়ে তুমি চলে যাও। আমি নিজেই ঘরে ঢোকার ব্যবস্থা করব।

কিন্তু স্যার.. মানে...বাস্তাবিক...

এবারে আমি সত্যি সত্যিই চটে উঠলাম, বললাম : এখন তুমি চুপ কর। বকবক করলে মজাটা বুঝতে পারবে।

এই বলে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলাম।

প্রথমে আমি রান্নাঘরে ঢুকে গেলাম। তারপরে ঢুকলাম দাসী ঘরে একটি ঘরে থাকত তার চাকর, আর একটি ঘরে তার স্ত্রী। তারপরে পড়ল একটি বড় হলঘর। সেখান থেকে উঠলাম সিঁড়িতে। তারপরে বন্ধুর নির্দেশিত ঘরের দরজাটাকে চিনতে পারলাম। দরজাটা সহজেই খুলে ফেললাম, তার পরে ভিতরে ঢুকলাম। ঘরটা এত অন্ধকার ছিল যে প্রথমে আমি কিছুই দেখতে পাইনি। আমি একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলাম। অনেকদিন ধরে ঘর বন্ধ থাকলে, বিশেষ করে যে ঘরের মধ্যে কেউ মারা গিয়েছে সেইরকম ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে যেরকম একটা পচা ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়, এই ঘরটির ভিতরেও সেইরকম শ্বাসরোধকারী একটা দুর্গন্ধ ছাড়ছিল। তারপরে ধীরে ধীরে অন্ধকারে আমার চোখ দুটি অভ্যস্ত হয়ে এল। সেই বিরাট অগোছালো শোওয়ার ঘরটি আমি বেশ ভাল করেই দেখতে পেলাম। দেখলাম, বিছানার ওপরে কোন চাদর পাতা নেই, কিন্তু তখনও একটা মাদুর পাতা রয়েছে, আর রয়েছে বালিশ। তার একটির উপরে বেশ গভীর একটা দাগ পড়েছে, দেখলেই মনে হবে কিছুক্ষণ আগেই কেউ যেন কনুই এর ওপরে তার মাথাটি রেখে বিশ্রাম করছিল। চেয়ারগুলি এদিকে ওদিকে ছড়ানো। একটা ছোট ঘর আমার চোখে পড়ল। তার দরজা অর্ধেকটা খোলা।

প্রথমেই আমি জানালার ধারে গেলাম, আলো ঢোকার জন্যে পাল্লাগুলো খুলে দিলাম। কিন্তু জানালার খড়খড়িগুলি অনেকদিন বন্ধ থাকার ফলে এমনি শক্ত হয়ে বসে গিয়েছিল যে সেগুলিকে কিছুতেই আমি নড়াতে পারলাম না। তরোয়ালের

খোচা দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করলাম। তাতেও কিছু হল না। তারপরে আমি যখন বিরক্ত হয়ে উঠলাম – এবং সেই আলোতেই মোটামুটি রকম সবকিছু দেখতে পারছিলাম এই ভেবে খড়খড়ি খোলার চেষ্টার পর পণ্ডশ্রম না করে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

একটা আরাম কেদারার উপরে বসে যে ড্রয়ারটির কথা বন্ধু আমাকে বলেছিল তার ডালাটা টানলাম। ড্রয়ারটা একেবারে বোঝাই হয়ে ছিল। আমার দরকার মাত্র তিনটি কাগজের প্যাকেটের। সেইগুলিই হাতড়াতে লাগলাম।

প্যাকেটগুলির উপরের লেখাগুলি পড়ার জন্য আমি যখন চোখ চিরে চিরে দেখছি হঠাৎ এমন সময় আমার মনে হল আমার পেছনে একটা যেন খস খস শব্দ হচ্ছে। বাইরের হাওয়ায় ভেতরের কোন কাগজপত্র নড়ছে এই ভেবে প্রথমে ব্যাপারটাকে আমি কিছুমাত্র গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিনি। কিন্তু দু'এক মিনিটের মধ্যেই আর একটা খসখসানি হল; এবারে খুব কাছে আর প্রায় অস্পষ্ট সে শব্দ। আমার চামড়ার ভিতর দিয়ে একটা অস্বস্তিকর কনকনে শিহরন বয়ে গেল। ব্যাপারটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনা মূর্খতা হবে ভেবে একবারও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম না আমি। তখন আমি দ্বিতীয় প্যাকেটটা পেয়েছি; এবং তৃতীয় প্যাকেটটা তুলে নেওয়ার জন্যে হাত দিয়েছি এমন সময় ঠিক আমার কাধের উপরে একটি দীর্ঘ আর করুণ যন্ত্রণাদায়ক নিঃশ্বাস এসে পড়ল। হঠাৎ পাগলের মতো এক ঝটকায় পেছনে ঘুরেই লাফ দিলাম আমি কয়েক ফুট দূরে গিয়ে দাড়ালাম। লাফ দিয়েই তরোয়ালের মাথাটা মুঠোর মধ্যে ধরে আমি দাড়ালাম ঘুরে। সত্যি কথা বলতে কি অশরীরীটি আমার ঠিক পাশেই দাড়িয়ে রয়েছে এটা অনুভব করতে না পারলে কাপুরুষের মতো আমি চো চো দৌড় দিতাম।

কী দেখলাম। একটি মহিলা দীর্ঘাঙ্গিনী সাদা ধবধব করছে তার পোশাক, যে চেয়ারের উপরে একমুহূর্ত আগে আমি বসেছিলাম, চেয়ারের পেছন থেকে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমার সারা শরীরের ভেতরে এমন একটা কাঁপুনি প্রবল যে আর একটু হলে আমি মেঝের উপরে পড়ে যেতাম। সেই ভয়ানক আতঙ্ক যে কোনদিন অনুভব করেনি তাকে আমার অবস্থাটা বোঝানো যাবে না। অথচ, সেই আতঙ্কের পিছনে কোন যুক্তি আমি খুজে পাইনি। এই অবস্থায় কোন কিছু চিন্তা করার মতো মানসিক অবস্থা মানুষের থাকে না; হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম করে; সারা শরীরটা স্পঞ্জের মতো শিথিল হয়ে যায় মনে হয় প্রাণটুকু এবারে বুঝি বেরিয়ে যাবে।

ভূত-টুতে আমি বিশ্বাস করিনে; তবু সেদিন ভূতের ভয়ে আমি আতকে উঠেছিলাম। সেদিন সেই অশরীরী আত্মাটিকে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি যে ভয় পেয়েছিলাম, ওরকম ভয় জীবনে আর কোনদিনই আমি পাইনি। সে যদি কথা না বলত তাহলে হয়তো আমি মারাই যেতাম। কিন্তু সে কথা বলল, এমন মিষ্টি সুরে বলল যে আমার হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীগুলি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। একথা আমি

বলতে পারব না যে নিজেকে সামলিয়ে নিতে পেরেছিলাম আমি। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করার শক্তিও যে ফিরে পেয়েছিলাম সে কথাও বলব না আমি। না, আমি এত ভয় পেয়েছিলাম যে কী করছি, তা আমি মোটেই বুঝতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, একটা গর্ব, সৈনিকের শেষ দম্ভ নিয়ে মুখের চেহারাটাকে আমি মোটামুটিভাবে সহজ করে রাখতে পেরেছিলাম। নিজের কাছে ভূতই হোক, অথবা কোন নারীই হোক---তার কাছে আমি যে ভয় পাইনি সেটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম। অবশ্য পরে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম; কারণ সেই মূর্তিটা দেখার পরে, আমি তোমাদের নিশ্চয় করে বলতে পারি, ওসব কথা আদৌ মনে হয়নি আমার। তখন আমি সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম।

মেয়েটি বলল---করুণ কণ্ঠে বলল---স্যার, আমার জন্যে অনেক কিছু করতে আপনি পারেন।

উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম আমি, কিন্তু মুখে কোন কথা যোগায়নি। গলার ভেতর থেকে কেবল একটা অস্পষ্ট শব্দ তালগোল পাকিয়ে বেরিয়ে এসেছিল মাত্র।

সে বলে গেল---করবেন? আপনি আমাকে বাঁচাতে পারেন; নীরোগ করতে পারেন আমাকে। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে--- ভীষণ, ভীষণ। এইভাবে বলতে-বলতে সে সেই চেয়ারের উপরে বসে পড়ল। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলল---করবেন?

তখনও আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না; কেবল ঘাড় নেড়ে বললাম---হ্যাঁ করব।

এই কথা শুনে মেয়েটি আমার সামনে কচ্ছপের খোলার একটা চিরুনি ধরে আস্তে আস্তে বলল: আমার চুলগুলি আঁচড়িয়ে দিন। তাতেই আমার অসুখ সেরে যাবে। চুল আমার আঁচড়ে দিতেই হবে আপনাকে। আমার মাথার দিকে চেয়ে দেখুন। কী কষ্টই না পাচ্ছি! এই চুলগুলিই আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

তার চুল খোলা, লম্বা, আর কালো। মনে হল চেয়ারের পেছন দিয়ে ঝুলে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়েছে। কাঁপতে কাঁপতে সেই চিরুনিটা আমি নিলামই বা কেন, আর তার সেই লম্বা কালো চুলগুলি- যেগুলি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে একটা ভীষণ ঠাণ্ডা কনকনে অবসাদ নেমে এল তা আমি বলতে পারব না। সেই অনুভূতিটা আজও আমার আঙুলের ডগায় লেগে রয়েছে। সে কথা মনে হলেই আজও আমি ভয়ে শিউরে উঠি।

কেমন করে তার সেই ঠাণ্ডা চুলগুলিকে সেদিন আমি আঁচড়েছিলাম তা আমি জানিনে। সেই চুলগুলি টেনেটুনে আঁচড়ে দিয়েছিলাম আমি, ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম জট। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে মাথা নিচু করেছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সে বেশ আনন্দ পাচ্ছে। হঠাৎ সে বলে উঠল---ধন্যবাদ। তারপর আমার হাত থেকে চিরুনিটা ছিনিয়ে নিয়ে সে পাশের ঘরে পালিয়ে গেল। আমি আগেই লক্ষ্য করেছিলাম পাশের ঘরের দরজাটা আধখোলা অবস্থায় ছিল।

একা বসে রইলাম আমি। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলে মানুষ যেভাবে চুপচাপ বসে থাকে, বেশ কয়েক সেকেন্ড আমিও সেইরকম চুপচাপ হতভম্বের মতো বসে রইলাম। অবশেষে জ্ঞান ফিরে এল আমার। জানালার ধারে দৌড়ে গেলাম আমি; জোর করে খড়খড়িগুলো খুলে দিলাম। ঘরের মধ্যে একঝলক আলো ঢুকে গেল, সেই দরজার সামনে হাজির হলাম। দেখলাম কপাট তার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাকে খোলার সাধ্য আমার নেই।

তারপরে আকস্মিক একটা আতঙ্কের মতো দৌড়ে পালিয়ে আসার একটা উন্মাদ বাসনা আমার ওপরে ভর করে বসল; যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা জানে এ আতঙ্ক কী জিনিস। ডেস্কের ওপরে কাগজের যে তিনটে প্যাকেট পড়েছিল সেগুলি তুলে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম আমি, চারটে করে সিঁড়ির ধাপ এক একটা লাফে পেরিয়ে এলাম, কেমন করে যে শেষ পর্যন্ত বাইরে বেরিয়ে এলাম তা আমি জানিনে। ঘোড়াটা আমার একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সোজা তার ওপরে লাফিয়ে পড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

পুরো একটা ঘণ্টা ধরে আমি কেবলই ভাবতে লাগলাম সত্যিই কি আমি দেখেছি! আমার স্নায়ুগুলি দুর্বোধ্য কোন আতঙ্কে যে দুর্বল হয়ে পড়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানসিক দুর্বলতার ফলেই মাঝে মাঝে আমরা অলৌকিক বস্তু দেখতে পাই, এই অলৌকিক ঘটনার মূলে রয়েছে অতিপ্রাকৃত কোন শক্তি।

জানালার কাছে এসে আমার মনে হল হয়ত আমি কোন অবাস্তব ছায়াই দেখেছি । তারপরেই হঠাৎ আমার বুকের দিকে লক্ষ্য পড়ল। আমার সামরিক পোশাক চুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। মেয়েদের লম্বা চুল আমার গলার বোতামে আটকে রয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে একটি একটি করে খুঁটে সেগুলি আমি বাইরে ফেলে দিলাম।

তারপরে আমি আর্দালীকে ডাকলাম। বিগত কয়েকটি ঘণ্টায় আমি এতই বিব্রত হয়ে ছিলাম যে তখনই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা করার মতো মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। তাকে আমার কী বলা উচিত সে বিষয়েও কিছু চিন্তা করার ছিল আমার। আর্দালীর হাতে বন্ধুটিকে তার চিঠিগুলি পাঠিয়ে দিলাম। বন্ধুটি সেনানীর হাতে প্রাপ্তিস্বীকারও করেছিলেন। বিশেষ করে আমার কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাকে। সেনানীটি তাঁকে বলেছিল যে রোদে আমার মাথা ধরেছে— আমি অসুস্থ। সংবাদটা পেয়ে তাঁকে আমার সম্বন্ধে বেশ উদ্বিগ্ন হতে দেখা গিয়েছিল। পরের দিন প্রভাতে সত্য কথাটা বলার অভিপ্রায় নিয়ে আমি তাঁর বাসায় গেলাম। শুনলাম আগের দিন সন্ধেবেলাতেই তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন- তখনও ফেরেননি। সেদিন আবার গেলাম। তখনও তিনি ফেরেননি। এক সপ্তাহ আমি অপেক্ষা করলাম —তখনও তিনি নিরুদ্দেশ। ব্যাপারটা আমি কর্তৃপক্ষদের জানালাম। অনুসন্ধান করার জন্যে দল বেরোল; কিন্তু তাঁর কোন চিহ্ন কেউ পেল না—-রা, কী ভাবে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন সে বিষয়েও কেউ কিছু জানে না।

বন্ধুর পরিত্যক্ত সেই গ্রাম্য বাড়িটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা হল।

সন্দেহজনক কোন কিছুই চোখে পড়ল না। সেখানে যে কোন মহিলাকে আটকে রাখা হয়েছে তারও কোন নিদর্শন পাওয়া গেল না।

অনুসন্ধানে কিছু পাওয়া গেল না দেখে অনুসন্ধান বন্ধ করে দেওয়া হল। পরের ছাপ্পান্ন বছর ধরে আর কিছু শুনিনি আমি। আমি আগেও যা জানতাম আজও তাই জানি —তার বেশি নয়।

অনুবাদ : সুনীলকুমার ঘোষ

একটি ভূতের গল্প

A Ghost Story মার্ক টোয়েন

ব্রডওয়ে ধরে অনেকদূর গিয়ে একটা প্রকাণ্ড পুরনো বাড়ির একটা বড় ঘর আমি নিয়েছিলাম। আমি আসবার অনেক বছর আগ থেকেই বাড়িটার উপরের তলাগুলো সম্পূর্ণ খালি পড়েছিল। বাড়িটাকে যেন ধুলো আর মাকড়শার জাল, নির্জনতা ও নীরবতার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম যেদিন সিঁড়ি বেয়ে আমার ঘরে উঠলাম, মনে হল আমি বুঝি গোরস্থানের ভিতর দিয়ে মৃত ব্যক্তিদের গোপনতাকে আক্রমণ করতে চলেছি। জীবনে এই প্রথম এতটা কুসংস্কারগত ভয় আমাকে পেয়ে বসল, সিঁড়ির একটা অন্ধকার কোণে মোড় নিতেই একটা অদৃশ্য মাকড়শার জালের সূক্ষ্ম তন্তুগুলো যখন আমার মুখের উপর ঝুলে পড়ে সেখানে লেগে রইল, তখন আমি যেন ভূত দেখার মতো শিউরে উঠলাম।

ঘরের ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সেই উপচ্ছায়া ও অন্ধকারকে বিদায় করে তবে স্বস্তি পেলাম। চুল্লিতে আরামপ্রদ আগুন জ্বলছিল, আরামের নিঃশ্বাস ফেলে তার সামনে বসে পড়লাম। দু'ঘণ্টা সেখানে বসে অতীতের কথা ভাবতে লাগলাম, মনে পড়ল অতীতের দৃশ্য, অতীতের কুয়াশা ভেদ করে ফুটে উঠল কত আধ ভোলা মুখ, কল্পনায় শুনতে পেলাম সেই সব কণ্ঠস্বর যা অনেকদিন আগেই চিরকালের মতো নীরব হয়ে গেছে, আর সেই সব পরিচিত গান যা এখন আর কেউ গায় না। আমার জাগ্রত স্বপ্ন যখন ধীরে ধীরে করুণ থেকে করুণতর সুরে নেমে গেল, তখন বাইরের ঝড়ের হাহাকার পরিণত হল মৃদু বিলাপে, জানালার কাচের উপরে বৃষ্টির ক্রুদ্ধ আঘাত অস্ফুট মৃদু শব্দে পরিণত হল, রাস্তার সব শব্দ একে একে থেমে এল এবং সর্বশেষ বিলম্বিত পথিকের দ্রুত পদশব্দও দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল, কোথাও একটি শব্দও রইল না।

আগুনটা নিভে আসছে। একটা নির্জনতাবোধ যেন আমাকে জড়িয়ে ধরছে। উঠে পোশাক ছাড়লাম, ঘরের মধ্যে চলাফেরা করলাম পা টিপে টিপে, যা কিছু করছি সবই চুপে চুপে, যেন আমার চারপাশে এমন সব শত্রুরা ঘুমিয়ে আছে যাদের ঘুম ভাঙলে মারাত্মক বিপদ ঘটবে। বিছানায় শুয়ে পড়লাম, শুয়ে শুয়ে বৃষ্টির শব্দ, বাতাসের গর্জন, অনেক দূরের সব জানালা বন্ধ করার অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে শুনতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

গভীর ঘুমই ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম তা জানি না, হঠাৎ দেখি ঘুম ভেঙে গেছে। আর একটা রোমহর্ষক প্রত্যাশায় বুকটা ভরে উঠেছে। চারদিক স্তব্ধ। শুধু আমার বুকের ভিতরটা ছাড়া —সেখানে হৃদস্পন্দনের শব্দ হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিছানার চাদরগুলো পায়ের দিকে নেমে যেতে লাগল, যেন কেউ সেগুলিকে ধরে টানছে! আমি নড়তে পারছি না, কথা বলতে পারছি না। কম্বলগুলো তখনও নেমে যাচ্ছে, আমার বুক পর্যন্ত খোলা হয়ে পড়ল। তখন অনেক চেষ্টায় সেটাকে চেপে ধরে মাথার উপর পর্যন্ত টেনে দিলাম। অপেক্ষা করে রইলাম, কান পাতলাম। অপেক্ষা করেই আছি। আবার সেই টান শুরু হল, একশ' সেকেন্ড ধরে আবার আমি জড়বৎ পড়ে রইলাম, শেষ পর্যন্ত আবার আমার বুক পর্যন্ত খোলা হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত শক্তি সঞ্চয় করে কম্বলটাকে যথাস্থানে টেনে এনে শক্ত হাতে চেপে ধরে রইলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম। আবার একটা আলতো টান অনুভব করলাম, সঙ্গে সঙ্গে মুঠোটাও শক্ত করলাম। আলতো টান ক্রমে জোরদার হতে লাগল আরও, আরও জোরদার হল। আমার হাত থেকে খসে গিয়ে এই তৃতীয়বার কম্বলটা পড়ে গেল আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। বিছানার পায়ের দিক থেকে জবাবে আর একটা আর্তনাদ উঠল। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল। আমি তখন যেটুকু বেঁচে আছি, মরে গেছি তার চাইতে বেশি ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে ভারী পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম— মনে হল, একটা হাতির পা মানুষের পায়ের মতো মোটেই নয়। তবে শব্দটা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এই যা ভরসা। শুনতে পেলাম, শব্দটা দরজার কাছে গেল, হুড়কো বা তালা না খুলেই বেরিয়ে গেল, দালান ও কড়িকাঠ নাড়াতে নাড়াতে দালান পার হয়ে গেল আবার সেই স্তব্ধতা নেমে এল।

উত্তেজনা প্রশমিত হলে নিজে নিজেই বললাম, "এটা স্বপ্ন— একটা বীভৎস স্বপ্নমাত্র।" এই কথা ভাবতে ভাবতে একসময় দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে সত্যি এটা স্বপ্নই ছিল, তখন একটা সুখকর হাসিতে আমার ঠোঁট দুটি ভরে উঠল, আবার খুশি হয়ে উঠলাম। উঠে একটা আলো জ্বালালাম, হুড়কো ও তালা যেমন ছিল তেমনি আছে, আর একটা স্বস্তির হাসি বুকের মধ্যে উথলে উঠে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ল, পাইপটা তুলে নিয়ে ধরালাম। তারপর আগুনের সামনে বসবার উপক্রম করতেই —আমার কাঁপা আঙুলের ফাঁক দিয়ে পাইপটা নিচে পড়ে গেল, গাল থেকে উবে গেল সব রক্ত, আতঙ্কে উঠতেই আমার শান্ত শ্বাস প্রশ্বাসও থেমে গেল! অগ্নিকুণ্ডের পাশে ছাইয়ের উপর আমার পায়ের ছাপের পাশাপাশি আর একটা

পায়ের ছাপ — ছাপটা এত বড় যে তার তুলনায় আমার পায়ের ছাপটা যেন কোন শিশুর। তাহলে সত্যি অতিথি এসেছিল, আর রাত্রির পায়ের শব্দের ব্যাপারটাও বোঝা গেল।

আলো নিভিয়ে দিয়ে ভয়ে অবশ দেহ নিয়ে বিছানায় ফিরে গেলাম। বহুক্ষণ ধরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কান পেতে রইলাম। মেঝের উপর দিয়ে কোন ভারী দেহকে টেনে নেবার মতো একটা ঘস্ ঘস্ আওয়াজ মাথার উপরে শুনতে পেলাম; তারপর দেহটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল, আর তার ধাক্কায় আমার জানালাগুলো কেঁপে উঠল। বাড়িটার দূরবর্তী অংশগুলোতে সশব্দে দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেলাম, কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম। চুপিচুপি পায়ে কেউ যেন দালান দিয়ে ভিতরে ঢুকছে, আর বেরিয়ে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে উঠছে আর নামছে। কখনও বা সেই শব্দ আমার দরজার কাছে এসে একটু ইতস্তত করে আবার চলে যাচ্ছে। দূরবর্তী দালান পথে শিকলের অস্পষ্ট ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনতে পেলাম, কান পাতলাম, ঝন্ ঝন্ শব্দ কখনও নেমে আসছে, কখনও শ্রান্ত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, অপদেবতার প্রতিটি পদক্ষেপের তালে তালে সজোরে শিকলের ঝন্ ঝন শব্দ হচ্ছে। কিছু অস্পষ্ট কথাও কানে এল, অর্ধ উচ্চারিত কিছু আতঙ্ক দিয়ে যেন জোর করে স্তব্ধ করে দেওয়া হল, অদৃশ্য পোশাকের খস খস শব্দ, অদৃশ্য পাখার শোঁ শোঁ শব্দ। তখন মনে হল, কে যেন আমার নিভৃতিকে আক্রমণ করছে — এখানে আমি একা নই। আমার বিছানাকে ঘিরে দীর্ঘশ্বাস ও শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ, রহস্যময় ফিসফিস কথা। ঠিক মাথার উপরে দেখতে পাচ্ছি সিলিং এর গায়ে নরম প্রস্ফুরক আলোর তিনটি ছোট বৃত্ত, মুহূর্তকাল সেখানে জ্বলতে জ্বলতে ঝুলে রইল, তারপর নিচে পড়ে গেল — দুটো আমার মুখের উপর, আর একটা বালিশের উপর। তরল পদার্থের মতো চটচট করতে লাগল, জমে গেল। আমার মন বলল, সেগুলো রক্তের ফোঁটা — আলো জ্বালিয়ে সেগুলো দেখার দরকারও বোধ করলাম না। তারপরই দেখলাম কতকগুলি উজ্জ্বল পাণ্ডুর মুখ, উপরে তোলা সাদা হাত, বিদেহী অবস্থায় বাতাসে ভাসছে, তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল। ফিসফিসানি, সব কণ্ঠস্বর, সব শব্দ থেমে গেল। নেমে এল নিস্তব্ধতা। কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। মনে হল, আলো দেখতে না পেলে আমি মরে যাব, ভয় আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। মুখের উপর একটা চটচটে রক্তের ছোঁয়া লাগল। আমার সব শক্তি নিমেষে উধাও হয়ে গেল, আহত পশুর মতো বিছানায় পড়ে গেলাম। তখন পোশাকের খস্খস্ শব্দ শুনতে পেলাম — মনে হল সেটা দরজার ভিতর দিয়ে বাইরে চলে গেল।

আবার সব কিছু শান্ত হলে পর, দুর্বল দেহ নিয়ে গুঁড়ি মেরে বিছানা থেকে নামলাম, গ্যাসটা জ্বালতে হাত কাঁপতে লাগল একশ' বছরের বুড়োর মতো। আলো দেখে মনে কিছুটা বল ফিরে এল। আসনে বসে ছাইয়ের উপরকার বড় বড় পায়ের ছাপের কথাও যেন স্বপ্নের ঘোরে ভাবতে লাগলাম। দেখতে দেখতে সবকিছু কেমন ঝাপসা হয়ে এল। চোখ তুলে তাকালাম, গ্যাসের আলোও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে

আসছে। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার সেই হাত্তির পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। সেটা আসছে—কাছে, আরও কাছে, ছাতা-পরা হল-ঘর পেরিয়ে ; সেটা যত কাছে আসছে ঘরের আলো ততই ম্লান হতে ম্লানতর হচ্ছে। পায়ের শব্দ আমার দরজার কাছে এসে থামল—আলো কমতে কমতে একটা ঈষৎ নীল রঙে রূপান্তরিত হল ; আমার চারপাশে সব কিছু যেন একটা ভৌতিক গোধূলির আলোয় আচ্ছন্ন। দরজা খোলেনি, অথচ বাতাসের একটা মৃদু ঝলক এসে আমার গালে লাগল ; আমার সামনে এসে দাঁড়াল একটা প্রকাণ্ড ধোঁয়াটে দেহ। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকে দেখতে লাগলাম। একটা পাণ্ডুর আভা জিনিসটার উপরে ছড়িয়ে পড়ল ; ধীরে ধীরে সেই ধোঁয়া আকার গ্রহণ করল—একটা হাত দেখা দিল, তারপর দুটি পা, তারপর শরীর এবং সকলের শেষে বাষ্পের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একখানি বিষণ্ন মুখ। জালের বাসা থেকে মুক্ত হয়ে মহামান্য "কার্ডিফ্ দানব" তার পেশীবহুল সুন্দর উলঙ্গ দেহ নিয়ে আমার মাথার উপরে দেখা দিল।

আমার সব দুঃখ অন্তর্হিত হল—কারণ একটি শিশুও জানে যে এই সদয় মুখ কারও কোন ক্ষতি করতে পারে না। আমার মনের খুশির ভাব তৎক্ষণাৎ ফিরে এল, আর তার সঙ্গে মিল রেখেই বুঝি গ্যাসের আলোটা আবার উজ্জ্বল দীপ্তিতে জ্বলে উঠল। এই দানব বন্ধুটিকে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে আমি যত খুশি হলাম, কোন নির্জন সমাজ পরিত্যক্ত মানুষই মানুষের সঙ্গলাভ করে তত খুশি হয় না।

"আরে এ সব তুমি ছাড়া কেউ নয়? তুমি কি জান, দু'তিন ঘণ্টা ধরে আমি ভয়ে মরতে বসেছিলাম? তোমাকে দেখে সত্যি খুব ভাল লাগছে। আহা, একটা এমন চেয়ার যদি থাকত—এখানে, ওটার মধ্যে বসতে চেষ্টা করো না!"

কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি বাধা দেবার আগেই সে ওটার মধ্যে ঢুকতেই ওটা সবেগে নিচে নেমে গেল—জীবনে কখনও একটা চেয়ারকে ওভাবে খান্‌খান্ হয়ে ভেঙে যেতে আমি দেখিনি।

"থাম, থাম, তুমি তো সব কিছু ধ্বংস—"

আবার অনেক দেরি। আবার একটা শব্দ, আর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চেয়ার ভেঙে খান্-খান্।

"কী আশ্চর্য! তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই? তুমি কি এখানকার সব আসবাবপত্র ভেঙে ফেলতে চাও? এখানে, এখানে, ওরে কাঠ মুখ্খু—"

কিন্তু সবই বৃথা। আমি ধরে ফেলবার আগেই সে বিছানার উপর বসে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা একটা শোচনীয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল।

"আচ্ছা, এটা কি রকম আচরণ তোমার? প্রথমে তো ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে একগাদা ভবঘুরে ভূতকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে ভয়ে আধ মরা করে ফেললে ; তারপরে এমন অশালীন পোশাক পরে এলে যা একমাত্র সম্ভ্রান্ত রঙ্গমঞ্চ ছাড়া অন্য কোন সভ্য সমাজই বরদাস্ত করত না, এমনকি ঐ উলঙ্গবাহার বেশ যদি তোমার জাতির হত তাহলে সেটাও তারা বরদাস্ত করত না, তবু যাহোক করে আমি যেই সেটাকেও

মেনে নিলাম অমনিই তুমি তার প্রতিদানে বসবার মতো যে আসবাব পাচ্ছ সেটাকেই ভেঙে চুরমার করে ফেলছ? কেন এ রকম করছ, যেমন নিজের ক্ষতি করছ, তেমনই আমারও ক্ষতি করছ। তোমার শিরদাঁড়ার শেষ প্রান্তটা ভেঙেছে; জংঘাস্থিটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে এমনভাবে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে যে, একটা শ্বেত পাথরের উঠোনের মতো দেখাচ্ছে। এর জন্য তোমার যে লজ্জিত হওয়া উচিত—সেটা বুঝবার মতো বয়স তোমার হয়েছে।"

"আচ্ছা, আর কোন আসবাব ভাঙব না। কিন্তু আমি বা কি করব? একটা শতাব্দী ধরে একটু বসবার ফুরসৎ পেলাম না।" তার চোখে জল এসে গেল।

আমি বললাম, "আহা বাছারে, তোমার প্রতি এতটা কঠোর হওয়া আমার উচিত হয়নি। হাজার হোক, তোমার বাপ মা নেই। তবে এখানে মেঝেতে বস—আর কোন কিছুই তো তোমার ভার সইবে না— আর তাছাড়া, মাথার উপরে ওখানে বসে থাকলে তো তোমার সঙ্গে আমরা মিশতে পারব না, তাই আমার ইচ্ছা তুমি এখানে নিচে বস, তাহলেই ঐ উঁচু টুলটার উপরে উঠে আমি তোমার মুখোমুখি বসে গল্প করতে পারব।"

সে মেঝেতে বসে পড়ল। আমার দেওয়া চুরুট ধরিয়ে, আমার কম্বলটা গলায় জড়িয়ে নিল এবং আমার স্নানের গামলাটাকে উল্টো করে শিরস্ত্রাণের মতো মাথায় চাপিয়ে নিজেকে একটি দেখবার মতো আরামদায়ক জীব করে তুলল। তারপর হাঁটু দুটো ভেঙে তার মৌচাকের মতো গর্তওয়ালা অদ্ভুত পায়ের পাতা দুটোকে গরম করবার জন্য আগুনের দিকে মেলে ধরল।

"তোমার পায়ের পাতা ও পায়ের পিছন দিকটা ওরকম গর্ত আর কাটা কাটা কেন?"

"ও তো নারকীয় শীতের ফাটা— নিউয়েল-এর গোলাবাড়িতে বিশ্রাম করতে গিয়ে মাথার পিছন দিকটা পর্যন্ত সবটা শরীর ঐভাবে ফেটে গেছে। তবু জায়গাটা আমার খুব পছন্দ; লোকে যেমন নিজের পুরনো বাড়ি ভালবাসে, আমিও তেমনই ওই জায়গাটাকে ভালবাসি। সেখানে থেকে যে শান্তি পাই তেমন শান্তি আর কোথাও নেই।"

এইভাবে আধ ঘণ্টা গল্প করবার পরে আমার মনে হল তাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সেও সেই কথাই বলল।

"ক্লান্ত? তা হবে। এবার তোমাকে সব কথা বলব, কারণ তুমি আমার সঙ্গে বড় ভাল ব্যবহার করেছ। রাস্তার ওপাশে যাদুঘরে যে "প্রস্তরীভূত মানুষ"টি আছে, আমি তারই আত্মা। আমি "কার্ডিফ দানব" এর ভূত। ওই দেহটিকে যতদিন কবর না দিচ্ছে ততদিন আমার বিশ্রাম নেই। মানুষ যাতে আমার এই মনোবাসনা পূরণ করে সেজন্য আমার কি করা স্বাভাবিক বল? ভয় দেখিয়ে তাদের এ কাজে বাধ্য করা—দেহটা যেখানে আছে সেখানেই ভর করা! তাই তো রাতের পর রাত আমি যাদুঘরের উপর ভর করেছি। অন্য সব ভূতদের সাহায্যই আমি পেয়েছি। কিন্তু তাতে

কোন কাজ হল না। কাবণ মাঝবাতে কেউ যাদুঘবে আসে না। তখন মনে হল, পথেব মাঝখানে এসে এই জাযগাটাতে একটু ভব কবলে মন্দ হয না। মনে হল, আমাব কথাগুলি যদি কাউকে শোনাতে পাবি, তাহলেহ কাজ ফতে কবতে পাবব, কাবণ পবলোকে এসে আমি খুব ভাল সঙ্গীসাথী পেযেছি। বাতেব পব বাত আমবা এই ছাতা পবা হল ঘবেব মধ্যে কাপতে কাপতে ঘুবে বেডিযেছি, পাযেব শিকল টেনে টেনে চলেছি, আর্তনাদ কবেছি, ফিস ফিস্ কবে কথা বলেছি, সিডি দিযে উঠেছি আব নেমেছি, আব তাতেই বড ক্লান্ত হযে পডেছি। কিন্তু আজ বাতে যখন তোমাব ঘবে আলো দেখতে পেলাম, তখন নতুন উদ্যম নিযে নবীন উৎসাহে কাজে নেমে পডলাম। কিন্তু আমি বড ক্লান্ত শ্রান্তিতে একেবাবেই ভেঙে পডেছি। তোমাকে মিনতি কবছি, আমাকে কিছুটা আশা দাও।"

উত্তেজনায আমাব আসন থেকে ছিটকে পডে আমি চেঁচিযে বলে উঠলাম: "এ যে ভযংকব বাডাবাডি। এবকমটা তো কখনও ঘটেনি! আবে ভুল সর্বস্ব বুডো জীবাত্মা, তোমাব সব পবিশ্রম যে জলে গেছে তুমি তো ভব কবেছ তোমাব একটা প্লাস্টাবেব মূর্তিব উপব আসল "কার্ডিফ দানব" তো বযেছে আলবানী তে*, এমন ভুলটি কবলে তুমি! তোমাব নিজেব দেহাবশেষবেও চিনলে না!"

কাবও মুখে এতখানি লজ্জা ও শোচনীয অপমানেব দৃষ্টি আমি আগে কখনও দেখিনি।

প্রস্তবীভূত মানুষটা ধীবে ধীবে উঠে দাডাল, বলল

"ঠিক কবে বল তো, একথা সত্যি?"

"আমি যেমন এখানে বসে আছি ঠিক তেমনি সত্যি।"

সে তাব পাইপটা নিযে সে ম্যান্টেল এব উপব বাখল, একমুহূর্ত ইতস্তত কবে (পুবনো অভ্যাসমতো নিজেব অজান্তেই যেখানে প্যান্টেব পকেট থাকবাব কথা সেখানে হাত দুটো ঢুকিযে দিল) এবং শেষ পর্যন্ত বলল

"দেখ, এত অদ্ভুত আমাব কখনও লাগেনি। "প্রস্তবীভূত মানুষ" সবাইকে প্রতাবিত কবেছে, কিন্তু এবাব দেখছি তাব নিচ ধাপ্পাবাজি এতদূব নেমে গেছে যে শেষ পর্যন্ত তা নিজেব প্রেতাত্মাকেও প্রতাবিত কবে দিযেছে। দেখ বাপু, আমাব মতো একটি অসহায বন্ধুহীন প্রেতাত্মাব জন্য তোমাব হৃদযে যদি এতটুকু কৰুণা থাকে তাহলে আজকেব এই ঘটনা কখনও প্রকাশ কবো না। ভাব তো, নিজে যদি নিজেকে এভাবে বোকা বানাতে তবে তোমাব মনেব ভাবটা কি হত।"

তাব বাজকীয পদশব্দ এক ধাপ এক ধাপ কবে সিঁডি দিযে নেমে পবিত্যক্ত বাজপথে মিলিযে গেল। বেচাবা! সে চলে যাওযাতে আমাব দুঃখ হল আবও দুঃখ হল এই জন্য যে সে আমাব লাল কম্বল ও স্নানেব গামলাটাও সঙ্গে নিযে গেছে।

— অনুবাদ: মণীন্দ্র দত্ত

*এটা ঘটনা। এই নকল মূর্তিটা থেকে সুকৌশলে আব একটা নকল মূর্তি তৈবী কবে সেটাকেই "একমাত্র আসল" কার্ডিফ দানব হিসাবে নিউ ইযর্ক এ প্রদর্শিত হযেছিল, আব ঠিক সেই একই সমযে আলবানীব যাদুঘবেও সে মূর্তি প্রচুব দর্শক আকর্ষণ কবেছিল।

কঙ্কাল

The Skeleton   আলফ্রেড হিচকক

আগেই বলে রাখা ভাল যে আমি কোন ভূতের গল্প বলছি না আপনাদের কাছে। আমি নিজেই যে ভূত আছে বলে বিশ্বাস করি না। আমার কথা শুনে ভাবছেন – কি বলে লোকটা! ভূতের গল্প বলছে অথচ ভূত যে আছে তা বিশ্বাস করে না। বেশ তবে শুনুন গল্পটা।

এই গল্পের শুরু বন্দরনগরী লাসম্পেজিয়াতে।

বড় অদ্ভুতভাবে মিউজিয়মে কাঠের তৈরি একটি নারীমূর্তি স্থান পায়।

কাঠের তৈরি অষ্টাদশী নগরের সকলেরই কৌতূহলের বস্তু। এই মূর্তিটিরই নাম অ্যাটলান্টা। অ্যাটলান্টা কিন্তু ইটালির তৈরি নয়। কোন এক জাহাজ একে নিয়ে আসে এই বন্দরে।

এই মিউজিয়মের কিউরেটর যুবক পল স্মিথ কিন্তু ভালবাসে এই অ্যাটলান্টাকে। তাকে ছাড়া যুবকের চলে না সে যেন তার ধ্যান জ্ঞান। বন্ধুরা তাকে এ নিয়ে ঠাট্টা করে, কিন্তু সরলপ্রাণ স্মিথ এর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

অনেকে অনেকভাবে লেখার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে কিন্তু আমার সংগ্রহের লক্ষ্যবস্তু মিউজিয়ম। সেখানে আমি নিয়মিত যেতাম, তাই স্বাভাবিক কারণেই স্মিথ আমার বিশেষ পরিচিত। আমি অবাক হয়ে দেখতাম স্মিথ সেই কাঠের তৈরি সুন্দরীর দিকে একমনে তাকিয়ে আছে যেন পলক পড়ছে না।

একদিন তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, বন্ধু, অমনমন একাগ্রচিত্তে কি দেখেন বলবেন কি? অনেক দিন থেকেই দেখছি, আজ আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। কি পেয়েছেন এর মধ্যে একটা কাঠের পুতুল বৈ তো নয়। মানছি দেখতে খুবই সুন্দরী তন্বী তরুণী।

মিঃ স্মিথ বললেন, জানেন, সকলে ভাবে হয় আমি পাগল, আর তা না হলে...জানেন, আমি সব জানতে পারি। অজ থেকে অনেকদিন আগে যা ঘটেছে তা সব আমার জানা

আমি অবিশ্বাসের ভাব দেখাই।

মিঃ স্মিথ বললেন, আপনি ভাবছেন, এ আবার কোন্ পাগলের পাল্লায় পড়লাম। কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করতে পারেন। শুনুন আমার অতীত কাহিনী।

সে আজ থেকে অনেকদিন আগেকাব কথা। ১৩ই অক্টোবব ১৭৭৪ সন। সবে বিয়ে কবেছি, নবযৌবনা সুন্দবী বউ পেলে একজন যুবকেব যে অবস্থা হয। আনন্দে, খুশিতে হাবুডুবু খাচ্ছি আমি আব সেই সঙ্গে আমাব বউও—নাম তাব অ্যাটলান্টা।

বিযেব কয়েক মাস পবেই সমুদ্রযাত্রায বেবিযে পডলাম দু'জনে। চলতে চলতে এসে পডলাম পাবস্য উপসাগবেব তীবে। সেখানেই ঘটলো মর্মান্তিক ঘটনা। ভগবান বুঝি বেশিদিন সুখ লেখে নাই আমাদেব কপালে।

সমুদ্রে ঘুবতে ঘুবতে আমবা তখন হাপিযে উঠেছিলাম। তাই বনপথ দিযে দু'জনে হাত ধবাধবি কবে হাঁটছিলাম।

হঠাৎ চিৎকাব কবে উঠলো অ্যাটলান্টা। কিছু বোঝবাব আগেই সে পডে গেল মাটিতে।

আমাব তখন সাধাবণ বুদ্ধি লোপ পেযেছে। নিজেকে সামলে নিযে চেযে দেখি সব শেষ। অ্যাটলান্টা আমাকে ছেডে চিবজীবনেব মতো চলে গেছে।

আমি ওকে বুকেব মধ্যে জডিযে ধবে অনেক কাঁদলাম। কিন্তু কাদলেই তো আব মৃত মানুষ ফিবে আসে না। আমাব অ্যাটলান্টাও আব ফিবে এল না।

অ্যাটলান্টাকে নিযে দেশেব দিবে বওনা হলাম। মিশবে গিযে তাব কাঠেব মমি তৈবি কবে ফিবে আসি এখানে। তাবপব আবাব জন্ম নিযে আমি হযেছি পল স্মিথ। এইভাবেই নতুন নতুন জন্ম নিযে আমাব অ্যাটলান্টাকে আগলে বাখি। তাকে না দেখে আমি থাকতে পাবি না। আপনিই বলুন, লোকে কি বললো তাতে আমাব কি যায আসে ? আমি যে তাব কথা শুনতে পাই, তাব সঙ্গে কথা বলি নির্জনে।

আমি ভাবি, তাও কি সম্ভব ? পল স্মিথ যা বললেন, তা কি বিশ্বাসযোগ্য ?

এক মনে এই সব ভাবছি এমন সময আমাবই চোখেব সামনে দেখলাম পল স্মিথ আব বক্ত মাংসে গডা শবীবী মানুষ নেই সে হযে উঠেছে বীভৎস এক কঙ্কাল। সেই কঙ্কাল হাসছে। প্রাণ খুলে হাসছে!

কিন্তু একি ? সেই অ্যাটলান্টাব কাঠেব মূর্তিব ঠোটেও দেখা দিযেছে হাসি। হাসছে সে। দেখতে দেখতে সেই কাঠেব মূর্তি এক সুন্দবী নাবীব রূপ ধবে কাচেব বাক্স থেকে বেবিযে এসে মিঃ স্মিথেব কঙ্কালকে জডিযে ধবলে উন্মত্ত হযে ওঠে দু'জনে।

অনুবাদ : তীর্থপতি দত্ত

সাপ

The Snake — ডেনিস হুইটলি

কসিটেয়ার্সকে আমি ভাল চিনতাম না, যদিও তিনি আমার একজন প্রতিবেশী ছিলেন। আমাকে দেখলেই উনি সব সময় ওঁর বাড়িতে আড্ডা দেবার জন্যে যেতে বলতেন। এক শনিবার আমার এক বন্ধু জ্যাকসন আমার বাড়িতে এসেছিল।

জ্যাকসন বড় ইঞ্জিনীয়ার। আমার কোম্পানির আমন্ত্রণে একটি খনির ব্যাপারে মতামত দিতে সে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এসেছে। ওর প্রকৃতি আমার ঠিক বিপরীত। তাই আমাদের সব কথাও ফুরিয়ে আসছিল। বৈচিত্র্যের সন্ধানে আমি জ্যাকসনকে সঙ্গী করে কসিটেয়ার্সের বাড়িতে গেলাম। উনি আমাদের দেখে ভীষণ খুশি হলেন। একটা বিশাল বাড়িতে কসিটেয়ার্স একা থাকতেন এবং সঙ্গে অনেক চাকর বাকর ছিল। এত বড় বাড়িতে উনি যে কি করে থাকতেন তা আমার জানা নেই। অবশ্য এটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, উনি আমাদের উষ্ণ আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা সবাই আরাম কেদারায় বসে আড্ডা জমালাম। দিনটা ছিল গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যা। তাই মিষ্টি ফুলের গন্ধ খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসছিল। এই রবিবারের স্নিগ্ধ, শান্ত মনোরম পরিবেশের স্মৃতি সোমবার সকালের শহরের ব্যস্ততার মধ্যে মনে হয় যেন এক বাসি ঝরে পড়া স্বপ্ন।

আমি জানতাম কসিটেয়ার্স খনির ব্যবসাতেই টাকা করেছেন, কিন্তু কেমন করে, কোথা থেকে তা আমি জানতাম না। যাই হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই কসিটেয়ার্স খনির ব্যাপারে জ্যাকসনের সঙ্গে খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা জমিয়ে নিলেন। আমার এই ব্যাপারে কোন আগ্রহ ছিল না, তাই আপন মনে মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ওদের কথা আমার কানে অস্পষ্টভাবে আসছিল। বাগানের গাছের ডালে বসে পাখিরা মিষ্টি সুরে ডাকছিল।

এই সময় আসল ঘটনার সূত্রপাত হলো একটা চামচিকেকে নিয়ে। পাঠকদের নিশ্চয় জানা আছে যে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ওরা সকলের নজর এড়িয়ে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এবং ঘরের আলো আঁধারের মধ্যে চকিতে উড়ে বেড়ায় আর আমরা অসহায় নির্বোধের মতো খবরের কাগজের ঝটকা দিয়ে তাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করি। কখনো কসিটেয়ার্সের মতো বয়স্ক কোন লোককে চামচিকে দেখে এত ভয় পেতে দেখিনি।

কসিটেয়ার্স গর্জে উঠে বললেন ওকে তাড়িয়ে দিন। ওকে তাড়িয়ে দিন, এই বলে তিনি তার টাকওয়ালা মাথাটা সোফার গদির আড়ালে লুকিয়ে ফেললেন। আমি ওর কাণ্ড দেখে হাসতে লাগলাম। বললাম —এই সামান্য ব্যাপারে এত হৈ চৈ করার কি আছে ? তারপর ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম। চামচিকেটা বারকয়েক এ প্রান্ত ও প্রান্ত আঁকাবাকা পথে উড়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনিভাবে জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

গদির তলা থেকে কসিটেয়ার্স যখন মাথাটা তুললেন তখন তার লালবর্ণ মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, উনি জিজ্ঞাসা করলেন তাহলে ওটা কি গেছে ?

আমি বললাম আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আপনার হৈ চৈ করা দেখে মনে হচ্ছে ওটা যেন সাক্ষাৎ একটা শয়তান।

কসিটেয়ার্স গম্ভীর গলায় বললেন হয়তো তাই।

আমি তাকিয়ে দেখলাম তার সাদা চোখের নীল মণি দুটো কেমন চকচক করছে। ভদ্রলোকের ভয়ার্ত দৃষ্টি ও এত ভয় না দেখলে আমি হয়তো হেসেই ফেলতাম।

তিনি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিন। কথাটা বলে তিনি টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে একপাত্র হুইস্কিতে অল্প জল মিশিয়ে সেই কড়া পানীয়তে চুমুক দিলেন। এই মনোরম সন্ধ্যায় এই বিশ্রী ঘটনা যদিও খুবই খারাপ লাগছিল কিন্তু এটা ওর বাড়ি। তাই কি বা করা যায় জ্যাকসনও কেপার মদ নিয়ে বসলেন।

কসিটেয়ার্স ওর আগের ব্যবহারের জন্যে আমাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। তারপর আমরা জমিয়ে বসে গল্পে মন দিলাম। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আলোচনাটাও স্বাভাবিকভাবেই ভূত প্রেতের দিকে এগোলো, জ্যাকসন বললেন ব্রাজিলের জঙ্গলে তিনি এই রকম অনেক রহস্যজনক ঘটনার কথা শুনেছেন। কিন্তু ওর আজগুবী গল্প আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। কারণ যদিও তার নামটা ইংরেজদের মতো কিন্তু পর্তুগীজ বলে মনে হয় এবং পর্তুগীজরা এই সব ভুতুড়ে ব্যাপার সহজে বিশ্বাস করে।

কিন্তু কসিটেয়ার্সের কথা আলাদা। তিনি একজন ইংরেজ, তিনি যখন আমাকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন আমিও কালো যাদুতে বিশ্বাস করি কিনা ? তখন আমি না হেসে গম্ভীরভাবেই উত্তর দিলাম না, বিশ্বাস করি না।

আমার কথা শুনে কসিটেয়ার্স খুব দৃঢ়কণ্ঠে বললেন আপনি ভুল বলছেন। এই কালো যাদু না থাকলে আজ আমি এইখানে আপনাদের সামনে এইভাবে বসে থাকতে পারতাম না।

আমি ওর কথার প্রতিবাদ করে বললাম আপনি যথার্থই এই কথা বলতে চান ?

আজ্ঞে হ্যা মহাশয়। দীর্ঘ তের বছর ধরে আমি দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে পায়ে হেঁটে ঘুরেছি। সেদিন আমি ছিলাম এক দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ। আপনারা আমার সেই দুরবস্থার দিনগুলোকে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না। দিনগুলো

একবকম নবক যন্ত্রণাব মধ্য দিযেই আমাকে কাটাতে হযেছিল। একটাব পব একটা সামান্য চাকবি কবেছি এবং পাবিশ্রমিক যা পেযেছি তাতে অতিকষ্টে দেহে প্রাণটুকু ধবে বাখা যায কিনা সন্দেহ। আব খাওযা দাওয়াব জন্যে হাতে কিছুই থাকতো না। তখন শুধুমাত্র একটু মদ ও পানীযব জন্যে ওদেশেব কৃষ্ণাঙ্গদেব সাথে বন্ধুব মতো মিশতেও হতো। সেদিন মাথা তুলে বাঁচবাব হীনতম স্বপ্নটুকুও আমাব ছিল না। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ এই দুই সমাজেই আমি ছিলাম অপাংক্তেয। হযতো আমাব এইভাবেই বাকি জীবনটা কাটতো। যদি না একদিন এই বালা যাদুব সংস্পর্শে আমি আসতাম এবং এবই ফলে আমাব প্রচব অর্থপ্রাপ্ত হযেছিল আব এই অর্থ দিযেই আমি ব্যবসা শুরু কবি। সেটা আজ থেকে বাইশ বছব আগেকাব ঘটনা। বর্তমানে আমি একজন ধনী মানুষ তাই বাকি জীবনটা বিশ্রাম নিযে কাটাতে চাই।

কাসিটেযার্সেব প্রত্যেকটা কথা ছিল দৃঢ় ও প্রত্যযপূর্ণ এবং স্বীকাব কবতে লজ্জা নেই যে আমি ওব কথায খুবই প্রভাবিত হযেছিলাম। ওব কথাবার্তাব মধ্যে কোন পাগলামিব লক্ষণ ছিল না। এইখানে কাসটেযাসেব একটু বিবরণ দেওযা ভাল। তিনি বিশালদেহ, জাতিতে ইংবেজ এবং অত্যন্ত কাঠখোট্টা ধবনেব। কিন্তু বিপদেব সময এইবকম লোককে সবাই কাছে পেতে চাইবে। তাই সামান্য একটা চামচিকে দেখে তাকে ভয পেতে দেখে আমি খুবই অবাক হযে গিযেছিলাম।

আগেই বলেছি আমি একটু অবিশ্বাসী। কিন্তু তাব কাবণ বোধহয এই যে আমি কখনো সত্যিকাব কোন অলৌকিক ঘটনা দেখিনি। তাই ওকে এই ব্যাপাবে সবকিছু খুলে বলতে অনুবোধ কবলাম।

কাসটেযার্স তাব গ্লাস থেকে আমাব দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিযে থেকে বললেন ঠিক আছে। আপনাদেব ইচ্ছে হলে আবও এক গ্লাস পানীয নিযে নিন। আমবা আমাদেব গ্লাসগুলো ভর্তি কবে নিলাম আব উনি বলতে শুরু কবলেন। আমি মনে কবেছি যে এই চামচিকাটা সাক্ষাৎ শযতানেব প্রতিমূর্তি হতে পাবে, আমি আক্ষবিকভাবে তা বোঝাতে চাই যে আমি শুনেছি এই পৃথিবীতে কিছু লোক আছে যাবা শযতানেব অশুভ শক্তিকে চিনতে ও বুঝতে পাবে। অবশ্য আমি নিজে তা দেখিনি। তবে শুনেছি যে এই অশুভ শক্তি সমস্ত বাযুমণ্ডলে বিচবণ কবে বেড়ায এবং কিছু কিছু প্রাণী আছে যাবা এই অশুভ শক্তিকে ধাবণ কবতে পাবে যেমন বেতাবযন্ত্র বিদ্যুৎ তবঙ্গ থেকে আহবণ কবে। যেমন ধবুন বেড়াল। ওটা কিন্তু সত্যিই অশুভ শক্তি। ওবা অন্ধকাবে দেখতে পায। দিনেব আলোয যা আমবা দেখতে পাই না তা ওবা দেখতে পায। আপনাবা হয তো দেখেছেন যে ওবা ঘবে কোন এক অদৃশ্য বস্তুকে ঘিবে মাঝখান থেকে গোল হযে ঘুবতে থাকে।

এই জীবগুলো আমাদেব পক্ষে ক্ষতিকব নয। কিন্তু যখনই কোন মানুষ অশুভ ইচ্ছাশক্তিতে পবিচালিত হয তখন ওবা সত্যিই আমাদেব কাছে ভযংকব হযে ওঠে। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, আমি তেব বছব ধবে এই যুক্তবাষ্ট্রেব এ কোণ থেকে ও কোণ পাযে হেঁটে ঘুবেছি। যদিও সেদিন এই যুক্তবাষ্ট্রেব নামটা ছিল না।

ডারবান থেকে ডামারল্যান্ড, ওরেঞ্জ নদী থেকে মাথাবেল ঘুরেছি। ফলের খামারের কর্মী, শ্রমিক, ফেরিওয়ালা, মালগাড়ির খালাসী, কেরানী প্রভৃতি যে কাজই পেয়েছি তাই করেছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আজ মনে হয় আমি যা পারিশ্রমিক পেতাম তা কিছু না পাওয়ারই সামিল।

কে যে আমার সবচেয়ে কঠোর মনিব ছিল তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি। সেই খসখসে গলার ওলন্দাজটি যে সারাক্ষণ বাইবেল কপচাতো নাকি সেই পাঁড় মাতাল দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী স্কট লোকটি।

অবশেষে আমি এইভাবে ভেসে ভেসে সোয়ালীল্যান্ডে এসে পৌঁছলাম। জায়গাটি লরেন্সো মারকুইস এবং ডেলাগোয়া উপসাগরে পর্তুগীজ উপনিবেশের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। জায়গাটির সৌন্দর্য অতুলনীয়। বর্তমানে ওটি আদিবাসীদের জন্যে সংরক্ষিত এলাকা বলে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু সেই সময় ওখানে মুষ্টিমেয় কিছু শ্বেতাঙ্গ এখানে ওখানে বসবাস করতো।

যাই হোক, সেই সময় আমি স্কাবেল সেলুনে বেসী আইজাকসনের সঙ্গে দেখা করলাম। ও আমাকে একটা চাকরির কথা বললো। যদিও ওর মতো নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। তখন আমি একেবারেই কপর্দকশূন্য তাই বাধ্য হয়ে চাকরিটা নিয়ে নিলাম। সে আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিল। ধূসর রংয়ের কোঁকড়ানো মাথার চুল ছিল। নাকটা আকর্শির মতো বাঁকানো ছিল। মুখের রং ছিল পুরুষ টার্কীর মতো লাল। তার ধূর্ত কুতকুতে কালো চোখ দুটো দেখলেই মনে হতো সর্বদাই তার মনে পাপ চিন্তা ঘুরছে। সে বলেছিল যে তার স্টোরকিপার হঠাৎ মারা গেছে এবং যেভাবে সে এই কথা আমায় বলেছিল তাতে তখনই আমার মনে সেই হতভাগার মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ জেগেছিল।

কিন্তু তখন আমার কাছে মাত্র দুটো পথই খোলা ছিল। হয় বেসীর চাকরিটা গ্রহণ করা আর না হলে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষে করে বেড়ানো। এই অবস্থায় তখনই আমি মন ঠিক করলাম এবং বেসীর সাথে যাত্রা করলাম।

মাইলের পর মাইল গ্রাম্য পথ অতিক্রম করে আমি ওর স্টোরে পৌঁছলাম। স্টোর রুমের অবস্থা দেখে আমি চমকে উঠলাম। তার গুদামের মালপত্র বলতে ছিল শুধুমাত্র দুই টিন সার্ডিন মাছ এবং একটা মরা ইঁদুর। এই দেখে বুঝলাম বেসীর ব্যবসাটা সহজ পথের নয়। আজ আমার মনে হয় বেসী আমার সঠিক মূল্যায়ন করেছিল এবং আমার উপর আস্থা স্থাপনও করেছিল। যাই হোক, আমি সর্বদা সতর্ক থাকতাম এবং কখনোই কৌতূহল প্রকাশ করতাম না। কারণ আমার মনে কেমন যেন একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল যে এই কৌতূহল প্রকাশ করার জন্যেই হয়তো আমার পূর্বসূরীকে মরতে হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে আমি বেসীর আস্থাভাজন হয়ে উঠলাম এবং ও ওর ব্যবসার গোপন কথাগুলো আমার কাছে বলত। বেসী সীমান্তের ওপারে—পর্তুগীজদের সাথে অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র ও মদের চোরাকারবার করতো। যদিও

ওব খদ্দেববা সকলেই ছিল স্থানীয় এলাকাব কৃষ্ণাঙ্গ লোকেবা, কাবণ ও তল্লাটে শ্বেতাঙ্গ বলতে কেবলমাত্র বেসীব স্ত্রী বেবেকা ছিল।

আমি ওব হিসেবপত্র দেখাশুনা কবতাম। যদিও তাব খাতাপত্র সবই ছিল ভূয়া। ওব হিসেবেব কাবসাজি আমি সহজেই শিখে নিলাম। ব্রাউন সুগাব বলতে বোঝাতো পাঁচটাব মধ্যে দুটো নকল বুলেট এবং হোয়াইট সুগাব বলতে পাচেব মধ্যে তিনটে নকল বোঝাতো। এই নকল গুলিগুলো পিচবোর্ডে আকা এবং দেখতে আসল গুলিবই মতো। যাই হোক, বেসী হিসেবেব খাতাব এই সাংকেতিক ভাষা বেশ ভালই বুঝত।

মোটেব উপব সে আমাব সাথে খাবাপ ব্যবহাব কবতো না, তবে এক গ্রীষ্মেব বাত্রে ওব সাথে আমাব একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল এবং ওব বিশাল লাল মুঠিব এক ঘুষিতে আমায় মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। এবপব থেকে যখনই আমি বুঝতাম যে আমাব মেজাজ আমাব নিয়ন্ত্রণেব বাইবে চলে যাচ্ছে বিশেষ কবে যখন দেখতাম নিষ্ঠবভাবে ও ওই কালা আদমীগুলোব সাথে ব্যবহাব কবছে তখন নিজেকে সামলাতে আমি বেশ কিছুক্ষণ গ্রামেব পথে পায়ে হেটে ঘুবে আসতাম। এই নয় যে আমি মানুষটা খুব অল্পে কাতব হই, কিন্তু সে যে বকম ব্যবহাব কবতো তাতে যে কোন লোকেবই খাবাপ লাগবে।

যখন আমি ওব ব্যবসাব মধ্যে বেশ ভালভাবে ডুবে গেছি তখন টেব পেলাম যে অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র ও মদেব চোবাচালানী তাব একমাত্র ব্যবসা নয় । বেসী একজন সুদখোব মহাজনও ছিল। আব এই ব্যবসাতেই তাব বেশ উপার্জন হতো। তাছাড়া এও বুঝেছিলাম যে এই কাজেব জন্যেই সে কালা যাদুব সম্পর্কে এসেছিল।

কিভাবে বেসী ভূত প্রেতেব ওঝা উমটাঙ্গাব সংস্পর্শে এসেছিল তা আমি জানি না। বুড়ো শয়তানটা ঝিনুকেব পোশাক পবে এবং চিতাবাঘেব দাতেব মালা পবে প্রায়ই আমাদেব কাছে আসতো এবং বেসী তাকে খুবই সমাদব কবতো। ঘণ্টাব পব ঘণ্টা বসে মদ খেত, এবং অবশেষে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাড়ি ফিবে যেত। এই বুড়ো বজ্জাতটা ওব গোষ্ঠীব কুমাবী মেয়েদেব ধবে এনে বেসীকে দিত। আব বেসী তাদেব পর্তুগীজদেব কাছে বিক্রি কবতো। এ ছাড়াও যে সব হতভাগ্য লোকেবা তাব কাছ থেকে টাকা ধাব কবে শোধ দিতে পাবতো না, তাদেব অসহায় বউদেবও চালান কবা হতো।

আমাব যাবাব ঠিক নয় মাস পবে ঝামেলাটা আবম্ভ হলো। উমটাঙ্গা ছিল অত্যন্ত খবচে স্বভাবেব। যাব জন্যে তাব দলেব ভিতব কুমাবী মেয়েব সংখ্যা কমে আসছিল। ফলে তাকে ক্রমাগতই বেসীব কাছে টাকা ধাব নিতে হতো, কিন্তু কখনোই সে ধাব শোধ কবতে পাবতো না। এবপব থেকে ওদেব দু'জনেবই দেখাসাক্ষাৎটা আব আগেব মতো মধুব বইল না। উমটাঙ্গা তখন থেকে প্রায় শুধু হাতেই তাব কালো ভুঁড়িটা দোলাতে দোলাতে ঘবে ফিবত।

কিন্তু এতে বেসীব কোন ভাবান্তব দেখা গেল না। তাকে তাব পাওনাদাববা ভয়

দেখাতে আরম্ভ করলো ; তাই সে উমটঙ্গাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিল সে যদি যথেষ্ট সংখ্যায় কুমারী মেয়ে জোগাড় করতে না পারে তবে সে যেন তার বউদের বিক্রি করে তার ধার শোধ করে দেয়।

আমি ওদের সাক্ষাৎকারের সময় কখনই উপস্থিত থাকতাম না, কিন্তু ওদের কথাবার্তার বিষয়বস্তু আমি ঠিক জানতে পারতাম। অবশ্য কিছুটা বেসীর অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলার জন্যে এবং কিছুটা উমটঙ্গার টুকরো টুকরো উক্তির থেকে যখন সে বাড়ির উঠোন থেকে বিদায় নিত।

একদিন উমটঙ্গা তার তিনজন স্ত্রীকে নিয়ে এল। এতে তার ঋণের মূল অংশটি শোধ হয় বটে কিন্তু বেসী এক বিচিত্র পদ্ধতিতে টাকা ধার দিত। তার কাছে শুধু আসলটাই সব নয়। আসল ধারটি শোধ দিতে যত বেশি দেরী হবে, সুদের অনুপাত ততই বেড়ে চলবে। বেসীর মতে তিরিশজন মেয়ে পেলে উমটঙ্গার সব ধার দেনা শোধ হয়ে যাবে।

সন্ধ্যার দিকে উমটঙ্গা আবার এলো। খুবই ধীর স্থির দেখাচ্ছিল ওকে। ও কুড়ি মিনিটের বেশি ছিল না। পাতলা দেওয়ালের মধ্য দিয়ে আমি সব কথাই শুনছিলাম—উমটঙ্গা বেসীকে বলছিল হয় এই তিনটে মেয়ে নাও, তা নাহলে কাল সকালের আগেই তোমার মৃত্যু হবে।

আমার মতে বেসী বুদ্ধিমান হলে এই তিনটে মেয়েকে নিয়ে নিত। কিন্তু ও তা করলো না। বেসী কর্কশ গলায় বলল - -তুমি জাহান্নমে যাও।

উমটঙ্গা চলে গেল।

প্রায় একডজনের মতো উমটঙ্গার দলের লোকেরা বাইরে অপেক্ষা করছিল। ও এগিয়ে গেল এবং যাদুর খেলা দেখালো। ওর লোকেরা উমটঙ্গার হাতে একটা কালো ও একটা সাদা জ্যান্ত মোরগ দিল। উমটঙ্গা উঠোনে বসে পড়ল এবং অদ্ভুতভাবে দুটো মোরগকে কেটে ফেলল। তারপর সে খুব মনোযোগ সহকারে ওদের কলজে দুটো পরীক্ষা করলো। এরপর উবু হয়ে বসে সামনে পেছনে দুলতে লাগলো এবং ওর ভাঙা গলায় একটানা ক্লান্তিকর একঘেয়ে সুরে মন্ত্র পড়ে চললো। আর অন্য সবাই ওকে ঘিরে শুয়ে পড়লো এবং একের পর এক উপুড় হয়ে শুয়ে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। এইভাবে আধঘণ্টা থাকলো। তারপর বুড়ো ওঝাটি উঠে নাচতে লাগলো। আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম ওর কোমরের বাঁদরের লেজের বেল্টটা হাওয়ায় গোল হয়ে ওর চারপাশে ঘুরে চলেছে। ও কখনো লাফালো আবার কখনো ঘুরপাক খেতে লাগলো। এই শীর্ণ জীর্ণ বুড়ো জঙ্গলী ভূতটার যে এমন উদ্দাম নাচের শক্তি আছে তা কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। এরপর তার দেহটা ক্রমে ক্রমে শক্ত হয়ে উঠল এবং সে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। উমটঙ্গা মূর্ছা গেল এবং মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। যখন তার সঙ্গীরা তার দেহটা উল্টে দিল তখন আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম ওর মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। তারপর ওর লোকেরা ওকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

তখন সময়টা ছিল কটকটে দিনেব বেলা এবং সে কিন্তু খুব বেশিক্ষণ ধরে এই কাজ করেনি। যখন তাব এই কাজ শেষ হলো ততক্ষণে বাত্রিব গাঢ় অন্ধকাব চারিপাশে ঢেকে ফেলেছে এবং একমাত্র তাবাব আলো ছাড়া সেই গাঢ় অন্ধকাবে আব কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

এই সব দেখে স্থানীয় লোকেবা প্রকৃতিব ঘড়ি অনুসাবে দৈনন্দিন কাজকর্ম কবে থাকে। তাই সন্ধ্যা হবাব সাথে সাথে বেসী, বেবেকা ও আমি বাত্রেব খাবাব খেয়ে ফেললাম। বেসীকে দেখে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছিল, তা অবশ্য অস্বাভাবিক ছিল না, কাবণ একটু আগে যে ঘটনা ঘটে গেল তাতে আমিও চিন্তিত ছিলাম। খাওয়া শেষ হলে বেসী বোজকাব মতো অফিস ঘবে গিয়ে ঢুকলো সাবাদিনেব ব্যবসাব হিসাবপত্র দেখতে, আব আমিও শুতে গেলাম।

বাত দুটোব সময় বুড়ী বেবেকা চিৎকাব কবে আমাব ঘুম ভাঙালো। মনে হলো সে ঘুম থেকে উঠে বেসীকে বিছানায় না দেখে আমাকে ডাকতে এসেছে। আমবা বেসীব অফিস ঘবে ঢুকে সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখলাম। বেসী তাব চেয়াবে বসে আছে, তাব বিস্ফাবিত দুই চোখে এক প্রচণ্ড আতংকেব ছায়া। দুই হাত দিয়ে চেয়ারেব হাতল দুটো সে প্রাণপণে ধবে ছিল এবং তাছাড়া ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন কিছু একটা দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল। যদিও বেসীকে দেখতে মোটেই সুন্দব ছিল না। কিন্তু সেদিন তাব এই কালো মুখটাতেই যে প্রচণ্ড আতঙ্কেব ভাব ফুটে উঠেছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দেখে মনে হল কয়েক ঘণ্টা আগে বেসীব মৃত্যু হয়েছে।

বেবেকাও স্কার্টেব মধ্যে মাথাটা গুজে চিৎকাব কবে কেঁদে বাড়ি সবগবম কবে তুলল। ওকে ঘবেব থেকে বাইবে এনে আমি যেন ঘবে ঢুকে বেসীব মৃত্যুব কাবণ অনুসন্ধান কবতে লাগলাম। সেদিন ঠিক আপনাদেবই মতো একমুহূর্তেব জন্যেও বিশ্বাস কবতে পাবলাম না যে এই দন্তহীন বুড়ো শয়তানটি দল থেকে কোন মানুষকে মাবতে পাবে।

আমি ঘবে তন্ন তন্ন কবে খুঁজেও কোন মানুষেব এই ঘবে ঢোকা বা উপস্থিতিব কোন চিহ্নই পেলাম না। আমি খুব ভাল কবে বেসীব মৃতদেহেব দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মনে হলো আকস্মিক আতংকেব ফলে সংজ্ঞা হাবিয়েছে বা ওব হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে গেছে। মনে হলো এব কাবণ কি? হয়তো ও নিশ্চয় এমন কিছু দেখেছিল যা সত্যিই ভয়ঙ্কব কিছু হবে। এটা ঠিক যে আমি কখনোই জানতাম না যে বেসীব মৃত্যুব ঠিক দুই এক সপ্তাহেব মধ্যেই আমি নিজেই ওই জিনিসটা দেখবো।

পবেব দিন বেসীকে কবব দেওয়া হলো। ওদেশেব প্রথা অনুযায়ী সাবাদিন আশেপাশেব সব মেয়েবা বুকফাটা চিৎকাব কবে চললো এবং পুরুষদেব জন্যে ব্যবস্থা হলো অঢেল মদেব। মনে হলো যেন আফ্রিকাব জনসাধাবণেব প্রায় অর্ধেকই ওখানে হাজিব হয়েছিল। আপনাবা হয়তো জানেন না যে কালো মানুষেব দেশে বহস্যজনক খববগুলো খুব সহজেই দ্রুত চাবিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

উমটঙ্গাকে দেখে মনে হলো সে এই ব্যাপারে আনন্দিত বা দুঃখিত কিছুই হয়নি। শুধুমাত্র একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। আমাদের হাতে ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণও ছিল না। আগের রাত্রে ওই সব পাগলামি ও ওর লম্ফঝম্পকে নিশ্চয় কোন সভ্য আদালতে খুনের প্রমাণ হিসাবে দেখানো যাবে না। আমার মনে হয়েছিল সমস্ত ঘটনাটাই যেন একটা আশ্চর্যজনক কাকতালীয ব্যাপার।

সমস্ত কাজকর্ম মিটে যাবার পর সে পরদিন আমার কাছে এল। ভাঙা ভাঙা এবং দুর্বোধ্য ইংরাজীতে আমাকে যা বলতে চাইল তার অর্থ হচ্ছে- —"মহান আত্মার সিংহাসনের সামনে তোমরা সকলেই কি প্রাণ দেবে?"

আমি বললাম, এই বাড়িতে একজনের মৃত্যুই যথেষ্ট। এরপর আর কোন কথা না বলে তার লাঠিটা চাইল যেটা গত রাত্রে বেসীর অফিস ঘরে ফেলে গিয়েছিল। আমি ওর সঙ্গে কোন কথাই বললাম না, তাছাড়া ওর লাঠিটা ছিল আমার কাছে খুবই পরিচিত। আমি লাঠিটা আনতে বেসীর অফিস ঘরে ঢুকলাম। ঘরের মেঝেতে এই চার ফুট লম্বা সাপ লাঠিটা পড়েছিল। আমার মনে হয় আপনারা হয়তো একটু ছোট মাপের লাঠি দেখেছেন। কারণ ওরা শ্বেতাঙ্গদের জন্যে একটু ছোট মাপের লাঠি তৈরি করে থাকে। লাঠিটা ছিল মোটা কাঠের উপব খোদাই করা। সাপেব মাথাটা লাঠির হাতলের কাজ করে আর লেজটা নিচেব অপর প্রান্তে থাকে এবং এর মাপে পাঁচ থেকে বারটি সাপের দেহের মতো পেঁচানো থাকে। তার উপরে চামড়ার আঁশের মতো নকশা করা থাকে। উমটঙ্গার লাঠিটা খুব সুন্দর দেখতে ছিল। যদিও আকৃতিতে সরু ছিল কিন্তু প্রচণ্ড ভারী ছিল। লাঠিটার রং ছিল কালো, মনে হয় ওটা আবলুস কাঠের উপর খোদাই করা ছিল। তবে ওটা যে একটা দারুণ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। আমি ওটা মেঝে থেকে তুলে কোন কথা না বলে ওর হাতে দিলাম।

প্রায় দশ দিন কেটে গেল। ওর দেখা পেলাম না। এর মধ্যে বুড়ী রেবেকার কান্নাও থেমে গেল। সে ব্যবসাপত্রের দিকে মনোযোগ দিল। মনে হয় বেসী ওর ব্যবসার বিষয়ে সবকিছুই ওকে বলতো কারণ কথা বলে বুঝলাম রেবেকা ব্যবসার খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু জানে। ঠিক হলো যে আমি এখন থেকে ম্যানেজার হিসাবে কাজ চালিয়ে যাব। কিছুদিনের মধ্যেই উমটঙ্গার প্রসঙ্গে আমাদের দু'জনের মধ্যে কথা উঠলো। আমি পরামর্শ দিলাম যে লোকটার সুদের পরিমাণ সত্যিই খুবই বেশি এবং এও বললাম যে লোকটি হয় তো ভয়ঙ্কর হতে পারে। তাই য. পাওয়া যায় তাই নিয়েই ওর সাথে একটা মিটমাট করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের মতো কাজ হবে। কিন্তু আমার কথায় রেবেকা রাজী হলো না। মনে হলো ওকে আমি সুদ ছেড়ে দেবার কথা বলায় যেন ওর চোখ ও দাঁত উপড়ে নিয়েছি, তাই ও আমার কথাগুলো শুনে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠে বলল, তোমার তাতে কি? আমার টাকার প্রয়োজন। আমার একটা ভবিষ্যৎ আছে, তার

কথাও ভাবতে হবে। একটা লোক পাঠিয়ে ওকে খবর দিয়ে ডেকে আন এবং ও এলে ওকে দেনা শোধ করে দিতে বল।

এক্ষেত্রে আমার কিছুই করার ছিল না। দজ্জাল বুড়ীটা কোন কোন ব্যাপারে বেসীর চেয়েও খারাপ ছিল। পরের দিন আমি একটা লোক পাঠালাম। এবং তার পরের দিন উমটঙ্গা এসে হাজির হলো। আমি বেসীর অফিস ঘরে বসে ওর সঙ্গে কথা বললাম, ওর সঙ্গীটি ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছিল। বেসী যে চেয়ারটায় বসে মারা গিয়েছিল, আমি সেই চেয়ারে বসে সরাসরি কথাটা পাড়লাম।

ও বসে কয়েক মিনিট আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি দেখলাম ওর মুখটা আগের চেয়ে আরও কুঁচকে গেছে - যেন শুকনো পচা ফলের মতো। ওর কালো জুতোর বোতামের মতো গোল গোল চোখগুলো এক অদ্ভুত হিংস্র আগুনের মতো ধক্ ধক্ করে জ্বলছিল। উমটঙ্গা খুব ধীরস্থির গলায় আমাকে বলল---তুমি খুব সাহসী যুবক।

আমি ব্যবসায়িক গলায় বললাম—না না, কিছু নয়।

তুমি নিশ্চয় জান বুড়ো মনিবের কি হয়েছে? তুমি কি সেই প্রেতের সামনাসামনি হতে চাও?

ওর স্থির দৃষ্টির মধ্যে একটা অশুভ শক্তির ইঙ্গিত পেলাম: যা দেখলে শরীরটা হিম হয়ে আসে কিন্তু আমিও ওকে ছাড়বার পাত্র নই। ওকে সাফ কথা জানিয়ে দিলাম যে ওর কাছে পাওনা সমস্ত টাকা আমি ফেরত চাই অথবা তার সমতুল্য অন্য কোন জিনিস দিয়ে ওকে দেনা শোধ করতে হবে।

উমটঙ্গা আমাকে ফের উপদেশ দিল। বলল- -উমটঙ্গার সঙ্গে ব্যবসা করা ভুলে যাও। তুমি অন্য লোকের সাথে ফলাও ব্যবসা করতে পার। তুমি ভুলে যেও না যে উমটঙ্গা কালা যাদু জানে, তুমি মরবে।

কিন্তু আসল কথাটা হলো ব্যবসাটা ছিল ওই বুড়ীটার, আমার নয়—তাই ইচ্ছা থাকলেও ওকে আমি ছেড়ে দিতে পারলাম না। অতএব ওর কথার সেই একই উত্তর দিতে হলো, যে উত্তর ও বেসীর কাছ থেকেও পেয়েছিল। তাই আমি বেসীর বন্দুকটা দেখিয়ে বললাম যদি কোনরকম বদমায়েশী কর তবে দেখামাত্র তোমাকে গুলি করে মারবো। আমার কথার উত্তরে ও শুধু একটু হেসেছিল। অমন শয়তানের হাসি আমি কোন মানুষের মুখে আজও দেখিনি। ও আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে অপেক্ষারত ওর সঙ্গীদের কাছে গিয়ে দাড়াল। তারপর সেই একই ভেলকী-বাজীর পুনরাবৃত্তি হলো: কালো-সাদা মোরগ দুটোকে মারা হলো। সেই একইভাবে উপুড় হয়ে গড়াগড়ি এবং বুড়ো উমটঙ্গার নাচ চলল। অবশেষে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল এবং তার সঙ্গীরা তাকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

ইতিমধ্যে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল এবং আমার মনের মধ্যে একটা দারুণ আতংকবোধ হচ্ছিল। বেসীর সেই টকটকে লাল মুখ ও বিস্ফারিত চোখ দুটো আমার বারবার মনে পড়ছিল।

বুড়ীটার সাথে নৈশভোজ সেরে আমি রেসীর ঘরে ঢুকলাম। রাতের অভ্যাস মতো আমি রোজই একটু মদ খেয়ে থাকি কিন্তু সেদিন আমি কিছুতেই বোতলটা সঙ্গে নিলাম না। কারণ আমার ইচ্ছা ছিল সারা রাতটা আমি জেগে সজাগ ও সতর্ক হয়ে কাটাবো। তাছাড়া আমার ধারণা হয়েছিল উমটঙ্গার লোকেরা রেসীকে মারবার জন্যে নিশ্চয় কিছু করে থাকবে। হয়তো ওর মদের সাথে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল।

আমি ঘরে ঢুকে খুঁটিয়ে খুটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলাম। ঘরের এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে একটা মাছি পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে পারে। জানালাগুলি অতি সাবধানে বন্ধ করে দিলাম এবং প্রত্যেকটার গায়ে একটা করে চেয়ার ঠেস দিয়ে রাখলাম যাতে চেয়ারগুলো না ফেলে কেউ জানালা খুলতে পারে; তাছাড়া আমার তন্দ্রা এলে ওই শব্দে যাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। এরপর আমি আলো নিবিয়ে দিলাম যাতে ওরা বর্শা বা তীর ছুড়ে আমায় আঘাত করতে না পারে। এই সব ভাবতে ভাবতে আমি চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমি জীবনে এমন ভয়ংকর আর একটি রাত্রি কল্পনা করতে চাই না। আপনারা নিশ্চয় জানেন অন্ধকারের মধ্যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত কল্পনাই মনে আসে এবং ওই রাত্রিতে আমি যে কি কল্পনা করিনি তা বলতে পারবো না। দূরের তৃণভূমিতে ওরা সামান্য খস্‌খস্‌ আওয়াজ শুনলেই মনে হচ্ছিল এই বোধ হয় শত্রু গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে, যার জন্যে আমি সর্বদাই সজাগ ছিলাম। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যখনই মনে হচ্ছিল যে কোন একটা ছায়ামূর্তি সামান্যতম নড়াচড়া করছে তখনই সেদিক লক্ষ্য করে আমি বেপরোয়াভাবে গুলি চালাচ্ছিলাম। ওই বয়সে আমি খুবই সাহসী ছিলাম, তাই বোধ হয় ওই ভয়ঙ্কর রাতটা আমি কাটাতে পেরেছিলাম।

রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ আকাশে চাঁদ উঠল। আপনাদের হয়তো মনে হবে যে চাঁদের আলোয় পরিবেশটা কিছুটা সহজ হয়ে এল, কিন্তু মোটেই তা হল না। আপনারা হয়তো জানেন না চাঁদের আলো এক এক সময় বড় ভয়ঙ্কর লাগতে পারে। পরিবেশটাকে আরও অস্বাভাবিক করে তোলে। আমি শুনেছিলাম চাঁদের আলোয় অশুভ শক্তিরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। জানালায় গরাদের ফাঁক দিয়ে লম্বা লম্বা, ফালি ফালি চাঁদের আলো ঘরের মেঝেতে এসে পড়েছিল। সময় কাটানোর জন্যে আমি মেঝের আলোয় ফালিগুলোকে বার বার গুণে যাচ্ছিলাম। এই শীতল অশুভ আলো আমাকে সম্মোহিত করে ফেলেছিল। তারপর এক ঝটকায় আমি সোজা হয়ে গেলাম। সেই সময় আমি লক্ষ্য করলাম আমার সামনে টেবিলের উপর কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তা যে কি তা তখনই ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু এটা বুঝলাম যে এখানে কিছুক্ষণ আগেই এমন কিছু একটা জিনিস ছিল যা এখন আর নেই।

হঠাৎ আমি যেন সব বুঝে ফেললাম। আমার হাতের চেটো ঘেমে উঠল, উমটঙ্গার লাঠিটা দেখতে পেলাম না, যেটা উমটঙ্গা আবার ফেলে গিয়েছিল। আমি ঘরটা পরিষ্কার করবার সময় ওটাকে মেঝে থেকে তুলে টেবিলের উপর হেলান দিয়ে রেখেছিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এই লাঠিটা আমার চোখের সামনে ছিল। আবছা অন্ধকারে

সোজা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এখন আর সেটা টেবিলের উপর নেই। ভাবলাম ওটা নিশ্চয় মাটিতে পড়ে যায়নি কারণ তাহলে আমি নিশ্চয় পড়ার শব্দ পেতাম।

এরপরই ঘরের মেঝেতে এসে পড়া চাঁদের আলোয় লাঠিটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আমি একটু অবাকই হযে গেলাম। ভাবলাম আমার হয়তো ভুল হয়েছে, আমি হয়তো ওটা টেবিলের উপর হেলান দিয়ে রাখিনি এবং লাঠিটা সারাক্ষণই ওইভাবে মেঝেতেই পড়ে ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো এই ধরনের চিন্তাগুলো শুধু আমাকেই বোকা বানাচ্ছে। মনে হলো আমার চোখদুটো যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে পড়বে। একটা ভয়ঙ্কর চিন্তা আমার সমস্ত শরীরটাকে হিম করে দিল। শুধু একটা কথাই মনে হলো যেটা আমি এতক্ষণ লাঠি বলে ভেবেছিলাম সেটা মোটেই লাঠি নয়।

আমি ওটা থেকে কিছুতেই চোখ সরালাম না, নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম ওটা নড়ছে কিনা, কিন্তু এ কি? আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। ঘরের মেঝেতে পড়া চাঁদের আলো ঝিরঝির করে কাঁপছিলো, তাই মনে হলো আমার চোখ বোধহয় আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

আমি এক মুহূর্তের জন্যে চোখটা বন্ধ করলাম কারণ এ ছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না। এবং যখন আমি চোখ খুললাম তখন আতঙ্কে বিস্ময়ে দেখলাম যে সাপটা ধীরে ধীরে ফণা তুলছে।

আমার সমস্ত শরীর ঘেমে ভিজে উঠল। এখন আমি বুঝতে পারলাম কিভাবে বেসীর মৃত্যু হয়েছিল। আর কেনই বা ওর মুখটা কালো হয়ে গিয়েছিল। উমটঙ্গার লাঠিটা মোটেই লাঠি নয়—-ওটা আফ্রিকার জঙ্গলের সবচেয়ে বিষধর সাপ। এই জাতের সাপ বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটতে পারে এবং একটি ছুটন্ত তেজী ঘোড়াকে তাড়া করে তার আরোহীকে ছোবল দিয়ে মেরে ফেলতে পারে। এই সাপের দংশনে মিনিট চারেকের মধ্যেই মানুষ মরে কাঠ হয়ে যায়। আর আমার সামনে সেই মারাত্মক মাম্বা সাপটি পড়েছিল।

যদিও আমার হাতে রিভলবার ধরা ছিল কিন্তু ওই অবস্থায় ওটাকে একটা অপ্রযোজনীয় খেলনা ছাড়া কিছু মনে হলো না। কারণ ওর গুলিতে সাপটাকে মারবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এক্ষেত্রে বন্দুক খুবই কার্যকর হতো। তার সাহায্যে আমি সাপটার মাথাটা উড়িয়ে দিতে পারতাম কিন্তু বেসীর ঘরে বন্দুকটা থাকতো না। তাছাড়া আমি বোকার মতো ঘরের দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

আমার চোখের সামনে সাপটা আবার নড়ে উঠল। ঘরের মেঝেতে চট্যাস চট্যাস করে তার লেজটা আছড়াচ্ছিল। আর আমার কোন সন্দেহই রইল না উমটঙ্গা একজন জাত সাপুড়ে। ও ইচ্ছা করেই ওর এই বিশ্রী লাঠিটা এখানে ফেলে গিয়েছিল প্রতিশোধ নেবার জন্যে। মনে হলো হয়তো অসহায় বেসী ঠিক আমার ভয়ে এইভাবে বসেছিল।

আমি মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপতে লাগলাম, কিভাবে এই যাত্রায় রক্ষা পাওয়া যায়।

ঠিক এই সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল যাতে আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম। সাপটা যখন আমাকে ছোবল মারতে যাবে তখন আমি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলে পড়ে গেলাম। আমার পায়ে লেগে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট ছিটকে গেল আর সাপটা আমাকে ছেড়ে ওটার দিকে তেড়ে গেল। মাম্বাদের ছোবলের সাথে আপনাদের পরিচয় থাকলে নিশ্চয় বুঝতেন যে ওরা কত জোরে ছোবল মারে। তা কেবল মাত্র একটা বিশাল হাতুড়ির ঘা অথবা খচ্চরের চাটের সাথেই তুলনা করা চলে। সাপের মাথাটা সজোরে বাস্কেটটার উপর আছড়ে পড়ল এবং তার ফাঁক দিয়ে সটান ভেতরে ঢুকে আটকে গেল।

সত্যিই আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। সেদিনই সকালে আমি বেসীর দেবাজেব কাগজপত্র দেখতে গিযে অনেক অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাস্কেটের ভিতর ফেলেছিলাম যার জন্য ওটা বেশি ভারী হয়ে উঠেছিল। যদিও উল্টে পড়ার সময দুই-একটা কাগজ ছিটকে পড়ে গিযেছিল কিন্তু অবশিষ্ট যা ছিল তা মাম্বাটাকে আটকে বাখার পক্ষে যথেষ্ট ভারী ছিল।

একটা বিশাল চাবুকের মতো সপাং সপাং করে শব্দ করে সাপ্টা ঝটকা মাবতে লাগলো। কিন্তু শত চেষ্টা করেও ওর মাথাটা বাস্কেটের ফাদ থেকে ছাড়াতে পারলো না। আমি আব সময নষ্ট না করে ভারী ভারী হিসাবের খাতাগুলো দিযে সাপটাকে চাপা দিতে লাগলাম। যার ফলে এই মাম্বারের ব্যাপারে খুব নিশ্চিন্ত হলাম। আপনার এই চার্মাচকেটাকে তাডাতে যা সময় লেগেছিল তাব অর্ধেক সমযের মধ্যেই আমি সাপটাকে কাবু কবে ফেললাম। এইবার আমি পিস্তলটা তুলে নিলাম আব মনে মনে বললাম এইবাব সুন্দবী! তোমায বাগে পেযেছি, এখনই তোমার মুণ্ডুটা উডিযে দিচ্ছি। আর তোমার এই সুন্দর চামডা দিযে একজোড়া দারুণ জুতো বানানো যাবে।

এইবাব আম হাঁটু গেডে বসলাম এবং পিস্তল তাক কবলাম। সাপটা প্রাণপণে দু'বাব আমাব কাছে আসবার চেষ্টা কবলো কিন্তু ও আমার এক ফুটের মধ্যেও আসতে পারলো না। শুধু মাত্র দু'বাবই বাস্কেকটা একটু কবে নাডাতে পাবল। আমি পিস্তলের নলটা ওব মাথায দেড ফুট দূবে এনে তাক করলাম এবং সেই সমযই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যার থেকে আমি সেই কুখ্যাত কালা যাদুর পরিচয় পেলাম।

জ্যোৎস্নায আলোকিত ঘরটা ধীরে ধীরে অন্ধকারে ঢেকে গেল এবং চাঁদের আলোটা আমার চোখেব সামনে থেকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। সাপের মাথাটা ধীরে ধীবে অদৃশ্য হযে গেল। ঘবের দেওয়ালগুলো কেমন আস্তে আস্তে অপসৃত হতে লাগলো, আব তাব সাথে সেই বুডো শযতান আদিবাসীটির গাযের বোটকা গন্ধ আমার নাকে এল।

আমাব মনে হলো আমি যেন উমটঙ্গাব কুটিরেই দাঁডিয়ে আছি। এক মুহূর্ত আগে যেখানে সাপটা ছিল সেখানে স্পষ্ট দেখতে পেলাম উমটঙ্গা ঘুমিয়ে আছে অথবা

বলা যেতে পারে যেন অচেতন হয়ে পড়ে আছে। ওই দেশের প্রথা মতো সে তার এক স্ত্রীর পেটের উপর মাথা রেখে শুয়েছিল। আমি বিস্ময়ের মতো তাকে অভিবাদন করতে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম এবং পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে আমি অনুভব করলাম যে আমার বাঁ হাত দিয়ে আমি সেই ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা ধরে আছি যার ভিতর আটকা পড়ে আছে মাম্বারের মাথাটা

আমার সারা শরীর দিয়ে একটা বিদ্যুৎ শিহরন খেলে গেল। আমি অনুভব করলাম আমার মাথার চুলগুলো সব খাড়া হয়ে উঠেছে। আমার সমস্ত মনোবল একত্রিত করে এক ঝটকায় আমার হাতটা সরিয়ে নিলাম। উমটঙ্গা যেন অচেতন অবস্থায় একটু কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই একটা ভারী কিছু পড়ার শব্দ হলো এবং আমি তাকিয়ে দেখলাম এক মুহূর্ত আগে বাস্কেটের যে জায়গাটায় আমার হাতটা ছিল সেখানে সাপটা একটা ছোবল মেরেছে। ভয়ে, আতঙ্কে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল। মনে হলো যেন একটা বরফ শীতল হাওয়া এর নাগাড়ে আমার শরীরের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে। সেই মারাত্মক ঠাণ্ডায় আমি ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম যদিও সেটা ছিল একটা গ্রীষ্মের রাত্রি। দেখলাম ওই ঠাণ্ডা হাওয়াটা সোজাসুজি ঘুমন্ত উমটঙ্গার নাকের উপর দিয়ে আমার দিকে বেয়ে আসছে আর এই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়াটা আমার সারা দেহটাকে অবশ করে দিচ্ছিল। আর আমি এটাও বুঝতে পারছিলাম যে কয়েক মুহূর্ত পরেই আমার অসাড় দেহটা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই সাপটার উপরেই পড়ে যাবে।

এইবার আমি আমার সমস্ত মনোবল একত্রিত করে আমার পিস্তল ধরা হাতটা তুলে ধরলাম। সেই সাপটা আমি আর দেখতে পেলাম না। কিন্তু স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল উমটঙ্গার কপালের উপর মনে মনে ভাবলাম আর যদি একবার আমার জমে যাওয়া আঙুলটা দিয়ে পিস্তলের ঘোড়াটা টানতে পারতাম। তাই আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম আর তখনই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো।

উমটঙ্গা অচেতন অবস্থায় আমার সাথে কথা বলতে লাগলো। অবশ্য এই কথা মানুষের সঙ্গে নয়, আত্মা যেভাবে আত্মার সাথে কথা বলে এটা ঠিক সেই রকম। সে পড়ে থাকা অবস্থায় দেহটাকে এপাশ ওপাশ মোচড় দিল, গোঙাতে লাগলো এবং ওর কপাল থেকে অঝোরে ঘাম মুখ, গাল ও গলা বেয়ে পড়তে লাগলো। আমি এখন যেমন আপনাদের স্পষ্ট করে দেখছি ঠিক তেমনি স্পষ্টভাবে উমটঙ্গাকে দেখেছিলাম। ও আমাকে ওর প্রাণ ভিক্ষা দেবার জন্যে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো এবং নিস্তব্ধ রাত্রিতে যেখানে স্থান ও কাল মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় সেখানে দাঁড়িয়ে আমি উপলব্ধি করলাম যে ওই সাপটি ও উমটঙ্গা অভিন্নহৃদয়।

আমি সাপটাকে মারলে উমটঙ্গাও মরবে। সব ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। উমটঙ্গা কোন উপায়ে অদ্ভুত শক্তিকে বশ মানাতে পারে তাই ওর কালা যাদুর শেষে মন্ত্রপাঠ করার পর যখন সে অচেতন হয়ে পড়ে তখন ওর আত্মাটা ওর দেহ থেকে বেরিয়ে এই ভয়ঙ্কর সাপ ল্যাটাটাতে ঢুকে পড়ে।

আমার মনে হলো আমার উচিত এই মুহূর্তে সাপটাকে ও উমটঙ্গাকে মেরে ফেলা। কিন্তু আমি তা করলাম না। আপনারা নিশ্চয় শুনে থাকবেন যে একজন ডুবন্ত লোক মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তার অতীত জীবনের প্রতিটি দৃশ্যকে তার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেতে দেখে, ঠিক সেই রকমই ওই মুহূর্তে আমারও একটা অনুভূতি হলো। আমার জীবনের গত তের বছর ধরে জমে থাকা ব্যর্থতা ও হতাশার প্রত্যেকটি দৃশ্য ওই মুহূর্তে একের পর এক আমাব চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু মনে হল আমি যেন আরও বেশি কিছু দেখলাম।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা ঝকঝকে তকতকে সাজানো অফিস এবং সেখানে আমি সুন্দর পোশাক পরে বসে আছি। এ ছাডা আমি স্পষ্ট এই বাড়িটাকেও দেখলাম, ঠিক আপনারা যেমন সামনের রাস্তা থেকে এটাকে দেখেন। যদিও বিশ্বাস করুন আগে কখনো আমি এই বাডিটাকে দেখিনি। এ ছাড়া আরও অনেক দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ওই মুহূর্তে আমি উমটঙ্গাকে নিজেব বাগে পেযেছিলাম। ও আমাকে পরিষ্কার গলায় বলে চলেছিল—এই সব জিনিস আমি আপনাকে দেব। শুধু যদি আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেন।

এবপর উমটঙ্গার চেহারাটা ধীরে ধীবে মিলিযে গেল। অন্ধকার ক্রমে পাতলা হয়ে এল। আবার সেই জানালার ফাঁক দিযে চাঁদের আলো ঘরে এসে পডলে তাতে মাম্বারের মাথাটা চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি পিস্তলটা পকেটে পুরে ফেললাম। দরজা খুলে বাইরে এলাম আর বাইরে থেকে দরজাটা ভালভাবে বন্ধ করে দিয়ে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পডলাম। আমি এমন ক্লান্ত হযে পড়েছিলাম যে তখনই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হযে পড়লাম। পরদিন একটু বেলা করে ঘুম থেকে উঠলাম। কিন্তু গতকাল রাত্রের ঘটনাগুলো আমার পরিস্কাব মনে ছিল। ওটা যে স্বপ্ন ছিল না সে বিষযে আমি খুবই নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমি একটা বন্দুকে গুলি ভরে সোজা বেসীর অফিস ঘরে গিযে ঢুকলাম।

টেবিলের পাশে সাপটা ঠিক সেইভাবেই পডেছিল। তার মাথাটা বাস্কেটের ভিতর গোজা এবং দেহটা ভারী ভারী হিসাবের খাতা দিয়ে চাপা দেওযা ছিল। দেখে মনে হলো ওটা সোজা হয়ে তার স্বাভাবিক চেহারা ধারণ করেছে। বন্দুকের নলটা দিযে খোঁচা মেরে বুঝলাম যে ওটা ঠিক সেই আগের মতো একটা সাপ-লাঠি। তখন আমি ওটাকে একটা চকচকে পালিশ করা কাঠের লাঠির চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারছিলাম না। যদিও জানতাম যে ওর ভিতর একটা শয়তানের জীবন লুকানো রয়েছে, অতি সন্তর্পণে লাঠিটা রেখে আমি ঘর থেকে বেরিযে এলাম।

একটু পরেই উমটঙ্গা এল। আমি ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। ওকে দেখে মনে হলো ও যেন বার্ধক্যের ভারে আরও অনেকটা কুঁজো হয়ে গেছে। ও বেশিক্ষণ থাকলো না। নিজেই ওর ঋণের কথাটা তুলল এবং আমার কাছে অনুনয়-বিনয় করে বলল যে আমি যদি ওর ধারটা না ছেড়ে দিই তাহলে ওকে পুরোটাই শোধ

দিতে হবে এবং ওকে সর্বস্বান্ত হতে হবে। শুধু ঋণেব জন্যে ওকে ওব স্ত্রীদেব বিক্রি কবতে হবে। যাব ফলে ও ওব দলেব উপব আধিপত্য হাবাবে।

আমি ওব কথা শুনে বুঝিয়ে বললাম যে এটা আমাব ব্যাপাব নয়। সম্পর্ণ টাকাটাই বেবেকাব এবং সে এক পযসাও ছাডতে বাজী নয।

এই কথা শুনে উমটঙ্গা আশ্চর্য হযে গেল কাবণ আদিবাসীদেব মধ্যে মেয়েবা সম্পত্তিব উত্তবাধিকাবী হয না। ও বললো যে ও ভেবেছিল ব্যবসাটা এখন সম্পূর্ণই আমাব এবং আমাব কর্তব্য বেবেকাব ভবণ পোষণেব ব্যবস্থা কবা। উমটঙ্গা আবও জানতে চাইল যে বাস্তব ঘটনা এই হলে আমি ওকে ঋণেব ব্যাপাবে সাহায্য কবতে পাবি কিনা? আমি উত্তবে শুধু বললাম যে কাবও কাছ থেকে জোব কবে পযসা আদায কবা আমাব স্বভাব নয। আমাব এই উত্তব শুনে উমটঙ্গা মনে মনে খুশি হল এবং ওব ভযঙ্কব লাঠিটা মেঝে থেকে তুলে নিযে বিদায নিল।

পবেব সপ্তাহে আমাকে স্টোবেব কাজে স্কাবেলে যেতে হযেছিল এবং ওখানে দুই বাত্রি থাকতেও হযেছিল। আমি ফিবে এসে শুনলাম যে বেবেকা মাবা গেছে ও তাকে কবব দেওযা হযেছে। বেবেকাব মৃত্যুব ঘটনাটা আমি বাডিব চাকবদেব কাছ থেকে শুনেছিলাম। যেদিন আমি বওনা হযেছিলাম সেদিনই উমটঙ্গা বেবেকাব সঙ্গে দেখা কবতে আসে। তাবপব উঠোনে বসে অন্যেব মতো কালো যাদু ও মন্ত্র পাঠ কবেছিল এবং পবেব দিন বাডিব চাকবেবা বেবেকাকে মৃত অবস্থায পায এবং বেবেকাব সমস্ত শবীব কালো হযে গিযেছিল, আমি শুধু জানতে চেযেছিলাম যে উমটঙ্গা কি লাঠিটা ভুল কবে ফেলে গিযেছিল? যদিও আমি জানতাম উত্তব একই হবে। ওবা বলেছিল হ্যাঁ, সে ওটা পবদিন এসে নিযে গিযেছিল।

তাবপব আমি বেশিব ভাগ ব্যবসাপত্র ধীবে ধীবে গুটিযে আনলাম। আমি জানতাম যে দেশীয ব্যাঙ্কেব প্রতি কোন আস্থা ছিল না। তাই সে তাব টাকা পযসা ঘবেই কোথাও জমিযে বাখত। প্রায সপ্তাহ খানেক চেষ্টা কবে আমি তাব সন্ধান পেলাম এবং তাব বাজাবে পাওনা বাবদ যা কিছু ছিল সব মিলিযে প্রায হাজাব দশেক মত পেলাম। আমি এই অর্থ ব্যবসায খাটিযে আজ অন্তত এক লাখে পবিণত কবেছি। অতএব আপনাবা বুঝতেই পাবছেন যে ওই কালো যাদুব দৌলতেই আজ আমি এখানে বসে আছি।

কাসটেযার্স যখন তাব কথা শেষ কবে এনেছিলেন তখন কি একটা ব্যাপাবে হঠাৎ আমাব চোখ পডল জ্যাকসনেব উপব। তাব কালো চোখ দুটো জিঘাংসাব আগুনে জ্বলজ্বল কবে জ্বলছিল এবং সে একদৃষ্টে বৃদ্ধেব দিকে তাকিযে ছিল।

হঠাৎ সে কর্কশ গলায চিৎকাব কবে উঠল, তোমাব নাম কাসটেযার্স নয। তোমাব নাম থম্পসন, আব আমাব আসল নাম মাইজ্যাকসন। আমাব শৈশবে তুমি আমাব যথাসর্বস্ব চুবি কবে আমাকে ফেলে পালিযেছিলে।

ঘটনাটা আমি পুবোপুবি উপলব্ধি কবাব আগেই জ্যাকসন চেযাব ছেডে দাঁডিযে

আমার চোখে পড়েছিল। জ্যাকসন চিৎকার করে বলল— তুমি সেই শয়তান, তুমি সেই বদমাশ বুড়োটার টাকা নিয়েছিলে আমার মাকে মারবার জন্যে।

অনুবাদ : প্রীতি পালচৌধুরী

অভিশপ্ত প্রাসাদ

The fall of the House of usher— এড্‌গার এলান পো

রোডেরিক আসার আমার ছোটবেলাকার বন্ধু। বহুদিন ওর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ নেই। কিছুদিন আগে ওর একটা চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা শুধু অনুরোধে ভরা। রোডেরিক লিখেছে ও ভীষণ অসুস্থ। মানসিক ও শারীরিক রোগে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। সেই জন্যে ও আমাকে বারবার অনুরোধ করেছে ওর বাড়িতে গিয়ে কয়েক সপ্তাহ থাকবার জন্যে। আমি গেলে নাকি ওর শারীরিক ও মানসিক দুটো রোগই খানিকটা উপশম হবে। তাছাড়া আরও লিখেছে আমি গেলে ওর মন ভাল হয়ে যাবে। ওর চিঠিটা পড়ে আমি আমার বন্ধুর অনুরোধ না রেখে পারলাম না। যাবার জন্যে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করলাম।

আমি রওনা হলাম। সেদিনটা ছিল শরৎকালের একটা ক্লান্তিকর, নিস্তেজ আবহাওয়ার দিন। চারদিক সব চুপচাপ, শান্তশিষ্ট, মেঘগুলো আকাশ থেকে যেন নিচের দিকে নেমে আসতে চাইছে। এইরকম পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমি ঘোড়ার পিঠে চেপে গ্রামের নির্জন পায়ে চলা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম। যেতে যেতে রাত্রির অন্ধকার ক্রমশ গাঢ় হতে আরম্ভ করলো। আমার গন্তব্যস্থল ছিল রোডেরিক আসারের বাড়িটা। বেশ খানিকটা যাবার পর আমার বন্ধুর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনটা দুঃখে ভরে উঠল।

যেতে যেতে বাড়িটার চারপাশের জায়গাগুলো ভালভাবে দেখতে লাগলাম। দেখলাম দেওয়ালগুলো একেবারে বিবর্ণ, ফ্যাকাশে আর জানালাগুলোও ফাকা ফাকা, মলিন বর্ণ। তাছাড়া দেখলাম নলখাগড়ার জঙ্গল আর কিছু মৃত গাছের গুঁড়ি। মনের মধ্যে অদ্ভুত রকমের একটা অনুভূতি এলো। মনে হলো পৃথিবীর অন্য কোন জায়গার সঙ্গে এই জায়গার কোন তুলনা করা যায় না। আমি আমার মনের থেকে এই সব আজেবাজে চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলে ভাবতে লাগলাম, হঠাৎ আমি কেন আসারের বাড়িটার সম্পর্কে এই সব ভাবছি। তবে মনে হলো কোন অলৌকিক শক্তি আমার একটা ধারণা জন্মায় আমার মনটা ছেয়ে

গেল। এত ভেবেও এই রহস্যের কোন সমাধান করতে পারলাম না। আমি নানান কথা ভাবতে ভাবতে এগোতে লাগলাম। হঠাৎ বাড়িটার সামনে গিয়ে কালচে মতো যে খালটা বয়ে গেছে ওটা দেখতে পেলাম। খালটার সামনে এসে ঘোড়াটাকে থামালাম। খালের জলের দিকে তাকালাম। জলের নিচে ফ্যাকাশে নলখাগড়াগুলো আর মৃত গাছের গুঁড়িগুলো চোখে পড়লো। আরও স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম জানালাগুলোকে। কেমন যেন উলটে রয়েছে। আমার সারা শরীর মন জুড়ে একটা রোমাঞ্চকর শিহরন খেলে গেল।

বিষণ্ন, নির্জন ভুতুড়ে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনটা কেঁপে উঠল। তার সাথে রোডারিকের মুখটা মনের মধ্যে ভেসে উঠল। সত্যি কথা বলতে কি আমি আমার বন্ধুর সম্পর্কে খুব কমই জানি। কারণ ও খুব রক্ষণশীল পরিবারের ছেলে, উঁচু দরের কাজকর্মের জন্যে বিখ্যাত। ওদের কাজকর্ম অনেকেরই প্রশংসা কুড়িয়েছে। আমি ওদের বংশের একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি তা হলো রোডেরিকের বংশে লোকসংখ্যা একদমই বাড়েনি। যার ফলে ওদের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে। আমি একদৃষ্টে খালটার দিকে তাকিয়ে থেকে এই সব কথাগুলো ভাবছিলাম। তার সাথে আমার ভেতরের সেই অলৌকিক অনুভূতিটা টের পাচ্ছিলাম। মনে মনে ভাবলাম ছোটদের মতো আমার মনটাকেও কুসংস্কার গ্রাস করে ফেলেছে।

মনের অবস্থা এমন হলে মানুষের যেমনটি হয় ঠিক তেমনি আমার গা ছমছম্ করতে লাগলো। স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে উঠল। ক্রমশ ভয়ে, আতঙ্কে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। জোর করে খালের থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে সোজাসুজি বাড়িটার দিকে চোখ রাখলাম। কিন্তু কিছুতেই মনটা স্থির করতে পারলাম না। একটা ভয়ঙ্কর চিন্তা আমার মনটাকে ক্রমশ অসুস্থ করে তুলতে লাগল। আমি বাড়িটা ও তার চারপাশটা ঘিরে নানারকম কল্পনা করতে লাগলাম। আমার দেখা পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে এই জায়গার কোথাও মিল খুঁজে পেলাম না। মনে হতে লাগলো গাছের গুঁড়ি, ফ্যাকাশে দেওয়াল সব যেন এই রহস্যময় খালটার থেকে উঠে আসছে। ছোঁয়াচে জীবাণুর মতো মনের কল্পনাগুলো ধীরে ধীরে ডালপালা ছড়াতে লাগলো

আমার মনের সমস্ত চিন্তাভাবনাগুলোকে জোর করে চুপ করিয়ে ভালো করে বাড়িটাকে দেখতে লাগলাম। এইবার নিখুঁতভাবে সমস্ত কিছু আমার নজরে পড়লো। বাড়িটা সবদিক থেকে একেবারে প্রাচীন আমলের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গোটা বাড়িটা রঙ চটে বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আসলে বাড়িটার কি রং ছিল তাও বোঝা যাচ্ছে না। বাইরেটাতে ছাতা পড়ে গেছে। উঁচু ছাদের কোণ থেকে অনেকগুলো মাকড়শার জাল ঝুলে আছে। বাড়িটা এত পুরনো হলে কি হবে, একেবারে ধ্বংসের স্তূপে পৌঁছায়নি। আমি একটু অবাক হয়েই দেখলাম এত প্রাচীন হয়েও বাড়িটা ঠিক মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কোন অংশই এখনও ভেঙে পড়েনি।

নিখুঁতভাবে সমস্ত কিছু দেখতে দেখতে আমি বাড়িটার একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাড়িটার ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে আমার ঘোড়াটাকে

নিয়ে গেল। মনে হলো লোকটা বাড়ির চাকর, তারপর আমি হাঁটতে হাটতে করিডোরে এসে পৌঁছলাম। থিলান ঘেরা করিডোরটা দেখতে ভারী অদ্ভুত। এইবার চাকরটা এসে আমাকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। জায়গাটা ভারী অন্ধকার আর যেবার রাস্তাটাও কেমন আকাবাকা। লোকটা আমাকে ওর মালিকের স্টাডিওর দিকে নিয়ে চলল। আমি শুধু ওকে অনুসরণ করে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে আমার সেই আগের ভৌতির অনুভূতিটা মনের মধ্যে চাড়া দিয়ে উঠল। যা কিছু দেখতে পেলাম সবই আমার চোখে অদ্ভুত মনে হতে লাগলো। আশে পাশে যা দেখলাম সবই আমার অচেনা অজানা মনে হলো। সিঁড়ির মুখে বোর্ডেরিকের পরিবারের ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভদ্রলোক আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালেন তারপর আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। ওর মৃদু স্পর্শ আমার শরীরে লাগলো এইবার চাকরটা দরজা খুলে আমার বন্ধু বোর্ডেরিক আসারের কাছে নিয়ে গেল।

প্রথম যে ঘরটা দেখলাম সেই ঘরটা বেশ উঁচু আর বড় বড় জানালাগুলো সব লম্বাটে আর সরু, জানালাগুলো কালো রংয়ের ওক কাঠের তৈরি, মেঝে থেকে জানালাগুলো এত উঁচুতে ছিল যে ছোয়া যায় না। লাল আলোর একটা মৃদু রেখা জানালাটার জাফরি ভেদ করে ঘরের মধ্যে পড়ায় ঘরের সবকিছু স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমি ঘরটার সবকিছু দেখতে লাগলাম। দেওয়ালগুলোতে কালো রংয়ের ঝালর ঝোলানো, ঘরে পুরনো ভাঙাচোরা আসবাবপত্রে ভর্তি। চারদিকে অনেক বইপত্র ও বাদ্যযন্ত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব দিকে কারও নজর আছে বলে মনে হলো না। তাছাড়া ঘরের সমস্ত পরিবেশটাও কেমন যেন বিষন্নতায়, মালিন্যতায় পরিপূর্ণ ছিল।

ঘরের মধ্যে একটা সোফার উপর বোর্ডেরিক লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে। আমাকে দেখেই ও সোফা থেকে উঠে বসল ও মৃদু হেসে আমাকে অভিনন্দন জানালো। আমি ওকে দেখে বুঝলাম আমাকে দেখে ও সত্যিই খুব খুশি হয়েছে আর মনে হলো সত্যিই রোডোরিক আমাকে খুব ভালবাসে। আমরা দুই বন্ধুতে বসে কথা বলতে আরম্ভ করলাম। কথা বলতে বলতে ও যখন থেমে যাচ্ছিল তখন আমি কিছুটা ভয় আর কিছুটা সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছিলাম। ভাবছি—মানুষ কি করে এই রকম বদলে যেতে পারে? বোর্ডেরিক আমার সেই ছোটবেলাকার বন্ধু। যার সঙ্গে আজকের বিছানায় শোয়া রোডোরিককে কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। যদিও ওর মুখটার মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম। যেমন ওর বড় বড় চোখ দুটো পরিষ্কার আর চকচকে। ঠোঁট দুটো খুবই পাতলা আর ফ্যাকাশে। নাকটা বেশ লম্বাটে কিন্তু নাকের ডগাটা খানিকটা বাকা, চিবুকটার গড়ন খুব সুন্দর। মাথার চুলগুলো খুব নরম কিন্তু মুখের গড়ন এক থাকলে কি হবে? ওর মুখের হাব ভাব ও কথা বলার ধরন এত বদলে গেছে যে আমার মনে সন্দেহ হচ্ছে— আমি ঠিক আমার বন্ধু বোডেরিকের সঙ্গে কথা বলছি তো? ওর এই অচেনা ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা সব আমাকে

অবাক কবে দিচ্ছিল। মনে মনে আমি ভীতু হয়ে উঠলাম, আব পাচটা সাধাবণ মানুষেব সঙ্গে এই বিছানায শুযে থাকা বোডেবিকেব মিল খুজে পেলাম না।

মনে মনে ভয পেলেও ওব কাছে কোন কিছু প্রকাশ কবলাম না। আমবা দু'জনে কথাবার্তা বলে যেতে লাগলাম, বোর্ডেবিক আমাকে ডেকে আনাব কাবণগুলো খুলে বলতে লাগলো এবং আবও বললো ও আমাব কাছ থেকে কি বকম সাহায্য চায। তাবপব আস্তে আস্তে ও বলতে শুরু কবল ওব শাবীবিক ও মানসিক বোগেব প্রধান কাবণগুলো পাবিবাবিক। এই বোগটা কাটিয়ে উঠবাব জন্যে ও প্রাণপণ চেষ্টা কবে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ কথা বলাব পব বোর্ডেবিক ক্লান্ত হযে চুপ কবে থাকল, তাবপব বলল এই ঘটনাগুলো খুব শীঘ্রই ঘটে যাবে আমি ওব কথাবার্তা শুনে বুঝতে পাবলাম ও মানসিকভাবে খুবই অসুস্থ। ওব কাছে সব কিছুই বিষাদ লাগে। কোন কিছুতে মন নেই। কোন খাবাব পছন্দ কবে না, এমনকি কোন ফুলেব গন্ধ পর্যন্ত সহ্য কবতে পাবে না, চোখে আলো পডলে ক্ষেপে যায। পোশাকেব প্রতিও ওব কোন নজব নেই। শুধু এক ধবনেব পোশাক ছাড়া কিছুই পডতে ভালবাসে না। শুধু অদ্ভুত অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্রেব শব্দ শুনতে ভালবাসে, যে শব্দ শুনলে মনে ভয আসে না। একমনে ও এই বেহালাব শব্দ শুনতে ভালবাসতো।

বোর্ডেবিক ফেব বলে চললো আমি হযতো শীঘ্রই মাবা যাব, আমাব সময প্রায শেষ হযে এসেছে। ভবিষ্যতেব ঘটনাগুলোব কথা ভেবে ভেবেই আমি শেষ হযে যাচ্ছি। আমি সব সময একটা আতঙ্কেব মধ্যে থাকি কখন যে সেই ঘটনাটা আমাব জীবনে ঘটে যায। আব ঠিক তখনই আমি মবে যাব, এইটাই আমাব সবচেযে ভযঙ্কব আতঙ্ক। একটানা কথা বলে ও থামলো আমি বুঝলাম এইটাই ওব মানসিক অসুস্থতাব মূল কাবণ। এই বাডিতে থেকে বোর্ডেবিকেব মনটা কুসংস্কাবে আচ্ছন্ন হযে গেছে। যাব ফলে ওব মানসিক অসুস্থতা দেখা দিযেছে। আব এই মানসিক অসুস্থতাব থেকেই ওব শাবীবিক অসুস্থতা দেখা দিযেছে। এই বাডিতে ও ভীষণ একা। ওব আপনজন বলতে ওব একমাত্র বোন। ওকে বোর্ডেবিক ভীষণ ভালবাসে। আমবা যখন কথা বলছিলাম তখন ওব বোন ম্যাডেলিন আমাকে না দেখেই চলে গেল। আবাব কিছুক্ষণ বাদে ফিবেও এলো। ওব দিকে তাকাতেই আমাব মধ্যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি সাবা মনটায ছেযে গেল। ম্যাডেলিন বেশিক্ষণ দাডালো না। তাডাতাড়ি কবে নিজেব ঘবে ঢুকে দবজা বন্ধ কবে দিল। আমি একটু অবাক হযেই বোর্ডেবিকেব দিকে তাকালাম। দেখলাম ও ওব রুগ্ন হাতটা দিযে মুখটা ঢেকে বেখেছে আব আঙুলেব ফাক দিযে ওব চোখেব জল পডছে। ওব শীর্ণ হাতেব আঙুলগুলো ও চোখেব জল দেখে মনটা আমাব কষ্টে ভবে উঠল।

এই ভুতুডে বাডিটায বেশ কযেকদিন কেটে গেল। আমি কিন্তু কখনো ওব বোনকে নিয়ে কোন কথা বলতাম না। আমি সবচেযে বেশি ব্যস্ত ছিলাম আমাব বন্ধুকে নিযে। ওব মানসিক ও শাবীবিক যন্ত্রণা কমানোব দিকেই আমাব লক্ষ্য ছিল। আমবা

দু'জনে একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি, ছবি এঁকেছি, গীটার বাজিয়েছি। খুবই গভীর বন্ধুত্ব ছিল আমাদের মধ্যে। রোডেরিক ছবি, গান, লেখাপড়া কোনটাই বাদ দেয়নি। কিন্তু এত গভীর বন্ধুত্ব থাকলে কি হবে আমি কখনো রোডেরিকের মনের ভিতর ঢুকতে পারিনি। ওকে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। তাছাড়া ওর পড়াশুনার আসল উদ্দেশ্যটা যে কি তা বুঝতে পারতাম না। সবচেয়ে বড় কথা হলো কেন আমাকে ও ডেকেছে এবং কি কাজের জন্যে তাও আমার কাছে পরিষ্কার হলো না। ওর বাজনা বাজানোর হাতটাও ছিল খুব মিষ্টি। তাছাড়া ও ছবি আঁকতো দারুণ। কিন্তু ওর আঁকা সমস্ত ছবিগুলোতে একটা দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার অনুভূতি ফুটে উঠত। ছবিগুলো দেখলেই আমার মনটা কষ্টে ভরে উঠত। ঠিক আসল মানেটাও বুঝে উঠতে পারতাম না। কিন্তু মজার কথা হলো রোডেরিকের আঁকা ছবিগুলো আমাকে ভীষণভাবে কাছে টানতো।

একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটলো। রোডেরিকের প্রিয় বোন ম্যার্ডলিন মারা গেল। সারা বাড়ি জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এল। রোডেরিক শোকে, দুঃখে আরও ভেঙে পড়লো। ও আমাকে ওর মনের অদ্ভুত একটা ইচ্ছের কথা বলল। ওর ইচ্ছে ম্যার্ডলিনের মৃতদেহটা ওদের বাড়ির দেওয়ালের ভল্টে দিন পনেরোর জন্যে রেখে দেওয়া হোক। আর এই ভল্ট বাড়ির মূল দেওয়ালের মধ্যেই ছিল। আমি রোডেরিকের ইচ্ছামতোই সাহায্য করলাম। ম্যার্ডলিনের দেহটা কফিনে রাখা হলো। তারপর আমরা দু'জনে মিলে ওটাকে নিয়ে ভল্টের সামনে এলাম। দেখলাম দেওয়ালের ভল্টটা আকারে বেশ ছোট, ঘরের ভেতরটা স্যাতস্যাতে, একদম আলো নেই, এই ভল্টটা ছিল আমার শোবার ঘরের ঠিক নিচে। ঘরটা দেখেই বোঝা গেল পুরনো আমলে এই ঘরটা ব্যবহার হতো এবং এই ঘরটায় দাহ্য পদার্থও রাখা হতো। ভল্টের ভিতরের সমস্ত জায়গা জুড়ে লম্বা লম্বা লোহার দরজা লাগানো ছিল। আমরা কফিন রাখার জায়গাটায় রেখে দিলাম। রাখার সময় কফিনের ঢাকনাটা সামান্য একটু সরিয়ে দিলাম। ম্যার্ডলিনের মৃতদেহটা আমি ভাল করে দেখলাম। মনে হলো রোডেরিকের সঙ্গে ওর বোনের মুখটার খুব মিল রয়েছে।

আমি দেখলাম আমার বন্ধু বোনের দিকে তাকিয়ে আপনমনে কি সব বিড়বিড় করে বলতে লাগলো। ম্যার্ডলিনের বোজা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে খুব কষ্ট হচ্ছিল। পরিপূর্ণ যৌবনে ম্যাডলিন মারা গেছে, ওর ঠোটে রহস্যময় হাসির ছোঁয়া লেগেছিল যা আমার কাছে খুব ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। তাই বেশিক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। ঢাকনাটা সরিয়ে আমরা কাফনটা ঢেকে দিলাম, তারপর ভল্টে রেখে লোহার দরজাটা বন্ধ করে আমরা দু'জনে ফিরে এলাম।

এদিকে আমার বন্ধুর মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যেতে লাগলো। লক্ষ্য করলাম ওর স্বাভাবিক আচরণগুলো সব কেমন গোলমেলে হয়ে গেছে। কোনদিকে খেয়াল নেই। কাজকর্মে একদম মনযোগ নেই। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। চোখে-মুখে সেই আগের মতো উজ্জ্বলতা নেই। কণ্ঠস্বর কেমন অস্বাভাবিক

মনে হতে লাগলো। ওর গলার আওয়াজে একটা কাপুনিভাব ছিল। আমার মনে হতো ও ভিতরে ভিতরে কারও সঙ্গে প্রতিমুহূর্তই যুদ্ধ করে চলেছে। ওকে দেখে আমারই মনে হতো ওর অশরীরী দেহটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি মনে মনে ভীষণ ভীত হয়ে উঠলাম। যদি ওর মতো কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে যাই তাহলে? তখন আমি কি করবো? মনে মনে সত্যি আমি আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়লাম। আর বোর্ডেরিকের জন্য মনটা কষ্টে ভরে উঠত। আস্তে আস্তে আমিও কেমন যেন হয়ে গেলাম।

ম্যাডলিনকে কবর দেবার পর দিন সাতেক কেটে গেল নিশ্চিন্তেই। ঠিক আট দিনের মাথায় আমি ভীষণ ভয় পেলাম। সেদিন অনেক রাত্রি করেই বিছানায় শুতে গেলাম, তার সাথে মনের ভয়টা কেমন চেপে বসলো। এদিকে রাত ক্রমশ বেড়ে চললো। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। ঘুমবার চেষ্টা করেও ঘুমতে পারছি না, তাতে মনের ভয়টা ক্রমশ বাড়তেই লাগলো। যতসব আজে বাজে ভাবনা চিন্তা আমাকে গ্রাস করে ফেলতে লাগলো। যত মনে সাহস আনবার চেষ্টা করতে লাগলাম ততই অজানা ভয়টা আমাকে চেপে ধরতে লাগলো। ভাবলাম এই পুরনো বাড়ি, পুরনো আসবাবপত্রের জন্যই হয় তো আমার মনটা এত দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেখলাম মৃদু হাওয়াতে কালো আর ছেড়া ঝালরগুলো কেমন অদ্ভুতভাবে দুলছে। তার সাথে আমার মনে হতে লাগলে সামনের দেওয়ালগুলো ক্রমশ এগোচ্ছে আর পেছোচ্ছে।

মনের ভয়টা কাটাবার জন্যে বিছানার চাদর বালিশগুলোকে এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। একটা বালিশে আরাম করে মাথাটা রাখবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুতেই আজেবাজে ভাবনা চিন্তাগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করলাম। কিছুই দেখতে পেলাম না ঘন অন্ধকার ছাড়া। ঠিক সেই সময় অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেলাম। আমি মরিয়া হয়ে তা শোনার চেষ্টা করলাম। শব্দটা মাঝে মাঝে থামছে আবার হচ্ছে। এইবার আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। ভয়ে, আতংকে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম না। নিজের পোশাকগুলো খুলে ছুড়ে ফেললাম। আস্তে আস্তে ঘরে পায়চারি করতে লাগলাম। হঠাৎ থমকে গেলাম। সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ভাবলাম নিশ্চয় বোর্ডেরিক উঠে আসছে। আমার কথাই ঠিক হলো। বোর্ডেরিক একটা আলো হাতে আমার ঘরে এসে ঢুকলো। ওর দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পেলাম। কি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওর মুখটা, ওর কথাবার্তা হাবভাব সবই অস্বাভাবিক মনে হতে লাগলে। তবুও আমি মনে মনে খুশিই হলাম। মনে হলো বোর্ডেরিক এসে আমাকে বাঁচিয়ে দিল। ও আমার দিকে তাকিয়ে বলল 'তুমি ওটা দেখনি?'

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তাই কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ রইলাম। বোর্ডেরিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে উঠল তাহলে সত্যিই তুমি ওটা দেখনি? ঠিক আছে এখনই দেখতে পাবে। কথাটা শেষ করেই বোর্ডেরিক হাতের আলোটা নিয়ে গবাদহীন জানালাটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর আলোটা বাইরের

দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। বাইরে তখন প্রচণ্ড বেগে ঝড় বয়ে চলেছে। তাই এক নিমেষে আলোটা ঝড়ের নৃত্যে হারিয়ে গেল। তার সাথে খোলা জানালা দিয়ে দমকা হাওয়া এসে আমাদের ছুঁয়ে যেতে লাগলো। এই প্রচণ্ড ঝড়ের রাতটা আমার কাছে কিন্তু বেশ মনোরম মনে হচ্ছিল। কারণ এই রাতের সঙ্গে মিশে ছিল আমার ভয় আর ভাল লাগা। আমি বাইরেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। দেখলাম ঘন কালো মেঘেরা নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। আর মিষ্টি চাঁদটা কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। আকাশে একটাও তারা দেখতে পেলাম না। বিদ্যুৎ চমকানোও চোখে পড়লো না। কিন্তু একটা অদ্ভুত আলো মেশানো ধোঁয়া ঘূর্ণিঝড়ের মতো খেলে বেড়াতে লাগলো। মনে হলো হঠাৎ এক ধরনের গ্যাস সমস্ত বাড়িটাকে ছেয়ে ফেলেছে। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। বোর্ডেরিকের দিকে তাকিয়ে আতংকিত গলায় বললাম, আর দেখতে হবে না, চল। আমি প্রায় ওকে জোর করেই জানালা থেকে সরিয়ে এনে ঘরের চেয়ারটায় বসিয়ে দিলাম আর বললাম ওটা তেমন কিছুই নয় বোর্ডেরিক। মনে হয় কোন প্রাকৃতিক ব্যাপার, তার থেকে বরং জানালাটা বন্ধ করে দিই। এই ঠাণ্ডা হাওয়া তোমার শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। এই সব ছেড়ে চল তোমাকে একটা বই পড়ে শোনাই তোমার যে বইটা সবচেয়ে ভাল লাগে সেইটাই পড়ে শোনাই। দেখ তোমার খুব ভাল লাগবে। আর এই অন্ধকার রাতটাও কেটে যাবে।

বোর্ডেরিক আমার কথায় রাজী হয়ে গেল। ও রাজী হওয়াতে আমি খুব খুশি হলাম। আমি বইটা পড়তে শুরু করলাম। বইটির নাম ছিল 'পাগলের কাহিনী'। লেখক ছিলেন স্যার ল্যান্সলট ফ্যানিং। আমি জানতাম আমার বন্ধুর এই বইটা খুবই প্রিয় বই। পড়তে পড়তে কাহিনীর একটা পরিচিত জায়গায় এসে পৌঁছে নায়ক এথেলরেড্ এক সন্ন্যাসীর বাসস্থানে যাবার জন্যে অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে জোর করে সেখানে ঢুকেছিল। বইতে লেখাটা ঠিক এমনি ছিল। খুব তাড়াতাড়ি এথেলরেড্ দস্তানা লাগানো হাতে দরজার কাঠটা ধরলো তারপর সজোরে টান দিলো। সেটাকে ভেঙে একেবারে তছনছ করে দিতে লাগলো। সেই কাঠ ভাঙার শব্দ সারা বন জঙ্গল জুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

এই জায়গাটা পড়েই আমি চুপ করে গেলাম। মনে হলো এই বাড়িটার কোন দূরের এক জায়গা থেকে এই রকম ভাঙাচোরা শব্দ ভেসে আসছে। লেখকের বইয়ের বর্ণনার সাথে হুবহু মিল আছে। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়, তার সাথে জানালার কাঁচের ঝনঝন শব্দ, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, আমি তবুও বইটা পড়ে যেতে লাগলাম। এইভাবে এথেলরেড্ দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। সেখানে সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল না, তার বদলে দেখলো একটা ভয়ঙ্কর ড্রাগন। আগুনের মতো লকলকে জিভ, রূপোর তৈরি মেঝেওয়ালা একটা সোনার প্রাসাদকে পাহারা দিচ্ছে। আর ঠিক প্রাসাদের ওপরের দেওয়ালে একটা চকচকে তামার ফলক ঝুলছে এবং তাতে কবিতার ছন্দে

লেখা আছে "এখানে একমাত্র বীরেরাই ঢুকতে পারে—আর কোন বীর যদি ড্রাগনটাকে মেরে ফেলতে পারে তাহলে এই ফলকটা সে জয় করতে পারবে।"

এইবার এথেলরেড্ ক্রুদ্ধ চোখে ড্রাগনটার দিকে তাকালো। ও হাতের গদাটা ওপরে তুলে ড্রাগনটার মাথায় সজোরে আঘাত করলো। আঘাতের চোটে ড্রাগনটা বিকট চিৎকার করে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। ড্রাগনের ভয়ঙ্কর চিৎকার এথেলরেড্ সহ্য করতে না পেরে দুই হাতে কান দুটো চেপে ধরলো। এই ধরনের বীভৎস চিৎকার ও আগে কখনো শোনেনি। শেষে ড্রাগনটা মরে গেল!

এতখানি পড়ে আমাকে হঠাৎ থেমে পড়তে হলো। আমি ভীষণভাবে অবাক হয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম বাড়ির কোন দূরের জায়গা থেকে—একটা মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ শব্দ কানে ভেসে আসতে লাগলো আর তার সাথে বিকট একটা চিৎকার। ঠিক গল্পের ড্রাগনের মতো সেই চিৎকারটা। এইবার আমি সত্যিই মনে মনে ভয় পেতে আরম্ভ করলাম। আমি রোডোরিকের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম ও কিছু বুঝেছে কি না। কোন শব্দ শুনেছে কি না। অবশ্য ওর হাবভাব সেই আগের মতোই মনে হচ্ছিল। চেয়ারটায এমনভাবে বসেছিল যে আমি ওকে পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছিলাম না। কারণ ওর মুখটা দরজার দিকে ফেরানো ছিল। তবুও দেখলাম ওর ঠোঁট দুটো অসম্ভবভাবে কাঁপছে আর বিড়বিড় করে কিসব যেন বলে চলেছে। মাথাটা একেবারে বুকের কাছে নামিয়ে রেখেছে, চোখ দুটো খোলাই ছিল। ওর দেহের নড়াচড়া দেখে বুঝতে পারলাম রোডেরিক একদম ঘুমায়নি। জেগেই রয়েছে কিন্তু ওকে আমার কাছে খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। আমি এই সব কিছু লক্ষ্য করে আবার পড়তে শুরু করলাম- —

এইভাবে এথেলরেড্ সেই ভয়ঙ্কর ড্রাগনটাকে শেষ করে জয়ের আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল, ও এই বীভৎস জন্তুটার মৃতদেহ্ সরিয়ে নিজের যাবার রাস্তা করে নিল। তারপর প্রাসাদের মধ্যে রূপোর মেঝেতে গেল, ওখানেই ঝুলানো রয়েছে তামার ফলকটা। ও যেই তামার ফলকটা নামাতে গেল ঠিক তখনই ওটা মেঝেতে পড়ে গেল। তার সাথে প্রচণ্ড এটা ভয়ঙ্কর শব্দ হলো।

এইখানেও আমাকে থামতে হলো। শুনতে পেলাম দূরে কোথাও এমনি একটি তামার ফলক মাটিতে পরে একটা বিকট শব্দের সৃষ্টি করলো। আমি ভীষণভাবে ঘাবড়ে গেলাম, মুখে কোন কথা সরছিল না। ভয়ে, আতংকে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমার বন্ধু রোডেরিক আসারের কোন পরিবর্তন দেখলাম না। আমি ছুটে গেলাম ওর চেয়ারটার দিকে। দেখলাম রোডেরিকের মুখটা পাথরের মতো কঠিন, পলকহীন চোখ দুটোয় কোন ভাষা নেই, স্থির হয়ে রয়েছে। আমি ওর কাঁধে একটা হাত রাখতেই ওর সমস্ত শরীরটা একটু কেঁপে উঠল, অসুস্থ দেহে মৃদু হেসে মাতালের মতো জড়ানো গলায় বিড়বিড় করে বলতে লাগলো—শোননি? আমি কিন্তু শুনেছি। শুধু আজকে নয়—। অনেক মিনিট,

অনেক ঘণ্টা, অনেক দিন ধরে আমি শুনে আসছি, কিন্তু আমি কিছুই করতে পারিনি। আসল কথা হলো আমার সাহসে কুলোয়নি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তাছাড়া শোন, আমি আমার বোন ম্যাডিলিনের কান্না বেশ কিছুদিন ধরেই শুনছি, কিন্তু সাহস করে বলতে পারিনি। কিন্তু আজ যখন তুমি পড়তে আরম্ভ করলে এথেলরেড্ সন্ন্যাসীর দরজা ভেঙে ড্রাগনটাকে মারল এবং তার সাথে ড্রাগনের আর্তনাদ আর তামার ফলকটার বিকট শব্দ সব মিলে আমাকে স্তব্ধ করে দিল। তাই আমি ওর সিড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পাইনি।

কথাগুলো শেষ করেই বোর্ডেরিক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। দেখে মনে হচ্ছিল ওর প্রাণটা এখনই বেরিয়ে যাবে। ও চিৎকার করে বলতে লাগলো—পাগল, তোমাকে আমি বলতে পারি—আমার বোন ম্যাডলিন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

সত্যিই আমরা দেখতে পেলাম ম্যাডলিনের দীর্ঘকায় শরীরটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর সাদা জামাটা রক্তে মাখা। ওর শীর্ণ দেহের প্রতিটি অংশে ধস্তাধস্তির চিহ্ন। দেখে মনে হচ্ছিল ও কাঁপছে। ছটফট করছে আর ঠিক দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ চাপা কণ্ঠে কেঁদে উঠল। তারপর ও সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে বোডেরিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর বোর্ডেরিক চেয়ার ছেড়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল মেঝের উপর। আমি বুঝলাম বোডেরিক শেষ নিঃশ্বাস ছেড়ে পরলোকে পা বাড়াল।

বাইরে তখনও প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য চলেছে। আমি এই ঘটনার পর ঝড়ের বেগে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভয়ে, আতংকে আমি ছুটতে লাগলাম। উদ্‌ভ্রান্তের মতো আমি ছুটছিলাম। এইবার নিজেকে অনুভব করতে পারলাম। হঠাৎ কোথায় যেন আলো জ্বলে উঠল। আমি দেখার জন্য ঘুরে দাঁড়ালাম। আমি অবাক বিস্ময়ে বোডেরিকের ভুতুড়ে বিশাল বাড়িটাকে দেখতে লাগলাম। বাড়িটার ফাটলগুলো ও দেখতে পেলাম। হঠাৎ মনে হলো ফাটলগুলো ক্রমশ বড় হতে আরম্ভ করেছে, আর কোথা থেকে একটা ঘূর্ণিঝড় দৈত্যের মতো বাড়িটার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার সাথে সাথে গোটা বাড়িটাই ধ্বসে পড়ল। দেওয়ালগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। অসংখ্য জলতরঙ্গ বাজার মতো। একটি বিরাট কোলাহল আমার মনে ভেসে এলো। আমি তখন সেই কালচে সক খালটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, আর আমি বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগলাম বোর্ডেরিক আসারের ভুতুড়ে বাড়িটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে খালের জলের মধ্যে কেমন করে তলিয়ে যাচ্ছে।

অনুবাদ: প্রীতি পালচৌধুরী

লিপি

The Inscription — এ. এন. এল. মুনবী

ডোরসেটের চার্লস উইনচকোম্বির বাড়িতে একটা ভাল লাইব্রেরি আছে—এ খবরটা জানা থাকায় লন্ডন ছাড়বার বিবেক-বেদনাটুকু পর্যন্ত আমার মন থেকে চলে গেল। আমাকে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। হাতে বেশি সময় নেই অথচ কাজ প্রচুর। একটি পণ্ডিত সমাজের 'জার্নাল'-এর জন্য আমাকে গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি করতে হচ্ছে। প্রবন্ধের মাল মশলা সংগ্রহের জন্য আমাকে গত দশ দিন ধরে ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়ে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে। খুবই ব্যস্ত ছিলাম এ ক'টা দিন।

শ্বাসরোধকারী গুমোটের মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয়েছে। আমার গবেষণার বিষয়বস্তু হল, "দক্ষিণ ওয়েলসের ক্লুর্উনিয়াক প্রতিষ্ঠানসমূহ"। কখনই এ কাজে যতটা মনঃসংযোগ করা দরকার, অসহ্য গুমোটের জন্য আমি তা করে উঠতে পারছিলাম না, তাপমাত্রা নব্বই ডিগ্রীর নিচে নামছিল না।

এরকম অবস্থায় চার্লসের কাছ থেকে 'উইক এন্ড' কাটাবার নিমন্ত্রণ পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে চার্লসকে জানিয়ে দিলাম যে সেদিন সন্ধ্যাতেই আমি তার বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছি।

চার্লসের বাড়ির নাম 'স্ট্যাপটন ম্যানর'। বাড়িখানা যে দেখবার মতো সুন্দর তা নয়, কিন্তু এর মধ্যেই যেন রয়েছে চমৎকারিত্ব। এ বাড়ি কোন বিশেষ যুগের বা কোন বিশেষ নির্মাণশৈলীর নয়। চার শতাব্দী ধরে সংযোজন ও বিয়োজনের মধ্যে দিয়ে বাড়িখানা বর্তমান আকার পেয়েছে। মূল অংশটা তৈরি হয়েছিল ষোড়শ শতকে—টিউডর যুগে, সপ্তদশ শতকে স্টুয়ার্ট যুগে বাড়িখানাকে বাড়ান হয়েছিল। ১৭৪৫ খ্রিঃ সদরের বহির্ভাগ তৈরি করে বাড়িখানাকে আধুনিক রূপ দেবার চেষ্টা হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে তৎকালীন গৃহস্বামী বাড়ির সঙ্গে আরো একটা অংশ যুক্ত করেন। এই নতুন সংযোজনের ফলে বাড়ির সামঞ্জস্য কিছুটা নষ্ট হয়েছে ঠিকই কিন্তু চার শতাব্দী ধরে তৈরি বাড়িখানাকে দেখতে খুব খারাপ লাগে না।

প্যাডিংটন স্টেশন থেকে চারটে পঁয়তাল্লিশের ট্রেন ধরে যখন চার্লসদের স্টেশনে পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছে। আমাকে নিয়ে যাবার জন্য চার্লস নিজেই স্টেশনে এসেছিল, ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। আমরা একসঙ্গে কেম্ব্রিজে

পড়েছি। ছাত্রজীবনের শেষে কর্মজীবনে ঢুকেও আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। আমাদের দু'জনের রুচি আলাদা হলেও আমি চার্লসকে আন্তরিকভাবেই ভালবাসতাম। ও ছিল একজন অতি উৎসাহী এবং নামকরা খেলোয়াড। তাছাড়া নিজের সম্পত্তির দেখাশোনার কাজও ওকে করতে হত, আমার ঝোঁক ছিল পুরাতত্ত্বের দিকে। সে বিষয়ে আবার চার্লসের কোন উৎসাহ ছিল না। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতাম চার যুগ ধরে গড়ে ওঠা বাড়িখানা সম্পর্কে চার্লসের নিজের মনে কোন কৌতূহল নেই কেন!

বস্তুতপক্ষে চার্লস ছিল সেই ক্ষয়িষ্ণু গ্রাম্য জমিদার-জোতদার শ্রেণীর প্রতিনিধি, যারা তখনও পর্যন্ত পূর্বপুরুষদের বিষয়-সম্পত্তি এবং প্রাসাদ রক্ষা করতে পারছিল।

চার্লসের স্ত্রী মেরী তো আমায় আরো বেশি চেনা, সে আমার বোনের বান্ধবী। সে অনেকবার আমাদের বাড়িতে এসেছে—থেকেছে। মেরীকে বাচ্চা বয়স থেকেই আমি চিনি, সেদিনের সেই জবুথবু লাজুক মেয়েটির সঙ্গে আজকের সুতনুকা, শ্রীমতী প্রশান্তমনা গৃহকর্ত্রীকে তুলনা করে দেখতে বেশ মজাই লাগে। সেদিনের সেই গালফোলা ডল পুতুলের মতো মেয়েটি যে এমন সুন্দরী হযে উঠবে তা কে ভাবতে পেরেছিল।

ওদের স্বামী-স্ত্রীকে ভাল করে জানি বলেই একথা বলতে কোন সঙ্কোচ বোধ করলাম না যে আমি সঙ্গে কিছু কাজ নিযে এসেছি।

—"কি কাজ ?" চার্লস জিজ্ঞেস করল।

—" 'জার্নাল' -এর জন্য একটা প্রবন্ধ তৈরি করছি, তোমাদের লাইব্রেরিতে অনেক পুরনো বইপত্তর আছে। সেখান থেকে কিছু মাল-মশলা পেয়ে যাব। হাতে মোটেই সময় নেই, আমাকে রোজই কয়েক ঘণ্টা লাইব্রেরিতে বসে কাজ করতে হবে।"

—"কিসের উপর প্রবন্ধ লিখছ ?" চার্লস প্রশ্ন করল।

—"দক্ষিণ ওয়েলসের ক্লিউনিয়াক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর।"

প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর কথা শুনে চার্লস প্রথমে একটু ঠাট্টাই করল আমাকে। তারপর কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, "ঠিক আছে পুরাতাত্ত্বিক, তুমি বেড়াতে এসেও পড়াশুনা করে যাও, আমার লাইব্রেরির দরজা সব সময়েই তোমার জন্য খোলা থাকবে।"

চার্লসের কথার ভঙ্গিতে আমি আর মেরী দু'জনেই হেসে উঠলাম।

পরদিন সকালে চার্লসের পারিবারিক লাইব্রেরিতে বসে অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলাম। পুরনো আমলের অনেক বইপত্র রয়েছে এখানে। আমার পক্ষে দরকারী কিছু প্রাচীন পুঁথি-পত্রও পেয়ে গেলাম। নাঃ, এবার এখানে এসে উপকৃতই হয়েছি, কাজের অগ্রগতিতে আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। লাঞ্চের সময় হাল্কা ঠাট্টা-রসিকতাও করলাম চার্লস আর মেরীর সঙ্গে, লাঞ্চের পর কফি পর্ব, তারপর চার্লস প্রস্তাব করল :

—"চল এবার বাগানে কিছুক্ষণ পায়চারি করা যাক।"

—"বেশ তো চল," আমি রাজী হলাম।

বাড়ির পিছনে একটা চত্বর। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। সামনে

হ্রদের জলরাশি। ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সূর্যের আলো হাজার হাজার হীরের কুঁচির মতো জ্বলছে আর জ্বলছে। হ্রদের ওপারে জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের পর পাহাড। চমৎকার বিকেল। হাঁটতে হাঁটতে আমরা দুই বন্ধু এগিয়ে চললাম হ্রদের দিকে। মাঝে মাঝে দু'একটা কথাবার্তাও হল।

হ্রদের পাড়ে এসে পড়লাম, হ্রদের বুকে ছোট্ট একটি দ্বীপও রয়েছে। দ্বীপের মধ্যে আবার মন্দিরের মতো দেখতে একখানা ছোট বাড়ি। বাড়িখানা বেশ পুরনো।

কথাপ্রসঙ্গে চার্লস বলল, "তোমাকে বোধ হয় একটা কথা বলা হয়নি...।"

—"কি কথা ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—"আমি দ্বীপের ঐ মন্দির-বাড়িটা ভেঙে ফেলছি, অবশ্য বেশি ভাঙবার দরকার নেই, মন্দিরটা এমনিতেই ভেঙে পড়ছে, অনেক দিন ধরেই এরকম শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে ওটা।"

-"ভাঙবে? কেন? এরকম একটা পুরনো স্থাপত্যের তো পুরাতাত্ত্বিক মূল্য রয়েছে," একটু প্রতিবাদের সুরেই আমি বললাম।

"তোমার ঐ স্থপতিকর্মকে আমার কোন দিনই একটা সুন্দর জিনিস বলে মনে হয়নি। বাড়ির কোন জায়গা থেকে ঐ মন্দিরটা দেখা যায় না, এমনভাবে ওটা তৈরি করা হয়েছে যেন বাড়ির কোন লোকের নজরে ওটা না পড়ে, মন্দিরটা দেখতেও এমন কিছু দর্শনীয় বস্তু নয়।"

"কিন্তু এতদিনের একটা পুরনো জিনিসকে ভেঙে ফেলবে!"

– "আমি একটা নতুন গোলাবাড়ি তৈরি করাচ্ছি ; ঐ ভাঙা মন্দিরের পাথরগুলো গোলাবাড়ি তৈরির কাজে লাগবে। ভাঙার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে! সকাল থেকেই মজুররা কাজে লেগেছে। চল দেখে আসি কাজ কতদূর এগোল।"

হ্রদের পাড় ধরে চললাম। জলের একটা সংকীর্ণ বাহু ঢুকে গিয়েছে একফালি বনভূমির মধ্যে। গাছগুলো এসে পড়েছে জলের একেবারে কিনারায়। তাদের ছায়া পড়েছে জলে, জলের রঙ ছায়ায় কালো—তার মধ্যে যেন নিষেধের ইশারা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও জায়গাটা কেমন যেন নিরানন্দময়, একটু আগের খুশিভরা মনটা যেন কেমন দমে গেল।

-"চল দ্বীপে যাওয়া যাক," চার্লস বলল।

এখানে জলধারা খুবই সংকীর্ণ। ওপাড়েই ছোট্ট দ্বীপটা, একটা ছোট সেতু দ্বীপটাকে যুক্ত করেছে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে। মরচেধরা লোহার সেতুটা পার হয়ে আমরা দ্বীপে গিয়ে পৌঁছলাম।

দ্বীপের মধ্যে আগাছার জঙ্গল। আইভি লতা, হলি আর জামের মতো লাল রসাল ফলযুক্ত চিরশ্যামল স্তম্ভাবশেষ আর চিরহরিৎ গুল্ম ঢেকে ফেলেছে দ্বীপের মাটিকে, দ্বীপের এক প্রান্তে একটা ছোট গর্তের মধ্যে মন্দিরটা। এ ধরনের ছোট মন্দির আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের সম্পত্তির এখানে-ওখানে তৈরি করতেন, বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকে তো এরকম মন্দির গড়বার প্রথা খুবই চালু ছিল। এরকম জিনিস আমি আগেও

দেখেছি, এ মন্দিরটা যে ঐ প্রথার একটা চমৎকার নিদর্শন তা-ও নয়। তবু ওটাকে ভেঙে ফেলা হবে, একথা জেনে আমার মনের মধ্যে একটু কষ্টই হতে লাগল। হয়ত আমি পুরাতাত্ত্বিক বলেই মানসিক কষ্ট হল।

মন্দিরটা চৌকো। সাদামাঠা। কোনরকম অলঙ্করণ নেই। মন্দিরের সামনের দিকটা খোলা, সামনের দিকের উপর দিকটা ত্রিকোণ আকৃতির। এই ত্রিকোণ রয়েছে চারটি ডোরিক স্তম্ভের উপর।

মন্দির তৈরি করবার অদ্ভুত জায়গা বটে।

বন্ধু চার্লস বলেছে এই দ্বীপে না এলে এ মন্দির দেখা যায় না। অবাক হয়ে ভাবলাম কোন পাগল অদ্ভুত খেয়ালের বশে এই অগম্য বিষণ্ন জায়গায় এমন মন্দির তৈরি করিয়েছে।

মন্দিরটা ভেঙে ফেলবার বিরুদ্ধে আমি যেন কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না। যদিও একজন পুরাতাত্ত্বিক হিসেবে আমার মনে হল যে এ ব্যাপারে আমার প্রতিবাদ করা উচিত। তাই বললাম, "অতীতের স্মৃতি হিসেবে মন্দিরটাকে রেখে দিলেই ঠিক হত না?"

বলবার জন্যই বললাম কথাগুলো। আমার গলায় খুব একটা উৎসাহের সুর ফুটে উঠল না।

—"ঐ পরিত্যক্ত মন্দিরটাকে রেখে কি হবে? বরং ভাঙলে মন্দিরের পাথরগুলো আমার কাজে লাগবে," চার্লস বলল।

—"কিন্তু তুমি তো তোমার গোলাবাড়ির জন্য অন্য জায়গা থেকেও পাথর জোগাড় করতে পারতে। শত হলেও ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে মন্দিরটা রয়েছে এখানে।"

—"১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে?" চার্লস একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করল।

—"হ্যাঁ, তাই," আমি উত্তর দিলাম।

—"না না, তুমি ভুল করছ। এ মন্দির ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের আগে তৈরি হয়নি। আমাদের অস্ত্রশালায় এই মন্দিরের একটা নকশা রয়েছে। তা থেকেই বোঝা যায় এ মন্দির কবে তৈরি হয়েছিল।"

—"ভুলটা তুমিই করছ চার্লস," আমি বললাম, "এদিকে তাকাও।"

আংশিকভাবে ভেঙে ফেলা প্রবেশ পথের চৌকাঠের দিকে চার্লসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। উপরের চৌকাঠের একটা দিক ভেঙে গিয়েছে, কিন্তু যে অংশ এখনও অক্ষত রয়েছে তার গায়ে পরিষ্কারভাবে খোদাই করে লেখা রয়েছে:

C. C. L. X IX

—"পুরো লেখাটা আমরা পাচ্ছি না চার্লস। আমার ধারণা পুরো লেখাটা হল M D C C L XX IX। চৌকাঠের ভাঙা অংশটাও নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে।"

আশেপাশের ভাঙাচোরা পাথর আর রাবিশের মধ্যে খুঁজলাম। কিন্তু চৌকাঠের ভাঙা অংশটা পাওয়া গেল না।

"ভাঙা অংশটা বোধহয় মজুরদের প্রথম বোঝার সঙ্গেই চলে গিয়েছে," চার্লস মন্তব্য করল।

—"তাই হবে," আমি বললাম।

—"লিপিতে বলা হয়েছে যে এ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে, কিন্তু এ তো বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার।"

—"কেন?" অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—"কেননা নকশা অনুসারে এ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ।"

—"তোমার হয়ত নকশার তারিখটা ঠিক মনে নেই।"

—"কি বলছ তুমি," একটু উত্তেজিতভাবেই চার্লস আমার কথার প্রতিবাদ করে বলল, "আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারি যে নকশায় দেওয়া তারিখটা হল ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ। ঠিক আছে, বাড়িতে গিয়ে নকশাটা দেখলেই তো হবে।"

আমি চুপ করে রইলাম।

—"যে বছরেই প্রতিষ্ঠা হোক না কেন, ও মন্দির আর থাকছে না। ভাঙা মন্দিরের পাথর আমার খুব কাজে লাগবে।"

—"পাথর তো তুমি অন্য জায়গা থেকেও জোগাড় করতে পার।"

—"পারতাম। কিন্তু এখন জোগাড় করা শক্ত।"

—"কেন?"

—"কেননা এই এলাকায় যে পাথরের খাতটা ছিল, তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন পাথরের প্রয়োজন হলে অনেকদূর থেকে তা সংগ্রহ করতে হয়। তাছাড়া মন্দিরের কিছু কাঠ এখনও বেশ শক্ত-পোক্ত রয়েছে, সেগুলোও আমার কাজে লাগবে।"

মাটিতে পড়ে থাকা একখানা কড়িকাঠে সজোরে লাথি মারল চার্লস। বলল, "দেখছ, এ কাঠ কিরকম মজবুত।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম দু'জনে। তারপর নীরবতা ভেঙে চার্লস বলল, "চল, এবার ফেরা যাক। চা-এর সময় হল। আমার কর্মচারী ডেভিস-এরও আসবার কথা আছে।"

মরচে ধরা সেতু পেড়িয়ে এ-পাড়ে এলাম। পিছু ফিরে একবার তাকালাম দ্বীপের দিকে। মনে হল সেখানে লরেল ঝোপের অন্ধকারে কি যেন নড়াচড়া করছে। যেন কোন বন্যজন্তু লুকিয়ে রয়েছে সেখানে। সেদিকে চার্লসের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। কিন্তু ততক্ষণে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

আমি কি সত্যিই কিছু দেখেছি? না কি এ আমার দৃষ্টিবিভ্রম!

আসন্ন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে এরকম দৃষ্টিবিভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়।

চা পর্ব শেষ হলে আমি আর চার্লস অস্ত্রশালায় গেলাম। না, চার্লস ভুল করেনি। মন্দিরের নকশায় একটা সময় দেওয়া রয়েছে আর সে সময়টা হল ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ। তাছাড়া নকশার তলায় একটি লিপিও রয়েছে। লিপিতে বলা হয়েছে:

—"ডোরসেট কাউন্টির স্ট্যাপটন ম্যানরের স্যামুয়েল উইনচ্কোম্বি এস্কোয়ার কর্তৃক ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত এবং উৎসর্গীকৃত।"

নকশার এক কোণে শিল্পীর নাম এবং পদবীর আদ্যাক্ষর দুটি রয়েছে। অক্ষর দুটি হল: জি. এল.। এই জি. এল. কে সে সম্পর্কে চার্লস কিছুই বলতে পারল না। আমরা আবার তারিখ সংক্রান্ত আলোচনায় ফিরে এলাম।

—"হয়ত ঐ তারিখ দেওয়া চৌকাঠখানা মন্দির থেকেও পুরনো কোন বাড়ি থেকে সংগ্রহ করা হযেছিল," আমি বললাম, "কিন্তু এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।"

—"কি প্রশ্ন?" চার্লস জিজ্ঞেস করল।

—"তারিখ দেওয়া চৌকাঠখানাকে সবার নজবে পড়ে এরকম একটা জাযগায় বসান হল কেন?"

—"আবার এ-ও তো হতে পারে যে খোদাইকারী অথবা শিল্পী তারিখ ভুল করেছিল," চার্লস বলল।

—"হয়ত এটাই তারিখের গরমিলের কারণ।"

চার্লসের কথার যৌক্তিকতা একেবাবে অস্বীকার কবতে পাবলাম না।

চার্লসকে জিজ্ঞেস করলাম, "স্যামুযেল উইনচ্কোম্বি সম্বন্ধে তুমি কতটা জান?"

- "তাঁব সম্পর্কে আগে তোমাকে কিছু বলিনি?" চার্লস পাল্টা প্রশ্ন করল।

আমি মাথা নাড়লাম।

-"স্যামুযেল উইনচ্কোম্বি হলেন আমারই এক পূর্বপুরুষ। তিনি আমাদের বংশেব কলঙ্ক।"

"আমি এটুকুই জানি। এব বেশি তুমি আমাকে বলনি। বললে নিশ্চযই মনে থাকত। তাব কথা বল আমাকে।"

"ঠিক আছে," চার্লস বলল, "অবশ্য বলবাব মতো কথা বিশেষ কিছু নেই। স্যামযেল ছিলেন এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ, তাঁর মাথায রীতিমতো ছিট ছিল, তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ নির্জনবাসী। বাইরের জগতেব সঙ্গে তিনি কোন যোগাযোগই রাখতেন না। এত বড বাডিতে তিনি একটা চাকবকে নিযে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন, তিনি কখনও বাড়িব বাইবে যেতেন না, বাইরেব কাউকে ঢুকতেও দিতেন না বাড়ির হাতাব মধ্যে। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান, মৃত্যুর আগে তিনি কোনদিন গীর্জায গিযেছেন - এমন কথা কেউ বলতে পারে না। পারিবারিক 'ভল্ট'-এ আমি তাঁর সমাধি দেখেছি। আমাব প্রপিতামহ ছিলেন তাঁর ভাইপো। স্যামুযেল বিয়ে করেননি। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর উত্তবাধিকারসূত্রে আমাব প্রপিতামহই সম্পত্তির মালিক হন। তুমি সহজেই অনুমান করতে পার বাড়ি আব বিষয-সম্পত্তির অবস্থা তখন কি রকম। অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়— অত্যন্ত আতঙ্কজনক। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে বিষয়-সম্পত্তি ঠিকমতো দেখাশোনা করা হয়নি, বাড়ি সাড়ান তো দূরের কথা, রঙ পর্যন্ত করা হয়নি। বাড়ির সামনে চমৎকার বাগান ছিল। সে বাগানে কুড়ি বছর কেউ হাতই

দেয়নি, ফলে বাগান আর 'বাগান' পদবাচ্য ছিল না, হয়ে উঠেছিল আগাছার জঙ্গল। দীর্ঘ কুড়ি বছরের মধ্যে মাত্র একটি কাজ করা হয়েছিল আর তা হল হ্রদের মাঝখানের দ্বীপে ঐ হাস্যকর মন্দির তৈরি করা। বাড়ি ঘর আর বিষয়-সম্পত্তিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আমার প্রপিতামহের দীর্ঘ দশটি বছর লেগেছিল। আমার প্রপিতামহই বাড়ির পশ্চিম অংশটা তৈরি করান।"

"সহজেই অনুমান করতে পার যে আমার এহেন পূর্বপুরুষ স্যামুয়েল উইনচ্কোম্বিকে নিয়ে এ অঞ্চলে নানা গাল গল্পের সৃষ্টি হয়েছিল। এলাকায় কোন অস্বাভাবিক বা আতংককর ব্যাপার ঘটলেই মনে করা হত যে তার পিছনে রয়েছে স্যামুয়েল উইনচ্কোম্বির কুবুদ্ধি ভরা মস্তিষ্ক। অবশ্য এই মনে করবার পিছনে আপাতদৃষ্টিতে যে কোন সঙ্গত কারণ ছিল তা নয়। আমার ধারণা তরুণ বয়সে তিনি বোধ হয় তার বিশেষ বিদ্যার ক্ষেত্রে একটু বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন করতে পার সেই বিশেষ বিদ্যাটা কি? সতেরশ' ষাটের দশকে তিনি মেডমেনহ্যামে প্রায়ই যেতেন— অনেক সময় কাটাতেন সেখানে।"

"সে সময় মেডমেনহ্যাম ছিল রহস্যময় অতিপ্রাকৃত বিদ্যাচর্চার একটা বড় কেন্দ্র। স্যামুয়েল হয়ত এই বিদ্যাচর্চা শুরু করেছিলেন। মনে হয় এই চর্চা ছিল একান্তই অপেশাদার। সে যুগে অনেকেই শখ করে অতীন্দ্রিয় গুপ্তবিদ্যার চর্চা করতেন। আমি এর মধ্যে নিন্দা করবার মতো কিছু খুঁজে পাই না। স্যামুয়েল বিষয় সম্পত্তির দিকে নজর দেননি— বরং অবহেলা করেছেন। এটা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় ব্যাপার নয়, কিন্তু এছাড়া তাঁর মধ্যে নিন্দনীয় আর কিছু তো আমি খুঁজে পাইনি। হয়ত বুড়ো বয়সে তিনি বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় তিনি ছিলেন একজন নিতান্ত নিরীহ বৃদ্ধ। কারো কোন ক্ষতি তিনি করেননি। বাতিকের জন্যই তার সম্পর্কে নানা অদ্ভুত সব গল্প চালু হয়েছে।"

"স্যামুয়েলের আমলে এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। একটা বেদে ডুবে গিয়েছিল হ্রদের জলে। গ্রামবাসীরা গল্প তৈরি করল যে বেদেটাকে নাকি হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু এ গল্পের সপক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না, কিন্তু গ্রামের লোকের মুখ বন্ধ করবে কি করে? মিথ্যা গুজব রটতে দেরি হল না, অপবাদ আর কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হল বৃদ্ধ স্যামুয়েলের উপর। আমার বিশ্বাস এসব গুজবের কথা বৃদ্ধ স্যামুয়েলের কানেও পৌঁছল। কেননা এরপর থেকেই তিনি বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই ছিন্ন করলেন। তার নির্জন নিঃসঙ্গ জীবন আরো নির্জন আরো নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল।"

—"তুমি কি স্যামুয়েল উইনচ্কোম্বির ছবি দেখেছ? সেখানা বাড়ির পশ্চিম অংশের চিলে কোঠায় রয়েছে। আমার ছেলেবেলায় ছবিখানা হলঘরেই টাঙানো ছিল। কিন্তু...কিন্তু মেরী একেবারেই পছন্দ করে না ছবিখানা। সে জন্যই ওখানাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে হলঘর থেকে, তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মেয়েরা মাঝে মাঝে কিরকম বোকামি করে তা নিশ্চয়ই জান।"

--"না, স্যামুয়েল উইনচ্‌কোম্বের ছবি আমি দেখিনি," এতক্ষণ পরে আমি বললাম।

—"বেশ তো চলো, এক্ষুণি দেখতে পাবে," চার্লস বলল।

বাড়ির পশ্চিম অংশে এলাম আমরা দু'জনে, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম, ছাদের একখানা ঘর, এটাই চিলে কোঠা। এ ঘরে নানা অকেজো আসবাবপত্র বোঝাই করে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া পুরনো আমলের নানা টুকিটাকি জিনিসপত্র রয়েছে ঘরখানায়। দীর্ঘকাল ধরে এসব জিনিসপত্র জড়ো হয়েছে এখানে। পুরনো বাড়িতে এরকমটিই হয়ে থাকে। ঘরের এক কোণে ছবির গাদা। তার মধ্যে খুজে চার্লস একখানা বিরাট ছবি বের করল, তারপর ছবিখানাকে রাখল জানালার পাশে —আলোর মধ্যে।

- "এই যে স্যামুয়েল উইনচ্‌কোম্বের ছবি। অবশ্য ওর চেহারাটা খুব সুন্দর নয়, তাই না ?"

তাকালাম, ক্যানভাসের পটে তুলি দিয়ে আঁকা একজন অতি বৃদ্ধের ছবি। ছবির ঐ মানুষটি অতি বৃদ্ধ এবং অতি দুষ্ট দর্শন। এক মহা অশুভ এবং মহা অমঙ্গলের ভাব যেন ফুটে উঠেছে ঐ ছবির মুখে। মেরী যে কেন হলঘর থেকে এ ছবিখানাকে সরিয়ে ফেলতে বলেছে তা এবার বুঝতে পারলাম।

এ ছবি দর্শকের উপরও অশুভ প্রভাব বিস্তার করে। চার্লস কি করে এ ছবি দেখেও নির্বিকার থাকে তা ভেবে খুব অবাকই হলাম।

- "এ তো অত্যন্ত দক্ষ শিল্পীর আকা জীবন্ত ছবি," আমি বললাম, "চিত্রশিল্পীর নাম জান ?"

—"বুড়ো স্যামুয়েলের চাকর এ ছবি একেছে," চার্লস উত্তর দিল, "লোকটা ছিল ইটালির মানুষ, ছেলেবেলায় সে ছবি আকা শিখেছিল, এখন আমার মনে হচ্ছে, মন্দিরের নকশাও বোধ হয় ইটালীয় চিত্রকরের আকা।"

স্যামুয়েলের ছবিখানাকে চার্লস আবার গাদার মধ্যে রাখল। আমরা দু'জনে চিলে কোঠা থেকে বেরিয়ে নেমে এলাম। সেই সপ্তাহ অন্তে এমন কিছু ঘটল না যার সঙ্গে এ কাহিনীর কোন সম্পর্ক রয়েছে। অন্ততপক্ষে আমার তো তাই মনে হল। আমার লেখার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেল, চার্লসের লাইব্রেরির পুঁথি পত্তর থেকে আমার প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক মাল মশলাও পেলাম। মোটের উপর সপ্তাহ অন্তে চার্লসের বাড়িতে আসাটা আমার পক্ষে লাভজনকই হল।

প্রায় একমাস পরে 'দি টাইমস' পত্রিকায় চার্লসের মৃত্যুসংবাদ দেখে প্রচণ্ড আঘাত পেলাম, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে, এছাড়া সংবাদপত্র থেকে আর কিছু জানতে পারলাম না, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে না পারলেও আমি দুঃসংবাদটা জানবার সঙ্গে সঙ্গেই মেরীকে চিঠি লিখলাম। পরের ডাকেই মেরীর উত্তর এল, তার চিঠি থেকে জানতে পারলাম যে নূতন গোলাবাড়িটা তৈরি হচ্ছিল, মিস্ত্রী এবং মজুরদের কাজকর্ম দেখাশোনা করবার জন্য চার্লস গিয়েছিল সেখানে। বাজ মজুরদের ভারায় উঠেছিল সে। সেখান থেকে হঠাৎ পা পিছলে নিচে পড়ে যায় চার্লস, আর এই পতনের ফলেই হয় মৃত্যু। মজুররা বলেছে ভারা নাকি শুকনো খটখটে ছিল, চার্লসও বেশ সহজভাবেই উঠে

আসছিল ভারায়, কেন যে হঠাৎ পা পিছলে গেল তা মজুররা বলতে পারে না। ভারায় উঠতে চার্লস অপটু নয়, কাজকর্ম দেখবার জন্য আগেও সে অনেকবার ভারায় উঠেছে। কিন্তু কি যে হয়ে গেল। একেই বোধ হয় বলে নিয়তি! চিঠির শেষের দিকে মেরী লিখেছে:

"যদি আপনার হাতে জরুরী কোন কাজ না থাকে তবে কয়েকদিনের জন্য এখানে এলে খুব খুশি হব। অনেক ব্যাপারে আপনার পরামর্শ এবং উপদেশ আমার কাছে একান্ত প্রয়োজনীয়। আপনি চার্লসের বাল্যবন্ধু, আমাব বান্ধবীর দাদা; সুতরাং আমার এই নিদারুণ দুঃসময়ে এটুকু দাবি বোধহয় আমি করতে পারি। বর্তমানে আমাব যে মানসিক অবস্থা তাতে আমি কোনদিকই সামলে উঠতে পারছি না। আপনি এলে আমাব বোঝা খানিকটা হাল্কা হয়, দুঃখের দিনে আমিও কিছুটা সান্ত্বনা পাই। জানি কোন সান্ত্বনার বাণীই আমার চরম ক্ষতিকে পূরণ করতে পারবে না, তবুও মানুষ তো দুঃখের দিনে সান্ত্বনা আর সহানুভূতি খোঁজে। যথাসাধ্য চেষ্টা কববেন আসবার জন্য। আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। এই বিপদের দিনে আপনি যে আমার পাশে এসে দাঁড়াবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন সে বিশ্বাস আমার আছে।"...

বলা বাহুল্য হাতেব কাজ ফেলে রেখেই আমি 'স্ট্যাপট ম্যানব' এব দিকে রওনা দিলাম।

বেচারী মেরী! প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে মেয়েটা। কতইবা ওব বয়স! কিন্তু আঘাত পেলেও ও ভেঙে পড়েনি। ধীরভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে ভাগ্যের সঙ্গে, ওব আচরণ যেন আরো মানবীয়—আরো কোমল— আরো নম্র হয়ে গিয়েছে। এরকম আচরণ ওব মধ্যে অনেকদিন দেখিনি, চার্লসেব আকস্মিক মৃত্যু ওর মানসিক স্থৈর্য আর অচঞ্চল ভাবকে সাময়িকভাবে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে, কর্তৃত্বপরায়ণা জমিদার গৃহিণীর যে ভাবটা ওব আচরণে অজ্ঞাতসারেই ফুটে উঠত তা যেন একেবারেই নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। ও যেন এখন আমার আগের জানা মেরী।

আমরা দু'জনে একসঙ্গে চা পান করলাম, চা পর্ব শেষ হলে সর্দার খানসামা বলল, "হুজুর, জমিদারীর প্রধান কর্মচারী মিঃ ডেভিস্ লাইব্রেব ঘবে অপেক্ষা কবছেন। আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন?"

মেরীব দিকে তাকালাম, তার চোখে সম্মতির লক্ষণ, খানসামার দিকে তাকিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, মিঃ ডেভিসের সঙ্গে আমি কথা বলব।"

—"তা হলে এজেন্ট মশাইকে (মিঃ ডেভিসকে) কি এখানেই নিয়ে আসব?"

—"না চল, আমিই লাইব্রেরি ঘবে যাচ্ছি।"

মিঃ ডেভিস আমার অপরিচিত নন, তাঁকে আমি আগেও দেখেছি। চমৎকার মানুষ। বয়স তিরিশের কিছু উপরে। ভদ্রলোক এখানকার স্থানীয় ডাক্তারের ছেলে। আমি লাইব্রেরি ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। ওঁকে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্থ বলেই মনে হচ্ছিল।

"আপনি আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি," মিঃ ডেভিস বললেন, "আমার মনের

উপর একটা বিরাট বোঝা চেপে রয়েছে। সব কথা মিসেস উইনচ্‌কোম্বির সঙ্গে আলোচনা করা যায় না, বিশেষ করে এই সময়ে, আপনার সঙ্গে যদি আলোচনা করতে চাই আশা করি আপনার আপত্তি হবে না।"

—"না, মোটেই আপত্তি হবে না, বলুন, কি ব্যাপারে আলোচনা করতে চান।"

"মিঃ উইনচ্‌কোম্বি যেদিন মারা গেলেন তার পরদিন সকালে কিছু দলিল পত্রের খোজে আমি এ বাড়িতে এসেছিলাম, দলিলপত্রগুলি জমিদারী এবং 'লজ' সংক্রান্ত, ওগুলো খুব দরকারী। মিঃ উইনচ্‌কোম্বির সই এর জন্য আমি দলিলগুলো রেখে গিয়েছিলাম। ওগুলো খুজতে গিয়ে আমি মিঃ উইনচ্‌কোম্বির ডায়েরীখানাও পেয়ে গেলাম, তিনি নতুন দুটো খামার কিনবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য তিনি কয়েকটা দিনও ধার্য করেছিলেন, এ ব্যাপারটা আমি জানতাম। ডায়েরীতে ধার্য দিনগুলির কথা লেখা আছে কিনা দেখবার জন্য আমি পাতা ওলটাতে লাগলাম। দিনগুলোর কথা আমার জানা দরকার বলেই আমি এ কাজ করলাম। অবশ্য আগেও মিঃ উইনচ্‌কোম্বির অনুমতি নিয়ে তাঁর বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্র আমি নাড়াচাড়া করেছি।"

"জানি, মৃত ব্যক্তির কাগজপত্র বা ডায়েরী দেখা নীতিগতভাবে ঠিক সঙ্গত নয়, তবুও বিষয় সম্পত্তির স্বার্থেই আমাকে এ কাজ করতে হল। আপনি উপস্থিত থাকলে আপনাকে সামনে রেখেই আমি এ কাজ করতাম। মিঃ উইনচ্‌কোম্বি আমাকে খুব বিশ্বাস করতেন। একথা আপনি মিসেস উইনচ্‌কোম্বিকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন। ঐ দুটো নতুন খামার কিনবার পরিকল্পনা ছিল। ঐ দুটো সম্পর্কে কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছিল বলতে পারেন, এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মিঃ উইনচ্‌কোম্বির অবর্তমানে এ সম্পর্কে আমার ওয়াকিবহাল হবার দরকার ছিল। আশা করি আমার অবস্থাটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন। আমি কি অন্যায় করেছি?"

"না, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কোন অন্যায় করেন নি," মিঃ ডেভেন্সকে আশ্বস্ত করবার জন্য আমি বললাম।

"ডায়েরী খুলে একটা অদ্ভুত 'এন্ট্রি' দেখে আমি না পড়ে পারলাম না। পড়ে আমি এতদূর কৌতূহলী হয়ে উঠলাম যে ভাল করে পড়ব বলে ডায়েরীখানা সঙ্গে না নিয়ে গিয়ে পারলাম না। স্বীকার করছি কাজটা অন্যায়, তবুও আমি না করে পারলাম না। মিসেস উইনচ্‌কোম্বিকে আমি শ্রদ্ধা করি। উনি ডায়েরীর লেখাগুলো পড়লে তিনি অনাবশ্যক কষ্ট পাবেন। দুঃখের দিনে তার কষ্টের বোঝা আর বাড়াতে চাই না।"

"আমার মনে মিঃ উইনচ্‌কোম্বি ছিলেন বাস্তববাদী এবং সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ। কিন্তু ডায়েরীতে তিনি যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা পড়ে মনে হয় যে মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকে তিনি স্নায়বিক ব্যাধিতে ভুগছিলেন। এ ব্যাধি ক্রমেই উৎকট হয়ে উঠেছিল। তিনি অলীক কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। নানারকম খেয়াল দেখতে শুরু

করেছিলেন আমার মনিব। ডায়েরীর লেখাগুলি যদি সাধারণের কাছে প্রকাশ করা হয় তবে অনেকেই হয়ত এ কথাই বলবে যে মিঃ উইনচ্‌কোম্বি আত্মহত্যা করেছেন। এ ডায়েরী আমি দ্বিতীয় কোন লোককে দেখাইনি। আশা করি ঠিক কাজই করেছি। আপনি এসেছেন এ খবর পেয়ে আমি ডায়েরীখানা সঙ্গে করে এনেছি। আমি চাই আপনি পড়ুন। না, গোটা ডায়েরীখানা পড়তে হবে না। মিঃ উইনচ্‌কোম্বির মৃত্যুর একমাস আগে থেকে যে 'এন্ট্রি'গুলো রয়েছে সেটুকু পড়লেই চলবে। আপনার পড়া হলে এ ডায়েরী নিয়ে আমার কি করা উচিত সে সম্পর্কে আপনি আমাকে উপদেশ দেবেন। আমি আপনার উপদেশ এবং নির্দেশ মতোই কাজ করব।"

চার্লসের ডায়েরীখানা নিলাম। মিঃ ডেভিসকে বললাম, "আপনি আগামীকাল আমার সঙ্গে দেখা করুন।"

- "কখন?"

--"প্রাতরাশের পর।"

-"ঠিক আছে স্যার। দেখবেন এ ডায়েরী যেন আর কোন লোকের হাতে না পড়ে।"

- "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আচ্ছা মিঃ ডেভিস, আপনার অফিস এখান থেকে কতদূরে?"

"কাছেই। নতুন গোলাবাড়িটার পাশেই আমার অফিস।"

"ঠিক আছে। আপনাকে আসতে হবে না। কাল প্রাতরাশের পর আমিই আপনার অফিসে যাব। এখানে আলোচনা করলে কোন চাকর বাকরের কানে আমাদের কোন কথা যেতে পারে।"

- "তাহলে তো খুবই ভাল হয় স্যার। বেশ নিরিবিলিতে বসে আলোচনা করা যাবে।"

--"তা হলে একথাই রইল।"

–"ঠিক আছে স্যার। এখন আমি যেতে পারি?"

- "আসুন।"

মিঃ ডেভিস চলে গেলেন।

নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। তারপর মনঃসংযোগ করলাম ডায়েরীর পাতায়। মোটের উপর ডায়েরীখানা সাদামাটা। পরপর বিভিন্ন দিনের ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। 'এজেন্ট', 'হেড কিপার' এবং প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তারিখসহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একসময় লেখার মধ্যে যেন অস্বাভাবিকতার সুর খুঁজে পেলাম। অস্বাভাবিক সুর প্রথম লক্ষ্য করলাম চার্লসের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ আগের 'এন্ট্রি'তে। প্রাসঙ্গিক অংশগুলি তুলেই দিচ্ছি :

২রা সেপ্টেম্বর :

আজ রাতে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। হ্রদের দিক থেকে ফিরে আসছিলাম। মনে হল পথের বাঁ পাশে রডোডেনড্রন ঝোপের আড়ালে একটা ছায়ামূর্তিকে যেন

দেখতে পেলাম। ভাবলাম বোধহয় কোন ছিঁচকে চোর। ভাল করে দেখবার জন্য ঝোপটার কাছে গেলাম। কিন্তু না, কেউ নেই সেখানে। আলো-ছায়ার লুকোচুরিতে নিশ্চয়ই দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছে আমার।

৪ঠা সেপ্টেম্বর :

মনে হল হ্রদের পাড়ে যেন একটা লোককে দেখতে পেলাম। এবার দেখলাম নৌকোঘাটার কাছে। অবশ্য লোকটাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাইনি। কিন্তু এ তো ভাল কথা নয়। এখানে ছিঁচকে চোরের আনাগোনা শুরু হয়েছে। হেড-কিপার জ্যাকসনকে বলব সন্ধ্যাবেলায় এখানে যেন একজন পাহারাওয়ালা রাখে, চোরটাকে ধরতে হবে। এ ব্যাপারে মেরীকে কিছু বলিনি।

৫ই সেপ্টেম্বর :

আজ রাতে বাড়ি ফিরবার সময কেউ আমাকে অনুসরণ করেছে। না, আমাব কোন ভুল হয়নি। অনুসরণকারীর পায়ের শব্দ আমি পবিষ্কার শুনতে পেয়েছি। কিন্তু আমি পিছন ফিরে তাকাতেই পাযের শব্দ থেমে গিযেছে। বার বার পিছন ফিরেও আমি অনুসরণকারীকে দেখতে পাইনি। বাচ্চাদের একটা খেলা আছে না? কি যেন নাম সে খেলাটাব? হ্যাঁ, মনে পড়ছে—খেলাটার নাম "ঠাকুরমা'র পদক্ষেপ"। অদৃশ্য অনুসরণকারীর সঙ্গে আমি যেন সেই খেলাই খেলছি। আমার কি কোন স্নায়বিক রোগ হয়েছে? বোধহয তাই। আমার বোধহয় ডাক্তার দেখান উচিত। নাঃ, কাল থেকে কিছুদিন সন্ধ্যার পর আর বাড়ির বাইরে যাব না।

৮ই সেপ্টেম্বর :

আজ রাতে একটা কাজ করলাম, গত তিরিশ বছর আমি এ কাজ করিনি, ঘুমুতে যাবার আগে আমি খাটের তলা এবং কাবার্ডগুলোব ভিতরের দিক ভাল করে দেখে নিলাম। ভগবান জানেন আমি কি খুঁজে পাবার আশা করেছিলাম। আমাব স্নাযবিক দুর্বলতা ভযঙ্করভাবে বেড়ে গিযেছে। আমি তুচ্ছ ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে পড়ছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, মেবী যেন আমার এই শোচনীয মানসিক অবস্থা দেখতে না পায়। কিন্তু কতদিন...কতদিন আর ওকে ফাঁকি দিতে পাবব। হায ভগবান! এ কি হল আমার?

১০ই সেপ্টেম্বর :

গোলাবাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম। কাজ কতদূর এগোল দেখবার জন্য মই বেয়ে উপরে উঠলাম। এক ফোঁটা বাতাস নেই। গাছের পাতা পর্যন্ত কাঁপছে না। কিন্তু যখন আমি উপরে উঠে পাঁচিলের উপর দাঁড়ালাম তখন আচমকা একটা দমকা বাতাস যেন ছুটে এল হু হু করে। বাতাস যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল আমাকে। মনে হল কে যেন আমার ঘাড়ে ধাক্কা মারল। আমি পড়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ছাদের একটা কড়ি আমার হাতের কাছেই ছিল। কোনরকমে সেটা আঁকড়ে ধরে নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা পেলাম। আমার কানের পাশে সোঁ-সোঁ করে বাতাসের গর্জন। একটা অদৃশ্য দানব যেন আমাকে ফেলে দিতে না পেরে দারুণ

আক্রোশে হুংকার দিয়ে উঠল, এ বড় অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা...। আজকে বিকেলেই আমাদের গ্রামের গির্জার পাদ্রীমশাই-এর সঙ্গে দেখা হল, তিনি বললেন আমাকে নাকি অসুস্থ দেখাচ্ছে। আমার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা তাকে প্রায় বলেই ফেলছিলাম, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। লোকে আমাকে বোকা অথবা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবুক এটা আমি মোটেই চাই না।

"যাই হোক, আমার বোধহয় হাওয়া বদলান দরকার। মেরীকে নিয়ে স্কটল্যান্ডে যাচ্ছি। এদিককার কাজ ডেভিসই দেখাশোনা করবে। আশা করি স্কটল্যান্ডে একটা সপ্তাহ কাটিয়ে আসতে পারলে আমার দেহ আর মন দুই ই সুস্থ হয়ে উঠবে। আমি আর অলীক ভয়ের শিকার হব না। কিন্তু প্রশ্ন হল আমার ভয়টা কি সত্যিই অলীক? সত্যিই কি এর কোন ভিত্তি নেই?"

পরের সপ্তাহে ডায়েরীর লেখা স্বাভাবিক। এক জায়গায় চার্লস লিখেছে:

"স্কটল্যান্ডে এসে খুব ভালই হয়েছে। দেহ মনে খুব সুস্থবোধ করছি। দিনগুলো কাটছে যেন হাল্কা হাওয়ায় ভেসে। কোন চিন্তা নেই...ভাবনা নেই। চমৎকার ঘুম হচ্ছে।"

আর এক জায়গায় চার্লস বলেছে:

"ভাবতেই পারছি না আগের সপ্তাহে আমি অলীক ভয়ের শিকার হয়েছিলাম। কেন হয়েছিলাম? আমার অস্বাভাবিক আচরণ কি কারো নজরে পড়েছে? না, না, ঐ দিনগুলোর কথা একেবারেই ভাবব না। মন হয়ত আবার দুর্বল হয়ে পড়বে।"

শেষের 'এন্ট্রি' টা আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ, কিন্তু পরবর্তী ঘটনার আলোকে খুবই অশুভ লক্ষণপূর্ণ। এর মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী দুর্ঘটনার অশনি সংকেত। চার্লসের ডায়েরী থেকে প্রাসাঙ্গিক অংশ তুলে দিচ্ছি।

১৯শে সেপ্টেম্বর:

"স্কটল্যান্ড থেকে ফিরে এসেছি। আজকে সন্ধ্যায় ডেভিস এসেছিল। কাল বেলা দশটায় ওর সঙ্গে গোলাবাড়ি দেখতে যাব, গোলাবাড়ির কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে, একটা ভাল কাজ করা হল এতদিনে। কালকে ভাল করে দেখব নতুন গোলাবাড়িটা..."

এই গোলাবাড়ি দেখতে গিয়েই দুর্ঘটনাটা ঘটল।

চার্লসের লেখা আমার মনে গভীর ছাপ ফেলল। ওকে আমি কট্টর বাস্তববাদী বলেই জানতাম। ওর মতো মানুষ সহজে বিচলিত হয় না। ওর মধ্যে কল্পনাবিলাসের ছিটেফোঁটাটুকু পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু ডায়েরীর পাতায় এসব কি লেখা রয়েছে?

মিঃ ডেভিস ঠিকই বলেছিলেন, এ ডায়েরী মেরীকে দেখান হবে না। তাকে জানান হবে না যে তার স্বামী এক অদ্ভুত স্নায়বিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কথামতো কাল প্রাতরাশের পরই আমি মিঃ ডেভিসের সঙ্গে দেখা করব, তাকে বলব এ ডায়েরী নষ্ট করে ফেলতে। এ ব্যাপারে তিনি যেন কারো কাছে মুখ না খোলেন -এরকম অনুরোধও করব।

পরদিন প্রাতরাশের পর আমি মিঃ ডেভিসের অফিসের দিকে যাত্রা করলাম।

কিন্তু অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভদ্রলোক ছুটতে ছুটতে আসছেন।

--"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনার সঙ্গে রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেল," হাপাতে হাপাতে মিঃ ডেভিস বললেন, "একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে, এক্ষুণি আমার সঙ্গে দ্বীপে চলুন। যেতে যেতে আমি সব কথা বলব।"

গতি পরিবর্তন করে হ্রদের দিকে চললাম দু'জনে, যেতে যেতে মিঃ ডেভিস বললেন, "দ্বীপের মন্দিরটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। মন্দিরের ভিত খুঁড়বার জন্য আমি একটা মজুরকে কাজে লাগিয়েছিলাম। মজুরটা ভিত খুড়ে মাটির তলায় একটা পুরনো সমাধিকক্ষ বের করেছে। কক্ষের মধ্যে একটা কফিনও রয়েছে, খবরটা কানে আসতেই আমি আপনার কাছে ছুটে এলাম, তাকে একদম চুপ করে থাকতে বলেছি।"

অন্ধকার বনপথ ধরে এগোলাম, হ্রদের সংকীর্ণ বাহুর কাছে এসে ছোট লোহার সেতুটা পার হয়ে দ্বীপে পৌঁছলাম।

মন্দিরটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। ফাকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে একজন বুড়ো গ্রাম্য মজুর। তার হাতে কোদাল। আমাদের দেখে সে টুপি ছুয়ে অভিবাদন করে একপাশে সরে দাড়াল।

দেখলাম সমাধিকক্ষটা অগভীর। সেখানে একটামাত্র সাদামাটা সীসের কফিন রয়েছে। কফিনের উপর কোন লিপি নেই। কফিনটা ছোট সমাধিকক্ষটাকে ভরে ফেলতে পারেনি, ভিতরে আর কিছু আছে কিনা দেখবার জন্য ঝুকে পড়ে নিচের দিকে তাকালাম, একটা জিনিস আমার নজরে এল, হাত বাড়িয়ে জিনিসটাকে তুললাম। 'সিলিনডার' বা বেলুনের মতো দেখতে একটা কাচের পাত্র, পাত্রটার মুখ 'সীল' করা। পাত্রের উপরটা ছাতা আর ময়লায় নোংরা। ভিতরে অস্পষ্টভাবে কি যেন দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় কাগজ।

পকেট থেকে ছুরি বের করে 'সীল'টা ভেঙে ফেললাম। ভাঙতে বেশ কষ্টই হল, কেননা এ 'সীল' যে করেছে সে বেশ দক্ষতার সঙ্গেই নিজের কাজ করেছে। সে চায় না কেউ এই 'সীল' ভাঙুক। যা ভেবেছি তাই। কাচের পাত্রের ভিতরে শক্ত করে পাকানো একখানা 'পার্চমেন্ট' কাগজ রয়েছে। অনেকদিনের পুরনো কাগজ, কাচের পাত্রের মধ্যে থাকবার জন্য এই স্যাতস্যাতে জায়গায় থেকেও কাগজখানা ভিজে যায়নি, কাগজের লেখা পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে। আমি আর মিঃ ডেভিস দু'জনেই ঝুকে পড়লাম কাগজখানার উপর। লেখা আছে:

"স্যামুয়েল উইনচ্‌কোম্বির সমাধি সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্দেশপত্র। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই মার্চ ভৃত্য জিওভান্নি লিয়োনির সঙ্গে এরকম ব্যবস্থাই করা হল। এই নির্দেশপত্র স্যামুয়েল উইনচ্‌কোম্বর কফিনের সঙ্গেই কবরে যাবে। জিওভান্নির প্রতি আদেশ রইল যেন সে এ নির্দেশপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করে।

গির্জার সমাধিক্ষেত্র লোকে যাকে পবিত্রভূমি বলে, আমার যেন সেখানে সমাহিত করা না হয়। এ নির্দেশের পিছনে সঙ্গত এবং অকাট্য কারণ রয়েছে। আমি, স্যামুয়েল

উইনচ্কোম্ব, এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছি যে আমার মৃত্যুর পর আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য জিওভান্নি লিয়োনি রাতের অন্ধকারে আমার মৃতদেহ নিয়ে আসবে দ্বীপের এই ছোট মন্দিরে। মৃত্যুর পর আমাকে সমাধি দেবার জন্যই এই মন্দিরটি আমি তৈরি করিয়েছি। যথারীতি আচার অনুষ্ঠান পালন করেই আমি এ মন্দিরটি উৎসর্গ করেছি অন্ধকারের দেবতাদের উদ্দেশ্যে। অন্ধকারের দেবতারা চান নররক্ত। তাদের তৃপ্ত করবার জন্য আমাকে নরহত্যাও করতে হয়েছে। এক ভবঘুরে বেদেকে উৎসর্গ করতে হয়েছে আঁধার দেবতাদের উদ্দেশ্যে।

আমার মরদেহ গির্জার প্রাঙ্গণে সমাহিত হল না। ধর্মের দিক থেকে এ এক নিয়মবিরুদ্ধ কাজ হল, এ নিয়ে এই পল্লী অঞ্চলে নানা রকম হৈচৈ শুরু হতে পারে, তা যাতে না হয় সেজন্য আমি ভৃত্যকে নির্দেশ দিচ্ছি সে যেন আমার নাম লেখা একটা খালি কফিন গ্রাম্যগির্জার তথাকথিত পবিত্রভূমিতে সমাহিত করবার ব্যবস্থা করে। লোকে যেন বোঝে আমি সারাজীবন একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান ছিলাম।

আমার দেহাবশেষকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য, আমার শেষ বিশ্রামস্থলকে অপবিত্র করবার প্রচেষ্টাকে বন্ধ করবার জন্য আমি নিজেই একটা ব্যবস্থা করে গেলাম, এ ব্যবস্থা অলৌকিক। আমার সমাধি মন্দিরকে রক্ষা করবার জন্য রেখে গেলাম আঁধারলোকের এই প্রহরীকে। যুগযুগ ধরে এই কালো প্রহরী আমার সমাধি মন্দিরকে পাহারা দেবে। স্ট্যাপটন ম্যানরের কোন ভবিষ্যৎ অধিকারী যদি মূর্খের মতো এ মন্দির ভাঙবার চেষ্টা করে তবে প্রহরী দ্রুত প্রতিশোধ নেবে। এ সম্পর্কে আমার নির্দেশ তো আমি মন্দিরের প্রবেশপথের চৌকাঠে খোদাই করিয়ে রেখেছি। মন্দিরের কাছে যে আসবে তারই নজরে পড়বে এ লিপি। যে বই থেকে আমি লিপির কথাগুলো ধার করেছি, সে বইখানাকে নির্বোধরা বলে, 'পবিত্র ধর্মগ্রন্থ'। লিপির নির্দেশ যে অমান্য করবে তার উপর নেমে আসবে মহা অভিশাপ। মহা অমঙ্গল গ্রাস করবে তাকে।

"মহান শয়তানের জয় হোক,

স্যামুয়েল উইনচকোম্ব।"

'পার্চমেন্ট' এর লেখা এখানেই শেষ। আমি আর কার্ভিস নিঃশব্দে একে অন্যের দিকে তাকালাম, আমাদের দুজনের মনে তখন একই চিন্তা। মিঃ কার্ভিস প্রথমে নীরবতা ভাঙলেন, বুড়ো মজুরটির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন

"মিঃ উইনচ্কোম্বের এক পূর্বপুরুষের কবর এটা। এক্ষুণি মাটি চাপা দাও। মিসেস উইনচ্কোম্বের কানে যেন এ কবরের কথা না যায়। শোকাহত মহিলাকে আরো বিব্রত করবার প্রয়োজন নেই। আর শোনো, তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে এ গোপন কবরের কথা তুমি আর কাউকে বলবে না। আমরা চাই না এই দুঃসময়ে এ নিয়ে গ্রামে কোন গালগল্পের সৃষ্টি হোক।"

বৃদ্ধ মজুর স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল মিঃ কার্ভিসের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, "না, আমি কাউকে বলব না।"

আর একটি কথাও না বলে সে কবরের গর্ত ভরাট করতে লাগল। পাথরের মোটা পাতগুলি যথাস্থানে বসাবার সময় আমরা দু'জনে তাকে সাহায্য করলাম। কাজ শেষ হলে আমরা একসঙ্গেই দ্বীপ ছেড়ে চলে এলাম। এপাড়ে এসে ডেভিস বুড়ো মজুরটিকে বললেন :

—"শোনো, আর একটা কাজ বাকি আছে। তুমি কয়েকজন লোক নিয়ে আসবে এখানে, তারপর সবাই মিলে ঐ লোহার সেতুটা তুলে ফেলবে। ঐ দ্বীপ আর কবর মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক—এটাই আমরা চাই। তোমার উপর এ দায়িত্ব দিলাম। বেছে বেছে বিশ্বাসী লোকদের আনবে। দেখবে যেন এ নিয়ে কোন হৈ-চৈ না হয়।"

বুড়ো মজুরটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর লোকজন ডাকবার জন্যে চলে গেল।

বনভূমির মধ্য দিয়ে ফিরবার সময় আমি মিঃ ডেভিসকে জিজ্ঞেস করলাম, "লোকটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? ও কি সত্যিই মুখ বন্ধ রাখবে ?"

—"ও ব্যাপার নিয়ে আমি মোটেই চিন্তা করছি না। ওরা তিন পুরুষ ধরে এই জমিদারীতে কাজ করেছে। বুড়ো টমাস বেকার যখন একবার বলেছে সে কাউকে বলবে না তখন আপনি ধরে নিতে পারেন যে এ গোপন ব্যাপারটা গোপনই থাকবে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে কোন ছোকরা মজুরকে কাজে না লাগিয়ে আমি বুড়ো টমাসকেই এ কাজে লাগিয়েছিলাম।

বাড়ি ফিরে লাইব্রেরি ঘরে বসে আমরা দু'জনে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম। একটা বিষয়ে আমরা দু'জনেই একমত হলাম। ঠিক হল মেরী উইনচ্কোম্বির জীবিতকালে আমাদের রহস্যময় আবিষ্কারের বিন্দুবিসর্গও বাইরে প্রকাশ করা হবে না।

এক মাস আগে মেরীর মৃত্যুর খবর পেয়েছি, কাজেই এই রহস্যময় কাহিনী বলবার ক্ষেত্রে আর কোন বাধা নেই। চার্লসের ডায়েরী এবং স্যামুয়েলের কবরে পাওয়া 'পার্চমেন্ট'খানা আমরা পুড়িয়ে ফেলেছিলাম। অবশ্য পোড়াবার আগে আর একবার 'পার্চমেন্ট'-এর লেখা পড়ে নিয়েছিলাম দু'জনে।

—"আচ্ছা স্যার, 'মন্দিরের কাছে যে আসবে তারই নজরে পড়বে এ লিপি,' এ কথাগুলোর অর্থ কি ?" মিঃ ডেভিস জিজ্ঞেস করলেন।

লিপি ! আমার মাথার মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হল। ভাঙা চৌকাঠের উপর যা খোদাই করা ছিল তা আমার মনে ছিল। তাড়াতাড়ি লিখে ফেললাম :

C C L X IX

আচ্ছা কি নির্বোধ আমি ! রোমান তারিখের মধ্যে তো কোন বিরতি চিহ্ন থাকে না। আর এখানে দেখছি স্পষ্ট বিরতি চিহ্ন। না, এ কোন তারিখ নয়। হারিয়ে যাওয়া অক্ষরটা নিশ্চয়ই E। তা হল গোটা লিপিটা হচ্ছে—E C C L. X. IX.।

বাইবেল খুললাম। পেয়ে গেলাম জায়গাটা।

"যে প্রস্তর অপসারণ করিবে, সে তাহা দ্বারাই আঘাতপ্রাপ্ত হইবে; এবং যে ব্যক্তি কাষ্ঠ বিচ্ছিন্ন করিবে, সে তাহা দ্বারাই বিপদাপন্ন হইবে।"

বাইবেলের এই উপদেশকেই সতর্কবাণী হিসেবে খোদাই করিয়েছিলেন বিগত দিনের অশুভ অন্ধকার শক্তির উপাসক স্যামুয়েল উইনচ্কোম্বি।

অনুবাদ : অনিরুদ্ধ চৌধুরী

রক্তাক্ত মৃত্যু

The Masque of the Red death —এড্গার এলান পো

সেই সময় সমস্ত দেশ জুড়ে রক্তাক্ত মৃত্যুর প্রতিধ্বনি। দেশটা যেন ধ্বংসের মুখের খাবারের মতো গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে! এই রক্তাক্ত মৃত্যুটাও এক ধরনের ব্যাধি। যে ব্যাধির আক্রমণে সমস্ত জায়গা জুড়ে রক্তবন্যা বয়ে চলে।

এই রোগের লক্ষণ হলো প্রথমে তীব্র একটা যন্ত্রণার অনুভূতি, তারপর মাথা ঘোরা, সবশেষে শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে অবিরত রক্ত ঝরা। সারা শরীরটাই রক্তের দাগে ভর্তি হয়ে ওঠে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা হলো এই রোগের শিকার যাতে বাইরের কোন সাহায্য কিংবা তার পরিচিত মানুষদের কাছ থেকে কোনরকম সহানুভূতি পেতে না পারে তার জন্যে শিকারের মুখটা আঠালো ফিতে দিয়ে আঁটা থাকে। এই শিকার ধরা থেকে তাকে শেষ করতে সময় লাগে মাত্র আধ ঘণ্টা। এই আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত ঘটনাটা নিখুঁতভাবে ঘটে যায়।

এই রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের ফলে রাজকুমার প্রসপেরোর রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল। রাজকুমার প্রসপেরো খুব সুখী আর ভীষণ আমুদে ছিলেন। তাছাড়া তিনি খুব সাহসী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। যখন দেখলেন তাঁর রাজ্যের লোকসংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে তখন তিনি তার দরবারের হাজারখানেক যোদ্ধা আর অভিজাত মহিলাদের নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। তারপর তিনি নিজের তৈরি করা নির্জন দুর্গগুলোর মধ্যে কোন একটাতে ওদের পাঠিয়ে দিলেন।

ওদের যে দুর্গটায় পাঠানো হলো সেটা ছিল অদ্ভুত ধরনের দেখতে। যার থেকে রাজকুমারের নিজস্ব অভিজাত আর অদ্ভুত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্গটার চারদিকই জুড়ে উঁচু আর শক্ত দেওয়াল ছিল। আর দেওয়ালটার চারদিকেই মাঝে মাঝে লোহার গেট ছিল। মানুষগুলোকে লোহার গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেবার পর দরজার বল্টুগুলো গরম করে হাতুড়ি পিটে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলো। এর ফলে

দুর্গের মধ্যে কোনরকম উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটলে কারো পক্ষেই বাইরে আসার উপায় ছিল না। আবার তেমনি কেউ ইচ্ছা করলেই ভিতরে ঢুকতে পারতো না, কিন্তু দুর্গের ভিতরে সবকিছুর ব্যবস্থা ছিল। বেচে থাকার জন্যে যা যা প্রয়োজন সবকিছুরই সুব্যবস্থা ছিল। আনন্দ ফূর্তি করবার জন্যে সবরকম ব্যবস্থা এই দুর্গের ভিতরে করা হয়েছিল। আনন্দ দেবার জন্য ব্যালে নর্তকী আর যন্ত্রসংগীতের বাদকেরাও ছিল। এছাড়া সঙ্গ দেবার জন্য একদল সুন্দরী রমণী ছিল আর খাবার জন্যে ঢালাও মদের ব্যবস্থা ছিল। দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থাটাও ছিল খুব নিখুঁত, কোন ভয় ছিল না, শুধু এই দুর্গে একটাই জিনিস ছিল না তা হচ্ছে— "রক্তাক্ত মৃত্যু"।

রক্তাক্ত মৃত্যুর কথা বলার আগে দুর্গটার বর্ণনা দিয়ে নিই। এই দুর্গটা ছিল সাতটা ঘরওয়ালা একটা রাজকীয় অট্টালিকা। এই বিরাট ঘরগুলোর সবটা এক নজরে দেখা যায় না। কারণ ঘরগুলোর দরজাগুলো ছিল অদ্ভুত ধরনের। আসলে এই রকম অসম্পূর্ণ দেখানোটাই ছিল ঘরগুলোর বৈশিষ্ট্য। কুড়ি কিংবা তিরিশ গজ অন্তর একটা করে বাঁক ছিল আর এই প্রতিটি বাকই দেখলে কেমন রহস্যময় মনে হতো। দেওয়ালের ডান বা দু' দিকেই ঠিক মাঝখানে একটা করে লম্বাটে ধরনের ভতুড়ে জানালা বসানো ছিল। ঘরের বাইরে ছিল টানা বারান্দা। প্রতিটি ঘরেই খোলামেলা বাতাস বয়ে যেত। প্রত্যেকটা জানালায় কাচ লাগানো ছিল। কিন্তু জানালার কাচের রংগুলো ছিল অদ্ভুত ধরনের। প্রত্যেক ঘরের প্রতিটি সরঞ্জাম যে রঙের ছিল সেই ঘরের জানালার কাচের রঙটা ওই ঘরের সাজ সরঞ্জামের রঙের মতো ছিল।

যেমন পূর্বদিকের প্রথম ঘরের প্রতিটি সাজ সরঞ্জাম নীল রঙের ছিল, তাই ঐ ঘরের জানালার কাচের রঙটাও নীল রঙের ছিল। দ্বিতীয় ঘরটায় বেগুনী রঙের জিনিসপত্র সাজানো ছিল, তাই ঘরের জানালার কাচও বেগুনি রঙের ছিল। এইভাবে তৃতীয় ঘরের জানালার কাচের রঙ সবুজ। চার নম্বর ঘরের জানালার কাচের রঙ কমলা। পাচ নম্বর ঘরের জানালার কাচের রঙ সাদা। ছয় নম্বর ঘরটার জানালার কাচের রঙ ছিল ধূসর। আর পশ্চিমদিকের সাত নম্বর ঘরটার প্রতিটি সাজ সরঞ্জাম ছিল কালো রঙের। এই ঘরের কড়িকাঠ থেকে মেঝে পর্যন্ত সবকিছুই কালো রঙের ছিল। এমনকি ঝুলে থাকা পর্দাগুলো আর মেঝেয় বিছানো কার্পেটটাও কালো রঙের ছিল। কিন্তু এই সাত নম্বর ঘরের জানালার কাচের রঙটা ছিল আলাদা। কালো না হয়ে লাল রঙ ছিল। এই লাল রঙটা দেখলেই মনে হতো—তাজা আর ঘন রক্তের মতো।

দুর্গের সাতটা ঘরের মধ্যে কোনটাতেই কিন্তু আলোর ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি কড়িকাঠের ঝোলানো ঝাড়বাতি কিংবা প্রদীপ কোন কিছুরই ব্যবস্থা ছিল না। শুধু মাঝখানে কিছু সোনার অলংকার ছাদ বেয়ে নেমে এসে এদিক ওদিক ঝুলানো ছিল। যার ফলে সব ঘরগুলোই আলোবিহীন ছিল। শুধু ঘরের বাইরে লম্বা বারান্দায় প্রতিটি জানালার ঠিক উল্টোদিকের বারান্দাতে একটা করে তিনপায়া টুল রাখা ছিল আর এই টুলের উপর রাখা থাকতো জ্বলন্ত অঙ্গারের পাত্র। এই জ্বলন্ত অঙ্গার থেকে

যে আলো বের হতো তা রঙীন জানালাগুলোর কাঁচ ভেদ করে ঘরের মধ্যে যখন পড়ত তখন প্রতিটি ঘরই কেমন রহস্যময় হয়ে উঠত। যেন একটা ভৌতিক আবহাওয়া সৃষ্টি হতো। এই সাতটা ঘরের মধ্যে সবচেয়ে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি হতো পশ্চিমদিকের সাত নম্বর ঘরটায়। অঙ্গারের আলো যখন ওই লাল ঘন রক্তের বঙের কাঁচের জানালা ভেদ করে ঘরের মধ্যে দিযে কালো পর্দাগুলোয ও মেঝের কার্পেটের উপর পডত তখন সমস্ত রকমের গা ছম্‌ছম্‌ করা ভুতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি হতো। এই পরিবেশে যদি কেউ এই ঘরে ঢুকতো তখন তার মুখটায় একটা নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর ভাব ফুটে উঠতো। যার জন্যে এই ঘরটাকে দুর্গেব সবাই এড়িয়ে চলতো। খুব কম লোকই এই সাত নম্বর ঘরটায় ঢুকতে সাহস পেত।

সাত নম্বর ঘরটার পশ্চিম দিকের দেওয়ালে আর একটা অদ্ভুত জিনিস রাখা ছিল। তা হচ্ছে মস্তবড আবলুস কাঠের ঘড়ি। এই ঘড়ির পেন্ডুলামটা ছিল বিশ্রী, কেমন যেন একঘেযে বিশ্রীভাবে শব্দ করে দুলতে থাকতো, মিনিটের কাঁটাটা সব ঘর পাক খেয়ে যখন একটা ঘণ্টা পুরো হতো তখনই ঘড়িটার পেতলের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে একটা অদ্ভুত ধরনেব শব্দ বেরিয়ে আসত, শব্দটা ছিল পরিষ্কার, জোরালো ও গম্ভীর। এই শব্দের মধ্যে একটা যাদু ছিল, যখনই শব্দটা হতো তখন যারা বাদ্যযন্ত্রগুলো বাজাত তারা সেসব বাজনা থামিযে চুপটি করে শব্দ শুনতো। নাচ, গান তখন সব থেমে যেত, সমস্ত কিছুই কেমন এলোমেলো হয়ে যেত। সবাই যেন এই শব্দ থেকে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করতো আর সবাই হতবুদ্ধি হয়ে পডত, শব্দটা যখন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেত তখন আবার সবাই সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠত। একে অন্যের দিকে তাকাতো, হাসতো, গল্প করতো। ওদের এই হাসি, তাকানো দেখলেই মনে হতো সবটাই ওদের ভয়ের জন্যে, তারপর ওরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো, বলতো আবার যখন এই শব্দটা হবে তখন আর ওরা এমনি করে বোকার মতো চুপ করে থাকবে না, কিন্তু ওদের বলাই সার হতো। সেই ষাট মিনিট অর্থাৎ তিন হাজার ছশো সেকেন্ড পরে ঘড়িটা আবার এই অদ্ভুত সুরে বেজে উঠত, তখন আর ওদের আগের কথা মনে থাকতো না। আগেব মতো সবকিছু থেমে যেত, মানুষগুলো সব বোকার মতো নিশ্চুপ হযে যেত, ওরা সবাই কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করতো। প্রতি ঘণ্টায এই রকম অদ্ভুত শব্দ শুনে চুপ করে গেলেও ওদের আনন্দের অনুষ্ঠান ঠিকভাবেই চলতো। তাতে কোনরকম ত্রুটি ছিল না।

এই সাত নম্বর ঘরের সমস্ত সাজসজ্জাগুলো রাজকুমার প্রসপেরোর রুচি অনুযায়ীই হয়েছিল, এতেই ওঁব অদ্ভুত ধরনের রুচির পরিচয় আমরা পাই। তাছাড়া তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো চলতো। এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে শুধু একটাই পরিবেশ সৃষ্টি হতো যেটা হচ্ছে গতিময় ও ভৌতিক আবহাওয়ার, অবশ্য "হারমানি" দেখার পর থেকেই রাজকুমারের মাথায় এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত পরিকল্পনাগুলো এসেছে। তাছাড়া এখানকার মানুষগুলোও সবকিছুই দেখলে মনে হয় কোন কিছু সুস্থ নয়, সব কেমন এলোমেলো, অগোছালো।

নির্জন, নিখুঁত নিরাপত্তা থাকায় দুর্গের মধ্যে সবাই খুবই আনন্দের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। এইভাবে প্রায় পাঁচ-ছয় মাস কেটেও গেল। হঠাৎ ছয় মাসের শেষ হবার আগেই সেই অভিশপ্ত ব্যাধির আক্রমণ শুরু হলো। ঘটনাটা যেদিন ঘটে সেদিন রাজকুমার প্রসপেরো তাঁর হাজারখানেক মজুরদের সঙ্গে নাচ-গানের আসরে আনন্দে, উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছিলেন। ঘরগুলো সব যেন ভয়াবহ মনে হতে থাকে। মনে হলো, ঘরের রঙগুলো যেন তারা চুষে নিচ্ছে! হঠাৎ আবলুস কাঠের সেই ঘড়িটার শব্দ বাজতে থাকে যার ফলে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের বাজনা থেমে যায়, চারদিকে নিস্তব্ধ-নীরবতা নেমে আসে। সবাই যেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। শব্দটা থামতেই আবার বাদ্যযন্ত্রগুলো বেজে ওঠে, সবাই হাসি, গল্পে মুখর হয়ে ওঠে। আনন্দ-স্ফূর্তির বন্যা বয়ে চলে। তিনপায়া টুলে রাখা সেই জ্বলন্ত অঙ্গারের আলোগুলো রঙীন কাঁচের জানালাগুলো ভেদ করে এক এক ঘরে বিভিন্ন রঙের পরিবেশ সৃষ্টি করতে থাকে। সব ঘরগুলোর মধ্যে সাত নম্বর ঘরটা আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

উৎসবের রাত ক্রমশ বেড়ে চলে। লাল জানালার কাঁচ ফুঁড়ে রক্তের মতো লাল আলো সাত নম্বর ঘরটার কালো রঙের সাজ-সরঞ্জামের উপর এসে পড়তে থাকে আর ঠিক তখনই একটা মূর্তি সাত নম্বর ঘরে কালো কার্পেটে পা রাখে, তার দেহটা লাল আলোয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময় আবলুস কাঠের ঘড়িটা সুরেলা ছন্দে বেজে ওঠে, অন্যসব ঘরের লোকেরা সেই শব্দ শুনতে পায়, শুধু সাত নম্বর ঘরটা ছাড়া বাকি ঘরগুলোতে লোকেব ভিড। ওদের এই উৎসব চলে ঠিক মাঝরাত পর্যন্ত। প্রতিদিনই প্রতি ঘণ্টায় ঘড়ির শব্দে ওদের নাচ, গান, কথাবার্তা সব থেমে যায়। আজ আবার শব্দটা আরম্ভ হতেই রোজকার মতো সব থেমে গেল। মানুষগুলোর মধ্যে একটা বিহ্বলতা নেমে আসে। তারপর যখন ঘড়িটার শেষ শব্দটা খুব আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়, ঠিক তখনই ভিড়ের মধ্যে অনেকেই একজন মুখোশধারীর অস্তিত্ব টের পায়, যাকে এক মুহূর্ত আগেও দেখা যায়নি। সকলেই এই অদ্ভুত আকৃতির লোকটার উপস্থিতি নিয়ে চাপাস্বরে ফিসফিস করে আলোচনা করতে থাকে। সবার চোখে বিস্ময়, তীব্র আতংক, ভয়ে সবাই মরিয়া হয়ে ওঠে। অদৃশ্য মূর্তিটার আকৃতিটাও বীভৎস, বিরাট লম্বা, দৈত্যেব মতো দেখতে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা রহস্যের শিহরন, মুখে আটকানো মুখোশ, পোশাক-পরিচ্ছদগুলো সব যেন ঘন লাল রক্তবর্ণ, দেখলেই দেহের রক্ত সব হিম হয়ে আসে।

সেই সময় রাজকুমার প্রসপেরোর দৃষ্টিটা ঐ ভুতুড়ে মূর্তিটার উপর গিয়ে পড়ে। মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে কর্কশ গলায় বলে ওঠেন—এতদূর স্পর্ধা?

মূর্তিটা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, রাজকুমার ওর সাহস দেখে ক্ষেপে ওঠেন। রুক্ষস্বরে বলেন-- ওর স্পর্ধা তো কম নয়। আমাদের উপহাস করছে, অপমান করছে। ওকে তোমরা সবাই মিলে ধরো, ওর মুখোশটা খুলে দাও। তাহলে আমরা জানতে পারবো আগামীকাল ভোরে কাকে আমবা ফাঁসিকাঠে ঝোলাবো।

রাজকমার প্রসপেরো পূর্বদিকের নীল ঘরটায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছিলেন। আর

এই ঘরেই ঘটনার প্রথম সূত্রপাত। ওঁর হাতের ইশারায় সমস্ত বাজনা থেমে গেল। রাজকুমার তখন নিজের দলের লোকজনদের নিয়ে একইভাবে ঘরটার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন। দলের লোকজনেরা মুখোশধারী দৈত্যের দিকে এগিয়ে যায় তাকে ধরবার জন্যে কিন্তু মূর্তিটা সেদিকে কোনরকম লক্ষ্য না করেই এগিয়ে যায় রাজকুমারের দিকে। একটা অজানা আতংকে সবাই থেমে যায়, কারও সাহসে কুলোয় না মূর্তিটাকে জাপটে ধরতে। এতক্ষণে মূর্তিটা রাজকুমার প্রসপেরোর সবচাইতে কাছের লোহাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ওদের মধ্যে দূরত্ব মাত্র গজখানেকের মতো। এবার মূর্তিটা ঘরের মাঝখানটা পার হয়ে একেবারে শেষপ্রান্তে দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর ভয়ংকর মূর্তিটা নিজের যাবার রাস্তা করে নেয়, ওর প্রতিটি পদক্ষেপ যেন মাপা আর জোরালো। প্রথমে মূর্তিটা নীল রঙের ঘর থেকে ছুটে যায় বেগুনী রঙের ঘরে, সেখান থেকে যায় সবুজ রঙের ঘরে, তারপর কমলা রঙের ঘরে ঢোকে। এখানে মূর্তিটা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

রাজকুমার প্রসপেরোর মধ্যে ক্রোধ আর ভয় দুটো মিলে কাজ করতে থাকে। মনে মনে ভীষণ ক্ষেপে ওঠেন। তার সঙ্গে একটা ভয়মিশ্রিত লজ্জা আর অপমানে রাজকুমার প্রসপেরো মরিয়া হয়ে ওঠেন। তিনি মূর্তিটার পিছন পিছন ধাওয়া করে চলেন। কিন্তু ওঁর সঙ্গীরা কেউই তাকে অনুসরণ করে না। রাজকুমার প্রসপেরো মূর্তিটার পিছন পিছন একের পর এক ঘরে ঢোকেন, হাতে তার ঝকঝকে একটা ছুরি, যার তীক্ষ্ণ ফলাটা চক্চক্ করে ওঠে প্রতিহিংসা, অপমান ও ক্রোধে।

সবশেষে রাজকুমার প্রসপেরো আর দৈত্যটা সাত নম্বর ঘরে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। রক্তের মতো লাল আলো ঘরের মধ্যে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। খানিক বাদে ঘরের মধ্যে থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ সমস্ত জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, আর রাজকুমারের তীক্ষ্ণ ফলাওয়ালা ছুরিটা কালো কার্পেটের উপর গিয়ে ছিটকে পড়ে। তারপর রক্তাক্ত দেহে রাজকুমার প্রসপেরোর মৃতদেহটা কালো কার্পেটের উপর আছড়ে পড়ে।

তারপরের ঘটনাগুলো খুবই দ্রুত ঘটে যায়। সবাই তখন আতংকে, ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে। কারও কোন কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না। হঠাৎ রাজকুমারের তীক্ষ্ণ চিৎকার ওদের সবাইকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনে। এবার সবাই মরিয়া হয়ে মনের সাহস জোগাড় করে ছুটে যায় লাল রঙের ঘরটার দিকে। হুড়মুড় করে ঘরে সবাই ঢুকে পড়ে ও তার সাথে সবাই দেখতে পায় সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা, যা দেখে ওরা আতংকে শিউরে ওঠে, মুখের ভাষা সব বন্ধ হয়ে যায়।

সবাই আতংকিত চোখে তাকিয়ে দেখে সামনে সেই আবলুস কাঠের ঘড়িটার ঠিক পিছনে লম্বা বিকট আর ভয়ঙ্কর দৈত্যটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হবে একটা পাথরের খোদাই করা মূর্তি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কবর থেকে উঠে আসা মুখোশধারী মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর ভয়ে সবার শ্বাসবন্ধ হয়ে এলো। এই মুহূর্তে প্রত্যেকেই রক্তাক্ত মৃত্যুর উপস্থিতি টের পায়। সবাই বুঝতে পারে এই

মূর্তিটা হচ্ছে একটা পিশাচ। মানুষের রক্তেই যার ক্ষিধে মেটে। মাঝরাতে যে সকলের অলক্ষ্যে চোরের মতো এই দুর্গে ঢুকে পড়েছে।

তারপর থেকে চলে একের পর এক রক্তাক্ত হত্যালীলা। আর তার সাথে সাত নম্বর ঘরটায় রক্তের স্রোত বয়ে চলে। দুর্গের সবাই মৃত্যুভয়ে দিশেহারা হয়ে ওঠে। এই ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত মৃত্যুর থেকে বাঁচবার জন্যে সবাই মরিয়া হযে ওঠে। কিন্তু পালাবার কোন পথই নেই ওদের। এইভাবে একের পর এক মানুষের সংখ্যা কমতে থাকে, তার সাথে দুর্গটা জনশূন্য হয়ে পড়ে। আবলুস কাঠের অদ্ভুত ঘড়িটা স্তব্ধ হয়ে যায়, বাইরের বারান্দায় রাখা জ্বলন্ত অঙ্গারগুলো নিভে যায়, লোকজনহীন সমস্ত দুর্গটা জুড়ে একটা রহস্যময় গভীর অন্ধকার নেমে আসে। শুধু এই দুর্গটার মধ্যে বেঁচে থাকে একরাশ অন্ধকার আর মৃত্যু। রক্তাক্ত মৃত্যু তাব আধিপত্য বিস্তাব করে বেঁচে থাকে এই রহস্যমষ দুর্গটার মধ্যে আর তার অভিশপ্ত ব্যাধির বিস্তাব ঘটে।

অনুবাদ : প্রীতি পালচৌধুরী

ছোটখাটো ভালোমানুষ ভূত

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ডমরুধর গল্প বলছিলেন সুন্দরবন থেকে আমাদের বাড়ি আসতে হলে অনেক দূর নৌকোয আসতে হয়। তারপর পাঁচ ক্রোশ পথ হাঁটতেও হয। সন্ধ্যার সময আমি বাড়ির পথে হাঁটছি, ভেড়িতে লোকজনেরা মাছ ধরছিল। তাদের কাছ থেকে একটা ভেটকি মাছ চেযে নিলাম। ভেটকি মাছটা হাতে নিযে আমি পথ চলতে লাগলাম। সকলেই জানে যে মাছ দেখলে ভূতের লোভ হয়। দু' ক্রোশ পথ গেছি। রাত প্রায় এক প্রহব হয়েছে। এমন সময় একটা ভূত আমার সঙ্গ নিল, 'দেঁনা, দেঁনা' বলে আমার পিছু পিছু আসতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি, আমার বেশ ভয় করছিল। কিন্তু ভূতকে মাছ দিলে আর রক্ষা নেই! তা হলেই সে মানুষকে প্রাণে মেরে ফেলবে। সেজন্যে তার কথা আমি শুনলাম না। তাকে কিছুতেই মাছ দিলাম না। কিছুদূর গিয়েছি এমন সময় আর একটা ভূত এসে জুটল। একটা আমার ডানদিকে আর একটা আমার বাঁ দিকে। আমার দু' পাশে দুটো ভূত। হাত পেতে 'দেঁনা, দেঁনা' বলতে বলতে আমার সঙ্গে চলল। কিন্তু কিছুতেই আমি তাদের মাছ দিলাম না। শেষ পর্যন্ত তারা আর লোভ সামলাতে পারল না। কানকোতে হাত দিয়ে মাছের মাথার দিক আমি ধরেছিলাম, মাছের অপর দিক তারা খপ করে ধরে ফেলল। অন্য

দিকটা ধবে তাবা মাছটা আমাব হাত থেকে কেড়ে নিতে চেষ্টা কবল। আমি মাছেব কানকোব দিক, তাবা মাছেব লেজেব দিক ধবে— সেই মাঠেব মাঝখানে সন্ধেবেলা জোব টানাটানি শুরু হল। কিন্তু আমি একা, ভূত হল দু'জন। দ'জনেব সঙ্গে আমি কতক্ষণ টানাটানি কবতে পাবি। ক্রমে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তখন উপায় না দেখে একটা ভূতেব হাতে কামড় মাবলাম। বলব কী সে ভূতেব হাতেব কথা! ঠিক যেন কাঠেব উপব কামড় মাবলাম। সে কী ভয়ংকব দুর্গন্ধ। আমাব এই মানুষেব নাকে অমন দুর্গন্ধ কখনো শুঁকিনি।

আমাব দাত নেই বটে কিন্তু সেই ফোকলা মুখেব এক কামড়েই ভূত দুটো দৌড়ে পালাল। এদিকে দুর্গন্ধে তখন আমাব বাববাব গা গুলিয়ে বমি হতে আবস্ত কবেছে। এমন কষ্ট হচ্ছে যে মনে হল যেন পেটেব নাড়িভুঁড়ি সব বেবিয়ে যাবে। আমি চোখ বুজে সেখানে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পবে মনে হল কে যেন আমাব মাথায় মুখে জল দিচ্ছে। তাতে শবীবটাও খানিকটা হালকা মনে হল। চোখ চেয়ে দেখলাম কী আশ্চর্য! এ আবাব কী? একটা ছোটখাটো নতুন ভূত এসে আমাব সেবাশুশ্রূষা কবছে। আমি উঠে বসলাম। তক্ষুনি ভূতটা কিছু দূবে পালিয়ে গেল। আমাব মাছটি যে চুবি কবেনি। মাছ সেই জায়গাতেই পড়ে ছিল, মাছটা নিয়ে আস্তে আস্তে আমি বাড়িব দিকে বওনা দিলাম।

নতুন ভূতটা দূবে দূবে আমাব সঙ্গে আসতে লাগল। সে আমাব কাছে মাছ চাইল না। কোনও কথাও বলল না। বুঝলাম যে সে অতি ভালোমানুষ ভূত। তা ছাড়া স্বভাবেও সে অতি ভীতু প্রকৃতিব। একবাব আমি কাশলাম আব অমনি সে ভয়ে দূবে পালিয়ে গেল। একবাব আমি হাঁচলাম আবাব সে দূবে পালাল। একবাব কুকুব ডেকে উঠল, অমনি সে ভয়ে দূবে সবে গেল। কিন্তু সে আমাকে একেবাবে ছেড়ে গেল না। ভয় পেয়ে একবাব পালিয়ে যায়, তাবপব আবাব এসে উপস্থিত হয়। এবকম ভীতু ভূত কখনো দেখিনি। তখন বুঝলাম ভগবান আমাকে এই ছোটখাটো ভূতটিকে উপহাব দিয়েছেন।

শেষকালে আমি তাকে বললাম, 'দেখ, ভালোমানুষ ভূত, তুমি আমাব উপকাব কবেছ। আমাব সেবাশুশ্রূষা কবেছ। আমাব সঙ্গে তুমি চল, দু'খানা ভাজা মাছ আমি তোমাকে দেব।'

ঘবে গিয়ে আমাব গিন্নি এলোকেশীকে মাছটা দিলাম। বান্নাঘবে এলোকেশী মাছ ভাজতে লাগল। কয়েকখানা মাছ যেই ভাজা হয়েছে অমনি বান্নাঘবেব ঘুলঘুলি থেকে ভালোমানুষ ভূত হাত বাড়াল। তাব হাতে চাবখানা মাছ দিলাম, আব তাকে বললাম, 'কাল আবাব এস তোমাকে ভাল মাছ দেব।' পবদিন বিকেলবেলা খুঁদিবাম মণ্ডলেব পুকুবে চুপচাপ হাত সুতো ফেলে একটা রুই মাছ ধবলাম। আবাব ভূতকে চাবখানি মাছ দিলাম। এইবকম আমি নিত্যই অন্যেব পুকুব থেকে মাছ ধবতে লাগলাম আব নিত্যই ছোটখাটো ভালমানুষ ভূতটিকে মাছ দিতে লাগলাম।

একদিন আমাব গিন্নি এলোকেশী বলল, 'মাছ ভাজবাব সময় তুমি বোজ বান্নাঘবে

আস কেন? দিনের বেলায় না এসে তুমি রোজ সন্ধেবেলা পুকুর থেকে মাছ নিয়ে আস কেন? ঘুলঘুলির কাছে দাঁড়িয়ে তুমি চুপিচুপি কার সঙ্গে কথা বল?'

আমি বললাম, 'আবাদ থেকে এবার একটা ভূত এনেছি। মনে করেছি যে ভূতটা ভালো করে পোষ মানলে ওকে নিয়ে কলকাতায় যাব। যারা ঘোড়ার নাচ দেখায় তাদের কাছে ভূতটা বিক্রি করব। অনেক টাকা পাব। কিন্তু এ ভূতটা বড্ডই ভীতু। তুমি ঘুলঘুলির কাছে যেও না। তোমার চেহারা দেখলে ভূত ভয়ে পালাবে।'

পরদিন সন্ধেবেলা নবাই ঘোষের পুকুর থেকে একটা বড় মিরগেল মাছ ধরে আমি এলোকেশীকে দিলাম। এলোকেশী সেই মাছ যখন ভাজছিল, সেই সময়ে যথারীতি আমি রান্নাঘরে গেলাম, যথারীতি ভূতও রান্নাঘরের ঘুলঘুলি থেকে হাত বাড়াল। মাছ নিয়ে যেই আমি ভূতকে দিয়েছি পেছন থেকে অমনি এলোকেশী মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

ভূত একবার মাত্র এলোকেশীর মুখের দিকে চাইল। এলোকেশীর সেই অদ্ভুত মুখশ্রী দেখে আতঙ্কে দম বন্ধ করে সে সেখান থেকে পালাতে লাগল

'করলে কী! করলে কী!' এই কথা বলতে বলতে তক্ষুনি আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। মনে করলাম, বুঝিয়েসুঝিয়ে ভূতটিকে ফিরিয়ে আনব। বাগানে গিয়ে দেখি ভূত ছুটতে ছুটতে ঈশান কোণের সেই ভয়ানক খেজুর গাছটায় গিয়ে চড়েছে। আমি ভাবলাম— যাঃ, এইবার ভূতটার প্রাণ গেল। এমন আমার শখের ভূত এইবার মারা পড়ল।

শ্রোতারা ডমরুকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খেজুর গাছের ওপর উঠে ভূত মারা পড়বে— সে কী রকম খেজুর গাছ? আর ভূত কি কখনো মারা যায়?'

ডমরুধর বললেন, 'এ সামান্য খেজুর গাছ নয়। এ গাছ জীবজন্তু মানুষ পর্যন্ত খেয়ে নেয়। তারপর গাছের নিচে কেবল হাড় চামড়াগুলো ফেলে রেখে। সুন্দরবন থেকে আমি এ গাছের বীজ এনে নিজের বাড়ির বাগানে লাগিয়েছিলাম।'

লম্বোদর বললেন, 'বইতে এ ধরনের গাছের কথা পড়েছিলাম বটে। তবে তারা ছোট পোকামাকড় খায় এরকম জীবজন্তু খাওয়ার কথা তো কখনো শুনিনি।'

ডমরুধর বললেন, 'আপনারা সাধারণ সাদাসিধে মানুষ, এসব কথা কী করে জানবেন। আমার বাগানের গাছটিকে আমি সবসময় ঘিরে রাখতাম, কাউকে কাছে যেতে দিতাম না। ভূত যখন তার ওপর গিয়ে উঠল আমি তার প্রাণের আশা ছেড়ে দিলাম। ক্রমে যা ভয় করছিলাম তাই হল। যেই ভূত গাছের মাথার কাছে গিয়ে উঠল, সেই সময় পাতাগুলো সোজা উঁচু হয়ে দাঁড়াল, ভূতের সমস্ত শরীর ঢেকে দিল। ভূতের গা নিংড়ে কালো রঙের রক্ত গাছের গা দিয়ে দরদর ধারায় গড়াতে লাগল। শেষকালে ভূতের খোসাটা নিচে পড়ল।'

[illegible] জিজ্ঞেস করলেন, 'ভূতের খোসা—সে আবার কী?' ডমরুধর উত্তর [illegible] মাংস রক্ত সব এই ভয়ঙ্কর গাছ চুষে খেয়ে ফেলেছিল। ছারপোকার [illegible]? মটর ডাল মুসুরির ডালের খোসা দেখেছ? ভূতের খোসাও সেইরকম,

তবে অনেক বড। যা হোক পবদিন আমি গাছটাকে কেটে ফেললাম। তা না হলে তোমাদেব দেখাতে পাবতাম।'

পোষা ভূতটিব কথা ভেবে ডমরুধব গভীব দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

একটি ভৌতিক কাহিনী

প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যায

আমাব নাম শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ। নিবাস বীবভূম জেলাব টগবা নামক গ্রামে। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে আমি বি. এ. পাশ কবিযা চাকবিব সন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কযেকমাস ধবিযা বহু স্থানে বহু আবেদন কবিলাম কিন্তু কোনওরূপ ফল ফলিল না। অবশেষে সিউডী জেলা স্কুলে দ্বিতীয শিক্ষকেব পদ শূন্য হইযাছে সংবাদ পাইযা স্বযং সদবে গিযা বহু লোকেব খোসামোদ কবিযা উক্ত কর্মে নিযুক্ত হইলাম। আমাব বেতন হইল মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

আমাদেব গ্রাম হইতে সিউডী বাবো ক্রোশ পথ ব্যবধান। ববাবব একটি কাঁচা বাস্তা আছে। আমি গ্রামে ফিবিযা গিযা নিজেব জিনিসপত্র লইযা আসিযা দুই দিন পবে নূতন কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন অল্প বেতন, সেইরূপ একই ছোটখাটো সস্তা বাডি খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু পাইলাম না। হেড মাস্টাব মহাশযেব বাসাতেই শযন ও আহাবাদি কবি, দিবসে বিদ্যালযে কর্ম কবি, এবং অবসব সমযে বাসা খুঁজিয়া বেডাই। অবশেষে শহবেব প্রান্তে একটি বৃহৎ খালি পাকা বাডিব সন্ধান পাইলাম। বাডিটি বহুকাল খালি পডিযা আছে। স্থানে স্থানে ভগ্ন তথাপি বাসোপযোগী কযেকখানি ঘব তাহাতে ছিল। মাসিক পাচ সিকা মাত্র ভাডা দিলেই বাডিখানি পাওযা যায। কিন্তু গুজব এই যে বাডিটিতে ভূত আছে। তখন আমি সদ্য কলেজেব ছোকবা—ইযংবেঙ্গল ভূতেব ভযে যদি পশ্চাৎপদ হই তবে আমাব বিদ্যা মর্যাদা একেবাবে ধূলিসাৎ হইযা যায। সুতবাং বাডিটি লওযাই স্থিব কবিলাম। কিন্তু অত দূবে একাকী থাকা নিবাপদ নহে, চোবডাকাতেব ভযও ত আছে—তাই একজন সঙ্গী অনুসন্ধান কবিতে লাগিলাম। একজন জুটিযাও গেলেন, তিনি আমাদেবই স্কুলেব চতুর্থ শিক্ষক—নাম বাসবিহাবী মুখোপাধ্যায। যদিও তিনি বি. এ. পাশ কবেন নাই, তথাপি কলেজে অধ্যয়ন করিযাছেন এবং নিজেকে ইযংবেঙ্গল শ্রেণীভুক্তই মনে করেন। তাঁহাব পূর্ব বাসায কিছু অসুবিধা হইতেছিল, তাই তিনি আমার সহিত যোগদান করিয়া সেই বাড়িটি লইতে প্রস্তুত হইলেন। একজন ভৃত্য ও একজন পাচক ব্রাহ্মণ স্থিব

করা গেল কিন্তু তাহারা রাত্রিকালে সে বাড়িতে থাকিতে অস্বীকৃত হইল, বলিল কাজকর্ম সারিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া রাত্রি নয়টার মধ্যেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কি করি, তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। পরবর্তী রবিবারে প্রাতে জিনিসপত্র লইয়া সেই বাড়িতে গিয়া বাসা করিলাম।

বাড়িটি বহুকালের নির্মিত। চারিদিকের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন, গো-মহিষাদি নিবারণ করিবার জন্য বাঁশের বেড়া বাধা আছে। বাড়িটির চারিদিকে বাগান। অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঠাল, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। সেগুলি ফড়িয়াগণের নিকট জমা দেওয়া। বাড়িটি দ্বিতল। নিম্নতলে সম্মুখভাগে বেশ বড় বড় দুইখানি ঘর আছে, সেই ঘর দুটি মাত্র আমরা দখল করিলাম, কারণ আমাদের প্রয়োজন অল্প। বাড়ির পশ্চাতে একটি পুষ্করিণী, তাহার জল পানযোগ্য নহে, স্নানযোগ্যও নহে, তবে বাসনমাজা প্রভৃতি গৃহকর্ম তাহাতে হইতে পারিত। বাড়ির অল্পদূরে একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘিকা ছিল, আমরা সেইখানে গিয়াই স্নান করিতাম, এবং পান রন্ধনের জন্য সেই জল ভৃত্য আনয়ন করিত। একখানি ঘর আহারাদি করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিলাম। অপর খানিতে দুইটি চৌকি পাতিয়া আমরা দুইজনে শয়ন করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরে প্রদীপ জ্বালা থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন যায়। ইতিমধ্যে দশহরার দুইদিন ছুটি হইল, সেইসঙ্গে একটা রবিবারও পাওয়া গেল। আমি বাড়ি গেলাম।

বাড়িতে দুইদিন মাত্র থাকিয়া তৃতীয় দিন প্রভাতে পদব্রজে সিউড়ী যাত্রা করিলাম। আমাদের গ্রামের এক ক্রোশ পরে হাতছালা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। পূর্বে এখানে স্থানীয় জমিদারের অনেকগুলি হাতি বাধা থাকিত, হাতিশালা হইতে হাতছালা নামটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই গ্রামের প্রান্তে সড়কের ধারে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে রমাপ্রসন্ন মজুমদার নামক একজন ব্রাহ্মণ সর্বদা বাস করেন এবং আপনার তপ জপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে। সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, মজুমদার মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আশীর্বাদ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "বাবা তুমি কোথা যাইতেছ ?"

আমি উত্তর করিলাম "সিউড়ী স্কুলে আমার একটি মাস্টারি চাকরি হইয়াছে। দশহরার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলাম। কল্য স্কুল খুলিবে, তাই ফিরিয়া যাইতেছি।"

মজুমদার মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন--"বাবা, আজ কি তোমার না গেলেই নয় ? আজ বাড়ি ফিরিয়া যাও, কল্য যাইও।"

আমি বলিলাম -"কল্য স্কুল খুলিবে। আমার নূতন চাকরি, কামাই হওয়াটা বড়ো খারাপ কথা, সুতরাং আমাকে ওরূপ অবজ্ঞা করিবেন না।"

মজুমদার মহাশয় বলিলেন- -"তুমি কোথায় বাসা লইয়াছ ?"

"শহরের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন খালি বাড়ি ছিল, সেইটি ভাড়া লইয়া

আমি ও আমাদের স্কুলের অন্য একটি মাস্টার বাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একত্রে বাসা করিয়াছি।"—বলিয়া মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় সিউড়ী পৌঁছিলাম। স্নানাহার করিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। আহার করিয়া বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, এমন সময় দেখি আমাদেরই গ্রামের একজন কৈবর্ত বৃহৎ লাঠি ঘাড়ে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি রে। তুই হঠাৎ কোথা থেকে এলি ?"

সে বলিল—"আজ্ঞে, মা ঠাকুরাণী এই চিঠি দিয়েছেন এবং এই একটি কবচ আপনার হাতে পরবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" বলিয়া চিঠি ও কবচ দিল।

চিঠি পড়িয়া দেখিলাম, মাতা ঠাকুরাণী লিখিতেছেন —"তুমি বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার পর রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আসিয়াছিলেন এবং একটি কবচ দিয়া বলিলেন 'মা, তোমার ছেলে আজ প্রাতে সিউড়ী রওনা হইয়াছে, পথে তাহার সঙ্গে দেখা হইল, তাহার জন্য আমি এই রামকবচটি আনিয়াছি, তুমি যেমন করিয়া পার আজই এই কবচটি তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দাও এবং বিশেষ অনুরোধ করিয়া লেখ যেন আজই সে এই কবচটি ধারণ করে। আর লিখিয়া দাও, যদি কোনরকম ভয় পায় তবে যেন তারকব্রহ্ম নাম জপ করে। এই কবচের গুণে এবং নামের বলে সে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে।' সুতরাং আমি দীন কৈবর্তকে দিয়া এই চিঠি ও কবচ পাঠাইলাম। প্রাপ্তমাত্রে রামনাম স্মরণ করিয়া তুমি কবচটি ভক্তিপূর্বক দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে, যেন কোনমতে অন্যথা না হয়। ইহা তোমার মাতৃ আজ্ঞা বলিয়া জানিবে।"

পত্র ও কবচ লইয়া আমি দীনুকে বলিলাম, "তুই আজ এইখানেই থাকবি ত ? তোর খাবার জোগাড় করি।"

সে বলিল—"আজ্ঞে না, মা ঠাকুরাণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তুই নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কবচটি পরাইয়া দিবি এবং আজ রাত্রেই আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবি যে, আমার ছেলে কবচ পরিয়াছে।"

সুতরাং তাহাকে থাকিবার জন্য আর অনুরোধ করিলাম না। তাহার হাতে দুই আনা পয়সা দিয়া বলিলাম "এই নে, বাজার হইতে কিছু মুড়ি মুড়কি কিনিয়া পথে খাইতে খাইতে যাইবি।" তাহার সম্মুখে কবচটি আমি হস্তে ধারণ করিলাম। সে আমায় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর যথাসময়ে দুইজনে শয়ন করিলাম। উভয়ের চৌকির শিয়রে দুইটি বড় বড় জানালা খোলা ছিল। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রবল বায়ু আসিয়া মেঘকে উড়াইয়া একাদশীর চন্দ্রকে দৃশ্যমান করিতেছে। আমরা দুইজনে কিয়ৎক্ষণ গল্পগুজব করিয়া নিস্তব্ধ হইলাম। পথশ্রমে কাতর ছিলাম, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি বাতাসে প্রদীপটা নিবিয়া গিয়াছে। ক্ষীণ

মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে জ্যোৎস্নালোক জানালা পথে প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকের দেওয়ালের একটা অংশ আলোকিত করিয়াছে। ঘুমে জড়িত চক্ষু অল্পে অল্পে খুলিয়া দেখিলাম, যেন একটা কঙ্কালসার বৃদ্ধ আমার শয্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে এবং একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখখানা যেন বহুদিন রোগে শীর্ণ, গালের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তহীন মাড়ীর উপর তাহার ওষ্ঠদ্বয় চুপসিয়া বসিয়া গিয়াছে। মাথায় সাদা ছোট চুলগুলো যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু দুটা হইতে যেন ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রূপের জ্বালা বহির্গত হইতেছে।

দেখিয়া আমি আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিলাম। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আবার চক্ষু খুলিলাম। আবার দেখিলাম সেই বীভৎস মূর্তি ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়া আছে। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, তখন হঠাৎ মাতা ঠাকুরাণীর পত্রের কথা স্মরণ হইল। মনে মনে বলিলাম, আমার ভয় কি, আমার হস্তে রামকবচ রহিয়াছে এবং মৃদুস্বরে তারকব্রহ্মনাম জপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চক্ষু খুলিলাম, তখন সে মূর্তি আর নাই। সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিলাম এবং জড়িতকণ্ঠে আমার বন্ধুকে ডাকিতে লাগিলাম। রাসবিহারীবাবু উঠিয়া বলিলেন --"কি মহাশয় ?"

আমি তখন প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ঘটনা তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনিও অত্যন্ত ভীত হইলেন। সমস্ত রাত্রি আমরা বসিয়া গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আহারাদি করিয়া সাড়ে দশটার সময় স্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় ডাকওয়ালা পিওন একখানি পত্র দিল। দেখিলাম সেখানে রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন। চিঠির তারিখ ও ছাপ গতকল্যকার। চিঠিখানিতে লেখা আছে :

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

পরমশুভাশীর্বাদাঃ সন্তু বিশেষঃ

বাবাজীবন, গতকল্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমি তোমাদের বাটিতে গিয়াছিলাম এবং তোমার মাতা ঠাকুরাণীকে তোমার নিমিত্ত একটি রামকবচ দিয়া আসিয়াছি। তাহাকে অনুরোধ করিয়াছি যে অদ্যই তিনি সেটি যে কোন উপায়ে যেন তোমাকে পাঠাইয়া দেন যাহাতে অদ্যই নিশাগমের পূর্বে কবচটি তুমি ধারণ করিতে পার। বোধ হয় অদ্য রাত্রে তুমি কোনরূপ ভয় পাইবে, কিন্তু সেই রামকবচটির গুণে তোমার কোনও বিপদ হইবে না। কবচটি তুমি নিয়ত ধারণ করিয়া থাকিবে এবং আর যদি কখনও ভয়ের কারণ ঘটে তবে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিবে। সর্বদা শুদ্ধাচারে থাকিবে। অত্র কুশল। মা ভবানী তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি নিয়ত আশীর্বাদক
শ্রীরমাপ্রসন্ন দেবশর্মা

পত্রখানি পড়িয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেখানি রাসবিহারীবাবুকে দেখাইলাম, তিনিও খুব আশ্চর্য হইলেন।

পূজার ছুটির সময় বাড়ি গিয়া প্রথমেই মজুমদার মহাশযকে প্রণাম করিতে গেলাম। যে বিপদ হইতে আমাকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা, আমি যে সেই রাত্রে ভয় পাইব একথা আপনি কি করিযা জানিতে পারিযাছিলেন?"

একটু মৃদু হাস্য করিয়া মজুমদার মহাশয বলিলেন—"তুমি যখন সেদিন আসিযা আমাকে প্রণাম করিলে, তখনই আমি দেখিলাম একটি প্রেতাত্মা তোমার পশ্চাতে বেড়াইতেছে। কোনও কারণে সে তোমার উপর ভযানক ক্রুদ্ধ হইযাছে এবং তোমার প্রাণহানি করিবার মানসেই তোমার সঙ্গ লইয়াছে। কেবল উপযুক্ত ক্ষণ পায় নাই বলিযা সে পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তুমি চলিযা গেলে আমি গণনা করিয়া দেখিলাম যে, সেই রাত্রেই ক্ষণ উপস্থিত হইবে তাই তাড়াতাড়ি একটি রামকবচ লিখিয়া তোমার মাতা ঠাকুরাণীকে দিযা আসিযাছিলাম। যাহা হউক কবচটি তুমি কখনও পরিত্যাগ করিও না।"

আমি বলিলাম—"মজুমদার মহাশয, আমার সঙ্গে যে লোকটি সেই ঘরে শযন করিতেন, তিনি কোনরূপ ভয দেখিলেন না কেন? আমরা উভয়েই একত্র সেই বাড়িতে ছিলাম, তবে আমার উপরেই ভূতের এত আক্রোশ কেন?"

মজুমদার মহাশয জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে লোকটির নাম কি?"

"তাহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায।"

—"তিনি ব্রাহ্মণ, এই কারণে ভূত সহসা তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই। তুমি কাযস্থ, তোমার প্রাণহানি করা তাহার পক্ষে সহজ হইত।"

এই কথা শুনিযা কিযৎক্ষণ আমি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে বলিলাম—"সে ভূত কি এখনও আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে?"

"করিতেছে। আর একবার সে তোমায় দেখা দিবে কিন্তু সে কতদিনে উপস্থিত হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না। কিন্তু এই রামকবচের বলে তোমার বিপদ হইবে না।"

তাহার পর অষ্টাদশ বৎসর কাটিযা গেল। সে ভূতের কথা আমি প্রায বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু রামকবচটি বরাবর সযত্নে ধারণ করিযাছিলাম। আমি ক্রমে দ্বিতীয শিক্ষক হইতে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলাম। পরে আরও কযেক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম করিযা প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টারী পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমার বেতন দেড়শত টাকা হইল। মফঃস্বলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইত। একদিন মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিযা একখানি গরুর গাড়ি ভাড়া করিযা সেই গ্রামাভিমুখে রওযানা হইলাম, শরৎকালের পরিষ্কার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ছিল। ডিস্ট্রীক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা দিযা গাড়ি মন্থর গমনে চলিযাছে। আমি প্রথম শুইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘণ্টা দুই এ-পাশ ও-পাশ করিয়া যখন কিছুতেই ঘুম হইল না, তখন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম গাড়োয়ান তাহার বসিবার

সেই সংকীর্ণ স্থানটুকুতে কোনপ্রকার শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি— পরিষ্কার পথ পাইয়াছে— গরু দুইটি অবাধে আপন মনে চলিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষের শ্রেণী, কোথাও দূরে দূরে, কোথাও বা ঘনসন্নিবদ্ধ। ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস দিতেছে। গাড়োয়ান আরামে নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া গরীবকে জাগাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। অথচ গরু দুইটা অরক্ষিত অবস্থায় পথ চলে, তাহাও নিরাপদ নহে। এই বিবেচনা করিয়া আমি আর শুইলাম না, বসিয়াই রহিলাম

এই অবস্থায় প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিল। আমার একটু তন্দ্রা আসিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। হঠাৎ গরু দুইটা থামিয়া গেল, একটা ঝাকুনি দিয়া গাড়িখানা দাঁড়াইয়া পড়িল। আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

চক্ষু খুলিয়া দেখি, সেই ভীষণ মূর্তি। গরু দুইটার সম্মুখে পথ অবরোধ করিয়া গাড়ির জোয়ালের উপর দুইটা জীর্ণ হস্ত রাখিয়া, সেই শুষ্ক চর্মাবৃত বৃদ্ধ কঙ্কাল দাড়াইয়া আছে এবং সেই জ্বলন্ত চক্ষু দুইটা হইতে আমার প্রতি ক্রোধানল বর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। বুকের কাছে হাত রাখিয়া তারকব্রহ্মনাম জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে দেখিলাম, সে মূর্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া যাইতেছে। যখন সে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, গরু দুইটা তখন গাড়ি পশ্চাতে ঘুরাইয়া দিয়া, মহাবেগে ছুটিতে লাগিল।

ঝাঁকানিতে গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল —"বাবু এ কি? গরু এমন করিয়া ছুটিতেছে কেন?" আমি আসল কথা তাহাকে না বলিয়া কেবলমাত্র বলিলাম "হয় ত পথে কোনও ভয় দেখিয়াছে তাই ছুটিয়া বাড়ি যাইতেছে।" গাড়োয়ান তখন গাড়ি থামাইবার এবং মুখ ঘুরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, গরু দুইটার লাঙ্গুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দাঁড়াইল না। দৌড়িতে দৌড়িতে অবশেষে যখন একটি গ্রামের বাজারে উপনীত হইল এবং সেখানে অনেক লোকজন ও অন্যান্য গরুর গাড়ি দেখিতে পাইল, তখন দাড়াইল। গরু দুইটা ভয়ানক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দেখিয়া আমি গাড়োয়ানকে বলিলাম "থাক্, আজ আর যাইয়া কাজ নাই, গরুকে খুলিয়া দাও, উহাদের মুখে ঘাস জল দাও, কল্য প্রভাতে তখন আবার যাওয়া যাইবে। অদ্য রাত্রে এইখানেই বিশ্রাম করি।"

তাহার পর আরও সাত বৎসর কাটিয়াছে কিন্তু আর কখনও কোনরূপ ভয় পাই নাই। সে কবচটি এখনও ধারণ করিয়া আছি এবং যতদিন বাঁচিব ধারণ করিয়া থাকিব, আমার মাতৃদেবী এবং মজুমদার মহাশয়ের লিখিত সেই পত্র দুইখানি অদ্যাপি আমার নিকট আছে, যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন, ত দেখাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি যেমন শুনিয়াছি, উপরে অবিকল স্বহস্তে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন

উপরে লিখিত ঘটনাগুলি আমি যেমন বলিয়াছি, ইন্দুবাবু তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ঐ ঘটনাগুলি আমার প্রত্যক্ষীভূত এবং অবিকল সত্য।

স্বপ্ন হলেও সত্য

A True Story—কাউন্ট লুই হ্যামন

কেন জানি না আমার হঠাৎই খেয়াল হলো লন্ডন শহরে বনেদী এলাকায় গিয়ে থাকবার। অনেক খুঁজে পেতে একটা বনেদী ও সেকেলে পুরনো বাড়ির সন্ধান পেলাম. এই বাড়িটা ছিল নদীর পাশ দিয়ে প্রধান রাস্তার উপর দিয়ে গিয়ে ভিতর দিকে টেম্পলে কিংস ফোর্ড ওয়াকের। এই বাড়িটা দেখতেও ছিল ভীষণ অদ্ভুত ধরনের। বাড়িটা দেখেই আমার পছন্দ হয়ে গেল। ভাবলাম, যাক্ এতদিনে একটা মনের মতো বাড়ি পেলাম। একটু নির্জনে থাকতে পারবো। চিন্তা ভাবনা করবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত বাড়ি ছিল এটা। বাড়িটা পেয়ে খুব খুশিই হলাম।

আমার পাঠকরা নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে, যেখানে আমি আছি সেখানে ভূত প্রেতের গন্ধ থাকবেই। কিন্তু এই বাড়িটার ব্যাপারে আমার মনে কোন ভূত প্রেতের সন্দেহও উঁকি মারেনি। তাছাড়া আমি কোন প্রেত চর্চা সঙ্ঘের সদস্যও নই। কিন্তু কি করবো আমার ভাগ্যটাই এমন। যেখানেই যাব সেখানেই আমার গন্ধে ভূত প্রেতরা এসে হাজির হয়। তাই এই বাড়িটাও আমাকে শান্তিতে থাকতে দিল না।

আমার বাড়িওলি বেশ বয়স্ক ধরনের মহিলা। দেখলেই বোঝা যায় পাকা গিন্নীবান্নী মানুষ, তাছাড়া উনি সৎ, কর্মঠ ও পরিশ্রমী। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো এই বাড়িতে এসে আমার ব্রেকফ্রাস্ট বন্ধ হ'ল। কোন দিনই সকালে ব্রেকফাস্ট পেতাম না। তার কারণ আমি রোজ সকালে দশটার পর ঘুম থেকে উঠতাম আর আমার ব্রেকফাস্ট নটার সময় টেবিলে এসে হাজির হতো, আর দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তা টেবিল থেকে তুলে নেওয়া হতো। এই ছিল বাড়ওলির নিয়ম। নিয়মমতো টেবিলে উপস্থিত না থাকার জন্যে আমার কপালে খাওয়া জুটতো না। ঘুম থেকে উঠে খিদেয় ছটফট করতাম। কিন্তু বাড়িওলিকে বলবার মতো সাহসে কুলোতো না। ওনাকে একটু ভয়ই পেতাম। তাই খিদের জ্বাল মেটাতাম হোটেলে গিয়ে।

এইভাবে বেশ চলতে লাগলো। মনে মনে খুবই অশান্তিতে ভুগছিলাম। ব্রেকফাস্ট খাই না অথচ তার টাকাগুলো আমাকে দিতে হচ্ছে। একদিন ভাবলাম, না, আর অপেক্ষা করা চলে না, বাড়িওলিকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবো। এইভাবে দিনের পর দিন না খেয়ে বিল মেটানোর কোন মানে হয় না।

খুব সাহস করেই একদিন মহিলাকে বলে ফেললাম—দেখুন আমার রাতে ঘুম

হয না। ভোবের দিকে ঘুমিযে পড়ি, তাই আপনি যদি দযা করে ব্রেকফাস্টটা দশটার সময় না সবিয়ে আবও দশ মিনিট পরে সবান তাহলে আমার খাওযাটা হয। এই ব্যাপারটা আপনি একটু ভেবে দেখবেন।

আমার কথা শুনে মহিলাটি তো ক্ষেপে আগুন। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিযে চিৎকাব কবে বললেন—তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমি বলি, তোমার বিবেক বলেও কিছু নেই। তুমি আমার অসুবিধে বোঝ না। তোমার চেযে আমাব দ্বিগুণ বযস, দেখ তো আমি কত পরিশ্রম করি। আব তুমি রবিবার গীর্জায যাও, বাতে প্রার্থনা কব, আব সকাল সকাল খেযে-দেয়ে শুযে পড। তার পরেও তোমাব নটার সময ঘুম ভাঙে না, ব্রেকফাস্ট খেতে পার না, আমার মনে হয তুমি একটা দুর্বৃত্ত। তোমাকে আমার বাড়িতে থাকতে দেওযাই অন্যায হযেছে। যুবক বযেসে যে ছেলে এমন অকর্মা হয তাকে দিযে আর কোন কাজই হয না।

আমি আর কথা বাড়ালাম না, ভাবলাম ওনাকে বোঝাতে পারবো না। এ আমাব সাধ্যের অতীত, কি কবে বোঝাবো যে, এই ঘরে যে শোবে তাব ঘুমেব সর্বনাশ হবে। আমি বেশ কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছিলাম এই ঘরে কোন ভৌতিক ব্যাপাব আছে। তাই রাতেব পর রাত আমাকে জাগিযে রেখে ঘুম কেড়ে নিযেছে, সাবাবাত জেগে জেগে বই পড়ে ক্লান্ত হযে ভোরবেলায ঘুমিযে পড়ি, যাব জন্যে কিছুতেই সকাল দশটাব আগে ঘুম থেকে উঠতে পাবি না। এই কথা কাকে আমি বোঝাবো, কেউই আমার কথা বিশ্বাস কবতে চাইবে না।

একদিন দুপুববেলায খুবই ক্লান্ত ছিলাম, তাই আমাব বৈঠকখানাব ছোট সোফাটায ঘুমিযে পড়লাম। এত গভীব ঘুম দিযেছিলাম যে আমি দুপুব থেকে অনেক বাত পর্যন্ত ঘুমালাম। হঠাৎ জেগে উঠে দেখি আমাব হাতে একটা পেন্সিল ধবা বযেছে, আব মনেব মধ্যে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন স্পষ্ট হযে রয়েছে। স্বপ্নের কথাগুলো আমাব মনেব মধ্যে ছবির মতো ফুটে উঠল কিন্তু পেন্সিলটা কোথা থেকে এল তা কিছুতেই মনে পড়লো না। আবও অবাক হযে গেলাম যখন দেখলাম পাশেই কযেকটা কাগজের টুকরো পড়ে বযেছে। কাগজের টুকরোগুলো হাতে তুলে আমি চমকে উঠলাম, কাবণ যে স্বপ্নটা আমি ঘুমেব ঘোবে দেখেছি, আব তারই সব কথা এই কাগজগুলোতে আমি ঘুমের মধ্যে লিখে রেখেছি। ঘুমেব মধ্যে আমি কি কবে লিখলাম, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

তবুও আমি যা স্বপ্নেব কথা লিখেছিলাম তাই পাঠকদেব জানাচ্ছি—আমি যে ঘবটায থাকতাম সেটা জেমসেব রাজত্বকালে স্টেলা নামে একটি সুন্দরী মেযে, আব তরুণ এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিব গোপনে দেখাশোনার জাযগা ছিল। তরুণটি ছিলেন প্রোটেস্টান্ট আর স্টেলা ছিল ক্যাথলিক। একদিন ক্যাথলিক রাজার কাছে তাদেব গোপন অভিসাবেব কথা জানিযে দেওযা হলো। এই খবর পেয়ে তরুণটি বাগে ক্রোধে উন্মাদ হযে তার উপপত্নীকে খুন করে এই বাড়ির নিচে একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলেন। এই

মারাত্মক স্বপ্নের কথাগুলো পড়ে আমি সোফা ছেড়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার, আমি শান্তিতে ঘুমিয়েও পড়লাম।

পরের দিন রাতে আবার সেই একই স্বপ্ন দেখলাম। এমনকি স্বপ্নে অশরীরীকে অনুসরণ করে আমি তার সঙ্গে অচেনা একটা ঘরে ঢুকলাম। এই ঘরে আগে আমি কখনো আসিনি, কিন্তু স্বপ্নে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম মাটির নিচের ঘরটা, যার মেঝেটা মস্তবড় একটা চৌকো পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি, বহুদিনের অব্যবহারের ফলে কালো হয়ে গেছে।

স্বপ্নে আরও অনেক কিছু দেখলাম। আমি এই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানানো হলো, আর যেই মাত্র প্রার্থনাটা শেষ হলো অমনি সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল, এমনকি জায়গাটাও আবার ফাকা আর পোড়ো হয়ে গেল।

পর পর তিন দিন একই স্বপ্ন দেখে আমি ঠিক করলাম, এই রহস্যের সমাধান করতে হবে। অনেক ভেবে-চিন্তে পরের দিন বাড়িওলিকে বললাম—এই বাড়িতে কোন গোপন ঘর আছে? আমাকে একটু বলুন না সেই ঘরটা কোথায়?

আমার কথা শুনে মহিলাটি রেগেই গেলেন, বললেন, এই ঘরটা ভাড়া দিলেই যত জ্বালাতন বাড়ে! যেই এই ঘরে রাত কাটিয়েছে তারাই এই একই প্রশ্ন করেছে আমাকে। কেন যে তারা এই গোপন ঘরের প্রশ্ন করে তা আমি আজও জানতে পারিনি। তারপর বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ, একটা গোপন ঘর আছে। সেটা রান্নাঘরের নিচে আছে।

আমি ভদ্রমহিলাটির কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম তার সঠিক উত্তর না পেয়ে মনে মনে অখুশি হলাম। তারপর ভাবলাম, ওনাকে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। উনি ঠিক বলতে পারবেন না। তাই ঠিক করলাম, বাড়িওলি বাড়ির থেকে বের হলেই আমি একলাই অনুসন্ধান চালাবো। একটু পরেই বাড়িওলি বেরিয়ে গেলেন। তারপর আমি উঠে রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলাম। এই রান্নাঘরটা রাস্তার সমতলের ঠিক নিচে। বেশ খানিক খোঁজাখুঁজি করে পুরনো ওক কাঠের দরজা খুঁজে পেলাম। তারপর সেই দরজার ভিতর দিয়ে গোপন ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখলাম, আমার স্বপ্নে দেখা এই সেই ঘরটা। স্বপ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। এমনকি মেঝেটাও গাঢ় কালো রঙের পাথর দিয়ে বাঁধানো। আর আমি বেশিক্ষণ এই ঘরটায় থাকলাম না। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে এলাম। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। এটা কি ধরনের রহস্য বুঝতে পারলাম না। মন থেকে ব্যাপারটা মুছে ফেলবার জন্যে ড্রেস করে বাইরে বেরিয়ে গেলাম। যাতে এই বাজে চিন্তার থেকে আমি মুক্তি পেতে পারি।

সারা সন্ধ্যাটা আমি বাইরেই কাটালাম। থিয়েটার দেখলাম, তারপর অনেক রাতে বাড়ি ফিরে এলাম। খুবই পরিশ্রান্ত ছিলাম। বিছানায় শুয়ে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। আবার সেই একই স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। কিন্তু আজকের স্বপ্নটা ছিল অন্যদিনের চেয়ে একটু আলাদা। স্টেলা নামের সুন্দরী মেয়েটি আমাকে পথ দেখিয়ে সেই মাটির নিচের ঘরে নিয়ে গেল, তারপর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল,

আজ রাত বারোটার সময় এই ঘরে মৃতের জন্যে প্রার্থনার আয়োজন কর। তারপর সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্বপ্ন দেখা শেষ হতেই আমি চমকে উঠে পড়লাম। স্বপ্নের কথাগুলো কানের মধ্যে বাজতে লাগলো। এমনকি মেয়েটার শীতল নিশ্বাসের স্পর্শ পর্যন্ত আমি অনুভব করতে পারছিলাম। সবকিছু মিথ্যে ভাববার জন্যে আমি ভাল করে চোখ রগড়াতে লাগলাম। তারপর দেওয়ালের দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠলাম। চোখের সামনে স্বপ্নে কানে শোনা কথাগুলো দেওয়ালে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে। ঠিক সেই কথা—'মাঝরাতে এই ঘরে মৃতের জন্যে প্রার্থনা করো।' আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না কি করে এই দেওয়ালে লেখা হলো। তাহলে কি আমিই ঘুমের ঘোরে উঠে টেবিল থেকে পেন্সিল নিয়ে দেওয়ালে লিখেছি! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো না, না, এটা অসম্ভব।

আমি এই সব কথা কাউকে কিছু না বলে পোশাক পরে পথে বেরিয়ে পড়লাম। ভাবলাম যেমন করেই হোক আজ রাতে প্রার্থনার ব্যবস্থা করবো। পথে বেরিয়ে মনটা ভোরের ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়ায় ভরে উঠল। মনে হলো দিনের সঙ্গে রাতের কত পার্থক্য। এই কথা ভাবতেই মনে পড়ে গেল রাতের স্বপ্নে দেখা দৃশ্যগুলো, যে কথাগুলো আমার কানের মধ্যে হাতুড়ি মারতে লাগলো, মনে মনে ভাবলাম স্বপ্নের কথামতো সবই পালন করবো, সকলকে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করবো। আমি নিজে ক্যাথলিক নই। আমি কখনো কোন গোঁড়া মতের সমর্থক নই, কিন্তু বেরিয়ে প্রায়ই ক্যাথলিক চার্চে যেতাম। যার ফলে চার্চের কয়েকজন যাজকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। আমি ভাবলাম এখান থেকে আমি সাহায্য পেতে পারি। তাই তাড়াতাড়ি ছুটে চার্চে গেলাম এবং যাজকের সঙ্গে দেখা হলো। আমি জানতাম উনি খুব সহানুভূতিশীল ও খুব বুদ্ধিমান। কিন্তু আমার সব কথা শুনে উনি বিশ্বাস করলেন না। বললেন—এসব বাজে কথা, মিথ্যে কথা! তাছাড়া তিনি আমাকে আরও বললেন—আপনার এই বাজে চেষ্টা ছেড়ে দিন। কেউই ওই ঘরে গিয়ে প্রার্থনা করবে না। আমি বলছি এই লন্ডন শহরে আপনি এমন একজনও পাদ্রী খুঁজে পাবেন না যিনি আপনার ইচ্ছা পূরণ করবেন।

আমি অনেকগুলো চার্চ পেরিয়ে এলাম। আর একটায়ও ঢুকলাম না। অশান্ত মনে গ্রীন পার্কে ঢুকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। তারপর একটা বেঞ্চে বসে ভাবতে লাগলাম কি করা যেতে পারে? হঠাৎ দেখলাম একজন তরুণ পাদ্রী আপন মনে একটা প্রার্থনার বই পড়তে পড়তে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে সুপ্রভাত জানিয়ে হাতের বইটা বন্ধ করলেন এবং আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। কথা বলে এই তরুণ পাদ্রীটিকে আমার বেশ ভাল লাগলো। ভাবলাম তাহলে ওনাকে আমার স্বপ্নের কথাটা বলা যেতে পারে, হয়তো উনি বিশ্বাসও করতে পারেন। তাই সাহস করে আমার স্বপ্নের কথা বললাম।

আমার কথা শুনে মনে হলো, উনি পুরোপুরি বিশ্বাস করেছেন। উনি আমার

দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হেসে বললেন – আমি আপনাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবো। আপনি আর কোন কিছু ভাববেন না। আপনার যা যা দরকার সবই আমি করে দেব। কথা দিলাম আজ রাতে আমি আপনার বাড়িতে যাব। এই তরুণ পাদ্রীটির কাছ থেকে কথা পেয়ে আমি খুব নিশ্চিন্ত হলাম। মনের আনন্দে বাড়ি ফিরে এলাম।

রাত্রিবেলায় কয়েকজন বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তাদের আমি এই ব্যাপারে সব কথা বললাম। বন্ধুরা সব কথা শুনে খুবই উৎসাহী হয়ে অনুরোধ করলো আমরাও এই রাতে এই ঘরে থাকতে চাই। দয়া করে তুমি পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করো প্রার্থনার সময় আমরা উপস্থিত থাকতে পারবো কিনা। আমারও মনে মনে ইচ্ছা এই ঘটনায় বন্ধুরা উপস্থিত থাকুক।

সবাই মিলে গল্প করতে লাগলাম। সময় হু হু করে কেটে যেতে লাগলো। বারোটা বাজতে যখন পনেরো মিনিট বাকি ঠিক সেই সময় দরজার কাছে পাদ্রীর পায়ের শব্দ পেলাম। ওনাকে আমি বন্ধুদের মনোবাসনা জানালাম। উনি বললেন আমার কোন আপত্তি নেই। আপনার বন্ধুদের সবাই উপস্থিত থাকতে পারেন।

পাদ্রীর মত পেয়ে আমরা সবাই খুশি হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সবাই মিলে ধীর পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন রহস্যজনক কিছুই চোখে পড়লো না, কিন্তু ঘরটায় ঢুকে মনে হলো মৃত্যুর পারবেশেই আমরা রয়েছি। কি নিস্তব্ধ, কি নিরানন্দ। মোমবাতির ম্লান আলোয় পাদ্রীর মুখটা আমার কাছে খুবই রহস্যময় বলে মনে হলো। কি নিবিষ্ট মনে প্রার্থনা করছেন। আমি শুধু সেদিকেই চেয়ে দেখতে লাগলাম। প্রার্থনা শেষ হতে সবাই আমরা আবার নিচে নেমে এলাম। তারপর তরুণ পাদ্রীটি আমাদের সকলকে বিদায় জানিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

এইভাবে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। আমি মনে মনে খুবই নিশ্চিন্ত হলাম। স্বপ্ন দেখার আর কোন উৎপাত রইল না। প্রার্থনার দিন থেকেই আমি শান্তিতে ঘুমুতে পারছিলাম। কোন রকম গোলমাল হয়নি। বেশ সুখেই বাড়িটায় ছিলাম।

হঠাৎ একদিন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার সময় দেখলাম একদল রাজমিস্ত্রি আর জলের কলের মিস্ত্রি ড্রেনের সঙ্গে সংযোগ করবার জন্যে দরকারি কি সব কাজকর্ম করছিল। ওদের ঘরের মেঝের পাথর তোলবার দরকার ছিল তাই তারা পাথর উঠিয়ে মাটির তলায় একটা কুয়ো আবিষ্কার করলো। সেদিন সবাই খুব অবাক হয়ে দেখেছিল কুয়োটা। আমি কিন্তু একটুও আশ্চর্য হইনি। কারণ আমি এই মাটির তলার ঘর ও বাড়ির নিচে কুয়োর কথা সবই স্বপ্নে দেখেছিলাম।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে একটি পত্রিকায় খবরটি প্রকাশ পায়। ঘটনাটির বিবরণ ছিল এমনি। আরম্ভের প্রথমেই ছিল মাটির নিচে মনুষ্যদেহাবশেষ। চমকপ্রদ আবিষ্কার। কিংস রোডওয়াদের একটা বাড়ি মেরামত করবার সময় মিস্ত্রিরা একতলা ঘরের নিচে একটা কুয়ো আবিষ্কার করেছে। এবং কুয়োর তলায় পাওয়া গেছে একটা তরুণীর কঙ্কাল ও একটা তরবারি। তরবারিটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাতে দ্বিতীয়

জেমসের রাজত্বকালের তারিখ দেওয়া আছে। এতে প্রমাণ হচ্ছে, নিশ্চয় কোন রোমান্সজনিত ঘটনা রয়েছে। তাছাড়া রহস্যপূর্ণ নারীর মৃত্যু এই সব মিলিয়ে এই বাড়িটায় একটা গোপন রহস্য এতদিন ধরে ছিল।

সত্যি কথা বলতে কি—এই ঘটনার পর আমার জীবন অনেকখানি পার হয়ে গেছে। তবুও যখন নির্জনে ভাবতে বসি, তখন কিছুতেই এই ঘটনার রহস্যটা খুঁজে পাই না। ভাবি, এটা কি নিছক স্বপ্ন না অন্য কিছু। আজও উত্তর পাইনি।

অনুবাদ প্রীতি পালচৌধুরী

সশঙ্ক শয়তান

The Devil ফ্রেডরিক ব্রাউন

নরক।..সেখানে শয়তানের প্রাসাদ পান্ডেমোনিয়াম। প্রাসাদে নিজের খাস কামরায় বসে আছেন শ্রীশয়তান। স্বর্গে দাসত্ব করবার চেয়ে নরকে রাজত্ব করা ঢের ভালো— শয়তানের তাই ধারণা। আলো ঝিকমিক ডেস্কটার উপর ঝুঁকে পড়লেন শয়তান। খুট্ করে ইন্টারকমের সুইচটা টিপলেন।

—'হ্যাঁ। স্যর, বলুন।'

লিলিথের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সে হল শয়তানের প্রাইভেট সচিব।

'আজকে ক'জন এসেছে?' শয়তান প্রশ্ন করলেন।

'বেশি নয়, মোটে চারজন স্যর। ওদের একজনকে ভেতরে আপনার কাছে পাঠাব?'

'হ্যাঁ, পাঠাও...আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর।'

'ঠিক আছে স্যর।'

'ওরা এখন কোথায়?'

'আমার কামরায় বসে আছে।'

'তুমি ওদের মোটামুটি পরীক্ষা করে দেখেছ?'

'হ্যাঁ স্যর।'

'আচ্ছা, তোমার কি ওদের মধ্যে কাউকে একেবারে...স্বার্থপরতাহীন বলে মনে হয়েছে?'

'একজনকে মনে হয়েছে।'

'বল কি!' শয়তান চমকে উঠলেন।

—'কিন্তু তাতে কি হয়েছে স্যর ' চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। এক বিলিয়ন বা একশ' কোটি লোকের মধ্যে হয়তো একজন চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। আর সে ইচ্ছার সঙ্গেও স্বার্থের কোন সম্পর্ক থাকা চলবে না। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হতে হবে সেই ইচ্ছাকে। তাই তো ?'

—'হ্যাঁ, তাই!' চূড়ান্ত ইচ্ছা এই শব্দ দুটি শুনে নরকের অসহনীয় উত্তাপের মধ্যেই শ্রীশয়তান কেঁপে উঠলেন। শয়তানের মনে সব সময়ই এই দুশ্চিন্তা—কোনদিন কোন একজন হয়তো তার কাছে এমন এক চূড়ান্ত ইচ্ছার কথা বলবে যে ইচ্ছার সঙ্গে স্বার্থের কোন সম্পর্কই নেই। আর সেদিন ?

হ্যাঁ, সেদিনই আসবে শয়তানের অমর জীবনে দারুণ বিপর্যয়। কি হবে ? শয়তান শৃঙ্খলিত হয়ে পড়বেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাকে কাটাতে হবে সুদীর্ঘ এক হাজার বছর। হাজার বছর পরে শৃঙ্খল মোচন হলেও শাশ্বত কালের অনাগত দিনগুলিতে শয়তান হয়ে পড়বেন কর্মহীন। তার কাছে আর কেউ আসবে না। অসহ্য! অসহ্য! অসহ্য সেই অবস্থা! সে অবস্থার কথা শ্রীশয়তান ভাবতেও পারেন না।

কিন্তু সে সম্ভাবনা তো ক্ষীণ...অতি ক্ষীণ...এক বিলিয়ন লোকের মধ্যে একজনের সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা বর্জিত চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করা...আবার কেঁপে উঠলেন শ্রীশয়তান।

না, এসব কথা ভেবে অনাবশ্যক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই। লিলিথ ঠিকই বলেছে, সম্ভাবনা ক্ষীণ, খুবই ক্ষীণ। এটা অসম্ভব বললেও বোধহয় বাড়িয়ে বলা হবে না। মানুষ কখনও স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠতে পারে না।

আপনমনে এই কথাগুলো বলে শ্রীশয়তান নিজেকেই যেন সান্ত্বনা দিলেন।

হাজারে একজন লোক শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে। এরা আত্মা বিক্রি করে ইচ্ছা পূরণের জন্য। শয়তান ইহজগতে এদের ইচ্ছা পূরণ করেন। তার বদলে মৃত্যুর পর এদের আত্মা আসে শ্রীশয়তানের অধিকারে। ঐ আত্মাদের হয় অনন্ত নরকবাস। এদের ভিতরে কেউ কেউ যে স্বার্থহীন ইচ্ছা প্রকাশ করে না তা ও নয়। কিন্তু সেসব স্বার্থহীন ইচ্ছাও তুচ্ছ, চূড়ান্ত ইচ্ছার ধারে কাছেও তা যেতে পারে না। হয়তো আরো লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যাবে। শ্রীশয়তানের কাছে কেউ চূড়ান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করবে না। হয়তো এই চিরন্তন কাল প্রবাহে কোনদিনই কেউ সে ইচ্ছা প্রকাশ করবে না। এখনও পর্যন্ত যারা শ্রীশয়তানের কাছে ইচ্ছা পূরণের জন্য আত্মা বিক্রি করতে এসেছে তারা সেই বিপজ্জনক ইচ্ছার ধারে কাছে যেতে পারেনি। অতএব শ্রীশয়তান নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আবার ইন্টারকম এর সুইচটা টিপলেন শ্রীশয়তান।

'বলুন স্যর,' লিলিথের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'ঠিক আছে লিল্, একজন করে পাঠাও।'

'এক্ষুণি পাঠাচ্ছি স্যর।'

-'শোন, যে লোকটিকে তোমার স্বার্থপর বলে মনে হয়নি তাকেই আগে পাঠাও। তার সঙ্গে কারবারটাই আগে শেষ করি।'

—'ঠিক আছে স্যর।'

শ্রীশয়তান আর একটা সুইচ টিপলেন। লিলিথের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হলো।

যে লোকটি বিশাল দরজা-পথে শ্রীশয়তানের খাস কামরায় এসে ঢুকল তাকে দেখে কিন্তু মোটেই বিপজ্জনক বলে মনে হলো না। লোকটি বেঁটে। ওকে দেখলেই মনে হয় যেন খুব ভয় পেয়েছে।

শ্রীশয়তান ভ্রূকুটি করলেন। লোকটির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—

—'তুমি কোথায় এসেছ জান?'

—'জানি,' মৃদুস্বরে লোকটি উত্তর দিল।

—'কার কাছে এসেছ জান?'

—'জানি,' ভীরু গলায় লোকটি বলল।

—'তুমি শর্তের কথা জান?'

—'হ্যাঁ' বেঁটে লোকটি বলল, 'অন্তত আমার ধারণা শর্তটা ভালোভাবেই বুঝেছি।'

—'কি বুঝেছ?'

—'আমি আপনাকে আমার একটা ইচ্ছার কথা বলব। আপনি আমার ইচ্ছাপূরণ করবেন, বিনিময়ে আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মা আপনার করতলগত হবে...এই তো?'

—'হ্যাঁ, ঠিকই বুঝেছ। এইবার বল তোমার কি ইচ্ছা? আমার কাছ থেকে তুমি কোন ইচ্ছাপূরণের বর চাও!'

—'মানে....' বেঁটে লোকটি বলতে লাগল, 'আমি অনেক ভাবনা-চিন্তা করে, অনেক সতর্কতার সঙ্গে আমার ইচ্ছাটা ঠিক করেছি এবং তারপর আবার অনেক...'

—'থাম, কোন অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনতে চাই না, আমার সময়ের দাম আছে। বল তোমার ইচ্ছা কি?'

—'মানে তাহলে...তাহলে বলেই ফেলি ইচ্ছাটার কথা।'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেই ফেল।' অধৈর্যের সুরে শয়তান বললেন।

—'ইচ্ছাপূরণ করবেন তো?'

—'নিশ্চয়ই।' গম্ভীর গলায় শ্রীশয়তান বললেন।

—'তাহলে বলি! আমার মধ্যে কোন পরিবর্তন না এনে আপনি আমাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ, সবচেয়ে দুষ্ট, সবচেয়ে নির্বোধ আর সবচেয়ে দুঃখী মানুষে পরিণত করুন। এটাই আমার চূড়ান্ত ইচ্ছা।'

দারুণ আতঙ্কে শ্রীশয়তান আর্তনাদ করে উঠলেন তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

অনুবাদ: অনিরুদ্ধ চৌধুরী

লালঘর

The Red Room   এইচ্. জি. ওয়েলস্

মদের গ্লাস হাতে আগুনের ধারে বসে আমি বললাম, আমি তোমাকে জোর করে বলতে পারি আমার সামনে কোন ভূত সশরীরে না এলে আমি ভয় পাব না।

এই বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

শীর্ণদেহ বৃদ্ধ লোকটি বলল, তোমার যা খুশি বলতে পার।

আমি বললাম, আমার বয়স হলো আঠাশ বছর। এই আঠাশ বছরের মধ্যে আমি কখনো ভূত দেখিনি।

এক বৃদ্ধা আগুনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসেছিল। বিস্ফারিত হয়ে ছিল তার ম্লান চোখ দুটো। সে বলল, তোমার বয়স আঠাশ বছর হলো, কিন্তু এই ধরনের বাড়ি কখনো কোথাও দেখনি তুমি। এখনো অনেক কিছু দেখার আছে।

আমার সন্দেহ হচ্ছিল বুড়ো বুড়ীরাই মানুষের মনে এক অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ভয় ঢাকিয়ে দেয়। আমি শূন্য গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখে ঘরের চারদিকে তাকালাম। তারপর সেকালের বড় পুরনো আমলের আয়নায় আমার প্রতিফলন দেখতে লাগলাম। এক অস্বাভাবিক সংকল্পের দৃঢ়তায় আমার দেহটাকে কেমন যেন শক্ত দেখাচ্ছিল।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আজ রাতে যদি কিছু দেখি তাহলে আমার জ্ঞান বাড়বে। আমি সংস্কারমুক্ত খোলা মন নিয়ে এ ব্যাপারে পরীক্ষা করতে এসেছি।

বৃদ্ধ আবার আগের মতো বলল, তোমার যা খুশি।

বাইরে বারান্দায় কার পায়ের শব্দ আর ছড়ি ঠোকার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে আর একজন বুড়ো লোক ঘরে ঢুকল। এই লোকটি প্রথম লোকটির থেকে আরো বৃদ্ধ এবং লোলচর্ম। সে একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে হাঁটছিল।

ঘরে ঢুকেই একটা ইজিচেয়ারের উপর বসে পড়ল সে। বসেই কাশতে শুরু করল। প্রথম লোকটি আগন্তুকের পানে অসন্তোষের সঙ্গে তাকাল। বৃদ্ধা আগন্তুকের পানে একবার তাকালও না। আগের মতোই আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল।

কাশি থামলে আগন্তুক বলল, তুমি নিজে থেকেই এটা বেছে নিয়েছ।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি নিজে থেকেই এটা বেছে নিয়েছি।

আগন্তুকের চোখে একটা কাপড়ের ঢাকনা ছিল। সেটা সরিয়ে আমাকে দেখতে গেলে আমি দেখলাম তার চোখ দুটো ছোট অথচ উজ্জ্বল।

সে আবার কাশতে লাগল। তখন প্রথম বৃদ্ধটি তাকে এক গ্লাস মদ দিয়ে বলল, এটা পান করো।

আগন্তুক বৃদ্ধ যখন গ্লাসে মদ ঢালছিল তখন তার ছায়াটাকে খুব বড় দেখাচ্ছিল দেওয়ালের উপরে। সেই ছায়াটা যেন উপহাস করছিল তার শীর্ণ দেহটাকে।

আমার মনে হচ্ছিল মানুষ বুড়ো হলেই তার মানবিক গুণগুলো দিনে দিনে ঝরে যায় তার মধ্য থেকে। এই তিনজন বৃদ্ধের উপস্থিতিতে অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম আমি। তার শীর্ণদেহের নীরবতা, ন্যুব্জতা আর তাদের কুটিল মনের বিচ্ছিন্নতাবোধ অস্বস্তিতে ভরে তুলেছিল আমার মনটাকে।

আমি বললাম, তোমার এই ভুতুড়ে ঘরটাতে যদি আমাকে কোন ভূত দেখাতে পার তাহলে আমি খুশি হব। নিজেকে ধন্য মনে করব।

কাশতে কাশতে আগন্তুক বৃদ্ধ হঠাৎ আমার মুখপানে তাকাল। কিন্তু কেউ আমার কথার উত্তর দিল না।

আমি আবার প্রথম বৃদ্ধকে বললাম, আমাকে কিছু দেখাতে আর আপনাকে কিছু করতে হবে না।

প্রথম বৃদ্ধ আমার কথার উত্তরে বলল, ঘরের বাইরে দরজার কাছে একটা বাতি আছে। তুমি যদি তাই নিয়ে বারান্দা দিয়ে লালঘরটায় আজ রাতে চলে যাও তাহলে দেখতে পাবে।

বৃদ্ধা বলল, হ্যাঁ, বিশেষ করে আজকের রাতেই। একা যাবে।

আমি বললাম, খুব ভাল কথা। কোন দিকে যাব?

তুমি বাইরে বারান্দায় গিয়ে একটু গেলেই একটা দরজা পাবে। সেই দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে একটা ঘোরানো সিঁড়ি পাবে। সেই সিঁড়ি বেয়ে কিছুটা উঠলেই সেখানে একটা চাতাল পাবে। সেই চাতালের বাঁদিকে আর একটা দরজা আছে। সেই দরজা দিয়ে ঢুকলে একটা টানা বারান্দা পাবে। সেই বারান্দার শেষ প্রান্তে আছে লালঘর।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ বলল, তুমি কি সত্যি সত্যিই যাচ্ছ?

আমি বললাম, এইজন্যই এখানে এসেছি আমি।

এই বলে আমি দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। দরজার কাছ থেকে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম ওরা তিনজন অর্থাৎ বৃদ্ধা, বৃদ্ধ, আর একজন বৃদ্ধ আগুনের কাছে এক জায়গায় ঘন হয়ে বসে আমার পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আমি দরজা খুলে তাদের শুভরাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। জ্বলন্ত বাতিটা হাতে তুলে নিয়ে হিমশীতল অন্ধকার বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে চাতালে গিয়ে আবার একটা দরজা পার হয়ে সেই টানা বারান্দায় গিয়ে পড়লাম।

এই বাড়িটা ছিল একজন লর্ডের। তিনি তিনজন বৃদ্ধের হাতে এই পুরনো আমলের বাড়িটার দেখাশোনার ভার দিয়ে যান। এই বিরাট বাড়িটার গঠন, আসবাবপত্র, সাজসজ্জা সবই পুরনো আমলের এবং কেমন যেন ভুতুড়ে ভাব বিরাজ করছে এ বাড়ির সর্বত্র।

আমি যখন বাতি হাতে যাচ্ছিলাম তখন আমার ছায়া কাঁপছিল। অবশেষে আমি সেই লালঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে বাতিটা জ্বেলে ঘরখানার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

আমার মনে পড়ল এই লোরেন প্রাসাদের লালঘরেই অতীতে একদিন এক ডিউক, যুবক বয়সে মারা যান। এই প্রাসাদের প্রচলিত ভৌতিক কুসংস্কারকে সাহস করে জয় করতে গিয়েই মৃত্যুবরণ করতে হয় তাকে। আসলে তার মূর্ছার রোগ। কিন্তু এই রোগের ফলে তার মৃত্যু হলেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা বলতে থাকে ভৌতিক ক্রিয়াই তার মৃত্যুর কারণ। এই ঘরে আর এক মহিলার মৃত্যু ঘটে। আসলে তাঁর স্বামী ঠাট্টা করে তাকে ভয় দেখাতে গেলে মহিলার মৃত্যু ঘটে।

এইভাবে এই লালঘরকে ঘিরে দিনে দিনে কত রূপকথার সৃষ্টি হয় এবং তা ছড়িয়ে পড়ে লোকের মুখে মুখে। আমার মনে হয় যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত কত রহস্যের এক অন্ধকার বিশাল সমুদ্র স্তব্ধ হয়ে আছে এই ঘরখানায় আর আমার হাতে এই জ্বলন্ত বাতির আলোকবৃত্তটুকু সেই সমুদ্রের মাঝে সামান্য এক দ্বীপমাত্র।

আমি ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখার জন্য সাতটা বাতি জ্বেলে দিলাম। তারপর দরজা খুলে বাইরে এসে বারান্দায় আবার নিজের হাতে রাখা আরও দশটা বাতি নিয়ে সেগুলোও জ্বেলে দিলাম। মোট সতেরটা বাতি আমি ঘরের জানালাগুলোর কোণে কোণে ও বিভিন্ন জায়গায় রেখে দিলাম। একটা জানালা খুলে দেখলাম সারা আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে চাঁদের আলো। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল চুপিসারে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে যেন আসছে।

সময় কাটাবার জন্য আমি আপন মনে কবিতা আবৃত্তি করলাম। নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলতে লাগলাম। কিন্তু সেই সব কথার প্রতিধ্বনি অদ্ভুত শোনাতে লাগল আমার কানে।

মাঝরাতের পর এক কোণে রাখা একটা বাতি নিভে গেল। একটা কালো ছায়া ঘন হয়ে উঠল তার জায়গায়। কিন্তু আমি বাতিটা নিভে যাওয়া দেখিনি। কোণে অন্ধকার জমে উঠতে আমার মনে হলো কে যেন এসে বসেছে। দেশলাই নিয়ে গিয়ে নিভে যাওয়া বাতিটা আবার জ্বাললাম। এদিকে টেবিলের উপর রাখা দুটো বাতি নিভে গেল।

টেবিলের উপর একটা বাতি আবার জ্বালাতেই আয়নার তলায় রাখা একটা বাতি নিভে গেল। মনে হলো কে যেন বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে পলতেটাকে আঙুল দিয়ে টিপে ধরে আছে। তার জন্য বাতিটা নিভে যাবার পরে কোন ধোঁয়া বার হচ্ছে না বা বাতির মুখে কোন ময়লা দেখা যাচ্ছে না।

এরপর খাটের কাছে যে বাতি ছিল তা নিভে গেল। ক্রমশ আমার অবস্থাটা শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগল। একটা নিভনো বাতি জ্বালতে না জ্বালতেই অপর একটা কি দুটো বাতি নিভে যেতে লাগল। সারা ঘরময় ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগলাম আমি।

এইভাবে সামান্য একটা বাতির আলো দিয়ে ছায়া আর অন্ধকারের সঙ্গে এক

আশ্চর্য অর্থহীন সংগ্রামে মেতে উঠলাম আমি তখন। যে ছায়া অন্ধকারকে আমি ভয়ে ভয়ে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছিলাম, সেই ছায়া আর অন্ধকার জোর করে আমার ঘাড় ও বুকের উপর চেপে বসার জন্য ছুটে আসছিল চারদিক হতে।

অবশেষে শেষ বাতিটা নিভে গেল। আমার হাত কাঁপতে লাগল। আমি আর দেশলাই জ্বালতে পারলাম না। বারান্দায় চাঁদের আলো আছে মনে পড়ে যাওয়ায় এই ঘর থেকে পালাবার জন্য দরজার কাছে ছুটে যেতে চাইলাম। অন্ধকারে কিছু দেখতে না পাওয়ায় খাটে ধাক্কা লেগে পড়ে গেলাম। উঠে যেদিকেই যাবার চেষ্টা করলাম সেদিকেই কোন না কোন ভারী আসবাবপত্রে ধাক্কা খেতে লাগলাম।

দেখতে দেখতে শেষ স্মৃতিবোধটুকু চলে গেল আমার মন থেকে। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। দরজা খুঁজে পেলাম না কিছুতেই। তারপর আর কিছুই মনে নেই আমার।

দিনের আলোয় চোখ মেলে চাইলাম আমি। আমার মাথায় তখন ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখলাম। শীর্ণ হাডওয়ালা সেই প্রথম বৃদ্ধটি আমার মুখপানে তাকিয়ে বসে আছে আমার পাশে। কি ঘটেছে, কেন আমার এই অবস্থা তার কিছুই মনে পড়ল না।

সেই বৃদ্ধা আমায় নিজে এক গ্লাস জল গড়িয়ে দিলে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কোথায়?

বৃদ্ধা বলল, সকালবেলায় আমরা তোমায় লালঘরে গিয়ে দেখতে পাই। তোমার মাথায় ও মুখে রক্ত লেগে ছিল।

আমি এবার ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি ফিরে পেলাম। গতরাত্রির সব ঘটনার কথা মনে পড়ল আমার একে একে।

একজন বৃদ্ধ তখন বলল আমাকে, তাহলে তুমি এবার বিশ্বাস করলে যে লালঘরটা ভূতুড়ে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তাহলে তুমি কিছু দেখেছ তো? বল বল, কার ভূত তুমি দেখলে? ভূতটা কি বৃদ্ধ আর্ল বা ডিউকের অথবা সেই যুবতী কাউন্টপত্নীর?

আমি বললাম, কোন ভূতই আমি দেখিনি। আসলে কোন ভূতই নেই ও ঘরে। আছে শুধু ভয়। এই ভয়ই মরণশীল মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে বিপদের মুখে, এমনকি অনেক সময় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় মানুষকে। এই ভয় কেউ দেখতে পায় না চোখে, কোন শব্দ শুনতে পায় না কানে, কোন যুক্তি মানতে চায় না মনে। এই ভয় বারান্দা থেকে আমার সাথী হয়ে ঘরের উত্তর প্রান্তে গিয়েছিল আমার সঙ্গে। এই ভয়ের সঙ্গেই সংগ্রাম করি আমি অন্ধকার লালঘরে।

আমার কথা শুনে দ্বিতীয় বৃদ্ধ বলল, আমরাও কোন ভূত দেখিনি এ বাড়িতে। শুধু ভয়ে আমরা কোনদিন লালঘরে ঢুকিনি।

অনুবাদ : সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

কঙ্কালের টঙ্কার

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমি কবিতা লিখতুম, আমার আত্মীয়রা আমায় তিরস্কার করতেন, বন্ধুরা ঠাট্টা করতেন, মাস্টারমশাই প্রহার দিতেন এবং কাগজের সম্পাদকেরা না ছেপে ফেরৎ দিতেন। কিন্তু বলে রাখি, একদিন সমস্ত বিপদ থেকে যে আমার প্রাণরক্ষা হয়েছিল, সে শুধু আমার ঐ কবিত্বশক্তির জোরে। তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ কবিতা আমার প্রাণরক্ষা করলে কেমন করে। সত্যি বলছি, সেদিন কারো সাধ্য ছিল না যে, মরণাপন্ন আমাকে রক্ষা করে। ভাগ্যে কবিতা লিখতে শিখেছিলুম, তাই বেঁচে গেলুম। নইলে লোকের অত্যাচারে কবিতালক্ষ্মীকে বাল্যবয়সে বিদায় দিলে সেদিন আমার যে কি অবস্থা হতো, তা আমিই জানি।

গল্পটা তাহলে খুলেই বলি। নানা স্থান ঘুরে আমি যাচ্ছিলুম জয়পুর থেকে দিল্লী। টাইম টেবল খুলে দেখলুম, যদি দিল্লী যেতে হলে রাত্রের গাড়িতেই সুবিধে। কিন্তু সে ট্রেন অনেক রাত্রে ছাড়ে প্রায় দুটো। একে জয়পুরের মতো জায়গা, তায় মাঘ মাসের শীত, তার উপর রাত্রি দুটো — এই ব্রাহ্মস্পর্শ ঘাড়ে নিয়ে যাত্রা করতে আতঙ্কে আমার বুক কাঁপতে লাগল। কিন্তু উপায় কি? আমি স্টেশন মাস্টারকে বললাম, "কি উপায় করা যায়, বলুন দেখি? এত দারুণ শীতে ভোর রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ট্রেন ধরবার কথা মনে করতেই তো আমার কম্প দিয়ে জ্বর আসছে।"

স্টেশন মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি ফার্স্টক্লাস প্যাসেঞ্জার?" তখন বড়দিনের ছুটিতে রেল কোম্পানি অর্ধ ভাড়ায় সর্বত্র যাতায়াতের ব্যবস্থা করায় আমি সস্তায় বড়মানুষি করেছিলুম। বুক ফুলিয়ে বললুম, "হ্যাঁ, আমার ফার্স্টক্লাসের টিকিট।"

স্টেশন মাস্টার বললেন, "প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের জন্যে খুব একটা ভাল ব্যবস্থা আছে।"

আমি বললুম, "কি?"

তিনি বললেন, "আপনি এক কাজ করবেন। সন্ধ্যা আটটার মধ্যে খেয়েদেয়ে স্টেশনে আসবেন। আপনার জন্যে একখানা ফার্স্টক্লাস গাড়ি ঐ সাইডিংয়ে কেটে রেখে দেবো, আপনি তাতেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়বেন লেপ মুড়ি দিয়ে। তারপর রাত্রে যখন মেল আসবে, তাতেই আপনার গাড়ি লাগিয়ে দেবো। আপনি দিব্যি ঘুমতে ঘুমতে দিল্লী গিয়ে পৌঁছবেন।"

আমি বললুম- "বাঃ এ তো বেশ!"

স্টেশন-মাস্টার বললেন—"হ্যাঁ, শীতের রাত্রে গাড়ি ধররার অসুবিধে বলেই তো কোম্পানি বড়লোক যাত্রীদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছেন।"

আমি বললুম—"খুব ভালো ব্যবস্থা। আমি আটটার মধ্যেই আসবো--আপনি গাড়ি ঠিক করে রাখবেন।" তিনি বললেন —"গাড়ি ঠিক থাকবে। কিন্তু আপনি দেরি করবেন না! আটটার পর আর ট্রেন নেই বলে আমরা আটটার সময় স্টেশন বন্ধ করে চলে যাই।"

আমি বললুম--"আটটার মধ্যেই আসবো।" বলে আমি চলে গেলুম।

তারপর সন্ধ্যাবেলা আহারাদি সেরে পায়ে তিনজোড়া ডবল মোজা, গায়ে দুটো গরম গেঞ্জির উপর একটা মোটা ফ্লানেলের কামিজ, তার উপর সোয়েটার, তার উপর তুলো ভরা মেরজাই, তার উপর ওয়েস্ট কোট, কোট, ওভারকোট এবং সর্বোপরি একটা মোটা বালাপোষ মুড়ি দিয়ে, মাথাটাকে কান চাপা টুপি ও পশমের গলাবন্ধ দিয়ে এঁটে কাপতে কাপতে ঠিক আটটার সময় স্টেশনে এসে হাজির হলুম।

আমার মস্ত বড় লোহার তোরঙ্গটা দু'জন কুলি এসে ধরাধরি করে নামাতে গিয়ে একজন ফিক্ করে একটু হেসে ছেড়ে দিলে। আমি বললুম "কেয়া হলো রে?"

সে বললে - "বাবুজির তোরঙ্গ দেখছি ফাকা। যা দু' একটো ধুতি উাত আছে, সেগুলি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বাক্সটি আমাদের বখশিস্ করে যান বাবু আপনার কুলিভাড়া, রেল মাশুল অনেক বেচে যাবে।"

আমি বললুম- "যা, যা, তোম্‌কো আর ইয়ে করতে হবে না!" বলেই আমি হন্ হন্ করে স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে চলে গেলুম। স্টেশন মাস্টার আমাকে দেখেই বললেন- "গুড্ ইভিনিং বাবু। আপনার ভাগ্য খুব ভালো, আজ আর কোন প্যাসেঞ্জার নেই, সমস্ত গাড়িটাই আপনার একলার। চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।" বলে তিনি আমাকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে, পাচ ছয়টা রেল লাইন টপ্‌কে অনেক দূর চলে চলে একটা ফাঁকা মাঠের ধারে এনে দাড় করালেন। সামনে দেখলুম, একখানা ধোয়াটে রঙের গাড়ি কাটা পড়ে রয়েছে ঠিক যেন একটা স্কন্ধকাটা, অন্ধকারের আড়ালে গা লুকিয়ে দাড়িয়ে আছে! মাস্টারবাবু গাড়িটার চাব খুলে দিয়ে বললেন "নিন্ উঠে পড়ুন। বিছানা পেতে শুয়ে পড়ন।" বলেই তাড়াতাড়ি তার হাতবাতিটা তুলে নিয়ে গুড নাইট —বলে ছুট দিলেন। অন্ধকারে তাকে আর দেখতে পেলুম না, রেল লাইনের খোয়াগুলোর উপর তাঁর জুতোর খস্‌খস্ শব্দ কেবল শুনতে লাগলুম। হ্যাৎ করে আমার মনে হলো -তাই তো মাস্টারবাব অমন করে পালালেন কেন?

ইতিমধ্যে দেখি, কুলি দুটো আমার তোরঙ্গ ও বিছানাটা গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েই বল্‌ছে বাবুজি পয়সা'; আমি তাদের হাতে পয়সা দিতেই, তারাও ছুট্ দিল স্টেশনের দিকে। ব্যাপার কি? আমি হতভম্বের মতো দাড়িয়ে ভাবছি, দেখি দুটো কয়লা মাথা কালো ভূত রেল-লাইনের বাধের নিচ থেকে উঠে অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারটে

সাদা চোখ দিযে আমায দেখতে দেখতে স্টেশনেব দিকে চলে গেল। তাদেব পিছনে একটা কুকুব ল্যাজ তুলে দৌড দিলে। তাব পবেই সব একেবাবে নিস্তব্ধ! একেবাবে অন্ধকাব!

অমাবস্যাব বাত্রি- চাবিদিক অন্ধকাব ঘুটঘুট্ কবছে। সেই অন্ধকাবে একটা মাঠেব মধ্যে দাঁডিযে আমি এদিক ওদিক্ চাবিদিক্ দেখতে লাগলুম - আশেপাশে কেউ নেই; দূবে কেবল গাছগুলো অসাড হযে ছাযাব মতো দাঁডিযে আছে। গাযেব ভিতবটা কেমন ছম্‌ছম্ কবতে লাগলো।

আমি আস্তে আস্তে গাডিব মধ্যে গিযে উঠলুম। গাডিব ভিতবটা একেবাবে অন্ধকাবে ঠাসা। তাডাতাডি দেওযাল হাতডে বিজলিবাতিব চাব টিপলুম খুট কবে শব্দ হলো, আলো হলো না। সর্বনাশ! আলো নাই না কি? আলোব সুইচ্ নিয়ে অনেক নাডানাডি কবলুম, কোনই ফল হলো না, যেমন অন্ধকাব তেমনই, পকেট খুজলুম, দিযেশালাই নেই। কেমন কবেই বা থাকবে? তোবঙ্গেব মধ্যে একটা দিযেশালাই আছে! চাবি খজতে লাগলম, পৈতেতে চাবি বাধা ছিল, বালাপোষ, ওভাবকোট, কোট, ওযেস্ট কোট, সোযেটাব, গেঞ্জিব গোলক ধাধাব মধ্যে কোথায পৈতে-গাছটা হাবালো, কিছুতেই খজে পেলুম না। বামুনেব ছেলে, বিপদে আপদে, বিদেশবিভূযে যজ্ঞোপবীতটাই মস্ত সম্বল! সেটাও শেষে খোওযালুম!

সেই অন্ধকাবে আমাব যেন হাপ ধবতে লাগলো। অন্ধকাব যে জাতাকলেব মতো মানুষেব বুককে এমন কবে পিষতে থাকে এ আমি জানতুম না। আমি গাডিব মধ্যে এদিক্ ওদিক্ কবে ছট্‌ফট্ কবতে লাগলুম, কানে কাদেব সব ফিস্ ফিস্ কথা এসে লাগতে লাগলো। কোথায একটু আলো পাই? আমি ছুটে গাডি থেকে বোবযে বেলেব লাইন থেকে দুটো পাথব তুলে ঠক্ ঠক্ কবে সজোবে ঠুকতে লাগলুম যদি একটু আলোব ফিন্‌কি পাই। কিন্তু হায অদৃষ্ট, আলোব বদলে পাথবেব কুচিব ফিন্‌কি এসে আমাব চোখ দুটোকে ঝন্‌ঝনিযে দিলে!

আমি দু' হাতে চোখ বগ্‌ডাতে বগ্‌ডাতে স্টেশনেব দিকে ছুট দিলুম, যেমন কবে পাব, স্টেশন থেকে একটা আলো নিযে আসব। স্টেশন মাস্টাবটা কি পাজি! এই অন্ধকাবে মাঠেব মধ্যে আমায একা ফেলে গেল, একটা আলো দিলে না! বললে কি না, দিব্য ঘুমতে ঘুমতে যাবেন! পাজি কোথাকাব!

আমি ছুটতে ছুটতে একেবাবে স্টেশনেব কাছে এসে হাপ নিযে দাডালাম প্লাটফর্মেব — কিনাবায যে একটা কাল খেজুবগাছ ছিল, ঠিক তাব সামনে। কিন্তু এ কি? এই তো সেই খেজুব গাছ, এই তো এই তো বযেছে। কিন্তু স্টেশন কোথায? আমি এদিক্ ওদিক্ চাবিদিক্ চেযে দেখলুম স্টেশন নেই। মনে হলো, কালো শ্লেটেব গা থেকে ছেলেবা যেমন তাদেব আকা ছবিগুলো মুছে ফেলে, ঠিক তেমনি কবে অন্ধকাবেব গা থেকে স্টেশনকে একেবাবে কে মুছে ফেলেছে।

আমাব বুকটা ধবক্ কবে উঠলো। আমি তিলমাত্র না দাঁডিযে আবাব ছুটলাম্—যে পথে এসেছিলুম, সেই পথে আমাব গাডিব দিকে টপাটপ পাচ ছযটা

লাইন টপ্‌কে ছুটতে ছুটতে আমি যখন সেই মাঠের ধারে আমার গাড়ির সাম্‌নে এসে দাড়ালুম, তখন দেখি অতবড় গাড়িখানা নিয়ে কে উধাও হয়েছে। গাড়ির চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। কি সর্বনাশ!

আবার ভাল করে চারিদিক্ চেয়ে দেখলুম—স্টেশনও নেই, গাড়িও কোথায়? করি কি! একবার মনে হলো, যাই, আর একবার গিয়ে ভাল করে স্টেশনটা খুঁজে আসি। কিন্তু স্টেশনের দিকটার সেই খা খাঁ মূর্তি মনে হতে আমার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো! ছেলেবেলায় গল্পে শুনতুম দৈত্যদানারা রাতারাতি বড় বড় বাড়ি উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আবার সকালে যেখানকার বাড়ি সেইখানে রেখে যেতো—একি তাই হলো নাকি! মনে তো বিশ্বাস হয় না, কিন্তু চোখে তো দেখছি তাই।

হঠাৎ বুকটা কেঁপে উঠে মনে হলো, এমন করে রেল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা তো ঠিক নয় আচম্‌কা একখানি গাড়ি এসে চাপা দিয়ে যেতে পারে! যেই এই কথা মনে হওয়া, তাড়াতাড়ি লাইন থেকে সরে অন্যদিকে ছুটে গেলুম। কিন্তু যেদিকে যাই, সেইদিকেই রেলের লাইন, সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে, যেদিকে ছুটি সেইদিকেই দেখি রেলের লাইন লোহার জাল দিয়ে আমায় ঘিরে ফেলেছে পালাবার উপায় আর নেই! আমার এই ছুটোছুটি দেখে অন্ধকার থেকে কারা হঠাৎ যেন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। আমি চমকে উঠে থেমে দাড়াতেই টাল সামলাতে না পেরে একেবারে বাঁধের উপর থেকে গড়াতে গড়াতে নিচে এক গাছতলায় এসে পড়লুম। মনে হলো প্রাণটা যেন বাচলো! ট্রেন চাপা পড়বার আর ভয় নেই।

গাছের গায়ে ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইলুম। মনে হতে লাগলো কতক্ষণে রাত্রিটা কাটবে। কিন্তু রাত্রির যেন শেষ নেই। বসে বসে দেখতে লাগলুম, নিস্তব্ধ রাত্রি ঝিম্ ঝিম্ করতে করতে আরো নিঝুম চিকের ডানার মতো একখানা কালো কুৎসিত কম্বল আস্তে আস্তে টেনে মুড়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব জিনিস যেন মুছে আসছে। দেখতে দেখতে আমি শুদ্ধ যেন মুছে আসতে লাগলুম। কালো জুতো মোজা পরা আমার লম্বা পা দু'খানা একটু একটু করে মুছে গেল। কালো ওভারকোট ও নীল গলাপোষ মোড়া গা তাও আস্তে আস্তে মুছতে লাগলো। যখন প্রায় কোমড় অবধি মুছে গেছে, আমি আর সে দৃশ্য দেখতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেললুম। চোখ বুজে মনে হতে লাগলো আমি আছি কি নেই? আছি কি নেই?

"আছ আছি এইখানে, আছি।" বলে কানের কাছে কে একজন চিৎকার করে উঠলো। আমি চোখ চেয়ে দেখি, মানুষের দেহের মেদ মাংস ছাড়িয়ে নিলে যেমন হয়, তেমনিতর একটা কঙ্কাল তার কাঠের মতো সরু সরু লম্বা আঙুল নেড়ে ইশারা করে কাকে ডাকছে। দেখতে দেখতে ঠিক তারই জুড়ি আর একটা কঙ্কাল লাফাতে লাফাতে তার পাশে এসে দাড়ালো।

তারপর আর একটা।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা আস্তে আস্তে সরে আমার খুব কাছে এসে ঘাড় হেঁট করে আমাকে দেখতে লাগলো। তার চোখের ওপর চোখ পড়তে দেখলুম—না আছে পাতা, না আছে তারা, শুধু দুটো গোল গোল গহ্বর কালো কট্‌কট্‌ করছে। সে আমাকে বেশ নিরীক্ষণ করে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—"এই নাকি সে?"

প্রথম কঙ্কালটা বললে "বেশ বেমালুম লুকিয়েছে তো, একেবারে চেনবার জো নেই।"

শেষ কঙ্কালটা ছুটে এসে বললে—"কৈ, দেখি।" বলে তার হাড় বার করা আঙুলগুলো দিয়ে টিপে টিপে আমায় দেখতে লাগলো।

"ও আর দেখছিস কি? ও সে ই! আমার চোখে কি ধুলো দেবার জো আছে হাজারই লুকোক না।" বলে প্রথম কঙ্কালটা এতখানি হাঁ করে বিরাট শব্দে হেসে উঠলো। মুখের ভেতর থেকে তার সেই সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে অন্ধকারকে যেন কামড়ে ধরল।

শেষ কঙ্কালটা বললে "তবু একটু পরখ করতে হবে না; ওদিকে লগ্ন বয়ে যায়।" বলে সে আমার শিয়রের কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি ভাবলুম, ব্যস্, এইবার আমার শেষ!

দেখতে দেখতে বাকি দুটো কঙ্কাল এগিয়ে এসে আমার পা দু'খানা ধরলে, প্রথমটা মাথার দিকটা ধরলে, তারপর তিনজনে মাটি থেকে চ্যাং দোলা করে আমায় তুলে ফেললে। আমি তাড়াতাড়ি দু'হাত দিয়ে গাছের গুঁড়িটা চেপে ধরে বলে উঠলুম "কোথায় নিয়ে যান মশাই?"

তারা বললে "বিয়ে দিতে।"

আমি চমকে উঠে বললুম "বিয়ে দিতে কি মশাই! এই বুড়ো বয়সে?"

একজন বললে "বুড়োরা বরই পছন্দ করি।"

আমি বললুম "মশায়, আমার চেয়ে ঢের বুড়ো আছে, তাদের কাউকে নিয়ে যান্ না, আমায় কেন মিছিমিছি কষ্ট দিচ্ছেন।"

প্রথম কঙ্কালটা চেঁচিয়ে বলে উঠলো "তুমি ভেবেছ, পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকলে রেহাই পাবে? তোমাকে আমরা জোর করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেবো।"

আমি বললুম—"আমি তো মশাই, পালিয়ে এসে লুকিয়ে নেই। সেই ছেলেবেলায় একবার পালিয়েছিলুম বটে, তারপর তো জ্যাঠামশাই পুলিশ দিয়ে ট্রেন থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার বিয়ে দেন।"

সে বললে "আমরাও পুলিশ এনেছি, ধরে নিয়ে গিয়ে তোমার বিয়ে দেবো বলে।"

আমি কাঁচমাচু হয়ে বললুম "কিন্তু আমি তো আর বিয়ে করতে পারব না।"

"পারবে না কি? বিয়ে তোমায় করতেই হবে। এমন কি তোমার গো?" বলে সেই পয়লা নম্বরের কঙ্কালটা ভীষণ গর্জন করে উঠলো।

আমি বললুম—“রাগ করেন কেন মশাই? আমি ছাড়া কি আর পাত্র নেই? কত ছেলে হয়তো খুশি হয়ে বিয়ে করবে।”

সে বললে—“এত রাত্রে এখন ভাল পাত্র পাই কোথায়? যার তার হাতে তো মেয়ে দেওয়া যায় না, চল, লগ্ন বয়ে যায়।”

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললুম—“তাহলে নিতান্তই কি আমাকে বিয়ে করতে হবে?”

শেষ কঙ্কালটা আমার কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে নরম সুরে বললে—“দুঃখ করছিস কেন ভাই ক্যাংলা!”

আমি তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বললুম—“ক্যাংলা কে মশাই! আমি তো ক্যাংলা নই। আমি শ্রীমাধবচন্দ্র চক্রবর্তী। আমার পিতার নাম ৺মধুসূদন চক্রবর্তী।”

প্রথম কঙ্কালটা হো-হো করে হেসে উঠে বললে “রাধে মাধব! রাধে মাধব!”

আমি বললুম—“সে কি মশাই?”

সে বললে—“এই এতরাত্রে, এই শ্মশানের ধারে একটা জ্যান্ত শিয়াল-কুকুর থাকে না, আর মাধব চক্রবর্তী আছে? তুই এতই বোকা পেলি আমাদের?” আমি বললুম—“এই তো আমি রয়েছি।” সে বললে—“আবে ভাই, মাধব চক্রবর্তীর দেহের ভিতর আবার কে এলো!”

সে বললে—“আবে ক্যাংলা, তুই মাধব চক্রবর্তীর শূন্য দেহের মধ্যে সেঁধিয়ে আছিস, সে কি আমি টের পাইনি ভেবেছিস?”

আমি বললুম—“এসব কি হেঁয়ালি বকছেন মশাই? মাধব চক্রবর্তীর দেহেব মধ্যে যদি ক্যাংলা এলো, তো মাধব চক্রবর্তী গেল কোথা?”

সে বললে—“আরে ভাই, বামুনের ছেলে সে, বৈকুণ্ঠে গেছে!”

আমি বললুম—“না মরেই সে বৈকুণ্ঠে গেল?”

সে বললে—“মরেছে না তো কি?”

আমি বললুম—“মরেছে কি রকম! সে মরে গেল আর টের পেলে না?”

সে বললে “মানুষ কখন জন্মায় আর কখন মরে, সে তা টের পায় না কি।”

কথাটা শুনে বোঁ করে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। আমার অজান্তে আমি মরে গেলুম না কি অ্যা? সেই যে দেখলুম পৃথিবীর গা থেকে একে একে সব মুছে আসছে—সেই কি আমার মৃত্যু না কি? কিন্তু এই তো আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা বটে। কিন্তু তবু কেমন সন্দেহ হতে লাগলো। হয়তো এ আমি নই—এ আর কার আত্মা আমার শূন্য শরীর দখল করেছে। নইলে এই কঙ্কালগুলোর সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইতে পারতুম? জ্যান্ত মানুষ কি কখনো তা পারে? কিন্তু মরে গেলুম কেমন করে? আমার তো রোগ হয়নি। হয়তো ঐ বাঁধের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ার সময়ে পাথরে মাথা লেগে আমার মৃত্যু হয়েছে—আমি টের পাইনি।

ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গুলিয়ে যেতে লাগলো। কেমন মনে হতে লাগলো—না, আমি মাধব চক্রবর্তী নই। এবং ঠিকই বলেছে—কাঙালীচরণের আত্মা

আমার শূন্য দেহের মধ্যে এসে আসন পেতে বসেছে। তাইতো আমার দেহের ভ্রম হচ্ছে, মাধব চক্রবর্তীর জের বুঝি এখনো চলছে, কিন্তু কাঙালীচরণ লোকটা কে? আমি যদি কাঙালীচরণ হব, তবে আমি আমাকে চিন্‌তে পারছি না কেন? এরা তো চিন্‌তে পেরেছে।

প্রথম কঙ্কালটা বলে উঠলো- -"কি হে ক্যাংলা, কি ভাবছ? বিয়ে করবার মতি স্থির হলো?" আমি বললুম- -"আচ্ছা মশাই, আমি কি সত্যি কাঙালীচরণ?"

সে খানিক আমার মুখের দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে বল্লে- "সে কি রে ক্যাংলা, তুই নিজেকে নিজে চিনতে পারছিস্ না?"

আমি বললুম—"না।"

সে বললে- -"সর্বনাশ হয়েছে! তুই আমাদেরও চিনতে পারছিস না?"

আমি বললুম- -"একটুও না।"

সে বল্লে—"তোর মনে পড়ছে না- -আজ এই অমাবস্যার দিনে ঘুটঘুটে লগ্নে তোর বিয়ে - বাগেশ্বরীব সঙ্গে?"

আমি বললুম—"কৈ আমার তো কোন বিয়ের কথা হয়নি!" সে বললে—"সে কি বে! তোর গায়ে গোবর পর্যন্ত হয়ে গেছে, মনে পড়ছে না?"

আমি বললুম -"গায়ে গোবব কাকে বলে?"

সে বল্লে- -"তুই অবাক কবলি। তোর কিছু মনে পড়ছে না? গায়ে গোবরের দিন ভোর বাত্রে তালপুকুরে তুই মাছ মাবতে যাচ্ছিলি তত্ত্ব পাঠাবার জন্যে, তালগাছের মাথায় বসে পা ঝুলিয়ে বাগেশ্ববী বরপণেব কড়ি বাচছিল, তুই বাগেশ্বরীকে দেখ্‌তে পার্সনি, সেও তোকে দেখতে পায়নি, তাবপব তুই যেমন ঠিক তাল গাছের তলাটিতে এসেছিস্, অমনি বাগেশ্বরীর পা দুটো দুল্‌তে দুল্‌তে তোব কপালে এসে ঠক করে লেগে গেল। বাগেশ্বরী তো লজ্জায় সাত হাত জিভ্ কেটে, মাথায় ঘোম্‌টা টেনে দৌড! আর তুই বাড়িতে কাদতে কাঁদতে ছুটে এসে বললি ও মেয়েকে আমি বিয়ে করব না। কেন রে, কেন কি হয়েছে? তুই বললি, - ওর পা আমার কপালে ঠেকেছে। তাতে হয়েছে কি? তুই বললি -হয়েছে আমার মাথা আব মুণ্ডু। বলে তুই- কপাল চাপড়াতে লাগলি! এ সব তোর মনে পড়ছে না?"

আমি বললুম -"মনে পড়ছে, ওই রকম একটা গল্প যেন কোথায় শুনেছিলুম। তারপর কি হলো?"

সে বললে—"সর্বনাশ করলি। তারপরেও তোর মনে পড়ছে না? তারপর তো গুরুঠাকুর এলেন; এসে বিধান দিলেন যে, বাগেশ্বরীর পা তোর মাথায় একবার ঠেকেছে, তুই—সাত—একে—সাতশোবার তোব পা দিয়ে তার মাথাটা থেৎলে দে, তা হলেই সব দোষ খণ্ডে যাবে। তুই বললি ওরে বাপরে; বাগেশ্বরীর মাথায় লাথি মারা; সে আমি পারব না; বলে তুই ছুট্ দিলি।"

আমি বললুম—"তারপর?"

সে বললে—"তারপর আজ বিয়ের সময় তোকে খুঁজে না পেয়ে, খুঁজতে খুঁজতে

এই শ্মশানঘাটে এসে দেখি, তুই এই মাধব চক্রবর্তীর মড়াটাকে দানা পাইয়ে বসে আছিস্। হাঁরে, এই মাধব চক্রবর্তীকে যারা পোড়াতে এসেছিল, তারা গেল কোথায়; তোকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে বুঝি?"

আমি বললুম—"মাধব চক্রবর্তীকে আবার পোড়াতে আসবে কারা? আমি তো তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না?"

সে বললে—"তোর কিছুই মনে পড়ছে না? তুই সত্যি বলছিস, না মস্করা করছিস?"

আমি বললুম—"তোমার দিব্যি, আমি সত্যি বলছি।" সে বললে, "তবে সর্বনাশ হয়েছে—তোকে মানুষে পেয়েছে।"

আমি বললুম—"মানুষে পেয়েছে কি গো!"

সে বল্লে—"জানিস না বুঝি, আমরা যেমন মানুষের ঘাড়ে চাপি, মানুষও তেমনি আমাদের কারো কারো ঘাড়ে চাপে। তুই যখন মাধব চক্রবর্তীর দেহে সেঁধিয়েছিলি, তখন বোধ হয় তার একটুখানি প্রাণ ছিল, সেইটে তোকে পেয়ে বসেছে।"

আমি বললুম—"তাতে কি হয়?"

সে বললে—"মানুষ যেমন তখন নিজেকে চিনতে পারে না, আপনার লোককে চিনতে পারে না, আবোল-তাবোল বকে, কট্‌মট্ করে চোখ ঘুরোতে থাকে, আমাদেরও ঠিক তেমনি হয়। তাই তো তুই অমন করছিস্—নিজেকে চিনতে পারছিস না, আমাদেরও চিনতে পারছিস না।"

"ওগো, তবে আমার কি হবে?"

সে বল্লে—"যেমন বিয়ে করব না বোলে পালিয়ে এসেছিস, তেমনি ঠিক জব্দ।"

আমি বললুম—"ওগো, আমি বাগেশ্বরীকে বিয়ে করবো—আমাকে উদ্ধার করো।"

সে বললে—"তবে বেরিয়ে আয় ওখান থেকে।"

আমি বললুম—"বেরুব কি করে গো?"

সে বললে—"পথ হারিয়ে ফেলেছিস বুঝি? মুস্কিল করলি দেখছি? এক কাজ কর। মাধব চক্রবর্তীর ঐ কোঁচার খুঁটটা এই গাছের ডালে বেঁধে গলায় একটা ফাঁস দিয়ে তুই ঝুলে পড়—তাহলেই সুড়ুৎ করে বেরিয়ে আসতে পারবি।"

আমি আঁতকে উঠে বললুম—"ওরে বাপরে—সে যে ফাঁসি! সে আমি পারব না।"

সে বললে—"ভয়-কি! আমি তো কতবার ফাঁসি গেছি! তোর কোনো ভয় নেই, তুই ঝুলে পড়।"

আমি ভয়ে শিউরে উঠে বললুম—"না গো, না—সে আমি পারব না, গলায় ফাঁসি দিতে কিছুতেই পারব না।"

যেমন এই কথা বলা, সেই প্রথম কঙ্কালটা তার সেই কালো গর্তের মতো চোখ দুটোকে বন্ বন্ করে ঘুরিয়ে বললে—"কী তুই ফাঁসি যেতে পারবি না! আমরা

হলুম গলায়দড়ে! তুই আমাদের ঘরের ছেলে হয়ে, এমন কথা বলিস যে, ফাঁসি যেতে তোর ভয় হয়—কুলাঙ্গার কোথাকার।"

আমি কাঁচুমাচু হয়ে বললুম—"কি করব, আমার যে ভয় করছে!"

সে দাঁতের দু'পাটি কড়মড় করতে করতে বলে উঠলো—"ফের ঐ কথা! এই বেলা ঝুলে পড়, নইলে তোব ভাল হবে না বলছি।"

আমি বললুম-—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমি ফাঁসিতে ঝুলতে পারব না—আমার ভয় করছে।"

সে আরো রেগে বললে— "হতভাগা কোথাকার! দূর হ, আমাদের সামনে থেকে দূর হ।" বলে সে তেড়ে আমায় মারতে এলো।

দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে -"রাগ করেন কেন খুড়ো মশাই। ও হয় তো ক্যাংলা নয়? নইলে ফাঁসিতে ভয় পাবে কেন?"

খুড়ো মশাই বললেন —"কী! ক্যাংলা নয় ও? আমি সাত বছর টিক্‌টিকি পুলিশে কাজ করেছি, কত বড় বড় ফেরার পাকড়াও করেছি--আমার ভুল হবে?" শেষ কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে - "যখন সন্দেহ হচ্ছে তখন একবার পরখ কবে দেখতে ক্ষতি কি দাদামশাই?"

দাদামশাই বললেন, "আচ্ছা বেশ, পবীক্ষা হোক।" বলে আমার দিকে ফিরে বললে --"কি হে, তুমি মাধব চক্রবর্তী না কাঙালীচবণ!"

আমি বললুম --"আজ্ঞে, আগে তো জানতুম আমি মাধব চক্রবর্তী, কিন্তু তাবপর থেকে মনে হচ্ছে কাঙালীচবণ।" সে বললে - "কাঙালীচবণ যদি হও, তুমি আমার অবাধ্য হয়েছ বলে তোমায় ফাঁসি দেবো আমরা, এই শ্মশানে —এই গাছের ডালে!"

আমি বললুম--"আজ্ঞে আমি তবে মাধব চক্রবর্তী," সে বললে- -"বেশ মাধব চক্রবর্তী বলে যদি নিজেকে প্রমাণ কবতে পাব, তাহলে তোমায় তিনবাব সেলাম ঠুকে আমরা চলে যাবো।"

"আর যদি না পারি?"

"তা হলে এইখানে তোমার ঘাড় মট্‌কে রেখে চলে যাবো।"

"ঘাড় মট্‌কে দেবেন? সর্বনাশ! এই বিদেশ বিভূঁয়ে —এই অচেনা জাযগায এত রাত্রিতে নিজেকে কি করে প্রমাণ করবো মশাই?"

"না পার ঘাড়টি মট্‌কে দেবো---শ্মশানের ভূত হয়ে থেকো।"

সত্যি বলছি, এই কথা শুনে আমি কেঁদে ফেললুম। তখন সেই দ্বিতীয় কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে—"কাঁদছ কেন? তোমার এমন কোনো চিহ্ন নেই, যাতে প্রমাণ হয়, তুমি মাধব চক্রবর্তী?"

আমি বললুম—"আছে। এই দেখুন, আমার ডান হাতে একটা জড়ুলের দাগ।"

সে হেসে বললে —"ও প্রমাণ তোমাদের পুলিশের কাছে চলে, এখানে আমাদের কাছে চলে না। কোন ভিতরের প্রমাণ দিতে পার?"

আমি বললুম— "আমার ভিতরে কি আছে না আছে, আমি তো জানি না মশাই। এই দেখুন না আমার ভিতরে কাঙালীচরণ আছে কি মাধব চক্রবর্তী আছে, আমি তাই ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।"

প্রথম কঙ্কালটা গম্ভীরস্বরে বলে উঠল "আজ্ঞে না, না, আমি মাধব চক্রবর্তী।"

সে বললে- "শীগগির প্রমাণ কর নইলে ঘাড় মট্‌কালুম বলে।"

দ্বিতীয় কঙ্কালটা বললে— "অমন ঘেবড়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কি এমন কোন গুণ নেই যাতে বোঝা যায় তুমি মাধব চক্রবর্তী ?"

আমি বলে উঠলুম - "হ্যাঁ আছে বৈ কি! আমার একটা মস্ত গুণ আছে, আমি কবিতা লিখতে পারি।"

প্রথম কঙ্কালটা এগিয়ে এসে বললে "তুমি কবিতা লিখতে পার? নিজে লেখ? না পরের কবিতা নিজের বলে চালাও ?"

আমি বললুম —"না মশাই, আমি সে রকম কবি নই।" সে বললে— "তোমার কবিতা কাগজে ছাপা হয় ?"

আমি বললুম— "না, সম্পাদকেরা ভয়ে ছাপেন না।" সে বললে "ভয়ে ছাপেন না কি রকম ?"

আমি বললুম "আমার কবিতা এত উচ্চশ্রেণীর যে, একবার সে কবিতা ছাপলে পাঠকেরা অন্য কবিতা পড়তেই চাইবে না। কাগজ ভর্তি করা তখন দায় হয়ে উঠবে। এ কথা এক সম্পাদক আমায় নিজের মুখে বলেছেন।"

সে বললে "আচ্ছা! কৈ দেখি একটা কবিতা লেখ দিকিনি।"

আমি তখনই ওভারকোটের পকেট থেকে আমার পকেট বইখানা বার করে বললুম "আলো একটা চাই যে।"

সে বললে "দিচ্ছি আলো।" বলে খানিকটা ধূলো বালি একত্র করে একটা ফুঁ দিলে আর অমনি আগুন জ্বলে উঠলো। আমি সেই আলোয় বসে লিখতে লাগলুম।

খানিকটা লিখেছি, সে বললে — "কৈ, কি লিখলে পড়।" আমি বললুম— "এখনও যে শেষ হয়নি মশাই।" সে বললে "কবিতার আবার শেষ আছে না কি? যা লিখেছ পড় -ফাজলামি করতে হবে না।" আমি সুর করে পড়লম—

"পড়িয়ে বিপদে তারা,
হয়েছি মা দিশে হারা!
উদ্ধার এ দুঃখ-কারা
পার হতে মা জননী
শ্মশানে বসিয়ে ডাকি,
ভয়ে ঘোরে শির চাকি,
খাবি খায় প্রাণ পাখি,
শূন্য হেরি এ ধরণী
কোথা মোর গেহ খাঁচা

কোথা পিতা, কোথা চাচা,
এসে মা আমারে বাঁচা,
দিয়ে তোর পা-তরণী।”

এইটুকু শেষ হতেই সে বললে—“ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে। এ রকম গান তো আমি অনেক যাত্রায় জুড়িদের মুখে শুনেছি। এ তোমার নিজের লেখা না পুরনো গান একটা মুখস্থ ছিল তাই লিখে শোনাচ্ছ?”

আমি বললুম—“না মশাই, এ আমার নিজের রচনা। একেবারে টাট্‌কা। এতে আপনি পুরোনোর গন্ধ কোথায় পেলেন? দেখছেন না, একেবারে আধুনিক ধরনের লেখা।”

সে বললে—“থাম, তোমায় আর জ্যাঠাপনা করতে হবে না। পুরোনো একটা গান চুরি করে নিয়ে আমায় ফাঁকি দেবে ভেবেছ? তা হচ্ছে না। দেখি তুমি কত বড় ওস্তাদ, আমার নাম দিয়ে একটা কবিতা লিখতে পার?” আমি বললুম—“খুব পারি। নাম দিয়ে আমি অনেক কবিতা লিখেছি। তেলের নাম দিয়ে ওষুধের নাম দিয়ে অনেক ভাল ভাল কবিতা আমার লেখা আছে। একবার একটা জুতোর দোকানের কবিতা লিখে প্রাইজ পেয়েছিলাম। আপনার নামটা কি বলুন, আমি এখনি লিখে দিচ্ছি।”

সে বললে—“আমার নাম জাদবেল। লিখে ফেল দেখি এই নাম দিয়ে একটা কবিতা চট্ করে। বুঝব কত বড় বাহাদুর তুমি।”

আমি কাগজ পেন্সিল নিয়ে লিখতে শুরু করেছি মাত্র, সে বললে—“কি লিখলে, পড় হে। আমি ও বড় কবিতা দু’চক্ষে দেখতে পারি না।”

আমি বললুম—“মশাই, আর একটু সময় দিন।” বলে আমি খস্ খস্ শব্দে লিখে যেতে লাগলাম। একবার একটু থেমেছি, সে আমার খাতার দিকে ঝুঁকে দেখে বললে—“উঃ, অনেকটা লেখা হয়েছে। এইবার পড়।”

অগত্যা আমি পড়লুম—

“বেল আছে, জেল আছে,
আর আছে কৎবেল;
পাশ্ আছে, ফেল আছে,
আর আছে শূল শেল্
গোল আছে, চোল আছে,
আর আছে সবখেল
সব সে বড়া হ্যায়
জাদবেল জাঁদবেল”

পড়া শেষ হতেই সে চিৎকার করে উঠলো—“বাঃ, বাঃ, বেড়ে লিখেছ তো হে। আর একবার পড় তো, আর একবার পড় তো।”

আমি আর একবার চিৎকার করে পড়লুম—“বেল আছে, জেল আছে, ইত্যাদি।”

সে আবার বললে—"বেশ হয়েছে! চমৎকার হয়েছে! যাও প্রমাণ হয়ে গেল তুমি কবি মাধব চক্রবর্তী।"

আমি বললুম—"ঠিক বলছেন মশাই, আমি কাঙালীচরণ নই!" সে বললে—"কাঙালীচরণের চৌদ্দপুরুষ এমন কবিতা লিখতে পারে না। মাধব চক্রবর্তী না হলে এমন কবিতা লেখে কে?" আমি বললুম—"মশাই, আমার আর একটা কবিতা শুনবেন? এই খাতায় লেখা আছে—এই জয়পুরের সম্বন্ধে।" সে বললে—"কি শোনাও তো দেখি।"

আমি তাড়াতাড়ি পকেট বইয়ের খাতা হাতড়ে কবিতাটা বার করে পড়তে শুরু করলুম—

"বস্তা-বস্তা পুঞ্জ পুঞ্জ তীব্র হিম ঢেলে
ব্যোম মার্গে কে রচিল শীতের পাহাড়?
লেপ গদি বালাপোষ সর্ব বর্ম ভেঙে
কম্প এসে কাঁপাইছে শরীরের হাড়!
ঊর্ধ্ব ফণা ক্রুদ্ধ শত নাগিনীর প্রায়
কপালে কপোলে ভীম হানিছে ছোবল,
কিম্বা কোন্ পিশাচিনী উন্মাদিনী-সমা
তীক্ষ্ণধার ছুরিকায় করিছে কোতল!
অথবা কি মেঘ-দৈত্য ছোঁড়ে শাপনেল -"

হঠাৎ দূরে একটা বীভৎস কোলাহল উঠলো—"ওরে ক্যাংলাকে পাওয়া গেছে।"

আমি চমকে উঠে পড়া থামিয়ে চেয়ে দেখি আমার সামনের কঙ্কাল তিনটে লাফাতে লাফাতে ডিগবাজি খেতে খেতে মাঠের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল! আমি রাম! রাম! বলতে বলতে সেখান থেকে উঠে পড়লুম। এতক্ষণ রাম নামটা যে কেন মনে আসেনি কে জানে!

আমি রেল-লাইনের বাঁধ ঠেলে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় দুটি কুলির সঙ্গে দেখা। তারা বললে—"বাবু, আপনাকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি গাড়ি ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলেন?"

আমি আর কি বলব? বললুম—"আমি এখানে ঐ ইয়ে হচ্ছিল কি না, তাই একটু দেখছিলুম।" তারা বললে, "আপনার গাড়ি ঠেলে আমরা ঐ ওদিকে রেখে দিয়েছি। চলুন আপনাকে দেখিয়ে দিই।" বলে তারা আমাকে গাড়িতে তুলে দিলে।

আমি গাড়িতে উঠে বললুম—"হাঁরে, গাড়িতে আলো নেই কেন?"

সে বলল—"বিজুলিবাতি আছে, মেল গাড়ির সঙ্গে লাগিয়ে দিলে তবে জ্বলবে।"

আমি বললুম—"আমাকে একটা বাতি দিয়ে যেতে পারিস্?—বখশিস্ দেবো।"

তাদের একজন ছুটে গিয়ে একটা বাতি এনে দিলে। আমি সেইটে সামনে রেখে পকেট বই খুলে নিজের লেখা কবিতা পড়তে লাগলুম।

ভুতুড়ে বাড়ি

The Haunted House-- আলেকজান্ডার উলবার্ট

বহুদিন পর লন্ডনে ফিরে এসে মনের মতো একটা বাড়ি খুজে বেড়াচ্ছিলাম। কল্পনায় ছিল বাড়িটা হবে শহরের এক কোণে, সামনে ছোট্ট একটা ফুলের বাগান থাকবে। কিন্তু লোকজন, ট্রাম বাসের হটগোল যেন একদম শোনা না যায়। এই কল্পনার বাড়ি সর্বত্র খুজে চললাম। একদিন হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে আমার মনের মতো বাড়ি খুজে পেলাম। বড় রাস্তা থেকে সামান্য ভেতরে বড় বড় গাছে ঢাকা মস্ত বাগানওয়ালা পুরানো আমলের ভাঙাচোরা একটা বাড়ি দেখতে পেলাম। প্রথম দর্শনে বাড়িটা দেখে মনে হলো, খুব নির্জন ও নিরিবিলি। যেটা আমি মনে মনে খুবই চাইছিলাম। তাছাড়া এই বাড়িতে লোকজন আছে কিনা, বা এই বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হবে কিনা কিছুই জানতাম না। বাড়ির গায়ে কোথাও 'এই বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হইবে' বলে কোন বিজ্ঞাপন নজরে পড়লো না।

কিন্তু এই বাড়িটা দেখেই মনে মনে কেমন জেদ এলো যেমন ভাবেই হোক এই বাড়িই আমাকে ভাড়া নিতে হবে। আমি সোজাসুজি বাগানের ওক কাঠের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। অদ্ভুত ব্যাপার— দরজাটা সশব্দে নিজের থেকে বন্ধ হয়ে গেল। বাগানে ঢুকেই মনে হলো আমি এক বিচিত্র জগতে এসে পড়েছি —বাইরের পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কোথাও মানুষের কোলাহল, ট্রাম বাসের আওয়াজ, গোলমাল, চিৎকার, চেচামেচি কোন কিছুই শোনা যায় না। চারিদিকের পরিবেশটা যেন খুব শান্ত, মৌন, নিস্তব্ধতা ছড়ানো। একটা পুরানো ঝর্ণা দেখতে পেলাম। ঝর্ণা থেকে প্রতিনিয়ত জল ঝরছে, চারপাশে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে রয়েছে, কয়েকটা মৌমাছি, প্রজাপতি ফুলের উপর উড়ে বেড়াচ্ছে। সামনের মঞ্চে বসবার আসনটা দেখে মনে হলো বহু পুরানো, অব্যবহারের জন্যে ভেঙেও গেছে।

আমি বাগান পেরিয়ে সদর দরজা পেলাম। মনে মনে ইতস্তত করলেও সাহস করে দরজায় কড়া নাড়লাম। দেখলাম, একজন বুড়ো মানুষ এসে দরজা খুলে দিলেন।

কি বলে কথা শুরু করবো তাই ভাবতে লাগলাম। খানিক ভেবে বললাম —শুনেছিলাম এই বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হবে।

ভদ্রলোক একটু রাগত গলায় বললেন —না, এমন তো কোন কথা নেই। আপনি নিশ্চয় ভুল শুনেছেন। কি আর করি— —ভাবলাম বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হলো না।

হঠাৎ ভদ্রলোকের স্ত্রী ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, বলুন তো আপনি কি করে জানলেন? অবশ্য এই নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু সত্যিই আমরা ভেবেছি এই বাড়িটা ভাড়া দিয়ে আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলে যাব। আপনি যদি ভাড়া নিতে চান তাহলে ভিতরে এসে সম্পূর্ণ বাড়িটা দেখে যান।

এইরকম প্রস্তাব শুনে আমি ভিতরে ঢুকে বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। দেখলাম বাড়িটা ভীষণ পুরানো, ওর হাড়গোড় সব বেরিয়ে গেছে। সর্বত্র ইট, কাঠ ভেঙে পড়েছে, আসবাবপত্রগুলোও খুব পুরানো, অনেক জায়গায় ঝুল জমেছে আবার কোথাও কালিও পড়েছে। তবুও কি জানি কেন বাড়িটা আমার কাছে দারুণ ভাল লাগলো। মনে মনে বললাম, যেমন করেই হোক বাড়িটা আমি নেবই। এখানে বসে পড়াশুনা দারুণ হবে। বাড়িটা খুব সুন্দর লাগলো।

সংস্কারবশে আমি না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না, আচ্ছা, আপনারা বাড়িটা ছাড়তে চাইছেন কেন?

লক্ষ্য করলাম ভদ্রমহিলার চোখে মুখে [illegible] ছায়া পড়লো। তিনি নরম সুরে বললেন, সত্যি কথা বলতে কি, এই বাড়িতে [illegible] পারছি না। এই বাড়িতে কোন চাকর থাকলেই এক রাতের বেশি [illegible] ঘরে নানা রকম অলৌকিক ঘটনা ঘটে। সেই ঘর বাড়ির একেবারে পেছন দিকে। আজকাল রাতের মধ্যে এ ধরনের নানা প্রকার আওয়াজ শোনা [illegible] আমার স্বামী কানে একটু খাটো বলে তিনি অনেক কিছুই শুনতে পান না। কিন্তু আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে এই বাড়িটা। সারারাত ঘুমোতে পারি না, [illegible] যেন পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই। ভয়ে ভয়ে এই বাড়িটায় [illegible] আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ভদ্রমহিলা আবার আপনমনে বলে চললেন, জানেন, এই বাড়িতে আমরা বেশিদিন আসিনি। আমার স্বামীর এক দাদা এই বাড়িতে থাকতেন। তার মৃত্যুর পর আমরা এই বাড়ির মালিক হই। আমার স্বামীর কাকা বাড়ির সামনের দিকেই থাকতেন পেছন দিকটা কোনদিনই কেউ ব্যবহার করেনি। হঠাৎই ভদ্রমহিলা একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে চুপটি করে রইলেন।

আমার মনের বাসনা পূর্ণ হলো। বাড়িটা অনির্দিষ্টকালের জন্যে ভাড়া নিলাম। দিন দুয়েকের মধ্যে বুড়ো বুড়ি তাদের বাক্স বিছানা সব নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু বেশির ভাগ পুরানো জিনিস রেখে গেলেন। প্রথম দিন বাড়িটায় ঢুকে খুব আনন্দ পেলাম। ছোট বাচ্চার মতো সারা বাড়ি ছুটে বেড়ালাম। কোন ঘরে কি আসবাবপত্র সাজাবো, কোথায় কি মেরামত করবো এই সব প্রথম দিনেই ঠিক করে ফেললাম। পিছনের একমাত্র ছোট ঘরটায় তালা ঝুলানো ছিল। আমি তালা খুলে ঘরে ঢুকতেই সমস্ত শরীরটা ভারী হয়ে উঠল। গায়ে কাঁটা দিতে লাগলো, কি রকম যেন একটা ভয় ভয় অবস্থা! খুব রহস্যপূর্ণ মনে হলো! এক পা গিয়েই আর এগোতে ইচ্ছা করলো না। এই ঘরে একটাও আসবাবপত্র ছিল না, সম্পূর্ণ ফাকা। তাড়াতাড়ি ঘরটা আবার বন্ধ করে দিলাম।

আমি আব আমাব সেক্রেটাবি দু'জনে মিলে দোতলাব দুটো ঘব সাজিয়ে-গুছিযে নিলাম। আমাব সেক্রেটাবি আমাব চেযে বযসে বেশ বড। আমাদেব কোন চাকব-বাকব ছিল না। বাইবে হোটেলে খেযে এসে বাত্রিটা শুধু ঘবেতে ঘুমোতাম—ঘুমোতাম বললে মিথ্যে বলা হচ্ছে, কাবণ আমবা দু'জনেই সাবাবাত্রি জেগে থাকতাম, ভযে দু'জনেই কাঠ হযে থাকতাম।

প্রথম দিনটাব কথা বেশ মনে আছে। আমবা উপব নিচ সমস্ত ঘবেব দবজা-জানালা দেখেশুনে বন্ধ কবে এবং সমস্ত কিছু ভাল কবে দেখে নিয়ে তাবপব যে যাব নিজেদেব ঘবেব দবজা বন্ধ কবে শুযে পডলাম। আমাব মাথাব ঠিক উপবেই ইলেকট্রিক আলো ছিল। তাই ভাবলাম একটা বই পডি। বেশ মেজাজে বইটা পডছি, হঠাৎ একটা ভাবী আওযাজ শুনে চমকে উঠলাম। স্পষ্ট বুঝতে পাবলাম, নিচেব দবজা খুলে কে যেন ভেতবে ঢুকলো! বইপত্র বন্ধ কবে কান পেতে শুনতে চেষ্টা কবলাম কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। এমনকি বাগানে একটা পাতা পডাব শব্দও পেলাম না। অধৈর্য হযে কিছু শুনবাব জন্যে অপেক্ষা কবতে লাগলাম। খানিকক্ষণ বাদে পাযেব শব্দে চমকে উঠলাম, মনে হলো কে যেন সিঁডি বেযে ওপবে উঠে আসছে। প্রথম সে হলঘবে ঢুকলো তাবপব আমাদেব ঘবেব দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ভযে আমাব শবীব হিম হযে গেল। পাযেব শব্দটা ঠিক আমাব ঘবেব সামনে এসে থামলো। আমি কোন উপায না দেখে আলো জ্বেলে হাতে মোটা ডাণ্ডা নিযে দবজাব সামনে অপেক্ষা কবে বইলাম। ভাবলাম নিশ্চয় চোব ডাকাত হবে। খুব সাবধানে পা ফেলছে। ঠিক আছে, আমিও গোড। এই কথা ভেবে হাতেব ডাণ্ডাটা দেখতে লাগলাম। বুঝলাম বাইবেব থেকে কে যেন দবজায চাপ দিচ্ছে। হঠাৎ দবজাটা সশব্দে খুলে দিলাম। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না। শুধু গাঢ অন্ধকাব চাবিদিকে। মনে মনে বললাম, তাহলে দস্যু ডাকাত নয, বাচা গেল। পবমুহূর্তেই ভযে শিউবে উঠলাম, ভযে মাথাব চুলগুলো খাডা হযে উঠল। তাহলে ? বাইবেব আলো জ্বালালাম। কাউকেই দেখতে পেলাম না। কিন্তু অনুভব কবতে পাবলাম কে যেন দাঁডিযে দাঁডিযে জোবে জোবে নিঃশ্বাস ফেলছে। আমি ভীষণ ভয পেযে চিৎকাব কবে ঘবেব দবজাটা বন্ধ কবে দিলাম।

বিছানায বসে বসেই বাকি বাতটা কাটিযে দিলাম। কখন যে সূর্য উঠেছে, লোকজন জেগেছে সে সব দিকে আমাব কোন খেযালই ছিল না। অনেক পবে, দিনেব আলোয সাহস কবে বাইবে বেবিযে এলাম। দিনেব আলোয বাত্রিব ভয সব দূব হযে গেল কিন্তু বাত্রেব ঘটনাকে আমি কিছুতেই উডিযে দিতে পাবলাম না। অন্য কেউ হলে একে মনেব ভুল, বা স্বপ্ন দেখা বলে উডিযে দিতে পাবতো কিন্তু আমি তো সাবাটা জীবন ধবেই প্রেততত্ত্ব নিযে গবেষণা কবেছি। তাই তাডাতাডি আমাব সেক্রেটাবি পার্কাবকে ডেকে বললাম কি হে, কাল বাতে তোমাব কেমন ঘুম হলো ?

পার্কাব বিমর্ষ মুখে বলল স্যাব একদিনও এই বাডিতে থাকবো না স্যাব। থাকলে আমি পাগল হযে যাব।

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললাম—তাহলে তুমিও কাল রাত্রে ওই সব শব্দ শুনেছ? তাহলে আমার কোন খোঁজখবর নাওনি কেন?

প্রশ্ন করলেও মনে মনে ভাবলাম, আমিই যখন ভয়ে এত কাবু হয়ে গেছি আর ও বেচারা নিশ্চয় অনেক বেশি কাবু হয়েছে। আমার চেয়েও বয়সে বড়—বড় হলে কি হবে, ওর স্ত্রী আছে ছেলেমেয়ে আছে। তাই ভয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়েছে। পার্কার আবার ভয়ে ভয়ে বললো—চলুন, স্যর, এখান থেকে আমরা চলে যাই। এই বাড়িতে নিশ্চয় ভূত আছে। এটা ভূতের বাড়ি, আর এখানে আমরা থাকবো না।

ওর কথা শুনে আমার সাহসের মাত্রাটা আরও বেড়ে গেল। বললাম—ভূত আছে জেনেই আমি এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছি, তুমি তো জান ভূত প্রেত নিয়েই আমার চর্চা। সে যাই হোক, আমি এইখানেই থাকবো।

সেদিন রাত্রিতে আমরা সব রকম ব্যবস্থা করে ভূতের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দরজার সামনে দুটো ইজিচেয়ারে বসে সারা রাত কফি আর চা খেয়ে গল্প করে কাটিয়ে দেব ঠিক করলাম। রাত দশটা পর্যন্ত কোনকিছুই টের পেলাম না। একসময় আমাদের একটু ঘুম ঘুমও পেল, আর ঠিক তখনই আগের দিনের মতো অদৃশ্য পায়ের শব্দ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতে লাগলো। আর মনে হলো সিঁড়ির আলোটা কে যেন জ্বালিয়ে দিল। পার্কার চারদিক দেখে জোরালো গলায় বললো—এ নিশ্চয় কোন বদমাশের কাজ স্যর। আমরা দু'জনেই ছুটে সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম সত্যিই আলোটা জ্বলছে। কিন্তু কাউকেই কোথাও দেখতে পেলাম না। উঁকি মেরে দেখলাম নিচের হলঘরের সমস্ত আলো জ্বলছে। আমি পার্কারের দিকে তাকিয়ে বললাম—পার্কার, আমরা তো সব আলোই নিভিয়ে দিয়েছিলাম, তাই না? তাহলে কে জ্বাললো বল তো? দৌড়ে নিচে নেমে গিয়ে দেখলাম, হলঘরের সমস্ত জানালা-দরজা খোলা, সব আলো জ্বলছে। হলঘরে ঢুকতেই মনে হলো কে যেন পট্‌পট্‌ করে সব আলোগুলো নিভিয়ে দিল। তারপর কে যেন মেয়েলী কণ্ঠে ব্যঙ্গের হাসি হেসে জানালাগুলো বন্ধ করতে লাগলো। আমরা দু'জনে দৌড়ে আবার উপরে উঠে এলাম। সেদিন রাতে আর নতুন কিছুই ঘটলো না। কোনমতে রাতটা কেটে গেল।

পরের দিন রাতে আমি আর পার্কার খাওয়া দাওয়ার পর আলোচনায় বসলাম। কি করা যায়? পার্কার বললো—ভূতটুত সব বাজে কথা স্যর, আমার মনে হয় কোন পাজী লোকের কাজ এসব। আমাদের এই বাড়ি থেকে তাড়ানোর জন্য এই সব ভয় দেখাচ্ছে। তাছাড়া ভূত কখনো আলো জ্বালাতে পারে? যার জন্যে আমি আজ একটা ভাল জাতের কুকুর এনে রেখেছি। আজ সব বদমায়েশি ধরতে পারবে।

আমি বললাম—ভূত না হয় আলো জ্বালাতে পারে না কিন্তু সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজটা কিসের?

পার্কার আমার কথায় বাধা দিয়ে বললো—আমরা তো ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি ভূতের কোন দেহ নেই—ও অদৃশ্য, তাহলে পায়ের আওয়াজ হয় কি করে?

পরামর্শ সেরে বাড়িতে ঢুকতেই কুকুরের চিৎকার শুনতে পেলাম। কুকুরটা পার্কারের ঘরে বাধা ছিল, চিৎকার শুনে মনে হলো কুকুরটা ভয়ে চিৎকার করছে। আমাদের দেখে ওর যেন সাহস ফিরে এলো। কুকুরটাকে নিয়ে আমরা দু'জনে সমস্ত বাড়িটা ঘুরে দেখলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কুকুরটা কিছুতেই বন্ধ ঘরটার সামনে গেল না, বরং একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে গোঙাতে লাগলো। ওর গায়ের সমস্ত লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। ভয়ে কুকরটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপতে লাগলো। ওর অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাই কুকুরটাকে সঙ্গে করে উপরে উঠে এলাম। একটু পরেই কুকুরটা কেমন নেতিয়ে পড়লো। তার পরেই শুনতে পেলাম কে যেন নিচ থেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে। ক্রমশ পায়ের আওয়াজ ভারী হয়ে এলো। আমি আর পার্কার দু'জনে ভয়ে জড়াজড়ি করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পায়ের শব্দের সঙ্গে গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, এত রাতে আপনারা কি করছেন বলুন তো ?

তাকিয়ে দেখলাম রাতের পাহারাওলা পুলিশ। পুলিশ দেখে আমাদের ধড়ে প্রাণ এলো। পুলিশ দেখলে যে এত আনন্দ হয় তা আমি এর আগে কোনদিনই বুঝতে পারিনি। পুলিশমশায় আমাদের উপর ভীষণ চটেছিল, তাই বলতে শুরু করলো —কি ব্যাপার বলুন তো আপনাদের ? এই পাচ মিনিট আগে দেখলাম বাড়ির সদর দরজা, জানালা সব বন্ধ। আলো জ্বলছে না। আর এখন দেখছি সদর দরজা হাপাট করে খোলা, সমস্ত বাড়িতে আলো জ্বলছে। বাগানে এসে শুনলাম কুকুর কাদছে, তাই সোজা উপরে উঠে এলাম। অবাক লাগছে! এই মাঝরাতে কেউ বাড়ির সমস্ত দরজা জানালা খুলে রাখে ? কেন বন্ধ করে দেননি আপনারা ? কি হয়েছে ?

আমি আর পার্কার দু'জনেই বললাম- আমরা খুব ভাল করে সমস্ত দরজা খিল দিয়ে এটে বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তা কি করে যে খুলল, আমরা তা জানি না। পুলিশ আমাদের কথা শুনে বললো নিশ্চয় এই বাড়িতে একদল বদমাশ লোক ঢুকেছে, আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, আমি সারা বাড়ি তল্লাস করবো। কি করবো আমরা ! সত্যিই তো বাড়ির সমস্ত দরজা জানালা খুলে হা করে রয়েছে, গোটা বাড়িতে আলো জ্বলছে। তাই কিছু না বলে পুলিশমশায়ের সঙ্গে নিয়ে সারা বাড়ি টহল দিলাম। কিন্তু কুকুরটা আর উঠল না। ও শুয়ে পড়ে সমানে হাপাতে লাগলো। আমরা সারা বাড়ি খুজে কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না। এতে পুলিশের সন্দেহ বাড়লো। আমাদের নামধাম টুকে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু সেদিন থেকে প্রায় বেশ কয়েক রাত আমাদের কোন অঘটন ঘটলো না।

প্রায় পাচ ছয় দিন বাদে আমার এক পুরানো বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। এই বাড়ি দেখে অবাক হয়ে বললো এই বাড়িতে তুমি আছ কি করে ? এটা তো ভূতের বাড়ি। আমি বললাম -তুমি জানলে কি করে যে এটা ভূতের বাড়ি ?

আমার বন্ধুটি বলল -কয়েক বছর আগে আমার এক মেসোমশাই এই বাড়িতে

কযেক দিন ছিলেন। তাতেই টেব পেযেছিলাম এটা নির্ঘাৎ ভূতেব বাড়ি। ঠিক আছে, তুমি একটা প্রমাণ দেখ। একটা সাদা কাগজ খামে ভবে তোমাব টেবিলেব দেবাজে বেখে দাও।

বন্ধুব কথামতো আমি একটা সাদা কাগজ বেখে দিলাম। প্রায় মাসখানেক বাদে একদিন আমাব বাড়িতে বন্ধুদেব ডিনাব দিলাম। নানান গল্পেব মধ্যে এই বাড়িটায যে ভূত আছে তাব কথা উঠলো। তখনই বন্ধুবা সবাই মিলে প্ল্যানচেট শুরু কবলেন। প্ল্যানচেট টেবিলে তিন মিনিটেব মধ্যেই এক অশান্ত আত্মা উপস্থিত হলো। একটা কাগজে লেখা ফুটে উঠলো আমি কার্ল ক্লুট, এই বাড়িতে আগে আমিই থাকতাম। এব চেযে বেশি কিছু জানতে চাও তো নিচেব বন্ধ ঘবে সবাই চলে এসো।

আমবা সবাই মিলে নিচেব বন্ধ ঘবটায এসে বসলাম। একটা মোমবাতি জ্বেলে ধ্যানে বসলাম। আবাব শুনতে পেলাম, অশবীবী আত্মাটা বলে চলেছে আমি কার্ল ক্লুট। এই ঘবে আমি আমাব পিসতুতো ভাই আর্থাব লিডেলকে খুন কবে পুঁতে বেখেছিলাম।

আমবা জিজ্ঞাসা কবলাম আপনাব আত্মাব শান্তিব জন্যে আমবা কিছু কবব কি ? আপনি বলুন

প্রথমটায কোন উত্তব পেলাম না। অনেকক্ষণ পবে বিবক্ত হযে লিখল দযা কবে এই বাড়িটা ছেড়ে দাও, তাহলেই আমাব শান্তি হবে। এতদিন আমি যে একটা সাদা কাগজ খামে ভবে দেবাজে বেখে দিযেছিলাম তাব কথা ভুলেই গিযেছিলাম। তাই মনে হতেই তাড়াতাড়ি গিযে টেবিলেব দেবাজটা খুলে খামে ভবা সাদা কাগজটা বেব কবে দেখলাম, তাতেও একই কথা লেখা আছে। 'দযা কবে এই বাড়িটা ছেড়ে দাও, তাহলেই আমাব শান্তি হবে।' পবেব দিন আমি বাড়িব পুবানো সব দলিল পত্র খুঁজে দেখতে লাগলাম। দেখলাম, সাতাই ত্রিশ চাল্লিশ বছব আগে এ বাড়িতে কার্ল ক্লুট নামে এক জার্মান ভকিল ও তাব স্ত্রী শার্লোট বাস কবতো। আব মাঝে মাঝে ভাস্তবেব এক আত্মীয আর্থাব লিডেল নামে এক যুবক এই বাড়িতে এসে থাকতো কিন্তু একদিন বাদে তাবে আব খুঁজে পাওয়া যাযনি। তাবপব কিছুদিন পবে কার্ল ও শার্লোট এই বাড়ি ছেড়ে জার্মানিতে চলে গিযেছিল।

দলিল পত্র দেখে শুনে আমাব মনেব অদম্য ইচ্ছাটা আবও বেড়ে গেল। ভাবলাম, যেমন কবেই হোক এই কার্ল, শার্লোট ও লিডেলেব গোপন বহস্যটা জানতে হবে। এবং ওদেব আত্মাব শান্তিব ব্যবস্থা কবতে হবে। আমি জানি, ওবা যতদিন জীবিত মানুষেব কাছে ওদেব গোপন বহস্যেব কথা না বলবে ততদিন ওবা মুক্তি পাবে না। তাই আমি বন্ধ ঘবটাতে ইলেকট্রিক আলোব ব্যবস্থা কবলাম, ঘবটা চুনকাম কবলাম, টেবিল চেযাব পাতলাম। তাবপব আমাব বন্ধুদেব সব খবব দিযে তাদেব আসতে বললাম। সন্ধ্যা হবাব সঙ্গে সঙ্গেই তাবা এক অন্ধ মিডিযামকে নিযে আমাব বাড়িতে এসে হাজিব হলেন।

আমবা সবাই মিলে সিয়ান্সে বসলাম। কিছুক্ষণেব মধ্যেই দবজাব সামনে একটা

ছাযা দেখতে পেলাম। আস্তে আস্তে ছাযাটা একটা মানুষেব মূর্তি ধবে ঘবেব মধ্যে ঢুকলো। মূর্তিটাব মুখ শুকনো, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, খোচা দাড়ি, সব মিলিযে দেখে মনে হলো শীর্ণকায এক যুবক। আমি বুঝলাম, এ নিশ্চয কার্ল ক্লিট। খুব করুণ দেখাচ্ছিল ওকে।

আমি বললাম — আমি আপনাব প্রতিবেশী। আপনাব সঙ্গে আলাপ পবিচয কবতে চাই। আপনি কিছু বলুন।

ছাযামূর্তিটি উত্তব কবলো — না, আমি এই সব চাই না। তুমি এখান থেকে চলে গেলে বাঁচি। তোমাকে তাড়াবাব জন্যে আমি এত চেষ্টা কবছি। তবু তুমি যাচ্ছ না কেন?

এব উত্তবে আমি বললাম — বহু বছব তো এই বাড়িতে কাটালেন একা একা। এখন কোন বন্ধু পেতে ইচ্ছা কবে না?

আমাব কথা শুনে মনে হলো কার্ল বেশ খুশি হযেছে। হতাশ গলায বলল — আমি তো এই বাড়ি ছেড়ে কোনদিন কোথাও যেতে পাবব না। এখানে আমি চিবকালেব মতো বন্দী।

জিজ্ঞাসা কবলাম, লিডেলকে খুন কবতে গেলেন কেন? এইবাব দেখলাম কার্ল ভীষণ উত্তেজিত হযে উঠলো। বলল — ওই শযতানটাই তো আমাদেব জীবনেব শনি। ও আসাব আগে আমি আব শার্লেট বেশ সুখে ঘব সংসাব কবেছি। খুব শান্তিতে ছিলাম। এই লিডেলটা দেশে কুকাণ্ড কবে আমাব এখানে আশ্রয নিল। দযা কবে আমি ওকে থাকতে দিলাম। আব ও কি কবলো? আমাব অনুপস্থিতিতে আমাব স্ত্রীব সঙ্গে বদমাযাশি কবতে চাইত। ওকে জ্বালাতন কবতো। শার্লেট অশান্তিব ভযে প্রথমে এসব কথা আমাকে বলতো না। একদিন লিডেল ওকে চবম অপমান কবল যাব জন্যে ও কাঁদতে কাঁদতে আমাকে এসে সব কথা বললে। শুনে আমি ক্রোধে পাগল হযে গেলাম। ছুটে গিযে ওকে খুন কবলাম। তাবপব ওব মৃতদেহটা এই ঘবেব নিচে পুঁতে বেখেছি। এই ঘটনাব পব থেকে শার্লেট চিন্তাভাবনায দিন দিন বোগা হযে যেতে লাগল। বছবখানেকেব মধ্যেই ও মাবা গেল। ওব মৃত্যুব পব আমি আব একা থাকতে পাবলাম না। আমি আত্মহত্যা কবি। তুমি যে ঘবে আছ সেই ঘবেতেই আমি ও আত্মহত্যা কবি। তাবপব থেকে আমবা বেশ সুখেই এই বাড়িতে বসবাস কবছি। শুধু মাঝে মাঝে লিডেল এসে আমাদেব সুখেব সংসাব ভেঙে দিযে যায। এইভাবেই চলে যাচ্ছে বছবেব পব বছব। আমবা ছাড়া এই বাড়িতে আব কাবোকে থাকতে দিই না। কিন্তু তোমাদেব মতো কেউ এসে থাকলে তাকে আমি কিছুতেই তাড়াতে পাবি না, ও তুমি যদি সত্যিই আমাদেব মতো দুটি আত্মাকে শান্তি দিতে চাও তাহলে এখানে আব থেক না। এই ঘবে একটা টেবিল, দুটো চেযাব বেখে যাও। আব সন্ধ্যাব পব নিচেব তলাব এদিকটায তোমবা কেউ এসো না।

এই কথা শোনাব পব থেকে আমি সেইমতো সব ব্যবস্থা কবলাম। যাব জন্যে

যে কদিন আমরা এই বাড়িতে ছিলাম আর কোন গোলমাল হয়নি। এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগের দিন স্বপ্ন দেখলাম, কার্ল আর শার্লেট হাত ধরাধরি করে আমার বিছানার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের মুখদুটো দেখে মনে হচ্ছে ওরা ভীষণ খুশি। বললাম—কাল সকালে আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। আপনাদের সহযোগিতা পেয়েছি যথেষ্ট। আমার কৃতজ্ঞতা জানবেন।

কার্ল ম্লান হেসে আমার কথার উত্তর দিল—তোমার মতো বন্ধু আমি জীবিত অবস্থায় পাইনি। শুধু কতগুলো অকৃতজ্ঞের দেখা পেয়েছি। আমরাও তোমার কাছে........সবার আগে বন্ধু আর একটা উপকার করে যাও। এই ঘরের এক কোণে আমার আঁকা শার্লেটের একটা ছবি আছে। তুমি ছবিটা কাল পুড়িয়ে ফেলো। আর ঐ ঘরটা ভেঙে ফেলতে পার কিনা একবার চেষ্টা করে দেখ। আর যেদিন তুমি আমাদের জগতে আসবে সেদিন এই অকৃত্রিম বন্ধু দুটি তোমাকে সাদরে গ্রহণ করবে জেনো।

যাবার দিন সকালে ঘরের এক কোণে সুন্দরী রমণী শার্লেটের বিবর্ণ ছবিটা দেখতে পেলাম। সেটা তখনই পুড়িয়ে ফেললাম তারপর বাড়িওয়ালাকে না জানিয়েই আগে সেই ছোট ঘরটা ভেঙে ফেলার ব্যবস্থা করলাম। তারপর সব কথা বাড়িওয়ালাকে জানালাম।

আমার মনে হয় এই গল্প পড়ে পাঠকরা নিশ্চয় বাড়িটা ঠিক কোথায়, কত নম্বর জানতে চাইবেন। আগেই ক্ষমা চেয়ে বলছি আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কারণ বাড়িওয়ালা আমাকে শাসিয়ে দিয়েছেন, বাড়ির ঠিকানা জানালেই আমার নামে মামলা করবেন। অতএব বুঝতেই পারছেন

অনুবাদ প্রীতি পালচৌধুরী

মাঝরাতের এক্সপ্রেস

Midnight Express অ্যালফ্রেড নয়েস

॥ ১ ॥

মর্টিমার বইখানা পেয়েছিল তার বাবার লাইব্রেরি ঘরের একটা তাকে। বইখানা ছেঁড়াখোঁড়া। পাতাগুলো লাল মলাটের বাঁধনে কোন রকমে আটকে রয়েছে। মর্টিমারের বয়স বারো। বাবার লাইব্রেরি থেকে কোন বই নিয়ে বাইরে যাওয়া একেবারে নিষেধ।

কিন্তু সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করে মর্টিমার বইখানা নিয়ে সোজা চলে গেল তার শোবার ঘরে। বইখানার নাম 'মাঝরাতের এক্সপ্রেস' (মিডনাইট এক্সপ্রেস)। মলাটের উপরে নামটা দেখেই ছেঁড়া বইখানার দিকে একটা আকর্ষণ অনুভব করেছিল বাচ্চা মর্টিমার। রাতে নিজের ঘরে শুয়ে বইখানা রসিয়ে রসিয়ে পড়বে মর্টিমার।

মর্টিমারদের বাড়িখানা এলিজাবেথীয় ধাঁচে তৈরি। সেই বাড়ির একখানা ছোট্ট কামরায় থাকত সে। মাঝরাতে বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ত, বাইরের কলকোলাহল যখন সম্পূর্ণ থেমে যেত, তখন বিছানা থেকে উঠে মোমবাতি জ্বালত মর্টিমার। তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে বইখানা পড়ত। মোমবাতির ক্ষীণ আলো ছোট ঘরখানার সব কোণের অন্ধকারকে দূর করতে পারত না। ঘরের মধ্যে শুরু হোত আলো-ছায়ার লুকোচুরি খেলা। ঘরের পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে হয়ে উঠত।

মর্টিমার বইয়ের মলাট খুলত। রোজ রাতেই সে বইখানা প্রথম থেকে পড়তে আরম্ভ করত। নিচে হলঘর থেকে ভেসে আসত 'ঠাকুর্দা ঘড়ি'-র (গ্র্যান্ডফাদার ক্লক) টক্ টক্ শব্দ। মর্টিমার শুনতে পেত তার হৃৎপিণ্ডের ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দ। দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসত বেলাভূমিতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের গর্জন, সব মিলিয়ে পরিবেশটা হয়ে উঠত গভীর রহস্যময়। মর্টিমার যেন জানা জগৎ ছেড়ে এসে পড়ত এক অলৌকিক, অপার্থিব জগতে। বইখানা পড়তে পড়তে রাতজাগা মথের ডানার শব্দ শুনে সে চমকে উঠত। কান খাড়া করে কিছু যেন শুনবার চেষ্টা করত মর্টিমার। মনে হোত ও যেন মথের ডানার আওয়াজ নয়, ও যেন গভীর নিস্তব্ধ জঙ্গলে একখানা শুকনো ডাল ভেঙে পড়বার শব্দ। যেন বাতাসের বেগে একখানা ডাল ভেঙে পড়ছে।

রোজ রাতে বইখানা পড়ত মর্টিমার। কিন্তু বার বার পড়েও সে গল্পটা বুঝতে পারত না। বইখানা সে শেষও করতে পারেনি, বইয়ের পঞ্চাশ পাতায় এসে সে থমকে থেমে যেত। সেখানে ছিল একখানা ভয়ঙ্কর ছবি। সেই ছবিখানা দেখলেই মর্টিমার শঙ্কা বিহ্বল হয়ে পড়ত।

মর্টিমার ছিল একটু ভাবুক ধরনের ছেলে। কিন্তু তার মানসিক ভারসাম্যের ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি ছিল না। ছবিখানা যে কেন তাকে এতখানি আতঙ্কিত করে তোলে, তা সে কিছুতেই বুঝতে পারত না। তার বয়স যখন আরও কম ছিল, তখন সে রাতে সিঁড়ির অন্ধকার কোণটা এক ছুটে পার হয়ে যেত। 'এনসেন্ট মেরিনার' কাহিনীতে একজন লোক যেমন নির্জন রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে একবার মাত্র পিছন ফিরে তাকিয়েই আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করে সোজা চলে গিয়েছিল, মর্টিমারও ঠিক তেমনি করেই পঞ্চাশ নম্বর পাতাখানার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই সেখানা উল্টে দিত।

অথচ সেই ছবিখানার মধ্যে কিন্তু ভয় পাবার মতো কিছু ছিল না।

ছবিখানা এক নির্জন অঞ্চলের একটা ছোটখাট স্টেশনের। দৃশ্যটা মাঝরাতের। প্লাটফর্মে একটি আলো মিটমিট করে জ্বলছে। সেই আলোর নিচে দাঁড়িয়ে আছে একটি মাত্র মানুষ। কিন্তু তার মুখখানা দেখা যাচ্ছে না, কেননা সেই মুখ সামনের

অন্ধকার সুরঙ্গপথের দিকে ঘোরানো। দেখে মনে হয় লোকটা যেন কিছু শুনবার চেষ্টা করছে। মনে হয় লোকটা যেন খুবই উত্তেজিত। সে যেন কোন ভয়াবহ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

এই ছবিটা চাক্ষুষ অথবা কল্পনার চোখে দেখলে মর্টিমারের মনে হোত সে নিজেই যেন কোন অতল, অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে।

বইটার যতটুকু মর্টিমার পড়েছিল, তার মধ্যে ভয় পাবার মতো বা দুঃস্বপ্ন দেখবার মতো কিছু ছিল না। কিন্তু তবু কেন সে ভয় পেত? আবার ভয় পেলেও মর্টিমার কেন বইখানার আকর্ষণ কাটাতে পারত না? গভীর রাতে ঘরের আলো-আঁধারি পরিবেশে ছবিখানা দেখলেই তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠত। একা একা গভীর রাতে মর্টিমার ছবিখানা দেখতে পারত না। ছবিখানা যাতে দেখতে না হয় সে জন্য সে পঞ্চাশ নম্বর পাতার সঙ্গে একান্ন নম্বর পাতাখানাকে 'পিন' দিয়ে আটকে দিয়েছিল। তারপর সে ঠিক করল যে, পঞ্চাশ আর একান্ন নম্বর পাতা বাদ দিয়ে গোটা বইখানাকে পড়ে ফেলবে। কিন্তু বইখানা আর কোনদিন শেষ করতে পারেনি মর্টিমার। পঞ্চাশ পাতার কাছাকাছি পৌঁছবার অনেকটা আগেই তার দু'চোখে যত রাজ্যের ঘুম নেমে আসত। গল্পের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত তার মনে থাকত না। সে জন্য পরের রাতে তাকে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হোত। কিন্তু পরের রাতেও একই ঘটনা ঘটত। পঞ্চাশ নম্বর পাতায় পৌঁছবার অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়ত মর্টিমার।

রাতের পর রাত একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটত। বইখানার শেষটা আর কোনদিনই পড়া হয়নি মর্টিমারের।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গেল, বালক মর্টিমার মাঝবয়সী হলো। সেই বইখানা এবং তার ভিতরকার ছবিখানার কথা ভুলেই গেল মর্টিমার।

॥ ২ ॥

এক রাতে মাঝবয়সী মর্টিমার এক অখ্যাত রেলস্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিল। রাত প্রায় বারোটা। ট্রেন আসতে এখনও অনেকটা দেরি।

এক সময় স্টেশনের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। হঠাৎ মর্টিমারের মনে হলো, এই স্টেশন ঘর, এই প্লাটফর্ম যেন তার খুবই পরিচিত। অবাক হয়ে সে ভাবল, "এমন কেন মনে হচ্ছে? এদিকটায় আগে তো কোনদিন আসিনি আমি।"

প্লাটফর্মের দিকে ভাল করে তাকালো মর্টিমার। একটু দূরে একটা বাতি টিম টিম করে জ্বলছে। সেই বাতির নিচে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছায়ামূর্তি। মূর্তির মুখ দেখা যাচ্ছে না। সে মুখ ঘোরানো একটা সুরঙ্গের দিকে। সে যেন কিছু শুনবার চেষ্টা করছে। উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীরটা যেন টান টান হয়ে উঠেছে। একটা ভয়ঙ্কর—ভয়াবহ পরিণতির জন্য যেন অপেক্ষা করে আছে ছায়ামূর্তিটা।

চমকে উঠল মর্টিমার। স্মৃতির তরঙ্গগুলি যেন তার মনের বেলাভূমিতে আছড়ে পড়তে লাগল। এই তো সেই পঞ্চাশ নম্বর পাতার ছবিখানার বাস্তব রূপ।

এই তো সেই স্টেশন, সেই প্লাটফর্ম, সেই টিমটিমে বাতির নিচে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তি যার মুখ সুরঙ্গের দিকে ঘোরানো। ছবি কি কখনও বাস্তব হয়? কখনও জীবন্ত হয়?

মর্টিমার অবাক হলো ঠিকই, কিন্তু সে ভয় পেল না। সে ঠিক করল আজ সে এগিয়ে যাবে, দাঁড়াবে গিয়ে লোকটার সামনে। যে মুখ সে কোনদিন দেখেনি, আজ সেই মুখ সে দেখবে। দেখতেই হবে মর্টিমারকে। ছায়ামূর্তির দিকে সে এগিয়ে যাবে। কোন একটা কৌশল ঠিক করে তার সঙ্গে কথা বলবে। হয়তো এই বলে সে আলাপ শুরু করবে, "মশাই, মাঝরাতের ট্রেনটা কি 'লেট' করছে?" অবশ্য তাকে বয়সের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হবে।

কিন্তু ছায়ামূর্তিটার দিকে প্রথম পা ফেলতেই মর্টিমার কেমন যেন 'নার্ভাস' হয়ে পড়ল। তার হাত দু'খানা ঘামে ভিজে গেল, উত্তেজনা আর অজানা আতঙ্কে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। কিন্তু তবুও অসীম সাহসে ভর করে সে ছায়ামূর্তিটার দিকে এগিয়ে চলল।

মূর্তিটার সামনে এসে পড়ল মর্টিমার। তার উপস্থিতি টের পেয়ে ছায়ামূর্তি মর্টিমারের দিকে মুখ ফেরালো। কিন্তু কোন কথা বলবার আগেই মর্টিমার যা দেখলো তাতে তার বাক্‌শক্তি যেন রহিত হয়ে গেল। স্তম্ভিত মর্টিমার দেখলো তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে নিজে। হ্যাঁ, অবিশ্বাস্য হলেও নিজেরই সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ছায়ামূর্তির মুখখানা একটু ফ্যাকাশে হলেও এ যে তারই মুখ সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। মর্টিমার যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিবিম্বই দেখছে।

মর্টিমার যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হলো। মহা আতঙ্কের একটা তুহিনশীতল স্রোত বয়ে গেল তার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে। মর্টিমার পড়ে গেল প্লাটফর্মের উপরে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ট্রেন প্রচণ্ড গতিতে ঝম্ ঝম্ শব্দ করে চলে গেল স্টেশন পেরিয়ে। তারপরই জায়গাটা হয়ে গেল নিঝুম নিস্তব্ধ। আকাশে চাঁদ উঠল। কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদের হলুদ আলোয় সমস্ত পরিবেশটা কেমন যেন অলৌকিক, কেমন যেন অপার্থিব হয়ে উঠল।

প্লাটফর্মে কেবল মর্টিমার আর তার ছায়ামূর্তি।

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে মর্টিমার ছুট দিল। পিছনে শোনা গেল ছুটন্ত পদশব্দ। ছায়া মর্টিমার তাড়া করেছে জীবন্ত মর্টিমারের কায়াকে।

ছুট...ছুট...ছুট...ছুট...উন্মাদের মতো ছুটতে লাগল মর্টিমার। রাস্তার একপাশে লম্বা লম্বা পত্রবহুল গাছের সারি আর ঝোপ জঙ্গল, অন্যপাশে একটা সরু খাল। খালের জলে গাছের ছায়াগুলি কাঁপছে। মাথার উপরে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ। মরা হলুদ রঙের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

পিছনে ধাবমান পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। ছায়ার পদশব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে কায়ার কাছে। আর তো ছুটতে পারে না মর্টিমার। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু তা হলেও তাকে ছুটতেই হবে। পিছনের পায়ের শব্দটা যে আরও কাছে এগিয়ে এসেছে।

জয় ভগবান! সামনে রাস্তার ধারে একখানা সাদা বাড়ি দেখা যাচ্ছে না? যাচ্ছেই তো—একখানা ছোট সাদা রঙের বাড়ি দেখতে পাচ্ছে ছুটন্ত মর্টিমার। বাড়িখানার সামনের দিকে একটা দরজা আর পিছনে দুটো দরজা। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় একজন মানুষের মুখের সঙ্গে যেন বাড়িখানার কেমন একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। মর্টিমারের মনে হলো, কোনরকমে একবার ঐ বাড়িতে আশ্রয় নিতে পারলে সে নিজের ছায়ামূর্তির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

ছোটার বেগ বাড়িয়ে দিল মর্টিমার। পিছনেব পদশব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতব হযে উঠল।

ছুটতে ছুটতে সাদা বাড়িখানার বন্ধ দরজার সামনে এসে আছড়ে পড়ল মর্টিমার। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে 'কলিংবেল'-টা টিপতে গেল। কিন্তু কোন 'কলিংবেল' নেই। মর্টিমার কড়া নাড়ল। কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়া পাওযা গেল না। কেবল কড়ার খট্ খট্ শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

মর্টিমার এবাব উন্মাদের মতো বন্ধ দরজায় ঘুষি মারতে লাগল। অমসৃণ দরজায ঘুষি দেবার ফলে তার হাত ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। অনেকক্ষণ দরজায় ঘুষি দেবার পর ভিতর থেকে সাড়া পাওয়া গেল। ভারী পায়ে কে যেন এগিযে আসছে। সিঁড়ি দিয়ে নামছে সে। পুরোনো নড়বড়ে সিঁড়ির ধাপগুলো লোকটির পায়ের চাপে আর্তনাদ করে উঠছে। পায়ের আওয়াজটা থামল দরজাব ওপাশে। ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল। মর্টিমারের সামনে এখন একটা লম্বা ছায়ামূর্তি। মূর্তিটার এক হাতে একটা মোমবাতি। কিন্তু মোমবাতিটা এমনভাবে ধবা ছিল যে, সেটার ম্লান আলোয লোকটির মুখ তো দূরের কথা, চেহারাটা পর্যন্ত ভাল করে দেখা গেল না।

হঠাৎ মোমের ম্লান আলো লোকটার মুখের উপরে পড়তেই মর্টিমার আঁতকে উঠল। লোকটাব সমস্ত মুখখানা 'ব্যান্ডেজ'-এর আবরণে ঢাকা!

॥ ৩ ॥

মূর্তিটা কোন কথা বলল না। শুধু হাতের ইশারায মর্টিমারকে বাড়ির ভিতরে আসবার জন্য ইঙ্গিত করল। সে বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই মূর্তিটা দরজাটা বন্ধ করে দিল। মর্টিমারকে অনুসরণ করবার ইঙ্গিত করে সে নড়বড়ে সিঁড়ি দিযে উপরে উঠতে লাগল। লোকটার হাতের মোমবাতির ম্লান আলোয তার দেহেব বিশাল ছায়া গিয়ে পড়ল সাদা চুনকাম করা দেওয়াল—-উপরের 'সিলিং'-এ। আলোকশিখার কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে তার ছায়াও কাঁপতে লাগল। একটা অতিপ্রাকৃত ভৌতিক পরিবেশের মধ্য দিয়েই যেন মর্টিমার উপরে উঠতে লাগল।

মূর্তিটাকে অনুসরণ করে উপরতলার একখানা ঘরে এসে ঢুকলো মর্টিমার। ঘরের 'ফায়ারপ্লেস'-এ আগুন জ্বলছে। তার দু'পাশে দু'খানা আরামদায়ক 'ইজিচেয়ার', সে দু'খানা রয়েছে মুখোমুখি অবস্থায়। ঘরের মধ্যে ওক কাঠ দিয়ে তৈরি একটা ছোট টেবিল। সে টেবিলের উপরে রয়েছে লাল মলাটের একখানা ছেঁড়াখোড়া বই। আয়োজন দেখে মর্টিমারের মনে হলো, সে যে এখানে আসবে তা বোধ হয় আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আর সে জন্যই হয়তো তার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।

হাতের ইশারায় মুখে 'ব্যান্ডেজ' বাঁধা লোকটি মর্টিমারকে একখানা 'ইজিচেয়ার'-এ বসতে বলল। তারপর ছোট টেবিলখানার উপরে মোমবাতিটা বসিয়ে দিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় সে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেতে ভুলল না।

মর্টিমারের চোখ পড়ল মোমবাতিটার দিকে। তার নাকে এল মোমের পোড়া গন্ধ। ক্ষয়ে যাওয়া মোমের খণ্ডটাও তো তার চেনা। মোমের খণ্ড এবং গন্ধ যেন মর্টিমারকে নিয়ে গেল তার ছেলেবেলায়- নিয়ে গেল এলিজাবেথীয় ধাঁচে গড়া একখানা বাড়ির একটা ছোট কামরার মধ্যে।

টেবিলের উপর থেকে লাল মলাটের ছেঁড়াখোঁড়া বইখানা তুলল মর্টিমার। আতঙ্কে এবং উত্তেজনায় তার হাত দু'খানা কাঁপছে। চিনেছে - বইখানাকে চিনতে পেরেছে সে। ছেলেবেলায় বাবার 'লাইব্রেরি' ঘর থেকে যে বইখানা মর্টিমার নিয়ে এসেছিল এ তো সেই বই।

বইখানার পঞ্চাশ নম্বর পাতাখানা বের করল সে। এই তো পাতাখানা এখনও 'পিন' দিয়ে আটকানো রয়েছে। মর্টিমার নিজেই তা একদা আটকে দিয়েছিল।

বইয়ের গল্পটা পুরো পড়া হয়নি। যেটুকু পড়া হয়েছিল তা ও এখন মনের পটে আবছা হয়ে গিয়েছে। মর্টিমার ঠিক করল এবার সে বইখানার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই পড়ে ফেলবে। ছেলেবেলায় সে যে লেখা ভুল করে বুঝে উঠতে পারেনি, আজ এই মাঝ বয়সে সে নিশ্চয়ই লেখাটাকে ভাল করে বুঝতে পারবে।

লাল মলাটের উপরেই বড় বড় অক্ষরে বইখানার নাম লেখা রয়েছে। বইয়ের নাম হলো, "মাঝরাতের এক্সপ্রেস"। বইখানার প্রথম 'প্যারাগ্রাফ'টি পড়ার পরেই মর্টিমারের মনটা আতঙ্কে ছেয়ে গেল। বইখানার যেটুকু সে পড়েছিল তা তার মনে পড়ে গেল। অবাক হয়ে সে দেখল যে, এই বই-এর কাহিনী তো তারই জীবনের গল্প। গল্পটি এই রকম :

মানসিক দিক থেকে আর সব ছেলেদের চাইতে অন্যরকম দশ বছরের একটি ছেলে তার বাবার 'লাইব্রেরি' থেকে একখানা বই নিয়ে আসে নিজের ঘরে। সেই বইখানার পঞ্চাশ নম্বর পাতায় যে ছবিখানা ছিল, সেখানা দেখলে ছেলেটি খুব ভয় পেত। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে দেখলে ছবিখানার মধ্যে ভয়ের কোন ব্যাপারই ছিল

না। ছেলেটি কিন্তু বইখানা শেষ করতে পারেনি। কাজেই গল্পটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াল তা সে ছেলেবেলায় জানতেই পারল না।

ছেলেটি বড় হলো। সেই বইখানার কথা সে ভুলে গেল। গল্পটার যেটুকু সে পড়েছিল তা ও আর তার মনে রইল না।

মাঝ বয়সে এক অখ্যাত স্টেশনে মধ্যরাত্রে তার ছবিতে দেখা দৃশ্যটা বাস্তব হয়ে উঠল। নির্জন প্লাটফর্মে নিজেরই মুখোমুখি হয়ে মাঝবয়সী লোকটি শঙ্কা-শিহরিত অবস্থায় প্রাণভয়ে ছুটে পালাল। ছুটতে ছুটতে লোকটি এসে পড়ে পথের ধারের একখানা ছোট্ট বাড়ির সামনে। সেই বাড়িতে আশ্রয় পায় আতঙ্ক-বিহ্বল মানুষটি। সারা মুখে 'ব্যান্ডেজ' বাঁধা একটি মূর্তি তাকে নিয়ে যায় উপরতলার একখানা ঘরে। সেইখানে সে টেবিলের উপরে একখানা বই দেখতে পায। বইখানার নাম, "মাঝরাতের এক্সপ্রেস"। মাঝবয়সী লোকটি বইখানা পড়তে থাকে। অবাক হয়ে সে দেখে যে, বইখানার ভিতরে যে গল্প রয়েছে, তা হলো লোকটির নিজের জীবনেরই কাহিনী। বই-এ যে ঘটনাগুলির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি চিরকাল ধরে ঘটতে থাকবে। চক্রাকারে আবর্তিত হবে ঘটনাগুলি।

প্রথম থেকে রাস্তার ধারের বাড়িখানার সামনে আসা পর্যন্ত ঘটনাগুলি তিন তিনবার পড়ল মর্টিমার। বিদ্যুৎচমকের মতোই চকিতে একটা চিন্তা এসে তার মনকে শঙ্কাতুর করে তুলল। শঙ্কা-বিহ্বল মর্টিমারের মনে হলো, সে এক ভয়ঙ্কর বৃত্তের মধ্যে এসে পড়েছে। সেই বৃত্ত ঘুরছে- ক্রমাগত ঘুরে চলেছে। আর তার সঙ্গে ঘুরছে মর্টিমারও। এই অবিরাম ঘোরার হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। এই ঘটনাগুলি চিরকালই ঘটতে থাকবে। গল্পের ছোট-বড় ঘটনাগুলির মধ্যে নতুন কিছু নেই। সেগুলি চিরকাল ধরে একই রকম রয়েছে। সেগুলি ছিল-- সেগুলি আছে -সেগুলি থাকবে। সেগুলির তাৎপর্য আজ মর্টিমার যেন নতুন করে বুঝতে পারল -নিজের মনে উপলব্ধি করতে পারল।

কিন্তু যে মূর্তি তাকে সিঁড়ি দিয়ে উপরে নিয়ে এল সে কে? সে তো লম্বায় মর্টিমারেরই মতো। তাহলে....তাহলে কি ওটা তারই আর এক মূর্তি? আর সে জন্যই কি 'ব্যান্ডেজ' বেঁধে মূর্তিটা তার মুখখানাকে ঢেকে রেখেছে?

এই প্রশ্নটা মর্টিমারের মনে জেগে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সে শুনতে পেল ঘরের দরজা খুলবার শব্দ। মুখে 'ব্যান্ডেজ' বাঁধা লোকটি এসে ঘরে ঢুকল। মোমবাতির [illegible] লম্বা লোকটির ছায়াটাকে একটা অতিদীর্ঘ ভৌতিক অপচ্ছায়া বলে মনে

[illegible] মর্টিমারের সামনের 'ইজিচেয়ার' খানায়। এবার দু'জনে [illegible]পূর্ণ নিস্তব্ধতা। সে নিস্তব্ধতা মনের উপরে প্রচণ্ড চাপের [illegible] অস্বস্তিতে মর্টিমারের মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

[illegible]টে গেল অনেকক্ষণ। একসময় লোকটা ধীরে ধীরে তার [illegible] বুঝতে পারল লোকটা এবার কি করতে চাইছে। লোকটা

এবার খুলতে চাইছে তার মুখের ব্যান্ডেজ। আচ্ছা, মুখখানা কার? ওখানা কি তার নিজেরই মুখ? ও মুখ কি জীবিত না মৃত মানুষের?

ব্যান্ডেজের দুই প্রান্তে দু'খানা হাত রাখল মূর্তিটা, এক্ষুণি সে ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু করবে।

আর এক মুহূর্ত নষ্ট করা যায় না। যা করবার তা এক্ষুণি করে ফেলতে হবে। এখন মর্টিমার একটা কাজই করতে পারে...আর সে কাজের কোন বিকল্পও নেই।

এক লাফ দিয়ে মর্টিমার ঝাঁপিয়ে পড়ল মূর্তিটার উপর। প্রাণপণ শক্তিতে কঠিন হাতে সে মূর্তিটার গলা টিপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে মর্টিমারের মনে হলো তার নিজের গলাটাও কে যেন সাঁড়াশির মতো শক্ত হাতে টিপে ধরেছে। মর্টিমারের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল। তার মুখ থেকে ঘড় ঘড় করে গোঙানির শব্দ বেরিয়ে এল। মূর্তিটার মুখ থেকেও বেরিয়ে এল গোঙানির আওয়াজ। দুটো অবরুদ্ধ স্বর একসঙ্গে মিশে গেল। বোঝা গেল না কোনটা মর্টিমারের আর কোনটা এই বাড়ির লোকটির কণ্ঠস্বর। গোঙানির শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে নেমে এল মৃত্যুর নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে দিল বহুদিন আগেকার এক 'ঠাকুর্দা ঘড়ি'-র টক্ টক্ শব্দ। ভেসে এল বেলাভূমিতে আছড়ে পড়া সমুদ্রতরঙ্গের চাপা গর্জনধ্বনি।

আজ— এতদিন পরে মর্টিমার সেই ভয়াবহ ছবিখানার হাত থেকে মুক্তি পেল।

এতদিন পরে মর্টিমার বোধ হয় 'মাঝরাতের এক্সপ্রেস' এর আরোহী হতে পারল। আর সেই 'এক্সপ্রেস' গাড়িটা হলো লাল মলাটের সেই পুরোনো ছেঁড়া বইখানা।

অনুবাদ : অনিরুদ্ধ চৌধুরী

কপালে থাকলে

Spector Lovers - জোসেফ শেরিডন লে ফানু

অ্যালি মোরানের বয়সের বোধ হয় কোন গাছ পাথরও নেই। শহরের পাকাচুল থুত্থুরে বুড়োরা পর্যন্ত অ্যালির বয়স যে কত তা ' ' পারে না। কারণ তারা কেউই তাকে যুবতী অবস্থায় দেখেনি। অ্যালির বয়স আশির একদিনও কম নয়। পঁচাশি এমনকি পচানব্বই ও হতে পারে তার বয়স। তবে শহরের কোন লোকই বা তার বয়স নিয়ে ভাবছে! সে যদি বড়লোক হোত, তবে লোকজন তার কাছে আসত।

তার বয়স নিয়ে মাথা ঘামাত। কিন্তু অ্যালি মোরান হলো হদ্দগরীব। কাজেই তাকে নিয়ে কে আর মাথা ঘামাতে যাচ্ছে।

অ্যালি মোরান থাকে তার নিজের কুঁড়ে ঘরে। তার থাকবার মধ্যে আছে একটা হাড় বের করা রোগা ডিগডিগে কুকুর আর তিনপেয়ে একটা বিড়াল। কিন্তু যা আছে তাই নিয়েই খুশি অ্যালি। সে কারও কাছে হাত পাততে যায় না।

না, একটু ভুল বলা হলো। অ্যালির একটি জোয়ান নাতিও আছে। নাম তার পিটার। পিটার একুশ বছরের যুবক। সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং বলশালী। তার মতো আমুদে আর আড্ডাবাজ ছেলে সারা গাঁয়ের ভিতরে আর দু'টি নেই। শুধু কি তাই, পিটার নাচতে পারে, গাইতে পারে, কুস্তি করতে পারে। মুষ্টিযুদ্ধ বা 'বক্সিং' লড়তেও সে মহা ওস্তাদ।

নাতি পিটার হলো ঠাকুরমা অ্যালি মোরানের নয়নের মণি। নাতির প্রশংসায় বুড়ী একেবারে পঞ্চমুখ। পরশীদের সঙ্গে দেখা হলেই বুড়ী বলে, "আমার পিটারের মতো একটি ছেলে দেখাও দেখি। পারবে না, ওরকম ছেলে হয় না। তোমরা দেখো, কালে দিনে আমার পিটার একটা সত্যিকারের মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠবে।"

মাঝে মাঝে কোন স্পষ্টবক্তা হয়তো অ্যালির মুখের উপরেই বলে ওঠে, "কি করে আর আপনার নাতি মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠবে! মানুষ হতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়। আপনার নাতি আর সেটা করছে কোথায়। এতটা বয়স হলো, এখনও তো সে হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছে। আজ পর্যন্ত আয় করে একটি 'পেনি' কি আপনার হাতে দিয়েছে নাতি?"

এরকম কথা শুনলে রাগে অ্যালি বুড়ীর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। সে চিৎকার করে বলে ওঠে, "আমার নাতি পিটার এক পেনির কাঙাল নয়। আমিও কি তার কাঙাল? তোমাদের কারো কাছে আমি কি কোনদিন হাত পাততে গিয়েছি? আমার পিটারের কাজ করবার কোন দরকার নেই। কাজ তো করবে তোমাদের মতো ছোট দরের মানুষেরা। আমার নাতি অনেক বড় দরের মানুষ হবে। তোমাদের মতো পরিশ্রম করবার কি দরকার তার?"

"কিন্তু আপনার পিটারের ভবিষ্যতের কী? আপনাকে তো একদিন কবরের নিচে চলে যেতে হবে, তখন আপনার ঐ আদরের নাতিকে দু'বেলা মুখের খাবার যোগাবে কে? ওর তো নিজের আয় করবার সুযোগ নেই।"

অ্যালি বুড়ী চিৎকার করে বলে ওঠে, "খাবার যোগাবে ওর বৌ। পিটারকে কি এমন তেমন মেয়ে বিয়ে দেব ভেবেছো? ওর বৌ আসবে রাজা-জমিদারের পরিবার থেকে। আমার নাতবৌ কত সোনাদানা সঙ্গে আনবে। পিটারের আবার খাবার ভাবনা!"

ছোটবেলা থেকেই পিটার শুনে আসছে এরকম কথাবার্তা। কাজেই পরিশ্রম করে আয় করতে সে মোটেই উৎসাহ বোধ করে না। কি হবে পরিশ্রম করে? এখন ঠাকুরমা খাওয়াচ্ছে, পরে বৌ খাওয়াবে। পরিশ্রম করে আয় করবার দরকারটা কোথায়?

কিন্তু তাহলেও একটা সমস্যা তো থেকেই যাচ্ছে। রাজা বা জমিদারের ঘর থেকে না হয় বৌ এল, সে না হয় পিটারকে খাওয়াল। কিন্তু তার হাত থেকে পিটারকে বাঁচাবে কে ? বন্ধুবান্ধবদের অবস্থা তো নিজের চোখেই দেখছে পিটার। দেখছে বন্ধুদের বৌরা কি দাপটে তাদের শাসন করছে। জনসনটার অবস্থাটা কি করুণ! কোন দিন যদি সে রাত দশটার পরে বাড়ি ফেরে তবে তার বৌ আর বাড়িতেই ঢুকতে দেয় না তাকে। বার বার কড়া নাড়লেও দরজাই খোলে না সে। তারপর ঐ স্টোনওয়াল...তার অবস্থা তো আরও শোচনীয়! প্রতি সপ্তাহের মাইনেটা তাকে তুলে দিতে হয় বৌ এর হাতে। বৌ গুণে গুণে টাকাগুলি নিয়ে নেয়। তারপর একটি পেনি র দরকার হলে বৌ-এর কাছে হাত পাততে হয় স্টোনওয়ালকে। রীতিমতো তোষামোদ করতে হয় বৌকে। অনেক তোষামোদ করবার পর অনেক কৈফিয়ৎ নিয়ে বৌ হয়তো সামান্য কিছু দেয়।

না না, এত অপমান —এত হেনস্তা সহ্য করতে পারবে না পিটার। অন্য বাড়ির একটা মেয়ে এসে তার উপরে কর্তৃত্ব করবে এ চিন্তাটাই অসহ্য পিটারের কাছে। না না, সে কারোর হাততোলা হয়ে থাকতে পারবে না। বিয়েই করবে না পিটার।

কিন্তু আগামী দিনের কথাও তো চিন্তা করতে হবে। বুড়ী ঠাকুরমা তো আর চিরদিন তাকে খাওয়াতে পারবে না। ঠাকুরমার তো অনেক বয়সই হলো। আর কতদিন বাঁচবে সে। এবার খুঁজে পেতে একটা চাকরির যোগাড় করাই বোধ হয় ভাল।

কিন্তু চাকরির কথা ভাবতেই তো পিটারের গায়ে জ্বর আসে। আর ঠাকুরমাও বোধ হয় চায় না যে তার আদরের নাতি চাকরিতে ঢুকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করুক।

তা হলে উপায়? পিটার যদি কোন বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে না করে—সে যদি আদৌ বিয়ে না করে তবে খাওয়া পরার একটা উপায় তো তাকে বের করতেই হবে। ভেবে ভেবে একটা উপায় বের করে ফেলল পিটার। হ্যাঁ, যে করেই হোক তাকে কিছু গুপ্তধন আবিষ্কার করে ফেলতেই হবে। ব্যস, তাহলেই আর খাওয়া পরার জন্য কোন চিন্তা ভাবনাই করতে হবে না। প্রচুর পরিমাণ গুপ্তধন যদি পাওয়া যায় তবে তো ভালই, কিন্তু তা যদি না পাওয়া যায়, তবে সারাটা জীবন ভালভাবে আরাম করে কাটিয়ে দেবার মতো সম্পদ হলেই পিটার খুশি।

যাক, সমস্যার সমাধান তো হয়ে গেল' পিটার খুশি হয়ে আপন মনেই মন্তব্য করল, এখন সুযোগটা এলেই হয়। তা সুযোগের জন্য কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে বৈকি। তবে সুযোগ এলেই একটি মুহূর্তও অপব্যয় না করে কাজে নেমে পড়তে হবে।

কিছুদিন অপেক্ষা বোধ হয় করা যেতে পারে। ঠাকুরমার বয়স হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও সে যেরকমভাবে চলাফেরা করছে, তাতে সে শীগগির মারা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আর ঠাকুরমা যতদিন বেঁচে আছে ততদিন পিটারের তো খাওয়া পরার কোন চিন্তাই নেই। যেভাবেই হোক ঠাকুরমা তার ব্যবস্থা করবেই। প্রাণ থাকতে

পিটারকে সে কষ্ট পেতে দেবে না। কাজেই পিটারের মনে এখনও দুশ্চিন্তা এসে বাসা বাঁধেনি।

রোজ সকালে 'ব্রেকফাস্ট'-টা সেরে নিয়ে পিটার ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে। ফিরে আসে দুপুরের খাওয়ার সময়ে। খাওয়ার পরে ঠাকুরমার সঙ্গে একটু গল্প করে সে আবার সাজ-পোশাক পরে বেরিয়ে পডে। এবার সে যায় তাদের শহর থেকে অনেকটা দূরে—এক একদিন এক এক দিকে। তাদের শহরের আশেপাশে যত সরাইখানা আছে, তারই কোনটায় গিয়ে সমবয়সী বেকার, বাউণ্ডুলে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দেয় পিটার। অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা চলতে থাকে, বাড়ি ফিরতে এক একদিন মাঝরাত—এমনকি ভোরও হয়ে যায়।

॥ ২ ॥

সেদিন সন্ধেবেলায় ঘুরতে ঘুরতে পিটার গেল পার্মাসটাউনে। জায়গাটা নামেই 'টাউন'। সত্যি কথা বলতে কি জাযগাটা একটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ওখানে অনেক দোকান-পাট রয়েছে। আড্ডা দেবার জাযগাও রযেছে কয়েকটা। পিটাব তারই একটায় গিয়ে উঠল। সেখানেই দেখা হলো কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। ব্যস্! আর পিটারকে পায় কে? চলল আড্ডা, তাসখেলা আর পানভোজন। দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা কখন যে রাত একটার ঘর ছুঁই ছুঁই করল তা পিটার বুঝতেই পারল না। বন্ধুরা এবার আড্ডা ছেড়ে উঠল। তারা এবার বাড়ি যাবে। কাজেই নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিটারকে উঠতে হলো। একটা সিগার ধরিযে ধোঁয়া ছাডতে ছাড়তে ঘরমুখো হলো পিটার।

বাডি যাবার পথে পড়ে একটা ছোট নদী। নদীটার নাম লিফি। সেটার উপবে একটা সিমেন্টের পুল। পিটার ভাবল বেলিং-এ ভর দিয়ে পুলটার উপরে কিছুক্ষণ দাঁডিয়ে বিশ্রাম করতে হবে। আড্ডাখানায় আজকে সুরাপানটা একটু বেশি পরিমাণেই হযে গিযেছে। মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করছে। নদীর ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাটাও ঠাণ্ডা হবে।

রেলিং-এ ভর দিয়ে সেতুটার উপরে দাড়াল পিটার। চমৎকার ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওযা। হাওয়ার পরশ লাগছে পিটারেব মুখে - মাথায। সমস্ত শরীবটা জুডিয়ে যাচ্ছে। না, এখানে কিছুক্ষণ দাডাবে পিটার। জাযগাটাকে খুব ভাল লাগছে আজ রাতে। পিটার অবশ্য প্রকৃতি প্রেমিক নয়, কিন্তু আজকের নৈশ প্রকৃতি যেন তাকে মুগ্ধ করে ফেলেছে। প্রকৃতি দেবী যেন মায়াজাল বিস্তার করেছে নিতান্ত গদ্যময় পিটারের উপরে। পিটারের মতো ছেলেও যেন সামাযকভাবে হয়ে উঠেছে কল্পনা বিলাসী।

বেশ লাগছে। হাল্কা কুযাশাব আবরণে চাঁদের আলো ম্লান। সেই ম্লান আলোয় নদীর ওপারের বাড়িগুলি দেখা যাচ্ছে। এত রাতে কোন বাড়িতেই আলো দেখা যাচ্ছে না। বাড়ির লোকজন ঘুমিয়ে পডেছে। চারদিক নিঝুম- –নিস্তব্ধ।

নদীর ওপারে সুন্দর সুন্দর সাজানো বাগান। সেগুলির ফাঁকে ফাঁকে বাড়িগুলি দেখা যাচ্ছে। বাগানের মধ্য দিয়ে পথ চলে গিয়েছে পিটারদের শহরের দিকে। শহরটা

এখনও অনেকটা দূরে। নদীর ওপারে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তার পরে সাজানো বাগানগুলো। তারও ওপাশে বাড়িগুলো।

কিন্তু আজ পিটার এ কি দেখছে? সাজানো বাগানগুলোর এপাশেই তো বাড়িগুলি দেখতে পাচ্ছে পিটার! এটা কি করে হলো? এ তো হবার কথা নয়। এ পথে তো সে অনেকবার যাতায়াত করেছে। চিরকালই দেখে এসেছে বাগানের পরে সারি সারি বাড়ি। না, নেশাটা আজকে জব্বর হয়ে গিয়েছে। নইলে এরকম ভুল দেখবে কেন পিটার?

আরে, বাড়িগুলি আবার কি রকম! এ তো ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর! ঘরগুলির দেওয়াল মাটির। সেগুলির মাথায় টালির চাল। এরকম বাড়ি তো এ এলাকায় নেই। পিটারের এতটা বয়স হলো, এরকমের বাড়ি তো সে আগে কোনদিন দেখেনি। থাকলে তো দেখবে। আজ রাতে নেশার ঘোরে এসব কি দেখছে সে? আরও কি অদ্ভুত ব্যাপার, বাড়িগুলিকে এই মুহূর্তে সে দেখছে, কিন্তু পরের মুহূর্তে আর দেখতে পাচ্ছে না। বাড়িগুলি যেন থির থির করে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পিটারের কি চোখ খারাপ হয়ে গেল? সে কি ভুল দেখছে? না, তা ই বা হবে কেমন করে? সে তো নদী দেখতে পাচ্ছে, সেতু দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে হাল্কা কুয়াশার আবরণের আড়ালে ম্লান চাঁদ। তবে? অন্য সব কিছু যখন সে ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছে তখন বাড়িগুলিকেও সে ঠিকই দেখছে। ওগুলি নিশ্চয়ই ওখানে আছে। পিটার নিশ্চয়ই এতদিন ঐ টালির চাল দেওয়া মেটে কুঁড়ে ঘরগুলিকে খেয়াল করে দেখেনি। কিন্তু কুঁড়ে ঘরগুলি অমন করে কাঁপছে কেন? ওগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই পিটার নেশার ঘোরে ওরকম দেখছে।

কিন্তু না, আর অপেক্ষা করা যায় না। এখনও অনেকটা পথ যেতে হবে। এদিকে রাত তো কাবার হয়ে আসছে। বাড়ি পৌঁছতে এখনও কম করে আধঘণ্টা লাগবে। একটু ঘুমোতেও তো হবে। কাল সকালে আবার পাড়ার ক্লাবের জরুরী সভা রয়েছে। সে সভায় পিটারকে উপস্থিত থাকতেই হবে, কারণ সে হলো ক্লাবের একজন কর্তা ব্যক্তি।

কাজেই কুঁড়ে ঘরগুলি নিয়ে আর একটুও মাথা ঘামালো না পিটার, সে এখন সোজা নিজের বাড়িতে যাবে।

নদী পার হয়ে পুল থেকে নামল পিটার। সামনে একটা বেশ বড় মাঠ। মাঠের পরে সারি সারি বাগান। সেই বাগানগুলির মধ্য দিয়ে পথ। সেই পথ গিয়ে মিশেছে বড় রাস্তার সঙ্গে। বড় রাস্তা ধরে একটু এগোলেই পিটারদের ছোট্ট শহরটা।

পিটার এদিকে চলল। ঐ তো বড় রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে রাস্তার পাশের রুয়লার দোকান, কাঠচেরাই এর কারখানা আর ছোট্ট বড় পাথরের টুকরোর দোকানটা। না, সবই তো ঠিকঠাক আছে। এতক্ষণে বোধ হয় পিটারের নেশার ঘোরটা কেটেছে। তার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে।

কিন্তু বড় রাস্তা দিয়ে এই গভীর রাতে কারা যাচ্ছে? মনে হচ্ছে একদল পুলিশ

যাচ্ছে। এখানে এত পুলিশ কেন? ভাল করে তাকিয়ে দেখল পিটার। নাঃ সাজপোশাক আর অস্ত্রশস্ত্র দেখে এদের তো পুলিশ বলে মনে হচ্ছে না। আরে, এ তো একদল সৈন্য। এত সৈন্য তাদের শহরটার দিকে যাচ্ছে কেন? ব্যাপার কি? এ অঞ্চলে তো কোনদিন সৈন্য দেখা যায়নি। এরা এল কোথা থেকে? কেন এল?

গৃহযুদ্ধের সময়ে পিটারদের শহরটাকে আক্রমণকারীদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য একটা আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল বটে, কিন্তু সে তো অনেকদিন আগেকার ব্যাপার। শান্তি স্থাপিত হবার পর সে বাহিনী তো কবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সেই আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন ক্যাপ্টেন ডেভারোজ।

সেই আধা সামরিক বাহিনী কি তাহলে ভেঙে দেওয়া হয়নি? গৃহযুদ্ধ তো শেষ হয়েছে একশো বছর আগে। বাহিনীটা কি এখনও আছে? যদি থেকে থাকে, সৈনিকদের এ অঞ্চলে দেখা যায়নি কেন? বাহিনীটা থাকলেও এ বাহিনী গড়বার সময় যারা সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়েছিল, নিশ্চয়ই তাদের কেউই আর এখন বেঁচে নেই।

পিটারের মনে হলো আজ রাতে আড্ডাখানা থেকে বেরিয়ে আসবার পর থেকেই সে সব কিছু ভুল দেখতে শুরু করেছে। নাঃ, আজকে নেশাটা বড্ড বেশি হয়ে গিয়েছে।

পিটারের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পদাতিক বাহিনী। তবে ওদের সেনাপতি যাচ্ছে ঘোড়ায় চেপে। দলপতি হিসেবে সে যাচ্ছে সবার আগে আগে। এ রকমই তো হওয়ার কথা। দলপতি একজন ক্যাপ্টেন। তার চওড়া পিঠটা দেখতে পাচ্ছে পিটার, দেখতে পাচ্ছে তার কাঁধের উপরে লাগানো লাল রঙের পদমর্যাদার চিহ্ন। হ্যাঁ, ওটা যে ক্যাপ্টেনের পদমর্যাদার চিহ্ন, তাতে কোন ভুল নেই।

রাস্তায় একটা রেল গেট আছে। ছয় মাইল দূরের রেলস্টেশন থেকে মালগাড়ি আসে। কাঠচেরাই-এর কারখানা থেকে কাঠ নিয়ে আবার ফিরে যায় স্টেশনে। সে মালগাড়ি যাতায়াত করে রাতে। কাজেই রাতের বেলা অনেক সময়েই রেল গেটও বন্ধ থাকে।

আজকেও 'রেল গেট' বন্ধ। পিটার ভাবল সৈন্যদলের এবার থামতেই হবে। অপেক্ষা করতে হবে 'গেট' খুলবার জন্য। সেই সুযোগে পিটার কাছে গিয়ে ওদের দেখতে পাবে। ক্যাপ্টেনের মুখখানা দেখবার জন্য খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠেছে পিটার। এ এলাকার সবাইকেই তো চেনে পিটার। ক্যাপ্টেন যদি এই অঞ্চলের মানুষ হন তবে তাঁকে অবশ্যই চিনতে পারবে পিটার।

কিন্তু কি আশ্চর্য, ক্যাপ্টেন আর তার সৈন্যদল তো একটুও থামল না। তারা তো একটুও না থেমে 'রেল-গেট' পেরিয়ে সামনের দিকে চলে গেল। আজ রাতেই কি রেল কোম্পানি গেটটা তুলে নিয়ে চলে গেল? পিটার যখন আড্ডা দেবার জন্য যাচ্ছিল তখনও তো রেল-গেটটা ছিল। হ্যাঁ, খোলা অবস্থায়ই ছিল, নইলে পিটার গেল কি করে? কিন্তু গেটটা তুলে নেওয়া তো মোটেই ঠিক কাজ নয়।

এর ফলে তো সাংঘাতিক বিপদ ঘটতে পারে। পিটারের মতো কোন নেশাগ্রস্ত নিশাচর তো মালগাড়ির তলায় চাপা পড়তে পারে।

রেল কোম্পানির উপর খুবই রাগ হলো পিটারের। সে এক ছুটে চলে এল রেল-গেটের কাছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, রেল-গেটটা তো যেমন ছিল তেমনই আছে। ওটা তো বন্ধই রয়েছে। শুধু শুধুই সে রেল কোম্পানির উপরে রাগ করেছিল। কোম্পানির কর্তারা কি এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারেন?

কিন্তু ব্যাপারটা কি রকম হলো? ক্যাপ্টেন আর তার সৈন্যদল ওপাশে গেল কি করে? আচ্ছা পিটার কি সত্যি সত্যিই একজন ক্যাপ্টেন আর তার সৈন্যদলকে দেখেছে? নাকি নেশার ঘোরে খোয়াব দেখছে সে!

যাক্ আগে তো রেল-গেটটা পার হওয়া যাক, তারপর পিটার দেখবে ওপাশে সৈন্যদলটাকে দেখা যায় কিনা। বেয়ে বেয়ে রেল-গেটটার মাথায় উঠল সে, তারপর বেয়ে বেয়েই নামল গেটের ওপাশে।

কিন্তু কোথায়ই বা ক্যাপ্টেন আর কোথায়ই বা তার সৈন্যদল! রাস্তায় তো জনপ্রাণী নেই। আচ্ছা, সৈন্যরা তো জোর কদমে হাটে আর ক্যাপ্টেন তো রয়েছেন ঘোড়ার পিঠে। এতক্ষণে তারা নিশ্চয়ই রাস্তার মোড় ঘুরে চলে গিয়েছে। পিটারের তো রেল-গেটের মাথায় উঠতে এবং তারপর সেখান থেকে নামতে কিছুটা সময় ব্যয় করতে হয়েছে। আর সেটুকু সময়ের মধ্যেই ক্যাপ্টেন তার দলবল নিয়ে পিটার মোরানের চোখের আড়ালে চলে গিয়েছেন। কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যে তা কি সম্ভব? যাক্‌গে, আর ও কথা ভেবে নিজের মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করবে না পিটার। এখন সে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাবে। বিছানায় শুয়ে পড়লে ঘুম আসতে একটুও দেরি হবে না।

না, পথে আর কোন দিকেই তাকাবে না পিটার। তাকালেই হয়তো চোখে পড়বে আবোল-তাবোল অবাস্তব যত্তোসব ব্যাপার। যেখানে বাড়ি থাকবার কোন কথাই নেই, সেখানে পিটার দেখছে বাড়ি। সে বাড়ি আবার তার চোখের সামনেই থির থির করে কাঁপতে কাঁপতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। জনহীন রাস্তায় সে দেখতে পাচ্ছে একদল সৈন্য। না...না, আর কিছুতেই কোন দিকে তাকাবে না পিটার। তাকালেই হয়তো সে দেখতে পাবে আরও অদ্ভুত—আরও বিচিত্র কত দৃশ্য।

এই তো বাড়ির কাছে এসে পড়েছে পিটার। বড় রাস্তার এক পাশ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে একটা গলিপথ। সেই গলি ধরে একটু এগোলেই পিটারদের বাড়ি।

গলিতে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল পিটার। গলির মুখটা পেরিয়ে বড় রাস্তা ধরে একজন লম্বা-চওড়া মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটার পিঠটা দেখতে পাচ্ছে পিটার। দেখতে পাচ্ছে তার কাঁধের উপরে লাগানো লালরঙের পদমর্যাদার চিহ্ন। লোকটাকে চিনতে পেরেছে পিটার। এ তো সেই ঘোড়ায় চাপা ক্যাপ্টেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন একলা যাচ্ছেন কেন? তার সৈন্যদল কোথায় গেল? ঘোড়াটারই বা কি হলো?

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছে পিটার। ক্যাপ্টেন রাতে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করাচ্ছিলেন। তা শেষ হতেই সৈন্যরা 'ব্যারাক'-এ ফিরে গিয়েছে। আর এখন 'ক্যাপ্টেন' চলেছেন নিজের 'কোয়ার্টার'-এ।

ক্যাপ্টেনের মুখখানা দেখবার জন্য পিটার আগেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। এখন সে কৌতূহলটা আরও বেড়ে গেল। বাড়িতে না হয় আর একটু পরেই যাওয়া যাবে। দেরি তো হয়েই গিয়েছে, না হয় আর একটু দেরিই হবে। কিন্তু ক্যাপ্টেনের মুখখানা না দেখে, তাঁর সঙ্গে একটু কথা না বলে পিটার এখন কিছুতেই বাড়িতে যেতে পারবে না। ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার একজন সামরিক অফিসারের সঙ্গে একটু পরিচয় থাকাও তো ভাল। তাতে আখেরে লাভও হতে পারে।

ক্যাপ্টেন একটু এগিয়ে আছেন। তাঁকে ধরতে হবে। বলতে গেলে একরকম ছুটেই ক্যাপ্টেনের পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল পিটার। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি হলো।

ক্যাপ্টেন মাথা নিচু করে আপনমনে হাঁটছিলেন। হতে পারে পিটার একটা ডাকাবুকো যুবক, কিন্তু একজন সামরিক অফিসারের কাছে এসে সে একটু ঘাবড়েই গেল। ভীরু গলায় সে বলল, "শুভরাত্রি স্যার, যদি কিছু মনে না করেন...যদি দয়া করে অনুমতি দেন..."

ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে মুখ তুললেন। পিটার অবাক হয়ে গেল। সে তার বাক্যটাও শেষ করতে পারল না।

হ্যাঁ, অবাক হবারই কথা। ক্যাপ্টেন তো তার সম্পূর্ণই অচেনা। এঁকে তো সে কোন দিন চোখেই দেখেনি। পিটারের ধারণা ছিল যে, এই এলাকার সবাইকে সে চেনে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, তার ধারণাটা ভুল।

পিটারের অবাক হবার আরও একটা কারণ ছিল, আর সেটাই হলো প্রধান কারণ।

আচ্ছা, কোন পুরুষ কি দেখতে এত সুন্দর -এত সুদর্শন হয়? পিটারের সামনে এখন অতি সুন্দর এক পুরুষ। সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষ মেশায় সে সৌন্দর্য যেন আরও অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে রইল পিটার মোবান। সে কোন কথাই বলতে পারল না।

"শুভদিন পিটার," সুমার্জিত কণ্ঠে ক্যাপ্টেন বললেন।

পিটার চমকে উঠল। এই অচেনা, অজানা ক্যাপ্টেন যে তার নামও জানে দেখা যাচ্ছে। এই এলাকার সবাই তাকে চিনলেও এই একেবারে অচেনা ক্যাপ্টেন তার নাম জানলো কি করে? পিটারের নামটা কি এই অঞ্চলে এতই পরিচিত হয়ে উঠেছে? শুধু কি তাই? ক্যাপ্টেন বলছেন 'শুভদিন'। এটা বললেন কেন তিনি? এখন তো রাত। দিন তো শুরু হবে আরও কয়েক ঘণ্টা পরে। ক্যাপ্টেনকে প্রশ্নটা না করে পারল না পিটার মোবান। সে জিজ্ঞেস করল, "এখন তো রাত, তবে শুভদিন বলছেন কেন স্যার।" -- "রাত! তা হবে," একটু উদাসভাবেই বললেন, "আমার কাছে এখন দিনই রাত আর রাতই দিন হয়ে গিয়েছে। সব কিছু কেমন যেন গুলিয়ে

গিয়েছে। তোমাকে আমি ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারব না, আর মনে হয় তুমিও ঠিক বুঝতে পারবে না।"

পিটার চুপ করে তাকিয়ে রইল।

ক্যাপ্টেন বললেন, "সে সব কথা থাক। পিটার, আমার একটা উপকার তোমাকে করে দিতে হবে। আমাকে একটু সাহায্য করবে পিটার?"

—"আমাকে কি করতে হবে তা বলুন স্যার," পিটার বলল।

ক্যাপ্টেন বললেন, "খুব একটা শক্ত কাজ তোমাকে করতে হবে না। তোমাকে একটা জায়গা খুঁড়তে হবে। তারপর গর্তের ভিতর থেকে তুলে আনতে হবে একটা জিনিস। আমার এই কাজটুকু করে দিতে পারবে? করে দিলে তোমারও কিন্তু বেশ লাভ হবে।"

—'খুঁড়তে হবে!' পিটার ভাবল, বেশ লাভ হবে? তাহলে এতদিনে বোধ হয় গুপ্তধন পাবার সুযোগটা এসেই গেল। ক্যাপ্টেনের এই প্রস্তাবে পিটার রাজী না হয়ে পারে! পরিশ্রম করতে মোটেই ইচ্ছে করে না পিটারের, কিন্তু গুপ্তধন পেতে হলে খোড়াখুঁড়ির এটুকু পরিশ্রম তো তাকে করতেই হবে, নইলে কে আর গুপ্তধন তুলে দেবে তার হাতে। ক্যাপ্টেন নিশ্চয়ই কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন। তাই সেটা উদ্ধার করবার জন্য পিটারের সাহায্য চাইছেন তিনি। সেই গুপ্তধনে পিটারেরও একটা ভাগ থাকবে। কতটা ভাগ? ঠিক আছে, ভাগের কথাটা পরে চিন্তা করে দেখা যাবে, আগে গুপ্তধনটা তো মাটির তলা থেকে তুলে আনা যাক। এই সুন্দরকান্তি ক্যাপ্টেন নিশ্চয়ই পিটারকে ঠকাবেন না।

ক্যাপ্টেন যেন একটু মিনতিঝরা গলায় বললেন, "আমার কাজটা করে দেবে তো পিটার?"

—"নিশ্চয়ই দেব," পিটার উত্তর দিল।

—"বেশ, তাহলে চল আমার সঙ্গে। আজ আর হাতে বেশি সময় নেই। তোমাকে যখন পেয়েছি, তখন আজকেই কাজটা সেরে ফেলতে চাই আমি। এস।"

॥ ৩ ॥

ক্যাপ্টেনকে অনুসরণ করল পিটার। অনেক রাস্তা অনেক গলিপথ ধরে চলতে চলতে ক্যাপ্টেন পিটারকে নিয়ে এল একটা পুরোনো আমলের 'রোমান ক্যাথলিক' গীর্জার সামনে। গীর্জার পাশ দিয়েই একটা গলিপথ বেরিয়ে গিয়েছে। গলির পাশেই একখানা ভাঙাচোরা বিশাল বাড়ি। এ বাড়িখানা পিটার চেনে। এখানে কোন লোকজন থাকে না। পুরোনো আমলের একখানা পরিত্যক্ত বাড়ি গলির পাশের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে। হ্যাঁ, গুপ্তধনের সন্ধানই পেয়েছেন ক্যাপ্টেন। গুপ্তধন তো এরকম ভাঙাচোরা প্রাসাদের মধ্যেই থাকে। এবার সত্যি সত্যিই তা হলে পিটারের কপাল খুলল।

ক্যাপ্টেন পিটারকে নিয়ে গেল ছোটখাট পাহাড়ের মতো বিশাল বাড়িখানার সদর

দবজাব সামনে। এ বাড়িব আবাব সদব দবজা আছে নাকি! পিটাব তো এতদিন সদব দবজাব জায়গায় একটা বিবাট ইটেব স্তূপই দেখেছে। কিন্তু এখন তো সেখানে দেখা যাচ্ছে গুলবসানো একটা বিশাল দবজা! আজ বাতে পিটাব কত আজগুবি ব্যাপাবই না দেখছে!

ক্যাপ্টেন দবজাব কড়া নাড়লেন। ভিতব থেকে কোন একজন ভাবী দবজাটা খুলেও দিল। কিন্তু যে খুলল তাকে পিটাব দেখতেই পেল না। পেল না বলে সে কিন্তু মোটেই অবাক হলো না। আজ বাতে বাড়ি ফেবাব পথে যা কিছু ঘটছে, তা সবই অদ্ভুত—অবিশ্বাস্য।

বাইবে হাল্কা কুয়াশা থাকলেও চাদেব ম্লান আলোয় দেখতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু পুবোনো বাড়িটাব ভিতবে ঢুকতেই আব চাদেব আলো দেখা গেল না। তাব বদলে দেখা গেল অন্যবকমেব একটা আলো। এই অদ্ভুত আলোটা আসছে কোথা থেকে? এই প্রশ্নটা কিন্তু পিটাবেব মনে একবাবও জাগল না। এ আলোটা উজ্জ্বল না হলেও বাড়িব ভিতবকাব সব কিছুই এই মবা আলোয় মোটামুটিভাবে দেখা যাচ্ছিল।

একখানা ঘবেব সামনে এসে থামলেন ক্যাপ্টেন। বললেন, "পিটাব, এই ঘবেব ভিতবে যাও। ঘবেব কোণে একখানা গাঁইতি আছে, সেটা নিয়ে এস।"

পিটাব ঘবে ঢুকে গাঁইতিখানা নিয়ে এল।

ক্যাপ্টেন বললেন, "ঠিক আছে। এবাব উপবেব তলায় যেতে হবে। তোমাব কাজটা সেখানেই।"

ক্যাপ্টেনেব পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে উপবেব তলায় এল পিটাব। সামনে লম্বা টানা বাবান্দা। অনেকগুলো বন্ধ ঘবেব সামনে দিয়ে এগিয়ে ক্যাপ্টেন এসে থামলেন বাবান্দাব শেষপ্রান্তেব একখানা ঘবেব সামনে। ক্যাপ্টেন বললেন, "পিটাব, এই ঘবেব ভিতবেই তোমাব কাজ। দাঁড়াও, আমি দবজাটা খুলে দিচ্ছি।"

ভিতব থেকে নয়, বাইবে থেকেই দবজাটা খোলা গেল।

ক্যাপ্টেন বললেন, "এবাব ভিতবে যাও। ভয় নেই, আমি দবজাব কাছেই বয়েছি।"

ভয়! পিটাব আব যাই থাকুক, ভয় পাবাব ছেলে নয়। নির্ভয়ে ঘবেব ভিতবে ঢুকল পিটাব।

ঘবখানা ছোট। সেখানে একটাও জানালা নেই, ঘবে আলো হাওয়া আসবাব জন্য ঐ একটিই দবজা।

ঘবেব একটা দেওয়ালেব কোণটা দেখিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, "পিটাব, ঐ জায়গাটায় খোড়ো।"

পিটাব গাঁইতি তুলে নিয়ে ঐ জায়গায় মাবল একটা কোপ। ব্যস, পিটাবেব খোড়াব কাজ শুরু হয়ে গেল। পিটাব গাঁইতি চালিয়ে যাচ্ছে আব দিচ্ছে। কাজটা একটু পবিশ্রমেব হলেও এমন কিছু শক্ত নয়। গাঁইতিব আঘাতে দেওয়ালেব খানিকটা ভেঙে পড়ল, ইট পড়ে গেল, পবে গেল ইটেব নিচেব খোয়া। পিটাবেব মনে হলো আব

কয়েকবার ঘা দিলেই দেওয়ালে একটা গর্ত বেরিয়ে পড়বে আর সেই গর্ত দিয়ে দেখা যাবে নিচের তলাটা।

কিন্তু কই, তা তো হলো না। খোয়ার নিচে দেখা গেল আর এক সারি ইঁট রয়েছে। আর সেই ইঁটের উপরে শোয়ানো অবস্থায় রয়েছে....

একটা কঙ্কাল! একটা বাচ্চা ছেলের কঙ্কাল! গাঁইতির আঘাতে কঙ্কালটার পাঁজরের একখানা হাড়ও বোধ হয় ভেঙে গেল।

কঙ্কালটাকে দেখেই পিটার চমকে পিছিয়ে এল। নিজের অজান্তেই সে তাকাল খোলা দরজাটার দিকে। কিন্তু ক্যাপ্টেনকে আর দেখা গেল না। কয়েক মুহূর্ত আগেও তিনি এখানে দাঁড়িয়েছিলেন! কোথায় গেলেন তিনি?

ঘরের ভিতরে এতক্ষণ যে ঘোলাটে আলোটা ছিল সেটাও ক্রমে আরও...আরও ঘোলাটে হয়ে যেতে লাগল। ছোট ঘরখানার মধ্যে যেন নেমে এল অন্ধকারের একখানা নিকষ কালো যবনিকা।

পিটারের মাথাটা দুলে উঠল। সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে সে গিয়ে আছড়ে পড়ল তারই খোঁড়া দেওয়ালটার উপরে।

দেওয়ালটা একে অনেক দিনের পুরোনো। তার উপর আবার সেটার গোড়াটা খোঁড়া হওয়ায় সেটা একেবারেই কমজোরি হয়ে পড়েছে। সুতরাং পিটারের লম্বা-চওড়া দেহের সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই দুর্বল দেওয়ালটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। অচৈতন্য পিটারও ভাঙা দেওয়ালের সঙ্গে পড়ে গেল নিচে।

॥ ৪ ॥

পরের দিন সকালে অচেতন পিটারকে অ্যালি মোরানের বাড়িতে নিয়ে এল রাস্তার লোকেরাই।

তারা বলল, "দ্যাখো তোমার নাতির কীর্তি। নেশা করে হাড়গোড় ভেঙে রাস্তায় পড়েছিল। তোমার এই নাতি নাকি বিয়ে করে রাজকন্যে ঘরে আনবে? ছোঃ, একেবারে বাউণ্ডুলে হয়ে গিয়েছে ছোকরা! ওকে দিয়ে কোন কাজ কর্ম হবে না।"

নাতির অবস্থা দেখে বুড়ি অ্যালি মোরান তো হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। চিৎকার করে বলে উঠল, "ও আমার কি হলো রে!"

তারপর একটু সামলে নিয়ে সে নিজেই ছুটল ডাক্তারের কাছে। তাছাড়া আর উপায়ই বা কী? রাস্তার লোকেরা তো অচেতন পিটারকে রেখেই চলে গিয়েছে। এটুকু যে করেছে, সেটাই অ্যালি বুড়ীর চোদ্দপুরুষের ভাগ্য।

ডাক্তার এলেন। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, "না, ভয় পাবার কিছু নেই। ও সেরে উঠবে। হাড় ভেঙেছে ঠিকই, কিন্তু চিকিৎসায় ঐ ভাঙা হাড়ও জুড়ে যাবে। আপনি চিন্তা করবেন না।"

হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই সেরে উঠল পিটার। খুব দ্রুতই সে সুস্থ হয়ে উঠল। সম্পূর্ণ

সুস্থ হয়ে উঠবার আগেই সে একদিন স্থানীয় থানায় গিয়ে পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করল। সে রাতে পিটার যা দেখেছিল, তা খুলে বলল বড়কর্তার কাছে।

বড়কর্তা প্রথমটায় পিটারের কথায় কোন গুরুত্বই দিচ্ছিলেন না। ক্যাপ্টেন আর তাঁর সৈন্যদলের কথা শুনে তিনি তো হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "ওহে ছোকরা, সে-রাতে তোমার নেশাটা বোধহয় বড্ড জব্বর হয়েছিল, তাই নেশার ঘোরে ঐ সব খোয়াব দেখেছ। এখানকার ত্রিসীমানায় তো কোন সৈন্যদল বা ক্যাপ্টেনই নেই।"

কিন্তু কঙ্কালের কথাটা শুনেই পুলিশের বড়কর্তা চমকে উঠলেন। তিনি বললেন, "কঙ্কাল ? কোথায় কঙ্কাল ?"

—"রোমান ক্যাথলিক গীর্জার কাছের পুরোনো ভাঙা বাড়িটায়," পিটার উত্তর দিল।

—"ওটা তো পরিত্যক্ত বাড়ি," বড়কর্তা বললেন।

—"হ্যাঁ, ঐ বাড়ির মধ্যেই একটা বাচ্চা ছেলেব কঙ্কাল রযেছে।"

—"ঐ বাড়িতেই তো একসময ক্যাপ্টেন ডেভারোজ থাকত। কিন্তু সে তো অনেক দিন আগেকার কথা। তুমিও তো একজন ক্যাপ্টেনকে দেখেছিলে, তাই না ?"

—"হ্যাঁ," পিটার উত্তর দিল।

পুলিশের বড়কর্তা বললেন, "ঐ দেওযালটার দিকে একবাব তাকাও। ওখানে এই এলাকাব বিখ্যাত লোকদেব ছবি টাঙানো বযেছে। দেখ তো ঐ ছবিগুলিব মধ্যে তোমার দেখা ক্যাপ্টেনকে খুঁজে পাও কি না।"

পিটাব তাকালো। তারপব আঙুল তুলে একখানা ছবি দেখিযে বলল, "এই তো আমার দেখা ক্যাপ্টেনের ছবি।"

বড়কর্তা গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমার কোন ভুল হচ্ছে না তো ?"

—"না, সে রাতে আমি ক্যাপ্টেনেব মুখোমুখি হযেছিলাম, তার সঙ্গে অনেকক্ষণ ছিলাম। তাঁকে আমি ভাল করেই দেখেছি। ক্যাপ্টেনের মতো সুপুরুষ আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। ঐ ছবিতে আমি রাতেব দেখা ক্যাপ্টেনকেই দেখছি। না, আমি ভুল কবছি না।"

বড়কর্তা অবাক হযে বললেন, "কিন্তু তুমি ক্যাপ্টেন ডেভাবোজকে দেখবে কি করে ? তোমার পক্ষে তো তাকে দেখাই সম্ভব নয। তিনি তো মাবা গিযেছেন ষাট বছর আগে।"

পিটার স্তম্ভিত।

বড়কর্তা বললেন, "তুমি যখন কঙ্কালের কথা বলছ, তখন একবার দেখে আসা দরকার। চল, সেই ভাঙা বাড়িতে।"

দেখা গেল পিটারের সব কথাই সত্যি। ভাঙা ইঁটেব স্তূপ পাওয়া গেল, পাওয়া গেল একখানা গাঁইতি। বাচ্চা ছেলের একটা কঙ্কালও খুঁজে পেল পুলিশ। কঙ্কালের পাঁজরার একখানা হাড় ভাঙা। পরীক্ষা করে দেখা গেল হাড়খানা সদ্য ভেঙেছে।

নতুন করে আবার শুরু হলো পুলিশী তদন্ত। পুলিশের পুরোনো নথিপত্র থেকে জানা গেল যে, একদা ঐ বিরাট প্রাসাদের মালিক ছিলেন ডেভারোজের দাদা। তাঁর ছিল বিরাট সম্পত্তি। বলতে গেলে এই গোটা অঞ্চলটাই ছিল তাঁর জমিদারি। দাদার ছিল একটি মাত্র ছেলে। সেই ছেলেটিই ছিল বাবার বিরাট সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। নিতান্ত বাচ্চা বয়সেই ছেলেটি হারিয়ে গেল। পুলিশ এবং ছেলের বাবার অনুচরেরা তন্ন তন্ন করে খুজেও বাচ্চাটিকে উদ্ধার করতে পারল না। ছেলে না থাকলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা মালিকের ছোট ভাইয়ের। পুলিশ সন্দেহ করল যে, ভাইপোর আকস্মিক অন্তর্ধানের পিছনে হয়তো কাকার হাত রয়েছে। কাকাই হয়তো সম্পত্তির লোভে ভাইপোকে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই সন্দেহের সপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। প্রমাণের অভাবে কাকাকে ছুঁতেই পারল না পুলিশ।

সেই প্রমাণ পাওয়া গেল আজ এতদিন পরে। হ্যাঁ, এতদিন পরে পাওয়া গেল ডেভারোজের দাদার হারানো ছেলের কঙ্কাল। এই পাপের ফলেই ষাট বছর আগে মৃত ডেভারোজের আত্মার আজও মুক্তি হয়নি। ডেভারোজের অনুতপ্ত বিদেহী আত্মা ছায়ামূর্তি ধারণ করে প্রকাশ করে দিয়ে গেল তার অতীতের কুকর্মের কথা। এবার বোধ হয় মুক্তি পাবে ডেভারোজের ভূমিবদ্ধ আত্মা।

কিন্তু পিটার কি পেল? হ্যাঁ, তারও বিলক্ষণ লাভ হলো। ক্যাপ্টেন ডেভারোজের দাদা তার 'উইল' এ লিখে গিয়েছিলেন, "আমার হারিয়ে যাওয়া পুত্রের কোন সন্ধান যদি কেউ দিতে পারে, তবে সে আমার সম্পত্তির আয় থেকে দশ হাজার 'ডলার' পুরস্কার পাবে। আমার জীবিত পুত্রের সন্ধান দিলে পুরস্কারের পরিমাণটা যা হবে, মৃত পুত্রের সন্ধানের জন্যও ঐ একই অঙ্কের পুরস্কার সংবাদদানকারীকে দেওয়া হবে।..."

অনেকদিন পরে হলেও হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাটার সংবাদ তো পিটার মোরানই দিল। কাজেই 'উইল' এর শর্ত অনুসারে পুরস্কারের দশ হাজার 'ডলার' তো এখন আইনসঙ্গত ভাবে পিটারেরই পাওয়া উচিত।

এবং পিটার তা পেয়েও ছিল।

এরপর সারাজীবন পিটার মোরান জাঁক করে বলে বেড়িয়েছে, "আমাকে খেটে খেতে হবে কেন? যার কপালে গুপ্তধন আছে, তাকে কি পরিশ্রম করে খাওয়া-পরার যোগাড় করতে হয়? যা পেয়েছি তাতে হেসে খেলে আমার সমস্ত জীবনটা চলে যাবে।"

ঠাকুরমা অ্যালি মোরানও শহরের কারও সঙ্গে দেখা হলেই বলত, "কি, এতদিন ধরে কি বলে আসছিলাম আমি? বলতাম না যে, আমার পিটারকে কোন দিন কাজকর্ম করে খাওয়া-পরার যোগাড় করতে হবে না। এতদিনে ফলল তো আমার কথাটা। এবার পিটারকে বিয়ে দিয়ে একটি টুকটুকে নাতবৌ ঘরে নিয়ে আসব আমি। তোমরা দেখো, একটি রাজকন্যেই নাতবৌ হয়ে আমার ঘরে আসবে।"

অনুবাদ: অনিরুদ্ধ চৌধুরী

কায়াহীনের ছায়া

The Shadow of a Shade—টম হুড

আমার বাড়ি হবার পর থেকে ছোট বোন লিটি আমার সঙ্গেই থাকত। আমার বিয়ের আগে পর্যন্ত সে-ই ছিল আমার ছোট্ট সংসারের গৃহকর্ত্রী। এখন সে আমার স্ত্রীর সবসময়ের সঙ্গিনী। আমার বাচ্চাদের অতি প্রিয় পিসিমা, আমার ছেলে-মেয়েরা লিটির খুব ন্যাওটা। লিটিও তাদের খুব ভালবাসে। বাচ্চারা সান্ত্বনা পাবার জন্য, উপদেশ পাবার জন্য। বাচ্চারা যে সব ছোটখাট ঝামেলা এবং হতবুদ্ধিকর অবস্থার মধ্যে পড়ত তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তারা তাদের পিসির শরণাপন্ন হোত। লিটিও তাদের সাধ্যমতো সাহায্য করত।

আমার বাড়িতে লিটির স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব ছিল না, সে যাতে ভালভাবে থাকতে পারে তার সব ব্যবস্থাই আমি করেছিলাম। তার চারপাশে ছিল ভালবাসাভরা কতকগুলি হৃদয়। সে হৃদয়গুলি হলো আমার পরিবারের বাচ্চা এবং বড়দের। একটি সুখী পরিবারে, বড়দের স্নেহ আর ছোটদের ভালবাসার মধ্যেই কাটছিল লিটির দিনগুলি।

কিন্তু তা হলেও লিটির মুখখানা ছিল সব সময়েই গম্ভীর, তার দৃষ্টি ছিল বিষণ্নতায় ভরা। পরিচিতরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে যেত। বন্ধুরা হোত দুঃখিত।

কিন্তু হাসিখুশি লিটি এরকম হয়ে গেল কেন? এর পিছনে রয়েছে আশাভঙ্গ জনিত মনোবেদনা। হ্যাঁ, হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকের পুরোনো কাহিনীই হলো লিটির দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার কারণ। আর এ জন্যই সে গম্ভীর, এ জন্যই তার দৃষ্টি বেদনাতুর। বিয়ের অনেকগুলি ভাল ভাল প্রস্তাব এসেছিল তার কাছে। কিন্তু হৃদয়ে প্রথম যে প্রেমের ফুলটি ফুটে উঠেছিল তা অকালে আকস্মিকভাবে শুকিয়ে যাওয়ায় সে আর কোন তরুণের বিয়ের প্রস্তাবেই সাড়া দিতে পারেনি। সে কাউকে ভালবাসবে অথবা অন্য কারো কাছ থেকে ভালবাসা পাবে— এমন সুখস্বপ্নটুকু পর্যন্ত সে দেখতে পায়নি।

জর্জ ম্যাসন আমার স্ত্রীর সম্পর্কিত ভাই। এই তরুণ যুবক পেশায় নাবিক। লিটির সঙ্গে তার প্রথম দেখা হলো আমাদের বিয়ের সময়। প্রথম দর্শনেই প্রেম। লিটি আর জর্জ একে অন্যকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলল।

জর্জের বাবাও ছিলেন একজন নাবিক। ঝটিকাক্ষুব্ধ রহস্যময় সমুদ্র তাঁকে আকর্ষণ করত প্রবলভাবে। এই আকর্ষণ তিনি এড়াতে পারতেন না। সাগরের ডাকে তিনি সাড়া দিতেন। উত্তর মেরু মহাসমুদ্রের সুদক্ষ নাবিক হিসেবে জর্জের বাবার বেশ

নামডাক হয়েছিল। উত্তর মেরু অনুসন্ধান করবার জন্য প্রেরিত একাধিক অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া, উত্তর পশ্চিমের জলপথ খুঁজে বের করবার জন্য যে নৌ অভিযানগুলি পাঠানো হয়েছিল তার একাধিক অভিযানের অন্যতম অভিযাত্রী ছিলেন জর্জ ম্যাসনের দুঃসাহসী পিতৃদেব।

অসমসাহসী পিতার রক্তধারা বইছে জর্জের শিরায় শিরায়। বাবার সাগরের নেশা জর্জকেও পেয়ে বসেছিল। সে ও এড়াতে পারল না সাগরের ডাক। কাজেই জর্জ যখন স্বেচ্ছায় 'পাইওনীয়ার' নামক একখানা জাহাজের নাবিক হিসেবে কাজে যোগদান করল তখন আমি একটুও অবাক হলাম না।

ফ্রাঙ্কলিন নামে একজন দুঃসাহসী নাবিক উত্তর মেরু অভিযান করেছিলেন। কিন্তু তিনি বা তার দলের কেউ আর ফিরে আসেননি। তাদের কোন সংবাদও পাওয়া যায়নি সুমেরুর মহাতুষারময় জগতে ফ্রাঙ্কলিন আর তার সহযাত্রীরা যেন একেবারেই হারিয়ে গিয়েছিলেন।

'পাইওনীয়ার' নামে জাহাজখানা সেই হারিয়ে যাওয়া নাবিকদের খোঁজে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। এরকম একটা দুঃসাহসিক অভিযানে যোগ দেবার সুযোগ যখন এল তখন দস্যি নাবিক জর্জ ম্যাসন সেই সুযোগটা না নিয়ে পারল না। সাগরের ডাক শুনল জর্জ ম্যাসন। সুমেরু অভিযান তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। সত্যি কথা বলতে কি এরকম একটা রোমাঞ্চকর অভিযানের সুযোগ যদি আমার সামনে আসত তবে আমি নিজেও এই অভিযানের ডাককে অগ্রাহ্য করতে পারতাম না।

লিটি অবশ্য জর্জের সুমেরু অভিযানে অংশগ্রহণ করবার ব্যাপারটাকে আদৌ সমর্থন করেনি। কিন্তু জর্জ তাকে নানা ভাবে বুঝিয়ে নীরব করে দিয়েছিল। লিটিকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলেছিল, "তুমি কিছু ভেবো না। সুমেরু অভিযানে যারা স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে, তারা কখনও হারিয়ে যায় না। এই অভিযানে এমন কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই, যা তোমার দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া এটাও ভেবে দেখ, এই অভিযানের গুরুত্ব কতখানি। সাধারণ জাহাজে কাজ করলে যে অভিজ্ঞতা লাভ করতে আমার কম করে বারো বছর লাগতো, এই অভিযানে অংশগ্রহণ করে আমি বছরখানেকের মধ্যেই সেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারব। কাজেই তুমি কোন আপত্তি কর না।"

বলতে পারব না জর্জের এত কথার পরেও লিটি সন্তুষ্ট হতে পেরেছিল কি না। কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে জর্জ ম্যাসনের সঙ্গে সে আর কোন তর্ক করেনি। কিন্তু তার মুখখানা গম্ভীর এবং বিষণ্ণ হয়ে গেল। এর পর থেকেই একটা বিষণ্ণতা আর আতঙ্কের ছাপ তার সুন্দর মুখখানাকে কালো এবং শঙ্কিত করে রাখত। যখনই সে একলা থাকত তখনই সে জর্জের কথা ভাবত। ভেবে ভেবে সে হয়ে পড়ত শঙ্কা বিহ্বলা। লিটির মতো অল্পবয়সী হাসিখুশি মেয়ের তো এরকম হবার কথা নয়, তবে কেন এমন হলো?

লিটি ভাবত তার এই পরিবর্তনটা বোধ হয় কেউ দেখছে না, আমি কিন্তু প্রথম

থেকেই ব্যাপারটা দেখছিলাম। আদরের ছোট বোনটির এই অবস্থা দেখে আমার খুব কষ্ট হতো। কিন্তু লিটির মানসিক অবস্থার কথা ভেবে আমি এ বিষয়ে কোন কথা বলতাম না। লিটির জীবন ছিল আনন্দময়, তার জীবনে যে এমন একটা পরিবর্তন আসতে পারে, তা আমি ভাবতেই পারিনি।

আমার ছোট ভাই হ্যারি ছিল তখন 'অ্যাকাডেমি'-র ছাত্র। তখন সে সবে চিত্রকলার পাঠ নিতে শুরু করেছে। এখন সে চিত্রকলার জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার আঁকা ছবি এখন বেশ ভালদামেই বিক্রি হয়। চিত্রকলায় যারা প্রথম পাঠ নিতে শুরু করে তাদের মতোই হ্যারি ছিল কল্পনাবিলাসী এবং তাত্ত্বিক। সে একজন প্রাক্-র‍্যাফেলীয় যুগের শিল্পী হতে পারত। কিন্তু ব্যাপারটা হলো এই যে, তখনও চিত্রকলার ক্ষেত্রে প্রাক্-র‍্যাফেলীয় পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়নি। জর্জ ছবি আঁকত ভিনিসীয় পদ্ধতিতে। এই বিশেষ পদ্ধতির দিকে জর্জের একটা অদ্ভুত প্রবণতা ছিল।

জর্জের সুন্দর মাথাটা ছিল ইটালীযদের মতো। মাথার এই গড়নটা হ্যারিকে মুগ্ধ করল। জর্জকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে বসিয়ে হ্যারি তার একখানা ছবি এঁকেই ফেলল। ছবিখানার সঙ্গে জর্জের চেহারার যথেষ্ট মিল দেখা গেল। অবশ্য শিল্প কর্ম হিসেবে ছবিখানা ছিল মাঝারি ধরনের।

ছবিখানার পশ্চাৎপট ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। জর্জের নাবিকী পোশাকের রঙ আবার ঘন। এই দুই রঙের সন্নিপাতে জর্জের মুখখানা হয়ে উঠেছিল খুবই সাদা—বলতে গেলে প্রায় ফ্যাকাসে। চোখ দুটো হয়ে উঠেছিল জীবন্ত। সে চোখ দুটি যেন তাকিয়ে থাকত স্থিরদৃষ্টিতে। সে দৃষ্টি কেমন যেন তীব্র—কেমন যেন তীক্ষ্ণ।

ছবিখানার আকার মূলদেহের তিন-চতুর্থাংশ। ছবিতে জর্জের দেহের মাত্র একখানা হাতই দেখানো হয়েছে। হাতখানা নিচে নেমে কোমর থেকে ঝোলানো একখানা তরবারির বাট দৃঢমুষ্ঠিতে চেপে ধরেছে। ছবিখানা দেখে জর্জ বলেছিল, "আমাকে তো আধুনিক কোন জাহাজের একজন পদস্থ কর্মচারীর থেকে ভেনিসের একখানা 'গ্যালি' র 'কমান্ডার' বলেই বেশি মনে হচ্ছে।"

'গ্যালি' হলো দাঁড আর পালের দ্বারা চালিত লম্বা একতলা এক ধরনের জলযান।

জর্জের ছবিখানা দেখে লিটি খুবই খুশি হলো। জর্জের সঙ্গে ছবিখানার মিল দেখেই সে খুশি। ছবির শিল্প কলা নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামায়নি। হ্যারির নির্দেশে ছবিখানাকে খুব ভারী 'ফ্রেম'-এ বাঁধাই করে খাবার ঘরের দেওয়ালে টাঙিযে রাখা হলো।

ক্রমে জর্জের সুমেরু যাত্রার দিন এগিয়ে আসতে লাগল। "পাইওনীয়ার" জাহাজও অভিযানের জন্য প্রস্তুত। নাবিকেরা আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। সবাই তৈরি। এবার কর্তৃপক্ষের আদেশ পেলেই যাত্রা শুরু হবে। জাহাজের পদস্থ কর্মচারীরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন। যাত্রা শুরু হবার আগেই এরকম একটা পরিচিতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এতে পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়, ফলে কাজের সুবিধা হয়। জর্জও এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল। তার বন্ধুত্ব হলো 'পাইওনীয়ার'-এর সার্জন ভিনসেন্ট গ্রীভ-এর সঙ্গে। গ্রীভের আর কোন বন্ধু

নেই। জর্জের সঙ্গে পরিচিতির আগে পর্যন্ত সে ছিল নিঃসঙ্গ—একাকী। তার অবস্থাটা বুঝতে পেরেই জর্জ বিশেষ করে তারই সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। জর্জ প্রায়ই আমার কাছে ভিনসেন্ট গ্রীভের কথা বলত।

একদিন গ্রীভের কথা বলতে বলতে জর্জ মন্তব্য করল, "বেচারা! এখানে আমি ছাড়া ওর আর কোন বন্ধুবান্ধব নেই। ওর যা দু'চার জন বন্ধু আছে তারা হলো সুদূর হাইল্যান্ডের বাসিন্দা। এ অঞ্চলে কোন বন্ধুবান্ধব না থাকায় গ্রীভ বেশ অসামাজিক হয়ে উঠেছে। সবাইকার সঙ্গে ও স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করতে পারে না। আমি চাইছি ও একজন স্বাভাবিক এবং সামাজিক মানুষ হয়ে উঠুক।"

আমি বললাম, "তোমার উদ্দেশ্যটা তো খুবই ভাল।" জর্জ খুশি হয়ে বলল, "আপনি যদি অনুমতি দেন তবে ওকে এ বাড়িতে নিয়ে আসতে পারি।"

"তোমার বন্ধুকে এ বাড়িতে নিয়ে আসবার ব্যাপারে আমার তো আপত্তির কোন কারণই থাকতে পারে না। তুমি অবশ্যই তাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসবে।"

আমার কথা শুনে জর্জ খুবই খুশি হলো।

অতএব ভিনসেন্ট গ্রীভ এল আমাদের বাড়িতে। সত্যি কথা বলতে কি ওকে আমার প্রথম থেকেই ভাল লাগেনি। আমার মনে হলো ওকে আমাদের বাড়িতে আসবার অনুমতি না দিলেই বোধ হয় ভাল করতাম।

ভিনসেন্ট গ্রীভ তরুণ যুবক। তার চেহারাটা লম্বা, গায়ের রং বিবর্ণ। তার সাজপোশাক দেখলে তাকে বেশ ফিটফাট প্রকৃতির বলেই মনে হয়। একজন স্কটল্যান্ডবাসীর মতোই তার মুখখানা কঠোর। গ্রীভের ধূসর চোখের দৃষ্টি শীতল। তার ভাবভঙ্গির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। তার ভাবভঙ্গির মধ্যে কেমন যেন একটা নাষ্টামি, একটা চাতুর্য —অথবা দুটোই প্রকাশ পেত। এটা আমার মোটেই পছন্দ হোত না।

ভিনসেন্ট গ্রীভ এর পর থেকে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতে লাগল। লিটির কাছাকাছি যাবার জন্য, তার সঙ্গে একটু কথা বলবার জন্য সে সব সময়ই ছোক ছোক করত। তার এই হ্যাংলামি ভাবটা দেখে আমার মোটেই ভাল লাগত না। গ্রীভ আমাদের বাড়িতে এসেছিল জর্জের বন্ধু হিসেবে। আর জর্জ হলো লিটির প্রেমিক। কাজেই লিটির প্রতি তার এহেন আচরণ ছিল অত্যন্ত অশোভন এবং অসঙ্গত। গ্রীভ এমন ভাব করত যেন সে ই হলো লিটির প্রেমিক।

লিটির প্রতি ওর এই প্রেমিকসুলভ আচরণ নিশ্চয়ই জর্জেরও ভাল লাগত না। কিন্তু সে মুখে কিছু বলত না। হয়তো সে মনে করত গ্রীভের এই অসঙ্গত আচরণের জন্য দায়ী হলো তার বংশমর্যাদার অভাব। কোন খানদানী ঘরের যুবক নিশ্চয়ই এরকম আচরণ করত না

লিটিও কিন্তু গ্রীভের ভাবভঙ্গি আর অশোভন আচরণ মোটেই পছন্দ করত না। কিন্তু লোকটা একেবারে নাছোড়বান্দা। কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও সে নির্লজ্জের

মতো আমাদের বাড়িতে আসতে লাগল। তার আগমনটা ক্রমেই বিরক্তিকর হয়ে উঠতে লাগল।

লিটি জানত জর্জের মেরুযাত্রা আসন্ন। সে আর বেশিদিন জর্জকে নিজের কাছে পাবে না। কাজেই যাত্রার আগের কয়েকটা দিন সে জর্জকে যতদূর সম্ভব নিজের কাছে পাবার চেষ্টা করত। কিন্তু সার্জন ভিনসেন্ট গ্রীভ জর্জকে একলা পাবার পথে একটা বিরক্তিকর বাধাস্বরূপ হয়ে উঠল। কিন্তু যেহেতু গ্রীভ হলো জর্জের বন্ধু এবং সহকর্মী, সেহেতু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে লিটিকে তার অবাঞ্ছিত উৎপাত সহ্য করতে হোত।

সার্জন গ্রীভ কিন্তু মোটেই উপলব্ধি করতে পারত না যে লিটি আর জর্জের সম্পর্কের মধ্যে সে অন্যায়ভাবে নাক গলাবার চেষ্টা করছে। ওদের দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে তার অবাঞ্ছিত উপস্থিতি একেবারেই অনাবশ্যক। আবার এটাও হতে পারে যে সেটা বুঝেও গ্রীভ না বোঝবার ভান করত। সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থেকেই সুখী ছিল। একটা 'রোমান্টিক' কল্পনা করে সে বোধ হয় মনে মনে খুবই আনন্দ পেত।

কিন্তু একটা জিনিস দেখে খুবই বিব্রত বোধ করত সার্জন গ্রীভ। খাবার ঘরের দেওয়ালে জর্জের ছবিখানা টাঙানো ছিল, সেখানা দেখলেই সে কেমন যেন হয়ে যেত। ছবিখানার দিকে চোখ পড়লেই গ্রীভ খুব ঘাবড়ে যেত। প্রথম দিন যখন সে এ বাড়িতে এসেছিল তখনই জর্জের ছবিখানা দেখে গ্রীভ কেমন যেন শঙ্কা বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। ভয়ে বিস্ময়ে তার মুখ থেকে একটা অর্ধস্ফুট, অস্পষ্ট শব্দ বেরিয়ে এসেছিল। তাতেই গ্রীভের দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আমি লক্ষ্য করেছিলাম, ছবিখানার দিকে যাতে আর তাকাতে না হয় সেজন্য গ্রীভ চেষ্টা করছে। সে এড়াতে চাইছে জর্জের ছবিখানাকে।

'ডিনার' এর সময় গ্রীভকে জর্জের ছবির ঠিক মুখোমুখি একখানা চেয়ারে বসতে বলা হলো। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সেই চেয়ারখানাতেই বসল গ্রীভ। কিন্তু বলতে গেলে পরক্ষণেই সে চেয়ারখানা ছেড়ে উঠে দাড়াল।

তোতলাতে তোতলাতে গ্রীভ বলল, "এটা খুবই ছেলেমানুষী ব্যাপার, কিন্তু ঐ ছবিখানার উল্টোদিকে আমি কিছুতেই বসতে পারব না।"

"ছবিখানা একটা উঁচুদরের শিল্পকর্ম নয়," আমি বললাম, "ওখানা চিত্রশিল্প সমালোচকের চোখকে পীড়া দিতে পারে।"

গ্রীভ বলল, "আমি চিত্রশিল্প সম্পর্কে কিছুই জানি না। কিন্তু এ হলো আমার দেখা অপ্রীতিকর ছবিগুলির মধ্যে একখানা। ঘরের যেখানেই যাওয়া যাক না কেন এ ছবির দৃষ্টি আপনাকে অনুসরণ করবেই। এ ধরনের ছবি দেখলেই আমার খুব ভয় হয়। এ ভয় আমার মধ্যে এসেছে উত্তরাধিকার সূত্রে। ব্যাপারটা কি জানেন? আমার মা তার বাবা অর্থাৎ আমার মাতামহের ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে করেন। আমার জন্মের পরেই মা এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, তার বাঁচবার কোন আশাই ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। তার বিকারের ঘোরে

অর্থহীন, অসংলগ্ন কথা বলা থেমে গেল। যখন তিনি আবার সুস্থভাবে কথাবার্তা বলতে সক্ষম হলেন তখন তিনি বাড়ির লোকদের আমার মাতামহের ছবিখানাকে তাঁর ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। ছবিখানা মায়ের শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল। সেখানার দিকে চোখ পড়লেই মা-র মনে হোত যেন আমার মাতামহ কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে মা-কে ভয় দেখাচ্ছেন। ছবিখানার দিকে চোখ পড়লেই দারুণ আতঙ্কে আমার মায়ের সমস্ত শরীর শিউরে উঠত। স্বীকার করছি যে, এটা একটা কুসংস্কার, কিন্তু আমার শরীরিক এবং মানসিক গড়নের মধ্যেই এটা রয়েছে। মায়ের কাছ থেকেই আমি এটা পেয়েছি। এরকমের কোন ছবি দেখলেই আমি আঁতকে উঠি।"

আমার বিশ্বাস, জর্জ হয়তো ভেবেছিল যে, লিটির পাশের চেয়ারখানায় বসবার জন্যই গ্রীভ এরকমের একটা ছুতো দিচ্ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা যে তা নয়, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ভিনসেন্ট গ্রীভের মুখে আমি সত্যি সত্যিই একটা আতঙ্কের ছাপ দেখতে পেয়েছিলাম।

রাতে জর্জ আর তার বন্ধু যখন বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন আমি আধা-ঠাট্টার সুরে জর্জকে আড়ালে প্রশ্ন করেছিলাম, "কি, তুমি কি আবার সার্জন গ্রীভকে আমাদের সঙ্গে দেখা করাবার জন্য এ বাড়িতে নিয়ে আসবে ?"

জর্জ বলল, "কোন সরাইখানার বা কোন জাহাজের লোকদের মধ্যেই গ্রীভকে মানায়, কিন্তু যেখানে মেয়েরা রয়েছে সেখানে ওকে নিয়ে আসা যায় না।"

কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেল। আমাদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে ভিনসেন্ট গ্রীভ বিনা নিমন্ত্রণেই বার বার আমাদের বাড়িতে আসতে লাগল। তারপর এমন হলো যে সে বলতে গেলে রোজই আমাদের বাড়িতে আসতে লাগল। জর্জের মাধ্যমেই গ্রীভের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। কিন্তু জর্জকে সঙ্গে না নিয়েই আমাদের বাড়িতে তার আগমন ঘটতে লাগল।

জর্জকে 'পাইওনীয়ার' জাহাজে কাজ করতে হয়। নিজের কাজে সে অধিকাংশ সময়েই ব্যস্ত। জাহাজের কর্তৃপক্ষও তাকে প্রায় সবসময়ই কোন না কোন কাজে আটকে রাখে। জর্জ বলতে গেলে সময়ই পায় না। কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে সে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যায়। অন্যদিকে সার্জন গ্রীভের হাতে প্রচুর সময়। জাহাজে সব ওষুধ-পত্তর ঠিকমতো তোলা হচ্ছে কিনা অথবা নাবিকদের মধ্যে কারও ওষুধের প্রয়োজন আছে কিনা, সেটুকু দেখাই ছিল সার্জন গ্রীভের কাজ। এ কাজটুকু হয়ে গেলেই তার অবসর। অবসর কালে সে স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দ মতো কাজ করতে পারত।

লিটি গ্রীভকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলত। জর্জের কাছ থেকে যেন কোন একটা খবর নিয়ে এসেছে —এরকম একটা অজুহাত দেখিয়ে সে লিটির সঙ্গে দেখা করতে চাইত। জর্জ কিন্তু কোনদিনই গ্রীভকে লিটির কাছে পাঠায়নি। গ্রীভই একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে আসতে লাগল।

'পাইওনীয়ার' জাহাজের যাত্রার আগের দিন গ্রীভ আমাদের সঙ্গে দেখা করে বিদায় নেবার জন্য এল। একটু পরেই ক্ষুব্ধ এবং বেদনাহত লিটি চলে এল আমার কাছে। লিটির কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে তো আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। গ্রীভ ছোকরার এতদূর আস্পর্ধা! সে নাকি আজ লিটির কাছে প্রেম নিবেদন করেছে।

গ্রীভ বলেছে, "জানি, তুমি জর্জের বাগদত্তা। তাকে তুমি ভালবাস। কিন্তু সে ছাড়া অন্য আর একজন পুরুষও তো তোমাকে ভালবাসতে পারে। সেই আর একজনের মনে যদি ভালবাসার জোয়ার আসে ত' তুমি ঠেকাবে কি করে? মানুষ যেমন জ্বরে পড়া ঠেকাতে পারে না, তেমনি ঠেকাতে পারে না প্রেমে পড়াকে।"

লিটি নিজের মর্যাদা বজায় রেখে তীব্রভাবে গ্রীভকে ভর্ৎসনা করেছে।

গ্রীভ বলেছে, "আমার আবেগের কথা আমি খোলাখুলিই তোমার কাছে বললাম। এর মধ্যে কোন ক্ষতির ব্যাপার আছে বলে তো আমার মনে হয় না। অবশ্য আমি বেশ ভাল করেই জানি যে তোমাকে প্রেম নিবেদন করে আমাকে নিরাশই হতে হবে। তবুও আমার মনের কথাটাকে মনে চেপে রাখতে পারলাম না আমি।"

একটু চুপ করে থেকে গ্রীভ আবার বলতে লাগল, "হয়তো এমন হাজারটা ঘটনা ঘটতে পারে। যাতে জর্জের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত ছিন্ন হলেও হতে পারে, সেক্ষেত্রে মনে রেখো আর একজন মানুষও তোমাকে ভালবাসে। আশা করি আমার কথাগুলি তুমি ভুলে যাবে না।"

লিটির মুখে এসব কথা শুনে আমি খুবই রেগে গিয়েছিলাম। গ্রীভের ঔদ্ধত্যের একটা উত্তর এক্ষুণি দেওয়া দরকার। ওর অশোভন আচরণ সম্পর্কে আমার মতটা যে কি ত' ওকে তক্ষুণি জানাবার জন্য আমি উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু লিটিই থামাল আমাকে। সে বলল, "ভিনসেন্ট গ্রীভ চলে গিয়েছে। বলতে গেলে আমি তাড়িয়েই দিয়েছি তাকে। গ্রীভকে বলেছি, এ বাড়ির দরজা চিরদিনের মতো ওর কাছে বন্ধ হয়ে গেল। ভবিষ্যতে সে যেন কোনদিন এ বাড়িতে আসবার জন্য চেষ্টা না করে।"

একটু থেমে লিটি আবার বলল, "দাদা, জর্জকে রক্ষা করবার জন্যই তোমাকে এসব কথা বললাম। জর্জকে এ কথা জানাতে চাই না আমি। কারণ আমার আশঙ্কা, গ্রীভের এসব কথা শুনলে জর্জ খুবই রেগে যাবে এবং তার ফলে হয়তো ওদের দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বা অন্য কোন রকমের সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যাবে। সে ধরনের কোন ব্যাপার যাতে না ঘটে সেটাই চাইছি আমি।"

'পাইওনীয়ার' জাহাজ যাত্রা করবার আগে ভিনসেন্ট গ্রীভের সঙ্গে সেদিনের পর আর দেখা হয়নি।

সেদিনই সন্ধেবেলায় জর্জ এল। সারারাত সে থাকল আমাদের সঙ্গে। কিন্তু ভোর হতেই তাকে বিদায় নিতে হলো। তাকে এবার জাহাজে ফিরে যেতে হবে। জাহাজ তৈরি, আজই যাত্রা করবে 'পাইওনীয়ার'।

শীতল, বিষণ্ণ, ধূসর প্রত্যুষ। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। হাল্কা বৃষ্টি। দরজা

পর্যন্ত এগিযে দিলাম জর্জকে। সেখানে কবমর্দন কবলাম তাব সঙ্গে। জর্জ আমাদের কাছ থেকে বিদায নিয়ে চলে গেল।

বিষণ্ন মনে আমি ফিবে এলাম খাবাব ঘবে। বেচাবী লিটি সোফায বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

লিটিব ঠিক উপবে দেওযালে জর্জেব ছবিখানা টাঙানো ছিল। ছবিখানাব দিকে না তাকিয়ে পাবলাম না। ভোবেব আলো এসে পড়েছে জর্জেব ছবিব উপরে। আলোটা অদ্ভুত—অস্পষ্ট। বাইবে এখনও কুযাশা কেটে যায়নি। প্রত্যূষেব সেই ম্লান আলোয় ছবিতে জর্জেব মুখখানাব বঙ অসাধাবণ এবং অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। সে মুখ বিবর্ণ—পাণ্ডুব। কাছে গিযে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছবিখানাব দিকে তাকালাম। দেখলাম ছবিব মুখখানা কেমন একটা অদ্ভুত বাষ্পে ঢেকে গিযেছে। মনে হলো এই বাষ্পেব আববণেব জন্যই ছবিব মুখখানাকে এত অস্পষ্ট এবং বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ভাবলাম বেচাবী লিটি হযতো তাব প্রেমিক জর্জেব ছবিব মুখে চুমু খেযেছিল আব সে-সময তাব চোখেব কযেক ফোটা জল গিযে পডেছিল ছবিব মুখেব উপবে। বোধ হয সেই চোখেব জল থেকেই অদ্ভুত বকমেব বাষ্পেব আববণটাব সৃষ্টি হযেছে।

একটু পবেই আমি ঠাট্টাব সুবে ছোট ভাই হ্যাবিকে বললাম, "তোমাব আঁকা ছবিখানা সত্যিই খুব সুন্দব হযেছে। ছবিব মুখখানা যেন একেবাবে জীবন্ত। একটু আগেই ঐ মুখে চুমু খাওযা হযেছিল।"

আমাব কথা শুনে লিটি গম্ভীব হযে গেল। গম্ভীবভাবেই সে বলল, "দাদা, তোমাব ধাবণাটা ভুল। আমি জর্জেব ছবিতে চুমু খাইনি।"

হ্যাবি বলল, "বোধ হয ছবিব বার্নিশটা ফুটে বেব হচ্ছে, তাই ছবিখানাকে কিছুটা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।"

ছবি সম্পর্কে আলোচনাটা এখানেই থেমে গেল। আমি আব কিছু বললাম না। আমি চিত্রশিল্পী না হলেও এটা বেশ ভাল কবেই জানতাম যে, ছবিব বার্নিশ ফুটে ওঠাব ব্যাপাবটা সম্পূর্ণ অন্য বকমেব জিনিস।

নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সমযেই 'পাইওনীযাব' যাত্রা কবল। আমবা জর্জেব কাছ থেকে দু'খানা চিঠি পেলাম। সত্যি কথা বলতে কি চিঠি দু'খানা পেল লিটি। তিমি শিকাব কববাব দু'খানা জাহাজ কযেক দিনেব ব্যাবধানে শিকাব শেষ কবে দেশেব দিকে ফিবছিল। জর্জ এই সুযোগ ছাডেনি। সে জাহাজ দু'খানাব নাবিকদেব মাধ্যমে লিটিকে চিঠি দু'খানা পাঠিযেছে।

দ্বিতীয চিঠিতে জর্জ লিখেছে :

"...সম্ভবত তৃতীয চিঠি পাঠাবাব সুযোগ আব পাব না আমি, কেননা 'পাইওনীযাব' এগিযে চলেছে আবও উত্তবে - আবও উচ্চ অক্ষাংশেব দিকে। এই সুদূব নির্জন সমুদ্রে অভিযাত্রী জাহাজ ছাডা আব কোন জাহাজ যায না। আব কোন তিমি শিকাব কববাব জাহাজেব সঙ্গে দেখা হবে বলে তো মনে হয না। কাজেই চিঠি পাঠাব কি কবে?"

জর্জ আবও লিখেছে:

"...আমাদেব মনমেজাজ বেশ ভালই আছে। বলা যায় বেশ ফূর্তিতেই আছি আমবা। অবশ্য তোমাব কথা মনে হলেই মনটা খাবাপ হয়ে যায়। এখন আমবা একে অন্যেব কাছ থেকে কত দূবে!"

"...এখন পর্যন্ত আমবা খুব সামান্য ববফেব মুখোমুখি হয়েছি। আশা কবি আবও উত্তবে যাবাব পবও সাধাবণত সে অঞ্চলে যতটা ববফ জমে থাকে, ততটা আমবা দেখতে পাব না। এমনকি যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে যে, উত্তব মেরুব কাছাকাছি যাবাব পবেও আমবা পবিষ্কাব জল পাব। আমাদেব জাহাজ চালাতে কোন অসুবিধাই হবে না।"

"...ভাল কথা, আমাদেব ভিনসেন্ট গ্রীভ তো বেশ আবামেই আছে। তাকে দেখে মনে হয় যে, সে এমন একটা চাকবি কবছে, যে চাকবিতে কোন কাজ নেই, কিন্তু মোটা মাইনে আছে। আসলে আজ পর্যন্ত জাহাজেব কাবও কোন অসুখ বিসুখ কবেনি।"

তাবপব বহুদিন কেটে গেল। জর্জেব কাছ থেকে আব কোন চিঠি এল না। এক মাস কাটল, দু'মাস কাটল, দেখতে দেখতে কেটে গেল পুবো একটি বছব। বেচাবা লিটি!

একবাব আমবা এই অভিযান সম্বন্ধে একটা খবব জানতে পেবেছিলাম। খববটা জেনেছিলাম সংবাদপত্র থেকে। [illegible] জানলাম যে সুমেরু অভিযাত্রী দল নিবাপদে এগিয়ে চলেছে। একখানা [illegible] জাহাজেব ক্যাপ্টেন একদল এস্কিমো জাতেব লোকেব দেখা পেয়েছেন, সেই এস্কিমোদেব কাছ থেকেই পাওয়া গিয়েছে 'পাইওনীয়াব' জাহাজেব খবব। [illegible] সেই ক্যাপ্টেন খববটা পাঠিয়ে দিয়েছেন সভ্য জগতে।

আমবা জানতে পাবলাম [illegible] জন্য 'পাইওনীয়াব' জাহাজ [illegible] এগোতে না পেবে [illegible] অভিযানেব [illegible]। 'স্লেজ' এব উপবে 'বোট' [illegible]। অভিযাত্রীদেব [illegible] নাবিকদেব [illegible] হচ্ছে [illegible] যাচ্ছে।

শীত [illegible] এক [illegible] ফুল সুগন্ধ মধুমাস। আমাদেব এই পবিবর্তনশীল [illegible] এরকম সুন্দব বসন্তকালেব সাক্ষাৎ আমবা বড় একটা পাই না।

একদিন সন্ধ্যায় আমবা [illegible] আছি [illegible] ঘবেব জানালাগুলি খোলা। যদিও 'ফায়াবপ্লেস' এ [illegible] ভিতবেব অসহ্য গুমোটে আমবা অস্থিব হয়ে উঠেছিলাম। এমন সময় [illegible] জানালা পথে সন্ধ্যাব ঠাণ্ডা বাতাস ঘবেব ভিতবে ঢোকায় আমবা স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচলাম।

লিটি কাজ কবছিল। বেচাবী লিটি! সে মুখে কিছু বলত না, কিন্তু তাব মনেব দুঃখ আমবা বুঝতাম। জর্জেব দীর্ঘ অনুপস্থিতিব জন্য সে যে মানসিক কষ্ট বোধ কবত তাব ছাপ তো তাব চোখে মুখেই পড়ত। হ্যাবি জানালা দিয়ে বাইবেব দিকে

ঝুঁকে বাসন্তী প্রকৃতির শোভা আর সৌন্দর্য দেখছিল। বাগানে ফুল আর ফলেব সমারোহ। এবাব অন্য বছরের চাইতে অনেকটা আগেই বসন্তের ফুল ফুটেছে, ফলের গাছে ফলেছে ফল। স্নিগ্ধ সুন্দর আবহাওয়ার জন্যই ফল-ফুলের এই আবির্ভাব। আমি টেবিলের পাশে বসে বাতিব আলোয খবরের কাগজ পড়ছিলাম।

হঠাৎ ঘরের ভিতবে আছড়ে পড়ল এক প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ। এটা ঠাণ্ডা বাতাসের আকস্মিক প্রবাহ নয। কারণ খোলা জানালার পাশের পর্দাগুলি একটুও কাঁপল না। যদি বাতাস হতো তবে পর্দা নিশ্চয়ই কাঁপত। একটা মৃত্যুশীতল প্রচণ্ড শৈত্য আচ্ছন্ন কবে ফেলল সমস্ত ঘরখানাকে। এই মহাশৈত্য যেমন মুহূর্তের মধ্যে এল, তেমনি এক মুহূর্তের মধ্যেই চলে গেল। লিটি কেঁপে উঠল। হিম-শীতল শৈত্যের স্পর্শে আমিও কেঁপে উঠলাম।

লিটি চোখ তুলল। বলল, "কি অদ্ভুতভাবে মুহূর্তেব মধ্যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডাটা এল আব গেল!"

আমি হেসে বললাম, "বেচারা জর্জ উত্তর মেরুতে যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডাব মধ্যে রয়েছে, আমবা এখানে ঘরে বসেই তার খানিকটা স্বাদ পেলাম।"

সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই জর্জের ছবিব দিকে আমাব চোখ পড়ল। ছবির দিকে তাকিযে দারুণ বিস্ময়ে আমি নির্বাক হযে গেলাম। এ কি ভযানক দৃশ্য দেখছি আমি! উষ্ণ বক্তেব একটা প্রচণ্ড স্রোত যেন দ্রুতবেগে আমাব দেহেব মধ্য দিযে প্রবাহিত হলো। মুহূর্তকাল আগে যে কনকনে ঠাণ্ডায আমার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠেছিল, সেই ঠাণ্ডাব বিন্দুমাত্র প্রভাবও আব আমাব উপবে ছিল না। জ্বরগ্রস্তের মতো আমাব শরীর উত্তপ্ত হযে উঠল।

আগেই বলেছি টেবিলেব উপরে একটা বাতি জ্বলছিল। আমি যাতে স্বচ্ছন্দে পড়তে পাব সেজন্যই বাতিটা জ্বালানো হয়েছিল। ঘরের মধ্যে তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসেনি। ঘবেব ভিতবে তখনও সূর্যাস্তেব সমযকাব মৃদু বেগুনী আলো ছিল। সেই আলোয জর্জের ছবিখানাব দিকে তাকাতেই আমি দেখলাম ছবিব মধ্যে এক অদ্ভুত—-এক আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। আমি বেশ স্পষ্টভাবেই দেখলাম। না, এ আমাব ভ্রান্তদর্শন নয। অসুস্থ মস্তিষ্কেব জন্য আমাব দৃষ্টিবিভ্রমও ঘটেনি। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে, এবং পরিপূর্ণ জাগ্রত দৃষ্টিতেই এই পরিবর্তনটা দেখেছিলাম।

দেখলাম ছবিতে জর্জের মুখখানা নেই, সেখানে রয়েছে একটা দাঁত বের করা কবোটি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমি ছবিখানাব দিকে তাকালাম। না, এ কোন আলো ছাযার কারসাজি নয, আমাব কোন দৃষ্টিবিভ্রমও নয। সূর্যাস্তেব আলোয পরিষ্কাব দেখতে পেলাম কঙ্কাল-মুখখানা আমাব দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিযে রয়েছে। আমি দেখলাম চোখেব জাযগায দুটো গোল গোল অন্ধকাব গর্ত, দেখলাম দু'পাটি ঝকঝকে দাঁত, চক্ষু এবং গালের মধ্যবর্তী মাংসহীন অস্থি। এ তো মৃত্যুব মুখ! একটু আগে ঘবের ভিতবে ছিল মৃত্যুর শৈত্য, আব এখন নিজের চোখে দেখছি মৃত্যুর মুখ।

একটি কথাও না বলে আমি চেয়ার থেকে উঠে সোজা ছবিখানার দিকে এগিয়ে

গেলাম। ছবিখানাব কাছে যেতেই মনে হলো হাল্কা কুযাশাব মতো একটা কিছু যেন ছবিব সামনে থেকে সবে গেল। ছবিব আবও কাছে গেলাম। এবাব দেখলাম জর্জেব মুখ। সেই ভযাল ভৌতিক কবোটি অদৃশ্য হযে গিযেছে!

"বেচাবা জর্জ!" আমাব অজ্ঞাতসাবে সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই আমাব মুখ থেকে সংক্ষিপ্ত উক্তিটা বেবিযে এল।

লিটি মাথা নিচু কবে কাজ কবছিল, সে মুখ তুলে আমাব দিকে তাকাল। আমাব কণ্ঠস্বব নিঃসন্দেহে তাকে শঙ্কাতুবা কবে তুলেছিল। আমাব মুখেব ভাব দেখে সে আশ্বস্ত হতে পাবল না। কাপা গলায সে জিজ্ঞেস কবল, "কি বলতে চাইছ তুমি? তুমি কি কিছু শুনেছ? শুনলে দযা কবে বলো আমাকে!"

লিটি উঠে আমাব কাছে এল। আমাব দু'বাহুব উপবে নিজেব হাত দু'খানি বেখে অনুনযেব ভঙ্গিতে আমাব দিকে তাকাল।

—"না বোন, কি কবে শুনব? কোথা থেকে শুনব? ভাবছি কি বকম আবামেব অভাব আব অস্বাচ্ছন্দ্যেব মধ্যে আমাদেব জর্জেব দিনগুলি এখন কাটছে। ঘবেব মধ্যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডাব পবশ পেযে আমাব জর্জেব কথা মনে পডে গেল।"

হ্যাবি ততক্ষণে জানালাব পাশ থেকে সবে এসেছিল। আমাব কথা শুনে অবাক হযে সে বলল, "ঠাণ্ডা! কোথায ঠাণ্ডা! কি সব এলোমেলো কথা বলছ তুমি? এমন এক চমৎকাব সন্ধ্যায তুমি ঠাণ্ডাব পবশ পেলে কোথা থেকে? যদি পেযে থাকো তবে তুমি নিশ্চযই কম্পজ্ববেব কবলে পডেছিলে।"

আমি বললাম, "মাত্র দু' এক মিনিট আগেই আমি আব লিটি দু'জনেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বোধ কবেছিলাম। সেই কনকনে ঠাণ্ডায শবীবেব হাডগুলি পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। তুমি কি প্রচণ্ড ঠাণ্ডাটা বোধ কবোনি, হ্যাবি?"

— "মোটেই না, একটুও না," হ্যাবি উত্তব দিল।

আমি আবিশ্বাসীব দৃষ্টিতে তাকালাম ভাইযেব দিকে। হ্যাবি বলতে লাগল, "আমাব শবীবেব চাব ভাগেব তিন ভাগই জানালাব বাইবে ছিল, কাজেই ঘবেব আব কেউ যদি হিমেব পবশ পেযে থাকে, তবে আমিও নিশ্চযই পেতাম।"

এ তো বড আশ্চর্য ব্যাপাব! সেই অদ্ভুত শৈত্যটা কেবল ঘবেব মধ্যেই অনুভূত হলো? না, এটা নৈশ বাতাস নয। এ হলো এক অতিপ্রাকৃত দীর্ঘশ্বাস। মনে হলো একটু আগে আমি জর্জেব ছবিতে যে ভযাল ভৌতিক মুখখানা দেখেছি তাব সঙ্গে যেন সেই আকস্মিক শৈত্যেব একটা সম্পর্ক বযেছে। সেই শৈত্য হলো হিমশীতল মেরু অঞ্চলেব। আব সেই ভযাবহ নবকবোটি তাহলেও উত্তব মেরু অঞ্চলেবই এক হিমেল অপচ্ছাযা!

কিন্তু মুহূর্তেব জন্য হলেও এবকম অদ্ভুত ঠাণ্ডা বোধ কবলাম কেন? কেন জর্জেব মাথাব জাযগায দেখলাম নবকবোটি?

—"হ্যাবি, আজ মাসেব কত তাবিখ?" আমি ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস কবলাম।

"আজ মনে হয তেত্রিশ তাবিখ" হ্যাবি উত্তব দিল। তাবপব আমি যে কাগজখানা

একটু আগে পড়ছিলাম সেখানা তুলে নিয়ে সে বলল, "হ্যাঁ, এই যে, আজ মঙ্গলবার তেইশে ফেব্রুয়ারি, অবশ্য তোমার এই 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকা যদি সত্যি তারিখ দিয়ে থাকে। আমার ধারণা পত্রিকা সঠিক তারিখই ছেপেছে। খবরের কাগজগুলি 'আর্ট' সম্পর্কে যে কথাই বলুক না কেন, তারিখের ক্ষেত্রে কখনও ভুল বলে না।"

সংবাদপত্র সম্পর্কে হ্যারির ক্ষোভের কারণও আছে। এই তো মাত্র ক'দিন আগে একখানা প্রভাতী সংবাদপত্রের একজন চিত্রসমালোচক হ্যারির একখানা ছবি সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেছিল; হ্যারি মনে করে সেই সমালোচক চিত্রশিল্প সম্পর্কে কিছুই বোঝে না। এজন্য হ্যারি সাধারণভাবে সাংবাদিকতা ব্যাপারটার উপরেই একটু ক্রুদ্ধ হয়ে রয়েছে।

একটু পরেই লিটি সে ঘর থেকে চলে গেল। আমি তখন হ্যারিকে একটু আগে যা অনুভব করেছিলাম—যা দেখেছিলাম তার কথা বললাম।

শুনে হ্যারি কিছু বলবার আগেই আমি বললাম, "শোনো, আজকের তারিখটা টুকে রাখো, আমার মনে একটা আশঙ্কা মনে হচ্ছে জর্জের জীবনে একটা বিরাট দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে। উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। আমি ভয় পাচ্ছি। মনে হচ্ছে একটা বিরাট দুর্ভাগ্য—একটা মহা বিপদ যেন নেমে এসেছে বেচারা জর্জের মাথার উপরে। সাবধান, আমার আশঙ্কার কথাটা কিন্তু লিটির কাছে প্রকাশ কোর না। শুনলে বেচারী একেবারে ঘাবড়ে যাবে।"

হ্যারি বলল, "আমাব 'পকেট-বুক'-এ আমি আজকের তারিখটা নিশ্চযই টুকে রাখব। তবে আমার ধারণা কি জান? আমার ধারণা একটু সময়ের জন্য হলেও তুমি আর লিটি কল্পজ্বরের কবলে পড়েছিলে। পাকস্থলীব দুর্বলতা অথবা অলীক কল্পনা তোমাদের বিভ্রান্ত করেছিল---ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল। তুমি নিশ্চয়ই জান যে পাকস্থলী দুর্বল হলেই অলীক কল্পনার সৃষ্টি হয। ও দুটো আসলে একই জিনিস। পাকস্থলীব অবস্থা খারাপ থাকলেই লোকে ভুল বোধ কবে, অবাস্তব জিনিস দেখে। তাছাড়া ছবিখানা সম্পর্কে এটুকু বলতে পাবি যে ওটার মধ্যে কিছু নেই। অবশ্য একটা করোটি ওখানে নিশ্চযই রযেছে। কবি টেনিসন বলেছেন:

"কোন মুখ, যতই পূর্ণ হোক না কেন
তার উপর যতই মাংস আর চর্মের আবরণ থাকুক না কেন,
তা গড়ে উঠেছে একটা করোটির উপরে।"

একটু থেমে ভাই বলতে লাগল, "হ্যাঁ, করোটি অবশ্যই রয়েছে। একটি দেহকে যতই সুন্দর সাজে সাজানো হোক না কেন, পোশাকের নিচে তার নগ্ন অস্তিত্ব থাকবেই। তুমি কি ভাবছ ছবিখানা কেবল কতোগুলি রঙের প্রলেপ? মোটেই না দাদা, মোটেই তা নয়। শিল্পকর্ম বেঁচে থাকে, স্যার। তোমার নিজের মাথার মতোই ঐ ছবির মাথা বাস্তব। তোমার মাথায যেমন মাংসপেশী এবং অস্থি রয়েছে, ঐ ছবির মাথাতেও তেমনি সে সব রয়েছে। এখানেই হলো প্রকৃত শিল্পকর্ম আর বাজে বস্তু বা আবর্জনার মধ্যে পার্থক্য। ছবি তো অনেকেই আঁকে, কিন্তু সব ছবিকেই কি শিল্পকর্ম বলা যায়?

অনেক ছবিই তো নিছক আবর্জনা মাত্র। চিত্রশিল্পী আর চিত্রকর, এই শব্দ দুটি কি সমার্থক?”

চিত্রশিল্প সম্পর্কে হ্যারির প্রিয় মতবাদ হলো এই রকম। সে এখনও স্বপ্নবিলাসীর স্তর থেকে প্রকৃত সুদক্ষ শিল্পীর স্তরে উঠতে পারেনি। যাই হোক, আমি আর হ্যারির সঙ্গে তর্ক করতে চাইছিলাম না। আমাদের দু'জনের 'পকেট বুক'-এ তারিখটা লিখে নেবার পর আমি আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গটাকে পাল্টে ফেললাম।

লিটি উপর থেকে খবর পাঠাল যে, তার শরীরটা ভাল লাগছে না, সে শোবার জন্য নিজের ঘরে চলে যাচ্ছে।

তক্ষুণি আমার স্ত্রী নিচে নেমে এলেন। বললেন, “ব্যাপার কি? কি হয়েছে? এতক্ষণ আমি বাচ্চাদের সঙ্গে উপরে ছিলাম। তারপর লিটির শরীর খারাপ লাগছে শুনে তাকে দেখবার জন্য তার শোবার ঘরে গিয়েছিলাম।”

—“লিটি কেমন আছে?” আমি প্রশ্ন করলাম।

—“ওকে একটু দুর্বল মনে হচ্ছে। বেচারীর মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় এ ঘরের ঐ জানালাটা খুলে রাখাটা বোধ হয় বিচক্ষণতার কাজ নয়। জানি, সন্ধ্যার দিকটায় বেশ গরম থাকে, কিন্তু রাতের বাতাসটা তো মাঝে মাঝেই বেশ ঠাণ্ডা। যাই হোক, লিটিকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর খুব ঠাণ্ডা লেগেছে। ও খুব কাঁপছে। ঐ জানালাটা খোলা ছিল। সে জন্যই ঠাণ্ডা লেগেছে মেয়েটার।”

আমি আর লিটি যে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শৈত্য অনুভব করেছিলাম, এ কথাটা ছাড়া তখনকার মতো আমার স্ত্রীকে আর কিছু বললাম না, আমি আর কোন ব্যাখ্যার মধ্যে যেতে চাইছিলাম না, কেননা হ্যারি তখনও আমার দিকে তাকিয়েছিল। ভাবলাম আমার ব্যাখ্যা শুনলে হ্যারি হয়তো আমাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করে উপহাসের হাসি হাসবে।

শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে সব কথা না বলে কিন্তু পারলাম না। রাতে নিজেদের ঘরে এসে আমি কি অনুভব করেছিলাম, কি দেখেছিলাম এবং কি আশঙ্কা করছি, তা সব খুলে বললাম স্ত্রীকে। সব শুনে আমার স্ত্রী ঘাবড়ে গিয়ে এতটা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন যে, আমার মনে হলো কথাগুলি ওকে না বললেই ভাল হোত।

পরদিন সকালে লিটিকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ বলে মনে হলো। আমি বা লিটি, কেউই আগের রাতের ঘটনার কোন উল্লেখই করলাম না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো আমরা দু'জনেই যেন ঘটনাটা ভুলে গিয়েছি।

কিন্তু সেদিন থেকেই আমি মনে মনে শঙ্কাতুর হয়ে উঠলাম। আমার আশঙ্কা হলো যে কোন মুহূর্তে একটা দুঃসংবাদ আসতে পারে। শেষ পর্যন্ত দুঃসংবাদটা সত্যি সত্যিই এসে গেল। আমি কিন্তু এরকম একটা খবর পেয়ে চমকে উঠিনি। কেননা আমার মনে হয়েছিল যে, এরকম একটা দুঃসংবাদ আসবেই। এরকম একটা খারাপ খবরের জন্য আমি যেন মনে মনে তৈরি হয়েই ছিলাম।

একদিন সকালে প্রাতরাশের জন্য তৈরি হয়ে শোবার ঘর থেকে বেরোবার উপক্রম করছিলাম, এমন সময় দরজায় টোকা মেরে হ্যারি ঘরের ভিতরে এল। এত সকালে তার সঙ্গে আমার কোন দিন দেখা হয় না। কেননা সকাল বেলাটা সে সাধারণত তার 'স্টুডিও'-তেই কাটায়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়ে যায়।

হ্যারিকে খুবই বিবর্ণ—খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, "লিটি বোধ হয় এখনও নিচে নামেনি? নেমেছে কি?"

আমি কোন উত্তর দেবার আগেই সে আবার প্রশ্ন করল, "তুমি কোন্ খবরের কাগজ নাও?"

—"দি ডেইলি নিউজ", আমি উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু কেন?"

হ্যারি আবার প্রশ্ন করল, "লিটি নিচে নামেনি তো?"

—"না," আমি উত্তর দিলাম।

—"ভগবানকে ধন্যবাদ! পড়ে দেখ!"

হ্যারি পকেট থেকে একখানা খবরের কাগজ বের করে আমার হাতে দিল।

আমি কাগজখানা মেলে ধরতেই সে আঙুল দিয়ে একটা 'কলম'-এর নিচে একটা ছোট অনুচ্ছেদ আমাকে দেখিয়ে দিল।

জানতাম কাগজে কি সংবাদ রয়েছে। এক্ষুণি খবরের কাগজ থেকে জানতে পারব লিটির চরম দুর্ভাগ্যের কথা।

অনুচ্ছেদটির শিরোনাম হলো:

"মারাত্মক দুর্ঘটনার কবলে 'পাইওনীয়ার' নামক এক অভিযাত্রী জাহাজের একজন 'অফিসার'!

শিরোনামের নিচে সংবাদে বলা হয়েছে:

"নৌদপ্তরে প্রাপ্ত এক সংবাদ থেকে জানা গিয়েছে যে, 'পাইওনীয়ার' জাহাজের অভিযাত্রীরা পূর্ববর্তী উত্তর মেরু অভিযানের নাবিকদের খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু নিখোঁজ নাবিকদের কিছু চিহ্ন তারা খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু রসদপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব দেখা দেওয়ায় 'পাইওনীয়ার'-এর নাবিকেরা ঐ সব চিহ্ন অনুসরণ না করেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। 'পাইওনীয়ার' জাহাজের 'কমান্ডার' নৌ-ঘাঁটিতে এসে রসদ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করলেন। জাহাজখানার একটু-আধটু মেরামতিরও প্রয়োজন ছিল। এসব কাজ শেষ হলে 'কমান্ডার' জাহাজখানা যেখান থেকে ফিরে এসেছিল আবার সেখানে ফিরে গিয়ে নিখোঁজ নাবিকদের চিহ্ন ধরে এগিয়ে যাবার জন্য খুবই ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এই রকম সময়ে দুর্ঘটনার ফলে তিনি হারালেন একজন সুদক্ষ 'অফিসার'-কে। এই অফিসারটির নাম হলো লেফ্‌টেন্যান্ট জর্জ ম্যাসন। লেঃ ম্যাসন ছিলেন জাহাজের সম্ভাবনাপূর্ণ পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে একজন। জাহাজ থেকে নেমে জাহাজের 'সার্জন'-এর সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিলেন তিনি। দু'জনে উঠেছিলেন সমুদ্রে ভাসমান এক বিশাল হিমশৈলের উপরে। শিকার

করবার সময় তিনি হঠাৎ পা পিছলে অতি দ্রুতবেগে নিচে পড়ে যান। পড়বার সময় তাঁর মাথার দিকটা ছিল নিচের দিকে। সুমধুর আচার-ব্যবহারের জন্য তিনি তাঁর জাহাজের সব নাবিকের কাছেই একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁর আকস্মিক অকালমৃত্যুতে 'পাইওনীয়ার' জাহাজের ছোট অভিযাত্রীদল গভীর বিষন্নতায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।"

'দি ডেইলি নিউজ' কাগজখানার উপরে দ্রুত চোখ বোলাতে বোলাতে হ্যারি বলল, "সংবাদটা কি এ কাগজখানায় বেরোয়নি ?"

আমি হ্যারির আনা সংবাদপত্রখানায় প্রকাশিত সংবাদটা আর একবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছিলাম।

হ্যারি বলতে লাগল, "আজ না বেরোলেও দু'-এক দিনের মধ্যে এ সংবাদটা নিশ্চয়ই 'দি ডেইলি নিউজ' কাগজে বেরোবে। দাদা, তোমাকে কিন্তু কয়েকটা দিন খুবই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এ কাগজে জর্জের মৃত্যুসংবাদটা প্রকাশিত হলে তা যাতে লিটির নজরে না পড়ে সেদিকে তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।"

আমরা একে অন্যের দিকে তাকালাম। আমাদের দু'জনের চোখেই জল. বেচারা জর্জ! বেচারী লিটি!

আমরা দু'জনেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম। আমি বললাম, "কিন্তু লিটিকে তো কোন না কোন সময় খবরটা জানাতেই হবে।"

হ্যারি বলল, "হ্যাঁ, তা তো জানাতেই হবে। কিন্তু কাগজ থেকে হঠাৎ যদি লিটি দুঃসংবাদটা জানতে পারে তবে ও মরেই যাবে। তোমার স্ত্রী কোথায় ?"

--"সে বাচ্চাদের নিয়ে উপরে রয়েছে," আমি উত্তর দিলাম।

— "বৌদিকে খবরটা জানানো দরকার। তিনিই ধীরে সুস্থে লিটিকে খবরটা জানাতে পারবেন।"

স্ত্রীকে ডেকে পাঠালাম। দুঃসংবাদটা জানালাম তাঁকে।

নিজের আবেগটাকে লুকোবার জন্য আমার স্ত্রীকে তাঁর মনের সঙ্গে বেশ লড়াই করতে হলো। জর্জ ম্যাসন তো তাঁরই সম্পর্কিত ভাই। ভাই-বোনের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাবও ছিল। কিন্তু লিটির কথা ভেবেই আমার স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়লেন না। কিন্তু তার দু'চোখ থেকে নেমে এল অশ্রুধারা।

— "ওকে এই দুঃসংবাদটা দেবার সাহস পাব কোথা থেকে ?" আমার স্ত্রী যেন নিজেকেই এই প্রশ্নটা করলেন।

হঠাৎ বৌদির একখানা বাহু ধরে দরজার দিকে তাকিয়ে হ্যারি বলল, "চুপ!"

আমিও দরজার দিকে ঘুরে তাকালাম। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে লিটি। তার মুখখানা মৃতের মুখের মতোই বিবর্ণ—পাণ্ডুর। লিটির ওষ্ঠ এবং অধর ফাঁক হয়ে গিয়েছে, ও অন্ধের মতো তাকিয়ে--যেন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে ও। বলতে পারব না আমাদের কথা লিটি কতটা শুনেছে। কিন্তু ওকে দেখে মনে হলো দুঃসংবাদটা ও নিশ্চয়ই শুনে ফেলেছে। আমরা লাফিয়ে উঠে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু

লিটি হাত নেড়ে আমাদের সরে যেতে বলল। তারপর একটি কথাও না বলে ঘুরে উপর তলায়—নিজের ঘরে চলে গেল।

ওর ভাবভঙ্গি দেখে আমার স্ত্রী ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে লিটির ঘরের দিকে চললেন। ঘরে গিয়ে দেখলেন লিটি হাঁটু মুড়ে বিছানার পাশে বসে রয়েছে, তার মাথাটা বিছানার উপরে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে মেয়েটা।

একটুও দেরি না করে তক্ষুণি ডাক্তার ডাকলাম। ডাক্তার ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্য ওষুধ-পত্তর দিলেন। লিটির জ্ঞান ফিরল। কিন্তু যে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত সে পেয়েছিল তাতে কয়েক সপ্তাহ ধরে খুবই অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে বিছানায় পড়ে রইল আমাব ছোট বোন।

প্রায় এক মাস পরে লিটি নিচে নামবার মতো সুস্থ হয়ে উঠল। এই সময় একদিন কাগজ থেকে সংবাদ পেলাম যে, 'পাইওনীয়ার' জাহাজ ফিরে এসেছে। এই সংবাদটা আমাদের কারও মনে কোন ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করতে পারবে না বলে আমি খবরটা কাউকে বললাম না। 'পাইওনীয়ার' জাহাজের নাম উল্লেখ করলেই হয়তো লিটি মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করত।

কয়েকদিন কেটে গেল। একদিন বিকেলে আমি বসে একখানা চিঠি লিখছিলাম। এমন সময় সদর দরজায় খুব জোরে একটা শব্দ হলো। লেখা থেকে চোখ তুলে আমি তাকালাম। একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। কে যেন জানতে চাইছে আমি বাড়িতে আছি কি না। কণ্ঠস্বরটা খুবই অদ্ভুত মনে হলো। কিন্তু এ কণ্ঠস্বর তো আমাব একেবারে অপরিচিত নয়।

হতবুদ্ধি হয়ে উপরের দিকে তাকালাম। নিজের মনেই প্রশ্ন জাগল, এ কার কণ্ঠস্বর? আকস্মিকভাবেই আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল-হতভাগ্য জর্জের ছবিখানার উপরে। এ কি দেখছি আমি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি, না জেগে আছি?

আগেই বলেছি ছবিতে জর্জের একখানা হাত ছিল তলোয়ারের উপরে। এখন পরিষ্কাবভাবে—স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম জর্জ সেই হাতখানাব তর্জনী তুলে ধরেছে। জর্জ ম্যাসন যেন আঙুল তুলে সাবধান করছে আমাকে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জর্জের ছবিখানার দিকে তাকালাম। আমি কি ভুল দেখছি? না, মোটেই ভুল দেখছি না। এ আমার আচ্ছন্ন মনের কল্পনা নয়। স্পষ্টভাবে—পরিষ্কারভাবেই আমি দেখলাম জর্জের ছবিব মুখমণ্ডল বিবর্ণ—পাণ্ডুব। আর সেই বিবর্ণ মুখমণ্ডলে দুটি বড বড তরল ফোঁটা। ফোটা দুটি রক্ত না হলেও রক্তেরই মতো লাল।

আমি ছবিখানার কাছে গেলাম। ভেবেছিলাম করোটির মতো লাল ফোঁটা দুটিও অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু না, তা গেল না। বরং একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল, আমার চোখের সামনেই জর্জের তুলে ধরা তর্জনীটা পাল্টে গিয়ে একটা ছোট সাদা মথে রূপান্তরিত হয়ে গেল! 'মথ'-টা বসে ছিল ছবির 'ক্যানভাস'-এর উপরে। কিন্তু ঐ রক্ত-রাঙা তরল বিন্দু দুটি যে কি তা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। শুধু এটুকুই বুঝলাম যে, তরল বিন্দু দুটি রক্ত-রাঙা হলেও রক্ত নয়।

মনে হচ্ছিল মথটা যেন অসাড়--অবশ হয়ে রয়েছে। আমি ছবির উপর থেকে তুলে নিয়ে মথটাকে অগ্নিকুণ্ডের উপরকার তাকটার উপরে একটা উপুড় করা মদের গ্লাসের নিচে রেখে দিলাম। বর্ণনা করতে যতটা সময় লাগল তার চাইতে কম সময়েই কাজটা করে ফেললাম। তাকটার কাছ থেকে ফিরে আসতেই পরিচারিকা একখানা 'কার্ড' নিয়ে এসে বলল, "একজন ভদ্রলোক হলঘরে অপেক্ষা করছেন, তিনি জানতে চাইছেন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব কি না।"

কার্ডখানা হাতে নিয়ে দেখলাম সেখানে লেখা রয়েছে "অনুসন্ধানকারী জাহাজ পাইওনীয়ারের ভিনসেন্ট গ্রীভ"। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ভাগ্যিস লিটি এখন বাড়িতে নেই! মনে মনে এই কথা বলে পরিচারিকাটিকে বললাম, "যাও ভদ্রলোককে এইখানে নিয়ে এস।"

পারচারিকা চলে যাচ্ছিল।

আমি তাকে ডেকে বললাম, "শোনো জেন, তোমার কর্ত্রীঠাকরুণ আর মিস লিটি যদি ভদ্রলোক বিদায় নেবার আগেই আসেন, তবে তাদের বলবে যে, আমি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব জরুরী কথাবার্তা বলছি। এসময় ওদের কেউই যেন এ ঘরে না আসে।" জেন চলে গেল। আমিও গ্রীভের সঙ্গে দেখা করবার জন্য দরজার কাছে গেলাম। দরজার চৌকাঠ পেরোলো গ্রীভ। কিন্তু জর্জের ছবিখানার উপরে চোখ পড়বার আগেই সে থেমে গেল। হঠাৎ কাঁপতে শুরু করল গ্রীভ। তার সমস্ত শরীর —এমনকি পাতলা ওষ্ঠ এবং অধর পর্যন্ত সাদা হয়ে গেল।

নিচু গলায় সে তাড়াতাড়ি বলল, "আমি ভিতরে যাবার আগে দয়া করে ঐ ছবিখানাকে ঢেকে দিন। আমার উপরে এই ছবিখানার প্রভাবের কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। বেচারা ম্যাসনের স্মৃতি তো আমার মনের পটে জ্বল জ্বল করছে। এখন ঐ ছবিখানা আমি মোটেই সহ্য করতে পারব না। আমার উপরে ঐ ছবির প্রভাব এখন মারাত্মক হয়ে উঠবে। দয়া করে ছবিখানাকে ঢেকে দিন।"

গ্রীভের অনুভূতিটাকে আমি এবার আগের চাইতে ভালভাবে বুঝতে পারলাম। আমি নিজেও জর্জের ছবিখানার দিকে তাকিয়ে কয়েকবার ভয় পেয়েছি। জানালার কাছে একখানা ছোট গোল টেবিল ছিল। আমি টেবিলখানার কাপড়ের ঢাকাটা তুলে নিয়ে কাপড়খানাকে জর্জের ছবির উপরে ঝুলিয়ে দিলাম। জর্জের ছবিখানা ঢাকা পড়ে গেল।

তারপর ভিনসেন্ট গ্রীভ ঢুকল ঘরের ভিতরে। কি পরিবর্তন হয়েছে তার চেহারার! সে আগের চাইতে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে। তার রঙটা হয়ে গিয়েছে আরও পাণ্ডুর। গ্রীভের চোখ দুটো কোটরের ভিতরে ঢুকে গিয়েছে। গাল দুটো গিয়েছে ভেঙে। শরীরটা একেবারে বেঁকে কুঁজো হয়ে গিয়েছে। গ্রীভের দু'চোখে আর আগের মতো ধূর্ত দৃষ্টি নেই। সে চোখ দুটি এখন শঙ্কাবিহ্বল। দেখে মনে হয় সে যেন একটা তাড়া খাওয়া পশু। দেখলাম যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই গ্রীভ নিজের এপাশে ওপাশে তাকাচ্ছে। সে যেন নিজের পিছনে কারো উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে।

লোকটাকে আমি কোন দিনই পছন্দ করতে পারিনি। কিন্তু এখন যেন তাকে দেখে আমি দারুণ ঘৃণা বোধ করলাম। গ্রীভের অনুরোধে জর্জের ছবিটা ঢাকার কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলে তার সঙ্গে আমার করমর্দন করা হয়নি। করমর্দন না করার জন্য আমি মনে মনে বেশ খুশিই হলাম।

গ্রীভকে আমি কিছুতেই উষ্ণ অভ্যর্থনা করতে পারব না। আমার কথাবার্তা হবে একেবারেই নিরুত্তাপ। সৌজন্যের খাতিরে আমাকে কয়েকটা মামুলী কথা বলতেই হবে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও বলব না আমি।

গ্রীভের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, "আপনার সঙ্গে আবাব দেখা হওয়ায় আমি খুশি হয়েছি। কিন্তু আপনি এ বাড়িতে না আসলেই আমি আরও খুশি হব। হতভাগ্য জর্জের মৃত্যুর বিবরণটা জানতে আমি আগ্রহী, কিন্তু আমার বোনের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি আমি আপনাকে দিতে পারব না। আমার বোনও নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না।"

তারপর যতদূর সম্ভব ভদ্রভাষায় আমি গ্রীভকে স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, শেষ যেদিন সে আমাদের বাড়িতে এসেছিল সেদিন সে আমার বোনের সঙ্গে অভদ্র---অমার্জিত আচরণ করেছিল। তার আচবণ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার সেই অশালীন ব্যবহারের জন্য তাকে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।

নীরবে আমাব কথাগুলি শুনে গেল গ্রীভ। আমি বললাম, "দয়া করে এ বাড়িতে আর আপনি আসবেন না।"

উত্তবে কোন কথা না বলে গ্রীভ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তাকে খুবই দুর্বল দেখাচ্ছিল। কাজেই বাধ্য হয়েই বললাম, "আপনি একপাত্র বলকাবক মদ্যপান করুন, তাতে আপনার দুর্বলতা অনেকটা কেটে যাবে।"

আনন্দের সঙ্গেই গ্রীভ পান করতে রাজী হয়ে গেল। বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ। অশেষ ধন্যবাদ।"

আমি শেরি আর বিস্কুট নিয়ে এসে টেবিলের উপরে রাখলাম। টেবিলের এক পাশে গ্রীভ আর অন্যপাশে আমি। পানপাত্রটা নিয়ে সে লোভীব মতোই মদ্যপান করল।

হতভাগ্য জর্জের মৃত্যু ঠিক কিভাবে হয়েছিল তাব বিবরণ কিন্তু খুব সহজে গ্রীভের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। প্রথমে সে এ সম্পর্কে আমার প্রশ্নগুলিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই করতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুর্ঘটনার বিবরণটা দিল।

গ্রীভ বলল, "তুষারময় উত্তর মেরু অঞ্চলে একটা শ্বেত ভল্লুককে দেখতে পেয়ে আমি আর জর্জ সেটাকে শিকার করবার জন্য আমাদেব জাহাজ থেকে নেমে এলাম। ভল্লুকটা ছিল উপকূলের কাছে একটা হিমশৈলের উপবে। হিমশৈলের উপরের দিকটা ছিল একটা বাড়ির ছাদের মতো। সেই ছাদ ঢালু হয়ে গিয়ে মিশেছে মাথার উপরে বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলন্ত একটা খাড়াই তুষারময় বিরাট শৈলের একটা অংশের

প্রান্তসীমায়। ভল্লুকটার কাছাকাছি পৌঁছবার জন্য আমি আর জর্জ হামাগুড়ি দিয়ে সেই বিপজ্জনক শৈলশিরা ধরে এগিয়ে চললাম।

"জর্জ একটু অসতর্ক ভাবেই দুঃসাহসীর মতো শৈলশিরার ঢালু দিকটায় গিয়ে পড়ল, আমি চিৎকার করে ওকে ডাকলাম। বার বার বললাম, ফিরে এস—ফিরে এস—ঐ বিপজ্জনক পথে আর এগিও না—এগিও না...'। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। হিমশৈলের উপরিতলটা ছিল কাচের মতোই মসৃণ এবং পিচ্ছিল। জর্জ ফিরে আসবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সে পা পিছলে পড়ে গেল। তারপর শুরু হলো সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা। ধীরে ধীরে কিন্তু প্রতি মুহূর্তে দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে জর্জ গড়িয়ে গড়িয়ে শৈলশিরার কিনারার দিকে এগিয়ে চলল!"

গ্রীভ বলতে লাগল, "সেই মসৃণ, পিচ্ছিল হিমশৈলে বা শৈলশিরায় আঁকড়ে ধরবার মতো কিছুই ছিল না। যদি হিমশৈলের উপরিভাগে কোন অনিয়মিত উদগত কিছু থাকত তবে জর্জের দেহটা সেখানে আটকে যেতে পারত। তাহলে সে হয়তো প্রাণে বেঁচে যেত। কিন্তু না, সে রকম কিছুই ছিল না সেখানে। আমি আমার কোটটা ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি সেটাকে আমার বন্দুকের কুঁদোর সঙ্গে বেঁধে ফেললাম, তারপর সেটাকে এগিয়ে দিলাম জর্জের দিকে। কিন্তু জর্জ ততক্ষণে আমার কাছ থেকে এত দূরে সরে গিয়েছিল যে সেটা জর্জের কাছ পর্যন্ত পৌঁছলো না। আমি তারপর আমার গলায় বাঁধবার বড় রুমালখানাকে কোটের সঙ্গে বেঁধে জিনিসটাকে আরও লম্বা করে জর্জের দিকে বাড়িয়ে ধরবার জন্য চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! জর্জের দেহটা ততক্ষণে পিচ্ছিল ঢালু পথে গড়িয়ে আরও অনেক দূরে চলে গিয়েছে।"

"নিদারুণ আতঙ্কে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, কিন্তু আমার সেই আর্তনাদ শুনবার মতো কেউই ছিল না আশেপাশে। জর্জও বুঝতে পেরেছিল তার নিয়তিকে। সে বুঝতে পেরেছিল এক্ষুণি কি ঘটতে যাচ্ছে। গড়িয়ে নিচে পড়তে পড়তে সে চিৎকার করে আপনাদের এবং আপনার বোনের কাছে তার শেষ বিদায়বার্তা পৌঁছে দিতে বলল!"

এই পর্যন্ত বলবার পর গ্রীভের কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকবার পর সে বলল, "সব শেষ হয়ে গেল! এক মুহূর্তের জন্য জর্জ সহজাত আত্মরক্ষার তাগিদেই হিমশৈলের পিচ্ছিল, মসৃণ কিনারাটা চেপে ধরল। তারপর...তারপর আর তাকে দেখা গেল না। জর্জ চলে গেল---আমার চোখের সামনেই চলে গেল আমার প্রিয় বন্ধু জর্জ ম্যাসন!"

শেষ কথাক'টি বলবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীভের চোয়ালটা ঝুলে পড়ল। তার অক্ষিগোলক দুটো যেন বড় হয়ে কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠল গ্রীভ। আঙুল তুলে আমার পিছনে কি যেন দেখাল। তারপর হাত দু'খানাকে ছড়িয়ে দিয়ে একটা বুকফাটা আর্তনাদ করে সে ঘরের মেঝেতে পড়ে গেল, মনে

হলো তাকে বোধ হয় কেউ গুলি করেছে। বুঝলাম মৃগী রোগের কবলে পড়েছে গ্রীভ।

তাড়াতাড়ি তাকে মেঝে থেকে তুলতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি পিছন দিকে তাকালাম। দেখলাম জর্জের ছবিটা যে কাপড়খানা দিয়ে ঢাকা ছিল, সেই কাপড়খানা খসে পড়ে গিয়েছে। জর্জের মুখখানা আগের চাইতে বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ছবির মুখে লাল লাল ছোপ। এই লাল ছোপগুলির জন্যই মুখের ছোপহীন অংশগুলিকে আরও বেশি বিবর্ণ দেখাচ্ছে। জর্জের ছবির চোখ দুটো যেন কঠোর—কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে মেঝেতে পড়ে থাকা গ্রীভের দিকে।

ডাকঘণ্টি বাজালাম, সৌভাগ্যক্রমে হ্যারি বাড়িতে ফিরে এসেছিল। চাকরটি ঘরে ঢুকতে বললাম, "তুমি এক্ষুণি হ্যারিকে আসতে বল।"

চাকরের কাছ থেকে খবর পেয়ে হ্যারি ছুটে এল। অচেতন গ্রীভের চেতনা ফিরিয়ে আনবার কাজে সে আমাকে সাহায্য করল। ইতিমধ্যে আমি অবশ্য জর্জের ছবিখানাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম।

গ্রীভের জ্ঞান ফিরল। একটু সুস্থ হয়ে উঠবার পর সে বলল, "ইস্, আপনাদের কি বিব্রতই না করলাম! আমি মাঝে মাঝেই এরকম মূর্ছিত হয়ে পড়ি। আমি খুবই দুঃখিত—খুবই লজ্জিত।"

আমি বললাম, "আপনাব দুঃখ পাবার বা লজ্জা পাবার কোন কারণই নেই। মানুষ তো হঠাৎ অসুস্থ হয়েই পড়তে পারে। অসুস্থ মানুষকে সেবা করা তো মানুষেরই কর্তব্য।"

হঠাৎ গ্রীভ উৎকণ্ঠিতভাবে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল, "আচ্ছা অজ্ঞান অবস্থায় আমি কি কোন অস্বাভাবিক কথা বলেছি?"

আমি বললাম, "কই সেরকম কিছু তো বলেননি আপনি। আর বললেও তা আমি শুনতে পাইনি।"

আমার উত্তর শুনে গ্রীভ যেন আশ্বস্ত হলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। তারপর দুর্বল কণ্ঠে বলল, "আপনাদের বিব্রত করবার জন্য ক্ষমা চাইছি। খুব দুর্বলতাবোধ করছি। একটু বিশ্রাম করলেই সুস্থ হয়ে উঠব, আর সুস্থ হলেই চলে যাব এখান থেকে।"

এ কথা বলতে বলতেই তার মাথাটা ঝুঁকে পড়ল অগ্নিকুণ্ডের উপরকার তাকটার দিকে। সাদা মথটার দিকে চোখ পড়ল তার।

"তাহলে আমার আগেই 'পাইওনীয়ার' জাহাজ থেকে কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?" বেশ ঘাবড়ে গিয়েই গ্রীভ প্রশ্ন করল।

—"না, 'পাইওনীয়ার' থেকে আপনার আগে তো কেউ আসেনি। আপনি একথা ভাবলেন কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"এই মথটাকে দেখে ভাবলাম। এরকমের ছোট সাদা মথ তো এই দক্ষিণ অক্ষাংশে

দেখা যায় না। এগুলি দেখা যায় উত্তর অক্ষাংশে—মেরুবৃত্তের কাছাকাছি অঞ্চলে। সেখানে এই সাদা মথগুলিই হলো জীবনের শেষ চিহ্ন। এটাকে কোথা থেকে পেলেন?" গ্রীভ প্রশ্ন করল।

—"এটাকে পেলাম এখানেই—এই ঘরের মধ্যেই," আমি উত্তর দিলাম।

—"কি আশ্চর্য! আমি তো এরকম কথা আগে কখনও শুনিনি। এরপর রক্তবর্ষণের কথা শুনলেও আমি মোটেই অবাক হব না," গ্রীভ কেমন যেন ভীরু গলায় বলল।

আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, "এ কথার অর্থ? আপনি ঠিক কি বলতে চাইছেন?"

গ্রীভ বলল, "বিশেষ বিশেষ ঋতুতে এই সাদা মথগুলির দেহ থেকে ফোঁটা ফোঁটা লাল রঙের তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে। কখনো কখনো এত লাল রঙের ফোঁটা ঝরে যে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা মনে করে যে, রক্ত-বৃষ্টি হচ্ছে। মেরু অঞ্চলে সাদা বরফের উপরে আমি এই ফোঁটার দাগ দেখেছি। মথটাকে যত্ন করে রাখবেন। উত্তরে অনেক দেখা গেলেও দক্ষিণে এটা একটা বিরল পতঙ্গ।"

একটু পরেই গ্রীভ চলে গেল। দেখা গেল মদের গ্লাসের তলায় মার্বেল পাথবের টেবিলের উপরে এক ফোঁটা লাল রঙের তরল পদার্থ রয়েছে। জর্জের ছবির উপরকার রক্তিম দাগগুলির কারণ এবার বুঝতে পারলাম। কিন্তু একটা প্রশ্ন, মথটা এখানে এল কি করে? ওটা তো অগ্নিকুণ্ডের উপরকার তাকের উপরে একটা উপুড় করা গ্লাসের নিচে রেখে দিয়েছি! তাহলে?

গ্রীভকে কেন্দ্র কবে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছিলাম। অবশ্য ঘরের ভিতরকার আলোয আমি তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম ওটা হয আলো-ছাযার কারসাজি, নযতো আমার চোখেব ভুল।

খোলা জানালা পথে দেখলাম গ্রীভ মাথা নিচু কবে রাস্তা দিযে হেঁটে যাচ্ছে। দেখে চমকে উঠলাম। আরে, আলোকিত বাস্তাযও সেই একই অদ্ভুত ব্যাপার! না, কোন ভুল নেই। নিজেব চোখ দুটোকে পর্যন্ত আমি বিশ্বাস কবতে পাবছিলাম না। এ ও কি সম্ভব?

হ্যাবিকে ডাকলাম, সে এল।

আমি বললাম, "ঐ জানালার কাছে যাও। দেখো, গ্রীভ যাচ্ছে। আচ্ছা, হ্যাবি, তুমি তো একজন শিল্পী, বল ঐ লোকটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু কি তুমি দেখতে পাচ্ছ?"

—"না, অদ্ভুত কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না," হ্যারি উত্তর দিল। কিন্তু পরক্ষণেই হ্যাবির কণ্ঠস্বর পাল্টে গেল। বিপুল বিস্ময়ের সঙ্গে সে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ...অদ্ভুত ব্যাপার আছে...আছে...হায ভগবান! লোকটার দেখছি দুটো ছাযা! একি আশ্চর্য ব্যাপার—একি অসম্ভব ব্যাপার!"

গ্রীভের সতর্কভাবে দু'পাশে তাকানো আর একটু কুঁজো হয়ে হাঁটবার রহস্যটা এবার পরিষ্কার হযে গেল। ওব পাশে সব সময়েই একটা কিছু থাকে, যাকে কেউই দেখতে পায় না কিন্তু সেই অদৃশ্য কোন কিছুর একটা ছায়া পড়ে। সেই কোন কিছুকে গ্রীভ অত্যন্ত ভয় পায়।

যেতে যেতে গ্রীভ একবাব ঘুবে তাকাল। আমাদেব দু'ভাইকে সে জানালাব পাশে দাঁড়িযে থাকতে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে সে বাস্তা পেবিযে ওপাশেব অন্ধকাবেব দিকে চলে গেল। একটু আগে যে ব্যাপাবটা ঘটেছিল, তাব কথা হ্যাবিকে বললাম। তাবপব দু'ভাই আলোচনা কবে একমত হয়ে ঠিক কবলাম যে, এ সম্পর্কে একটি কথাও লিটিব কাছে বলব না।

দু'দিন পবে হ্যাবিব 'স্টুডিও' থেকে বাড়িতে ফিবে সাবা বাড়িতে একটা কেমন যেন এলোমেলো অবস্থা দেখলাম।

লিটিব কাছ থেকেই ব্যাপাবটা জানতে পাবলাম।

লিটি বলল, "বৌদি যখন উপবতলায ছিল তখন হঠাৎ গ্রীভ এসে হাজিব হয। পাবিচাবক তাব আসবাব খবব আমাদেব জানাবাব আগেই সে অপেক্ষা না কবেই সোজা খাবাব ঘবে চলে যায। আমি তখন সেখানেই বসেছিলাম। দেখলাম জর্জেব ছবিখানাব দিকে যাতে তাব চোখ না পড়ে সেজন্য সে চেষ্টা কবছিল। ছবিখানাব দিকে যাতে তাব নজব না যায, সেজন্য গ্রীভ ছবিখানাব ঠিক নিচে যে সোফাটা ছিল তাব উপবে বসল। আমাব প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সে আবাব প্রেম নিবেদন শুরু কবল। এই নিবেদনকে জোবদাব কববাব জন্য সে বলল, বেচাবা জর্জ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কববাব পূর্ব মুহূর্তে আমাকে অনুনয কবে বলে গিয়েছে আমি যেন তোমাব দেখাশোনা কবি আমি যেন তোমাকে বিযে কবি।

"গ্রীভেব এই কথাগুলো শুনে ওব উপব আমাব এত বাগ আব ঘেন্না হলো যে বুঝতে পাবলাম না ওব কথাব উত্তব কি ভাবে দেব। গ্রীভ যখন শেষ কথাগুলো বলছিল তখন আচম্বিতে গীটাবেব শব্দেব মতো টুং কবে একটা শব্দ হলো। সেই ধ্বনিটা যে ঠিক কেমন তা আমি সঠিকভাবে বোঝাতে পাবব না। আমাব চোখেব সামনে জর্জেব ছবিখানা পড়ে গেল। ছবিখানাব ভাবী ফ্রেমেব একটা কোণা সজোবে আঘাত কবল গ্রীভেব মাথায। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীব ক্ষতেব সৃষ্টি হলো। সেই প্রচণ্ড আঘাতে জ্ঞান হাবিযে ফেলল গ্রীভ।"

লিটি বলতে লাগল, "আমি ছুটে গিয়ে বৌদিকে খবব দিলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তাবেব কাছে লোক পাঠালেন। ডাক্তাব এলেন। তাব নির্দেশমতো অচেতন গ্রীভকে বহন কবে নিযে যাওযা হলো উপবতলায। তাকে শুইযে দেওযা হলো তোমাব 'ড্রেসিং রুম' এব একখানা 'কাউচ' এ।"

লিটিব কথা শুনে গ্রীভকে দেখবাব জন্য আমি 'ড্রেসিং রুম' এব দিকে পা বাড়ালাম। ভেবেছিলাম আমাব নিষেধ অমান্য কবে আবাব এ বাড়িতে আসবাব জন্য ওকে ভৎসনা কবব। কিন্তু ঘবে গিযে দেখলাম গ্রীভ বিকাবেব ঘোবে প্রলাপ বকছে। কাজেই ভৎসনা কববাব প্রশ্নই উঠল না।

ডাক্তাব ঘবেই ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, "এটা একটা অদ্ভুত 'কেস'। মাথাব আঘাতটা গুরুতব হলেও কেবল সেই আঘাত দিযেই বোগীব চৈতন্যলোপ

আর মস্তিষ্ক প্রদাহকে ঠিকমতো ব্যাখ্যা করা যায় না। অর্থাৎ কেবল মাথার আঘাতের জন্যই রোগীর এই অবস্থা হয়নি।"

আমি বলল, "গ্রীভ সবে 'পাইওনীয়ার' জাহাজে করে উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে ফিরে এসেছে।"

আমার কথা শুনে ডাক্তার বললেন, "এইবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। সম্ভবত মেরু অঞ্চলের অভাব এবং কষ্ট ভদ্রলোকের দেহের উপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করেছিল আর তারই ফলে দেখা দিয়েছে এই অদ্ভুত মানসিক ব্যাধি।"

ডাক্তারের নির্দেশমতো গ্রীভের কাছে থাকবার জন্য আমরা একজন সর্বক্ষণের 'নার্স' নিযুক্ত করলাম।

আমার এই গল্পের বাকি অংশটুকু বলতে খুব সময় লাগবে না। তাড়াতাড়িই শেষ করে ফেলা যাবে। মাঝরাতে এক তীব্র-তীক্ষ্ণ চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কোন রকমে গায়ে একটা পোশাক চড়িয়ে আমি নার্সের খোঁজে ছুটলাম। দেখলাম নার্স লিটিকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। তার বাহুবন্ধনের মধ্যে অচেতন লিটি।

আমরা দু'জনে ধরাধরি করে লিটিকে তার ঘরে নিয়ে গেলাম। ওকে শুইয়ে দিলাম ওর বিছানায়। তারপর 'নার্স' রহস্যটা প্রকাশ করল আমাদের কাছে।

নার্স বলল, তখন প্রায় মাঝরাত। গ্রীভ হঠাৎ তার বিছানায় উঠে বসল। তারপর সে আপন মনেই কথা বলতে শুরু করল। গ্রীভ এমন সব ভয়ঙ্কর কথাবার্তা বলতে লাগল যে সেসব শুনে নার্স খুবই ভয় পেয়ে গেল। একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখে 'নার্স'-এর ভয়টা আবো বেড়ে গেল। মোমবাতির ম্লান আলোয় সে দেখল যে ঘরের দেওয়ালে তার রোগীর দু'দুটো ছায়া পড়েছে! এও কি সম্ভব! নার্স ভাল করে নিজের দু'চোখ মুছল। সে কি এই নিঝুম রাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল? কিন্তু না, ঐ তো দেওয়ালের গায়ে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে রোগীর দু'দুটো ছায়া! একি রহস্য! একি প্রহেলিকা! নার্স হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

সীমাহীন আতঙ্কে অভিভূত হয়ে নার্স চুপি চুপি পা টিপে টিপে লিটির ঘরে চলে এল। কিছুতেই আর রোগীর ঘরে থাকতে পারছে না সে।

লিটির ঘুম ভাঙিয়ে তাকে গ্রীভের বলা ভয়ঙ্কর কথাগুলো ফিস্ ফিস্ করে বলল 'নাস'। তার নিজের ভয় পাবার কথাও বলল।

লিটি সাহসী মেয়ে। তার মনে দয়ামায়াও আছে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে সে নার্সকে বলল, "চলুন বাকি রাতটুকু আমি আপনার সঙ্গেই কাটাব।"

দু'জনে রোগীর ঘরে গেল। সেখানে রোগীর ঘরের দেওয়ালে লিটিও দুটো ছায়াই দেখল। কিন্তু সে যা শুনল তা আরও ভয়ঙ্কর।

নার্স বলতে লাগল, "বিছানার উপরে উঠে বসেছিল গ্রীভ। কারও দিকে যেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। কিন্তু যার দিকেই তাকিয়ে থাকুক না কেন সে অদৃশ্য। আপনার বোন বা আমি কেউই তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম সেই অদৃশ্য আগন্তুকের ছায়া।

"আবেগকম্পিত গলায় রোগী এক অদৃশ্য আগন্তুককে ভিক্ষে চাওয়ার সুরে বলছিল, 'আমাকে ক্ষমা কর, দয়া করে আমাকে মুক্তি দাও। আমি আর পারছি না...পারছি না। তুমি তো জানো যে, আমি আগেভাগে চিন্তাভাবনা করে অপরাধটা করিনি। মুহূর্তের জন্য স্বয়ং শয়তান এসে ভর করেছিল আমার উপরে। শয়তান লোভ দেখিয়েছিল আমাকে। সেই লোভের কবলে পড়ে আমি তোমাকে আঘাত করেছিলাম—ধাক্কা দিয়ে খাড়াই হিমশৈলের পিছিল গা থেকে তোমাকে ফেলে দিয়েছিলাম নিচের দিকে। কেন? তখন তো আমার মনে পড়ছিল একটি সুন্দর মেয়ের সুন্দর মুখখানি। সেই মেয়েকে নিজের করে পাবার পথে তুমিই তো ছিলে বাধা। আমার আর মেয়েটির মাঝখানে ছিলে তো কেবল তুমি। তোমাকে সরাতে পারলেই তো মেয়েটিকে পেতে পারি আমি। আমার তো তখন সে রকমই মনে হয়েছিল। কিন্তু না, আমার সে আশা দুরাশা। আমি ভুল করেছিলাম। শোনো জর্জ ম্যাসন, শোন; মেয়েটির কাছে আমি প্রেম নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করল। লিটি বোধ হয় বুঝতে পেরেছে যে, আমিই তোমার হত্যাকারী! জর্জ ম্যাসন, আমি অপরাধ স্বীকার করছি...আমি অনুতপ্ত। তুমি দয়া করে আমাকে মুক্তি দাও। আর ছায়ার মতো অনুসরণ কোর না আমায়। আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না...পারছি না! ম্যাসন, দয়া করো...ক্ষমা করো!' "

জ্ঞান ফিরে আসবার পর আতঙ্কিত কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ করে লিটিও গ্রীভের ভয়ঙ্কর স্বীকারোক্তির কথাটা বার বার শোনাল।

এবার আমি সব কিছু বুঝতে পারলাম। যে সব অদ্ভুত ঘটনার কথা আমি এতদিন লিটির কাছে গোপন রেখেছিলাম, সে সব কথা তাকে বলবার জন্য এবার আমি তৈরি হলাম। জানুক, সব কথাই জানুক লিটি। 'নার্স' রোগীকে দেখবার জন্য চলে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই মহা আতঙ্কে সে ছুটতে ছুটতে এ ঘরে ফিরে এল।

"কি ব্যাপার?" শঙ্কিত ভাবে আমি প্রশ্ন করলাম।

- "রোগী ঘরে নেই," শঙ্কাবহুল গলায় নার্স বলল।

"সে কি?"

আমি আর লিটি ছুটলাম রোগীর ঘরের দিকে।

ভিনসেন্ট গ্রীভ চলে গিয়েছে!

মহা আতঙ্কে বিকারের ঘোরে উঠে সে জানালা খুলে বাইরে লাফিয়ে পড়ে চলে গিয়েছে।

দু'দিন পরে গ্রীভের মৃতদেহ পাওয়া গেল নদীর জলে।

জর্জের ছবির সামনে এখন একখানা পর্দা ঝোলানো রয়েছে। অবশ্য ঐ ছবিখানাকে কেন্দ্র করে আর কোন অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার ঘটেনি।

ভিনসেন্ট গ্রীভের মৃত্যুর পর থেকে দেওয়ালের গায়ে সেই রহস্যময় অপার্থিব অতিপ্রাকৃত ছায়াটিকেও আর কোন দিন দেখা যায়নি।

অনুবাদ : অনিরুদ্ধ চৌধুরী

লট নম্বর ২৪৯

Lot No. 249—আর্থার কোনান ডয়েল

॥ ১ ॥

মিনার বাড়ির তিন বাসিন্দা

শহরের এক প্রান্তে অক্সফোর্ডের পুরানো কলেজ অঞ্চল। এখানে রয়েছে একখানা পুরানো বাড়ি। বাড়িখানার সর্বঅঙ্গে বয়সের ছাপ। বিশাল দরজার পাল্লা দু'খানা হেলে পড়েছে। বাড়ির খিলানগুলি ভেঙে গিয়েছে। আইভিলতার পুরু আবরণ ঢেকে ফেলেছে পুরানো বাড়ির মিনারটাকে।

নিচ থেকে একটা সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে উঠে গিয়েছে উপরের দিকে। দোতলা, তিনতলা এবং চারতলায় সিঁড়ির মুখোমুখি দু'খানা করে ঘর। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্রের বাসা ওখানে। নিরিবিলিতে পড়াশুনা বা গবেষণা করবার পক্ষে পুরানো হলেও এ বাড়িটা চমৎকার। চারতলায় থাকে অ্যাবারক্রোম্বি স্মিথ, তেতলায় এডওয়ার্ড বেলিংহ্যাম, দোতলায় উইলিয়ম মঙ্কহাউস লী আর একতলায় থাকে বুড়ো চাকর টমাস স্টাইলাস। সে ঘরদোর দেখাশোনা করে। উপরের তিন তলার বাসিন্দাদের রান্নাবান্না করে দেয়, ফাইফরমাশ খাটে।

সেদিন রাত প্রায় দশটা। চারতলায় নিজের ঘরে আরাম কেদারায় গা ঢেলে দিয়ে অ্যাবারক্রোম্বি স্মিথ গল্প করছিল তার বন্ধু জেফ্রো হেস্টির সঙ্গে। হেস্টিও গা ঢেলে দিয়েছিল আর একখানা আরাম কেদারায়। নদীতে নৌকো চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে ওরা ফিরে এসেছে।

নানা কথা বলতে বলতে হেস্টি এক সময় বলল, "মিনারের আর দুই বাসিন্দার সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?"

—"মোটামুটি আছে," স্মিথ বলল।

—"মঙ্কাহাউস লী ছেলেটা বেশ ভালই। তবে..."

—"তবে কি?" স্মিথ প্রশ্ন করল।

—"মানে বলছিলাম কি এডওয়ার্ড বেলিংহ্যাম লোকটিকে আমার তেমন সুবিধার বলে মনে হয় না।"

—"কেন?" স্মিথ প্রশ্ন করল।

—"কেন যে আমি বেলিংহ্যামকে পছন্দ কবি না তা আমি ঠিক বুঝিযে বলতে পাবব না। ও চোব-ডাকাত নয়, গুণ্ডা বা বদমাযেশ নয়। কিন্তু ওব ধবনধারণটা কেমন যেন অদ্ভুত। ওর চালচলন যেন সাধারণ বা স্বাভাবিক মানুষের মতো নয়। ওর চোখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেছ ? ওর দৃষ্টির মধ্যেই কেমন যেন ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা আব নারকীযতার ছাপ মাখানো রয়েছে। ওর চোখ দেখলেই মনে হয ও যেন শযতানের পযলা নম্বরের অনুচর।"

স্মিথ হেসে ফেলল। বলল, "তোমার আবার সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি।"

—"মোটেই না," হেস্টি প্রতিবাদ কবল, "অনেকেই বলে বেলিংহ্যাম নাকি নানা রকমের মন্তব তন্তর আর তুকতাক জানে। অবশ্য ওর কোন গুণ নেই এমন কথা আমি বলছি না। প্রাচ্যবিদ্যায এই বয়সেই ওব নাকি অসাধারণ পাণ্ডিত্য। প্রাচীন মিশবীয হিব্রু, আরবী, ফার্সী ইত্যাদি প্রাচ্যদেশীয় ভাষায ওর দক্ষতা নাকি প্রশ্নাতীত।"

– "বেলিংহ্যাম কি তুক তাক করে বা মন্তর পড়ে কারো কোন ক্ষতি কবেছে ?" স্মিথ প্রশ্ন কবল।

– "না তা কবেনি, বা কবলেও আমার তা জানা নেই।"

"তা হলে ওকে খাবাপ লোক ভাবছ কেন ?"

"মুশকিল হচ্ছে এই যে, কেন যে ওকে আমি খাবাপ ভাবছি তা ই আমি ঠিকমতো গুছিযে বলতে পাবছি না। কেন জানি না, কিন্তু লোকটাকে আমি মোটেই সহ্য কবতে পাবি না। মঙ্কহাউস লীর বোন ইভেলিনেব সঙ্গে যখন বেলিংহ্যামেব মতো একটা মানুষকে ঘুবে বেড়াতে দেখি তখন আমার আরও খাবাপ লাগে। লীদের পবিবাবেব সঙ্গে আমাদেব পবিবাবের অনেক দিনেব আলাপ পবিচয। ইভেলিন যখন একেবাবে ছেলেমানুষ তখন থেকেই আমি তাকে চিনি। সে সুন্দবী। তাব স্বভাবও সহজ সবল। তাব সঙ্গে যখন বেলিংহ্যাম ঘুবে বেড়ায তখন মনে হয একটা সুন্দর পাখিব সঙ্গে থপ্ থপ্ কবে হাঁটছে একটা কুৎসিত কোলাব্যাঙ।"

"তোমাব বুঝি ঈর্ষা হয ?" তবল সুরে স্মিথ বলল।

"না না, ঈর্ষাব কোন ব্যাপাবই নেই," হেস্টি বলল।

"তবে তুমি বেলিংহ্যামেব উপব এত বিরূপ কেন ?"

"শোনো স্মিথ, তোমাদেব এই বেলিংহ্যাম লোকটি খুবই ঝগড়াটে। সবাব সঙ্গেই ওব ঝগড়া, এই তো বন্ধু নর্টনেব সঙ্গে ওব খুব ঝগড়া হলো। শুনেছি ও নাকি নর্টনকে খুব শাসিযেছে। এবকম লোকেব সঙ্গে বেশি মেলামেশা না করাই ভাল।"

"তুমি কি আমাকে সাবধান কবছ ?"

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে হেস্টি বলল, "মনে কর তাই করছি।"

"দেখো, এবকম ছোটখাট ব্যাপার দিযে গোটা মানুষেব বিচাব করা চলে না।"

"তা জানি। কিন্তু লোকটাব সঙ্গে সামান্য মেলামেশা কবলেই বুঝতে পাববে ও কতবড় ধূর্ত– কতবড শয়তান !'

ঘডিতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল। হেস্টি তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল আরাম কেদারা থেকে। বলল, "হায় ভগবান! রাত এগারোটা বেজে গেল! আর নয়, এবার আমি উঠি। অনেকটা পথ যেতে হবে। শুভরাত্রি স্মিথ।"

—"শুভবাত্রি হেস্টি।"

হেস্টি বিদায় নিল।

॥ ২ ॥

রাতের আর্তনাদ

হেস্টি চলে যাবার পর স্মিথ টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে পডার টেবিলে গিযে বসল। বই-এর 'সেলফ' থেকে নামিয়ে নিল কয়েকখানা মোটা মোটা ডাক্তাবী বই। অ্যাবারক্রোম্বি স্মিথ ডাক্তারীর ছাত্র। সামনেই পরীক্ষা। এখন ভাল করে পডাশোনা করা দরকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সবকিছু ভুলে গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের রহস্যের মধ্যে ডুবে গেল।

দেওযাল ঘডিতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। বই-এর পাতা থেকে চোখ তুলল স্মিথ। ধূমপানের ইচ্ছা হলো। একটা সিগারেট ধরাল স্মিথ। হেস্টির কথাগুলো মনে পডল। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পডল মিনারের আব দুই বাসিন্দার কথা। উইলিযম মঙ্কহাউস লী সাহিত্যের ছাত্র। লোক হিসেবে তাকে তো ভালই মনে হয়। তেতলার এডওযার্ড বেলিংহ্যাম প্রাচীন ইতিহাসের কি একটা বিষয় নিযে গবেষণা করছে। যেটুকু পরিচয হযেছে তাতে তাকেও তো খারাপ লোক বলে মনে হয না। কিন্তু হেস্টি ওকে পছন্দ করে না কেন? বেলিংহ্যামের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে। ও নিশ্চযই রাত জেগে পডাশোনা করে। বেলিংহ্যামের সঙ্গে যতবার দেখা হযেছে ততবারই তো সে ভদ্রতা আর সৌজন্যের হাসি হেসেছে। ওকে তো বেশ ভদ্র আর শান্তিপ্রিয় মানুষ বলেই মনে হয়েছে। অন্তত এ পর্যন্ত তো ওর আচার আচরণে খারাপ কিছু দেখেনি স্মিথ। কিন্তু হেস্টি বেলিংহ্যাম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করল কেন? বন্ধু হেস্টিকে সে ভাল করেই চেনে। সে স্পষ্টবক্তা। কিন্তু কারোর নামে অযথা নিন্দাবাদ করবার মতো ছেলে তো সে নয। তা হলে? এসব কথা ভাবতে ভাবতে স্মিথ আবার বই এব পাতায মন দিল। আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল।

হঠাৎ একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান কবে ভেঙে দিল। সেই আতংকঘন ভযাবহ আর্তনাদ শুনলে শরীরের রক্ত জমে যায। আচমকা এই আর্তনাদে স্মিথ শিউরে উঠল। তার হাত থেকে মোটা ডাক্তারী বইখানা ছিটকে পডে গেল মাটিতে। শবীরের কাঁপুনিতে পডার টেবিলটা কেঁপে উঠল। টেবিলের আলোটা মাটিতে পড়ে নিভে গেল।

ঘর অন্ধকাব। নিকষ কালো অন্ধকাব। চোখের দৃষ্টি সেই অন্ধকারকে ভেদ করতে পারে না।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কে যেন দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসছে। এত রাতে কে আসছে? কেন আসছে? পায়ের শব্দটা এসে থামল স্মিথের দরজার বাইরে। তারপর ভেজানো দরজাটা খুলে কে যেন ঢুকল ঘরের মধ্যে।

—"কে? কেন?" স্মিথ চিৎকার করে উঠল।

—"আমি...আমি," কাঁপা গলায় উত্তর এল।

—"আমি কে?" বলতে বলতে আলোর 'সুইচ্' টিপে দিল স্মিথ।

আলোয় দেখা গেল মঙ্কহাউস লী এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। আতংকে আর উত্তেজনায় তাব সমস্ত শরীর কাঁপছে।

—"কি ব্যাপার মিঃ লী?" স্মিথ জিজ্ঞেস করল।

হাঁফাতে হাঁফাতে মঙ্কহাউস লী বলল, "মিঃ স্মিথ, আপনি তো চিকিৎসাশাস্ত্রের ছাত্র, দয়া করে একবার নিচে আসুন...শীগ্‌গির আসুন।"

— "কেন? কি হয়েছে?" স্মিথ উৎকণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করল।

---"বেলিংহ্যাম...বেলিহ্যাম খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে...সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। শীগ্‌গির তার ঘরে চলুন।"

—"একটু আগে কি মিঃ বেলিংহ্যামই চিৎকাব করে উঠেছিলেন?" স্মিথ জিজ্ঞেস কবল।

—-"হ্যাঁ, সে-ই চিৎকার করেছিল। মনে হয কোন কাবণে হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে সে চিৎকার করে উঠেছিল। চিৎকার শুনেই আমি ছুটে গিয়ে তার ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। তারপরই আমি ছুটে এলাম আপনার কাছে।"

আর কোন কথা বলল না স্মিথ। মঙ্কহাউস লীকে অনুসবণ করে সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। ঘোরানো সিঁড়িটা সরু। ইচ্ছা থাকলেও তাড়াতাড়ি নামা যায় না। পাশাপাশি দু'জন লোক নামতে পাবে না সেই সরু সিঁড়ি দিয়ে। একজনের পিছনে আর একজনকে নামতে হয। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত লীর সঙ্গে বেলিংহ্যামের ঘরে এসে ঢুকল স্মিথ।

॥ ৩ ॥

বেলিংহ্যামের ঘরে

এডওয়ার্ড বেলিংহ্যামের ঘরখানা আকাবে স্মিথের ঘরেরই মতো। ঘরে ঢুকে চমকে উঠল স্মিথ। ঘরখানাকে মানুষের থাকবাব জাযগা না বলে একটা ছোটখাট 'মিউজিয়াম' বললেই বোধ হয় ঠিক হয়। স্মিথ শুনেছিল বটে যে, বেলিংহ্যাম প্রাচীন ইতিহাসের কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে গবেষণা কবছে;....কিন্তু তাই বলে থাকবার ঘরের এই অবস্থা!

ঘরেব চারদিকের দেওয়ালে প্রাচ্য আব মিশরদেশের প্রাচীনকালেব বিভিন্ন যুগের নানা অদ্ভুত আর বিচিত্র নিদর্শন। ঘরে রয়েছে ছোট-বড় নানা আকারের ভাঙাচোরা

কত মূর্তি, প্রাচীনকালের কত রকমের অস্ত্রশস্ত্র, অনেকগুলি সূক্ষ্ম কারুকার্য করা রাজপোশাক, নানা রকমের মুখোশ, বড় বড় লাল-নীল পাথর, নানা রকমের কত পুঁতির মালা।

প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে রয়েছে প্রাচীন মিশরের 'হোরাস্,' 'ইসিস্' বা 'আইসিস্' এবং 'ওসিরিস' বা 'ওসাইরিস' প্রভৃতি দেবতার বড় বড় অদ্ভুত মূর্তি। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে বিরাট একটা কুমীরের শুকনো দেহ। কুমীরটার মুখ হাঁ-করা।

ঘরের মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল। তার উপর যে টুকিটাকি কত জিনিস তা বলে শেষ করা যায় না। সেখানে রয়েছে ছড়ানো টুকরো কাগজ, নানারকমের গাছের ছাল, আর শুকনো পাতা। তাছাড়া টেবিলের উপর রয়েছে 'প্যাপিরাস' গাছ থেকে তৈরি কাগজের একখানা পুঁথি। পুঁথিখানা খুবই প্রাচীন। ওখানার পাতা একেবারে হলদে হয়ে গিয়েছে।

টেবিলের সামনে দেওয়ালের দিকে একটা 'কফিন' বা 'শবাধার'। শবাধারের ডালা খোলা। ভিতরে রয়েছে একটা ম্যমি। সেটার দিকে তাকিয়ে স্মিথ ভয়ে চমকে উঠল। তার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে যেন বয়ে গেল আতংকের এক তুহিন-শীতল স্রোত।

দেখলেই বোঝা যায় যে ম্যমিটা বহুদিনের পুরানো। ওটার গায়ের রঙ পোড়া কাঠের মতো কুচকুচে কালো। দেহটা শুকিয়ে অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছে। কফিন থেকে দেহটা অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে। হাতের সরু সরু অস্থিসার বড় বড় আঙুলগুলো এসে পড়েছে টেবিলটার কাছাকাছি। কি বীভৎস! কি ভয়ানক!

ম্যমির ঠিক মুখোমুখি একখানা চেয়ারে বেলিংহ্যাম পড়ে আছে অজ্ঞান অবস্থায়। দারুণ আতংকে তার চোখ দুটো যেন কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ও দারুণ ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে ও জোরে শ্বাস নিচ্ছে। তখন ওর ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

বেলিংহ্যামের অবস্থা দেখে খুবই ঘাবড়ে গিয়েছে মঙ্কহাউস লী। সে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, "এখন কি হবে?"

স্মিথ ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করতে লাগল বেলিংহ্যামকে।

– "কি বুঝছেন?" উৎকণ্ঠিতভাবে লী জিজ্ঞেস করল।

"চিন্তা করবেন না। ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন বেলিংহ্যাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

মঙ্কহাউস লী দেখতে খুব সুন্দর। চেহারাটা লম্বা ছিপছিপে। মুখখানা কাঁচ। চোখের মণিদুটি কুচকুচে কালো। গায়ের চামড়া জলপাইয়ের মতনই মসৃণ।

স্মিথ ঝুঁকে পড়ে নিঃশব্দে বেলিংহ্যামকে পরীক্ষা করছিল। পরীক্ষা শেষ হতে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—"কি হয়েছে ওর?" ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করল লী।

স্মিথ বলল, "মনে হয় কোন কারণে ভীষণ ভয় পেয়ে উনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। একটু শুশ্রূষা করলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন। একটা কাজ করা যাক। আসুন, আমরা

দু'জনে মিলে মিঃ বেলিংহ্যামের অজ্ঞান দেহটাকে ঐ সোফায় শুইয়ে দি। ইস্ সোফাটার উপরে দেখছি রাজ্যের জিনিসপত্তর। দাঁড়ান, আগে ঐ গাছ-গাছড়া আর শিকড়-বাকড়গুলো সোফার উপর থেকে সরিয়ে ফেলা যাক।"

—"আমি সরিয়ে দিচ্ছি," মঙ্কহাউস লী বলল।

সোফা পরিষ্কার হলে স্মিথ বলল, "এবার আপনি মিঃ বেলিংহ্যামের পায়ের দিকটা ধরুন। আমি মাথার দিকটা ধরছি।"

অচেতন বেলিংহ্যামকে শুইয়ে দেওয়া হলো সোফার উপরে।

স্মিথ বলল, "আমি ওঁর পোশাকটা আলগা করে দিচ্ছি। আপনি একটু ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসুন। আচ্ছা, মিঃ বেলিংহ্যামেব কি হয়েছিল তা কি আপনি জানেন?"

লী উত্তর দিল, "না, আমি জানি না। বেলিংহ্যামের চিৎকার শুনেই আমি দোতলা থেকে এ ঘরে ছুটে আসি। এসে দেখি ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে চারতলায় ছুটলাম আপনাকে ডেকে আনবার জন্য।"

—"মনে হচ্ছে কিছু দেখে উনি ভীষণ ভয় পেয়েছেন," স্মিথ মন্তব্য করল।

অজ্ঞান হবার আগে সত্যিই ভীষণ ভয় পেয়েছিল এডওয়ার্ড বেলিংহ্যাম। জোরে জোরে শ্বাস নেওয়া এবং শ্বাস ছাডবাব জন্য ওর বুকটা হাপরের মতো উঠছে আর নামছে। মুখখানা হয়ে গিয়েছে রক্তশূন্য- বিবর্ণ। চোখেব মণিদুটো যেন দারুণ আতংকে অক্ষিকোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখের গড়নও বিকৃত হয়ে কেমন যেন অন্যরকম হযে গিয়েছে। সমস্ত মুখে এক অপার্থিব অলৌকিক আতংকের অভিব্যক্তি। কিন্তু কি সে আতংক? কি দেখে এত ভয় পেয়েছে এডওয়ার্ড বেলিংহ্যাম?

—"বুঝতে পারছি না, কি দেখে মিঃ বেলিংহ্যাম এত ভয় পেয়েছেন?" স্মিথ আপন মনেই প্রশ্ন কবল।

—"মনে হচ্ছে এই ম্যমিটাই হলো ওর ভয়ের কারণ," মঙ্কহাউস লী বলল।

—"কিন্তু ম্যমিটার মধ্যে এমন কি আছে যা দেখে উনি ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন?" একটু অবাক হয়েই স্মিথ প্রশ্ন করল।

—"তা বলতে পারব না। কিন্তু ঐ শুকনো মৃতদেহটা যেমন কুৎসিত তেমনই ভয়ঙ্কর। ওটাকে দেখলেই গা শিবশির করে ওঠে।"

-"কিন্তু ম্যমিটা তো এ ঘরে অনেকদিন ধরেই রয়েছে। আজ হঠাৎ ভয় পাবার কারণ কি?" স্মিথ প্রশ্ন করল।

—"না, আজই প্রথম নয়," মঙ্কহাউস লী বলল, "গত শীতকালেও ও একদিন ভয় পেয়ে অজ্ঞান হযে গিয়েছিল। তখন ম্যমিটা ছিল ওর টেবিলের সামনে। আমাব মনে হয় ওর এসব ম্যমিটমি নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল।"

—"কিন্তু মমির সঙ্গে ওঁর ভয় পাবার বা অজ্ঞান হবার কি সম্পর্ক?" স্মিথ প্রশ্ন করল।

—"তা আমি আপনাকে ঠিকমতো বুঝিযে বলতে পারব না। এটুকু বলতে পারি যে বেলিংহ্যাম হলো একজন অদ্ভুত খেয়ালী প্রকৃতির মানুষ। পুরানো আমলের

জিনিসপত্রের উপর ওর প্রচণ্ড আকর্ষণ। নানা দেশের বহু পুরানো জিনিস সে সংগ্রহ করেছে। শুধু সংগ্রহই নয়, এসব নিয়ে সে প্রচুর পড়াশোনাও করেছে। প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করা ওর একটা বড নেশা। আজ পর্যন্ত অনেক পুরানো পুঁথি-পত্তরের পাঠোদ্ধার করেছে। একাজে ওর সমকক্ষ লোক সমগ্র ইংলণ্ডে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কলেজের অনেকেই ওকে ছিট্‌গ্রস্ত বলে মনে করে। ওর নেশাগুলিই একদিন ওর পক্ষে সাংঘাতিক ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। এ সব নেশা ছাড়বার জন্য ওকে অনেক বলেছি, কিন্তু ও শোনেনি। নিজের অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়ালগুলি ছাডতে ও মোটেই রাজী নয। বাঃ! এই তো ওর জ্ঞান ফিরে আসছে!"

সত্যিই বেলিংহ্যামের জ্ঞান ফিরে আসছিল। স্মিথ আর মঙ্কহাউস লী ঝুঁকে পড়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

বেলিংহ্যামের চোখের পাতাদুটি ধীরে ধীরে নডে উঠল। হাতের শক্ত মুঠো দুটি আস্তে আস্তে আলগা হয়ে খুলে গেল। পাণ্ডুর মুখে লাগল রঙের ছোঁয়া। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই স্বাভাবিক হয়ে উঠল। আবও কযেকবার থির থির করে কেঁপে উঠবার পব চোখের পাতাদুটো হঠাৎ খুলে গেল। কিছুক্ষণ স্থির চোখে তাকিযে থাকবার পর বেলিংহ্যাম অবাক হয়ে ঘরের চারদিকে তাকিযে দেখতে লাগল। ধীরে ধীরে পরিবেশ সম্পর্কে সে সচেতন হযে উঠল।

হঠাৎ ম্যমিটার দিকে দৃষ্টি পডতেই চমকে উঠল বেলিংহ্যাম। সঙ্গে সঙ্গেই ধডমড করে উঠে বসে হুডমুড করে সোফা থেকে নামল। প্যাপিবাসের পাতার পুথিখানা ঝট্‌ করে তুলে নিযে সে পুঁথিখানাকে টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে রেখে ড্রয়ারে চাবি দিয়ে দিল। তারপর স্মিথ আর লী-র দিকে তাকিযে একটু কক্ষস্ববেই বলল, "কি ব্যাপাব, আপনারা হঠাৎ এখানে কেন?"

—"আরে তোমার চিৎকার শুনেই তো আমরা ছুটে এসেছি," মঙ্কহাউস লী বলল, "চারতলার এই ভদ্রলোকটি নেমে না এলে তুমি যে কি কাণ্ড করে ফেলতে, তা ভাবতেও আমার ভয় হচ্ছে।"

স্মিথেব দিকে তাকিযে বেলিংহ্যাম বলল, "আপনাব নাম তো অ্যাবারক্রোম্বি স্মিথ, কেমন ঠিক বলেছি কি না?"

এ প্রশ্নের উত্তরে স্মিথ একটু হেসে মাথা নাডল।

—"আপনি যে দযা করে এসেছেন, তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে ছোট করতে চাই না।"

একটু চুপ করে থেকে বেলিংহ্যাম বলল, "ইস্‌ কি বোকা!...কি বিরাট মূর্খ আমি! হ্যাঁ...হ্যা...আমি একটা মহামূর্খ!"

দু'হাতের আঙুল দিযে নিজের মাথাব চুল খামচে ধরে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল গবেষক বেলিংহ্যাম।

মঙ্কহাউস লী বলল, "শোনো বেলিংহ্যাম, তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও

বলছি। গভীর রাতে ম্যমি নিয়ে এসব ঘাঁটাঘাঁটি বন্ধ করে দাও। কে বলতে পারে কবে কি ঘটে যাবে?"

—"মিঃ বেলিংহ্যাম, ঐ শুকনো ম্যমিটাকে দেখেই কি আপনি ভয় পেয়েছিলেন?" স্মিথ প্রশ্ন করল।

—"না না তা নয়...তা নয়...সে সব কিছু নয়," মাথা ঝাঁকিয়ে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল বেলিংহ্যাম। তারপর অপেক্ষাকৃত স্থির কণ্ঠে বল, "আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, পর পর কয়েকটা রাত জেগে পড়াশোনা করবার জন্য শরীরটা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মাথাটা দুলে উঠল। কি দেখে যে ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম তা বলতে পারছি না। এখন বেশ সুস্থ বোধ করছি।"

দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে অদ্ভুতভাবে আলস্য ভাঙল এডওয়ার্ড বেলিংহ্যাম।

—"এবার তা হলে আমি উঠি," স্মিথ বলল।

— "না না এক্ষুণি যাবেন না। আর একটু থাকুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠব। তখন যাবেন।"

স্মিথের মনে হলো বেলিংহ্যাম যেন একলা থাকতে এখনও ভয় পাচ্ছে, তাই ওদের ছাড়তে চাইছে না।

লী বলল, "একি অবস্থা করে রেখেছ ঘরের। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে দম যেন বন্ধ হয়ে যাবে। দাঁড়াও আগে জানালাটা খুলে দি।"

লী জানালাটা খুলে দিতেই ঘরের গুমোট ভাবটা চলে গেল। বাইরে থেকে এক ঝলক মিষ্টি ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঘরের আবহাওয়াটাই পাল্টে দিল।

বেলিংহ্যাম বলল, "দাড়ান, আপনাদের একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাচ্ছি।" সে উঠে ড্রয়ারের ভিতর থেকে গাছের ছালের মতো একটা শুকনো পাতা বের করল। তারপর সেই পাতাটাকে ধরল লণ্ঠনের চিমনির উপর। পাতাটা পুড়ে কালো হয়ে গেল—কুকড়ে গেল। ধোয়ায় ভরে গেল সমস্ত ঘর। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোয়া কেটে গেল। ঘরে রইল দামী ধূপের মতো একটি অপূর্ব মিষ্টি সৌরভ।

স্মিথ আর লী দু'জনেই খুব অবাক হয়ে গেল। ওদের দুজনকে অবাক হতে দেখে বেলিংহ্যাম যেন একটু খুশিই হলো। গম্ভীরকণ্ঠে সে বলল, "এটা একটা পবিত্র গাছের পাতা। এ গাছ খুব দুষ্প্রাপ্য। অনেক কষ্টে এ পাতা আমি সংগ্রহ করেছি। এরকম নানা জিনিস আমার কাছে আছে, একদিন সময় করে দেখাব আপনাদের।...আচ্ছা মিঃ স্মিথ, আমি কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম?"

নিজের ঘড়ি দেখে মনে মনে একটু হিসেব করল স্মিথ, তারপর বলল, "না না, খুব বেশিক্ষণ নয়। আমার ধারণা, আপনি মিনিট পাঁচ-ছয় অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন।"

— "আমারও তাই মনে হয়। খুব বেশিক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম না আমি। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা যে কি অদ্ভুত ব্যাপার তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না, মিঃ স্মিথ। যে লোক চেতনা হারিয়ে ফেলে তার কাছে অচেতন অবস্থাটুকুর সময়ের

মাপ থাকে না। সে নিজে বলতে পারে না কতক্ষণের জন্য সে অজ্ঞান হয়েছিল। আমি বলতে পারব না আমি কতক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়েছিলাম—এক মুহূর্তের জন্য, না একদিনের জন্য, নাকি এক সপ্তাহের জন্য।"

দম নেবার জন্য একটু থামল বেলিংহ্যাম। তারপর আবার শুরু করল: "কাচের কফিনের মধ্যে ঐ যে ম্যমিটিকে দেখছেন, উনি হলেন চার হাজার বছর আগের একজন মহামান্য সম্রাট। আজ যদি উনি জেগে উঠে কথা বলতে পারতেন, তাহলে বোধ হয় বলতেন, 'আমি তো একটু আগেই জেগে ছিলাম। চার হাজার বছর তো আমার কাছে একটা নিমেষ ছাড়া আর কিছুই নয়।'...মিঃ স্মিথ, ম্যমিটা কিন্তু সত্যি সত্যিই খুব অদ্ভুত। তাই না?"

কৌতূহলী হয়ে ম্যমিটার দিকে তাকাল স্মিথ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ওটাকে। বহুকালের পুরানো একটা দেহ। কালের কবলে পড়ে দেহটা দুমড়ে গিয়েছে। তার ফলে মূর্তিটা যেন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। চোখ বলতে রয়েছে দুটো অন্ধকার গর্ত। কিন্তু সেই গর্ত দুটোর মধ্যে যেন লালচে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের রক্তিম আভা যেন ফিনকি দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে বাইরে। চামড়া কালো হয়ে হাড়ের সঙ্গে একেবারে লেগে গিয়েছে। ম্যমিটার মাথার খুলিতে কোঁকড়ানো কালো চুল। একটু ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁটের মধ্যে ছোট ছোট ঝকঝকে সাদা দাতের সারি দেখা যাচ্ছে। দাঁতগুলি ছোট হলেও তীক্ষ্ণ। ম্যমিটার গলার নিচ থেকে পা পর্যন্ত জড়ানো রয়েছে হলুদ রঙের কাপড় দিয়ে। সেই কাপড় কোন অজানা নির্যাস অথবা আঠার মতো জিনিস দিয়ে ভেজানো। ম্যমিটাকে দেখে স্মিথের মোটেই ভাল লাগল না। ওটার দাঁড়াবার ভঙ্গিটাই অদ্ভুত। ওটা যেন শিকারী পশুর মতোই শিকারের অপেক্ষায় ওৎ পেতে রয়েছে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি বুঝি কারও ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। এই নিষ্ঠুর, নৃশংস আর জিঘাংসার ভঙ্গিটা স্মিথের মোটেই ভাল লাগল না।

বেলিংহ্যাম বলল, "জীবিতকালে এই ম্যমিটার নাম কি ছিল, তা আমি জানি না। উৎকীর্ণ লেখাটা নিশ্চয়ই ওর মাথায় লাগানো ছিল। কিন্তু সে লেখা আমি দেখিনি। সেটা বোধ হয় বহুকাল আগেই হারিয়ে গিয়েছে। এখন ম্যমিটার মাথায় একটা সংখ্যা লেখা আছে। সংখ্যাটা হলো ২৪৯। যে নিলাম থেকে আমি ম্যমিটা কিনেছি, সংখ্যাটা তাদেরই দেওয়া।"

মঙ্কহাউস লী বলল, "লোকটার অদ্ভুত লম্বা চেহারা আর মোটা মোটা হাড় দেখে মনে হচ্ছে জীবিতকালে ও একটা ছোটখাট দৈত্যের মতোই ছিল। ও হয়ত একদা একলা নিজের হাতেই কোন পিরামিড গেঁথে তুলেছিল।"

—"তুমি একটা মারাত্মক ভুল করছ লী। এ হলো একজন মহামান্য ফ্যারাও-এর ম্যমি। এ কোন শ্রমিকের ম্যমি নয়, উনি যদি পিরামিড তৈরি করে থাকেন তবে তা ক্রীতদাসদের দিয়েই করিয়েছেন, নিজের হাতে পাথর সাজিয়ে পিরামিড তোলেননি।"

মঙ্কহাউস লী হেসে ফেলে বলল, "চার হাজার বছর আগে তো আর পৃথিবীর আলো দেখিনি। তুমি যা বলছ হয়ত তা-ই ঠিক।"

-"আপনি তো এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন মিঃ বেলিংহ্যাম?" স্মিথ প্রশ্ন করল।

—"হ্যাঁ, এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি।"

—"তা হলে আমি এখন চলি।"

স্মিথ যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। বেলিংহ্যাম সোফা থেকে উঠে এসে হৃদ্যতার সঙ্গে তার হাত দুখানি নিজের হাতের ভিতর নিয়ে আন্তরিকভাবে বলল, "ধন্যবাদ...অশেষ ধন্যবাদ মিঃ স্মিথ। আবাব আমাদের দেখা হবে। শুভরাত্রি।"

বেলিংহ্যাম আর লী-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্মিথ উপরে উঠে গেল। নিজের ঘরে গিয়ে সে চিকিৎসাশাস্ত্রের একখানা মোটা কেতাব খুলে তার পাতায় মন দিল।

॥ ৪ ॥

স্মিথ-বেলিংহ্যাম সংবাদ

সে রাতের ঘটনার পর থেকে মিনার বাড়ির দুই বাসিন্দা অর্থাৎ এডওয়ার্ড বেলিংহ্যাম আব মঙ্কহাউস লী র সঙ্গে অ্যাবারক্রোম্বি স্মিথের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তাদের সম্পর্ক 'আপনি' থেকে 'তুমি' তে নেমে এসে নিকটতর হলো। বেশি বন্ধুত্ব হলো বেলিংহ্যামের সঙ্গে। সে রাতের ঘটনার পব বেলিংহ্যাম স্মিথকে দু'বার ধন্যবাদ জানিযে গিয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে বেলিংহ্যাম একদিন স্মিথকে বলল, "তুমি যদি মনে কর আমাকে দিয়ে তোমার কোন প্রযোজন মিটবে, তাহলে কোনরকম দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করে আমাকে বলবে। আমি সাধ্যমতো তোমাকে সাহায্য করব।"

বেলিংহ্যামের আচার আচরণে কিছুটা আপাত রুক্ষতা থাকলেও ওকে খারাপ লোক বলে মনে করতে পাবল না স্মিথ। হেস্টি যে কেন ওব উপর বিরূপ তা বুঝে উঠতে পাবল না স্মিথ। বেলিংহ্যামের চরিত্রের কতগুলি বৈশিষ্ট্য স্মিথকে মুগ্ধ করেছিল। সে অসাধারণ পরিশ্রমী, নানা বিষয়ে তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অপূর্ব তার স্মৃতিশক্তি। বন্ধু হিসেবে সে মোটেই খারাপ নয়। তার সঙ্গ স্মিথের খারাপ লাগে না।

সময়ে-অসময়ে যখন তখনই স্মিথেব ঘরে ঢুকে পড়ে বেলিংহ্যাম। কিছুক্ষণ নানা কথা বলে। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে দ্রুত পা চালিযে ঘব থেকে বেরিযে চলে যায়। লোকটা যে অত্যন্ত খেয়ালী তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু দুনিয়ার সব জ্ঞানই যেন ওর মগজের মধ্যে রয়েছে। এমন কোন বিষয় নেই যা ও জানে না। মাঝে মাঝে কেমন সব অদ্ভুত ধবনের কথাবার্তা বলত বেলিংহ্যাম। যেমন একদিন বলল, "কে কি ভাবছে তা জানাতে পারে এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারলে খুবই মজা হত, তাই না স্মিথ?"

কোনদিন হয়তো বলত, "পৃথিবীতে নানা রকমের কত রহস্য রয়েছে, কিন্তু আমরা তার কোন খবরই রাখি না। এই আত্মার কথাই ধরো না কেন, ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ আত্মার উপর মানুষ যদি নিজের প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা [illegible]

তাহলে বিষয়টা কি রকম হত তা একবার ভেবে দেখ দেখি। তাহলে মানুষের ক্ষমতা খুব বেড়ে যেত। বিশ্বাস করো স্মিথ, মানুষের মধ্যে সত্যি সত্যিই অসীম ক্ষমতার সম্ভাবনা রয়েছে।"

মাঝে মাঝে বেলিংহ্যাম বলত, "দু'জন মানুষের যদি একরকম মন হত অথবা একটি মন যদি আরও একটি-দুটি মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারত তাহলে কি বিরাট ব্যাপারই না হত!"

স্মিথের ঘরে এসে এই রকম সব অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলত বেলিংহ্যাম। অনেক সময় সে আপন মনেই অনর্গল কথা বলে যেত। স্মিথ চুপচাপ পাইপ টানতে টানতে তার কথা শুনত। মাঝে মাঝে কেবল হুঁ, হাঁ, তাই নাকি—এরকম সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করত। সে কখনও প্রত্যক্ষভাবে বেলিংহ্যামের অদ্ভুত এবং উদ্ভট কথাগুলিকে সমর্থন করত না। অবশ্য কথাগুলির সরাসরি বিরোধিতাও করত না স্মিথ। সে বুঝতে পেরেছিল যে বেলিংহ্যাম হলো খুব মেজাজী প্রকৃতির যুবক। তার মতো লোকেব সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা খুবই শক্ত। সমর্থন বা অসমর্থন কিছুই না করলেও বেলিংহ্যামের অদ্ভুত এবং উদ্ভট কথাগুলো শুনতে স্মিথের ভালই লাগত। কথাগুলি শুনে সে খুব মজা পেত।

বেলিংহ্যামের একটা অদ্ভুত অভ্যাস স্মিথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সে লক্ষ্য করেছিল যে, বেলিংহ্যাম আপন মনে কথা বলে। স্মিথ নিজে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশোনা করত। মাঝে মাঝে নিঝুম রাতে নিচে বেলিংহ্যামেব ঘর থেকে চাপাগলার আওয়াজ ভেসে আসত। কার সঙ্গে যেন ফিসফিস কবে কথা বলত বেলিংহ্যাম। কিন্তু এত রাতে তার ঘরে কে আসবে ? সমস্ত তল্লাটটাই তো নিঝুম-নিস্তব্ধ। কোন দিকেই তো জনমানবের কোন সাড়া নেই। বেলিংহ্যাম কথা বলে কার সঙ্গে ? অনেক ভেবে স্মিথ এই সিদ্ধান্তে এল যে বেলিংহ্যামেব নিশ্চযই আপন মনে কথা বলবার বদ অভ্যাস আছে।

এ সম্পর্কে সে বেলিংহ্যামকে একবার জিজ্ঞেসও করেছিল। শুনে চমকে উঠেছিল বেলিংহ্যাম। আপন মনে কথা বলবার ব্যাপারটাকে সে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিল। শুধু তাই নয়, স্মিথের এরকম জিজ্ঞাসায় সে বেশ বিরক্তও হযেছিল। কিন্তু যত বিরক্তই হোক বা যত অস্বীকারই করুক না কেন বেলিংহ্যাম, স্মিথ তো আর নিজের কান দু'খানাকে অস্বীকার করতে পারে না।

স্মিথের ধারণা যে সত্যি, ক'দিন পরেই তার সমর্থনসূচক প্রমাণ পাওয়া গেল।

টমাস স্টাইলস মিনার বাড়ির বহুদিনের পুরানো চাকর। মিনার বাড়ির বাসিন্দাদের দেখাশোনা করে সে। বার্ধক্যের ছাপ পরেছে তার দেহে। মাথার চুলগুলি ধূসর হয়ে গিয়েছে। লোকটি সহজ সরল, মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সাধ্যমতো মিনার বাড়ির বাসিন্দাদের সেবা-যত্নের ত্রুটি করে না সে।

একদিন সকালে চাবতলায় স্মিথের ঘবে এসে একথা-সেকথার পর টমাস একটা

অদ্ভুত প্রশ্ন কবল। সে জিজ্ঞেস কবল, "স্যাব, মিঃ বেলিংহ্যামেব শরীব ভাল আছে তো?"

প্রশ্নটা শুনে অবাক হযে গেল অ্যাবাবক্রোম্বি স্মিথ। টমাসেব দিকে তাকিযে সে পাল্টা প্রশ্ন কবল, "হঠাৎ তোমাব এবকম ধারণা হলো কেন?"

—"মানে আমার মনে হয়..."

কি বলতে গিযেও টমাস থেমে গেল।

তাব দিকে স্থিব দৃষ্টিতে তাকিযে স্মিথ বলল, "আমাব তো মনে হয বেলিংহ্যাম বেশ সুস্থই আছে। আমি ডাক্তাবী পড়ছি। অসুস্থ হলে সে নিশ্চযই আমাকে বলত।"

- "স্যাব, বলছিলাম কি...মানে...মিঃ বেলিংহ্যামেব মাথা খাবাপ হযে যাযনি তো?"

সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বুড়ো টমাস প্রশ্নটা কবেই ফেলল।

"এবকম চিন্তা তোমাব মনে এল কেন?" স্মিথ জিজ্ঞেস কবল।

'তা হলে বলি স্যাব। কিছুদিন ধবেই দেখছি মিঃ বেলিংহ্যাম যেন কেমন পাল্টে গিযেছেন। গভীব বাতে তিনি আপন মনে কথা বলেন। কখনও হাসেন, কখনও বা যেন কাউকে খুব বকাবকি কবেন। আপনাব ঘবখানা ওঁব ঘবেব ঠিক উপবে। আপনিও নিশ্চযই কিছু কিছু শুনেছেন। এতে অবশ্যই আপনাব পড়াশোনাব ক্ষতি হয।"

- "না না, আমাব বিবাট কিছু ক্ষতি হয না। এটা এমন কিছু ব্যাপাব নয। তুমি এ নিযে দুশ্চিন্তা কবো না। মিঃ বেলিংহ্যাম সুস্থই আছেন।"

— "দুশ্চিন্তা কবতাম না স্যাব, কিন্তু আবও একটা ব্যাপাব আছে," ঘব গোছাতে গোছাতে টমাস বলল।

—"কি ব্যাপাব?"

"কিছু দিন থেকে দেখছি মিঃ বেলিংহ্যাম যখন ঘবে থাকেন না এবং ঘব যখন বাইবে থেকে তালা বন্ধ থাকে, তখনও কে যেন ঘবেব মধ্যে পাযচাব কবে। আমি নিজেব কানে বন্ধ ঘবে পাযেব শব্দ শুনেছি।"

"বলছ কি তুমি!" স্মিথেব কণ্ঠ থেকে এক বাশ বিস্ময ঝবে পড়ল।

"ঠিকই বলছি স্যাব। বুড়ো হতে পাবি, কিন্তু এখনও আমাব শুনবাব ক্ষমতা চলে যাযনি। নিজেব কান দুটোকে আব অস্বীকাব কবি কি কবে?"

একটু থামল টমাস। তাবপব বাধো বাধো গলায বলল, "মি. বেলিংহ্যাম এখন ঘবে নেই। এইমাত্র কোথায যেন বেবিযে গেলেন তিনি। তাব ঘবেব সামনে একবাব যাবেন স্যাব? দেখা যাক পাযেব শব্দটা এখন শোনা যায কিনা।"

টমাসেব কথা শুনে স্মিথেব কৌতূহল জাগ্রত হযে উঠেছিল। সে বলল, "বেশ, চল।"

বুড়ো টমাসেব পিছু পিছু নিচে নেমে এল স্মিথ। বেলিংহ্যামেব ঘবেব সামনে

এসে দাঁড়াল দুজনে। দরজাটা বন্ধ। একটা বিরাট ভারী তালা ঝুলছে বন্ধ দরজায়। টমাস কান পাতল। কি যেন শুনল। তারপর স্মিথকেও ইশারা করল কান পাতবার জন্য। তার ইঙ্গিতে বন্ধ দরজায় কান পাতল স্মিথ।

কি আশ্চর্য! বন্ধ ঘরের ভিতরে সত্যি সত্যিই পায়ের শব্দ শোনা গেল! কে যেন পা টেনে টেনে চলছে। হ্যাঁ, ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত কে যেন পায়চারি করছে। কোন ভুল নেই। পায়ের শব্দ স্পষ্টভাবেই শোনা যাচ্ছে। টমাস ঠিক কথাই বলেছে।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে টমাসের দিকে তাকাল স্মিথ। একটু পরে বেলিংহ্যামের ঘরের সামনে থেকে দু'জনেই চলে এল।

স্মিথের সঙ্গে তার ঘরে এল টমাস। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্মিথ জিজ্ঞেস করল, "কবে তুমি প্রথম বন্ধ ঘরে পায়ের শব্দ শুনেছ, টমাস?"

—"দু'দিন আগে রাতের বেলা আপনার ঘরে খাবার দিতে আসবার সময় আমি প্রথম পায়ের শব্দটা শুনতে পাই। আমার মনে হয়েছিল, কে যেন অত্যন্ত অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে চলাফেরা করছে। সিঁড়ি থেকেই আমি জিজ্ঞেস করি, 'কে?'। কেউ সাড়া দেয় না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো এই যে, আমাব গলার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই পায়চারির শব্দটা থেমে যায়। স্যার, মিঃ বেলিংহ্যামের ঘরের ভিতর নিশ্চয়ই আরও একজন লোক রয়েছে। এ নিযে একটু খোঁজ-খবর করা দরকার।"

স্মিথের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। সে বলল, "ঠিক আছে টমাস। তুমি এ বিষয় নিযে কারও সঙ্গে কোন আলোচনা কোরো না। ব্যাপারটা আপাতত গোপনই থাক। ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে একটু চিন্তা-ভাবনা করতে দাও। দরকার পড়লে আমি নিজেই তোমাকে জানাব - -তোমার সাহায্য নেব।"

—"ঠিক আছে, স্যাব। দরকার পড়লেই আমাকে বলবেন। এখন তবে আসি।"

—"এসো।"

বুড়ো টমাস বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।"

॥ ৫ ॥

রহস্য ঘনীভূত

বেলিংহ্যামের ঘরের ভিতরকার পায়ের শব্দ নিয়ে কিছুটা ভাবনা-চিন্তা করলেও স্মিথ শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা নিযে আর বেশি মাথা ঘামায়নি। মাথা ঘামাবার মতো আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকায় বন্ধ ঘরে পদশব্দের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু ক'দিন পরে এমন একটা ব্যাপার ঘটল যাতে রহস্য আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। স্মিথ আর ব্যাপারটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না।

ব্যাপারটা বলা যাক।

তখন গভীর রাত। চারদিক নিঝুম-নিস্তব্ধ। স্মিথ নিজের ঘরে পড়াশোনা করছিল।

হঠাৎ বেলিংহ্যাম ঢুকল তার ঘরে। তার চোখ-মুখ থেকে খুশির ভাব যেন উপচে পড়ছিল। ঘরে ঢুকেই সে বলল, "জানো স্মিথ, আজ আমি একটা বিরাট ব্যাপার আবিষ্কার করেছি। প্রাচীন মিশরের সম্রাট বেনি হাসানকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয়েছিল, তা আমি নিশ্চিতভাবেই জানতে পেরেছি। এ খবর জানতে পারলে ঐতিহাসিকেরা চমকে উঠবেন।"

কি করে আবিষ্কারটা করা গেল সেকথা বেলিংহ্যাম বেশ বিস্তারিতভাবে বলতে শুরু করল। স্মিথ মন দিয়েই শুনতে লাগল। হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেয়ে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল। স্মিথ দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল। কে যেন বেলিংহ্যামের ঘরের দরজাটা খুলল।

— "ওহে বেলিংহ্যাম, কেউ বোধ হয় তোমার ঘরের দরজা খুলে ঢুকলো কিংবা বেরুল।"

স্মিথের কথা শুনে বেলিংহ্যাম চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বলতে পারল না। ভয় আর বিস্ময় যেন তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তারপর স্খলিত স্বরে সে বলল, "না না...তা হতে পারে না। তা কি করে সম্ভব? আমি...আমি.. আমি যে নিজের হাতে দরজা বন্ধ করে এসেছি। তুমি...তুমি ভুল শুনেছ স্মিথ।"

"না, আমি ঠিকই শুনেছি। ওই তো সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সিঁড়ি ভেঙে কে যেন উঠে আসছে উপরে। ধুপ্ ধুপ্ শব্দ শুনতে পাচ্ছ না?"

বেলিংহ্যামের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কে বলবে যে, একটু আগেই তার মুখখানা খুশিতে ডগমগ করছিল। ঝোড়ো হাওয়ার মতো সে এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দড়াম্ করে স্মিথের ঘরের দরজার কপাট দুটো বন্ধ করে দিয়ে সে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। কিন্তু সিঁড়ির অর্ধেকটা যাবার পরই বেলিংহ্যামের পায়ের শব্দ থেমে গেল। থেমে গেল ধুপ্ ধুপ্ শব্দটাও। স্মিথ শুনতে পেল বেলিংহ্যাম ক্রুদ্ধকণ্ঠে কিন্তু চাপা গলায় কাকে যেন ধমকাল। একটু পরেই শোনা গেল বেলিংহ্যামের ঘরের দরজা খুলবার এবং বন্ধ করবার শব্দ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আবার ফিরে এল স্মিথের ঘরে। তার মুখখানা শুকনো ফ্যাকাসে। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। যেন একটা বিরাট সংকটকে কোন রকমে কাটিয়ে এল সে।

স্মিথ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল বেলিংহ্যামের দিকে। বেলিংহ্যাম বলল, "না না, তেমন কোন ব্যাপার নয়। তোমার কথা শুনে আমি তো প্রথমটায় খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আমার ঘরে অনেক মূল্যবান জিনিসপত্তর আছে, ভাবলাম চোর টোর এল নাকি।"

—"কিন্তু চোর এলে তো জিনিস নিয়ে পালিয়েই যেত। সে আবার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসবে কেন? আমার ঘরে তো আলো জ্বলছিল। চোর কি ধরা দেবার জন্য এখানে আসবে? সে কি এত বোকা?"

—"আরে না না, চোরটোর কিছু নয়। আসলে আমার [illegible]

পেবেছে যে আমি এখানে আছি। তাই দবজা ঠেলে বেবিয়ে উপবে উঠে আসছিল। আসলে ঘবেব দবজাটা আমি ভেজিযে দিযে এসেছিলাম, তালাবন্ধ কবে আসিনি—ভুলে গিয়েছিলাম।"

স্মিথ অবাক হযে বলল, "তোমাব কুকুব আছে না কি ? কই কোন দিন তো তোমাব সঙ্গে কুকুব দেখিনি।"

— "দেখবে কি কবে ? কুকুবটাকে তো এক বন্ধুব কাছ থেকে সবে এনেছি। কুকুবটা ভীষণ পাজী। কিছুতেই ঘবেব মধ্যে বন্ধ থাকতে চায না। কিন্তু যতদিন পোষ না মানে ততদিন ওটাকে বাইবে ছাডতেও ভবসা পাচ্ছি না। কি জানি কখন কাকে কামডে দেয়।"

"টমাসকে বলো না কেন, সে তোমাব কুকুবটাকে ঠিক পোষ মানিযে দেবে।"

- "না, টমাসকে আমি আপাতত কুকুবটাব কথা জানাতে চাই না। সে হযত কুকুব পুষবাব ব্যাপাবে আপত্তি কবতে পাবে। কিন্তু আমাব ঘবে অনেক মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র বযেছে। সেগুলি পাহাবা দেবাব জন্য একটা কুকুব আমাব সত্যি সত্যিই দবকাব।"

স্মিথ পবিষ্কাব বুঝতে পাবল যে বোলিংহ্যাম মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু কেন এই অনৃত ভাষণ ? বোলিংহ্যামকে একটু পবীক্ষা কববাব জন্য সে বলল, "জানো, আমাবও কুকুব খুব ভাল লাগে। আমাদেব বাডিতে বেশ কযেকটি ভাল জাতেব কুকুব আছে। চল, নিচে গিযে তোমাব কুকুবটা দেখে আসি।"

স্মিথেব কথা শুনে বোলিংহ্যাম কেমন যেন দিশেহাবা হযে হকচকিযে গেল। কিছুক্ষণ চুপ কবে থাকবাব পব অস্বাভাবিক দ্রুত কণ্ঠে সে বলল, "নিশ্চযই দেখবে, নিশ্চযই দেখবে। তবে আজকে তো হযে উঠবে না। আজকে আমাব একটা খুব দবকাবী কাজ আছে। বাত হলেও আমাকে এক্ষুণি বেবোতে হবে। আমি চলি। পবে একদিন কুকুবটা দেখো। আমি নিযে গিযে তোমাকে দেখাব।"

টুপিটা হাতে নিযে দ্রুত পদক্ষেপে ঘব থেকে বেবিযে গেল বোলিংহ্যাম। তাব ঘবেব দবজা খোলা এবং ভেতব থেকে দবজা বন্ধ কববাব শব্দ শোনা গেল। বোলিংহ্যাম মিনাব বাডিব বাইবে গেল না। ঢুকল নিজেব ঘবেব মধ্যে। সে আবাব মিথ্যে কথা বলল। কিন্তু কেন ?

ব্যাপাবটা নিযে আবাব ভাবতে শুরু কবল স্মিথ। চেষ্টা কবা সত্ত্বেও ডাক্তাবী কেতাবে আব মন বসল না। বোলিংহ্যাম এবকম মিথ্যেব জাল বুনে চলেছে কেন ? স্মিথ খুব ভাল কবেই জানে যে বোলিংহ্যামেব ঘবে কোন কুকুব নেই। সে কুকুব পোষেনি। যদি সে কুকুব পুষত তবে দিনে বা বাতে কোন না কোন সমযে কুকুবেব ডাক শোনা যেতই। কিন্তু স্মিথ কোন ডাক শোনেনি। তাহলে ?

তাছাডা সিডিতে যে পাযেব শব্দ শোনা গিযেছে, তা মোটেই কুকুব বা কোন জীবজন্তুব পাযেব শব্দ নয। তা হলে পাযেব শব্দটা কাব ? শব্দ শুনে তো মনে হয়েছিল যে কোন মানুষ যেন সিঁডি দিযে উপবে উঠে আসছে। বোলিংহ্যামেব বন্ধ

ঘরে কারো চলাফেরা করবার শব্দ তো স্মিথ নিজের কানেই শুনতে পেয়েছে। যে জিনিসটাকে সে বেলিংহ্যামের আপন মনে কথা বলা ভেবেছে, তা তো অন্য কারো সঙ্গে কথা বলাও হতে পারে। বুড়ো টমাসও তো সে রকম কথা শুনেছে। তারা দু'জনেই কি ভুল শুনল? না...না, তা হতে পারে না। তবে?

ধাঁ করে একটা কথা স্মিথের মাথায় এসে গেল। তবে কি বেলিংহ্যাম তার ঘরে কোন মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছে? তার মতো ছেলের পক্ষে এটা অসম্ভব নয়। কিন্তু কেউ না জানতে পারে এমন ভাবে একটি মেয়েকে লুকিয়ে রাখা কি আদৌ সম্ভব? অনেক ভেবেচিন্তেও সে পদশব্দ রহস্যের কোন সমাধান করতে পারল না। কিন্তু চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেল না স্মিথ। 'পদশব্দটা কার হতে পারে?'—এই চিন্তাটা ঘুরে ফিরে বারবার তার মনে হানা দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে স্মিথ ভাবল, 'বেলিংহ্যামের বন্ধ ঘরে কে চলাফেরা করে তা নিয়ে আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন? এটা ঠিক যে, ওকে ঘিরে একটা অদৃশ্য রহস্যের জাল রয়েছে কিন্তু সেই জাল কেটে দেওয়া তো আমার কাজ নয়। আমি বরং ওর সঙ্গে আর বেশি মেলামেশাই করব না। এর পর বেলিংহ্যাম আমার ঘরে এলে পাবে উদাসীন এবং নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা।'

পড়াশোনায় মন দেবার চেষ্টা করল স্মিথ। কিন্তু মন বসল না। "ধুত্তোর বেলিংহ্যাম!" বলে অসীম বিরক্তির সঙ্গে স্মিথ বই এর পাতা বন্ধ করল।

॥ ৬ ॥

আক্রমণ

সারারাত ঘুম হয়নি স্মিথের। ভোরের দিকে সে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু প্রচণ্ড কড়ানাড়ার শব্দে তার ঘুমটা ভেঙে গেল। শেষ রাতের তরল অন্ধকার কেটে গিয়ে তখনও ভোরের আলো পুরোপুরি ফোটেনি। ঘড়ির কাঁটার গতিও ভোরের দিকে। স্মিথ বুঝতে পারল না এমন সময় কে তার কাছে এল? বেশ বিরক্তভাবেই সে দরজা খুলল। খুলতেই বাইরে দেখা গেল বন্ধু হেস্টিকে। সে বোধ হয় ছুটতে ছুটতে এসেছে, তাই তখনও হাঁপাচ্ছে।

"কি ব্যাপার হেস্টি, এত সকালে?"

"কাল রাতে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছে," হেস্টি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

"কি ব্যাপার? বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভিতরে এস।"

হেস্টি স্মিথের ঘরের ভিতরে ঢুকে একখানা চেয়ারে বসল।

স্মিথ বলল, "এইবার বল, কি হয়েছে?"

"জানো স্মিথ, কাল রাতে লং নর্টনকে কে যেন খুন করবার চেষ্টা করেছিল।"

-"খুন! কি বলছ তুমি?"

—"ঠিকই বলছি। কাল রাতে হাই স্ট্রীট থেকে ও যখন পুরানো কলেজের গেটের

কাছে এল তখনই ঘটল সেই দুর্ঘটনাটা। জায়গাটা কি রকম অন্ধকার তা তো জানই। সেই অন্ধকারের মধ্যে কে যেন নর্টনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে তার গলা টিপে ধরল।"

—"কিন্তু লং নর্টনকে আবার খুন করতে যাবে কে?" স্মিথ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

—"তাই তো বুঝতে পারছি না," হেস্টি বলল, "নর্টনের মতো ছেলের যে এরকম হিংস্র শত্রু থাকতে পারে, তা আমি ভাবতেই পারিনি। এখন দেখছি আমার ধারণাটা ভুল। শত্রুহীন মানুষ বোধ হয় পৃথিবীতে একজনও নেই।"

—"কিন্তু কে নর্টনকে আক্রমণ করেছিল তা জানতে পেরেছ?"

—"না। যে আক্রমণ করেছিল সে মানুষ না জন্তু তা ঠিক করে বলা যাচ্ছে না। নর্টনের ধারণা, তাকে যে আক্রমণ করেছিল সে মানুষ নয়। আমি নিজেও লং নর্টনের গলায় আঙুলের দাগ আর নখের আঁচড় দেখেছি। দেখে আমারও মনে হয়েছে যে এ আক্রমণ কোন মানুষের কাজ নয়।"

—"তা হলে কে আক্রমণ করল?" স্মিথ একটু বিমূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করল।

— "সেটা ঠিক করে বলা শক্ত। তবে আমার মনে হয় সার্কাস দল থেকে পালিয়ে যাওয়া কোন গরিলা বা শিম্পাঞ্জিই নর্টনকে আক্রমণ করেছিল। পুরানো কলেজের গেটের সামনে কিছু ঝোপঝাড় রয়েছে। তা ছাড়া পাশের বাগান থেকে বিরাট একটা এলম্ গাছের একখানা ঝুপসি ডাল এসে পড়েছে গেটের মাথায়। নর্টনের বিশ্বাস ঐ এলম্ গাছের ডাল থেকেই রহস্যময় জীবটা তার উপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে। জীবটা এত জোরে তার গলা টিপে ধরে যে নর্টনের মনে হয় যে লোহার সাঁড়াশি দিয়ে যেন তার গলাটাকে সজোরে চেপে ধরা হয়েছে। সে প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু জীবটার খুব সরু সরু বাঁকানো আঙুলগুলো এমন ভাবে তার গলা টিপে ধরেছিল যে নর্টনের আর কিছু করবার মতো কোন ক্ষমতাই ছিল না। তাছাড়া অন্ধকারে কিছু দেখাও যাচ্ছিল না। গলা থেকে আক্রমণকারীর হাত দু'খানা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে সে বুঝেছিল যে হাত দু'খানা খুব সরু এবং রোমশ। নর্টনের বিশ্বাস হাত দু'খানা কোন পশুর।

যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সে হাতের বাঁধন শিথিল করতে পারছিল না। সে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিল। সৌভাগ্যক্রমে তখন সেখানে দু'জন লোক এসে গেল। জীবটা তখন নর্টনকে ছেড়ে দিয়ে এক লাফে পাঁচিলের উপর উঠে ছুটে পালিয়ে গেল। ভয়ে, আতঙ্কে নর্টন এখন ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে একবারও বাইরে বেরোয়নি। বেচারা নর্টন! বিরাট একটা ফাঁড়া গিয়েছে ওর।"

—"এ তো খুব আশ্চর্য ব্যাপার!" আপন মনেই স্মিথ মন্তব্য করল।

—"বটেই তো। কিন্তু স্মিথ, তোমার নতুন বন্ধু এডওয়ার্ড বেলিংহ্যাম লং নর্টনের দুরবস্থার কথা শুনলে খুব খুশিই হবে।"

—"কেন?" স্মিথ প্রশ্ন করল।

—"তোমাকে তো বলেছিলাম ক'দিন আগে নর্টনের সঙ্গে বেলিংহ্যামের খুব ঝগড়া হয়। কথাটা ভুলে গেলে নাকি?" একটু ব্যঙ্গের সুরেই হেস্টি বলল।

—"না ভুলিনি তবে...।"

স্মিথকে কথা শেষ করতে না দিয়েই হেস্টি বলল, "তোমার বেলিংহ্যামকে বোধ হয় আর কষ্ট করে নর্টনের পিছনে লাগতে হবে না। তার দুরবস্থার খবর শুনলেই সে বোধ হয় খুশি হয়েই থেমে যাবে।"

স্মিথ কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল হেস্টি। বলল, "ওহে স্মিথ, আজ বিকেলে নৌকা বাইচের প্রতিযোগিতা হবে। সময় করে যাবে কিন্তু।"

- -"চেষ্টা করে দেখব," স্মিথ বলল।

হেস্টি বিদায় নিল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়েই স্মিথ চিন্তা করতে লাগল। দুটো রহস্যের মুখোমুখি হয়েছে সে। একটা রহস্য হলো সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আর দ্বিতীয় রহস্যটা হলো লং নর্টনের উপর আচমকা আক্রমণ। অনেক ভাবনা-চিন্তা করেও স্মিথ রহস্য সমাধানের কোন সূত্র খুজে পেল না।

একবার মনে হলো দুটো রহস্যের মধ্যে হয়ত কোন যোগসূত্র আছে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো সেটা কি করে সম্ভব? একটার পর একটা চিন্তা তার মাথার মধ্যে এসে পাক খেতে খেতে জটের পর জট সৃষ্টি করতে লাগল। কিন্তু জটের সৃষ্টি হলেও মনের মধ্যে একটা যুক্তিসঙ্গত সুশৃঙ্খল চিন্তা দানা বেঁধে উঠতে পারল না।

চিন্তা করে করে স্মিথের মাথা গরম হয়ে উঠল। এই অবস্থায় কিছুতেই বই-এর পাতায় মন বসবে না। বরং কিছুক্ষণ বাইরে থেকে ঘুরে এলে মাথা ঠাণ্ডা হবে। তখন হয়ত পড়াশোনায় মন বসবে।

মুখে চোখে জল দিয়ে বাইরে যাবার পোশাক পরে স্মিথ বেরিয়ে পড়ল।

।। ৭ ।।

লী-বেলিংহ্যাম সংবাদ

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই স্মিথ দেখল যে, বেলিংহ্যামের ঘরের দরজাটা খোলা। দেখে একটু অবাকই হলো সে। বেলিংহ্যামের ঘরের দরজা তো কখনও খোলা থাকে না। হয় ভিতর থেকে না হয় বাইরে থেকে বন্ধ থাকে। স্মিথ ভাবল এই সুযোগে কোন ছুতোয় বেলিংহ্যামের ঘরে ঢুকে দেখে আসা যাক সত্যিই সেখানে কোন কুকুর আছে কি না। কিন্তু পুরোপুরি মনস্থির করবার আগেই একটা ব্যাপার ঘটল। বেলিংহ্যামের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল মঙ্কহাউস লী। তার মাথার চুল এলোমেলো, দারুণ রাগে মুখখানা লাল হয়ে গিয়েছে, চোখের কালো মণি দুটো যেন অসহ্য ক্রোধে জ্বলছে।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে এডওয়ার্ড বেলিংহ্যাম। দারুণ ক্রোধে তার মুখখানাও বিকৃত হয়ে গিয়েছে। সে চিৎকার করে বলল, "মনে রেখো লী, এর জন্য তোমাকে ভবিষ্যতে অনুতাপ করতে হবে, তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না। আমি কিন্তু এ অপমান মুখ বুজে সহ্য করব না।"

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মঙ্কহাউস লী বলল, "ঠিক আছে, তোমার যা খুশি তাই করো। আমাকে ভয় দেখিয়ে কোন লাভ হবে না। জেনে রেখো, আমারও এক কথা। আমি যা বলি তা ই করি। আমার বোনের সঙ্গে কিছুতেই তোমার বিয়ে দেব না। তোমার মতো একজন জঘন্য প্রকৃতির লোকের সঙ্গে ইভেলিনের মতো একটি মিষ্টি মেয়ের বিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো তাকে জেনে শুনে নরকে পাঠানো। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।"

—"বিয়ের প্রস্তাব তা হলে ভেঙে গেল?" কর্কশ কণ্ঠে বেলিংহ্যাম বলল।

—"হ্যা...হ্যা," ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মঙ্কহাউস লী বলল।

—"ভুল করলে মহা ভুল করলে লী। এর ফলে তোমার যে কি মারাত্মক ক্ষতি হবে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারছ না।"

—"বেলিংহ্যাম, তুমি কি আমাকে আবার ভয় দেখাচ্ছ? বলেছি তো, আমাকে ভয় দেখিয়ে কোন লাভ হবে না।"

"লী, তুমি তো জান আমার হাতে কি অসাধারণ ক্ষমতা আছে আমি শেষ বারের মতো তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।"

"কোন দরকার নেই। তোমার সঙ্গে আমি আর কোন সম্পর্কই রাখতে চাই না।"

"তোমার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যেও না লী। মনে আছে তো কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে?"

"হ্যা, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, কাউকে কিছু বলব না। আমার সে প্রতিজ্ঞা আমি রাখব। কিন্তু সব জেনে শুনে আমি কিছুতেই আমার বোনকে নরকে পাঠাতে পারব না। ইভেলিনের সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না।"

"তুমি বললেই তো হবে না, ইভেলিনের নিজের মত অন্যরকম হতে পারে।"

"তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, বেলিংহ্যাম। আমি বারণ করলে ইভেলিন তোমার ধারে কাছে আসবে না তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখবে না।"

আর কথা বাড়াল না মঙ্কহাউস লী। সে দ্রুতপদে নিচে নেমে গেল।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে স্মিথ ওদের ঝগড়া শুনল। আড়ি পাতা বা অন্যের কথার মধ্যে নাক গলাবার মতো বদ অভ্যাস স্মিথের ছিল না। নেহাৎ ওদের ঝগড়ার সময় সিঁড়ির উপর এসে পড়েছিল বলেই সে লী আর বেলিংহ্যামের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুনতে পেয়েছিল। তাও ওদের ঝগড়ার প্রথম দিকটা সে শুনতে পায়নি। ঝগড়াটা শুরু হয়েছিল বেলিংহ্যামের ঘরের ভিতরে।

কিন্তু যেটুকু শুনতে পেল তা থেকেই স্মিথ বুঝতে পারল যে ঝগড়ার কারণ হলো বেলিংহ্যামের সঙ্গে ইভেলিনের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া। কিন্তু কেন সম্বন্ধ ভেঙে দিল লী ? হতে পারে ইভেলিন সুশ্রী আর বেলিংহ্যাম সুদর্শন নয় কিন্তু দু'জনের মেলামেশায় এতদিন তো কোন আপত্তি করেনি। তবে আজ তার মনটা পাল্টে গেল কেন ? বেলিংহ্যামের চরিত্রের কোন অজানা দিকের খোঁজ কি সে পেয়েছে ? আর সেজন্যই কি তার মনে বেলিংহ্যাম সম্পর্কে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়েছে ?

তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারল স্মিথ। সেটা হলো এই যে ওরা একে অন্যকে ভয় করে। লী বেলিংহ্যামের এমন কোন গুপ্ত কথা জানে যা প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে সে শঙ্কিত। আবার লী ও বেলিংহ্যামের কোন এক 'অসাধারণ ক্ষমতার'-র জন্য বেশ সন্ত্রস্ত। সেও বেলিংহ্যামকে ভয় করে।

অথচ ক'দিন আগেও ওদের সম্পর্ক ছিল অন্যরকম। সে রাতে বেলিংহ্যাম ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে মঙ্কহাউস লী ই তো ছুটে এসে স্মিথকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। অচেতন বেলিংহ্যামকে পরীক্ষা করবার সময় লী র চোখে মুখে এবং আচার আচরণে কি উৎকণ্ঠা আর ব্যাকুলতার ভাবই না ফুটে উঠেছিল!

তাহলে এ ক'দিনের মধ্যে এমন কি ঘটল যাতে বিয়ের সম্বন্ধই শুধু ভাঙল না, দু'জনের সম্পর্কও একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল ? এ যে আর এক সমস্যা।

॥ ৮ ॥

সতর্কবাণী

বিকেলে বাইচ দেখতে গেল স্মিথ। হোস্টিদের দল এবং আর একটা দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা। না গেলে হোস্টি মনঃক্ষুন্ন হবে। তাই সময় করে যেতেই হলো। বাইচ দেখবার জন্য নদীর দু'পাড়ে অনেক লোকের ভিড় হয়েছে। আবহাওয়াটাও খুব সুন্দর। বসন্তের ঝকঝকে রৌদ্রে ঝলমল করছে চারদিক। সূর্যের আলোয় নদীর জল তরল রূপোর মতো দেখাচ্ছে। প্রতিযোগিতা শুরু হতে তখনও একটু দেরি আছে। কিন্তু অতি উৎসাহী মানুষদের চিৎকার আর চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। ভিড় থেকে একটু দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় স্মিথ দাঁড়িয়েছিল। অন্যমনস্কভাবে সে বোধ হয় কিছু ভাবছিল, আচমকা তার পিঠে কে যেন হাত দিল। স্মিথ চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল। দেখল মঙ্কহাউস লী এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

বিনীতভাবে লী বলল, "তোমাকে বিরক্ত করবার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। তাই আগেভাগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অনেকক্ষণ থেকেই তোমাকে খুঁজছিলাম আমি। এতক্ষণে দেখা হলো। যদি কিছু মনে না কর, তবে তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। কথাগুলি কিন্তু খুবই জরুরী। শুনবে ?"

—"অবশ্যই। কিন্তু কি ব্যাপারে কথা ?"

—"এসো, ওদিকটায় যেতে যেতে বলছি।"

—"চল। কিন্তু বেশি সময় লাগবে না তো ?"

প্রতিযোগিতার পর আমার দেখা না পেলে বন্ধু হেস্টি আমার উপর খুব রেগে যাবে। সে আমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার কথাতেই পড়াশোনার প্রচণ্ড চাপ থাকা সত্ত্বেও আমি 'রাইচ' দেখতে এসেছি।

—"তুমি বোধ হয় জান না যে হেস্টি আমারও বন্ধু। শুধু তাই নয়, আমাদের পরিবারের সঙ্গেও ওর দীর্ঘকালের পরিচয় এবং যোগাযোগ রয়েছে। আমাদের বাড়ির সবাইকেই ও চেনে। আমি বেশিক্ষণ সময় নেব না। প্রতিযোগিতা শেষ হবার আগেই তোমাকে ছেড়ে দেব। এই তো আমরা এসে গিয়েছি, চল ঐ বাড়িতেই গিয়ে বসা যাক।"

নদীর পাড়ে একখানা ছোট দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে সুন্দর বাগান। দরজা, জানালাগুলির রঙ সবুজ। বন্ধ দরজা খুলে একখানা সুন্দর সাজানো গোছানো ঘরে স্মিথকে বসালো লী। ঘরে একখানা খাট, একটা টেবিল আর কয়েকখানা চেয়ার। একদিকের দেওয়ালের তাকগুলিতে অনেক বইপত্তর, অন্যদিকের দেওয়ালেও কয়েকটা তাক। সেখানে রয়েছে কেটলি, কাপ, ডিস এবং আরও কিছু টুকটাকি জিনিসপত্তর। ঘরখানা দেখে স্মিথের বেশ ভালই লাগল। সে খুশভরা গলায় বলল, "এ কার ঘর ?"

লী বলল, "আমার বন্ধু হ্যারিংটনের। নির্জনে পড়াশোনা করবার জন্য সে এ ঘরখানা ভাড়া নিয়েছে। এখানে আমার অবাধ গতি। হ্যারিংটন ঘরে না থাকলেও আমার এখানে এসে কিছুটা সময় কাটিয়ে যেতে কোন অসুবিধা হয় না। তুমি পাইপ ধরাও, আমি একটু চা করি।"

পাইপে তামাক ভরল স্মিথ। দেশলাই এর কাঠি জ্বালা হলেও তামাকে আগুন দেওয়া হলো না। স্মিথ অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইল জ্বলন্ত কাঠিখানার দিকে। কাঠিখানা পুড়ে গেল। আঙুলে আগুনের ছ্যাঁকা লাগতেই স্মিথ কালো কাঠিখানা ফেলে দিল। দু'কাপ ধূমায়িত চা নিয়ে স্মিথের সামনে এল মঙ্কহাউস লী।

স্মিথের সামনের চেয়ারখানায় বসে লী বলল, "এইবার আমার কথা বলি। বলছিলাম কি, তুমি মিনার বাড়ির ঘরখানা ছেড়ে দাও।"

"কেন ?" স্মিথ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে লী বলল, "যত তাড়াতাড়ি ঘরখানা ছাড়বে ততই মঙ্গল।"

—"কিন্তু কেন ঘর ছাড়ব তাই বল ?"

—"তোমার 'কেন' র উত্তর আমি দিতে পারব না," অসহায়ের ভঙ্গিতে লী বলল।

— "কেন পারবে না ?"

"কারণ এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলব না বলে আমি একজনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি। সে প্রতিজ্ঞার মর্যাদা আমাকে রাখতে হবে। তবে এটা জেনো যে, তোমাকে

মিনার বাড়ি ছাড়বার কথা বলবার পিছনে যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। কারণটা বলতে পারছি না আমি; আর পারলেও তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না।"

— "কিন্তু কিছুই না জেনে অমন চমৎকার ঘরখানা ছেড়ে দেব?" স্মিথ প্রশ্ন করল।

লী বলল, "প্রতিজ্ঞা আমার মুখ আটকে দিয়েছে। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি যে বেলিংহ্যামের মতো মানুষের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। আমি তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। যদি সম্ভব হয় তবে আজই ঐ ঘর ছেড়ে দাও তুমি।"

"আজ সকালে সিড়ি দিয়ে নামবার সময় তোমাদের দু'জনের ঝগড়া শুনেছিলাম। তোমাদের কথা কাটাকাটি থেকে ঝগড়ার আসল কারণও আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার সঙ্গে বেলিংহ্যামের বিবাদের জন্যই কি তুমি আমাকে মিনার বাড়ির ঘরখানা ছাড়তে বলছ?"

"না না...মোটেই তা নয়," মঙ্কহাউস লী মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করল। "তুমি জান না বেলিংহ্যাম কি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক মানুষ। ও এক বিরাট ক্ষমতার অধিকারী। ইচ্ছে করলে ও যে কোন লোকের সর্বনাশ করতে পারে। তাই তো বলছি ওর কাছ থেকে দূরে থাক।"

একটু থেমে মঙ্কহাউস লী আবার বলল, "যে রাতে বেলিংহ্যাম অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে রাতের কথা মনে পড়ে?"

"কেন পড়বে না? এই তো ক'দিন আগের ব্যাপার," স্মিথ উত্তর দিল।

"তুমি বলেছিলে 'মনে হয় কোন কারণে ভীষণ ভয় পেয়ে বেলিংহ্যাম অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।' কি মনে পড়ছে সে কথা?"

"পড়ছে," স্মিথ উত্তর দিল।

—"সে রাতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। আজ আমি ওকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে ও যা বলল তাতে আমার দেহ মন শিউরে উঠল। বেলিংহ্যামকে অনেক অনুরোধ করলাম, কিন্তু কোন ফল হলো না। ওকে বকাবকি করলাম গালাগাল দিলাম কিন্তু তাও নিষ্ফল হলো। ও আমার কোন কথাই শুনতে রাজী হলো না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই ইভেলিনের সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিলাম। তারপরই শুরু হলো প্রচণ্ড ঝগড়া। সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে সে ঝগড়া তো তুমি শুনেছ।"

— "শুনেছি," স্মিথ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

লী বলল, "বেলিংহ্যাম হয়ত ইচ্ছে করে তোমার কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু ওর অজান্তেও হয়ত তোমার মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাই বলছিলাম মিনার ঘরটা ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আবার বলি, বেলিংহ্যামের সঙ্গ বা নৈকট্য মোটেই নিরাপদ নয়। যে কোন মুহূর্তে তুমি কোন ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়ে যেতে পার। সে বিপদ কি সাংঘাতিক, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।"

"কিন্তু বিপদটা যে কি তাই তো আমি জানলাম না," স্মিথ বলল।

—"এর বেশি আর কিছু আমি বলতে পারব না। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

—"তোমার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু অকারণে ভয় পেয়ে অমন সুন্দর নির্জন পরিবেশ ছাড়তে আমি রাজী নই। শহরের হট্টগোলের বাইরে ঐ শান্ত পরিবেশে লেখা পড়া করবার খুব সুবিধা। ওরকম জায়গা সহজে পাওয়া যায় না।"

- "স্মিথ, আমি অকারণে তোমাকে সাবধান করিনি। আমার কথাগুলো একটু ভেবে দেখো।"

একথার কোন উত্তর না দিয়ে স্মিথ বলল, "এবার আমি উঠি লী। বাইচ শেষ হবার বোধ হয় আর বেশি দেরি নেই। বাইচের শেষে আমাকে দেখতে না পেলে হেস্টি নিশ্চয়ই রেগে যাবে আমার উপর। আমি চলি।"

মঙ্কহাউস লীকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে স্মিথ ঘর থেকে বেরিয়ে পথে নেমে হাটতে শুরু করল।

স্মিথ ঠিক করেছিল যে, বাইচ প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যাবার পর সে ডাক্তার প্যাটারসনের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। ডাক্তার প্যাটারসন স্মিথের চাইতে বয়সে একটু বড় হলেও তার সঙ্গে স্মিথের খুবই অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। ডাক্তারের বাড়ি অক্সফোর্ড থেকে কিছুটা দূরে ফার্লিংফোর্ড নামক একটা জায়গায়। তার সুন্দর করে সাজানো লাইব্রেরিতে ডাক্তারী এবং আরও নানা বিষয়ের অনেক বই রয়েছে। সপ্তাহে অন্তত একদিন ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে তার লাইব্রেরিতে বসে স্মিথ নানা বিষয়ে গল্পগুজব করে কিছুটা সময় কাটায়। আজ কিন্তু তার সেখানে যেতেও ভাল লাগল না। এমন কি 'বাইচ' শেষ হওয়া পর্যন্তও সে অপেক্ষা করল না। হেস্টির সঙ্গে দেখা না করেই সে মিনার বাড়ির দিকে পা চালাল। মঙ্কহাউস লীর কথাগুলোই তার মনের মধ্যে কেবল ঘুরপাক খেতে লাগল।

॥ ৯ ॥

মৃত্যুদূত

আপন মনে একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে কিছুক্ষণ নানা পথে ঘুরে বেড়াল। তারপর সন্ধ্যা নাগাদ এসে পৌঁছলো মিনার বাড়ির সামনে। ঘোরানো সিঁড়টা অন্ধকার। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও সিঁড়ির আলোটা জ্বালানো হয়নি কেন? টমাস স্টাইলস কি আলোটা জ্বালাতে ভুলে গিয়েছে? তবে এ রকম ভুল তো তার হয় না কখনও। নাকি আলোটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে? অন্ধকারটা চোখে সয়ে গেলে স্মিথ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল। চেনা সিঁড়ি, ধাপগুলি মুখস্থ, কাজেই অন্ধকারেও স্মিথের উপরে উঠতে কোন অসুবিধা হলো না।

কিছুটা উঠবার পর তার মনে হলো পাশ দিয়ে কেউ যেন চলে গেল। খুব দ্রুতগতিতে কে যেন নিচের দিকে নেমে গেল। স্মিথ কেবল তার পায়ের শব্দই শুনল না,

তার কনুইতে খুব মৃদুভাবে একটা ধাক্কাও যেন লাগল। চমকে উঠে থমকে দাঁড়াল স্মিথ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিচের দিকে তাকাল সে। কিন্তু ঘনায়মান অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। স্মিথ উৎকর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। কানে এল বাতাসে দোলানো আইভি লতার মৃদু ঝির ঝির শব্দ।

কে নিচে নামল ? নিশ্চয়ই টমাস স্টাইলস। স্মিথ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে ? টমাস ?"

কিন্তু উত্তরে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে মিনার বাড়িটা একেবারে নিঝুম নিস্তব্ধ। কোন জনপ্রাণী নেই সেখানে।

স্মিথ ভাবল হয়ত সে ভুল শুনেছে। পুরানো মিনার বাড়ির কোন ফাঁক বা ফাটলের মধ্য দিয়ে আসা বাতাসের ঝাপটাকেই সে হয়ত পায়ের শব্দ বলে ভুল করেছে। কিন্তু মৃদু ধাক্কাটা ? সেটা কি ? সেটাও কি বাতাসের ঝাপটা ? নিজের ব্যাখ্যায় সে নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারল না। তার মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। মনে হলো, না, এ কেবল বাতাসের ঝাপটা নয়, এ আরও কিছু। কিন্তু সেটা কি ? চোর চোর আসেনি তো ?

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল স্মিথ। অবাক হয়ে দেখল বেলিংহ্যামের ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। অবাক কাণ্ড ! দরজাটা তো সবসময়েই বন্ধ থাকে। টেবিলের উপর একটা বাতি জ্বলন্ত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু বেলিংহ্যামের ঘরের ভিতরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দিল স্মিথ। কাফনটার উপর দৃষ্টি পড়তেই সে চমকে উঠল। সেখানে মমিটা নেই। শবাধারে শব নেই। মমিটাকে কি অন্য কোথাও নিয়ে গিয়েছে বেলিংহ্যাম ? তাই হবে। কিন্তু এভাবে দরজা খোলা রেখে বেলিংহ্যাম গেল কোথায় ? তার যদি সত্যিই পোষা কুকুর থেকে থাকে তবে সেটাই বা কই ?

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই নিজের ঘরে পৌঁছে গেল স্মিথ। সে ঘরের আলো জ্বালল না। বাইরের পোশাক না ছেড়েই সে অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ চেয়ারে বসে রইল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। একটু পরেই সিঁড়ির উপরে দুমদাম পায়ের শব্দ শুনে স্মিথ চমকে উঠল।

"স্মিথ ! স্মিথ !" বলে চিৎকার করতে করতে ঘরে ঢুকল হেস্টি।

"আরে হেস্টি যে, কি ব্যাপার ?"

— "ব্যাপার সাংঘাতিক," হাঁপাতে হাঁপাতে হেস্টি বলল, "তোমাকে এক্ষুণি যেতে হবে আমার সঙ্গে।"

"কেন, কি হয়েছে ?"

— "মঙ্কহাউস লী জলে ডুবে গিয়েছে। কাছাকাছি কোন ডাক্তার পেলাম না,

তাই ছুটতে ছুটতে এলাম তোমার কাছে। ভাগ্যিস তোমাকে পেয়েছি! এক্ষুণি চলো। চেষ্টা করলে হয়ত এখনও লী কে বাচানো যেতে পারে।"

—"কি করে জলে ডুবল লী?" স্মিথ প্রশ্ন করল।

—"তা বলতে পারব না," হেস্টি উত্তর দিল।

—"মঙ্কহাউস লী এখন কোথায়?"

– "তাকে তার বন্ধু হ্যাবিংটনের বাসায় শুইয়ে রেখে এসেছি। তুমি আর দেরি করো না।"

—"না না, দেরি করব কেন, একটু দাড়াও ওষুধের বাক্সটা গুছিয়ে নেই।"

ঘরের দরজা বন্ধ করে স্মিথ আর হেস্টি দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগল।

নামবার সময় দেখা গেল বেলিংহ্যামের ঘরের দরজা আগের মতোই খোলা রয়েছে। ম্যমির কফিনটার দিকে চোখ পড়তেই স্মিথের বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে উঠল। সপ্তসমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাস আর তরঙ্গ যেন আছড়ে পড়ল তার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল, শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা যেন প্রবল উত্তেজনায় কেপে উঠল। তারপর, মুহূর্তের জন্য তার দেহমন যেন অসাড় হয়ে গেল।

ম্যমিটা কফিনের মধ্যেই রয়েছে! শবাধারে রয়েছে শব! অথচ স্মিথ দিব্যি গেলে বলতে পারে যে একটু আগেও ম্যামটা কফিনের মধ্যে ছিল না।

তবে কি বেলিংহ্যাম ওটাকে নিয়ে কোথাও গিয়েছিল? সে কি ফিরে এসেছে?

ঘরের ভিতরে উঁকি দিল স্মিথ। না, কেউ নেই। বেলিংহ্যাম এখনও ফিরে আসেনি। তাহলে ম্যামটা ফিরে এল কি করে? লণ্ঠনের আলোয় ম্যমিটাকে যেন আরো বীভৎস– আরো ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। স্মিথের মনে হলো চার হাজার বছরের পুরানো শুকনো মড়াটা যেন নিষ্ঠুর জিঘাংসায় তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। ম্যমিটার দু'চোখের কোটরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্য থেকে দুটো রক্তাভ আভা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে! ম্যমির দেহ নিষ্প্রাণ হলেও কোটরাগত চোখ দুটি যেন নিষ্প্রাণ নয়!

আচ্ছন্নের মতো ম্যামটার দিকে তাকিয়ে রইল স্মিথ। বিস্ময় বিমূঢ় স্মিথের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল হেস্টির চিৎকারে। সে ততক্ষণে নিচে নেমে গিয়েছে। সেখান থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "কি ব্যাপার স্মিথ? মঙ্কহাউস লী র এখন তখন অবস্থা, তুমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছ কেন? এক্ষুণি নেমে এস ..দেরি করলে লী কে আর বাঁচানো যাবে না।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ...এক্ষুণি যাচ্ছি আমি। হেস্টি, তুমি বরং এগিয়ে একখানা গাড়ি ধরবার চেষ্টা কর।"

কপাল খারাপ। গাড়ি পাওয়া গেল না। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে স্মিথ আর হেস্টি নদীর ধারে হ্যাবিংটনের বাসায় হাজির হলো।

ভিজে গাছের গুড়ির মতো বিছানায় পড়ে আছে অচেতন মঙ্কহাউস লী। তার

পোশাক-পরিচ্ছদ ভিজে একেবারে ঢোল হয়ে গিয়েছে। এখনও জল গড়িয়ে পড়ছে পোশাক থেকে। কালো কোকড়ানো চুলে আটকে রয়েছে সবুজ শেওলা। চোখের কালো মণিদুটো উঠে গিয়েছে চোখের উপরের দিকে। চোখ দুটি দৃষ্টিহারা। ঠোঁট দু'টি নীল হয়ে গিয়েছে। ঠোঁটের দু'কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে সাদা ফেনা। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় তার সমস্ত শরীরটা থর থর করে কেঁপে উঠছে।

অচেতন লী-র পাশে হাটু মুড়ে বসে আছে তার বন্ধু হ্যারিংটন। সে লী-র ঠাণ্ডা শরীরটাকে গরম করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

স্মিথ আর হেস্টিকে ঘরে ঢুকতে দেখে হ্যারিংটন তাদের দিকে তাকাল। কোন কথা না বলে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে স্মিথ অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতোই লী-র নাড়ি দেখল। নাড়ি পরীক্ষা শেষ হলে সে বলল, "নাড়ির গতি অস্বাভাবিক নয়। ওকে দেখে ওর অবস্থাটা যত খারাপ মনে হচ্ছে, আসলে অবস্থাটা কিন্তু ততখানি সঙ্গীন নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও সুস্থ হয়ে উঠবে। হেস্টি, এস...ধর...লী-কে উপুড় করে দেওয়া দরকার। মিস্টার হ্যারিংটন, একখানা শুকনো তোয়ালে দরকার। আছে আপনার কাছে?"

—"হ্যা, আছে। এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।"

লী-র পাশ থেকে উঠল হ্যারিংটন।

সে একটু দূরে যেতেই স্মিথ চুপি চুপি হেস্টিকে বলল, "আমি কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি। লী জলে ডুবে গেলেও ওর পেটে কিন্তু এক ফোটা জলও যায়নি। আমার ধারণা জলে ডোবার আগেই ও ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।"

স্মিথের কথা শুনে হেস্টি অবাক হয়ে গেল। বলল, "তা হলে ওকে ঘুরিয়ে ওর পেটের ভিতর থেকে জল বের করতে হবে না?"

—"না, আমার ধারণা কিছুক্ষণ বিশেষ কায়দায় 'ম্যাসেজ' করলেই লী সুস্থ হয়ে উঠবে।"

—"কিন্তু কি দেখে লী ভয় পেল? এখানে ভয় পাবার মতো কি আছে?" হেস্টি যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল।

— "সেটা লী-র জ্ঞান ফিরে এলেই জানা যাবে," গম্ভীরভাবে স্মিথ বলল। "এবার ওর চেতনা ফিরিয়ে আনবার জন্য চেষ্টা শুরু করা যাক।"

একখানা শুকনো তোয়ালে নিয়ে হ্যারিংটন এল। সেখানা দিয়ে মঙ্কহাউস লী-র সমস্ত শরীর ভাল করে মুছে দিল স্মিথ। তারপর ডাক্তারী কায়দায় মঙ্কহাউস লী-র দেহটা ভাল করে 'ম্যাসেজ' করে দিতে লাগল।

কিছুক্ষণ 'ম্যাসেজ' করবার পরই লী-র জলে ডোবা ঠাণ্ডা শরীরটা অনেকটা গরম হয়ে উঠল। তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই স্বাভাবিক হয়ে এল, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল। তারপর একসময় ধীরে ধীরে তার চোখের পাতা খুললো।

চিন্তার মেঘ কেটে গিয়ে তিনজনের মনেই খুশির আলো জ্বলে উঠল। কয়েক

হ্যাবিংটনই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙল। সে বলল, "উঃ! কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম!"

স্মিথ বলল, "মিঃ হ্যাবিংটন, একটা পেয়ালা দিন।"

—"হ্যাঁ...হ্যাঁ, এই যে দিচ্ছি।"

হ্যাবিংটন পেয়ালা দিতেই স্মিথ ডাক্তারী ব্যাগের ভিতর থেকে একটা ব্র্যান্ডির শিশি বের করে পেয়ালার মধ্যে কিছুটা ব্র্যান্ডি ঢালল। তারপর পেয়ালাটাকে মঙ্কহাউস লী-র মুখের সামনে এগিয়ে ধরে বলল, "এটুকু খেয়ে নাও।"

পলকহারা চোখে চারদিকে তাকাল লী। তার মুখ ভাবলেশহীন। ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে লী ধীরে ধীরে স্মিথের দিকে তাকাল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে বোধ হয় পরিবেশটাকে বুঝবার চেষ্টা করছিল।

কোমল গলায় স্মিথ বলল, "তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ লী, আর কোন ভয় নেই। এই ব্র্যান্ডিটুকু খেয়ে নাও। দেখবে তুমি আরও ভাল বোধ করবে।"

পেয়ালার ব্র্যান্ডিটুকু খেয়ে নিল মঙ্কহাউস লী।

একখানা চেয়ারে বসতে বসতে হ্যাবিংটন বলল, "উঃ! কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম! কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটা যে কি ভাবে ঘটল, তা আমি এখনও বুঝতে পারছি না। আমি আর লী এ ঘরে বসে কিছুক্ষণ গল্প গুজব করলাম। তারপর লী বলল, 'আমি নদীর ধার থেকে একটু ঘুরে আসছি।' সে বেরিয়ে যাবার পর আমি একখানা বই খুলে বসলাম। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে আমার চোখ চলে যাচ্ছিল নদীর দিকে। দেখছিলাম লী পায়চারি করছে নদীর ধারে। হঠাৎ একটা ভয় ব্যাকুল তীব্র আর্তনাদ শুনতে পেলাম, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুনলাম নদীর জলে ঝপ্ করে কোন ভারী জিনিস পড়বার শব্দ।

"চমকে উঠে জানালা দিয়ে নদীর দিকে তাকালাম। কিন্তু লী কে দেখতে পেলাম না। এক ছুটে নদীর পাড়ে চলে এলাম। কিন্তু নদীর পারে জনপ্রাণী নেই। তবে কি...তবে কি বন্ধু লী ই জলে পড়ে গেল? প্রশ্নটা মনে আসতেই আমার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে মহা আতংকের একটা তুহিন শীতল স্রোত বয়ে গেল। মঙ্কহাউস লী তো একেবারেই সাঁতার জানে না!

"শেষ পর্যন্ত জলের তলা থেকে লী কে যখন খুজে পেলাম তখন ওর শোচনীয় অবস্থা। মনে হলো ওকে বোধ হয় আর বাচানো যাবে না। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। সৌভাগ্যক্রমে হেস্টির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাইচের শেষে সে নদীর ধার দিয়ে নিজের বাসায় ফিরছিল। লী র অবস্থা দেখে সে তৎক্ষণ ডাক্তারের খোজে ছুটল। আপনারা সময়মতো না এলে যে কি হোত, তা ভাবতেও আমার গা শিউরে উঠছে।"

এতক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে হ্যাবিংটন থামল।

ততক্ষণে মঙ্কহাউস লী অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। সে বিছানায় উঠে বসবার চেষ্টা করতেই তিনজনে ধরাধরি করে তাকে বসিয়ে দিল।

"তুমি হঠাৎ কি করে জলে পড়ে গেলে লী?" হ্যাবিংটন জিজ্ঞেস করল।

—“আমি তো পড়ে যাইনি,” লী বলল।

—“তবে ?”

—“আমাকে...আমাকে জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।”

—“সেকি! কে ঠেলে ফেলে দেবে ?” হ্যারিংটন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—“পরিষ্কার করে তা বলার সময় এখনও আসেনি। জলের দিকে মুখ করে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন আমাকে হাল্কা একটা পাখির পালকের মতো শূন্যে তুলে নদীর জলে ছুড়ে ফেলে দিল। জলে পড়বার আগেই বোধ হয় দারুণ আতংকে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। যে আমাকে আক্রমণ করেছিল তাকে আমি দেখিনি। কিন্তু সে কে বা কি তা আমি অনুমান করতে পারি। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি না জানি না। কিন্তু আমি যা বললাম তার প্রতিটি বর্ণ সত্যি।”

লী র কানের কাছে মুখ এনে স্মিথ বলল, “আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি লী।”

অবাক হয়ে লী মুখ তুলল। স্মিথের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে মৃদুস্বরে বলল, “তুমি বিশ্বাস করো ?”

অদ্ভুত দৃষ্টিতে লী র দিকে তাকিয়ে স্মিথ বলল, “হ্যা, বিশ্বাস করি।”

অধৈর্য কণ্ঠে হেস্টি বলল, “তোমাদের কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না। স্মিথ, তুমি তো ডাক্তার। লী এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেনি। ওকে এত বকাচ্ছ কেন ? এখন ওকে বিশ্রাম করতে দাও। ও শুয়ে পড়ুক। পরে গল্প করবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। এবার আমাকে উঠতে হচ্ছে। অনেকটা পথ যেতে হবে। আমি চললাম।”

স্মিথ বলল, “একটু দাড়াও। আমাকেও বাসায় ফিরতে হবে। তোমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়া যাক। তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আজকের রাতটা তুমি বরং এখানেই থেকে যাও।”

স্মিথ আর হেস্টি একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

॥ ১০ ॥

আলোর ইশারা

হেস্টি আর স্মিথ অনেকটা পথ একসঙ্গে গেলেও স্মিথ কিন্তু চুপচাপই ছিল। তার মনের মধ্যে কতগুলি ঘটনা কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল। অন্ধকার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ, কফিন থেকে ম্যামির অন্তর্ধান, ম্যামির প্রত্যাবর্তন, মঙ্কহাউস লীর উপর আক্রমণ, লং মর্টনকে হত্যার চেষ্টা —এ সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য মনে হলেও একটা সন্দেহ ধীরে ধীরে

হাত রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। বেলিংহ্যাম নিঃসন্দেহে অপরাধী। কিন্তু তার অপরাধ প্রমাণ করা যাবে না। নরহত্যা করবার জন্য সে এমন এক অস্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে, যা আগে কেউ কোনদিন নেয়নি। এরকম অস্ত্রের কথা কেউ বোধহয় কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি।

হেস্টির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাসার দিকে যেতে যেতে স্মিথ ভাবল, লী-র কথাই ঠিক। বেলিংহ্যামের কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল। লী-র পরামর্শই মেনে নেবে সে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে মিনার বাড়ির ঘর ছেড়ে দেবে। ওরকম ঘর হয়ত আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু ঘর না ছেড়ে উপায় কি? সারারাত ধরে রহস্যময় পদশব্দ শুনতে হলে তার পড়াশোনা তো মাথায় উঠবে। মন অন্যদিকে চলে গেলে সে লেখাপড়া করবে কি করে?

সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকবার আগেই রাস্তা থেকে স্মিথ দেখল যে, বেলিংহ্যামের ঘরে আলো জ্বলছে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময় সে দেখল বেলিংহ্যাম তার ঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজের মনের উত্তেজনা সে পুরোপুরি চেপে রাখতে পারেনি। সেই উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছে ঝকঝকে দুটি চোখের মধ্য দিয়ে।

স্মিথকে দেখে বেলিংহ্যাম বলল, "এই যে স্মিথ, এখন ফিরলে?"

"হ্যাঁ," স্মিথ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

"ফিরতে বেশ দেরি হলো, কোথায় গিয়েছিলে?"

"আড্ডা দিতে নয়, কাজেই গিয়েছিলাম," রাগতস্বরে স্মিথ জবাব দিল।

"এসো আমার ঘরে। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করা যাক।"

"সময় নেই," স্মিথ চড়া গলায় বলল।

মনের ভিতরের প্রচণ্ড ক্রোধকে যেন কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না স্মিথ।

"খুবই ব্যস্ত?" বেলিংহ্যাম প্রশ্ন করল।

স্মিথ কোন উত্তর দিল না।

"শুনলাম মঙ্কহাউস লী নাকি জলে ডুবে গিয়েছিল? কিন্তু দুর্ঘটনাটা ঘটল কি করে? খবরটা শুনে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। ঝগড়া ঝাঁটি যাই হোক না কেন, ওর সঙ্গে তো আমার অনেক দিনের পরিচয়।"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল স্মিথ। এত তাড়াতাড়ি বেলিংহ্যাম খবরটা জানল কি করে?

বেলিংহ্যামের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল স্মিথ। দেখল, তার চোখ দুটো শয়তানী আর ধূর্তামিতে ভরা। বেলিংহ্যামের ঠোঁটের কোণের চাপা বিদ্রূপের হাসিও স্মিথের নজর এড়াল না। নিজেকে আর সামলাতে পারল না স্মিথ। বেলিংহ্যামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ, লী জলে ডুবে গিয়েছিল। কিন্তু এখন সে ভালই আছে। আপাতত তার বিপদের কোন সম্ভাবনাই নেই। আমার কথাগুলো শুনে তুমি নিশ্চয়ই খুশি হচ্ছ না। না হবারই কথা। কারণ আমি বেশ ভাল করেই জানি যে মঙ্কহাউস লী-র দুর্ঘটনার পিছনে ছিল তোমারই কালো হাত। ভগবানকে

ধন্যবাদ যে তোমাব শয়তানী—তোমাব হত্যাব চেষ্টা এবাবও সফল হযনি। না না—অবাক হবাব অভিনয কবে তুমি আমাকে ভোলাতে পাববে না। আমি সব জেনেছি। তোমাব আসল রূপটাকে আমি চিনতে পেবেছি।”

– “তোমাব কথা আমি কিছুই বুঝতে পাবছি না। তুমি কি মনে কব লী-ব দুর্ঘটনাব জন্য আমিই দাযী ? আমি কি লী কে জলে ফেলে দিযেছি ?”

—“হ্যাঁ তুমি ই,” স্মিথ গর্জন কবে উঠল, “তোমাব ঐ ম্যমিটাকে জাগিযে তুমি সেটাকে মঙ্কহাউস লী ব পিছনে লেলিযে দিযেছিলে। শুধু তাই নয, লং টনকেও আক্রমণ কবেছিল তোমাব ম্যামটা।”

বেলিংহ্যাম প্রতিবাদ কবে বলল, “তা কি কবে সম্ভব ? মডাকে কি কেউ জাগাতে পাবে ? কেমন কবে জাগাবে ?”

—“তা জানি না। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই অসম্ভবই সম্ভব হযেছে।”

“তুমি কি পাগল হযে গেলে স্মিথ ?”

“মোটেই পাগল হইনি। আমি যা বলছি তা সুস্থ মাথায ভাল কবে জেনেশুনেই বলছি। শোনো বেলিংহ্যাম, তোমাবে আমি শেষ বাবেব মতো সাবধান কবছি। তুমি এখানে থাকবাব সময কলেজেব বন্ধুদেব মধ্যে যদি কাবো কোন ক্ষতি হয, তবে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না। উচিত শিক্ষাই দেব তোমাকে। আব তাব জন্য দাযী হবে তুমি নিজেই। তোমাব ঐ মিশবী মন্তুব তন্ত্রব আব ভকতাক এখানে চলবে না।”

“অ্যাবসার্ড স্মিথ, তোমাব মাথাটা দেখছি সত্যি সত্যিই খাবাপ হযে গেছে,” চিবিযে চিবিযে বেলিংহ্যাম বলল।

“হতে পাবে। কিন্তু আমাব কথাগুলি মনে বেখো। সেগুলিকে পাগলেব প্রলাপ বলে উড়িযে দিও না।”

“তোমাব এখন ওষুধেব দবকাব,” অদ্ভুত গলায বেলিংহ্যাম বলল।

“সে আমি বুঝব।”

আব কথা না বাড়িযে স্মিথ সোজা চলে এলো নিজেব ঘবে। বেলিংহ্যাম থমথমে মুখে নিজে ঘবেব খোলা দবজাব সামনেই দাঁড়িযে বইল।

ঘবে এসে দবজাটা ভেতব থেকে বন্ধ কবে দিল স্মিথ। তাবপব গোলাপ কাঠেব পাইপে তামাক ভবে ধূমপান কবতে কবতে স্মিথ গোটা ব্যাপাবটা খুঁটিযে খুঁটিযে ভাবতে লাগল।

একটু পবেই দড়াম কবে একটা শব্দ হলো। বেলিংহ্যাম তাব ঘবেব দবজা বন্ধ কবল।

সে বাতে স্মিথ আব কোনভাবেই পডাশোনায মন দিতে পাবল না।

॥ ১১ ॥

মবণেব কবাল কালো ছাযা

পবেব দিন সকালেব দিকে বেলিংহ্যামেব ঘব থেকে কোন পাযেব শব্দ বা গলাব

আওয়াজ পাওয়া গেল না। বেলিংহ্যামকে দেখতেও পেল না স্মিথ। অবশ্য দেখতে সে ইচ্ছুকও ছিল না। দেখা হলে সে এড়িয়েই যেত বেলিংহ্যামকে।

সামনে পরীক্ষা। কিন্তু কয়েকদিন ধরে পড়াশোনা মোটেই হচ্ছে না। বেলিংহ্যামের ব্যাপারের সঙ্গে সে এমন ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে বই-এর পাতায় মোটেই মন বসছে না।

বেলিংহ্যাম সংক্রান্ত সমস্ত চিন্তাকে জোর করে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে স্মিথ সকাল থেকে সারাটা দিন নিজের পড়াশোনা নিয়েই কাটিয়ে দিল। সন্ধ্যার দিকে সে ভাবল যে, ডাক্তার প্যাটারসনের বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসা যাক। গতকাল যাবে ঠিক করেও সে যেতে পারেনি।

বাইরে যাবার পোশাক পরে স্মিথ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবার সময় সে দেখল বেলিংহ্যামের ঘরের দরজাটা যথারীতি বন্ধ। সদর দরজা পেরিয়ে রাস্তায় নেমে স্মিথ দেখল বেলিংহ্যামের ঘরের একটা জানালা খোলা এবং তার ঘরে আলো জ্বলছে। সে আরও লক্ষ্য করল বেলিংহ্যাম জানালা দিয়ে ঝুঁকে কি যেন দেখছে। সম্ভবত স্মিথকে দেখতে পায়নি সে।

অক্সফোর্ডশায়ার লেন দিয়ে স্মিথ এগিয়ে চলল। রাস্তাটা বেশ নির্জন। এ রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার চলাচল খুবই কম। রাস্তার দু'পাশে বড় বড় ঝাঁকড়া গাছ। রাস্তার আলোগুলিও অনেকটা দূরে দূরে। শান্ত বাতাস বইছে ঝির ঝির করে। বড় মিঠে বাতাস। এ বাতাস দেহ-মন যেন জুড়িয়ে দেয়। খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে চলেছে আকাশ পথে। মাথার উপর চন্দ্রকলা। কিন্তু ম্লান জ্যোৎস্না। দু'পাশে গাছের সারির মাঝখানের রাস্তাটাকে পুরোপুরি আলোকিত করে তুলতে পারেনি। আলো আর ছায়ার লুকোচুরি খেলা চলছে সেখানে। সেই আলো-আঁধাবি পবিবেশে সবকিছুই কেমন যেন রহস্যময় - কেমন যেন অপার্থিব বলে মনে হচ্ছে।

পথ একেবারে নির্জন। এমনকি কাছাকাছি কোন মানুষজন আছে বলে মনে হয় না।

স্মিথ দ্রুত পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

সামনেই একটা বড় 'পার্ক'। পার্কের ওপারেই ডাক্তার প্যাটারসনের বাডি। বাড়ির একটা আলোকিত জানালা দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে না গিয়ে পার্কেব ভিতর দিয়ে গেলে পথটা অনেক সংক্ষেপ হয়। সময়ও বাঁচে। অনেকেই ফার্লিংফোর্ডে যেতে হলে পার্কের ভিতর দিয়েই যায়।

লোহার গেটটা খুলে স্মিথ পার্কের ভিতরে ঢুকল। পিছন ফিরে গেট বন্ধ করতে গিয়ে স্মিথ দেখল যে পথ দিয়ে সে এসেছিল সেই পথে একটা দীর্ঘ অপচ্ছায়া দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে পার্কটার দিকে। আলো-আঁধারির পরিবেশে ছায়ামূর্তিটাকে স্পষ্ট চেনা না গেলেও স্মিথ অনুমান করতে পারল, কে ছুটে আসছে। মূর্তিটার চোখের ভিতর থেকে লাল আগুনের আভা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

নিদারুণ আতঙ্কে স্মিথের সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে

সে প্রাণরক্ষার তাগিদে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। ডাক্তার প্যাটারসনের বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। কোনরকমে একবার পার্কটা পেরোতে পারলেই নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে। কিন্তু মৃত্যুদূত সেখানেও হানা দেবে কিনা, তাই বা কে জানে? কিন্তু পার্কের পুরো পথটাতেই পাথরের ছোট ছোট নুড়ি বিছানো থাকায় যত জোরে ছোটা দরকার তত জোরে স্মিথ ছুটতে পারছে না। বার বার পা আটকে যাচ্ছে। স্মিথ স্পষ্টই বুঝতে পারল যে তার আর ভয়াল ভয়ঙ্কর মৃত্যুদূতের মধ্যে দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। একবার হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে স্মিথ কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। আর একটু...আর একটু গেলেই পার্ক পেরিয়ে ফার্লিংফোর্ডে পৌঁছনো যাবে।

রক্তলোলুপ হিংস্র নেকড়ের মতো মূর্তিমান আতংক ছুটে আসছে ঝড়ের গতিতে। তার চোখ দুটো নিষ্ঠুর জিঘাংসায় জ্বল জ্বল করছে রক্ত-রাঙা চুনীর মতো। শোনা যাচ্ছে হাড়ের খট্‌খট্‌ শব্দ। মূর্তিটা একখানা অস্থিসার কুচকুচে কালো হাত বাড়াল স্মিথের দিকে। স্মিথ আর হাতের মধ্যে ব্যবধান সামান্য—খুবই সামান্য। এক্ষুণি জীবন্ত মৃতের মৃত্যু-শীতল বাহু হতভাগ্য স্মিথকে বেঁধে ফেলবে মরণ আলিঙ্গনে। আর নিস্তার নেই—আর উপায় নেই!

বাঁচবার অদম্য ইচ্ছায় স্মিথ আবার প্রাণপণে ছুটতে শুরু করল। সামনে পার্কের রেলিং। এক লাফে রেলিংটা পেরিয়ে ফার্লিংফোর্ডে এসে পড়ল স্মিথ।

সামনে ডাক্তার প্যাটারসনের বাড়ি। ভাগ্য ভাল, বাড়ির সদর দরজাটা খোলা। দমকা হাওয়ার মতো খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকল স্মিথ। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে খিল আটকে দিল। তারপর অস্ফুট আর্তনাদ করে অর্ধ-অচেতনের মতো শুয়ে পড়ল স্মিথ। তার বুকটা হাপরের মতো ওঠা-নামা করতে লাগল।

দরজা বন্ধ করার শব্দ শুনে লাইব্রেরি ঘর থেকে ছুটে এলেন ডাক্তার প্যাটারসন। স্মিথের অবস্থা দেখে চমকে উঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি ব্যাপার স্মিথ? তোমার কি হয়েছে? এ রকম করছ কেন?"

—"বলব—সব বলব, আগে একটু জল দাও," হাঁপাতে হাঁপাতে স্মিথ বলল।

ডাক্তার প্যাটারসন ছুটে গিয়ে পাশের ঘর থেকে জল, ব্র্যান্ডি আর কাচের গ্লাস নিয়ে এলেন।

জল আর ব্র্যান্ডি খেয়ে স্মিথ একটু সুস্থ হলো। তার মুখের ফ্যাকাসে ভাবটা কেটে গিয়ে সেখানে স্বাভাবিক রঙ ফিরে এল। কিন্তু আতঙ্কের ভাবটা তখনও কেটে যায়নি। স্মিথের বুকটা তখনও হাপরের মতো ওঠা-নামা করছে। নিদারুণ আতংকে চোখের মণিদুটো তখনও নিশ্চল হয়ে রয়েছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে স্মিথ বলল, "বরাত জোরে খুব বেঁচে গিয়েছি। আজ রাত্তিরে তোমার বাড়িতেই আমি থাকব, প্যাটারসন। তুমি জান আমি ভীরু নই। আমার অতি বড় শত্রুও আমাকে ভীরুতার অপবাদ দিতে পারবে না। কিন্তু আমি যে মহাবিপদে

পড়েছিলাম—যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তাতে ভোরের আগে পথে বেরোবার মতো সাহস আমার নেই।"

অবাক হয়ে স্মিথের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার প্যাটারসন বললেন, "তুমি আমার বাড়িতে রাত্রিবাস করলে আমার কোন অসুবিধাই হবে না। বরং তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে অনেক রাত পর্যন্ত তোমার সঙ্গে গল্প করে আমি আনন্দই পাব। কিন্তু বন্ধু, তুমি কি জন্য এত ভয় পেয়েছ, আমি তো তাই বুঝতে পারছি না।"

—"কি জন্য এত ভয় পেয়েছি? চল, তোমাকে দেখাচ্ছি।"

স্মিথ প্যাটারসনকে রাস্তার দিকের জানালাটার কাছে নিয়ে এল। বাইরেটা আলো-আঁধারিতে রহস্যময়। চারদিক নিঝুম-নিস্তব্ধ। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। পার্কের ভিতরেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাড়ির গেটের সামনে ঝোপঝাড়। সেখানে অন্ধকার গাঢ়তর। সেদিকে চোখ পড়তেই স্মিথ শিউরে উঠে সজোরে ডাক্তার প্যাটারসনের হাত চেপে ধরল।

অন্ধকারের মধ্যেও আরও অন্ধকার একটা সুদীর্ঘ এবং বিশীর্ণ মূর্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ছায়ামূর্তির চোখ দুটো যেন আগুনের গোলার মতো ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে।

—"দেখেছ!" আতংকে আর উত্তেজনায় স্মিথের গলা কেঁপে গেল।

—"হ্যাঁ, দেখেছি। এবার আমার হাতখানা ছাড় দেখি। এত জোরে চেপে ধরেছ যে ব্যথা লাগছে।"

—"কি দেখলে?" স্মিথ প্রশ্ন করল।

—"দেখলাম একটা খুব লম্বা আর রোগা মূর্তি। আমরা ওকে লক্ষ্য করছি, এটা বুঝতে পেরেই ও গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। ও কে?"

—"ও হলো মূর্তিমান মৃত্যু। খুব অল্পের জন্য ওর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি।"

—"তুমি তো এখনও দমকা বাতাসে পাতা যেমন কাঁপে তেমনি কাঁপছ। ব্যাপারটা [illegible] ঐ লম্বা আর রোগা লোকটার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক? আমাকে সব কথা খুলে বল।"

—"তোমাকে সব কথাই খুলে বলব প্যাটারসন," দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্মিথ বলল, "কিন্তু আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না। তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। এ কাহিনী যেমন অলৌকিক, তেমনই অবিশ্বাস্য।"

—"বিশ্বাস করব কি করব না, তা তো পরের কথা। আগে তোমার কাহিনীটাই শোনা যাক," ডাক্তার প্যাটারসন বললেন।

—"এস লাইব্রেরি ঘরে যাওয়া যাক। সেখানে বসে এ ব্যাপারের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব কথা আমি তোমার কাছে বলব। শুনলে বুঝতে পারবে আমি অকারণে ভয় পাইনি। অবশ্য আমার কথাগুলি যদি তুমি বিশ্বাস কর তাহলেই বুঝবে কি ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে আমি পড়েছিলাম।"

ডাক্তার প্যাটারসনের সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরি ঘরে এসে বসল অ্যাবারক্রোম্বি স্মিথ। ডাক্তার বললেন, "এইবার শুরু কর তোমার কাহিনী।"

স্মিথ তাব বুনোগোলাপ কাঠেব পাইপে তামাক ভবল, তাবপব ধূমপান কবতে কবতে বেলিংহ্যামেব অজ্ঞান হয়ে যাবাব বাত থেকে ডাক্তাব প্যাটাবসনেব বাড়িতে তাব আসা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই এক এক কবে বলে গেল।

শুনে ডাক্তাব প্যাটাবসন তো স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ তিনি কোন কথাই বলতে পাবলেন না। তাবপব যেন বাক্‌শক্তি ফিবে পেয়েই বললেন, "এসব তুমি কি বলছ, স্মিথ ? এ কি সম্ভব ?"

"হ্যা প্যাটাবসন," স্মিথ বলল, "আমাব বক্তব্যেব প্রতিটি শব্দ সত্যি—একটি শব্দও মিথ্যে নয়। পুবানো পুঁথি থেকে প্রাচীন মন্ত্র উদ্ধাব কবে তাব সাহায্যে ম্যমিকে সাময়িকভাবে জীবন্ত কবে শত্রুব উপব প্রতিশোধ নেবাব পৈশাচিক পথ পৃথিবীতে বোধ হয় আজ পর্যন্ত কেউ গ্রহণ কবেনি। ভবিষ্যতেও এই নাবকীয় পদ্ধতি কেউ অনুসবণ কববে বলে মনে হয় না। শোন প্যাটাবসন, শয়তানেব অবতাব বেলিংহ্যামেব শয়তানী আমি চিবদিনেব মতো খতম কবে দেব। হ্যা, আমিও প্রতিশোধ নেব। নেবই। বন্ধুবান্ধবদেব জন্য, মানবকতাব জন্য, নিজেকে বাচাবাব জন্য আমাকে প্রতিশোধ নিতেই হবে। আমিও যে খুব সহজ মানুষ নই, তা বেলিংহ্যামকে বেশ ভাল কবেই বুঝিয়ে দিতে হবে।"

উত্তেজনায় স্মিথেব কণ্ঠস্বব কাঁপতে লাগল।

"কিন্তু কি কবে প্রতিশোধ নেবে ?" ডাক্তাব প্যাটাবসন প্রশ্ন কবলেন।

স্মিথেব ঠোঁটে ফুটে উঠল এক বিচিত্র হাসি। সে হাসি কেবল বিচিত্র নয়, বহস্যময় এবং [illegible] ডাক্তাব প্যাটাবসনেব দিকে তাকিয়ে সে বলল, "তা এখন বলব না। পবে বলব। কাল আমাব অনেক কাজ। আজ বাতে আমি একটু ভাল কবে ঘুমিয়ে নিতে চাই।"

ডাক্তাব প্যাটাবসন ব্যস্ত হয়ে বললেন, "হ্যা, হ্যা, মিসেস বার্নিকে তোমাব খাওয়া আব শোবাব ব্যবস্থা কববাব জন্য এক্ষুণি বলে আসছি।"

সে বাতটা ডাক্তাব প্যাটাবসনেব বাড়িতেই কাটাল স্মিথ।

॥ ১২ ॥

প্রতিশোধ

অ্যাবাবক্রোম্বি স্মিথ খুব ধীব স্থিব স্বভাবেব মানুষ। উত্তেজিত হয়ে বা হঠাৎ বেগে গিয়ে কোন কিছু কবে ফেলা তাব স্বভাববিরুদ্ধ। অনেক ভেবে চিন্তে অনেক বিচাব বিবেচনা কবে সে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবে এবং তাবপব সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ কবে। কোন কাবণে একবাব সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজে অগ্রসব হলে তাকে সেখান থেকে সবানো খুবই শক্ত। স্মিথ [illegible] যে আজকেব দিনটাব সে পুবো সদ্ব্যবহাব কববে। কিছুতেই দিনটাকে নষ্ট হতে দেবে না সে। বেলিংহ্যামেব শয়তানীব ইতি টানতে হবে আজকেই।

সকালে ডাক্তার প্যাটারসনের কাছে নিজের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু না বলে স্মিথ ডাক্তারের কাছ থেকে বিদায় নিল।

প্রথমেই সে গেল ক্লিফোর্ডের বন্দুকের দোকানে। সেখান থেকে একটা ভারী রিভলভার আর কিছু কার্তুজ কিনল স্মিথ। রিভলভারে কার্তুজ ভরে সে অস্ত্রটাকে নিজের কোটের পাশ-পকেটে রাখল। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল মিনার বাড়ির দিকে।

বেলিংহ্যামের ঘরের দবজা খোলা। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘরের মধ্যে ঢুকল স্মিথ। কোনরকম অনুমতির অপেক্ষা করল না। টেবিলের সামনে বসে মাথা নিচু করে এক মনে কি যেন লিখছে বেলিংহ্যাম। সামনে টেবিলের উপর নানা জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে আর রয়েছে একখানা বড় এবং ধারাল ছুরি। কফিনের মধ্যে ম্যমিটা আগের মতোই নিষ্প্রাণ এবং নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। চারদিকে ভাল করে দেখে স্মিথ দরজাটা বন্ধ কবে দিল।

দরজা বন্ধ করার শব্দে চমকে মুখ তুলল বেলিংহ্যাম। স্মিথকে দেখে সে আরও চমকে উঠল। কিছুক্ষণ তার মুখে কোন কথা ফুটল না। সে অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল স্মিথের মুখের দিকে। জীবিত অবস্থায় স্মিথকে দেখবার আশা সে মোটেই করেনি।

––"স্মিথ ? ব্যাপার কি ? হঠাৎ এখন এলে ?"

বেলিংহ্যামের প্রশ্নের কোন জবাব দিল না স্মিথ। 'ফায়ারপ্লেস' এ আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল। সে লোহাব দণ্ডটা দিয়ে আগুনটাকে ভাল কবে উসকে দিল। তারপর বসল বেলিংহ্যামের মুখোমুখি একখানা চেয়ারে। নিজের ঘড়িটাকে খুলে টেবিলের উপরে রাখল স্মিথ। কোটেব পাশ পকেটে হাত দিয়ে সদ্যকেনা রিভলভারটাকে স্পর্শ করল। যে কোন মুহূর্তেই এটার প্রযোজন হতে পারে।

বেলিংহ্যাম স্মিথের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। এবার সে ধীরকণ্ঠে বলল, "কি ব্যাপার স্মিথ ? তুমি কি চাও ?"

––"আমি চাই তুমি টেবিলেব উপব থেকে ঐ ধারাল ছুরিখানা তুলে নাও।"

––"কেন ? ছুরি তুলব কেন ? ছুরি দিয়ে কি হবে ?" বিস্মিতভাবে বেলিংহ্যাম প্রশ্ন করল।

––"তোমার ঐ ম্যমিটাকে কেটে ফেলতে হবে," দৃঢকণ্ঠে স্মিথ বলল।

––"কি বলছ তুমি! ম্যমিটাকে কেটে ফেলব কেন ? জান, এটার দাম কত ?"

––"আমার জানবার প্রয়োজন নেই। যা বললাম তাই কর," গম্ভীর গলায় স্মিথ বলল।

––"কিন্তু কেন ? আমার এই মহামূল্যবান সংগ্রহটিকে আমি নষ্ট করব কেন ?"

––"কারণ আছে বলেই নষ্ট করবে। বেলিংহ্যাম, তোমার শয়তানী আমি ভাল করেই বুঝতে পেরেছি। ম্যমির রহস্যও আমার অজানা নয়। বহুযুগ আগের ঐ বাসি

মডাকে জাগিয়ে তুমি শত্রুর পিছনে লেলিয়ে দাও। আমার পিছনেও লেলিয়ে দিয়েছিলে। কি তোমার মুখখানা এত ফ্যাকাসে হয়ে গেল কেন?"

—"এসব তুমি কি বলছ স্মিথ?" অস্ফুট স্বরে বেলিংহ্যাম প্রশ্ন করল।

—"আমি ঠিকই বলছি। আর ঠিক যে বলছি একথা তুমি বেশ ভাল করেই জান। নরহত্যার জন্য তুমি এমন উপায় অবলম্বন করেছ যে আইন তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু বেলিংহ্যাম, আমার নিজস্ব একটা আইন আছে। সরকারী আইনের হাত থেকে তুমি রেহাই পেলেও আমার নিজস্ব আইন তোমাকে সাজা দেবে। পাচ মিনিটের মধ্যে তুমি যদি ম্যমিটাকে কাটতে শুরু না কর, তবে আমার পিস্তলভাবের একটি গুলি তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে।"

—"তুমি...তুমি আমাকে খুন করবে?" আতঙ্কভরা গলায় বেলিংহ্যাম বলল।

—"হ্যাঁ, তোমার মতো মূর্তিমান শয়তানকে খুন করতে আমি একটুও ইতস্তত করব না। তোমার বুক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে আমার হাত একটুও কাঁপবে না।"

—"কিন্তু ম্যমিটাকে কেন কেটে ফেলব তা ই তো জানতে পারলাম না," ভীরু গলায় বেলিংহ্যাম বলল।

"আবার ন্যাকামি," স্মিথ গর্জন করে উঠল, "তোমার শয়তানী বন্ধ করবার জন্যই ম্যমিটাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে?"

—"কিন্তু আমি কি করেছি?"

—"সে কথা কি খুলে বলতে হবে? তা তো তুমিও জান, আমিও জানি," ব্যঙ্গের সুরে স্মিথ বলল।

"তুমি যে কি বলছ, তাই আমি বুঝতে পারছি না," নিস্তেজ গলায় বেলিংহ্যাম বলল।

"আর কথা বলে সময় নষ্ট করব না। আর পাচ মিনিটের মধ্যেই তোমাকে কাজ শুরু করতে হবে।"

"স্মিথ...স্মিথ...তুমি...তুমি অন্যায় আবদার করছ। তুমি যা করতে বলছ, তা একবার ভাল করে ভেবে দেখ। তুমিই বল যে ম্যমিটাকে আমি এত দাম দিয়ে কিনেছি, সেটাকে কেটে ফেলা কি আমার পক্ষে সম্ভব? আজ না হোক, দু'দিন আগেও তো তুমি আমার বন্ধু ছিলে। সেই বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে বলছি, ম্যমিটাকে নষ্ট করবার কথা তুমি বোলো না।"

"এক মিনিট কেটে গেল," স্মিথ গম্ভীরভাবে বলল।

"শোনো স্মিথ, আমার কথাটা শোনো। এসো না, আমরা দু'জনে একটা খোলাখুলি আলোচনা করি। আলোচনার ফলে তোমার মতটা পাল্টেও তো যেতে পারে। আচ্ছা, আগে ঐ ম্যমিটার ইতিহাস শোনো। নিলাম থেকে কেনা ঐ ম্যমিটার সময়কাল কি ভাবে ঠিক করলাম, তা শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।"

"---দু'মিনিট কেটে গেল," গম্ভীর কণ্ঠে স্মিথ বলল।

—"স্মিথ...স্মিথ, তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ। কোন সুস্থ মস্তিষ্কেব লোক এভাবে একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনকে নষ্ট কবতে বলতে পাবে না। তুমি কেবল পাগলই নও, তুমি একটা ভয়ঙ্কব খুনী আমাকে খুন কবতে এসেছ।"

— "তিন মিনিট হয়ে গেল," কঠিন গলায় স্মিথ বলল।

- —"বিনা কাবণে আমাকে ম্যমিটাকে কেটে ফেলতে হবে ?" করুণ স্ববে বেলিংহ্যাম বলল, "তুমি জানো না স্মিথ, কত কষ্ট কবে— কত অর্থ ব্যয় কবে আমি এই ম্যমিটাকে সংগ্রহ কবেছি। এ কোন সাধাবণ লোকেব ম্যমি নয়, এ হলো প্রাচীন মিশবেব একজন 'ফ্যাবাও' বা নবপাতিব ম্যমি।"

"ম্যামিটাকে টুকবো টুকবো কবে কেটে তাবপব ওটাব দেহেব খণ্ডগুলিকে পুডিয়ে ছাই কবে দিতে হবে," কঠিন গলায় স্মিথ বলল।

বেলিংহ্যামেব চোখ দুটো ছলছল কবে উঠল। কান্না ভেজা গলায় সে বলল, "আমি তা পাবব না স্মিথ কিছুতেই পাবব না। তুমি...তুমি আমাকে ববং মেবেই ফেল।"

"চাব মিনিট হয়ে গেল," গম্ভীব কণ্ঠে স্মিথ বলল।

"স্মিথ, দয়া কব। এ কাজ কবতে আমাকে বোলো না।"

বেলিংহ্যামেব মাথা লক্ষ্য কবে বিভলবাব তুলে স্মিথ বলল,

"ভাবছ আমি বাসিকতা কবছি। পাঁচ মিনিট কেটে গেলেই আমি গুলি ছুড়ব।"

"সত্যিই তুমি নবহত্যা কববে ?"

"না, নবহত্যা কবব না, নবরূপী পিশাচকে হত্যা কবব। আব ত্রিশ সেকেণ্ড আছে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বেলিংহ্যাম বলল, "ঠিক আছে।"

— "তুমি যা চাইছ, তাই কবছি আমি। কিন্তু তুমি খুব অন্যায় কবালে স্মিথ।"

টেবিল থেকে ধাবাল ছুবিখানা তুলে নিয়ে স্খলিত পদে বেলিংহ্যাম এগোল ম্যামিব কফিনটাব দিকে।

কিন্তু খোলা কফিনটাব কাছে গিয়ে সে ইতস্তত কবতে লাগল।

স্মিথ গর্জন কবে উঠল, "কি হল, দাঁড়িয়ে বইলে কেন ? কাজ শুরু কবে দাও।"

"সত্যি সত্যিই কি আমাকে এ কাজ কবতে হবে ? এব কি সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে ?" হতাশভাবে বেলিংহ্যাম বলল।

"আব একটিও কথা নয়," স্মিথ ক্রুদ্ধ সিংহেব মতো হুংকাব দিল।

তাব ভয়ঙ্কব মূর্তি দেখে বেলিংহ্যাম আব কিছু বলতে সাহস কবল না। কফিন থেকে সে সাবধানে ম্যামিটাকে বেব কবে আনল। গভীব মমতাব সঙ্গে এক মুহূর্ত ম্যামিটাব দিকে তাকিয়ে বইল বেলিংহ্যাম। তাবপব পাগলেব মতো ম্যামিটাব বুকে ছুবি বসিয়ে দিল। আঘাতেব পব আঘাতে ম্যামিব হাড পাঁজবা খসে খসে পডতে লাগল। ধুলোব মেঘে আব গন্ধে ভবে গেল সমস্ত ঘব। বেলিংহ্যাম পাগলেব মতো ম্যামিব দেহে ছুবি চালাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ম্যামিব কংকালটা ভেঙে গিয়ে হুডমুড

করে ঘরের মেঝেতে পড়ে গেল। স্মিথের মনে হলো অক্ষিকোটরের অন্ধকার গহ্বরে ম্যমির চোখ দুটো যেন তখনও জ্বলজ্বল করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যমির দেহের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ঘরের মেঝেতে একটি স্তূপে পরিণত হলো।

হতাশভাবে উঠে দাঁড়াল এডওয়ার্ড বেলিংহ্যাম। স্মিথের দিকে ফিরে তীব্র ব্যঙ্গের সুরে সে বলল, "কি, সাধ মিটেছে?"

—"না, এখনও মেটেনি। এবার আরও একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।"

—"আবার কি কাজ?" বেলিংহ্যাম খেঁকিয়ে উঠল, "আমার আর কোন সর্বনাশ করতে চাও তুমি?"

"এবার ম্যমির দেহের খণ্ডগুলিকে ফায়ারপ্লেসের আগুনের মধ্যে ফেলে দাও," কঠিন গলায় স্মিথ নির্দেশ দিল।

কোন কথা না বলে বেলিংহ্যাম ম্যমির দেহের খণ্ডগুলি আগুনের মধ্যে ফেলতে লাগল। শুকনো লতাপাতার মতোই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল শুকনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো। চামড়া পোড়ার বিশ্রী দুর্গন্ধে ঘর ভরে গেল। সেই বিকট গন্ধে স্মিথের গা গুলিয়ে উঠল। তার বমি এল। কিন্তু তবু একটুও নড়ল না স্মিথ। সেই অসহ্য গন্ধের মধ্যে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে স্মিথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেলিংহ্যামের উপর কড়া নজর রাখল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিশপ্ত মমিটার ছাই ছাড়া আর কোন চিহ্নই রইল না।

ঘর্মাক্ত দেহে স্মিথের দিকে ফিরল বেলিংহ্যাম। ঘৃণা ভরা গলায় বলল, "মিঃ অ্যাবারক্রোম্বি স্মিথ, আশা করি এবার আপনি খুশি হয়েছেন।"

—"না, এখনও আমি খুশি হইনি, কেননা কাজ এখনও শেষ হয়নি।"

"তার অর্থ?"

ভুরু দুটি কপালে তুলে বেলিংহ্যাম প্রশ্ন করল।

কঠিন কণ্ঠে স্মিথ বলল, "তোমার মতো নরপিশাচকে আমি আর শয়তানী করবার কোন সুযোগ দিতে চাই না। ঐ অশরীরী ম্যমির সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই তোমাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।"

— "বেশ, বেশ...তাই হবে...তাই হবে," একথা বলে বেলিংহ্যাম টেবিলের উপর থেকে গাছের ছালের মতো শুকনো পাতাগুলো তুলে আগুনের মধ্যে ছুড়ে দিল। গলায় তীব্র ঘৃণা ঝরিয়ে সে বলল, "এবার কাজ শেষ হল তো?"

স্মিথ কোন উত্তর দিল না। তার চোখের সামনে শুকনো পাতাগুলি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। পুড়তে পুড়তে পাতাগুলি কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। বেলিংহ্যামের ঘরখানা ধোঁয়ায় ভরে গেল। কিন্তু একটু পরেই ধোঁয়া কেটে গেল। একটা অজানা আশ্চর্য মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল ঘরখানা। এ যেন কোন 'অন্যভুবনের অজানা সুরভি।'

স্মিথ বলল, "ঠিক আছে। এবার পুঁথিখানা বের কর।"

— "পুঁথি! কোন পুঁথি? কিসের পুঁথি?"

বেলিংহ্যাম এমন ভান করল যেন সে স্মিথের কথা শুনে খুবই অবাক হয়ে গিয়েছে।

—"বুঝতে পারছ না!" ব্যঙ্গের সুরে স্মিথ বলল, "বেশ, আমি তা হলে বুঝিয়েই বলছি। আমি প্যাপিরাস পাতার হলদে রঙের পুঁথিখানা বের করতে বলছি। পুঁথিখানাকে তুমি টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে চাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখেছ।"

স্মিথের কথা শুনে বেলিংহ্যাম আঁতকে উঠে বলল, "স্মিথ...স্মিথ, দয়া করো। ও পুঁথিখানাকে তুমি নষ্ট করতে বোলো না। ওখানা পুড়িয়ে তোমার কোন লাভ হবে না।"

—"যা বলছি, তাই কর," রিভলভার উঁচিয়ে স্মিথ বলল।

বেলিংহ্যাম এখন একজন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া মানুষ। কাতর কণ্ঠে সে বলল, "তুমি জানো না স্মিথ, ও পুঁথিখানা মহা মূল্যবান। সারা পৃথিবী খুঁজলেও ও রকম আর একখানা পুঁথি পাওয়া যাবে না। ও পুঁথি সন্ধান দেয় নতুন এক জগতের, উন্মুক্ত করে দেয় জ্ঞানের এক নতুন দিগন্তকে। কুয়াশার অন্তরালের সেই রহস্যময় জগৎকে আমি জানতে চাই—চিনতে চাই। এতে তুমি বাধার সৃষ্টি কোরো না, স্মিথ!"

—"আমি কোন কথা শুনতে চাই না। তুমি পুঁথিখানা বের কর...হ্যাঁ, এক্ষুণি বের কর। নইলে আমার রিভলভারের গুলি তোমার দেহটাকে এই মুহূর্তেই ঝাঁঝরা করে দেবে।"

—"আমার কথাটা একবার শোন স্মিথ...দয়া করে শোন। আচ্ছা...আচ্ছা ঠিক আছে, ঐ পুঁথির মধ্যে যা আছে, আমি তোমাকে তা শিখিয়ে দেব। ওর মধ্যে কি আছে জান? আছে এক অনন্ত...এক অলৌকিক রহস্যের পথের সন্ধান। এ জ্ঞান আজ বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গিয়েছে। স্মিথ, আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব কি করে মৃত ব্যক্তিদের বিদেহী আত্মাগুলিকে রাতের বেলা জাগিয়ে তুলতে হয়...কি ভাবে তাদের সক্রিয় করে তুলতে হয়...কেমন করেই বা বিদেহী আত্মাগুলিকে জাগরণকারীর বশে রাখতে হয়।"

কঠিন কণ্ঠে স্মিথ বলল, "তোমার বক্তৃতা শুনবার সময় আমার নেই। তুমি থামো। এক্ষুণি পুঁথিখানাকে বের করে ছুঁড়ে দাও আগুনের মধ্যে।"

—"বেশ, তাই করব। কিন্তু আগুনে ফেলবার আগে পুঁথির কয়েকখানা পাতা আমাকে নকল করে নিতে দাও।"

—"না," স্মিথ বজ্রকণ্ঠে গর্জন করে উঠল।

—"তোমার সময়ের দাম আছে ঠিকই, কিন্তু আমারও নকল করতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। আমি চট্‌ করে নকল করে নিচ্ছি। আমাকে অন্তত এটুকু দয়া করো স্মিথ।"

বেলিংহ্যামের কথার উত্তর না দিয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্মিথ ড্রয়ারের চাবি খুলে গোল করে পাকানো পুঁথিখানা টেনে বের করে আনল। বেলিংহ্যাম বাধা দেবার জন্য ছুটে

এলে স্মিথ তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ঘরের এক কোণে। তারপর পুঁথিখানাকে ছুঁড়ে দিল অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে। পুঁথিখানা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

বেলিংহ্যাম তখন উঠে বসেছে। তার সমস্ত মুখে ফুটে উঠেছে সব হারানোর ছাপ। তার দিকে তাকিয়ে স্মিথ বলল, "আমার কাজ শেষ। আশা করি আর কোন শয়তানীর খেলা খেলতে পারবে না তুমি। তোমার বিষদাঁত আমি ভেঙে দিলাম। এখন ছোরল মেরেও তুমি কারো কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বিদায় বেলিংহ্যাম। চলি।"

টেবিলের উপর থেকে ঘাড় আর টুপি তুলে নিয়ে স্মিথ দ্রুত পদক্ষেপে বেলিংহ্যামের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেলিংহ্যাম হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল খোলা দরজার দিকে।

উপসংহার

পরবর্তী ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনাই ঘটেনি। অক্সফোর্ডের পুরানো কলেজ বা তার আশপাশের এলাকায় নির্জনতা বা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কোন রহস্যময় ছায়ামূর্তি আর কাউকে আক্রমণ করেনি। মমি আর পুঁথি ছাই হয়ে যাবার কয়েকদিন পরেই বেলিংহ্যাম তার পড়া শেষ না করেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। শোনা যায় সে নাকি সুদানের দিকে গিয়েছে।

বেলিংহ্যাম বিশ্বাস করে যে মানুষের জ্ঞান সীমিত, কিন্তু প্রকৃতির রহস্য অসীম। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে মানুষ সেই সীমাহীন অনন্ত রহস্যের রাজ্যে প্রবেশ করবার পথ একদিন খুজে পাবেই। রহস্যলোকের বন্ধ তোরণ খুলবার চাবিকাঠি একদিন সত্যি সত্যিই এসে যাবে মানুষের হাতে।

প্রকৃতির অনন্ত রহস্যের মধ্যে যেতে চায় প্রাচীন ইতিহাস আর পুরাতত্ত্বের ছাত্র এডওয়ার্ড বেলিংহ্যাম। জানতে চায়— বুঝতে চায় সেই মহা রহস্যের স্বরূপ আর প্রকৃতি।

প্রকৃতির অজানা রহস্যলোকে প্রবেশ করবার পথের সন্ধান করে চলেছে বেলিংহ্যাম। কিন্তু এখনও বোধহয় সে প্রবেশপথ খুজে পায়নি। পেলে কোন না কোন ভাবে সে খবর জানা যেত।

অনুবাদ : অনিরুদ্ধ চৌধুরী

আগুন নিয়ে খেলা

Playing with Fire　আর্থার কোনান ডয়েল

সতের নম্বর ব্যাণ্ডারলি গার্ডেনস। এখানে গত চৌদ্দই এপ্রিল একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। ব্যাপারটা যে কি তা আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না। তবে একটা কিছু যে ঘটেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্রং নাস্তি। ঘটনাটা নিঃসন্দেহে আমাদের মনে দারুণ আতংক বহন করে এনেছিল। হ্যা, আমরা পাঁচজন আতংক বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। সেই আতংক থেকে আমরা আজও মুক্ত হতে পারিনি। সে মহা আতংকের ছাপ আজও রয়ে গিয়েছে আমাদের মনের মধ্যে। কোনরকম যুক্তি তর্ক বা অনুমানের অবতারণা না করে আমি সেদিনের ঘটনাটা সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করছি। লিখবার পর আমি লেখাটা পাঠাবো জন ময়ার, হার্ভে ডেকার আর মিসেস ডেলামারের কাছে। ওদের মধ্যে কেউ যদি লেখাটার একটি বর্ণকেও অসত্য বলেন, তবে এ লেখা আমি ছেপে প্রকাশ করবার জন্য পাঠাবো না। পল লি ডার এর মতামত জানবার উপায় নেই। তিনি দেশে ফিরে গিয়েছেন। তার ঠিকানা জানি না। সুতরাং চিঠি লিখে তার মতামত জানবারও কোন উপায় নেই।

প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জন ময়ারই এই অলৌকিক ব্যাপারের দিকে আমাদের আকৃষ্ট করেন। ব্যবসায়ী হিসেবে ভদ্রলোক কঠিন বস্তুতান্ত্রিক। কিন্তু ওর প্রকৃতির মধ্যে কেমন একটা রহস্যময়তা ছিল যার প্রভাব তিনি কিছুতেই এড়াতে পারতেন না। অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নিয়ে তিনি নিত্য নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে খুবই উৎসাহী ছিলেন। আমাদের মতো অত্যন্ত জানাশোনা কয়েকজনকে নিয়ে তিনি প্রেত তত্ত্বের চর্চা করতেন। একটা বন্ধ ঘরে আমাদের আসর বসত।

পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্য দরকার হলো একজন মিডিয়ামের। মিডিয়ামের মাধ্যমেই পরজগতের বাসিন্দারা ইহজগতের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। মিডিয়াম ছাড়া পরলোক চর্চার আসর একেবারেই অসম্ভব। আমাদের মিডিয়াম ছিলেন মিসেস ডেলামার। মিসেস ডেলামার ছিলেন জন ময়ারেরই ছোট বোন। তাঁর স্বামী মিঃ ডেলামার একজন নামকরা স্থপতি। মি. ময়ার মনে করতেন তার বোনের মতো 'মিডিয়াম' সহজে পাওয়া যায় না। তার উপর বিদেহী আত্মাদের প্রভাব নাকি অকল্পনীয়। তার মাধ্যমে পরজগতের আত্মারা নাকি সহজেই ইহজগতের মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। প্রতি রবিবার মার্টন পার্কের সতের

নম্বব ব্যাডাবলি গার্ডেনস এ আমাদেব প্রেত-চক্রেব আসব বসত। বসত হার্ভে ডেকনেব চিত্রশালায। প্রতি ববিবাবই মিসেস ডেলামাব চক্রে যোগ দেবাব জন্য আসতেন। সব সময য়ে তাঁব স্বামীব অনুমতি থাকত তা ও নয়। মিডিযামেব মাধ্যমে আমবা অনেক আশ্চর্য এবং অদ্ভুত খবব পেতাম।

এবাব হার্ভে ডেকনেব পবিচয দেওযা দবকাব। ডেকন ইংবেজ নন, তিনি স্কটল্যান্ডেব বাসিন্দা অর্থাৎ স্কচ। তাঁব চেহাবা ধাবাল এবং বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি অধ্যাপক। তাছাড়া চিত্রশিল্পী বলেও তাঁব যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। চিত্রশিল্পেব ক্ষেত্রে প্রচলিত বীতি এবং পদ্ধতিব বিবোধী শিল্পধাবাব দিকেই ছিল তাঁব প্রচণ্ড আকর্ষণ। প্রচলিত বীতি-নীতিকে না মেনে এক নিজস্ব পদ্ধতিতে ডেকন ছবি আকতেন। তাব চিত্রশালা ছিল অদ্ভুত বীতি এবং পদ্ধতিতে আঁকা ছবি ও অন্যান্য শিল্পবস্তু দিযে চমৎকাবভাবে সাজান, এবকম একখানি সুসজ্জিত 'চত্রশালা' যে কোন শিল্পীবই ঈর্ষাব বস্তু।

এবাব আমাব পবিচয দিচ্ছি। অবশ্য দেবাব মতো পবিচয আমাব বিশেষ কিছু নেই। আমি হার্ভে ডেকনেব বন্ধু। চিত্র শিল্পেব কতটা সমজদাব আমি সেকথা বলতে পাবব না। তবে এটুকু বলতে পাবব যে ডেকনেব প্রচলিত পদ্ধতি বিবোধী অঙ্কন বীতি আমাব বেশ ভালই লাগে। আমাব ধাবণা কোন প্রতিভাবান শিল্পী কখনও প্রচলিত বীতকে অন্ধভাবে অনুসবণ কবেন না। নিজেব বীতি তিনি নিজেই ঠিক কবে নেন। তাব শিল্প হযে ওঠে স্বকীযতাব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

আমাদেব প্রেত চক্রে যাবা আসেন, যোগ্যতাব দিক থেকে আমি তাদেব সমতুল্য নই। চক্রে আমাব কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে না। আমি যে এসব চক্রে খুব উৎসাহী এবং আগ্রহী এমন কথাও বলতে পাবি না। তবে এটা ঠিক যে ওদেব সঙ্গ আব সাহচর্য আমাব খুব ভাল লাগে। তাই ওদেব পবলোক চর্চাব আসবে আমি প্রাযই হাজিবা দেই।

আব গৌবচন্দ্রিকা বাড়িযে লাভ নেই। এবাব গত চৌদ্দই আমাদেব প্রেত চক্রে যে অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটেছিল, সাধ্যমতো তাব বিববণ দেবাব চেষ্টা কবি। আমি কোন ব্যাখ্যা, ভাষ্য বা টিকা টিপ্পনীব মধ্যে যাব না। নিজেব চোখে যেটুকু দেখেছি তা ই যথাযথভাবে লিখবাব চেষ্টা কবব।

আগেই বলেছি আমাদেব পবলোক চর্চাব বৈঠক বসত প্রতি ববিবাবে। চৌদ্দই এপ্রিল তাবিখটা ছিল ববিবাব। সেদিন চক্র শুরু হবাব একটু আগেই আমি সতেব নম্বব ব্যাডাবলি গার্ডেনস এ হাজিব হলাম। গিযে দেখলাম মিসেস ডেলামাব আমাব আগেই পৌঁছে গিযেছেন। মিসেস ডেকন আব মিসেস ডেলামাব একসঙ্গে চা পান কবছেন। কাপ হাতে মহিলা দু'জন ডেকনেব আঁকা একখানা অসমাপ্ত ছবি দেখছেন। ডেকন বঙ আব তুলি নিযে অসমাপ্ত ছবিখানাকে তাডাতাডি শেষ কববাব চেষ্টা কবছেন।

ইজেলেব সামনে গেলাম। আগেই বলেছি আমি যে খুব একটা শিল্প বসিক তা নয়, তবে ডেকনেব আঁকা ছবি আমাব ভাল লাগে। কিন্তু এ ছবিখানা অদ্ভুত। এবকম ছবি আমি কোনদিন দেখিনি। বিবাট ক্যানভাসে আকা বযেছে কপকথাব নানা কাল্পনিক

জীবজন্তুব ছবি। বং এব মিশ্রণ অপূর্ব আব তা প্রযোগ কবা হযেছে অদ্ভুত নিপুণতাব সঙ্গে।

মহিলা দু'জন তো ছবি দেখে খুবই মুগ্ধ। তাঁবা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কবছেন। আমাবও ভাল লাগল ছবিখানা। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বইলাম ছবিখানাব দিকে।

ছবিতে তুলিব টান দিতে দিতে মিঃ ডেকন আমাব দিকে তাকিযে একটু হাসলেন। তাবপব বললেন, "এই যে মাবকাম, আগেই এসে গিযেছেন দেখছি। চুপ কবে আছেন কেন ? ছবিখানা কেমন হযেছে বলুন দেখি।"

– "খুব সুন্দব। কিন্তু এ ছবিব বিষযবস্তু কি ? ওগুলো কোন জীব ?"

–"এদেব কোন নাম নেই, এবা কাল্পনিক জীব। রূপকথাব বাজ্য থেকে ওদেব চিত্রপটে এনেছি।"

—"ছবিব মাঝখানে ঐ সাদা ঘোড়াটা কেন ?"

—"ওটা ঘোড়া নয়," একটু ঠাট্টাব সুবে কথাটা বলে ডেকন ঠোঁট টিপে হাসলেন।

"তবে ?"

– "ওটা হলো 'ইউনিকর্ন'*। দেখতে পাচ্ছ না জন্তুটাব মাথাব উপবে একটা শিং এঁকেছি।"

– –"হ্যা, তাই তো। জন্তুটা তো ইউনিকর্নই বটে।"

"অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম কাল্পনিক কোন জীবকে চিত্রপটে রূপ দেব। কিন্তু কোন কাল্পনিক জীবকে ? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল গ্রীক পুবাণেব এই একশৃঙ্গী অদ্ভুত জীবটাব কথা। এ জীব ব্রিটিশ বাজকীয প্রতীক চিহ্নেব মধ্যেও বযেছে। ধাবণাটা মাথায আসতেই বঙ আব তুলি নিযে কাজ শুরু কবে দিলাম। সমস্ত দিন অক্লান্ত পবিশ্রম কবে রূপকথাব জীবগুলো আব ইউনিকর্নটাকে চিত্রপটে জীবন্ত কবে তুলবাব চেষ্টা কবলাম। এখন মনে হচ্ছে বৃথাই এতটা সময আব শক্তি নষ্ট কবলাম," ডেকনেব গলাব স্বব করুণ হযে উঠল।

"কেন ?" আমি অবাক হযে প্রশ্ন কবলাম।

– "আপনি তো চিনতেই পাবলেন না জীবটাকে," ডেকনেব গলাব স্বব আবো করুণ।

ডেকনকে বাধা দিযে বললাম, "না না মিঃ ডেকন, ভুলটা আমাবই হযেছে। আমি প্রথমে ইউনিকর্নটাকে চিনতে পাবিনি। মানে ঐ কাল্পনিক জীবটাব কথা আমাব মনেই আসেনি। তাই ভেবেছিলাম আপনি ঘোড়াব ছবি এঁকেছেন। কিন্তু এবাব জীবটাকে ইউনিকর্ন বলেই মনে হচ্ছে। আপনাব আঁকা সার্থক। ছবিখানা এত জীবন্ত হযেছে যে মনে হচ্ছে জীবটা বোধহয এক্ষুণি একছুটে 'ইজেল' থেকে নেমে আসবে।"

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডেকনেব মুখ। খুশিব গলায তিনি বললেন, "ঠিক বলছেন ?"

*ইউনিকর্ন: প্রাচীন গ্রীক্ এবং বোমান লেখকেবা এই জীবেব কথা লিখেছেন। এই কল্পিত জীবেব দেহটা ঘোড়াব মতো। এব মাথায একটা শিং।

"নিশ্চয়ই।

"তবে আমার আঁকা সত্যিই ভাল হয়েছে। আপনি সমজদার মানুষ। আপনার যখন ভাল লেগেছে, তখন আশা করি অন্যদেরও ভাল লাগবে।"

"নিশ্চয়ই লাগবে।"

আলতোভাবে শেষ ক'টি আচড় দিয়ে ছবিখানাকে সমাপ্ত করলেন ডেকন। তারপর রঙ, তুলি গুছিয়ে রেখে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ছবিখানার দিকে। তাঁর মুখে পরম তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল।

সন্ধ্যার একটু আগে জন ময়ার এসে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিপছিপে চেহারার এক ভদ্রলোক। আগন্তুক আমাদের অপরিচিত। জন ময়ার আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সে সময় জানলাম তিনি জাতিতে ফরাসী এবং তার নাম হলো পল লি ডাক। প্রথমটায় একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ ? হ্যাঁ তা ও ছিল বৌক। কারণটা হলো আমাদের পরলোক চর্চার বৈঠক বসত খুবই গোপনে এবং সেখানে কোন অজানা অচেনা মানুষের প্রবেশ করবার অধিকারই ছিল না। কাজেই বৈঠকের প্রধান উদ্যোক্তা জন ময়ার স্বয়ং একজন অপরিচিত আগন্তুককে নিয়ে আসায় যে অবাক হব তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। ভাবলাম আসরের নেতা হয়ে জন ময়ার নিজেই আসরের নিয়ম ভাঙলেন।

কিন্তু ময়ার যে অন্যায় কিছু করেননি তার প্রমাণ পেলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষ হতেই কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে মাঁসিয়ে পল লি ডাক 'অকাল্টিজম' বা রহস্যময় অতীন্দ্রিয়বিদ্যার একজন নামী গবেষক। শুধু তা ই নয়, তিনি 'রোজক্রশ' নামে একটি পবিত্র পারস্যদেশীয় সমিতির অন্যতম সভাপতি। এরকম একজন লোককে আমাদের আসরে এনে জন ময়ার কিছু অন্যায় করেননি। মাঁসিয়ে লি ডাক এর উপস্থিতি নিঃসন্দেহে আমাদের বৈঠকের গৌরব বাড়িয়ে দিল।

প্রেত চক্র শুরু হবার আগেই মিসেস ডেকন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। এসব চক্রে তিনি কোনদিনই উপস্থিত থাকেন না। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিলাম। চক্রের উপযোগী করে চেয়ারগুলোকে সাজিয়ে ফেললাম মেহগনি কাঠের চারকোনা টেবিলটার চারপাশে। ঘরের আলো কমিয়ে দেওয়া হলো। আলো আঁধারিতে সব কিছু যেন কেমন রহস্যময় হয়ে উঠল। আমরা চেয়ারে বসলাম। নিষ্প্রভ আলোতে কেবল আমাদের মুখগুলি দেখা যেতে লাগল।

—"সত্যি, এরকম আসর অনেকদিন পাইনি," খুশিভরা গলায় মাঁসিয়ে ডাক বললেন, "আমার খুবই ভাল লাগছে।"

জন ময়ারের মুখে হাসি ফুটে উঠল। মাঁসিয়ে ডাক-এর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "জানতাম আপনার ভাল লাগবে আর সে জন্যই তো আপনাকে নিয়ে এলাম। আপনার মতো লোকের সঙ্গ পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার।"

মঁসিয়ে ডাক বোধ হয় নিজের প্রশংসা শুনে একটু লজ্জিতই হলেন। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটে তিনি বললেন, "এ চক্রের মিডিয়াম কে?"

—"মিসেস ডেলামার।"

—"বেশ, আচ্ছা মাদাম, আপনি কি একেবারেই আবিষ্ট হয়ে পড়েন?"

—"না, সব সময় যে সেরকম হয় তা নয়। আমার কিছুটা চেতনা থাকে। অবশ্য গভীর ঘুমের মধ্যেও আমি একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়ি না," ধীর গলায় মিসেস ডেলামার বললেন।

—"বুঝলাম, এটা হলো প্রথম ধাপ। আবেশের ভাবটা আসে পরের ধাপে। তখন মিডিয়ামের আর নিজস্ব চেতনা বলতে কিছু থাকে না। তার আত্মা তখন দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। অন্যকোন আত্মা এসে শূন্যস্থান পূরণ করে। যাকে ডাকা হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারই আত্মা এসে প্রবেশ করে মিডিয়ামের দেহে। প্রয়াত আত্মাকে কোন প্রশ্ন করলে মিডিয়ামের মাধ্যমে সেই আত্মাই উত্তর দেয়।"

—"আচ্ছা মঁসিয়ে ডাক, চক্রে বসে যার কথা আমরা গভীরভাবে ভাবব তারই আত্মাকে কি নিয়ে আসা যাবে মিডিয়ামের মধ্যে?" মিসেস ডেলামার প্রশ্ন করলেন।

—"কেন যাবে না?" মুচকি হেসে মঁসিয়ে ডাক পাল্টা প্রশ্ন করলেন। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, "তবে ব্যাপারটা কি জানেন মাদাম, যাকে ডাকা হয় সেই আত্মা যদি চক্রের সবাইকার পরিচিত হয় তবে কাজটা একটু সহজেই হয়।"

হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন মিসেস ডেলামার। মঁসিয়ে ডাকের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

—"যদি মিঃ ডেকনের আঁকা ঐ ইউনিকর্নের আত্মাকে আনতে চাই?"

—"আমরা সবাই যদি ইউনিকর্নটার কথা গভীরভাবে চিন্তা করি তবে সেটাও সম্ভব," মঁসিয়ে ডাক উত্তর দিলেন।

—"তাই বুঝি!" হার্ভে ডেকন অবাক হয়ে মন্তব্য করলেন। তাঁর মনটা বোধ হয় খুশিতে নেচে উঠল।

—"এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ইউনিকর্নটাকে তো মনের চোখে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি," মঁসিয়ে ডাক বললেন।

—"অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন আমার আঁকা ইউনিকর্নটা পুরাণের কল্পজগতের বাসিন্দা নয়?"

—"হোক না কল্পজগতের বাসিন্দা, নাই বা হলো বাস্তব জগতের কোন জীব—কোন অসুবিধাই নেই এক্ষেত্রে।"

—"আপনি বলতে চাইছেন ছবির ঐ ইউনিকর্নটার আত্মাকেও আনা যেতে পারে," মিস্টার ময়ার বেশ অবাক হয়েই বললেন।

—"হ্যাঁ," মঁসিয়ে ডাক সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন।

—"কিন্তু সেটা কি সম্ভব?"

—"অবশ্যই সম্ভব। আত্মার তো নির্দিষ্ট কোন আকার বা নির্দিষ্ট কোন অবস্থানক্ষেত্র নেই। চেষ্টা করলে আত্মাকে যে কোন রূপে যে কোন জায়গায় যে কোন সময়ে আনা যেতে পারে।"

—"দয়া করে এনে দেখান আমাদের," মিঃ ময়ার বললেন।

—"দেখাতে যে পারবই এরকম কথা জোর দিয়ে বলতে পারছি না। তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। তবে এ কাজে আমাদেব সবাইকার আত্মিক শক্তি প্রয়োজন। আমার একার শক্তিতে বোধ হয় এত বড একটা কাজ সম্ভব হয়ে উঠবে না।"

—"আপনি এ বিষয়ে পণ্ডিত এবং অভিজ্ঞ। আমরা বলতে গেলে কিছুই জানি না," হার্ভে ডেকন বললেন, "আপনি যদি চক্র পরিচালনা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে আমরা সবাই সর্বতোভাবে আপনার সহযোগিতা করব। সবার পক্ষ থেকে এটুকু প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারি।"

—"বেশ, তাহলে চেষ্টা কবে দেখা যাক। আপনাবা সবাই কি ছবি ইউনিকর্নটার আত্মাকে আনতে চাইছেন?"

—"হ্যাঁ," সমস্বরে আমরা উত্তর দিলাম।

— "ঠিক আছে, এবার তাহলে কাজ শুরু করি।"

মঁসিয়ে ডাক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, "না না, আমাদের বসাটা ঠিক হয়নি—মানে আমি বলতে চাইছি ঠিক প্রেত চক্রের উপযোগী হয়নি। একটু অন্যরকমভাবে বসলেই আমরা আবো বেশি শক্তি সংহত করতে পারব। আচ্ছা, মাদাম ডেলামার যেখানে বসেছেন সেখানেই বসুন, আমি বসব মাদামের পাশে আব আমার পাশে বসবেন মিঃ মারকাম।

মাদামেব ওপাশে পব পব বসবেন মিঃ ডেকন আব মিঃ ময়ার। এভাবে বসলেই দেখা যাবে যে কালো চুল আর সোনালী চুলের মাথাগুলো একের পব এক রয়েছে। অর্থাৎ কালো চুল...সোনালী চুল...তাবপব আবাব কালো চুল...সোনালী চুল...এইভাবে থাকতে হবে মাথাগুলোকে। আমাদেব কাজের পক্ষে এর ফল খুব শুভই হবে।"

মঁসিয়ে ডাকেব নির্দেশ মতো আমবা আসন পবিবর্তন কবে নতুনভাবে বসলাম।

—"আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে এবাব ঘরেব সমস্ত আলো নিভিয়ে দেব," একটু গম্ভীর গলায় মঁসিয়ে ডাক বললেন।

—"সব আলো নিভিয়ে দেবাব কি সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

— "হ্যাঁ, সম্পূর্ণ অন্ধকাবে আমাদের মনঃসংযোগের কাজটা সহজতর হবে।"

—"কিন্তু...."

মিসেস ডেলামাব কি যেন একটা বলবার চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু তাঁকে থামিয়ে মঁসিয়ে ডাক বললেন, "আপনি বোধ হয় ভয় পাচ্ছেন মাদাম। কিন্তু আমি পল লি ডাক বলছি, আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই।"

ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হলো। নিরন্ধ্র অন্ধকারে ভরে গেল ঘরখানা। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারটা আমাদের চোখে সয়ে গেল। তখন একে অপরের অস্পষ্ট মূর্তিকে চিনতে পারলাম। চক্রটার গুরুত্ব যেন আগের চাইতে অনেক বেশি বেড়ে গেল।

—"আপনাদের হাতগুলো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিন। টেবিলটা প্রয়োজনের তুলনায় এত বড় যে আমরা একে অন্যের হাত ছুঁতে পারছি না। পারলে ভাল হত। অবশ্য এভাবেও খুব একটা অসুবিধা হবে না।"

অন্ধকারের ভিতর মঁসিয়ে ডাকের গলা শোনা গেল। ঘর নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ পরে মঁসিয়ে ডাকের গলা আবার শোনা গেল, "মাদাম ডেলামার, আপনি এবার প্রস্তুত হয়ে নিন। যদি তন্দ্রা বা ঘুম-ঘুম ভাব আসে তবে সে ভাবকে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করবেন না। এবার আত্মাকে আবাহন করা যাক। কিন্তু তার আগে একটি কথা মনে করিয়ে দেই, কথাটা হলো কোন অবস্থাতেই কেউ কোন কথা বলবেন না। সবাই তৈরি তো? বেশ, এবার তাহলে আবাহন শুরু করছি।"

অন্ধকারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আমরা। আমাদের দুটি কান অত্যন্ত সজাগ হয়ে রইল। আশেপাশে সামান্যতম শব্দ হলেও আমরা বোধ হয় শুনতে পাব। বাইরের বারান্দায় ঘড়ি রয়েছে। এখানে বসে টিক টিক্ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দূর থেকে ভেসে এল একটা কুকুরের ডাক। মাঝে মাঝে ভারী পর্দার নিচ দিয়ে বাইরের একটু আলো যেন অত্যন্ত সঙ্কোচিতভাবে এসে অন্ধকারের রাজ্যে লুটিয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে বাইরের বাঁধানো রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। চাকার শ্রুতিকটু কর্কশ শব্দ এখান থেকে শোনা যাচ্ছে। কখনও বা কানে আসছে পথিকদের কথাবার্তার দু'একটা ভগ্নাংশ।

চক্রে বসবার পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার আছে। দেখলাম অন্যান্য বারের মতো এবারেও আমার স্নায়ুর উপর চাপ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আমার পা দু'খানা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। বুকের মধ্যে অনুভব করছি একটা অদ্ভুত ধরনের শিহরন। চক্রের অন্য সবাইকার অবস্থাও বুঝতে পারলাম, কোন অসুবিধা হলো না। তাদের অবস্থাও নিশ্চয়ই আমারই মতো। এরকম অবস্থায় কতক্ষণ কাটল তা ঠিক করে বলতে পারলাম না। আচম্বিতে অন্ধকারের মধ্যেই একটা শব্দ শোনা গেল। মেয়েদের নিঃশ্বাস ফেলবার শব্দ আর তার সঙ্গে মেয়েলি পোশাকের খস্‌খস্ আওয়াজ।

—"ব্যাপার কি? সব কিছু ঠিক মতো হচ্ছে তো?"

উৎকণ্ঠিতভাবে কে যেন জিজ্ঞেস করলেন। যতদূর মনে হলো মিঃ ময়ারই প্রশ্ন দুটো করলেন।

—"হ্যাঁ, সব ঠিক আছে," মঁসিয়ে ডাক এর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ভয় পাবেন না। মাদাম ডেলামার আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। এখন চাই পরিপূর্ণ স্তব্ধতা। আপনারা যদি চুপচাপ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন, তবে আশা করি এবার আপনাদের আশ্চর্যজনক কিছু দেখাতে পারব।"

ঘরের মধ্যে আবার নিস্তব্ধতা।

টিক্...টিক্...টিক্। "ঘড়ি চলে অবিরাম টিক্ টিক্ টিক্।"

ঘেউ...ঘেউ...ঘেউ—রাস্তা থেকে কুকুরের ডাক ভেসে এল। পর্দার ফাঁক দিয়ে চলমান গাড়ির আলো মাঝে মাঝে এসে পড়তে লাগল অন্ধকার ঘরের মধ্যে। পরিবেশটা ক্রমে যেন আরো বেশি রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগল।

মিসেস ডেলামার এখন সম্পূর্ণ অচেতন। তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই ভারী থেকে আরো ভারী হয়ে উঠছে। আমার হাতের নিচে চৌকোনা টেবিলটা থিরথির করে কাঁপছে। এ কাঁপুনির মধ্যে যেন একটা ছন্দ রয়েছে। কাঁপুনিটা একটু একটু করে বাড়ছে। মনে হচ্ছে একখানা ছোট্ট নৌকা যেন দুলছে বিরাট ঢেউয়ের মাথায়।

ঠক্...ঠক্...ঠক্...

চৌকোনা টেবিলখানার পায়ার নিচে থেকে শব্দ হচ্ছে।

—"সময় হয়েছে। মনে হয় এবার আপনারা নতুন একটা অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। কিছু দেখছেন?" মঁসিয়ে ডাকের গম্ভীর কণ্ঠস্বর অন্ধকার ঘরে গম্ গম্ করে উঠল।

আরে তাইতো! একি দেখছি? নিজের দুটি চোখের দৃষ্টিশক্তিকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু বিশ্বাস না করে যাব কোথায়?

টেবিলের উপর সবুজ রঙের ফসফরাসের মতো একটা আলো। না, পুরোপুরি সবুজ রঙের নয়, একটু হলুদের পরশও আছে তার মধ্যে। আলো? না, আলো বলা বোধ হয় ঠিক হলো না। বরং সঠিকভাবে বলতে গেলে বলা উচিত দীপ্ত বাষ্পের একটা প্রভা। সেই প্রভা টেবিলের উপরের কিছুটা অংশকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। বাষ্প ঘন হচ্ছে। হচ্ছে ঘনতর। ধোঁয়ার মেঘের মতো বাষ্পপুঞ্জ ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। প্রদীপ্ত বাষ্পরাশি ঘুরছে—ক্রমাগত ঘুরছে—ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। কোন নির্দিষ্ট রূপ নেবার চেষ্টা করতে গিয়েও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

এ রকম অলৌকিক দৃশ্য তো আমাদের কল্পনারও বাইরে!

—"নাম জিজ্ঞেস করবার সময় আমরা কি বর্ণমালার অক্ষর ধরে প্রশ্ন করব?" অভিভূত কণ্ঠে জন ময়ার প্রশ্ন করলেন।

—"না, আমাদের পদ্ধতিটা ওরকম হবে না," একটু প্রতিবাদের সুরেই মঁসিয়ে ডাক বললেন।

"তবে?" ময়ার আবার প্রশ্ন করলেন।

তাঁর প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে মঁসিয়ে ডাক বললেন, "মাদাম ডেলামার একজন সত্যিকারের ভাল মিডিয়াম। ওঁর মতো মাধ্যম যখন পেয়েছি তখন নতুন কিছু করবার চেষ্টা করব।"

—"নিশ্চয়ই তা করব," একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—"কে বলছেন? মিঃ মারকাম, আপনি বললেন নাকি?"

—"না, না, আমি তো কিছু বলিনি।"

—"না, এটা মিঃ মারকামের গলা নয়," হার্ভে ডেকন বললেন।

—"মিডিয়ামের আত্মা এখন আর তাঁর দেহপিঞ্জরে নেই। মিডিয়াম হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। মাধ্যমের মধ্যে এখন প্রবেশ করেছে পরপারের অন্য এক শক্তি।" সেই অজানা কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল।

—"মিসেস ডেলামারের আত্মা এখন কোথায়?"

—"সে আত্মা রয়েছে অস্তিত্বের অন্য এক স্তরে।"

—"তাঁর কোন ক্ষতি হবে না তো?"

—"মোটেই না। মিডিয়ামের আত্মা এখন পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে রয়েছে। সেই আত্মা এখন আমার অবস্থানক্ষেত্রে রয়েছে আর আমি প্রবেশ করেছি মিডিয়ামের দেহে। সাময়িকভাবে আমরা জায়গা বদল করেছি।"

—"আপনি কে?"

—"আমার পরিচয় জেনে আপনাদের কোন লাভ হবে না। আমি একদা আপনাদের মতোই মানুষ ছিলাম তারপর একদিন আমার মৃত্যু হলো। পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে আমার আত্মা চলে এল অন্য লোকে—অন্য স্তরে।"

রাস্তা থেকে কথা কাটাকাটির শব্দ ভেসে আসছে। গাড়ির আরোহীর সঙ্গে চালকের ভাড়া নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। টেবিলের উপরটা ঢেকে গিয়েছে উজ্জ্বল কুয়াশার আবরণে। পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতির্ময় কুয়াশা তখনও ঘুরছে দ্রুতবেগে। এ ঘোরার মধ্যে কেমন যেন একটা ছন্দ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

বন্ধ ঘরে কোথা থেকে যেন ঢুকল হিমেল হাওয়ার একটা স্রোত। আমার শরীরটা ঠাণ্ডায় শির শির করে উঠল। শীত করছে। মনে ভয় ঢুকল নাকি? হ্যাঁ, স্বীকার করতে লজ্জা নেই আমি ভয় পেয়েছি।

—"যা দেখছি বা যা শুনছি তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর এবং আমাদের কাছে অভূতপূর্ব। আমরা সত্যিই একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। কিন্তু অনেকটা তো এগিয়েছি, এবার চক্র ভেঙে দিলেই বোধ হয় ভাল হয়।"

আমার কথা শুনে বেশ অবজ্ঞাভরেই হেসে উঠলেন সবাই। বুঝলাম ওঁরা বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। আরো এগোতে চান ওঁরা। ব্যাপারটার সমাপ্তি কোথায় তা না দেখে বোধ হয় ছাড়বেন না ওঁরা। ওঁদের কাছে এই মুহূর্তে আমার সতর্কবাণী একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

— "আমাদের সবাইকার আত্মিক শক্তি দিয়ে এই নতুন শক্তি সৃষ্টি করেছি আমরা," হার্ভে ডেকনের গলা শোনা গেল, "দরকার হলে এ শক্তিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। এ শক্তির কাছে আমরা জীবন মৃত্যুর স্বরূপ এবং প্রকৃতির নানা অজ্ঞাত রহস্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারি।"

—"নিশ্চয়ই পারেন।"

আবার শুনলাম সেই অজানা কণ্ঠস্বর।

—"না, না, অনেক চক্রে অনেক প্রশ্ন আমরা করেছি। আর প্রশ্ন নয়। এবার বরং কোন নতুন পরীক্ষা করে দেখা যাক," উত্তেজিতভাবে মিঃ ময়ার বললেন।

—"করুন।" অজানা কণ্ঠস্বর সম্মতি জানাল।

—"আপনার আত্মার যে অস্তিত্ব আছে তা প্রমাণ করতে পারেন?"

—"কি ধরনের প্রমাণ চান?" অজানা কণ্ঠস্বর পাল্টা প্রশ্ন করল।

—"আমার পকেটে কিছু খুচরো রয়েছে, সব নিয়ে কত হবে তা বলতে পারেন?"

—"ছেলেমানুষি করছেন কেন? আপনারা চক্রে বসেছেন জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করবার জন্য। আপনারা জানতে চাইছেন অজানাকে। শিশুসুলভ আচরণ করবার জন্য আপনারা এখানে আসেননি।"

—"খুবই সত্যি কথা মিঃ ময়ার," আমাদের মধ্যে কোন একজন বললেন।

—"এটা একটা আত্মিক চক্র, জুয়ারীদের আড্ডা নয়," অজানা কণ্ঠস্বর কঠিন এবং কর্কশ হয়ে উঠল।

—"মাপ চাইছি," মিঃ মযার ব্যগ্রভাবে বললেন, "আমি সত্যিই মূর্খের মতো প্রশ্ন করেছি, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবেই দুঃখিত। আচ্ছা, আপনি কে সে কথাটা কি বলবেন?"

—"অবান্তর প্রশ্ন করবেন না। আমি কে তা জেনে আপনার কোন উপকার হবে না," অজানা কণ্ঠস্বর এবাব গম্ভীর।

—"আপনার কি বহুদিন আগে মৃত্যু হয়েছে?"

—"হ্যাঁ।"

—"কতদিন আগে?"

—"সেটা বলা শক্ত।"

—"কেন?"

—"কারণ আপনাদের সময়েব হিসেব রাখবার পদ্ধতির সঙ্গে আমাদেব কোন সম্পর্ক নেই।"

—"আপনাবা কি ভাবে সমযেব হিসেব রাখেন?"

—"বাখবার প্রযোজন হয না। আমাদের ও ব্যাপাবটা একেবারে অন্যরকম।"

—"কি বকম?" মিঃ মযাব প্রশ্ন কবলেন।

- "বললেও তা বুঝতে পাববেন না। এ প্রসঙ্গটা বাদ দিন; অন্য প্রশ্ন করুন।"

—"আচ্ছা, আপনি কি সুখী?"

- "নিশ্চযই।"

—"আপনি কি আবাব পার্থিব জীবনে ফিরে আসতে ইচ্ছুক?"

-"নিশ্চযই না।"

"আপনাকে কি কোন কাজ করতে হয?"

—"হ্যাঁ, অনেক কাজই কবতে হয। কাজেব মধ্য দিয়েই আসে সুখ আব শান্তি। নিষ্কর্মারা কোন দিন সুখী হতে পারে না।"

—"আপনি কি কাজ করেন?"

—"বললেও বুঝতে পাববেন না। আমাদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা।"

—"একটা ইঙ্গিত তো দিতে পাবেন ?"

—"আমবা কাজ কবি সাধাবণ আত্মাব উন্নতিব জন্য।"

—"আপনি কি স্বেচ্ছায় আমাদেব চক্রে এসেছেন ?"

—"হ্যাঁ, যদি কোন উপকাব কবতে পাবি তবে সত্যিই খুব আনন্দ পাব।"

—"তবে উপকাব কবাই হলো আপনাব উদ্দেশ্য ?"

—"অবশ্য এ উপকাবেব সঙ্গে জড়িত থাকবে মঙ্গলবিধান।"

—"আমাদেব যাতে মঙ্গল হয় আপনি তা-ই কবতে চান ?"

—"নিশ্চযই, এ শুভ উদ্দেশ্য জীবনেব কোন স্তবে নেই ?"

—"আমাব প্রশ্ন শেষ হযেছে। মিঃ মাবকাম এবাব আপনি প্রশ্ন কবতে পাবেন," জন ময়াব বললেন।

—"আপনাদেব জীবনে কি কষ্ট আছে ?" আমি প্রশ্ন কবলাম।

—"না। কষ্টেব সম্পর্ক দেহেব সঙ্গে। আমবা বিদেহী, কাজেই আমাদেব কোন কষ্ট নেই।"

—"মানসিক কষ্ট ?"

—"আমাদেব স্তবেও কেউ কেউ মানসিক কষ্টেব শিকাব হন।"

— "জীবিত কালেব আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদেব সঙ্গে দেখা হয ?"

—"হ্যা, কখনও কখনও দেখা হয। কিন্তু সেটা খুব কম।"

- "কম কেন ?" আমি প্রশ্ন কবলাম।

"আমাদেব স্তবে দেখা সাক্ষাতেব জন্য প্রযোজন হয সহানুভূতিব। তা না থাকলে বা তাতে ভেজাল থাকলে দেখা সাক্ষাৎ প্রায হযেই ওঠে না।"

— "পার্থিব জগতে যাবা স্বামী স্ত্রী ছিল তাদেব মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয ?"

– "দেখা যে হবেই এমন কথা জোব দিযে বলা যায না। দেখা সাক্ষাৎ নির্ভব কবে তাদেব ভালবাসাব গভীবতাব উপব। ভালবাসা গভীব হলে নিশ্চযই দেখা হয," অজানা কণ্ঠ উত্তব দিল।

– "বিদেহী আত্মাদেব মধ্যে কি আত্মিক সংযোগ আছে ?"

"আছে।"

"আমবা যে চক্রে বসে আত্মাকে আবাহন কবছি, তা কি সঙ্গত ?"

–"আত্মা যদি কোন শুভ শক্তি হয তবে নিশ্চযই সঙ্গত।"

– "শুভ শক্তি বলতে কি বোঝাতে চাইছেন ?"

- –"যে শক্তি দুষ্ট বা ক্ষতিকাবক নয।"

– "অর্থাৎ ?"

— "নিচু স্তবেব আত্মাদেব কামনা বাসনাব ক্ষয হযনি। পার্থিব জীবনেব প্রতি তাদেব তীব্র আকর্ষণ। সেই জীবনকে ভোগ কববাব লোভে তাবা পৃথিবীতে ফিবে আসতে চায। সুযোগ পেলেই নিজেদেব স্বার্থসিদ্ধিব জন্য তাবা কোন জীবিত মানুষেব দেহে আশ্রয় নেবাব চেষ্টা কবে।

প্রেত-চক্রে বসে আত্মাকে আবাহন করলে পৃথিবীতে আসবার পথ খুলে যায়। লোভী এবং স্বার্থপর দুষ্ট আত্মা সেই পথ ধরেই নেমে আসে মরজগতে—এসে প্রথম সুযোগেই মিডিয়ামের দেহ অধিকার করবার চেষ্টা করে।"

--"নিচু স্তরের এসব আত্মা কি মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে?"

---"হ্যাঁ, খুবই ক্ষতি করতে পারে" অজানা কণ্ঠস্বর উত্তর দিল।

---"কি রকমের ক্ষতি?"

---"এমন ক্ষতি যা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না।"

—"তবু?"

---"সে ক্ষতি আপনারা পূরণ করতে পারবেন না। সে ক্ষতিকে রুখবার ক্ষমতাও আপনাদের নেই।"

—"মানুষের দেহ অথবা মনের পক্ষে তা কি খুব ক্ষতিকর?"

—"ক্ষতিকর তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে তা হলো সাংঘাতিক রকমের বিপদের উৎস।"

- "আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।"

হার্ভে ডেকন প্রশ্ন করলেন, "মিঃ ময়ার, আপনি কি আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন?"

- "হ্যা, আমি শুধু আর দু'একটা প্রশ্ন করব।"

--"করুন; কিন্তু ছেলেমানুষি করবেন না," আগন্তুক আত্মার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

- "আচ্ছা, আপনি যে স্তরে রয়েছেন সেখানে সব বিদেহী আত্মাকেই কি প্রার্থনা বা উপাসনা করতে হয়?"

"সব জগতে এবং সব স্তরে সবাইকেই প্রার্থনা করতে হয়।"

"কেন?"

"আত্মিক উন্নতির জন্য। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আত্মার আরও ঊর্ধ্বস্তরে যাবার পথ প্রশস্ত হয়।"

"আপনাদের কি বিশেষ কোন ধর্ম আছে?"

- "না। বস্তুজগতের ধর্মের সঙ্গে আমাদের আত্মিক জগতের কোন সম্পর্ক নেই।"

"আপনারা কি বিশেষ কোন জ্ঞানের অধিকারী?"

- - "জ্ঞান বলতে আপনারা যা বোঝেন আমাদের কাছে তা প্রকৃত জ্ঞান নয়। আমাদের মধ্যে আছে বিশ্বাস গভীর বিশ্বাস।"

- "অন্ধবিশ্বাস?"

"না। আমাদের বিশ্বাসের স্বরূপ আপনারা বুঝতে পারবেন না।"

এতক্ষণ মঁসিয়ে ডাক কোন কথা বলেননি। এইবার তিনি বললেন,

– "মিঃ ময়ার, এত প্রশ্ন করে কি হবে? এ জাতীয় প্রশ্ন তো যে কোন সাধারণ চক্রেই করা যায়। আমরা বরং নতুন কোন অভিজ্ঞতা লাভ করবার চেষ্টা করতে পারি।"

—"আমি আপনাকে সমর্থন করছি মঁসিয়ে ডাক। এ রকম প্রশ্ন আমরা আগেও অনেকবার করেছি। আপনি বরং নতুন কিছু করুন। আমাদের এমন কিছু দেখান যা দেখবার সৌভাগ্য আমাদের আগে কোনদিন হয়নি। আমরা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাই।"

—"বেশ, আপনারা সবাই যদি তা-ই চান তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখি। মাদাম ডেলামারের মতো ক্ষমতাশালী মিডিয়ামের মাধ্যমে যে আত্মিক শক্তিকে আমরা আনতে সক্ষম হয়েছি, দেখা যাক তাকে ঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় কিনা। আমার তো মনে হচ্ছে সেটা খুব শক্ত হবে না।"

—"আমাদের কি করতে হবে?" হার্ভে ডেকন প্রশ্ন করলেন।

—"কিছুই না। টেবিলের উপর হাত রেখে আপনারা শুধু গভীরভাবে চিন্তা করুন।"

টেবিলের উপর পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশা আরো উজ্জ্বল—আরো ঘন হয়ে উঠেছে। তখনও পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে সেই প্রভাময় নীহারপুঞ্জ। মিসেস ডেলামার স্থির হয়ে বসে আছেন তাঁর আসনে। তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই যেন আরো দ্রুত—আরো ভারী হচ্ছে। ঘর অন্ধকার। সেখানে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা। এই নিস্তব্ধতা যেন দেহ মনের উপর প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে। আমার বুকের উপর কে যেন পাষাণভার চাপিয়ে দিয়েছে। একটা অজানা আশংকায় আমার মনটা যেন বার বার শিউরে উঠছে। একটা কিছু ঘটবে—নিশ্চয়ই ঘটবে। কিন্তু সেটা আমাদের পক্ষে কি শুভ হবে? হঠাৎ একটা ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

প্রদীপ্ত কুয়াশার মেঘটা টেবিল থেকে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। জমা হচ্ছে ঘরের আঁধারের চেয়েও আরো আঁধার এক কোণে।

হলুদ-সবুজ উজ্জ্বল কুয়াশার মেঘটা এবার আস্তে আস্তে দীপ্তি হারাতে লাগল। ক্রমে সেটার রঙ হয়ে গেল ধূসর। ধূসর কুয়াশাটা কিন্তু স্থির নয়। সেটা এখনও ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে আরও ঘন হয়ে উঠছে।

টেবিলের উপরে আর একটুও কুয়াশা নেই।

—"অন্ধকার কোণে একটা মূর্তি দেখা যাচ্ছে না?" কে যেন বলল।

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বোধ হয় কোন জীবের জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম," আর একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ঘরের অন্ধকারতম কোণে যে একটা মূর্তির আবির্ভাব হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

—"ব্যাপার কি মঁসিয়ে ডাক? ওটা কিসের মূর্তি?"

—"চিন্তার কারণ নেই। কেউ ভয় পাবেন না," মঁসিয়ে ডাক-এর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—"মূর্তিটা যে কিসের অন্ধকারে তা ঠিক বুঝতে পারছি না। আরে আরে...ওটা দেখছি...ওটা দেখছি একটা বিরাট জন্তু! দেখুন মিঃ ময়ার, দেখুন! কি সর্বনাশ!

জন্তুটা দেখছি আমার দিকেই ছুটে আসছে!" উত্তেজিতভাবে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

—"ভয় নেই...ভয় নেই...ভয় পাবেন না মিঃ মারকাম," মঁসিয়ে ডাকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। স্বর এবার বেশ বিচলিত।

—"মঁসিয়ে ডাক, ঐ ভয়ঙ্কর জীবটাকে চলে যেতে বলুন...এক্ষুণি চলে যেতে বলুন..." আমার কণ্ঠস্বরে একই সঙ্গে অনুনয় এবং উত্তেজনার সুর ফুটে উঠল।

হার্ভে ডেকন চাপা আর্তনাদ করে উঠল। বুঝলাম সে ভীষণ ভয় পেয়েছে।

আচম্বিতে অন্ধকার ঘরে শোনা গেল ক্রুদ্ধ অশ্বের প্রচণ্ড হ্রেষাধ্বনি। সেই ভয়ঙ্কর ধ্বনিতে সমস্ত ঘরখানা যেন কেঁপে উঠল। আমার সমস্ত শরীরটাও কেঁপে উঠল থর থর করে। চক্রের অন্যদের অবস্থাও বোধ হয় আমার চাইতে ভাল নয়।

এর পর যা ঘটল তা ভাষায় গুছিয়ে বলা খুবই শক্ত। আমার আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে ব্যাপারগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটে গেল।

ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে একটা অতিকায় ছায়ামূর্তি বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল। খট্...খট্...খট্...ঘরের বাঁধানো মেঝের উপর খুরের শব্দ শুনতে পেলাম। চীঁ...ঈ...ঈ...শুনলাম একটা তীব্র হ্রেষাধ্বনি। ঝন্ ঝন্ করে জিনিসপত্র উল্টে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকার ঘরে শুরু হলো লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। অতিকায় জীবটার দেহের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চৌকো টেবিলটা উল্টে গেল। কাঠ ভাঙার শব্দ শুনতে পেলাম। দামী টেবিলখানা ভেঙে গেল। আমরা সবাই ছিটকে পড়লাম অন্ধকার ঘরের নানা দিকে। নিদারুণ ভয়ে এবং অসহ্য যন্ত্রণায় আমরা চিৎকার করে উঠলাম। হামাগুড়ি দিয়ে ছুটলাম ঘরের এক দিক থেকে আর এক দিকে। দারুণ আতংকে আমার শরীরটা তখন থর থর করে কাঁপছে। আমার সঙ্গীদের অবস্থাও নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভাল নয়। আমরা সবাই চিৎকার করছি। ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোন কোণে আশ্রয় নিয়ে আমরা সেই মূর্তিমান অবাস্তব ছায়াদেহীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করছি।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ফোঁস ফোঁস্ শব্দ, খুরের খট্...খট্...আওয়াজ, ক্রুদ্ধ উন্মত্ত হ্রেষাধ্বনি —এ সব মিলে ঘরের মধ্যে তখন এক অদ্ভুত.. এক অপ্রাকৃত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যেন আর এ পৃথিবীর বাসিন্দা নই। অপ্রাকৃত লোক এর একটা টুকরো যেন খসে পড়েছে অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে। এই মুহূর্তে আমরা যেন সেই অবাস্তব জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়েছি।

ঘরের মধ্যে শুরু হয়েছে প্রলয় কাণ্ড। মযার, ডেকন, মঁসিয়ে ডাক, মিসেস ডেলামার— এঁরা সব কে কোথায় আছেন কিছুই বলতে পারছি না। কিন্তু ওঁরা যে ঘরের মধ্যেই আছেন —বাইরে বেরিয়ে যাননি সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

"আঃ উঃ!"

দারুণ যন্ত্রণায় আমি তীব্র আর্তনাদ করে উঠলাম। কে যেন আমার বাঁ হাতখানা

সজোবে মাড়িয়ে দিল। সে দেহেব ভাবে আমাব হাড়গোড় বুঝি একেবাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

—"আলো! আলো কোথায়? শীগ্‌গিব জ্বালুন," ভীত এবং উত্তেজিত কণ্ঠে কে যেন চিৎকাব কবে উঠল।

—"মিঃ মযাব, আপনাব সঙ্গে দেশলাই আছে?"

— "না, মিঃ ডেকন, দেশলাই বেব ককন...আলো জ্বালুন।"

—"হায় ভগবান! আমাব দেশলাইটা যে খুজে পাচ্ছি না," হার্ভে ডেকনেব আর্ত কণ্ঠস্বব শোনা গেল, "ঢেব হযেছে! মঁসিযে ডাক, এবাব এই ভযঙ্কব পবীক্ষা বন্ধ ককন।"

— "পাবব না...বন্ধ কবতে পাবব না। ব্যাপাবটা এখন সম্পূর্ণভাবে আমাব নিযন্ত্রণেব বাইবে চলে গিযেছে। চেষ্টা কবলেও আমি কিছু কবতে পাবব না।"

—"সে কি!"

দাকণ আতংকে জন মযাবেব গলাব স্বব কেঁপে গেল

— "হ্যা, বিশ্বাস ককন, ঠিকই বলছি আমি।"

"তা হলে?" হার্ভে ডেকনেব প্রশ্নটা আর্তনাদেব মতো শোনাল।

"আমাদেব এ ঘব ছেড়ে চলে যেতে হবে। দবজাটা কোন দিকে?" গলাব স্বব শুনে বুঝলাম মঁসিযে পল লি ডাকও বেশ ঘাবড়ে গিযেছেন।

ভাগ্য ভাল। দবজাটা ছিল আমাব কাছেই। অন্ধকাবে হামাগুড়ি দিযে কিছুটা এগিয়ে গেলাম। হ্যা, পেযেছি দবজাটা। এবাব খুলে বাইবে বেবিযে পড়তে হবে। খবখবে হাতলে হাত বাখলাম। আব ঠিক সেই মুহূর্তেই ..

হ্যা, ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বিশাল ভাবী দেহ যেন আমাব হাল্কা শবীবটাকে চেপে মেঝেব সঙ্গে মিশিযে দিযে চলে গেল। কোন দিকে দৃকপাত না কবে হাতল ঘুবিযে দবজা খুলে ফেললাম। পিছনেই সকলে হুড়মুড় কবে বাইবে বেবিযে এলেন। আসাব সঙ্গে সঙ্গেই দবজাটা বাইবে থেকে বন্ধ কবে দিলাম।

ঘবেব মধ্যে তখন চলছে দাকণ ভূমিকম্প। সব কিছু লণ্ডভণ্ড হযে যাচ্ছে। এক মহাক্রুদ্ধ উন্মত্ত দানব যেন দাকণ আক্রোশে ছুটোছুটি কবছে ঘবেব মধ্যে।

"এ কোন জীব? অন্ধকাবে ভাল বুঝতে পাবলাম না," শঙ্কা বিহ্বল স্ববে আমি বললাম।

—"দবজা বন্ধ কববাব সময় আমি এক পলকে দেখেছি। জন্তুটা হলো একটা ঘোড়া।" হার্ভে ডেকেন বললেন।

— "ঘোড়া!"

"হ্যাঁ, কিন্তু মিসেস ডেলামাব কোথায়?"

—"কি সর্বনাশ! মাদাম তো ঘবেব মধ্যেই বযেছেন," মঁসিযে ডাকেব কণ্ঠস্বব শঙ্কাতুব।

"আসুন মিঃ মাবকাম, এক্ষুণি মিসেস ডেলামাবকে বাইবে নিযে আসি।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্ষুণি আনতে হবে। দেবি কবলে মাদামেব মাবাত্মক ক্ষতি হবাব সম্ভাবনা রয়েছে," মঁসিয়ে ডাক বললেন।

দবজা খুলে আবাব অন্ধকাব ঘবেব মধ্যে ঢকলাম। মিসেস ডেলামাবেব চেয়াবখানা ভেঙে গিয়েছে। মেঝেতে— চেয়াবেব ভাঙা টুকবোগুলোব মধ্যে গুটিসুঁটি মেবে পড়ে বয়েছে ভদ্রমহিলাব অচেতন দেহ। কোনবকমে ধবাধাবি কবে মিসেস ডেলামাবেব দেহটাকে বাইবে বেব কবে আনলাম। দবজাটা আবাব বন্ধ কবে দেওয়া হলো। বন্ধ কববাব সময় দেখলাম আগুনেব ভাটাব মতো দুটো জ্বলন্ত চোখ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমাদেব দিকে তাকিয়ে বয়েছে। আমাদেব ভাগ্য ভাল, ভয়ঙ্কব জীবটা তক্ষুণি আমাদেব দিকে ছুটে এল না।

কিন্তু দবজা বন্ধ কবতেই বীভৎস জীবটা আবাব দাপাদাপি শুরু কবল। ও বোধ হয় বন্দীদশা আদপেই পছন্দ কবছে না। অতিকায় জীবটাব প্রচণ্ড ধাক্কায় দবজাটা থব থব কবে কেঁপে উঠল। দুড়ুম...দুড়ুম...দড়াম...দড়াম...প্রচণ্ড ধাক্কাব আব বিবাম নেই। এ দবজা আব কতক্ষণ এবকম প্রচণ্ড ধাক্কা সইতে পাববে? দবজা তো ভেঙে পড়ল বলে।

"মিসেস ডেলামাবকে শীগ্গিব ভিতবেব ঘবে নিয়ে আসুন," আতংকে বিহ্বল গলায় হঠাৎ ডেকন চিৎকাব কবে উঠলেন, "দবজা ভেঙে জন্তুটা বাইবে বেবিয়ে এলো বলে।"

দড়াম্। আবাব প্রচণ্ড ধাক্কা। দবজাটা কেঁপে উঠল।

দড়াম্...দড়াম...। ধসে হয়ে গেল একখানা পাল্লা। মাবখানে মুহূর্তেব জন্য দেখতে পেলাম ধবাল এক শিং। আলো পড়ে শিংটা ঝক ঝক্ কবে উঠল।

ইউনিকর্ন!

গল্পকথাব বৃপলোকেব সেই অবাস্তব এক শৃঙ্গী প্রাণী আজ মূর্তিমান হয়ে আবির্ভূত হয়েছে আমাদেব চোখে।

"তাড়াতাড়ি করুন," হঠাৎ ডেকন চিৎকাব কবে উঠলেন, "না, না, ভিতবে নিতে গেলে দেবি হয়ে যাবে। ওদিকে গিয়ে সময় নষ্ট কববাব দবকাব নেই...ওকে ববং এদিকে...হ্যাঁ, আমাদেব খাবাব ঘবেই নিয়ে আসুন...তাড়াতাড়ি...খুব তাড়াতাড়ি..."

দড়াম...দড়াম, দুড়ুম...দুড়ুম! আঘাতেব পব আঘাত ঢেউ এব মতো আছড়ে পড়ছে পাল্লাব উপব। দবজাব দফা শেষ। যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পাবে।

তাবপব?

প্রশ্নটাব উত্তব সবাইকাব মনেব মধ্যেই ঘুবপাক খাচ্ছে কিন্তু মুখ ফুটে বলছে না কেউ।

খাবাব ঘবে নিয়ে এসে মিসেস ডেলামাবেব অচেতন দেহটাকে একটা সোফায় শুইয়ে দিলাম। ডেকন দবজাব ভাবী পাল্লা দুটো বন্ধ কবে দিলেন। ভয়ে, উৎকণ্ঠায়

ওঁর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুকনো পাতার মতো কাঁপছেন শিল্পী হার্ভে ডেকন। আমরা বাকিরাও কম বেশি কাঁপছি।

দুড়ুম...দুড়ুম...দড়াম...দড়াম...আর কয়েকবার প্রচণ্ড ধাক্কার পর ঘরের দরজাটা সশব্দে ভেঙে পড়ল।

খট্...খট্...খট্...টক্...টক্...টক্ অজানা জীবের খুরের শব্দে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল বাইরের বারান্দাটা।

এবার ?

এবার যদি এ ঘরের দরজাটা ভেঙে জীবটা ঢোকে ?

খট্...খট্...খট্...টক্...টক্...টক্...

উন্মত্ত জন্তুটার ক্রুদ্ধ পদাঘাতে সমস্ত বাড়িখানাই যেন কাঁপতে লাগল।

দুটি হাতে মুখ ঢেকে বাচ্চাদের মতো কান্না ভেজা গলায় মসিয়ে ডাক বলতে লাগলেন, "ভাবতে পারিনি...আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে এরকম একটা ব্যাপার হতে পারে। হায় ভগবান! এ কি হলো!"

—"আচ্ছা, ঐ ভয়ঙ্কর জন্তুটাকে বাগে আনবার জন্য আমরা তো বন্দুক ব্যবহার করতে পারি ?"

"না না, ওকে নিয়ে আর ঝামেলা বাড়াবেন না। ও এখানে বেশিক্ষণ থাকবে না —থাকতে পারে না। তাকে নিজের জায়গায় ফিরে যেতে হবেই," মসিয়ে ডাক বললেন।

দড়াম!

প্রচণ্ড এক ধাক্কায় চিত্রশালার দরজাটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

খট্ ..খট্. .টক্...টক্. খুরের সেই শব্দ ঢুকে পড়ল চিত্রশালায়।

"আমার স্টুডিও র দফা শেষ!" করুণ কণ্ঠে হার্ভে ডেকন বললেন।

"আমাদের সবাইকারই দফা শেষ। এ যাত্রায় কেউ বোধ হয় আর প্রাণে বাঁচব না।"

খুরের শব্দ একটু কমতেই একটা আর্ত চিৎকার শোনা গেল। আমরা সবাই চমকে উঠলাম, বলতে গেলে একই সঙ্গে।

লাফিয়ে উঠলেন হার্ভে ডেকন। ভীত অথচ উত্তেজিতভাবে বললেন, "আমার স্ত্রী! আমার স্ত্রী! দারুণ ভয় পেয়েছে। জীবটা বোধ হয় ওকে তাড়া করেছে। না, না, তোমরা আমাকে আটকে রেখ না...আমাকে যেতেই হবে...যেতে দাও আমাকে...।"

পাগলের মতো ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেললেন ডেকন। বারান্দার শেষ প্রান্ত থেকে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। সেই সিঁড়ির সামনে পড়ে আছেন মিসেস ডেকন, সবাই ছুটে গেলাম সেদিকে। ভদ্রমহিলা অচৈতন্য। কিন্তু তার দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। বোধ হয় দারুণ আতংকেই উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

শঙ্কাতুর চোখে আমরা একে অন্যের দিকে তাকালাম। চারদিক নিস্তব্ধ। চিত্রশালার

দিক থেকেও কোন দাপাদাপির শব্দ আসছে না। বীভৎস জন্তুটা কোথায় ঘাপটি মেরে রয়েছে কে জানে! ধীরে ধীরে এগোলাম চিত্রশালার ভাঙা দরজাটার দিকে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল এই বুঝি ভয়ঙ্কর জন্তুটা ঘরের অন্ধকার কোণ থেকে ছুটে এসে আমাদের আক্রমণ করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সে রকম কিছু ঘটল না। চিত্রশালার ভিতরটা নিথর-নিস্তব্ধ।

পা টিপে টিপে দরজার সামনে গেলাম। উঁকি দিলাম অন্ধকার ঘরের মধ্যে। আর তখনই দেখলাম এক অপূর্ব দৃশ্য। দৃশ্যটা কেবল অপূর্ব নয়, দুর্লভও বটে।

ঘরের মধ্যে যেখানে হার্ভে ডেকনের আঁকা ইউনিকর্ন-এর ছবিটা ছিল, তার সামনে এখন পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতির্ময় কুয়াশা। কুয়াশার রঙ হলুদের পরশ মাখানো সবুজ। কুয়াশা চক্রাকারে ঘুরছে—ঘুরছে ধীরগতিতে। জ্যোতির্ময় কুয়াশার দীপ্তি হ্রাস পাচ্ছে। ম্লান হয়ে আসছে উজ্জ্বলতা। জমাট বাঁধা পুঞ্জ পুঞ্জ কুয়াশা ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। আমাদের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে অনুজ্জ্বল পাতলা বাষ্পরাশি এক সময় মিলিয়ে গেল।

চিত্রশালায় এখন সন্ধ্যার তরল অন্ধকার। ইউনিকর্ন নেই। কল্পলোকের সেই অবাস্তব জীব আবার মূর্তি হারিয়ে চলে গিয়েছে রূপকথার জগতে।

—"মাদাম ডেলামার-এর জ্ঞান বোধ হয় এতক্ষণে ফিরে এসেছে," মঁসিয়ে পল লি ডাক বললেন।

ভদ্রলোকের মুখে এতক্ষণে খুশির হাসি ফুটে উঠল।

—"মিঃ ডেকন, আপনার দুটো ঘরের খুব ক্ষতি হলো বটে, কিন্তু আজকের চক্রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করলাম তা সত্যিই অতুলনীয়—অকল্পনীয়," জন ময়ার বললেন।

—"কিন্তু মিঃ ময়ার," হার্ভে ডেকন বললেন, "আমরা আগুন নিয়ে খেলা করেছি। ভবিষ্যতে এরকম বিপদ্জনক এবং ভয়ানক খেলা না করাই বোধ হয় ভাল।"

বিগত চৌদ্দই এপ্রিল তারিখে সতের নম্বর ব্যাভারলি গার্ডেনস-এ যে অতিপ্রাকৃত এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছিল, সাধ্যমতো তার যথাযথ বিবরণ লিখলাম। এ সম্পর্কে কারো যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে অথবা এ ঘটনা থেকেও ভয়ঙ্কর কোন ঘটনা সম্পর্কে কোন লোকের যদি ব্যক্তিগত কোন অভিজ্ঞতা থাকে তবে তিনি বা তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ঠিকানা নিচে দিয়ে দিলাম :

উইলিয়াম মারকাম
১৪৬ এম, দি অ্যালবেনি,
লন্ডন,
যুক্তরাজ্য

অনুবাদ : অনিরুদ্ধ চৌধুরী

দি আপার বার্থ

The Upper Berth—ফ্রান্সিস ম্যারিয়ন ক্রফোর্ড

ততক্ষণে পার্টি শেষ হয়ে গিয়েছে। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই ক্লান্ত এবং তারা ঘুমাতে চাইছে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আলোচনা প্রাণবন্তই ছিল এবং সেই আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়—এমনকি 'ভূত' সম্পর্কিত প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু সে সবও একঘেয়ে লাগছে এখন। কেউই আর বিশেষ কথা-টথা বলছে না। কেউ বা হাই তুলছে। অথচ, গাত্রোত্থান করে যে বাড়িমুখো রওনা হব, সেই ইচ্ছাটাও যে ছাই কারুর মধ্যে আসছে না।

এমন সময় ব্রিসবেন কথা শুরু করল। আমরা তার দিকে তাকালাম। তিরিশোর্ধ্ব যুবক, খুব সুন্দর বা খুব কুৎসিত কোনটাই সে নয়। কিন্তু দেখবার মতো যা, তা হলো তার দৈহিক গঠন। ছয় ফুটের উপর লম্বা এবং বিশাল কাঁধ, সুদৃঢ় গ্রীবা এবং শক্তিশালী দুটি হাতের এমন সমন্বয় খুব কমই আমি দেখেছি। তাকে দেখলেই বোঝা যায়, সে হলো সেই সমস্ত মানুষদের মধ্যে একজন, যাদের যতটা শক্তিশালী বাইরে থেকে মনে হয়, আসলে সে তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

—"সেটা ছিল এক আশ্চর্য জিনিস!"—ব্রিসবেন বলে উঠল। আমরা কথা থামিয়ে উৎসুকভাবে তার মুখের দিকে তাকালাম। সে কিন্তু খুব একটা চেঁচিয়ে কথাগুলো বলেনি। কিন্তু তার স্বরের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা আমাদের সমস্ত মনোযোগকে তার দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

—"হ্যাঁ, সেটা একটা আশ্চর্য জিনিসই বটে। লোকেরা সবসময়ই জিজ্ঞেস করে কেউ স্বচক্ষে ভূত দেখেছে কিনা,—হ্যাঁ, আমি দেখেছি তাকে।"

এই সামান্য কথা কয়টি শোনার পর একটা গুঞ্জনধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল হলঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত—

—"তুমি দেখেছ? যাঃ, এ যে অবিশ্বাস্য! তুমি নিশ্চয় মজা করছ আমাদের সঙ্গে—"

হলের প্রত্যেকটি লোকেরই তন্দ্রাভাব ততক্ষণে সম্পূর্ণভাবে কেটে গিয়েছে। তারা সবাই তাকিয়ে আছে ব্রিসবেনের দিকে।

—"সেবার যখন আটলান্টিক পার হয়ে আমেরিকায় ফিরছিলাম—" ব্রিসবেন শুরু করল, "তোমরা তো জান, ব্যবসার প্রয়োজনে আমাকে প্রায়ই আটলান্টিক

পার হয়ে বিদেশযাত্রা করতে হয়। আর সবসময়েই আমার প্রিয় জাহাজ 'কামস্কাটকাতে ভ্রমণ করতেই আমি ভালবাসি। জাহাজটি এখনও সমুদ্রে বেরোয়, কিন্তু ভগবানের দিব্যি! আমি আর ভুলেও কখনো ঐ জাহাজে উঠছি না। না, না, দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য আমার পায়ে ঢেলে দিলেও নয়।"

সে থামল। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল।

—"জাহাজে উঠলাম। যাত্রীদের চেঁচামেচির মধ্যে থেকে লাল নাকওয়ালা একজন পরিচারককে খুঁজে বার করলাম।"

--"কামরা নম্বর 105 লোয়ার বার্থ"--পরিচারকটির হাতে আমার সুটকেস, ওভারকোট। ছাতা আর বেড়ানোর ছড়ি গছিয়ে দিলাম।

--"কি হলো? নিয়ে চল হে" - লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখি তার মুখ একেবারে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে।

—"কি ব্যাপার? অসুস্থ হয়ে পড়লে নাকি?"

"না না, আমি ঠিক আছি স্যার, আসুন"

105 নম্বর কামরায় প্রবেশ করলাম। ঘরটি বেশ বড়। একপাশে 'আপার' আর 'লোয়ার' দুটি বার্থ রয়েছে। বার্থের বাঁদিকে রয়েছে একটি মুখ হাত ধোওয়ার জায়গা। কিন্তু কোন তোয়ালে দেখলাম না। এদিকে জলের যে বোতলটি বেসিনের উপর একটা হুক থেকে ঝুলছে, তাতে কোন জলও নেই। যাক্, এসব মামুলি ব্যাপার। তোয়ালে আমার সঙ্গেই রয়েছে, আর জলও পরে ভরে নিলেই চলবে।

– "এই নাও, তোমার বকশিশ..."

অবাক হলাম। আমার জিনিসপত্র মাটিতে রেখে পরিচারকটি কখন অন্তর্হিত হয়েছে!

প্রথমদিনটা বেশ ভালই কাটল। তীরের আবহাওয়ার চেয়ে সমুদ্রের আবহাওয়া যথেষ্ট ঠাণ্ডা থাকায় আমাদের বেশ ভালই লাগছিল। জাহাজের অন্যান্য যাত্রীরা ডেকের উপর পায়চারি করতে করতে একে অপরকে পর্যবেক্ষণ করছিল। সমুদ্রের আবহাওয়া কেমন থাকবে বা জাহাজ থেকে কেমন খাবার দেওয়া হবে এই নিয়ে তাদের বেশ চিন্তিত লাগছিল। আমার অবশ্য ও সব ব্যাপার নিয়ে কোন ভাবনা ছিল না। রাত্রে ডেকের উপর শেষবারের মতো পায়চারি করতে করতে যখন আমার শেষ সিগারেটটা আমি টানছিলাম, সেটাই ছিল জাহাজে ওঠার পর থেকে এখনও পর্যন্ত আমার কাছে শ্রেষ্ঠ সময়। এদিকে বেশ ঘুম ঘুম ভাবও আসছিল। সমুদ্রযাত্রার প্রথম রাত্রে আমি খুব ক্লান্তি নিয়েই আমার কামরায় প্রবেশ করলাম। দেখে আশ্চর্য হলাম যে ইতিমধ্যেই আমার উপরের বার্থটি কেউ একজন দখল করেছে। তার মালপত্র ঘরের এককোণায় পড়ে আছে আর উপরের বার্থ থেকে তাঁর ছড়িটি ঝুলছে। বিরক্তিকর ব্যাপার! কেবলমাত্র আমি একা থাকব এরকম একটা কামরা কি পাওয়া যাবে না? ঠিক করলাম সে যখন ঘরে ঢুকবে তখন তাকে একবার দেখব।

সঙ্গীটি যখন ঘরে প্রবেশ করল তখনও আমি জেগেই ছিলাম। লম্বা, রোগা, ফ্যাকাসে, ধূলিময় চুল আর ধূসর চক্ষুবিশিষ্ট এক ব্যক্তি। হাল ফ্যাশনের একটি কোট

সে পরেছিল। তাকে দেখেই আমার মনে হলো এর সাথে সংস্রব না রাখাই বাঞ্ছনীয়। ঠিক করলাম, যদি সে আগে ওঠে, আমি উঠব দেরিতে, আবার সে যদি দেরি করে শুতে যায়, আমি যাব তাড়াতাড়ি। মোটকথা, দ্বিতীয়বার আমি আর তার মুখদর্শন করতে চাই না।

তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হলো সঙ্গীটি উপরের বার্থ থেকে সটান মেঝেতে লাফ মেরেছে! ঘোর পুরোপুরি কাটতে না কাটতেই দেখি সে দরজা খুলে ফেলেছে। এরপর করিডর ধরে সে ছুটতে শুরু করল। এদিকে সমুদ্রের ঢেউয়ে জাহাজটা অল্প অল্প দোল খাচ্ছে। ভাবলাম, লোকটা টাল সামলাতে না পেরে পড়ল বোধহয়। কিন্তু না! লোকটা এমনভাবে দৌড়চ্ছে যেন এর উপর তার জীবনটাই নির্ভর করছে। কেবিনের খোলা দরজাটা ইতস্তত খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে।

প্রথমটায় বেশ ভয়ই পেয়েছিলাম, কিন্তু এরপর বেশ রাগ হতে লাগল। কি সব লোকই যে ওঠে জাহাজগুলোতে! যাই হোক্, উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। কিন্তু যখন উঠলাম, তখনও অন্ধকার কাটেনি। ঘরের ভিতরটা সমুদ্র জলের গন্ধ আর ভেজা বাতাসে একেবারে ভরে গেছে। এত শীত করতে লাগল যে আপাদমস্তক নিজেকে চাদরমুড়ি দিয়ে শুতে হলো। এদিকে আমার অদ্ভুত সঙ্গীটিও কখন যেন ফিরে এসেছে। একটা অদ্ভুত চাপা আর্তনাদের মতো শব্দ 'আপার বার্থ' থেকে ভেসে আসছে। নিশ্চয় সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নাঃ, কাল এই ব্যাপার নিয়ে আমি ক্যাপ্টেনের কাছে অভিযোগ করবই।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। জাহাজটা অসম্ভব দুলছে। আর কেবিনের ভিতরটা জুন মাসে যতটা ঠাণ্ডা পড়া উচিত, তার চেয়েও অনেক বেশি ঠাণ্ডা লাগছে। এরকমটা তো হওয়ার কথা নয়, তবে? চারিদিকে একবার ভাল করে তাকালাম। বার্থ-এর বাঁদিকে কিছুটা উপরের দিকে যে পোর্টহোলটি ছিল সেটি সম্পূর্ণ খোলা। শুধু তাই নয়, সেটার ঢাকনাটা দেওয়ালের গায়ে একটি হুকের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকানো রয়েছে। ওঃ, তাহলে এই ব্যাপার! কেউ ইচ্ছা করে এটা করে রেখেছে। অত্যন্ত রেগে গেলাম। বিছানা ত্যাগ করে আবার সেটা বন্ধ করে দিলাম। 'আপার বার্থ'-এর দিকে তাকিয়ে দেখি তার বাইরের পরদাটা বেশ ভালভাবেই বন্ধ করা রয়েছে। সঙ্গীটিরও নিশ্চয় শীত করছে! আর শুতে ইচ্ছা করল না, পোশাক পরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ঘড়িতে তখন সবে সাতটা বেজেছে। আকাশে প্রচুর মেঘ রয়েছে, আবহাওয়া যথেষ্ট গুমোট।

প্রথমে ভেবেছিলাম আমি ছাড়া এত সকালে বোধহয় আর কেউ ওঠেনি। পরে দেখলাম জাহাজের ডাক্তারও উঠেছেন এবং পায়চারি করছেন। ভদ্রলোক আইরিশ, কালো চুল এবং ঈষৎ নীলাভ চক্ষুবিশিষ্ট তরুণটিকে বেশ আকর্ষণীয় বলে মনে হলো আমার। তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম---

—"সুন্দর সকাল, তাই না ডাক্তারবাবু?"

—"সুন্দর সকাল, অবশ্য আরেকটু স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় সকালটা ঠিক ততটা সুন্দর নয়। তাই নয় কি?"

—"ঠিকই বলেছেন। সকালটা মোটেই তেমন সুন্দর নয়। আর রাত্রে যা ঘটেছে তা তো আর কহতব্য নয়। কে যেন পোর্টহোল্‌টা খুলে রেখেছিল, আর সারা ঘরটা সমুদ্র-জলের বিশ্রী ভ্যাপসা গন্ধ আর ভিজে বাতাসে ভরে গিয়েছিল।"

—"ভিজে বাতাসে ভরে গিয়েছিল? আপনার কামরার নম্বর কত?"

—"একশো পাঁচ?"

—"একশো পাঁচ নম্বর কামরায় ছিলেন আপনি!"—ডাক্তার যেন চমকে উঠলেন।

—"হ্যাঁ...কিন্তু...ব্যাপার কি?"

—"না, না....মানে,...ব্যাপার কিছু নয়। আসলে গত তিনবার এই জাহাজের সমুদ্রযাত্রার সময় ঐ কামরার যাত্রীরা এই একই অভিযোগ করে এসেছে।"

—"হ্যাঁ, সে তো করবেই। আমিও করছি। কামরাটা যেমন ঠাণ্ডা তেমনই ভিজে।"

ডাক্তার এবার এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর স্বর যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে—

—"আমার স্থির বিশ্বাস, ঐ ঘরটায় কিছু একটা রয়েছে। হ্যাঁ, রয়েছে। আমি জানি—" ডাক্তার হঠাৎ থেমে গেলেন। দ্রুত মুখের উপর দিয়ে হাত চালালেন তিনি, "—দেখুন, যাত্রীদের শঙ্কিত করা আমার উচিত নয়।"

"এতে শঙ্কিত হবার কি আছে? ভিজে বাতাসে আমার কিস্যু হবে না। আর যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়, তবে আপনি তো আছেনই—"

—"আমি ভিজে বাতাসের কথা বলছি না, কিন্তু..."

ডাক্তারের গলার স্বর প্রায় ফিসফিসানিতে পরিণত হলো,

—"কামরায় আপনার সঙ্গে আর কেউ ছিল না?—সে কি ফিরে এসেছিল?"—ডাক্তার সেই একইভাবে আমার দিকে তাকালেন।

—"হ্যাঁ, অবশ্য সে যখন ফিরে এসেছিল তখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরে জেগে উঠে আমি তার গোঙানির শব্দ পেয়েছিলাম। দাঁড়ান, দাঁড়ান, তখন খেয়াল হয়নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...আচ্ছা সে-ই পোর্টহোল্‌টা খোলেনি তো?"

—"শুনুন"—ডাক্তার ধীরে ধীরে বললেন, "আমার কেবিনে একটা অতিরিক্ত বার্থ রয়েছে, আপনি ইচ্ছা করলে আমার কেবিনে আসতে পারেন।"

—"ধন্যবাদ। কিন্তু পরিচারক এত ভালভাবে আমার কামরাটা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে যে সেটা ত্যাগ করার কথা ভাবতে পারছি না। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে অন্য কোন বিশেষ কারণ রয়েছে।"

—"দেখুন, ডাক্তারদের ভৌতিক ব্যাপার-স্যাপারে বিশ্বাস করা উচিত নয়, কিন্তু এই জাহাজে যা ঘটছে তার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও খুঁজে পাচ্ছি না। আমি আপনাকে আবার বলছি, আমার কামরায় চলে আসুন; বিশ্বাস করুন, আপনি 105 নম্বর কামরায়

না থেকে যদি সমুদ্রের জলেও পড়ে যেতেন তা হলে তা জেনেও আমি বেশি স্বস্তি পেতাম।"

--"সে কি! কেন বলুন তো?"

"কারণ,"...খুব শান্তকণ্ঠে ডাক্তার জবাব দিলেন, "গত তিনবারের সমুদ্রযাত্রায় যারাই ঐ কামরায় থেকেছে, তারা সবাই উন্মত্ত অবস্থায় সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে!"

কথাগুলি শোনার পর নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। প্রথমে ভাবলাম ডাক্তার বুঝি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন। কিন্তু তার গম্ভীর মুখ দেখে বুঝলাম তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই কথাগুলি বলেছেন।

"দেখুন, আপনি হয়তো আমার ভালর জন্যই বলছেন। কিন্তু"...একটু থেমে বললাম - "আমি কিন্তু 105 নম্বরেই থাকব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অন্যান্যদের মতো আমার সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দেওয়ার এতটুকু ইচ্ছা নেই।"

ডাক্তারকে এবার সত্যিই উদ্বিগ্ন দেখাল। অবশেষে তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন "বেশ, আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন, তবে আমরা অ্যাটলান্টিকের ওপারে যাওয়ার আগে আপনি আপনার মত পরিবর্তন করলে খুবই আনন্দিত হব।"

এরপর আমরা দুজনে ব্রেকফাস্ট করার জন্য ডাইনিং রুমে ঢুকলাম। বেশ কিছু যাত্রীকে সেখানে দেখলাম। সম্ভবত জাহাজের দোলানিতেই আমাদের খিদেটা একটু বেশিই চাগিয়ে উঠেছে। যাই হোক, খাওয়াদাওয়ার পর কামরায় ফিরলাম। আপার বার্থ এর সামনে তখনও পর্দা ঝোলানোই ছিল। সম্ভবত আমার সঙ্গীটি এখনো ঘুমোচ্ছে।

হঠাৎ সেই প্রথম দিনে দেখা পরিচারকটি ঘরে প্রবেশ করল।

"ক্যাপ্টেন একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, আসুন।" বলেই সে যেমনভাবে এসেছিল সেভাবেই বেরিয়ে গেল। কেন ক্যাপ্টেন দেখা করতে চান, কি বৃত্তান্ত কিছুই বোঝা গেল না। যাই হোক, ক্যাপ্টেনের ঘরে গেলাম। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি ঢুকতেই তিনি একটি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন

"স্যার!" ক্যাপ্টেন বললেন, "আমি আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই।"

"বেশ তো বলুন, যদি আমি কোনওভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি" —

- "যে লোকটি আপনার কামরায় ছিল," ক্যাপ্টেন হাত তুলে আমাকে থামালেন "তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা জানি সে বেশ তাড়াতাড়িই গতরাত্রে শুতে গিয়েছিল। আচ্ছা, তার ব্যবহারে অস্বাভাবিক কোন কিছু আপনার চোখে পড়েছে কি?"

ডাক্তারের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পর আবার ঐ একই প্রসঙ্গ নিয়ে ক্যাপ্টেনের উক্তিগুলো খুবই বিস্ময়কর শোনাল।

---"আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না যে সে সমুদ্রে পড়ে গেছে- " আমি ঢোক গিললাম।

"আমি ঠিক সেই ভয়টাই পাচ্ছি —"

"সে কী ? এ তো বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার "

— "কেন বলুন তো ?" ক্যাপ্টেন আমায় বাধা দিলেন।

"কারণ সেক্ষেত্রে ঐ একই ব্যাপার এই নিয়ে চারবার ঘটল, নয় কি ?"

আমি ইতিমধ্যে ঐ কামরা সম্পর্কে যা জেনেছি তা ক্যাপ্টেনকে বললাম। ক্যাপ্টেনকে বিরক্ত দেখাল। কে এই ঘটনাগুলো আমাকে জানিয়েছে তা জানবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমি অবশ্য ডাক্তারের বিষয়ে নিরুত্তর রইলাম। অবশেষে তিনি নিরস্ত হলেন।

"দেখুন, আপনি যা যা বললেন,"—ক্যাপ্টেন বলতে শুরু করলেন —"আপনার আগে ঐ কেবিনের যাত্রীদের মধ্যে দুজনও তাদের সহযাত্রীদের সম্পর্কে ঐ একই কথা বলেছে। তাদের মধ্যে দুজনকে সমুদ্রে পড়ে যেতেও দেখা গেছে। আমরা সেই সময় জাহাজ থামিয়ে তাদের দেহ অনুসন্ধান করারও চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোন ফল পাইনি। অবশ্য গতরাতে যে ব্যক্তিটি নিখোজ হয়েছে, তাকে পড়ে যেতে কেউ দেখেনি। পরিচারক আজ সকালে 105 নম্বর কামরায় গিয়ে দেখেছে তার বার্থ খালি। তার জিনসপত্র যেমনভাবে রাখা ছিল সেভাবেই পড়ে রয়েছে। পরিচারক জাহাজের প্রান্তে প্রান্তে খুঁজে দেখেছে কিন্তু তার খোঁজ পায়নি। সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।"

একটানা এতগুলো কথা বলতে পেরে ক্যাপ্টেন হাঁপিয়ে পড়লেন। এরপর আমার দিকে অনুনয়ভরা দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি

"সবই তো শুনলেন স্যার। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি জাহাজের অন্য কোন যাত্রীকে এ কথা জানাবেন না। আপনিই বলুন, এতে কি জাহাজের সুনামের হানি হবে না ? তার চেয়ে বরং আপনি 105 নম্বর কামরা ছেড়ে দিয়ে আমার বা অন্য যেকোন অফিসারের কামরায় চলে আসুন। আমার মনে হয় তার চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না।"

—"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু আমি আমার কামরা ছাড়বার কোন প্রয়োজনই বোধ করছি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, যা যা ঘটেছে সে সম্পর্কে আমার মুখ বন্ধই থাকবে। আপনি বরং এক কাজ করুন, পরিচারককে পাঠিয়ে আমার ঘর থেকে আমার সঙ্গীর জিনিসপত্রগুলো বের করার ব্যবস্থা করুন। আর হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত থাকুন যে আমার সঙ্গীটির মতো আমি কখনোই সমুদ্রে ঝাঁপ দেব না।"

এরপরও ক্যাপ্টেন আমার মত পরিবর্তন করাবার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল রইলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি মাথা নাড়লেন।

"বেশ, পরিচারককে দিয়ে এখনই আপনার কামরা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করছি। ও হ্যাঁ, পোর্টহোলটাও যাতে ভালভাবে আটকে দেয় তাও বলব তাকে।"

দিনটা মোটামটি ভালই কাটল। সন্ধ্যাবেলা ডাক্তারের সঙ্গে আবার দেখা হলো। তিনিই প্রথম কথা শুরু করলেন

—"আশা করি আপনি আপনার মত পরিবর্তন করেছেন—"

— "না" –

—"আপনি বড় দ্রুত সিদ্ধান্তটা নিলেন, নয় কি?"—ডাক্তারকে খুব চিন্তিত দেখাল।

সেদিন সন্ধ্যায়, খাওয়াদাওয়ার পর কিছুক্ষণ তাস খেললাম। এরপর কামরায় ফিরে এলাম। দরজা খুলে যখন ঘরে ঢুকলাম— সত্যি বলছি— আমি ভয় পাইনি, কিন্তু কিরকম যেন অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিলাম। আমার মানসপটে তখনও পর্যন্ত সেই লম্বা রোগা লোকটির ছবিই ভেসে উঠছে, যে গতকাল সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। আজ স্বপ্নে তাকে নিশ্চয় দেখতে পাব বিমর্ষ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, কি যেন বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না।

দরজা বন্ধ করলাম। ঘরের চারপাশে একবার দ্রুত দৃষ্টিচালনা করলাম। যাঃ বাবা, পোর্টহোলটা খোলা, আর শুধু খোলাই নয়, খোলা অবস্থায় দেওয়ালের হুকের সঙ্গে আটকানো। খুব রাগ হলো। চেঁচিয়ে পরিচারককে ডাকলাম। একটু পরেই সে প্রবেশ করল।

—"এদিকে দ্যাখো, তুমি আবার এটাকে খুলে রেখে গেছ? তুমি জানো না এরকম করা আইনবিরুদ্ধ? তুমি জানো না যখন প্রবল ঢেউয়ে জাহাজ দুলবে আর জল ঢুকবে, তখন দশজনে মিলেও এটাকে আটকানো যাবে না? জাহাজকে বিপদে ফেলার জন্য তোমার নামে ক্যাপ্টেনের কাছে রিপোর্ট করব" –

লোকটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কোন কথা না বলে সে সোজা পোর্টহোলের কাছে চলে গেল। সেটাকে শক্ত করে আটকাতে লাগল।

"কি ব্যাপার? আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না যে?"

"বিশ্বাস করুন, আমি মাত্র আধঘণ্টা আগে এটা বন্ধ করে গিয়েছিলাম। কিন্তু রাত্রি যখন গভীর হয়, এটা খুলে যায়। কেউ এটাকে আটকাতে পারে না। এই জাহাজে অমঙ্গলসূচক কিছু একটা ঘটছে। আপনি অন্য কোন কামরায় থাকলেই ভাল করতেন" পরিচারক স্ক্রুতে শেষ মোচড় দিল।

"টেনে দেখুন তো সব ঠিক আছে কি না?"

আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে টেনে বুঝলাম পোর্টহোলটাকে ভালভাবেই আটকানো হয়েছে।

"ভালভাবেই আটকানো হয়েছে, কি বলেন স্যার? কিন্তু আপনি দেখবেন, আধঘণ্টা যেতে না যেতেই এটা আবার খুলে গেছে আর হুকের সঙ্গে আটকে ঝুলছে।"

ভারী ধাতুর স্ক্রুটা পরীক্ষা করলাম। না, এটা সত্যিই শক্ত করে আটকানো হয়েছে।

"আধঘণ্টার মধ্যেই এটা খুলে যাবে, তাই বললে না? যদি সত্যিই তাই হয়, আমি তোমাকে এক পাউন্ড দেব। এখন যাও, অসম্ভব ব্যাপার নিয়ে তর্ক করতে আমার ভাল লাগে না।"

—"এক পাউন্ড দেবেন? সত্যি বলছেন স্যার? খুব ভাল কথা স্যার, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, শুভরাত্রি স্যার"—

পরিচারকটি অত্যন্ত খুশিমনে কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার পর পোশাক পরিবর্তন করে বিছানায় উঠলাম। ঘুম আসছিল না। দু'-একবার পোর্টহোলটার দিকেও তাকালাম। পরিচারকের কথাগুলো মনে পড়ল।

এর কতক্ষণ পরে জানি না, আধা-ঘুমন্ত অবস্থায় অনুভব করলাম ঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা আর ভিজে বাতাসে একেবারে ভরে গেছে! লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে জাহাজটা হঠাৎ ভীষণভাবে দুলে উঠল। টাল সামলাতে না পেরে ঘরের এককোণে ছিটকে পড়লাম। কোনমতে টাল সামলে উঠে দাঁড়ালাম এবং দেখলাম——

দেখলাম পোর্টহোলের ঢাকনা সম্পূর্ণ খুলে গেছে আর সেটা দেওয়ালের হুকের সঙ্গে আটকে ঝুলছে!!

এ পর্যন্ত বলে ব্রিসবেন আমাদের দিকে তাকাল।

—"বিশ্বাস করো, আমি কোন স্বপ্ন দেখছিলাম না। ব্যাপারটা সত্যিই ঘটেছিল।"

—"বলে যাও বলে যাও, থেমো না!"—আমরা তাড়া দিলাম। ব্রিসবেনের গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা পরের কথা। আপাতত তার কাহিনীটা আমাদের ভীষণভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

—"তোমরা তো জানো আমি ভীরু নই। পোর্টহোলের কাছে গিয়ে সেটাকে বন্ধ করলাম। আমার হাত দুটোতেও শক্তি নেহাৎ কম নেই। সর্বশক্তি দিয়ে স্ক্রুর প্যাঁচ ঘোরালাম। এরপর এটাকে খোলা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় আর এটাও নিশ্চিত যে জাহাজের দোলানিতেও এটা খুলবে না। যাই হোক, এরপরেও প্রায় মিনিট পনের পোর্টহোলের দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ! খুব যন্ত্রণা হলে মানুষ যেভাবে গোঙায়, ঠিক সেরকম একটা আওয়াজ আপার বার্থ থেকে ভেসে এল। চমকে উঠলাম! ওখানে কেউ রয়েছে নাকি? পর্দাটা একটু সরিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, রয়েছে। 'কিছু' একটা শোয়ানো রয়েছে। আমার হাত যেটা স্পর্শ করেছে, আন্দাজে মনে হচ্ছে সেটা একটা মানুষের হাত! কিন্তু কেমন যেন পিচ্ছিল আর ভিজে একটা ভাব রয়েছে সেটাতে! হঠাৎ কোন কিছু বোঝার আগেই প্রচণ্ড জোরে সেটা আমায় ধাক্কা মারল। টাল সামলাতে না পেরে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লাম। ঠিক তক্ষুণি উপর থেকে 'কিছু' একটা লাফিয়ে নিচে পড়ল। ভাল করে উঠে বসবার আগেই 'সেটা' দরজা খুলে ফেলে করিডর ধরে দৌড়তে শুরু করল। আমিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 'সেটার' পিছু নিলাম। কিন্তু দেরি হয়ে গেল! অথচ আমার চেয়ে প্রায় দশ গজ আগে করিডরের আবছা আলোতে আমি 'সেটার' ছায়াও প্রায় দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু করিডর পেরনোর পরই সেটাকে আর দেখা গেল না।

নিজের মনকে বোঝলাম যে যা দেখেছি তা একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। রাত্তিরে খাওয়াটা বেশি হয়ে গিয়েছিল, তাই হয়তো পেট গরম হয়ে এমনটা হয়েছে।

যাই হোক, ধীরে ধীরে আবার কামরায় ফিরে এলাম। এসে কী দেখলাম ভাবতে পারেন ?—দেখলাম সারা ঘরটা সমুদ্র জলের গন্ধে একেবারে ভরে গেছে আর...আর পোর্টহোলের খুলে যাওয়া ঢাকনাটা হুকের সঙ্গে আটকে ঝুলছে!!

ভয়ের বিরুদ্ধে আপনারা কখনো লড়াই করেছেন ? আমাকে বহুবার করতে হয়েছে কিন্তু তার কোনটাই সেদিনের মতো এমন কঠিন ছিল না। দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ধীরে ধীরে বার্থের দিকে এগিয়ে গেলাম। আপার বার্থটা একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার

পরীক্ষা করতে গিয়ে অবাক হলাম! সারা ঘরটা ভিজে বাতাসে ভরে গেছে অথচ আপার বার্থটা শুকনো খট্‌খট্‌ করছে! বিছানাটা কোচকানো, এতে নিশ্চয়ই কেউ শুয়েছিল। অবশ্য এমনও হতে পারে যে গতকালের পর পরিচারক কোঁচকানো বিছানাটাকে পরিপাটি করে সাজায়নি।

যাই হোক, পোর্টহোলটাকে আবার বন্ধ করলাম। এবার স্ক্রু এ প্যাঁচ ঘোরাবার সময় কেবলমাত্র হাত নয়, লাঠির সাহায্যও নিলাম। এই অবস্থায় সাংঘাতিকভাবে বলপ্রয়োগ না করলে এটাকে আর খোলা যাবে না। ঘুম কোথায় উধাও হয়েছে জানি না সারাটা রাত বিছানায় জেগে বসেই কাটিয়ে দিলাম সামান্য একটু শব্দ হলেই চমকে উঠছি। উঃ, সে রাতটা যে কিভাবে কেটেছে

একবারের জন্যেও আমি আমার চোখ পোর্টহোল থেকে সরাতে পারিনি। অবশেষে ঊষার প্রথম কিরণ কামরায় প্রবেশ করল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! পোশাক পরিবর্তন করে ডেক এ উঠে এলাম।

ডাক্তারকে দেখলাম সিগারেট টানছেন।

—"সুপ্রভাত" দ্রুত আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ডাক্তার বলে উঠলেন।

"ডাক্তার, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, জানেন ? সত্যিই আমার কামরাটিতে খারাপ কোন প্রভাব রয়েছে।"

"আমি জানতাম আপনি শেষ পর্যন্ত আপনার মত পরিবর্তন করবেন" ডাক্তার দ্রুত কাঁধ ঝাঁকালেন, "আমার মনে হয় রাতটা আপনার খুব একটা ভাল কাটেনি, তাই না ? "

—"আমার জীবনের সবচেয়ে জঘন্য রাত। তাহলে বলি শুনুন " কাল যা ঘটেছে সবই ডাক্তারকে বললাম।

"ঘটনাটা বড়ই অদ্ভুত, কিন্তু কাল যা যা ঘটেছে, সবই আপনাকে খুলে বললাম।"

—"আমি জানি আপনি সত্যি কথাই বলেছেন। যাক্‌, আপনি ইচ্ছে করলেই আমার কেবিনে আসতে পারেন।"

— "ধন্যবাদ, কিন্তু আমি বলি কি, আপনিই আমাব কামবায় আসুন না, দুজনে মিলে তাহলে এই বহস্যোব একটা কিনাবা কবা যেত।"

— –"আপনি বুঝতে পাবছেন না," – ডাক্তাবকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাল।

— "আবো একটা বাত ঐ কামবায় থাকলে....আপনাব...আপনাব পরিণতি হবে ঐ সমুদ্রেব জলে"

–"আচ্ছা ডাক্তাব, আপনি কি সত্যিই মনে কবেন যে এটা একটা ভৌতিক ব্যাপাব ?" গলায় কিছুটা অবিশ্বাস মাখিয়ে প্রশ্নটা কবলাম।

—"তাছাড়া আব কি হতে পাবে আপনিই বলুন না ?"

– "আমি এব কোন ব্যাখ্যা দিতে পাবব না সত্যি। কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়ই এব কোন না কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পাববেন"

"বেশ, কিন্তু তাব ব্যাখ্যাই যে ঠিক হবে তাবই বা নিশ্চয়তা কি ? এমন অনেক ঘটনা থাকে, যাব কোনো ব্যাখ্যা হয় না, তাই নয় কি ?"

– "তাব মানে আপনি ১০৫ নম্বব কামবায় আমাব সাথে থাকতে আগ্রহী নন ?"

"কখনোই না। আব শুধু আমি কেন, এই জাহাজেব কেউই আপনাব সাথে থাকতে বাজী হবে না"

অত্যন্ত নিবাশ হলাম। আমাব অবশ্য একাকী ঐ কামবায় থাকাব সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু যদি কেউ আমাব সঙ্গে থাকত, তবে বহস্যটা হয়তো ভেদ কবা যেত। ক্যাপ্টেনেব কাছে গেলাম। তাকেও ঐ একই প্রস্তাব দিলাম। তিনি বাজী হলেন —

"বেশ, আপনাব কামবাতে আজ আমবা দুজনেই থাকব। যে পাগলটা যাত্রীদেব ভয় দেখাচ্ছে, তাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দবকাব"–

পাবিচাবকটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি আব ক্যাপ্টেন ১০৫ নম্বব কামবায় প্রবেশ কবলাম। প্রথমেই পবিচাবকটিব সাহায্যে কামবাব প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখলাম। দেওয়ালে কোন গুপ্ত দবজা আছে কিনা লাঠি দিয়ে ঠুকে ঠুকে পবীক্ষা কবে দেখলাম। কিন্তু সন্দেহজনক কোন কিছুই নজবে পড়ল না।

"কিছু পেলেন স্যাব ?" —পবিচাবকটি হাঁপাচ্ছিল।

"না হে, কিছুই তো পেলাম না যাক গে শোনো, পোর্টহোল সম্বন্ধে তুমি যা বলেছিলে সেটাই ঠিক, এই নাও এক পাউন্ড।"

"আমি আপনাদেব ভালকথাই বলছি স্যাব" ধবাগলায় পবিচাবকটি বলল "আব একবাবও এখানে থাকবেন না। চাববাবেব সমুদ্রযাত্রায় চাবটে অমূল্য প্রাণ চলে গেছে স্যাব। আমি বলছি পবিত্যাগ করুন, এই কামবাটা ত্যাগ করুন "

"আব একটা বাত চেষ্টা কবা যাক না, কি বলেন, ক্যাপ্টেন ?" ক্যাপ্টেন কোন কথা না বলে কাষ্ঠহাসি হাসলেন।

বাত্রি দশটা নাগাদ খাওয়াদাওয়া সেবে আমবা ১০৫ নম্বব কামবায় ঢুকলাম। ক্যাপ্টেন দবজা বন্ধ কবলেন।

"আপনাব সুটকেসটা দবজাব সামনে বাখুন তো," ক্যাপ্টেন

বললেন, –"কেউ ঘব থেকে পালাবাব চেষ্টা কবতে গেলে বাধা পাবে, ও হ্যা, পোর্টহোল্‌টা শক্ত ধবে আটকানো হয়েছে তো ?"

স্ক্রু টা পবীক্ষা কবে দেখলাম। হ্যা, ঠিকই আছে। আমি সকালবেলায় আটকে যাবাব পব ঠিক সেভাবেই আছে।

আবেকবাব ঘবটা পবীক্ষা কবে দেখলাম।

"কোন মানুষেব পক্ষেই এই ঘবে প্রবেশ কবা সম্ভব নয়, তা দবজা দিয়েই হোক বা পোর্টহোল্‌ দিয়েই হোক"- নিশ্চিন্ত মনে বললাম।

"ভাল," ক্যাপ্টেন খুব শান্তকণ্ঠে বললেন, "এবপবও যদি কিছু ঘটে, তা হয় আমাদেব দৃষ্টিবিভ্রম, আব নয়তো সেটাকে ভৌতিক কার্যকলাপ বলে ধবে নিতে হবে।"

লোয়াব বার্থেব কিনাবায় বসলাম।

"প্রথম ঘটনাটা ঘটে মার্চ মাসে," ক্যাপ্টেন বলতে লাগলেন

"আপাব বার্থে যিনি শুয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বদ্ধ উন্মাদ। গভীব বাত্রে তিনি হঠাৎ কামবা ছেড়ে দৌড়ে বেব হন, আব কেউ তাকে থামাবাব আগেই তিনি সোজা সমুদ্রেব জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন।"

"বেচাবা! আচ্ছা, আব কখনো এমন ঘটনা ঘটেছে ?"

"ঘটেছে, তবে অন্য জাহাজে। আমাব জাহাজে এবকম ঘটনা এই প্রথম। হ্যা যা বলছিলাম, এব পবেব বাব...আবে! কি দেখছেন বলুন তো ?"

কথা বলাব চেষ্টা কবলাম, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেব হলো না। একদৃষ্টিতে তাকিয়েই বয়েছি পোর্টহোলেব দিকে। স্ক্রুটা ঘুবছে! খুব ধীবে ধীবে, কিন্তু তবু ঘুবছে ক্যাপ্টেনও সেদিকে তাকালেন,

"স্ক্রুটা ঘুবছে!" চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। কিছুক্ষণ দুজনেই একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে বইলাম

"না, স্ক্রুটা এখন আব ঘুবছে না" ক্যাপ্টেন বললেন।

পোর্টহোলেব কাছে গিয়ে স্ক্রুটা পবীক্ষা কবে দেখলাম। হ্যা স্ক্রুটা যে অল্প একটু আলগা হয়ে গেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খুব জোবে ঘুবিয়ে স্ক্রুটিকে আবাব আগেব অবস্থায় আনলাম। দুজনে আবাব নিজেব নিজেব জায়গায় এসে বসলাম।

"অদ্ভুত ব্যাপাব কি জানেন!" ক্যাপ্টেন আবাব বলতে শুরু কবলেন, "দ্বিতীয় যে লোকটি হাবিয়ে গিয়েছিল, সে সম্ভবত এই পোর্টহোল্‌ দিয়েই বেবিয়ে গিয়েছিল। সেদিনটা ছিল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ এক ঝড়েব বাত। আমি শুয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় জাহাজেব কিছু কর্মচাবী এসে আমায় বলল যে ১০৫ নম্বব কামবাব পোর্টহোলটা খুলে গেছে আব হু হু কবে জল ঢুকছে। আমি এসে দেখি সত্যিই তাই। সমস্ত কামবাটায় জল থৈ থৈ কবছে। অতিকষ্টে পোর্টহোলটা আটকানো হলো। কিন্তু জলে ভিজে কামবাটা একেবাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাবপবেও বেশ কয়েকদিন ঘবটাব মধ্যে ঢুকলেই সমুদ্র জলেব গন্ধ পাওয়া যেত। তা যাই হোক,

আমবা ধবেই নিলাম যে এই কামবাব যাত্রীটি পোর্টহোলেব মধ্য দিয়েই গলে বেবিয়ে গেছে। অথচ. .অথচ আর্পান লক্ষ্য কবে দেখুন, একজন মানুষেব গলে বেবিয়ে যাওয়াব পক্ষে পোর্টহোল্‌টা কত ছোট! এটাও খুব আশ্চর্য ব্যাপাব! যাই হোক, তাবপব...আচ্ছা, আর্পনি কি সমুদ্রেব জলেব গন্ধ পাচ্ছেন ?"—

—"হ্যাঁ, তাই তো! কিন্তু কামবাটা তো শুকনোই বযেছে. কিছুই বুঝতে প'বছি না, কেমন কবে...আঃ"—

হঠাৎ ঘবটা সম্পূর্ণ অন্ধকাব হযে গেল। না, সম্পূর্ণ নয, দবজাব ফাঁক দিযে কবিডবেব সামান্য আলো প্রবেশ কবে ঘবটাকে আলো আধাবি কবে তুলেছে। জাহাজটা এদিকে প্রচণ্ডভাবে দুলছে আব আপাব বার্থেব সামনেব পর্দাটা একবাব এদিক আব একবাব ওদিকে দোল খাচ্ছে।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন পোর্টহোলেব উপব ঝাঁপযে পডলেন। কিছুতেই তিনি স্ক্রুটাকে ঘুবতে দেবেন না। তাকে সাহায্য কববাব জন্য আমিও দৌডে গেলাম। ভাবী লাঠিটা আমাব হাতেই ছিল, সেটা দিযে প্রাণপণে সেটাকে ঘোবাতে লাগলাম। কিন্তু তাও শেষবক্ষা হলো না। মট্ কবে একটা শব্দ কবে লাঠিটা ভেঙে গেল আব আমিও টাল সামলাতে না পেবে হুমডি খেযে পডলাম। উঠে দাডিযে দেখি পোর্টহোল্‌টা পুবো হা কবে খোলা আব বিবর্ণমুখে ক্যাপ্টেন আপাব বার্থেব দিকে বিস্ফাবিত দৃষ্টিতে তাকিযে আছেন।

"আপাব বার্থে কিছু একটা বযেছে!" —কাঁপা কাপা গলায় ক্যাপ্টেন বললেন, "দবজা আটকে দাঁডান, যেই হোক না কেন, দবজা দিযে অন্তত পালাতে পাববে না. আবে. আবে কবছেন কি!?"

দবজাব দিকে না গিযে আমি লাফিযে আপাব বার্থে উঠে পডলাম! হাত দিযে বুঝতে পাবছি যে জিনিসটা আপাব বার্থে বযেছে সেটা পিচ্ছিল, সেটা ভেজা! আব.. সেটা আসলে . সেটা একটা ডুবে যাওয়া মানুষেব দেহ! প্রচণ্ড ক্রোধে তাব চোখ দুটো ধক্‌ধক্ কবে জ্বলছে! সমুদ্র জলেব গন্ধমাখা ভেজা চুলগুলো লট্‌পট্ কবে দুলছে। এক প্রচণ্ড ধাক্কায মেঝেতে আছডে পডলাম! প্রায অজ্ঞান অবস্থায যেন অনুভব কবলাম সর্পিলভাবে দেহটা নেমে এল উপবেব বার্থ থেকে! তাবপবই অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে সে আঘাত কবল ক্যাপ্টেনকে। ক্যাপ্টেন মেঝেব উপব লুটিযে পডলেন।

চেঁচাতে গিযে দেখলাম গলা দিযে কোন আওযাজ বেব হচ্ছে না! হৃৎপিণ্ডটা এত দ্রুত ওঠানামা কবছে যে মনে হতে লাগল বুকেব খাচা ভেঙেই বাইবে বেবিযে পডবে!

হঠাৎ সব কেমন যেন নিশ্চুপ হযে গেল! আস্তে আস্তে ঘাডটা তুলে চাবদিকে তাকালাম। সে নেই! সে অদৃশ্য হযে গেছে! কোথা দিযে গেল ? নিশ্চযই ঐ পোর্টহোলেব মধ্য দিযে...কিন্তু অতবড দেহটা ঐটুকু একটা গর্তেব মধ্য দিয়ে...আঃ, আব ভাবতে পার্বাছ না। ঐভাবেই মেঝেব উপব শুয়ে বইলাম। আমাব বাঁদিকে যে ঝাপসা কালো মতো জিনিসটা পডে আছে ওটা কি ? ও হ্যাঁ. ওটা হলো ক্যাপ্টেনেব

দেহ। তিনি বেঁচে আছেন তো? উঠতে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যথায় কঁকিযে উঠলাম। বাঁ হাতের কব্জির কাছে হাড়টা ভেঙে গেছে!

অবশেষে, অনেকক্ষণ পর ডান হাতে ভব করে উঠে দাঁড়ালাম। ক্যাপ্টেন বেঁচে আছেন। ধীরে ধীরে তাঁকে দাঁড় করালাম। তিনি মাথায় আঘাত পেয়েছেন।

—"কি দেখলাম বলুন তো? এ কী সত্যি?"

আমি ম্লান হাসলাম। ডাক্তারের কথাই তাহলে সত্যি হলো।

সব ঘটনার পিছনেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না।

—আব অল্প কথাই বলার আছে। 105 নম্বব কেবিনের দবজায় আধ-ডজন স্ক্রু আটকে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ কবে দেওযা হলো। ডাক্তার খুব যত্ন নিয়েই আমাব হাতটার পবিচর্যা কবেছিলেন। ক্যাপ্টেন আব ঐ জাহাজে উঠবেন না প্রতিজ্ঞা করলেন। আর আমি? আমার শেষ ডলারটা পর্যন্ত দিযে দেব, কিন্তু মৃতের সঙ্গে মোকাবিলা? নৈব নৈব চ।"

অনুবাদ : অনিন্দ্য চৌধুরী

॥ সমাপ্ত ॥